Resgitered No. 65

অসতো মা সদগময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৬ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৪৯শ ভাগ।	১লা বৈশাখ, বুধবার, ১৩৩৩, ১৮৪৮ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯৭	প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০
১ম সংখ্যা।	14th April, 1926.	অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

নূতন বরষে, নাথ, প্রণমি তোমায়,
কৃপা করি' এ দাসেরে রাখ তব পায়।
নব জীবনের আশা তুমিই ত নাথ,
নিরাশার অমানিশা কর সুপ্রভাত।
আশার আলোক হৃদে ফুটাও আমার,
শুষ্ক প্রাণে সুধারস করহ সঞ্চার।
নব বলে কর বলী দুর্ব্বল সন্তানে,
মৃত প্রাণ সঞ্জীবিত হ'ক সুধাপানে।
চাহি না সম্ভ্রম মান, সংসারের সুখ,
বড় সাধ অনিমেষে হেরি প্রেমমুখ।
শুনাও আশার বাণী, জুড়া'ক শ্রবণ,
আজীবন পূজি নাথ, তোমার চরণ।
প্রেম ভক্তি ও চরণে করি অর্ঘ দান,
রসনায় করি সদা তব গুণ গান।
দেহ মন প্রাণ সব সঁপি তব কাজে,
দেখা দেও দীনজনে অপরূপ সাজে।
এ ভবের ধূলাখেলা সাঙ্গ হবে যবে,
প্রেমবাহু প্রসারিয়া কোলে তুলি' ল'বে।
দিব্য ধামে দিব্য চক্ষু খুলিবে আমার,
কেটে যাবে সংসারের মোহ-অন্ধকার।
ভুঞ্জিব স্বরগসুখ অনন্ত অপার,
উথলিবে এ হৃদয়ে সুখ-পারাবার!
সেদিন নিকটে নাথ,—তাই সকাতরে—
ডাকি হে করুণাসিন্ধু, শুভ অবসরে।
পূরাও বাসনা মম দিয়ে দরশন,
কাতরে প্রার্থনা করি, হে দীনশরণ॥

শ্রী চন্দ্রনাথ দাস

হে নিত্য অপরিবর্ত্তনীয় চির নবীন বিশ্ববিধাতা, তোমার এই নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল বিশ্বের সকল পরিবর্ত্তন ও ঘটনার মধ্যে, তুমি প্রতি মুহূর্ত্তে তোমার নূতন রূপই ফুটাইয়া তুলিতেছ। আমরা স্থূল দৃষ্টি বশতঃই তাহা দেখিতে পাই না—বিশেষ গুরুতর কিছু না ঘটিলে আর তাহা আমাদের চক্ষে পড়ে না। বসন্তসমাগমে বৃক্ষলতাদি যখন নব পল্লবে সুশোভিত হয়, তখনই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে; অথচ তুমি নিয়তই তাহাদিগকে নূতন জীবনে বর্দ্ধিত ও বিকশিত করিতেছ। তোমার কালপ্রবাহ প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদিগকে নূতনে নিয়া আসিতেছে; তবুও আমাদের নিকট নববর্ষ যেরূপ নব ভাবে উপস্থিত হয়, আর কোনও দিন সেরূপ হয় না। তাই অধিকাংশ সময়ই আমরা নূতনকে ভুলিয়া পুরাতনেই ডুবিয়া থাকি—আমাদের জীবনেও যে তুমি নিত্য নূতন লীলা প্রকাশ করিয়া, আমাদিগকে প্রতি মুহূর্ত্তে নবীনতর উন্নততর জীবনে লইয়া যাইতে চাহিতেছ, তাহা দেখি না। আমরা যদি তোমার জীবন্ত মঙ্গলবিধাতৃত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া, তোমার হাতে আপনাদিগকে সম্পূর্ণরূপে অর্পণ করিতে পারিতাম, একমাত্র তোমারই দ্বারা চালিত হইয়া তোমার অনুগত জীবন যাপন করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমাদিগকে কখনও পুরাতন জীবনের মৃত্যু ও মলিনতার মধ্যে পড়িয়া থাকিতে হইত না। হে চির নবীন, তোমার এই নূতন আহ্বান ত কত রূপে, কত ভাবে, বার বার আমাদের নিকট আসিতেছে! আমরা কেন যে তাহা শুনিয়াও শুনি না, উদাসীন ভাবে মৃত অবশের ন্যায়ই পড়িয়া থাকি, তাহা তুমিই ভাল জান। আমাদের সকল ত্রুটি দুর্ব্বলতা তুমিই যথার্থ ভাবে দেখিতেছ। আমরা মোহাভিভূত হইয়া অনেক সময়ই তাহা গভীররূপে অনুভব করিতে পারি না। হে করুণাময় পিতা, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে আমাদের অবস্থা ভাল করিয়া অনুভব করিতে সমর্থ কর এবং প্রাণে নূতন আকাঙ্ক্ষা, নূতন প্রার্থনা, জাগাও। আমরা নববর্ষে তোমার নূতন বলে বলীয়ান্

হইয়া, নূতন ভাবে, নব জীবনের পথে চলি; সম্পূর্ণরূপে তোমার অনুগত হই। তোমার মঙ্গল ইচ্ছাই সর্ব্ব প্রকারে জয়যুক্ত হউক।

নিবেদন

নববর্ষের প্রার্থনা—নূতন বর্ষে আমি বাহিরের সাজ পোষাক কামনা করি না—আমার অন্তর পুণ্য-বসনে উজ্জ্বল দেখ্‌তে চাই। আমি যাদের স্নেহ করি, ভালবাসি, তারা আমাকে ভালবাসুক, আদর করুক, এ প্রার্থনা আমি করি না—আমি যেন উপেক্ষা পেয়েও তাদের প্রাণের সহিত ভালবাস্‌তে পারি! যাদের আমি উপকার করি, তারা কৃতজ্ঞ অন্তরে আমার প্রত্যুপকার করুক, এ প্রার্থনা আমার নাই—আমি যেন যে আমার অনিষ্ট করে, তাহারও কল্যাণকামনা, কল্যাণসাধন কর্‌তে পারি! যে আমাকে নির্য্যাতন করে, তাকেও যেন প্রেমে আলিঙ্গন কর্‌তে পারি! আমি দেশের ও দশের কাজ করি ব'লে লোকে আমার প্রশংসা করুক, সম্মান করুক, এ প্রার্থনা আজ আমি করি না—আমি যেন অনাদর তাচ্ছিল্য পেয়েও মানবের সেবা ক'রে যেতে পারি। আমি সুখে থাকি, আরামে থাকি, এ প্রার্থনা আজ আমি করি না; আমি যেন দুঃখ দৈন্যের ভিতরেও তাঁর চরণে প'ড়ে থাক্‌তে পারি, আনন্দে তাঁর নাম গান কর্‌তে পারি! আমার প্রাণ যেন উদার থাকে, হৃদয় যেন প্রেমে পূর্ণ থাকে—যে দুঃখ দেয়, যে বিপথে যায়, তাকেও যেন টেনে রাখ্‌তে পারি! দেশের অবস্থা, মানবের অবস্থা, ভেবে যেন এক ফোঁটা চোখের জল ফেল্‌তে পারি! আজ আমার নূতন দৃষ্টি হোক, নূতন জ্ঞান হোক, বিশ্ব জগৎ নূতন হোক! আজ প্রভু আমার নূতন বেশে প্রাণ মন এসে অধিকার করুন!

দেবতা কোথায়—কোথায় তুমি দেবতাকে রেখেছ, দেবতাকে খুঁজ্‌ছ? তুমি ভেবেছ কেবল তোমার ঐ মন্দিরে, বা মস্‌জিদে বা গির্জ্জায় তোমার দেবতা ব'সে আছেন, অন্য কোথাও দেবতা নাই; তাই তুমি মন্দির, মস্‌জিদ্ বা গির্জ্জায় প'ড়ে থাক! কেহ তাহা অপবিত্র কর্‌তে এলে প্রাণ দিয়ে তা রক্ষা কর! কত যত্নে মন্দির মস্‌জিদ বা গির্জ্জা তুমি পরিষ্কার কর, সজ্জিত কর! এ ত ভাল কথা। প্রভুর অর্চনা যেখানে হয়, তাহাই পবিত্র—তাহা যত্নে রক্ষা করা, পরিষ্কার করা কর্ত্তব্য। কিন্তু দেবতা কেবল ঐ মন্দির মস্‌জিদ্ বা গির্জ্জাতেই আছেন তা নয়; তিনি যে সর্ব্বত্রই আছেন—দেবতা যে বিশ্বের আকাশে বাতাসে আছেন, সূর্য্যে চন্দ্রে আছেন, রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দে আছেন; পর্ব্বতে নদীতে সমুদ্রে আছেন! তিনি যে প্রত্যেকের হৃদয়স্বামী হ'য়ে অন্তরে আছেন। যেখানে দশ জন তাঁর নামে সমবেত হয়, ব্যাকুল ভাবে তাঁর চরণে প্রাণের কথা নিবেদন করে, সেখানেই যে তাঁর আবির্ভাব হয়! তুমি দেবতাকে ছোট করিও না; দেবতাকে এক স্থানে সংকীর্ণ ক'রে, আটক রাখ্‌তে চেষ্টা করো না। দেবতা ক্ষুদ্র হ'লে তোমার প্রাণও ক্ষুদ্র সংকীর্ণ হবে; তখন মনে হবে, তোমার মন্দিরেই তিনি আছেন, মস্‌জিদে নাই; অথবা মস্‌জিদেই আছেন, মন্দিরে নাই; হিন্দুর ঘরেই আছেন, ম্লেচ্ছের ঘরে নাই; মসলেমের ঘরেই আছেন, কাফেরের ঘরে নাই। দেবতাকে ছোট ক'রে দেখো না। দেবতা যে সকলের সঙ্গে আছেন। সকলের প্রাণে আছেন। এই বিশ্বই যে তাঁর মন্দির; প্রতি স্থান, প্রতি পদার্থ, তাঁর সত্তায় পূত, পবিত্র; চোখ মেলে দেখ তাঁকে সর্ব্বত্র দেখ্‌তে পাবে।

নরক কোথায়?—তোমরা মনে কর মৃত্যুর পরে নরক আছে, যে পাপ করে সে সেখানে যায়; কত যন্ত্রণা সেখানে যেয়ে পায়! তোমাদের কি ভুল! নরক যে এখানেই রয়েছে, নরক যে সঙ্গেই রয়েছে; নরক যে মানুষের মনে! যেখানে প্রভুর আবির্ভাব, সে-ই স্বর্গ; যেখানে তাঁকে অস্বীকার করা হয় সে-ই নরক। তুমি আমি এই জীবনে কত বার নরকে যেয়ে পড়ি! যখনই প্রাণে অপবিত্র ভাব আসে, তখনই যে নরকবাস হয়; যখনই প্রাণে অপ্রেম আসে, বিদ্বেষ আসে, তখনই যে নরক-যন্ত্রণা ভোগ হয়! যখনই আমি ক্রোধের অধীন হই, যখন আমি বাসনার বশে চল্‌তে থাকি, যখনই আমি স্বার্থে অন্ধ হই, তখনই যে নরক! যখনই আমি আমার প্রভুকে—জীবনস্বামীকে—ভু'লে থাকি, যখনই তাঁর আসনে আর কাহাকেও বসাই, যখনই আমিত্ব ল'য়ে থাকি, তখনই যে আমি নরকে বাস করি! নরক দূরে, পরলোকে রয়েছে, মনে ক'রো না; নরক যে এখানেই আরম্ভ হয়; নরক যে সঙ্গে সঙ্গে আছে, মনের মধ্যেই আছে। মন শুদ্ধ কর, হৃদয় প্রেমে পূর্ণ কর; সত্য প্রেম পবিত্রতা সম্বল কর; চিত্তে ঈশ্বরের আসন পাত, তাঁর চরণে প্রাণ মন স'পে দাও। নরক চ'লে যাবে, হৃদয়ে স্বর্গের আলোক প্রতিভাত হবে।

সম্পাদকীয়।

পুরাতন ও নূতন বর্ষ—অবিরামবাহী অনন্ত কাল-পারাবারের ক্ষুদ্র বুদ্‌বুদ্‌স্বরূপ আর একটি বৎসর, ক্ষণকালের জন্য উত্থিত হইয়া, জগতে ও আমাদের জীবনে আপনার কার্য্য সাধন করিয়া, চিরকালের তরে আবার তাহাতেই লীন হইয়া গেল। অনন্তের তুলনায় ইহা কত ক্ষুদ্র! অগণিত যুগব্যাপী বিশ্বকার্য্যে ইহা কত নগণ্য! আমাদের ক্ষুদ্র জীবনের মধ্যেই বা ইহার স্থান কতটুকু! ইহাকে মাস দিন মুহূর্ত্তে ভাগ করিলে আবার তাহা আরও কত তুচ্ছ, গণনার অযোগ্য, হইয়া দাঁড়ায়! অথচ তাহাও বৃথা, কোনও কাজ না করিয়া, শূন্যে বিলীন হইয়া যায় না—আপনার কার্য্যটি সম্যক্‌প্রকারে সম্পন্ন করিয়া, আপনার একটি ছাপ রাখিয়াই যায়। এক ভাবে তাহা আবার অনন্তকালব্যাপী, চিরজীবনস্থায়ী। আমাদের দৃষ্টিশক্তি অতি ক্ষীণ বলিয়াই, আমাদের ধারণাশক্তি অতি স্থূল বলিয়াই, সে-সকল সূক্ষ্ম কার্য্য লক্ষ্য করিতে পারি না। সমষ্টিগত ভাবে তাহার কতকগুলি সম্বন্ধে একটা মোটামোটী ভাব গ্রহণ করিয়াই সন্তুষ্ট হই। কত আশা নিরাশা, উৎসাহ অবসন্নতা, জয় পরাজয়, উত্থান পতনের মধ্য দিয়া একটী বৎসর চলিয়া গেল! কত সুখ দুঃখ, আনন্দ শোক, পুণ্য পাপ, প্রীতি

অপ্রীতি, প্রেম অপ্রেম মহৎ আত্মত্যাগ ও নীচ স্বার্থপরতার, খেলা দেখাইয়া গেল! জগতে সমাজে ও প্রতি জীবনে ইহার মধ্যে কত ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে! তাহার মধ্যে কয়টা আমরা স্মরণে রাখিয়াছি? কয়টা লক্ষ্য করিয়াছি? লক্ষ্য করি আর না করি, তাহার প্রত্যেকটাই কিন্তু আমাদিগকে গড়িয়া উঠিতে, বর্ত্তমান অবস্থায় পৌছিতে, কিছু না কিছু সাহায্য করিয়াছে। সাধারণতঃ আমরা দুঃখের কথাই বিশেষ ভাবে স্মরণে রাখি; বিশেষ আনন্দের কারণ না হইলে সুখকর ঘটনা বড় একটা মনে থাকে না,—তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয় বলিয়াই অনুমিত হয় না। আনন্দ সুখটা আমরা আমাদের প্রাপ্য বলিয়াই মনে করি, তাহার জন্য কৃতজ্ঞ হওয়াটা কর্ত্তব্য বলিয়াও মনে হয় না। আর দুঃখ বেদনাটা নিতান্তই অন্যায়রূপে আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করে ভাবি বলিয়া, সর্ব্বদাই তাহার জন্য অভিযোগ করিয়া থাকি—উক্ত প্রকার অভিযোগে আমাদের পূর্ণ অধিকার আছে মনে করি। বহু দিন সুস্থ থাকা সত্ত্বেও এক দিন শিরঃপীড়াহেতু মস্তকে বস্ত্রবন্ধনের জন্য রাবেয়া একজনকে, কৃতজ্ঞতার নিশান না উড়াইয়া অকৃতজ্ঞতার নিশান ধারণ করিবার জন্য, তিরস্কার করিয়াছিলেন। আমরা পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাইব, আমরা প্রায় সকলেই উক্ত প্রকার তিরস্কার প্রাপ্ত হইবারই যোগ্য। আমরা কি বিগত বৎসরের ঘটনাবলীর জন্য যথার্থতঃ জীবনবিধাতার নিকট কৃতজ্ঞচিত্তে উপস্থিত হইতে পারিতেছি? কৃতজ্ঞ হইবার কি যথেষ্ট কারণ নাই? যে যত দুঃখ তাপ বেদনাই পাই না কেন, তাহা অপেক্ষা কি অধিক সুখ শান্তি আরাম পাই নাই? প্রত্যেক মুহূর্ত্তের ঘটনাবলীর যদি দুইটী তালিকা প্রস্তুত করি, তাহা হইলে কি দুঃখ বেদনার তালিকাটাই বৃহত্তর হইবে? আমরা সূক্ষ্মভাবে গণনা করিয়া কি তাহা দেখিয়াছি? না, অতি স্থূলভাবে বিচার করিলেও অপর তালিকাটিই বড় দেখা যাবে? তাহার পর, আমরা কি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, দুঃখ বেদনাটা বাস্তবিকই অপ্রার্থনীয়, অকল্যাণকর? তাহার মধ্যে অধিকতর মঙ্গল লুক্কায়িত থাকিতে পারে না, এরূপ কোনও নিশ্চিত প্রমাণ কি আমরা পাইয়াছি? আর সত্যই কি তাহার বিপরীত প্রমাণ আমরা জীবনে কখনও পাই নাই? আমরা যথার্থতঃই কি দেখিতে পাই নাই যে, দুঃখ বেদনা আমাদিগকে পরম বন্ধুর ন্যায় জীবনপথে উন্নতির দিকে অগ্রসর করিয়া, জীবনদেবতার নিকটবর্ত্তী করিয়া, পরম কল্যাণসাধনই করিয়াছে? তবে কেন আমরা সুখ দুঃখ, সম্পদ্ বিপদ্, উভয়কেই একই প্রেমময় দেবতার অসীম প্রেমের ব্যবস্থার অন্তর্গত জানিয়া, সমভাবে গ্রহণ করিতে পারি না? আমাদের ত্রুটি দুর্ব্বলতা, পাপ মলিনতার হেতু যে অনেক দুঃখ তাপ আসে, অবনতি দুর্গতি ঘটে, অপমানিত লাঞ্ছিত হইতে হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের কার্য্যের এ সকল ফল কি তাঁহারই ব্যবস্থাতে, তাঁহারই ইচ্ছানুসারে, ঘটে না? তাহার মধ্যে তাঁহার ক্রোধ বিদ্বেষই কার্য্য করে, না, সে-সকলের মূলে তাঁহার অপরাজেয় প্রেম ও মঙ্গল ইচ্ছাই রহিয়াছে? সে-সকল কি আমাদিগকে সংশোধিত করিয়া উন্নতির পথেই লইয়া যায়, না, নির্দ্দয় ভাবে শাস্তি প্রদান করিয়া অবনতির দিকে, নরকের পথেই ঠেলিয়া দেয়? পর্ব্বতশিখরে উঠিবার সময় উঠিয়া নামিয়া চলিলেও যেমন আমরা মোটের উপর ঊর্দ্ধদিকেই অগ্রসর হই, ক্রমে শিখরদেশেরই নিকটবর্ত্তী হই, জীবনপথেও কি তাহাই ঘটে না? ইচ্ছা সম্বন্ধে আমাদের কতকটা স্বাধীনতা আছে বলিয়া কি জগতের ঘটনাবলীর উপর আমাদের কোনও স্বাধীন কর্ত্তৃত্ব আছে,—তাঁহার ইচ্ছাকে অতিক্রম করিয়া, তাঁহার মঙ্গল ব্যবস্থাকে পণ্ড করিয়া, কোনও কার্য্য করিবার ক্ষমতা আছে? একটু চিন্তা ও পরীক্ষা করিলেই দেখিতে পাইব, আমাদের সেরূপ কোনও ক্ষমতা নাই। আমাদিগকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া তাঁহার পথে আনিবার জন্যই যাহা কিছু ব্যবস্থা। সুতরাং যাহা কিছু আসে তাহা আমাদিগকে তাঁহার পথেই ফিরিয়া যাইতে সাহায্য করে, আমাদের কল্যাণই সাধন করে। এ কথা ভুলিয়া যদি আমরা অকৃতজ্ঞচিত্তে বৃথা অভিযোগ করিয়া শক্তি ও সময় নষ্ট করি, তাহা হইলে আমরাই যে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইব—একদিকে দুঃখ বেদনা বৃদ্ধি করিব, অপর দিকে সংশোধনের সুযোগও হারাইব!

পুরাতন বর্ষের আলোচনা করিতে হইলে এই ভাবেই করিতে হইবে। যাহা গিয়াছে তাহা একান্তই গিয়াছে—তাহাকে ধরিয়া রাখা যাবে না, ফিরিয়াও আসিবে না। শুধু আনন্দ সুখটুকুর চিন্তায় ডুবিয়া থাকিয়াও কোন লাভ নাই। দুঃখ সুখ উভয়ই সমান ভাবে চলিয়া যায়, কেহই ফিরিয়া আসে না, কেহই দাঁড়াইয়া থাকে না—স্ব স্ব কাজ করিয়াই চলিয়া যায়। আমরা দেখি আর না দেখি, তাহাদের যেটুকু করিবার তাহা করিয়াই যায়। তবে কি পুরাতনের বিষয়ে কোনও আলোচনারই আর দরকার নাই—বিনা আলোচনায়ই তাহাকে যাইতে দিতে হয়? "যাহা গিয়াছে তাহাকে যাইতে দাও," ইহাই কি একমাত্র প্রকৃষ্ট নীতি? তাহা ত সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া মনে হয় না। উহার মধ্যে একটা সত্য রহিয়াছে, সন্দেহ নাই। অলসের ন্যায় অতীত বিষয়ের চিন্তায় ডুবিয়া থাকিলে উপকারের পরিবর্ত্তে অপকারই সাধিত হয়। অপর দিকে অতীত অলক্ষিতে আপনার কার্য্য করিয়া গেলেও, তাহার শিক্ষা প্রদান করিলেও, জ্ঞাতসারে উপযুক্ত চিন্তা ও আলোচনার দ্বারা তাহা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিলে, বল ও শক্তি সংগ্রহ করিলে, যেরূপ উপকার লাভ করা যায়, তদ্ভাবে তাহা কখনও সম্ভবপর হয় না। ভবিষ্যতের ভুল ত্রুটির হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য অতীতের অভিজ্ঞতা একান্ত প্রয়োজনীয়; বিনা চিন্তা ও আলোচনাতে সে অভিজ্ঞতা কখনও স্পষ্ট স্থায়ী ও কার্য্যকারী হয় না—অনেকটা অস্পষ্ট ও দুর্ব্বলই থাকিয়া যায়। আশা এবং উৎসাহের সুদৃঢ় ভিত্তিও পূর্ব্ব অভিজ্ঞতার মধ্যেই প্রকৃষ্টতররূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিশ্বাসই আশার মূল সন্দেহ নাই; কিন্তু সে-বিশ্বাস অভিজ্ঞতার উপরেই প্রতিষ্ঠিত—কল্পনার উপর স্থায়ী বিশ্বাস দাঁড়াইতে পারে না। জীবনের সত্য অভিজ্ঞতাই প্রকৃত বিশ্বাস জন্মায়; সে-বিশ্বাসে আর সংশয় সন্দেহ থাকিতে পারে না, অস্পষ্টতা অনিশ্চয়তাও তাহার মধ্যে থাকে না। এই বিশ্বাসকে ভিত্তি করিয়া যে আশার উদয় হয়, তাহা আর কিছুতেই বিচলিত হয় না। ঘোর অন্ধকারের মধ্যেও সে-আশা আলোক-রেখা দেখিতে পায়, সকল প্রকার বাধা বিঘ্ন বিপদ্ সত্ত্বেও উহা নির্ভীক ভাবে, অপ্রতিহত বল ও উৎসাহের

সহিত, গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে পারে। নিরাশা নিরুদ্যমের অশেষ প্রকার কারণ থাকিলেও, কিছুতেই এই আশার অভাব হয় না, উহা ম্লান হয় না। এই আশা ও উৎসাহ যে জীবনের পক্ষে কত প্রয়োজনীয়, ইহা ব্যতীত যে জীবনপথে চলা কত কঠিন—একপ্রকার অসম্ভব বলিলেও বোধ হয় অন্যায় হইবে না—তাহা বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। ইহা আমরা সকলেই পদে পদে অনুভব করিয়া থাকি। ইহার জন্য অতীতের আলোচনা অপরিহার্য্যরূপেই আবশ্যক। কিন্তু সে আলোচনা যে-কোনও রকমের আলোচনা হইলেই যে হয় না, তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। সে-আলোচনার দ্বারা সকল ঘটনার মধ্যে প্রেমময় মঙ্গলবিধাতার হস্তই দেখিতে হইবে; একদিকে আপনার ত্রুটি দুর্ব্বলতা, অপর দিকে তাঁহার অসীম করুণা, দেখিয়া শিক্ষা ও আশা সংগ্রহ করিতে হইবে—বিনম্র হৃদয়ে কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া, আশা উৎসাহের সহিত সাবধানে ভবিষ্যতের পথে চলিতে শিখিতে হইবে। অলস উদ্যমহীন ভাবে বৃথা অনুতাপের অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াও কোন লাভ নাই; অপর দিকে আপনার বর্ত্তমান অবস্থা ও গতির দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, কল্পনার রথে চড়িয়া মিথ্যা আশা ও উৎসাহের সহিত নূতন ভাবে পুরাতন ভ্রান্ত পথের অনুসরণেও কল্যাণ নাই। প্রেমময়ের করুণা স্মরণে তাঁহার অনুগত না হইয়া, নিশ্চেষ্ট জড়ের ন্যায় আপনার পথে চলাতেও মনুষ্যত্ব নাই। বিচার ও অভিজ্ঞতার সাহায্যে উন্নতি ও কল্যাণের পথ বাছিয়া লইয়া, বাধা বিঘ্নগুলি অতিক্রম বা পরিত্যাগ করিয়া, যাহাতে দ্রুতবেগে অগ্রসর হওয়া যায় তাহাই করিতে হইবে। তাহা হইলে আর অতীতকে নিরর্থক যাইতে দেওয়া হইবে না, পুরাতন বর্ষ হইতে যতটা উপকার লাভ করা সম্ভবপর পূর্ণ ভাবেই ততটা লব্ধ হইবে। নূতন বর্ষেও আমরা ঠিক পথ অবলম্বন করিয়া আশা উৎসাহের সহিত চলিতে সমর্থ হইব।

কিন্তু এখানে সর্ব্বপ্রথমেই আমাদিগকে একটি বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে—সর্ব্বদা স্মরণে রাখিতে হইবে যে, যদিও আশা ও উৎসাহ ব্যতীত কোনও কার্য্যেই সফলতা লাভ করা যায় না, বল ও শক্তি পাওয়া যায় না, দৃঢ় ভাবে দীর্ঘ কাল লাগিয়া থাকা যায় না, তথাপি উহাদের হস্তে রাশ ছাড়িয়া দিলে, নিরঙ্কুশ ভাবে উহাদের দ্বারা চালিত হইলে, সম্পূর্ণ বিপরীত ফলই প্রসূত হয়। উহাদিগকে শক্তি ও সহায় রূপে গ্রহণ করিতে হইবে বটে, কিন্তু প্রভু ও পথপ্রদর্শক করিতে হইবে না। সত্য ও কল্যাণের অধীনে সংযত ভাবে সুপরিচালিত না হইলে, উদ্দাম কল্পনার সাহায্যে উচ্ছৃঙ্খল ভাবে ছুটিয়া, অচিরেই উহারা আমাদিগকে ব্যর্থতা ও অকল্যাণের গভীর আবর্ত্তে নিয়া পাতিত করিবে; তখন আশা ও উৎসাহের পরিবর্ত্তে, একমাত্র নিরাশা ও নিরুৎসাহই আমাদের জন্য থাকিবে। প্রতি বৎসরই আমরা আশা ও উৎসাহের দ্বারা চালিত হইয়া অনেক কল্পনার সৌধ রচনায় নিযুক্ত হই এবং অল্প দিনের মধ্যে তাহা চূর্ণ বিচূর্ণ হইতে দেখিয়া, হতাশ ও নিরুৎসাহ হইয়া পড়ি—বিশ্বাস হারাইয়া ফেলি। তখন প্রায়ই সকল প্রকার চেষ্টা যত্ন পরিত্যাগ করিয়া পুরাতন অভ্যাসের স্রোতে গা ঢালিয়া দেই, মৃত্যুর পথেই চলিতে থাকি। এই জন্যই যেমন পূর্ব্বে তেমনি পরে, একভাবেই চলিয়া যাইতেছি, নূতন পথে আর অগ্রসর হইতে পারিতেছি না; আর, আমাদের যাহা কিছু আশা উৎসাহ ও বল, তাহাও দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত ও চিরস্থায়ী হইতে পারে না—কল্পনাবশে একটা কৃত্রিম ক্ষণস্থায়ী রূপ প্রাপ্ত হইয়া আমাদিগকে প্রতারিত করে। সুতরাং এ বিষয়ে নূতন বর্ষে আমাদিগকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, প্রেমময় মঙ্গলবিধাতা প্রত্যেক ব্যক্তি ও সমাজকে, সমগ্র মানবমণ্ডলী ও বিশ্বচরাচরকে, অনন্ত উন্নতি ও কল্যাণের পথে লইয়া যাইবারই ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহার অসীম প্রেম ও করুণার এই যে অবিরামবাহী স্রোত, তাহার হাতে আপনাদিগকে অর্পণ করিলে, আমরা স্বাভাবিক ভাবেই অতি সহজে, নিঃশঙ্কিত্ত রূপে, জীবনপথে অগ্রসর হইতে পারি,—আমাদিগকে কখনও আর ব্যর্থ হইতে হয় না। কিন্তু আপনার ভাবে, আপনার পথে, আপনার উপর নির্ভর করিয়া, চলিতে গেলে আর তাহা সম্ভবপর হয় না। তাই সর্ব্বাগ্রে তাঁহার পথ বাছিয়া লইতে হইবে, তাহা জানিবার ও বুঝিবার জন্য সর্ব্বপ্রযত্নে চেষ্টিত হইতে হইবে—বিদ্যাবুদ্ধির গৌরব পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহার বাণী শুনিবার জন্য, নির্দ্দেশ বুঝিবার জন্য, দীনহীন বেশে, বিনম্র হৃদয়ে, সর্ব্বদা প্রতীক্ষা করতে হইবে, উৎকর্ণ হইয়া থাকিতে হইবে। শুধু জানিলে বা বুঝিলেই যথেষ্ট হইল না। নিজের ভাবে, নিজের ইচ্ছা অভিরুচি অনুসারে, সে পথ অনুসরণ করিলে চলিবে না; প্রতি পদে সম্পূর্ণ রূপে তাঁহারই ভাবে, তাঁহারই অনুগত হইয়া, চলিতে হইবে—আপনার সমস্ত কর্ত্তৃত্ব পরিত্যাগ করিয়া, একান্ত বাধ্য সন্তান বা দাসের ন্যায়, তাঁহার হস্তের যন্ত্র হইয়াই চলিতে হইবে, সকল কার্য্য করিতে হইবে। এরূপ অবস্থায়ও অনেক সময় আপনার বল ও শক্তির উপর আশা ও নির্ভর থাকে—সফলতার অহঙ্কার থাকে—তখন আপনার জয়টাই লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায়। এই জন্য সম্পূর্ণ রূপে তাঁহারই উপর নির্ভর করিতে হইবে, আপনার দুর্ব্বলতা অক্ষমতা অনুভব করিয়া সকল বলের বল যিনি তাঁহারই শরণাপন্ন হইতে হইবে। এরূপ সকল বিষয়ে সর্ব্বপ্রকারে তাঁহার অনুগত হইয়া চলিতে, তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিয়া স্বাধীন ভাবে আপনাকে পূর্ণ অধীনতার মধ্যে নিক্ষেপ করিতে না পারিলে, কিছুতেই সফলতা ও সার্থকতার পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। ইহা আমাদের পক্ষে নিশ্চয়ই অত্যন্ত কঠিন—কোনও প্রকারেই সহজ নয়। কেন না, ইহা আমাদের দীর্ঘ কালের অভ্যাসের সম্পূর্ণ বিপরীত। সে দৃঢ় শৃঙ্খল ভঙ্গ করা নিতান্তই কঠিন, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা না ভাঙ্গিলেও চলিবে না—অন্য কোনও সহজ পথ নাই। এই কাঠিন্যের ভয়ে পশ্চাৎপদ হইলে অধিকতর কাঠিন্যের মধ্যে, প্রবলতর দুঃখ দুর্গতি, শ্রম ও সংগ্রামের মধ্যে, পড়িতে হইবে। তবে ইহার কাঠিন্য কতক পরিমাণে হ্রাস করিয়া অনেকটা সহজ করিবার উপায়ও আছে—সে উপায়, আপনার দুর্ব্বলতায় অনন্যগতি হইয়া, কাতর প্রাণে, করুণাময় পিতার নিকট প্রার্থনা করা, গতিহীন হইয়া সর্ব্বতোভাবে অগতির গতি যিনি তাঁহারই শরণাপন্ন হওয়া। একমাত্র তিনিই সে-শৃঙ্খল ভঙ্গ করিয়া, তাঁহাতে পূর্ণ আত্মসমর্পণ সহজ ও স্বাভাবিক করিতে পারেন, এবং তাঁহার অসীম কৃপায়

শরণাগতের জন্য তাহা করিয়াও থাকেন। সরল ব্যাকুল প্রার্থনা ভিন্ন আমাদের আর অন্য সম্বল নাই; তাহার ন্যায় নিশ্চিত ফলপ্রদ অন্য উপায়ও নাই। সুতরাং আমাদিগকে উঁহাকেই অবলম্বন করিতে হইবে, জীবনপথের একমাত্র সম্বল করিয়া নববর্ষে পদার্পণ করিতে হইবে। প্রেমময় পিতার অসীম করুণা আমাদের জন্য সর্ব্বদা সকল অবস্থায়ই রহিয়াছে। তাঁহাতেই সকল আশা ভরসা রাখিয়া, সম্পূর্ণরূপে তাঁহারই দ্বারা তাঁহারই পথে চালিত হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া, আমরা নূতন বর্ষে প্রবেশ করি। মিথ্যা কল্পনা জল্পনা, কর্তৃত্ব অহঙ্কার, পরিত্যাগ করিয়া, একমাত্র তাঁহারই শরণাপন্ন হই; এবং আশা ও উৎসাহের সহিত তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসরণ করিয়া জীবনের নূতন পথে চলি। করুণাময় পিতা আমাদিগকে বল ও শুভবুদ্ধি প্রদান করুন; প্রাণে নূতন সঙ্কল্প জাগ্রত করুন ও তাহাতে দৃঢ় রাখুন। তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছাই আমাদের প্রত্যেকের ও সমগ্র সমাজের জীবনে জয়যুক্ত হউক। সমস্ত বিশ্বে একমাত্র তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। সকলে নূতন বর্ষে ধন্য ও কৃতার্থ হই।

দেবেন্দ্রনাথের জীবনে বিধির অনুবর্ত্তিতা।

জীবনের সকল গুরুতর কার্য্যে বিধির অনুবর্ত্তিতা দেবেন্দ্রনাথের চরিত্রের একটি বিশেষ লক্ষণ ছিল। স্বীয় আত্মজীবনীতে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম-ব্রত গ্রহণের যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে—

১। সারা জীবনে কি প্রণালীতে এই ব্রত পালন করা হইবে, তদ্বিষয়ে বিশেষ চিন্তাপূর্ব্বক দেবেন্দ্রনাথ এমন একটি সুনির্দ্দিষ্ট প্রণালী নির্দ্ধারণ করিলেন, যাহাতে সেই ব্রত বিষয়ে কোনও রূপ অস্পষ্টতা না থাকে, কিংবা ব্রতপালন বিষয়ে শিথিলতা আসিবার কোনও সুযোগ না ঘটে।

"প্রতিদিন (ক) 'প্রাতে' (খ) 'অভুক্ত অবস্থায়' (গ) 'দশ বার গায়ত্রী মন্ত্র জপের দ্বারা' ব্রহ্মোপাসনা করিব,"—এই প্রতিজ্ঞাটির ভিতরে সকল কথাই, অতি স্পষ্ট। ইহার পরে যে সংশোধিত প্রতিজ্ঞাপত্র রচিত হইয়াছে, (যাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের পুরোভাগে মুদ্রিত হয়,) তাহাতে সারা জীবনে পালনীয় সঙ্কল্পগুলি অতিশয় স্পষ্ট। ঐ গ্রন্থে তাঁহার রচিত ব্রহ্মোপাসনার যে পদ্ধতি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা চিন্তার সুশৃঙ্খলায় ও ভাবের স্পষ্টতায় একটি আদর্শ পদ্ধতি।

দেবেন্দ্রনাথ নিজ ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণের দিনে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, উত্তরকালে তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপাসনাপদ্ধতি স্বয়ং রচনা করা সত্ত্বেও, আজীবন কখনও সেই প্রতিজ্ঞার অন্যথাচরণ করেন নাই। প্রতিদিন "প্রাতে, অভুক্ত অবস্থায়, দশ বার গায়ত্রী মন্ত্র জপের দ্বারা ব্রহ্মোপাসনা" তিনি কখনও ত্যাগ করেন নাই। কিন্তু প্রাভাতিক অভ্যস্ত দুগ্ধপানের পরে তিনি নিজ রচিত নূতন পদ্ধতি অনুসারে দ্বিতীয় বার উপাসনা করিতেন। তাঁহার জীবনে যখন দিনের পর দিন প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত (ও কখনও কখনও পুনরায় সন্ধ্যা হইতে আবার প্রভাত পর্য্যন্ত) একভাবে ব্রহ্মচিন্তায় মগ্ন হইয়া কাটিয়াছে, সে অবস্থাতেও তিনি ঐ দুই বারের নিয়মিত ব্রহ্মোপাসনা পরিত্যাগ করেন নাই,—বিধির অনুবর্ত্তিতা তাঁহার মধ্যে এমনই দৃঢ় ছিল।

ইহাতে কেহ যেন মনে না করেন যে, দেবেন্দ্রনাথ উপাসনা-কালে উপাসকের চিন্তা ও ভাবকে মুক্তভাবে উৎসারিত হইতে দিবার বিরোধী ছিলেন। সাধক ঐরূপ মুক্তভাবে ঈশ্বরের সঙ্গ সাধন করিলেও, তাঁহার উপাসনাতে এমন একটু অংশ থাকা আবশ্যক, যাহা কখনও পরিবর্ত্তিত কিংবা পরিত্যক্ত হইবে না, যাহা তাঁহাকে আজীবন বিধির দ্বারা বাঁধিয়া রাখিবে,—দেবেন্দ্রনাথের এই ভাব ছিল।

২। তৎপরে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম গ্রহণের দিনে যবনিকা, বেদী, আসন, উপস্থিত ব্যক্তিদিগের উপযুক্ত পরিচ্ছদ, নীরবতা ও গাম্ভীর্য্য, প্রভৃতির দিকে দেবেন্দ্রনাথ দৃষ্টি দিয়াছিলেন। যাহাতে অনুষ্ঠানাদির বাহ্য আকার তাহার গুরুত্বের অনুরূপ হয়, ও তাহা সকলের চিত্তে সম্ভ্রমের ভাবের উদয় করে, এ বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথের সর্ব্বদা সজাগ দৃষ্টি থাকিত।

৩। একজন গুরু স্থানীয় মান্য ব্যক্তির নিকটে স্বীয় সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়া এবং তাঁহাকে সে সঙ্কল্পের সাক্ষী করিয়া ব্রত গ্রহণ করিলে তাহা অধিক দৃঢ় হয়, ইহা অনুভব করিয়া দেবেন্দ্রনাথ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের কাছে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। এ ক্ষেত্রে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, প্রতিজ্ঞা-পত্রটি দেবেন্দ্রনাথের নিজের রচিত, প্রতিজ্ঞাগ্রহণের আগ্রহ দেবেন্দ্রনাথের হৃদয়েই প্রথম সমুদিত, এবং বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের অপেক্ষা দেবেন্দ্রনাথের চিত্তই ব্রাহ্মধর্ম্মপালনের দৃঢ়তায় ও সাহসে স্থিরতর; তথাপি তিনি বিধিরক্ষার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা ও বিনয় সহকারে বিদ্যাবাগীশের নিকটে ব্রতগ্রহণ ও উপদেশ যাচ্ঞা করিলেন।

ব্রাহ্মসমাজের শতাব্দী-পূর্ত্তি উপলক্ষে মহর্ষির আত্মজীবনীর যে নূতন সংস্করণ প্রস্তুত হইতেছে, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক লিখিত তাহার পরিশিষ্টের পাণ্ডুলিপি হইতে গৃহীত।

দুঃখের মূল্য

ধর্ম্মরাজ্যে দুঃখের স্থানটি কি, এ বিষয়ে আপনাদের কাছে কিছু নিবেদন করিতে ইচ্ছা করি। বর্ত্তমান যুগে এমন একটি হাওয়ার সংস্রবে আমাদিগকে প্রায়ই আসিতে হয়, যাহা দুঃখকে শিল্পে সাহিত্যে মানবপ্রেমে ও ধর্ম্মে স্থান দিতে অনিচ্ছুক। এই সংস্রব হইতে আমাদের মনে নানা প্রশ্ন উত্থিত হয়। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, ধর্ম্ম সুখী ও দুঃখী উভয়েরই জন্য; ঈশ্বর সুখীর ও দুঃখীর উভয়েরই ঈশ্বর। কিন্তু এ উভয়ের মধ্যে ধর্ম্মকে

বর্ষশেষ উপলক্ষে বিশেষ উপাসনায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে ৩০শে চৈত্র, ১৩৩২, সায়ংকালে নিবেদিত।

ও প্রেমকে অধিক রক্ষা করে কে? অধিক সহায়তা করে কে? আমার বোধ হয় মানবজীবনের সুখ অপেক্ষা দুঃখের সহিতই ধর্ম্মের সম্বন্ধ প্রগাঢ়তর। এই জন্য দেখা যায় যে ভগবানকে আমরা যত নামে ডাকি, তাহার ভিতরে দীনদয়াল, দীনবন্ধু, দুঃখহরণ, অনাথের নাথ, প্রভৃতি নামের সংখ্যাই অধিক।

এ বিষয়টির আলোচনার জন্য প্রথমে একবার সংসারের দিকে তাকাই। সংসারে প্রেমের বিশেষ কাজটি কি? মা সন্তানের জন্য খাটেন, রান্না করেন, তাকে খাওয়ান, তাকে সাজান, তাকে ঘুম পাড়ান, তার দৈনিক সব সেবা আনন্দ-মনে করেন। কিন্তু মার মন নিজ মাতৃত্বকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সার্থক বলিয়া কখন্ অনুভব করে? "আমি এইবার ঠিক মা হ'য়েছি," এই কথা মাতা কখন্ অনুভব করেন? খাটিবার সময়ে নয়, রাঁধিবার সময়ে নয়, খাওয়াইবার সময়ে নয়, সন্তানকে স্তন্যদানের সময়ে নয়, সন্তানের গলা জড়াইয়া বুকে করিয়া শুইয়া থাকিবার সময়ে নয়, অজস্র চুম্বনে তাহাকে অস্থির করিয়া নিজ স্নেহের উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিবার সময়েও নয়; কিন্তু সন্তানের কোনও কষ্ট দূর করিবার জন্য যখন আহ্বান আসে, তখন। সন্তান অন্যের কাছে রূঢ় কথা, কর্কশ ব্যবহার, পাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়াছিল, মার বুকে স্থান পাইয়া সে শান্ত হইল। তার বহু যত্নে রচিত খেলার ঘরখানি ভাঙ্গিয়া গেল, মার কাছে আসিয়া সে সান্ত্বনা লাভ করিল। কঠিন শ্রম করিয়া সারা বৎসর পড়িয়াও সে পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইল; আর-সকলে তাহার অকৃতকার্য্যতার কথাটাই ভাবিল, মা তাহার পরিশ্রম ও দুঃখের কথা হৃদয় দিয়া অনুভব করিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিলেন। সন্তান রোগের যন্ত্রণায় অস্থির হইতেছিল, মা আসিয়া গায়ে হাত বুলাইয়া দিলেন; তাহাতেই রোগ দূর হইল না বটে, কিন্তু মন সে যন্ত্রণা বহিতে প্রস্তুত হইল, শরীরও যেন কত শীতল হইল। এই সকল সময়ে মাতার মন বলিয়া উঠে, "আমি আজ ঠিক মা হইয়াছি; মায়ের যত কাজ, তাহার মধ্যে যেটি মহত্তম, তাহাই করিবার অধিকার আজ আমি পাইয়াছি।" আর-সকলে মনে রাখে, শিশু কেমন হাসে, কেমন খেলা করে, কেমন আধ আধ মিষ্ট কথা বলিয়া আনন্দ দেয়, অথবা বিদ্যালয়ে ও গৃহে স্বীয় উন্মেষশীল শক্তি-সকলের আভাস দিয়া মানুষকে কেমন সুখী করে; আর-সকলে শিশুর নিকট হইতে এই সকলের দাবী করে। মা মনে রাখেন, আমার বাছার জন্য সংসারপথে কত ব্যথা আছে, কত কাঁটা আছে; মানুষের কর্কশতা, তাড়না, ভৎর্সনা আছে; তাহার অকৃতকার্য্যতা, তাহার ভয় আশা, তাহার কোমল প্রাণের নানা বেদনা, তাহার রোগের ক্লেশ আছে। মাতার মন এ সকল ভাবিয়া লয়, এবং পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হয় যে এই সকল সময়ে আমাকে মায়ের কাজটি করিতে হইবে। মাতার দাবী নিজের উপরে; "আমি এই সকল সময়ে যদি মায়ের মতন সান্ত্বনা দিতে, আশ্রয় দিতে, বল দিতে না পারিলাম, তবে আমার মত হত-ভাগিনী কে আছে?"—মায়ের ভাব এই রূপ।

তৎপরে, পতি পত্নীর সম্বন্ধের বিষয়ে ভাবা যাক্। বিবাহ করিবার সময় পুরুষ ও নারী ভবিষ্যতের চিত্র কল্পনায় আঁকিতে ভালবাসে। সকল মানবীয় প্রেমেরই স্বভাব এই যে, সে ভবিষ্যতের ছবি কল্পনায় অঙ্কিত করে; হৃদয়ের গোপন একটি কক্ষে সেই ছবিসকল স্থাপন করিয়া সে-সকলের মধ্যে সময় কাটাইতে তাহার ভাল লাগে। বিবাহের পর অবোধ নবদম্পতি পরস্পরকে বলে,—এই এই ভাবে দুই জনে মিলিয়া হাসিব, আমোদ করিব, বেড়াইব; পরস্পরের সাহায্যে সুখের উপায়ের পর উপায় রচনা করিয়া করিয়া মিলিত জীবনের মাস বর্ষ সকল পূর্ণ করিয়া রাখিব। তাহারা জানে না যে, সুখের সঙ্গী নিকটে থাকা সত্ত্বেও জীবনে এমন দুঃখ আসিতে পারে, যাহাতে মনে হয়, বুঝি আমার কেহ নাই; এমন ভয় আসিতে পারে, যাহাতে মনে হয়, বুঝি সব গেল; এমন নিরাশা আসিতে পারে, যাহাতে মনে হয়, বুঝি জীবনের আলো চিরদিনের মত নিভিয়া গেল। তখনই প্রেমের কাজ। "আমি আছি, তোমাকে একাকী বলিয়া অনুভব করিতে দিব না; তোমার বোঝার অংশ লইব, একলা তোমাকে পিষিয়া যাইতে দিব না; আমার প্রেম দিয়া তোমার জীবন হইতে দুঃখের অনুভব মুছিয়া দিব,"—এই বলিয়া সারবান্ প্রেম তখন জাগরিত হইয়া উঠে। বিবাহের দিনে যদি এই কল্পনা, এই স্বপ্ন, এই সংকল্প মনে আসে যে, "ইহার দুঃখের দিনে, একাকিত্বের দিনে, সংগ্রামের দিনে ইহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিব বলিয়াই ইহাকে আমি পাইতেছি; এই নূতন জীবনে ইহাই আমার সর্ব্বোচ্চ আশা, ইহাদ্বারাই আমার জীবন ধন্য হইবে,"—তবে বলা যায় যে, সেই দিনের উপযুক্ত ভাবটি তাহারা পাইয়াছে। কিন্তু হায় হায়, যে-পিতামাতা, যে-অভিভাবক, যে-বন্ধুদল, যে-সমাজ, যৌবন-প্রাপ্ত মানুষের মনে এই ভাবটি সঞ্চার করিতে না পারে, তাহা কি-নিষ্ফল, তাহা কি-ক্ষুদ্র, তাহা কি-কদর্য্য! প্রেমের স্বভাবই কল্পনা করা, প্রিয়জনের জন্য কি কি করিব তাহা ভাবা। প্রেমে পড়িয়া যে-মানুষ কল্পনার চক্ষে কখনও এই ছবি দেখে না যে, দুঃখের দিনে, প্রিয়জনের জন্য আমি কি করিব, একাকিত্বের দিনে কেমন করিয়া আমি তাঁর পাশে দাঁড়াইব, তাহার সে প্রেম কি-তুচ্ছ!

জগতে প্রেম বস্তুর খরচ হয়। প্রেমের খরচ কি রকম? সংসারের রাজা তাঁর রাজ্যে তাঁর নিজ মূর্ত্তি ও নিজ নাম-অঙ্কিত মুদ্রা অজস্র প্রচলিত রাখেন; তাহাদ্বারা সংসারের কেনা-বেচার কাজটি চলে। সংসারের রাজার সেই মুদ্রা সংসারে বেশী খরচ হয় অন্ন বস্ত্রের সংস্থানে ও অভাবসকলের পূরণে, তার চেয়ে কম খরচ হয়, আমোদের ও সৌন্দর্য্য-ভোগের আয়োজনে। সেইরূপ বিশ্বরাজ তাঁহার নিজমূর্ত্তি-অঙ্কিত যে স্বর্ণমুদ্রা তাঁহার জগতে প্রচলিত রাখিয়াছেন, তাহার নাম 'প্রেম'। তাঁহার মূর্ত্তি এমন ভাবে সংসারের আর কোনও পদার্থে অঙ্কিত নাই। যেখানে প্রেম, সেখানেই তাঁহার স্বরূপ, তাঁহার ছবি। এই প্রেম-মুদ্রা বেশী খরচ হয় কিসে? বেশী খাটে কিসে? সংসারে একে অন্যকে সুখ দিবার জন্য তত নয়, যত একে অন্যের দুঃখ বহনে। মানুষের সংসারে প্রেম বস্তু কোন্ কাজটি সকলের চেয়ে বেশী করে? তার গ্রহণ করে, তার বহন করে, তার লঘু করে, দুঃখে রোগে শোকে কষ্টের অংশ লয়, বিপদের অন্ধকারের মধ্য দিয়া মানুষের সঙ্গে মানুষকে অধিক দৃঢ়রূপে বন্ধন করে।

বর্ত্তমান যুগে মানবের চিন্তা, মানবজীবনের সুখ ও দুঃখ, এ উভয়ের মধ্যে সুখকে অত্যন্ত অধিক মাত্রায় প্রাধান্য দিতেছে। দুঃখ যেন একটি কদর্য্য অস্পৃশ্য উল্লেখের অযোগ্য বস্তু। জীবনে দুঃখ থাকিলে তাহার কথা ভাবিও না, বলিও না; প্রেমের জীবন আস্বাদন করিবার সময় দুঃখকে তাহার মধ্যে আনিও না,—এইরূপ একটি ভাব মানুষের চিন্তাকে অধিকার করিতেছে। ইহার একটি ফল এই হইতেছে যে, মানুষে-মানুষে আলাপ ও সঙ্গ মানুষকে আর তেমন মহত্ত্বের অনুপ্রাণন সঞ্চার করিতে পারিতেছে না। আর একটি ফল এই হইতেছে যে, এই যুগের সাহিত্যে অঙ্কিত প্রেমের চিত্র মানবমনকে উন্নত করিতে পারিতেছে না; প্রেমের মহত্ত্বের ছবি শিল্পীর তুলিকায় ফুটিতেছে না। প্রাচীন কালে এদেশে মানুষের মনকে একটি ভ্রান্ত দুঃখবাদ অত্যধিক পরিমাণে অধিকার করিয়াছিল; এখন একটি সেই পরিমাণে ভ্রান্ত সুখবাদ মানবচিত্তকে অধিকার করিতেছে; দুঃখের মূল্যবোধ মানবমন হইতে অন্তর্হিত হইতেছে। বলিতে গেলে, সভ্যতা শব্দটির অর্থই দাঁড়াইতেছে, মানবজীবন হইতে দুঃখকে বিদূরিত করিবার ও সুখ বৃদ্ধি করিবার উপায়সমষ্টি। মানুষের পক্ষে সুখ চাওয়া ও দুঃখকে ভয় করা স্বাভাবিক; ইতর জীবকুলের সঙ্গে মানব এ বিষয়ে এক। কিন্তু জীবহিসাবে মানুষের পক্ষে সুখ চাওয়া ও দুঃখবর্জ্জন করা স্বাভাবিক হইলেও, সুখকেই চরম মঙ্গল বলিয়া মানুষের সম্মুখে ধরিলে, এবং দুঃখের গৌরবময় দিকটি ভুলিয়া গেলে, মানুষকে মনুষ্যত্বের পদবী হইতে [illegible]শ্রেণীতে নামাইয়া আনা হয়। দুঃখ দুঃখ-বলিয়াই প্রার্থনীয় [illegible]; কিন্তু দুঃখ মনুষ্যত্বের জন্য প্রার্থনীয়, দুঃখ প্রেমের জন্য প্রার্থনীয়। দুঃখ না থাকিলে আমাদের প্রেম মনুষ্যোচিত প্রেম হইত না।

সুখকে অত্যধিক প্রাধান্য দান করিলে গৃহ-পরিবার সম্বন্ধে মানুষের মনের ভাবটিও ক্রমশঃ নীচু হইয়া যায়। সকলেই চায় যে বাড়ীখানি আকাশের আলোতে ও মনের আলোতে, আনন্দে, হাসিতে, পূর্ণ হইবে; বাড়ীখানি সুখের স্থান হইবে, পরস্পরকে সুখ দিবার স্থান হইবে। বাড়ী সম্বন্ধে এই আদর্শ একটি সত্য আদর্শ বটে, কিন্তু সর্ব্বোচ্চ আদর্শ নয়; বাড়ী সম্বন্ধে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ কথা নয়। বাড়ীখানি বাড়ী হয় কিসে? কোন্ সময়ে মানুষ বাড়ীর মূল্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনুভব করে? আমি বলি, বাড়ীখানি বাড়ী বেশী হয়, জীবনে দুঃখ শোক রোগ সংগ্রাম আছে বলিয়া; সে-সকলের মধ্যে আমরা পরস্পরের পাশে দাঁড়াইতে পাই বলিয়া; সে-সকলের মধ্যে আমরা পরস্পরের জন্য ভালবাসা প্রকাশ করিতে পাই বলিয়া; দুঃখে কষ্টে পরস্পরের জন্য ত্যাগ স্বীকার করিতে, ক্লেশ বহন করিতে, পাই বলিয়া। যে ভালবাসার মসলায় বাড়ীখানি বাড়ী হয়, দুঃখ বিপদ অন্ধকার সংগ্রাম সেই মসলাকে গাঢ় ও মজবুত করিয়া তোলে।

জীবন হইতে দুঃখকে বাদ দিবার যে আত্যন্তিক আগ্রহের কথা আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহার ফলে দেখা যায় যে, কোনও কোনও পরিবারে, কাহারও দীর্ঘ ও কঠিন রোগের সঞ্চার হইলে, তাঁহারা সে রোগীকে হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দেন, কিংবা বেতন-ভোগী নর্সের (nurse) অধীনে বাড়ীর একটি সুদূর কক্ষে পাঠাইয়া দেন; যেন সেই রোগের ব্যাপারটি নয়নমনের সম্মুখে সহসা না আসে, যেন তৎপ্রসূত দৈনন্দিন জীবনযাত্রার রীতির ব্যতিক্রম, বাড়ীর সৌন্দর্য্য শৃঙ্খলায় ব্যাঘাত ও দুর্গন্ধ,—এ সকল যথাসম্ভব ভুলিয়া থাকা যায়। অনেক স্থলে এই ভাবের দ্বারা চালিত হইয়া রোগী স্বয়ংই হাঁসপাতালে যাওয়া বেশী পছন্দ করেন। আমি বলি না যে, এ সকলের প্রয়োজন হইতে পারে না। খুব দরকার হইতে পারে, এবং অনেক স্থলে তাহা না করাই দোষের হইতে পারে। মনের ভাবটি যদি এইরূপ হয় যে, আমরা আমাদের দেহ মন ঢালিয়া আরাম ভুলিয়া সেবা করিতেছি ও করিব, কিন্তু আমরা প্রাণপণ করিয়াও তো সব প্রয়োজনীয় সেবা শুশ্রূষা করিয়া উঠিতে পারিব না, তাই বেতনভোগী লোকের সাহায্য লইতেছি,—তবে তাহা দোষের নয়। কিন্তু মনের ভাব যদি এরূপ হয় যে, "টাকা আছে, টাকা খরচ করিলেই তো ভাড়াটে লোক রাখিয়া নিজেদের বাঁচাইতে পারি, বাড়ীটাকে ঝঞ্ঝাট বিশৃঙ্খলা দুর্গন্ধ হইতে রক্ষা করিতে পারি; বাড়ী খানিকে হাঁসপাতালে পরিণত করিয়া কি হইবে,"—তবে বলি, ধিক্ ধিক্ ধিক্! তোমরা বাড়ীর শ্রী সৌন্দর্য্য বাঁচাইতেছ, আরামকে বাঁচাইতেছ, কিন্তু মনুষ্যত্ব নষ্ট করিতেছ। তোমাদের প্রেমকে মহৎ করিয়া তুলিবার জন্য ভগবান্ তোমাদিগকে যে বিধি দিয়াছিলেন, তাহা তোমরা প্রত্যাখ্যান করিলে। এমন ভাব যার, সে-মানুষ মানুষ নয়; এমন বাড়ী যতই শ্রী সৌন্দর্য্যে সম্পদে ভূষিত হউক, তাহা মানুষ গড়িবার যোগ্য বাড়ী নয়। এমন মানুষ যদি প্রেমের কথা বলে, এমন বাড়ীতে যদি "প্রেম" কথাটি উচ্চারিত হয়, তবে সেখানে কাণে আঙ্গুল দিতে ইচ্ছা হয়।

দুঃখ বিপদ, ভয়, আশঙ্কা, অবস্থার অতর্কিত পরিবর্ত্তন,—এ সকল ভগবান্ রাখিয়াছেন আমাদিগকে প্রেম শিক্ষা দিবার জন্য, অর্থাৎ প্রেমের মনুষ্যত্বের দিকটি, প্রেমের মহত্ত্বের দিকটি শিক্ষা দিবার জন্য। উচ্চমনা মানুষের কথা কিরূপ? তিনি বলেন, "ধন্য বিপদ ও দুঃখ, যাহা না আসিলে প্রিয়জনের জন্য কষ্ট স্বীকার করিবার মহান্ অধিকার পাইতাম না, এবং আমার প্রেম ব্যর্থ হইয়া যাইত।"

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে মানবীয় প্রেমের একটি স্বভাব, ভবিষ্যৎ কল্পনা করা, হৃদয়ের গোপন কক্ষে ভবিষ্যতের ছবি রাখা। তেমনি মানবপ্রেমের আর একটি স্বভাব, অতীত জীবন হইতে স্মৃতিসকল সঞ্চয় করা। প্রত্যেক প্রেমিকের হৃদয়ের গোপন একটি কক্ষে অতীতের স্মৃতিসকল সঞ্চিত হয়; প্রত্যেক প্রেমিকের একটি প্রেমের স্মৃতিভাণ্ডার আছে। দীর্ঘ জীবনে প্রিয়জনের সঙ্গে সম্বন্ধটা কি করিয়া ফুটিয়াছে, তাঁহার জন্য সারা-জীবনে আমি কি কি করিয়াছি, তাহার স্মৃতির ধারা জীবনে প্রবাহিত হইয়া আসে, ও অন্তরে সঞ্চিত হইতে থাকে। উন্নত প্রেমের এই স্মৃতিভাণ্ডারে কিরূপ বস্তু থাকে? কোনও উন্নতমনা গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা কর; তিনি বলিবেন, পতির ও সন্তানের জন্য কত কষ্ট সহিয়াছি, জীবনে কতবার কত ফাঁড়া কাটিয়া গিয়াছে, কত বিনিদ্র রজনী 'এই বুঝি যায়, এই বুঝি যায়' করিতে করিতে কাটিয়াছে, ভগবানের চরণে কত প্রার্থনা উঠিয়াছে, অথবা, কত

দীর্ঘ বৎসর খোলার ঘরে থাকিয়া, একাহারে থাকিয়া, সন্তানের পড়ার খরচ জোগাইয়াছি,—এই সকল কথা আজীবন স্মরণ রাখিতে ইচ্ছা হয়; এই সব কথা ভাবিতে ভাবিতে হৃদয় মন উন্নত হয়; সন্তান বয়স্ক হইয়া যখন এ সকল ভাব বুঝিবার শক্তি লাভ করে, বাষ্পগদ্গদ্ কণ্ঠে তাহার কাছে এই সকল কাহিনী বলিতে বলিতে মন পবিত্র হইয়া উঠে। কোনও উন্নতমনা গৃহস্থকে জিজ্ঞাসা কর; তিনি বলিবেন,—পত্নী ও সন্তানের কল্যাণের জন্য প্রাণপণ প্রয়াস, স্বল্প বিশ্রাম ও দীর্ঘ শ্রম, কত বিপদের সময় দেহ মনের শেষ শক্তিবিন্দু ব্যয় করিয়া দিবারাত্রি সংগ্রাম, —এই সকলই তাঁহার স্মৃতির রত্নমালা। আমি নিজ বাল্যকালে নিজ পিতামাতার কাছে তাঁহাদের জীবনের এইরূপ কত কাহিনী শুনিয়াছি; শুনিতে শুনিতে কত অশ্রু পড়িয়াছে, মনে কত পবিত্র ভাবের বিদ্যুৎ খেলিয়া গিয়াছে। সে-সকল সরল কাহিনী কবি-রচিত মহাকাব্য অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ; কারণ তাহা মানব-প্রেমের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশের কাহিনী,—দুঃখবহনের কাহিনী। উন্নতমনা মানুষের কাছে প্রেমের স্মৃতিভাণ্ডারের মহামূল্য রত্ন এই সকলই। প্রেমের সুখ, প্রেমের আনন্দ নয়; কিন্তু দুঃখের স্পর্শে প্রেম যখন তাহাকে জাগাইয়াছে, খাটাইয়াছে, উঁচু করিয়াছে, তাহাই তাহার স্মরণ করিতে ভাল লাগে।

দুঃখকে বর্জ্জন করিবার যে অত্যধিক আগ্রহের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহা ধর্ম্মজীবনকেও নিস্তেজ করে। বর্ত্তমান অতি-সভ্য জগতে দুঃখ যেন এতই অশ্রদ্ধেয় ও অবজ্ঞেয় যে, মানুষের সঙ্গে আলাপে প্রসঙ্গে তাহার উল্লেখ নিষিদ্ধ। ইহা হইতে এক প্রকার কৃত্রিম তেজস্বিতা ও দৃঢ়তার ভাণ মানবচরিত্রে প্রবেশ করে; প্রকৃতপক্ষে তাহা এক প্রকার উদ্ধত বিদ্রোহের ভাব মাত্র, এক প্রকার dogged, sullen, ভাব মাত্র। এই ভাবটিকে মানুষ ধর্ম্মরাজ্যেও লইয়া যায়; দুঃখ বেদনা আঘাত পাইলে, তাহা লইয়া নম্র হইয়া কাতর হইয়া ঈশ্বরের সন্নিধানে আসিতে ইচ্ছা হয় না। ইঁহাদের মতে দুঃখ লইয়া যেমন মানুষের সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ হয় না, তেমনি ঈশ্বরের সঙ্গেও যেন কোন সম্বন্ধ হইতে পারে না। ধর্ম্মরাজ্যে আলোক, আনন্দ, সৌন্দর্য্য ভিন্ন অন্য কিছু যেন ইঁহারা স্বীকার করিতে চাহেন না। ইহার অনিবার্য্য ফল, ধর্ম্মের যে একটি মনুষ্যত্বের দিক আছে, বীরত্বের ও মহত্ত্বের দিক আছে, তাহা হইতে চ্যুত হওয়া।

আমরা ঈশ্বরকে পাইব কোথায়? তাঁহার স্পর্শ লাভ করিব কোথায়? শুধু কি মধুর সঙ্গীতে, শুধু কি জ্ঞানে, শুধু কি সত্যের চমৎকারিত্বে, শুধু কি ব্যক্তিগত জীবনের ও সুমার্জ্জিত সমাজের সুখ সকলে? একটি সুসভ্য, সুমার্জ্জিত, জ্ঞানোজ্জ্বলিত শিল্প সৌন্দর্য্য আস্বাদনে অভ্যস্ত মানুষের সমাজ, যদি ক্রমাগত একান্তভাবে এই সকলের মধ্য দিয়াই ঈশ্বরকে অনুভব করিতে থাকে, তবে এই প্রকার ঈশ্বর-সঙ্গ প্রচুর পরিমাণে থাকা সত্ত্বেও, ক্রমে সেই সমাজের ধর্ম্মভাব তরল লঘু ও নিষ্প্রভ হইয়া যাইবে। দুঃখে ঈশ্বরকে দেখিবে না? দুঃখকে ধর্ম্মজীবনের সহায় করিয়া লইবে না? জীবনের দুঃখ সংগ্রাম লইয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাঁহার দিকে তাকাইবে না? "তোমার এই দীন দুঃখী পরিবার" এ কথাটি সপরিবারে ঈশ্বরচরণে নিবেদন করিয়া সেই কাতরতার মধ্য দিয়া তাঁহার করুণার যে স্পর্শ পাওয়া যায়, তাহা প্রাণে গ্রহণ করিবে না? "তোমার দেওয়া দুঃখ সংগ্রাম আমরা মানুষের মত বহিব", এই বলিয়া বাড়ীর সব মানুষগুলি তাঁর চরণে একত্রে দাঁড়াইবে না? দুঃখের দিনে আমাদের প্রেম কেমন উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিয়াছে, তাহার স্মৃতিধারা পরিবারে সযত্নে রক্ষিত হইবে না? সেই স্মৃতিরত্নসকলকে ভগবৎকরুণায় মণ্ডিত করিয়া সন্তানসন্ততিকে দান করিবে না? ধারাবাহিকরূপে স্বীয় বংশে এই মহত্ত্বের ও ভগবৎকরুণার অনুপ্রাণন স[illegible] না? যদি তাহাই তোমাদের আদর্শ হয়, তবে জানিও, সেই অচঞ্চল নিস্তরঙ্গ শান্তিময় সুখময় আনন্দময় জীবনপ্রবাহই তোমাদের ধর্ম্মকে অতি লঘু ও অসার করিয়া দিবে। তবে বলি, আঘাত ও আন্দোলনের মধ্য দিয়া ভগবান্ যে আমাদের প্রেমকে উন্নত করেন, এবং তাঁহার করুণায় অপূর্ব্ব স্পর্শ দান করেন, তাহা হইতে আপনাদিগকে বঞ্চিত করিলে।

সাধুদিগের উক্তি।

প্রথম

(ক) ঈশ্বরপ্রেম বিভিন্ন প্রকারের; অথবা অনেক[illegible] বিভিন্ন ভাবধারা ঐ নামে কথিত হইয়া থাকে। [illegible] স্বার্থপ্রণোদিত প্রেম বলিয়া একরূপ প্রেম আছে। [illegible] প্রেমের সাধকগণ আপনাদের সুখ সুবিধার জন্য [illegible] ভালবাসে। ইহাদিগকে ইন্দ্রিয়সুখাসক্ত ব্যক্তিগণ এবং [illegible]গণের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। তাঁহারা যেমন নিজেদের অর্থ ও সুখ সুবিধা খুঁজিয়া বেড়ায়, অন্যের দিকে ফিরিয়া তাকায় না, তেমনি ভাবেই স্বার্থ প্রণোদিত প্রেমের সাধকগণ ঈশ্বরের দিকে হস্ত প্রসারণ করে; কিন্তু ঈশ্বরকে চায় না, চায় নিজেদের সুখ। আমরা ইহাকে প্রেমনামে অভিহিত করিতে পারি না; যদি তাহা করি, তবে ঈশ্বর এ প্রেম গ্রহণ করেন না। ফ্রান্সিস্ ডি সেলের কথায় বলিতে গেলে "ইহা অপবিত্র ও ধর্ম্ম বিনাশক।"

(খ) আত্মসুখকে বিসর্জ্জন দেয় না এরূপ এক প্রকার প্রেম আছে। এ প্রেমে আপনার ইচ্ছাকে কোন উন্নততর শক্তি অর্থাৎ ঈশ্বরের মহিমার সম্মুখে স্থাপন করা কর্ত্তব্য। আমরা ইহাকে মিশ্র অবস্থা বলিতে পারি; কারণ, এক সময়েই নিজেকেও ভুলিতেছি না, আবার ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বা ঈশ্বরের অধীনতার বিরুদ্ধেও যাইতেছি না। এ প্রেম সাধারণতঃ স্বার্থপূর্ণ বা ভ্রান্তিময় নহে। অন্য পক্ষে আত্মা ও পরমাত্মা যখন প্রকৃত প্রেমে অবস্থিতি করে অর্থাৎ আমরা ঈশ্বরকে যেমন ভালবাসা উচিত ঠিক তেমনি ভালবাসি এবং আমাদের নিজেদের জন্য যে প্রেমটুকু রাখি তাহাও নিঃশেষ করিয়া দেই, তখনই প্রকৃত প্রেম লাভ করিতে পারি।

দ্বিতীয়

(ক) মিশ্র-প্রেমের অবস্থা আবার সর্ব্বত্র সমান নহে।

ফরাসি বাগ্মী, ধার্ম্মিক, সাহিত্যিক ফেঁনেলোঁর Maxims of Saint হইতে অনূদিত।

(খ) যখন আত্মা ও পরমাত্মার ভিতরে পরস্পরের প্রেমের প্রতিদান হয় এবং আত্মা পরমাত্মার ভিতরে আপনাকে ডুবাইয়া ফেলে, তখন মিশ্র প্রেম শুদ্ধ প্রেমে পরিণত হয়। অতএব মিশ্র প্রেম উপযুক্ত রূপে ব্যবহৃত হইলে শুদ্ধ প্রেমে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে।

(গ) শুদ্ধ প্রেম মিশ্র প্রেমের বিরোধী নহে, বরং প্রথমটি দ্বিতীয়টির সাধনার ফল। যখন আমরা এইরূপ কৃতকার্য্যতা লাভ করি অর্থাৎ আমাদিগের ভিতরে শুদ্ধ প্রেম সঞ্চারিত হয়, তখন ঈশ্বরের মহিমা আমাদিগের মনকে এরূপ ভরপুর করিয়া তোলে যে, আমাদের কোন সুখেচ্ছা, আমাদের পার্থিব অস্তিত্ব প্রভৃতি আছে বলিয়াই মনে হয় না। মনে হয়, আমাদের সকল বিনষ্ট হইয়াছে, শুধু ঈশ্বরে অবস্থিতি করিতেছি। তখনই ঈশ্বর আত্মার কেন্দ্র হইয়া দাঁড়ান এবং সমস্ত প্রেম তাঁহাতেই সমর্পিত হয়। তখন তিনি সূর্য্যের ন্যায় আত্মার আলোকপ্রদানকারী হইয়া উঠেন। তাঁহার আলোকে আলোকিত হইয়াই এই সময়ে মানব জ্যোতিষ্মান্ এবং উৎসাহোদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। তখন কি আর মানুষের আপনার পার্থিব সুখ সুবিধার দিকে দৃষ্টি থাকে? কেবল ঈশ্বরের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়।

(ঘ) আমরা তাঁহার চরণে নত হই। আমরা আমাদের অস্তিত্ব ভুলিয়া যাই। অস্তিত্ব স্মরণে আনাই যে দোষের এই ...লিয়া নহে; পরন্তু আমাদিগের বাসনা বা ইচ্ছা করিবার বা ...হিবার কিছু থাকে না বলিয়াই এরূপ হয়। ঈশ্বর যখন মানব ...আত্মার পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়, তখন কি মানব আপনার বিষয় ...ছু ভাবিতে পারে? তখন আমরা ঈশ্বরকে এবং কেবল মাত্র ...কেই ভালবাসি। ঈশ্বরের ভিতরে বিশ্ববাসী সকলকে ভালবাসিতে আরম্ভ করি।

ক্রমশঃ

সুশীলকুমার বসু

নূতন সঙ্গীত

আলেয়া জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল

কবে আমি এ জীবন সঁপে দিব তোমার করে—
বিকাইব ও চরণে চিরজনমের তরে?
রেখে তোমায় হৃদি মাঝে, সাজা'য়ে প্রেম-ফুল-সাজে—
বড় সাধ মনে আজি পূজিব ভকতি ভরে।
করি' তব উপাসনা পুরিবে মনস্কামনা,
আনন্দে ঝরিবে আঁখি নিরখি' মম অন্তরে।
বহুদিনের মনের আশা, গভীর প্রাণের তৃষা,
মিটাইব প্রাণে পেয়ে প্রিয়তম প্রাণেশ্বরে॥

শ্রী চন্দ্রনাথ দাস

ব্রাহ্মসমাজ

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ২রা এপ্রিল গিরিডি নগরীতে প্রবীণ বৃ ব্রাহ্ম বাভগবান চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৭৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। নানা সংগ্রামের মধ্যে তিনি জীবনে বিশ্বাসের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। ১৩ই এপ্রিল তাঁহার পারলৌকিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। মধ্যমপুত্র শ্রীমান্ জীবনপ্রদীপ পিতার আত্মজীবনী হইতে কিছু কিছু পাঠ করিয়া প্রার্থনা করেন, মধ্যমা কন্যা শ্রীমতী শোভা বসু পিতার ব্রহ্মনিষ্ঠ গার্হস্থ্য জীবন সম্বন্ধে কিছু পাঠ করিয়া প্রার্থনা করেন, জামাতা শ্রীমান্ শিবেশচন্দ্র বসুও কিছু বলেন, এবং কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুপ্রভা দাস প্রার্থনা করেন। অপরাহ্নে দরিদ্রদিগকে পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করান হইয়াছে। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে নিম্নলিখিত ভাবে ১১২৲ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে—একটী ব্রাহ্মবালিকাকে একবৎসরের জন্য মাসিক ৩৲ টাকা করিয়া বৃত্তি ৩৬৲, একটী ব্রাহ্ম বালককে ঐরূপ বৃত্তি ৩৬৲, কলিকাতা সাঃ ব্রাঃ সমাজ প্রচার ফণ্ডে ৫৲ ঐ অনাথ ব্রাহ্মপরিবার ফাণ্ডে ১০৲, গিরিডি ব্রাহ্মসমাজে ৪৲, তিনিকড়ি বসু ফণ্ড ২৲, গিরিডি নববিধান সমাজ ৩৲ নববিধান সমাজ মিশন ফণ্ড ৪৲, ঢাকা ব্রাহ্মসমাজ ৫৲, ঢাকা অনাথ ব্রাহ্ম পরিবার ফণ্ড ৫৲, এবং গিরিডি পবলিক লাইব্রেরী ২৲।

বিগত ২রা এপ্রিল বাণীবন গ্রামে শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র ঘোষালের জ্যেষ্ঠা ভগিনী অনঙ্গময়ী দেবী দীর্ঘকাল অসুস্থ থাকিয়া ৬৯ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি অতি সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন।

বিগত ১১ই এপ্রিল পরলোকগত স্যার কে, জি, গুপ্তের আদ্যশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য, শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য শাস্ত্র পাঠ, জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রচন্দ্র ও দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রচন্দ্র প্রার্থনা ও কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী সুবালা আচার্য্য জীবনী পাঠ করেন। এই উপলক্ষে পুত্রগণ নিম্নলিখিত রূপ দান করিয়াছেন—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ৩০০৲ ভবানীপুর সম্মিলন ব্রাহ্মসমাজ ৩০০৲ পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ, ঢাকা ৩০০৲ অনাথব্রাহ্মপরিবার সংস্থান ধনভাণ্ডার, ঢাকা ১০০৲ অন্যান্য নানা প্রতিষ্ঠানে ৮০০৲ মোট ১৮০০৲।

বিগত ৫ই এপ্রিল সন্ধ্যাকালে পূর্ব্ব বাঙ্গলা ব্রাহ্ম সমাজ মন্দিরে স্যার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্তের মৃত্যুতে এক শোকসভা হইয়াছিল; মিঃ আর কে, দাস সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ রায়, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র নাগ, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত, এবং শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চিরশান্তিতে রাখুন ও আত্মীয়স্বজনদের শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

উৎসব—নিম্নলিখিত প্রণালীতে বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে—

১০ই এপ্রিল সায়ংকালে শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মিত্রের গৃহে বিশেষ ভাবে মহিলাদের জন্য সংকীর্ত্তন ও উপাসনা। বহু পুরুষও তাহাতে উপস্থিত ছিলেন। ১১ই এপ্রিল প্রাতে ও সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে সংকীর্ত্তন ও উপাসনা এবং অপরাহ্নে কাঙ্গালী বিদায়।

তিন বেলার উপাসনাতেই শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন। স্থানীয় কয়েকটি বন্ধু সংকীর্ত্তন করিয়া বিশেষ সাহায্য করেন।

শুভবিবাহ—বিগত ৫ই এপ্রিল কলিকাতা নগরীতে পরলোক গত বাবু বিজয়কৃষ্ণ বসুর জ্যেষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া ললিতা ও শ্রীযুক্ত রাজকুমার চন্দ্র রায়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান রাজেন্দ্র কুমারের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন।

প্রেমময় পিতা নবদম্পতিকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

ছান্দোগ্যোপনিষদ—দ্বিতীয়ার্দ্ধ। শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক পদপাঠ, অবিকল বঙ্গানুবাদ এবং ব্যাকরণ ও তাৎপর্য্য-ঘটিত বহুল মন্তব্য সহ ব্যাখ্যাত। পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ কর্ত্তৃক খণ্ডশীর্ষ, বিষয়ানুক্রমণিকা ও উপনিষদুক্ত সাধনপ্রণালী বিষয়ক ভূমিকাসহ সম্পাদিত। বাঁধান মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা। সম্পাদক ভূমিকাতে (১) উপনিষদের নীতি (২) জ্ঞানসাধন ও (৩) প্রেম-সাধন ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ছান্দোগ্যের প্রয়োজনীয় অংশ এই খণ্ডেই প্রকাশিত হইয়াছে। সেই হিসাবে প্রথমার্দ্ধ অপেক্ষা ইহা অধিকতর আদরণীয় বিবেচিত হইবে। আমরা প্রথম খণ্ডের সমালোচনাতে বলিয়াছিলাম যে এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ আমাদের নয়নগোচর হয় নাই। এখানে তাহারই পুনরুল্লেখ করিতেছি। নূতন কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। আশা করি ইহা সর্ব্বত্র বিশেষ সমাদৃত হইবে।

কোর-আনের সূরা, বেদের সূক্ত সংগ্রহ

শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্ত প্রণীত। মূল্য ১৲ টাকা। মূলতঃ হিন্দু ও মুসলমানের ধর্ম্মশাস্ত্রে যে একই ধর্ম্মতত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে, একই বিশ্বজনীন ধর্ম্ম সকলের সার কথা, তাহাতে কোনও বিরোধ নাই, ইহা প্রদর্শন করাই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। আমরা ইহা পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি এবং আশা করি ইহার দ্বারা উভয় সম্প্রদায়ের সংকীর্ণ ভাব দূরীকরণে সাহায্য হইবে। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। কিন্তু মূল্য কিছু বেশী হইয়াছে। দুঃখের বিষয় মুদ্রাকরপ্রমাদ পুস্তকখানির সৌন্দর্য্য অনেকটা নষ্ট করিয়াছে। ঋগ্বেদের ধর্ম্মসম্বন্ধে তিনি যে-সকল সূক্ত উদ্ধৃত করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতেও দেখা যায়, ঋগ্বেদের ঋষিগণ পরিশেষে একত্বে উপস্থিত হইলেও প্রথম হইতেই যে তাহাতে সর্ব্বত্র একেশ্বরবাদ প্রচারিত হইয়াছে এরূপ নহে। তথাপি তিনি বিদেশীয় পণ্ডিতগণকে অযথা আক্রমণ করিয়াছেন কেন, বুঝিলাম না। অধিকতর নিরপেক্ষতা অবলম্বনপূর্ব্বক সংযত ভাবে সত্য প্রদর্শন করিলে উদ্দেশ্য আরও সুসিদ্ধ হইত। উভয়ের মধ্যে মূলতঃ কোনও বিরোধ নাই। যিনি সর্ব্ব প্রথম উভয় ধর্ম্মের মৌলিক একতা প্রদর্শন করিয়া সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের তত্ত্ব প্রকাশিত করিলেন, ভূমিকাতে এত কথার মধ্যেও তাঁহার নামের উল্লেখ নাই, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়।

প্রাপ্তি স্বীকার—নিমতা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নিমতা ব্রহ্মমন্দির-সংস্কারকার্য্যের সাহায্যকল্পে সহৃদয় মহোদয়গণ হইতে প্রাপ্ত নিম্নলিখিত দান কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্বীকার করিতেছেন—

১৯২৩ সালের মে মাসে ২০৲ (উত্তর বঙ্গের জল প্লাবনের জন্য চাঁদা সংগ্রহ কাজ বন্ধ ছিল। কিন্তু অধুনা মন্দিরের কিয়ৎ অংশ পড়িয়া যাওয়াতে পুনঃ দান সংগ্রহ করা হইতেছে এবং নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে) ডাঃ হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা ২০৲ শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ কলিকাতা ১০৲ ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য (প্রথম) কলিকাতা ১০৲ বাবু মাণিকলাল দে কলিকাতা ১০৲ বাবু অমিয় কুমার সেন (প্রথম) কলিকাতা ১০৲ বাবু শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা ৫৲ বাবু বেণীমাধব দাস কলিকাতা ৫৲ বাবু আনন্দকুমার দত্ত কলিকাতা ১৲ শ্রীমতী কিরণ বসু কলিকাতা ৫৲ মোট ৯৬৲ মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত মোট ব্যয় ১৭৫।০

দাতব্য বিভাগের সম্পাদক কৃতজ্ঞতার সহিত ১৯২৫ সালের নিম্নলিখিত দান প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছেন—

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ আফিস হইতে প্রাপ্ত —[সরলা মহলানবীশ ফণ্ডের সুদ ৩৷৷০ কালীপ্রসন্ন বসু ঐ ৩৷৷০, হিমাংশুবালা গুহ ঐ ৩৷৷০ সৎসঙ্গী ঐ ৩৲, কানাইলাল সেন ঐ ৩৫৲ অভয়চরণ মল্লিক ঐ ৩৷৷০ অমিয়বালা গুহ ঐ ৩৷৷০ মুক্তকেশী ঐ ৩৷৷০ মোহিতকুমার দত্ত ঐ ১০৷৷০ রজত সরকার ঐ ৫।০ প্রশান্তকুমার গুহ ঐ ৩৷৷০ অনাদ্যা-গোলোক চন্দ্র বসু ঐ ১০৷৷০ কামিনী কুমার দত্ত ৭৲, বাবু রজনীকান্ত গুহ ৫৲ বাবু অধরচন্দ্র মজুমদার ৫৲ বাবু ঈশানচন্দ্র চাটার্জ্জি ১৲ বাবু অমূল্যকুমার রায় ১৲ মিসেস্ এন্ কে, ধর ৩৲ মিসেস্ তারকগোপাল ঘোষ ৫৲ বাবু জিতেন্দ্রকুমার বিশ্বাস ২৸৶৩ বাবু সুশীলকুমার চক্রবর্ত্তী ২৲ বাবু বীরেন্দ্রকুমার বসু ২৲ শ্রীযুক্ত এল্‌বিয়ান রাজকুমার বানার্জ্জি ২৫৲ কাজি আবদুল গফুর ১৲ বাবু নির্ম্মলচন্দ্র সিংহ ৪৲ মিসেস্ হৃদয়মোহন বসু ২৲ বাবু মহেশ চন্দ্র মুখার্জ্জি ১৲ বাবু ফকিরচাঁদ সাধুখাঁ ৫৲ শ্রীযুক্ত এ, সি, বানার্জ্জি ৪৲ বাবু ধীরেন্দ্রকুমার বসু ২৲ বাবু অমিয়কুমার দত্ত [illegible] বাবু অতুলকৃষ্ণ বিশ্বাস ৫৲ বাবু সুরেন্দ্রনাথ নন্দী [illegible] বসন্তবালা হোম ৫৲ শ্রীমতী সুধাংশুবালা দত্ত ও শ্রীমতী শিশিরিন্দুবালা ঘোষ ২৲ মিসেস্ ডি, এন, ঘোষ ১০৲ ডাঃ এন্ কে ঘর ৩৲ বাবু সুধীশ ও শ্রুতীশচন্দ্র বসু ৪৲ বাবু প্রভাতরঞ্জন ঘোষ ৪৲, বাবু হেমন্তকুমার বসু ২৲ শ্রীমতী সুবালা মল্লিক ৩৲ শ্রীমতী সুমতিবালা মল্লিক ৫৲ শ্রীযুক্ত পি, এন, ঘোষাল ২৲ বাবু ইন্দ্রনারায়ণ দাস ১৲ বাবু অশোককুমার বসু ৫৲ শ্রীমতী প্রভাবতী সেন ৫৲ বাবু হৃদয়কৃষ্ণ দে ১৲ বাবু চন্দ্রশেখর কর ১৲ শ্রীমতী বিনোদিনী ধর ২৲ শ্রীমতী শুধাংশুবালা দত্ত, শ্রীমতী শরদিন্দুবালা চন্দ্র ও শ্রীমতী শিশিরিন্দুবালা ঘোষ ৪৲ শ্রীমতী ইন্দুবালা বসু ১৲] বাবু হৃদয়রঞ্জন রক্ষিত (পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধে) ২৲ শ্রীমতী সুখদা নাগ (নাতির জাত কর্ম্ম উপলক্ষে) ৫৲ সেবিংস্ ব্যাঙ্কের সুদ ১২৶৪, শ্রীযুক্ত চণ্ডীকিশোর কুশারী ৩৲ বাবু সুধীন্দ্র নারায়ণ ও বাবু হেমেন্দ্রনারায়ণ রায় (মাতার শ্রাদ্ধে) ১০৲ বাবু শ্রীপতিনাথ দত্ত (পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধে) ২৲ বাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ হালদার (মাঃ প্রাণকৃষ্ণ বাবু) ৫৲ আমবাড়িয়া ষ্টেট ২৫৲ (হেমনগরের জমিদার হইতে) বাবু আশুতোষ দাস গুপ্ত (পুত্রের শ্রাদ্ধে দান) ২৲ শ্রীমান জিতেন্দ্রনারায়ণ রায় (পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধে) ২৲ মোট—৩১৪৸৴৭।

মহিলাদিগের নবদ্বীপ স্মৃতি ভাণ্ডার—

মহিলাদিগের নবদ্বীপ স্মৃতিভাণ্ডারের জন্য সংগৃহীত নিম্নলিখিত দানের প্রাপ্তি কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকৃত হইতেছে—(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর) শ্রীমতী চিত্রলেখা সিদ্ধান্ত ১৫৲ শ্রীমতী লতিকা রায় ৩৲ শ্রীযুক্তা নির্ম্মলা মিত্র ২৲ শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী মুখার্জ্জী রেঙ্গুন ৫৲ শ্রীমতী প্রীতিলতা বসাক রেঙ্গুন ৫৲ মোট ৩০৲ পূর্ব্ব স্বীকৃত ৩৯০৮৶০ সর্ব্বশুদ্ধ মোট ৩৯৩৮৶০

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৮ই মে ১৯২৬ খৃঃ ২৫শে বৈশাখ ১৩৩৩ সন, শনিবার ৭ ঘটিকার সময় পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে সমাজের বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন হইবে। সভ্যগণের উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়।

আলোচ্য বিষয়:—

১। ১৩৩২ সনের বার্ষিক কার্য্যবিবরণী এবং পরীক্ষিত আয় ব্যয়ের হিসাব। ২। ১৩৩৩ সনের জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্যনির্ব্বাচন। ৩। মিঃ আর, দাস প্রস্তাব করিবেন:—

"পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজের যে সকল সভ্যের দুই বৎসর বা ততোধিক কালের চাঁদা বাকি পড়িয়াছে, তাঁহাদের নাম সভ্যের তালিকা হইতে উঠাইয়া দেওয়া হউক।" ৪। শ্রীযুক্ত প্রদোষচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রস্তাব করিবেন:—"পূঃ বাঃ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলীর কার্য্যনির্ব্বাহক সভার গঠন সম্বন্ধীয় ৯ম নিয়মের তৃতীয় পংক্তিতে "৭জন সভ্যের" এই কথার পরিবর্ত্তে "৯ জন সভ্যের" এই কথা বসান হউক। ৫। শ্রীযুত ললিত সরকার প্রস্তাব করিবেন—"ইষ্টবেঙ্গল ইন্‌ষ্টিটিউসনের নিয়মাবলীর ম্যানেজিং কমিটি গঠন সম্বন্ধীয় 6 (c) এবং 6 (f) নং নিয়ম যথাক্রমে নিম্নলিখিত রূপে সংশোধিত হউক।

(a) Four members shall be elected by the Executive Committee of the E. B. Brahmo Samaj from among its own members and two shall be elected by the general Committe from among the members of the E. B. Brahmo Samaj.

(b) Two members shall be elected by the general Committe of the S. B. Brahmo Samaj from among the citizens of Dacca who may or may not be members of the E. B. Brahmo Samaj.

N.B. The present rule is that all the 8 members referred to above are elected by the Executive Committee of the E. B. Brahmo Samaj.

৬। শ্রীযুক্ত ললিতকুমার রায় প্রস্তাব করিবেন:— সমাজের সম্পাদক, সমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা কর্ত্তৃক মনোনীত না হইয়া সাধারণ সভা কর্ত্তৃক মনোনীত হইবেন, এই মর্ম্মে সমাজের নিয়মাবলীর ২৯ নং নিয়মের প্রথম পংক্তিতে "এক জন সম্পাদক" এই কথাটি তুলিয়া দিয়া ২৮ নিয়মে "মনোনীত হইবেন" এই কথার পরে "সম্পাদক সাধারণ বার্ষিক সভায় উপস্থিত সভ্যগণের অধিকাংশ ভোট দ্বারা মনোনীত হইবেন" এই কথাটি বসান হউক।

৭। বিবিধ

পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ, ঢাকা, ৩রা এপ্রিল, ১৯২৬

শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন
সম্পাদক
পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ।

বিজ্ঞাপন।

আগামী শুক্রবার ৩০শে এপ্রিল সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ উপাসনা-মন্দিরে অধ্যক্ষ সভার প্রথম ত্রৈমাসিক অধিবেশন হইবে। সভ্যগণের উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়।

আলোচ্য বিষয়।

১। কার্য্যনির্ব্বাহক সভার প্রথম ত্রৈমাসিক কার্য্য বিবরণী।

২। হিসাব পরীক্ষক নিয়োগ।

৩। কলিকাতা উপাসক মণ্ডলীর সম্পাদক নিয়োগ হেতু শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ কার্য্য নির্ব্বাহক সভার Ex-officio সভ্য হওয়াতে তৎস্থলে অন্য একজন সভ্যনিয়োগ।

৪। খাসিয়া পর্ব্বতে প্রচার কার্য্যের পুনর্গঠন বিষয়ক প্রস্তাব সম্বন্ধে কার্য্য নির্ব্বাহক সভার নির্দ্ধারণ।

৫। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অবান্তর নিয়মাবলীর সংশোধন।

I. সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষসভার সভ্য মনোনয়নের নিয়মাবলী:—

(ক) নিয়ম ৭, লাইন ৫, "সহকারী সম্পাদক" এবং একন. ইহার মধ্যে কোন" এই কথাটি বসিবে।

(খ) তপসীল ক ও খ এর পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত তপস বসিবে।

তপসিল (ক)।

সভ্য পদপ্রার্থিগণের নামের তালিকা।

মহাশয়,

আগামী বৎসরের অধ্যক্ষ সভার সভ্যপদপ্রার্থী সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের নিম্নলিখিত সভ্যগণের নাম আপনার নিকট প্রেরিত হইল। এতন্মধ্যে আপনি অনুগ্রহ করিয়া অনধিক ৩৫ জন সহরবাসী সভ্য ও অনধিক ৩০ জন মফঃস্বলবাসী সভ্যকে মনোনীত করিয়া আগামী——তারিখের পূর্ব্বে আমার নিকট প্রেরণ করিবেন। অতঃপর আপনার ভোটিং-পত্র প্রাপ্ত হইলে, তাহা গৃহীত হইতে পারিবে না।

সভ্যপদ প্রার্থিগণের নামের পূর্ব্বে যে নম্বর আছে, যাঁহাকে যাঁহাকে ভোট দিবেন, তাঁহাদের নামের সেই নম্বর "ভোট" শীর্ষক স্তম্ভে লিখিবেন। খামের উপরে "ভোটিং পত্র" এই কথা লিখিয়া দিবেন।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
সাঃ ব্রাঃ সঃ কার্য্যালয়।
তারিখ——

নিবেদক,
শ্রী——
সম্পাদক, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।

সভ্যপদপ্রার্থীর তালিকা।

সহর			মফঃস্বল			
ভোট	ক্রমিক নং	নাম	ভোট	ক্রমিক নং	নাম	ঠিকানা

তপসিল (খ)

মাননীয় সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক মহাশয় সমীপে—

মহাশয়,

আমি উপরিলিখিত "ভোট" শীর্ষক স্তম্ভে যাঁহাদের নামের "ক্রমিক" নম্বর লিখিলাম, তাঁহাদিগকে আগামী বৎসরের অধ্যক্ষ সভার সভ্য মনোনীত করিলাম।

নিবেদক
শ্রী—
ঠিকানা—
তারিখ—

(গ) ১০ম নিয়মেএই "ঘোষণা করিবেন" এই কথার পরে নিম্নলিখিত প্যারাটি যুক্ত হইবে।

(খ) যাঁহারা অধ্যক্ষসভার সভ্য মনোনীত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে যদি কোনও ব্যক্তি কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়া থাকেন, তথাপি তাঁহার নাম অধ্যক্ষ সভার সভ্য বলিয়া ঘোষণা করিতে হইবে। যদি এইরূপ ঘোষণার পর ৩ দিনের মধ্যে তিনি কর্ম্মচারীর পদ গ্রহণে অসম্মত বলিয়া পত্র দ্বারা সম্পাদককে না জানান, তবে তাঁহার অধ্যক্ষ সভার পদ শূন্য মনে করিতে হইবে এবং তৎ স্থানে নির্ব্বাচন তালিকা হইতে, যাঁহাদের নাম ঘোষিত হইয়াছে, তাহার পরবর্ত্তী ব্যক্তিকে সম্পাদক অধ্যক্ষ সভার সভ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবেন। (গ) যদি কোনও নির্ব্বাচিত অধ্যক্ষ সভার সভ্য কোনও ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হন, তিনি যদি নির্ব্বাচনের ফলঘোষণার ৩ দিনের মধ্যে সম্পাদকের নিকট পত্র দ্বারা নির্ব্বাচিত সভাপদ পরিত্যাগ জ্ঞাপন করেন; তবে তাঁহার স্থলেও, নির্ব্বাচন তালিকা হইতে যাঁহারা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, ভোটানুসারে তাঁহাদের পরবর্ত্তী নাম অধ্যক্ষ সভার সভ্য বলিয়া সম্পাদক গ্রহণ করিতে পারিবেন। তবে এই বিষয়টি সম্পাদক অধ্যক্ষ সভার পরবর্ত্তী বিশেষ অধিবেশনে জ্ঞাপন করিবেন।

After rule 11 add the following :—

১২। বিশেষ কারণে আবশ্যক বোধ হইলে, উপরে যে সকল স্থলে সময় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, কার্য্য নির্ব্বাহক সভা তাহার পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন। কিন্তু এমন কোনও পরিবর্ত্তন করিবেন না যাহাতে সভ্যগণের ভোট দিবার অসুবিধা ঘটে, অথবা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অধিবেশনে নির্ব্বাচনের ফল উপস্থিত করিতে পারা অসম্ভব হয়।

Add after rule 12 the following :—

II. সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের হিসাব পরীক্ষক নিয়োগের নিয়মাবলী।—

১। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ও প্রেসের হিসাব পরীক্ষার জন্য এক কিম্বা একাধিক হিসাব পরিদর্শক (auditors) নিযুক্ত হইবেন।

২। অধ্যক্ষ সভার যে বিশেষ অধিবেশনে কার্য্য নির্ব্বাহক সভা গঠিত হইবে, সেই অধিবেশনে অডিটর নিযুক্ত হইবেন। কোনও কারণে অডিটরের পদ শূন্য হইলে অধ্যক্ষ সভার অপর যে কোনও অধিবেশনে শূন্যপদ পূরণ হইতে পারিবে।

III. প্রচারক নিয়োগ ও তাঁহাদের শিক্ষাদির নিয়মসমূহ।
প্রচারক নিয়োগপ্রণালী।

In rule 2, *l.* 10 after করিতে পারিবেন add the following :—

"তিনজন সভ্য উপস্থিত হইলে প্রচার সভার কার্য্য চলিতে পারিবে।"

In rule 10, *l.* 3 substitute "১২" for "৯"।

In rule 10, *l.* 4 substitute "ঁ" for "ঃ"।

In rule 12, *l.* 4 between করিতে পারিবেন and কার্য্যনির্ব্বাহক সভা insert the following :—

এবং তাঁহাকে সেবকমণ্ডলীর সভ্যশ্রেণীভুক্ত করিয়া লইতে হইবে।

IV. Rules for conducting meetings of the Sadharan Brahmo Samaj.

In rule 1, *l.* 3 after "are final" add the following :—

"He will have a casting vote in addition to his vote as a member".

V. Rules for the guidance of Affiliated Samajes.

In rule 1, *l.* 3 after "Brahmo Samaj" add "under rule 3".

VI. Byelaws for the guidance of Institutions affiliated to the Sadharan Brahmo Samaj.

In Rule 6, Add the following words after "power" in the first line.

"To take over charge and ask the Executive Committee to reorganise or"

In *l.* 4, put the following before the disaffiliated institution, "In the case of disaffiliation",

VII. মন্দিরে দীক্ষিত হইবার নিয়মাবলী :—

In rule 1, line 1, before দীক্ষিত করিবার পূর্ব্বে add the following :—

১। কোনও ব্যক্তি সমাজ মন্দিরে ব্রাহ্ম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাঁহাকে উপাসকমণ্ডলীর কার্য্যনির্ব্বাহক সভার নিকট আবেদন করিতে হইবে। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা কোনও আচার্য্যকে তাঁহার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার ও তাঁহাকে ব্রাহ্মধর্ম্মের গুরুত্ব ও দায়িত্ব বুঝাইয়া দিবার ভার দিবেন।

In rule 1. (গ) after প্রস্তুত add :—

এবং অসুস্থ না হইলে প্রত্যহ নিয়মিত ব্রহ্মোপাসনা করেন।

(c) In rule 1. (ছ) after যোগ আছে add the following :—

"তৎপরে উপাসক মণ্ডলীর সম্পাদককে তিনি দীক্ষিত হইবার উপযুক্ত কি না তৎ বিষয়ে তাঁহার মতামত জানাইবেন।"

In rule 3, *l.* 1 substitute "উপাসক মণ্ডলীর সম্পাদক" for "আচার্য্য।"

VII. সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে অনুষ্ঠেয় গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানের নিয়মাবলী—

In rule 7, *l.* 2 between কুড়ি টাকা and প্রদান insert the following :—

"ও সমাজপ্রাঙ্গণ ব্যবহার করিলে তজ্জন্য আরও ১০৲ (দশ) টাকা।

৬। শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র চৌধুরী (পাতিয়ালা) নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি উপস্থিত করিবেন।

"গতবৎসরের অধ্যক্ষ সভার প্রথম ও চতুর্থ ত্রৈমাসিক অধিবেশনে খাসিয়া পর্ব্বতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের পুনঃ সংস্থাপন বিষয়ক গৃহীত প্রস্তাবানুসারে এই প্রস্তাব উপস্থিত করিতেছি যে, কার্য্য নির্ব্বাহক সভা অবিলম্বে উক্তস্থানে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের পুনঃ সংস্থাপন করেন, অথবা এক মাসের মধ্যে ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জারে বিজ্ঞাপন দিয়া ঘোষণা করুন যে উক্ত মিশন সর্ব্বথা পরিত্যক্ত হইল।"

৭। বিবিধ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ অফিস ২১১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট মার্চ্চ ২৪, ১৯২৬ সাল	শ্রীঅন্নদাচরণ সেন, সম্পাদক, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় দ্বারা ১০ই বৈশাখ মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রীবরদাকান্ত বসু বি এ

অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময়।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খৃঃ ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৪৯শ ভাগ।	১৬ই বৈশাখ, বৃহস্পতিবার, ১৩৩৩, ১৮৪৮ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯৭	প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০
২য় সংখ্যা।	29th April, 1926	অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

হে করুণাময় বিশ্বপতি, এই বিবিধ ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ বিশ্ব-সংসারে আনিয়া তুমি আমাদিগকে নিয়ত কত সম্পদ্ই দান করিতেছ! আমরা তোমার এ সকল দানের উপযুক্ত ব্যবহার দ্বারা, উন্নতি ও কল্যাণ লাভ করিব, তোমার প্রেম ও করুণার মূল্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া কৃতজ্ঞচিত্তে তোমার অনুগত হইব, এবং সে সমস্ত তোমারই সেবাতে নিয়োগ করিব, বলিয়াই তুমি এত দিয়াছ। কিন্তু আমরা মোহবশতঃ সে কথা ভুলিয়া অনেক সময় তাহাদের মধ্যেই ডুবিয়া থাকি, তোমাকে স্মরণে না রাখিয়া, তোমার কার্য্যে নিযুক্ত না করিয়া, তাহাদিগকে আমাদের ক্ষুদ্র উপভোগের বস্তুতে পরিণত করি। তাহাতে যে আমরা তোমা হইতে যেমন বঞ্চিত হই, তেমনি আনন্দ ও সুখ লাভেও অসমর্থ হই, কল্যাণ হইতেও চ্যুত হই, তাহা অনেক সময়ই ভাবিয়া দেখি না। আমরা তোমাকে ভুলিয়া তোমার দানসকল উপভোগ করিতে যাইয়া, কেবল দুঃখ ও অকল্যাণই সর্ব্বদা ডাকিয়া আনিতেছি। তবুও আমাদের চৈতন্যোদয় হইতেছে না— বৃথা বহুল-সংগ্রহ-আশয়ে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, অথচ প্রকৃত সম্পদ্‌লাভে সমর্থ হইতেছি না। কত প্রকারে আমাদের শক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে—তোমার জগতের সেবায় নিযুক্ত হইয়া বৰ্দ্ধিত হইতেছে না! আমরা তাই এত পাইয়াও, জীবনের পথে অগ্রসর না হইয়া, মৃত্যুর দিকে ধাবিত হইতেছি। তুমি ত নানাপ্রকারেই আমাদিগকে পথ প্রদর্শন, ও তোমার উচ্চ আদর্শ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত কর; তথাপি কেন যে আমরা ক্ষুদ্রতা অলসতাকে অতিক্রম করিতে পারি না, মোহাচ্ছন্নতা দূর করিতে পারি না—জানি না। তুমি আমাদের সকল দুর্ব্বলতাই অবগত আছ। হে দুর্ব্বলের বল, তুমি বল প্রদান না করিলে আমরা এই মোহশৃঙ্খল ছিন্ন করিতে পারি না, তোমার দানের উপযুক্ত ব্যবহার করিয়া উন্নতি কল্যাণ ও আনন্দলাভ করিতে পারি না। তুমি আমাদিগকে শুভসঙ্কল্প দেও, আমরা তোমার অনুগত জীবন যাপন করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হই। তোমার ইচ্ছাই আমাদের জীবনে জয়যুক্ত হউক। আমরা সর্ব্বপ্রকারে তোমারই হই।

নিবেদন।

ধর্ম্ম কি?—তোমরা ধর্ম্মের নামে কোলাহল করিতেছ; ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম আচরণ করিতেছ—ধর্ম্ম রক্ষা করিতেছ, এই অজুহাত দিয়া কত নৃশংস ব্যবহার করিতেছ; কত দুর্নীতির অনুসরণ করিতেছ! ঈশ্বর এক, ধর্ম্ম এক; মানুষ সবই তাঁর সন্তান। ধর্ম্ম ঈশ্বরপ্রীতিতে—ধর্ম্ম মানব-প্রেমে; ধর্ম্ম আপনাকে বিলোপ-করনে, দশের কল্যাণসাধনে। কে কার ধর্ম্ম নষ্ট করিতে পারে? সাধনের দেবতা যে অন্তরে রয়েছেন; ভজনালয় বাহিরের বিকাশ মাত্র। সকলের ভজনালয়ই পবিত্র; সকল মানবেই ঈশ্বর বর্ত্তমান। সকল মানুষই পবিত্রস্বরূপের সত্তায় পূর্ণ; সকল দেহই দেবমন্দির। ধর্ম্ম চাও? অন্তরে ঈশ্বরপ্রীতি ও মানব-প্রীতি সাধন কর; মানবের কল্যাণ কর; যে বিপথে যায় তাকে হাত ধ'রে তোল; যে ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করে, তাকে বুঝাতে চেষ্টা কর। যে তোমার ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠানে আঘাত করে, তাকেও বুঝাও, তার জন্য প্রার্থনা কর। প্রভু যিনি, সকলের আরাধ্য যিনি, তিনি ত সকল উৎপীড়ন সহ্য করেন! তুমি তাঁর উপাসক হ'য়ে এত ঘৃণা, এত বিদ্বেষ পোষণ কর? ধর্ম্মের নামে নর-রক্তে, ভাইএর রক্তে, হস্ত কলুষিত কর? ঈশ্বর যে সকলেরই! সর্ব্বত্র যে তিনি আছেন, সকল দেহই যে তাঁর পবিত্র মন্দির! ধর্ম্মের খোসা নিয়ে কলহ করিও না। ভাইএর বক্ষে ছুরি

মারিও না ;—ধর্ম্মের ভিতরে প্রবেশ কর; সেখানে কেবল প্রেম, কেবল প্রীতি, কেবল সেবা, কেবল ক্ষমা, কেবল আত্মবিলোপ।

বাঁধ ছেড়ে দিও না—জলের স্রোত এসেছে, সম্মুখে বাঁধ ; জলস্রোত বাঁধ অতিক্রমে ক'রে যেতে চায় ; তা হ'লে দেশ ভেসে যাবে—মানুষ পশু, ঘর দ্বার, ধ্বংস হবে ; প্রবল বন্যায় কত অনিষ্ট হবে! জল ক্রমেই উঠ্‌ছে, বাঁধ ভাঙতে চাচ্ছে! প্রবল তরঙ্গ, একটু যদি ছিদ্র পায়, জলস্রোত প্রবেশ করবে, ছিদ্র বড় হবে, বাঁধ ভেঙ্গে যাবে। বাঁধ ভাঙতে দিও না, প্রাণ দিয়া বাঁধ রক্ষা কর। দেশ রক্ষা করতে চাও, বাঁধ ছেড়ে দিও না ; প্রাণপাত ক'রে বাঁধ রাখ। জীবনকে বাঁচাইতে হ'লে, পাপের হাত হ'তে রক্ষা পেতে হ'লে, বাঁধ দিতে হয়, —প্রতিজ্ঞা করতে হয়, ব্রত নিতে হয়। তুমি মনে কর, এক দিন একটু ব্রত ভঙ্গ হ'লে কি হবে? এত কঠোর নিয়ম কেন? আত্মকৃত এ নিগড় কেন? সাবধান, কুবুদ্ধির অনুসরণ করো না। একটু ছিদ্র পেলেই বাঁধ ভেঙ্গে যাবে, আর স্রোত থামাতে পারবে না। এক দিনের জন্য, এক মুহূর্ত্তের জন্যও ব্রত ভঙ্গ করো না। একবার ব্রত ভঙ্গ হ'লে আর রক্ষা নাই, শয়তান তোমাকে পেয়ে বসবে,—দুইবার ভাঙবে, দশবার ভাঙবে, স্রোতে ভেসে যাবে। সাবধান, বাঁধ রক্ষা কর ; প্রাণপণে ব্রত পালন কর।

আমার ভয় কি?—আমি তাঁর চরণে আশ্রয় ল'য়েছি ; তিনি আমার সঙ্গে আছেন ; আমার জীবনের ভার তাঁর উপর। তবে আমি ভয় করব কেন? আমি নির্ভয়ে চলব ; সত্য বলব, সত্য করব, সত্যের মহিমা কীর্ত্তন করব। তাঁর নাম নিয়ে হেসে খেলে বেড়াব। যদি কেহ মন্দ বলে, যদি কেহ উৎপীড়ন করে, যদি জীবনপাত হয়, তাতেও ভয় করব না। তিনি আমার সঙ্গে ; তিনি জানেন কিসে আমার মঙ্গল। তিনি যদি চান এখনই আমি চ'লে যাব, তবে তাহাই হবে। তবে আমি ভয় করব কেন? তোমরা যাকে বিপদ বল, আমি তাকে বিপদ বলি না—আমি জলে যাব, আগুনে যাব, ঘোর তুফানে যাব। আমি যে তাঁরই সঙ্গে আছি ; আমি যে তাঁরই দাস হইয়াছি! তাতে যদি মৃত্যু হয়, সে মৃত্যুই আমার জীবন ; তাতে যদি অপমান হয়, সে অপমানই আমার ইষ্ট হবে ; তাতে যদি নিন্দা হয়, সে নিন্দাই আমার গৌরব। চলিব ফিরিব, তাঁর নাম গা'হিব—আর আনন্দে তাঁর নাম জপ করতে করতে চ'লে যাব।

সম্পাদকীয়।

অর্থের প্রয়োজন ও ব্যবহার—আমাদের দেশের মায়াবাদী সন্ন্যাসী অর্থের কোনও প্রয়োজনীয়তা দেখিতে পান নাই, বরং সংসারের ক্ষণভঙ্গুরতা ভাবিয়া এবং অর্থলিপ্সা মানুষকে সংসারের অতীত অমর জীবনলাভের চিন্তা ও চেষ্টা হইতে দূরে রাখে দেখিয়া, উপদেশ দিয়াছেন—"অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং"—অর্থ অনর্থের হেতু ইহা সর্ব্বদা চিন্তা কর। অর্থের অপব্যবহারহেতু যে নানা অনর্থ, দুর্গতি, সৃষ্ট হইতে দেখা যায় তাহাও হয়ত পরিলক্ষিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু প্রধানতঃ বিষয়চিন্তা 'পরমার্থ চিন্তার' বিষম পরিপন্থী বলিয়াই, এই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। সন্ন্যাসীর পক্ষেও সর্ব্বতোভাবে এই উপদেশ অনুসরণ করিয়া চলা সম্ভবপর কি না, সে আলোচনায় প্রবৃত্ত না হইয়া, সহজেই এ কথা বলা যায় যে, গৃহীর পক্ষে অর্থের যথেষ্টই প্রয়োজন আছে ; অথচ উক্ত কথা স্মরণে রাখিয়া চলিলে অর্থ চেষ্টায় প্রবৃত্ত হওয়া কখনও সম্ভবপর নহে। যাহা অনর্থের মূল, তাহা সংগ্রহের ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক নহে। গৃহীর অর্থ না হইলে চলে না, তাই তাহাকে নিশ্চয়ই অর্থসংগ্রহে চেষ্টিত হইতে হয়। কিন্তু তাই বলিয়া এই শিক্ষা যে এদেশে গৃহীদের জীবনকে কিছুমাত্র স্পর্শ করে নাই, এরূপ মনে করা নিতান্তই ভুল হইবে। উক্ত চিন্তা যে এ দেশের সাধারণ জীবনে, উচ্চ নীচ, শিক্ষিত অশিক্ষিত, সাধক ও সাধনভজনহীন, সকলকেই অল্পাধিক পরিমাণে স্পর্শ করিয়াছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে—কথাবার্ত্তার মধ্যে ত ইহা যথেষ্টই শুনিতে পাওয়া যায়, কার্য্যগত জীবনেও যে প্রমাণ না পাওয়া যায় এমন নহে। সাধারণ ভাবে এ দেশের জাতিগত জীবনে অর্থ-চেষ্টা বিষয়ে যে একটা উদাসীনতা ও উদ্যমহীনতা রহিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অবশ্য এ দেশে যে অর্থলিপ্সু বিষয়ী লোকের অভাব আছে, অনেকেই অর্থসংগ্রহে উদাসীন হইয়া পরমার্থসাধনেই অনুরাগী, আমরা এমন কথা বলিতেছি না। তবে যাঁহারা অর্থসংগ্রহকেই জীবনের প্রধান লক্ষ্য বলিয়া ধরিয়াছে, অন্য দেশের তুলনায়, তাহাদেরও আকাঙ্ক্ষা যে তত বড় নয়, উদ্যম তত অধিক নয়, ইহা আমরা নিঃসন্দিগ্ধরূপেই বলিতে পারি। আর সাধারণ ভাবে সমগ্র জাতিটা যে অর্থসংগ্রহ বিষয়ে তত্তটা উদ্যোগী নয়, তাহাতেও সন্দেহ নাই। অপর দিকে আমরা পাশ্চাত্য জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাই, সংসারের সুখসুবিধা পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করিতে ইচ্ছুক হইয়া, ও তাহার জন্য অর্থের একান্ত প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া, লোকে অর্থসংগ্রহকে জীবনের প্রধান লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে এবং তৎসাধনে সমস্ত উদ্যম চেষ্টা, মনপ্রাণ নিযুক্ত করিয়াছে—তাহারা Almighty Dollar—সর্ব্বশক্তিমান মুদ্রার—উপাসক হইয়াছে। সেখানে অর্থসংগ্রহ অপেক্ষা উচ্চ লক্ষ্য নাই, মহৎ বিষয়ের চিন্তা ও অনুসরণ নাই, পরমার্থ-তত্ত্বের অনুশীলন নাই, উন্নত ধর্ম্ম ও পূজা নাই, নিশ্চয়ই আমরা এরূপ কোন কথা বলিতেছি না। বরং এ সকল যথেষ্টই আছে, এবং আমরা যতই অহঙ্কার করি না কেন, আমাদের অপেক্ষা অধিকতররূপেই আছে বলিয়া আমরা মনে করি। তথাপি সাধারণ ভাবে উপরের কথাই সত্য। সে যাহা হউক, উহা আমাদের অদ্যকার আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্গত নহে। বর্ত্তমানে পূর্ব্বোক্ত পাশ্চাত্য হাওয়া আসিয়া আমাদের দেশের হাওয়াকে যে বহু পরিমাণে পরিবর্ত্তিত করিয়াছে—অর্থের পূজা, অতীব সুখের আদর্শ, সকল শ্রেণীর

লোকের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে—তাহা সহজেই পরিলক্ষিত হইবে। কিন্তু একটু সূক্ষ্মভাবে অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, ঠিক পাশ্চাত্য ভাবের পরিবর্ত্তে উহার বিকৃতিটাই এ দেশ গ্রহণ করিয়াছে। অর্থসংগ্রহের আকাঙ্ক্ষা ও বিলাসবাসনা প্রবল হইয়াছে বটে, কিন্তু সাধু উপায়ে বিবিধ প্রকারে ধনবৃদ্ধির নানা চেষ্টা এবং কল্যাণকর কার্য্যে সে ধন ব্যয় করিয়া অশেষ প্রকারে সকলের উন্নতি সাধনে ও সুখবর্দ্ধনে সহায়তা করিবার ইচ্ছা ও ব্যবস্থা যে সেই পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে, এরূপ কোনও লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। বরং পূর্ব্বে ধর্ম্মার্থে—পুণ্যসঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে বা স্বর্গলাভকামনায়—যে সকল জনহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান হইত, তাহাও পূর্ব্বকালীন ধর্ম্মবিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে যে তিরোহিত হইতেছে—সম্পূর্ণ তিরোহিত না হইলেও যে বহু পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে—তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সঞ্চয় করিবার স্পৃহাটাই এদেশে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইয়াছে; তাহার তুলনায় উপার্জ্জন বা ব্যয় করিবার আকাঙ্ক্ষার একান্ত ন্যূনতা দৃষ্ট হইবে—আর ব্যয় যাহা করা হয় তাহাও নিজের জন্যই, অপরের জন্য নয়, দেখা যাইবে। পাশ্চাত্য জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে তাহারা যেমন উপার্জ্জন করিতে জানে, তেমনি ব্যয় করিতেও জানে—তাহা সঞ্চয় করিবার জন্য তত ব্যস্ত নয় যেমন উপার্জ্জনের, তেমনি ব্যয়ের, নূতন নূতন পন্থা আবিষ্কারে তাহারা নিযুক্ত আছে—কিন্তু সে ব্যয় যে শুধু আপনার আরাম সুখ বর্দ্ধনেরই জন্য, নানা বিলাস বাসনেরই জন্য, তাহা নহে; দেশের ও দশের, অপরের, সুখ ও কল্যাণ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নানাপ্রকার নূতন জনহিতকর অনুষ্ঠানের ও সৃষ্টি সর্ব্বদা হইতেছে। বিবিধ দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা প্রমাণ করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। আর কাহারও জন্য সেরূপ কোনও প্রয়োজন থাকিলেও, সে বিস্তারিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া আমাদের উদ্দেশ্যের অন্তর্গত নহে। মার্কিণদেশীয়গণ ধর্ম্মার্থে কিরূপ অর্থ ব্যয় করিয়া থাকে, তাহার যে বিবরণ "ক্রিশ্চিয়ান রেজিষ্টার" নামক কাগজে বাহির হইয়াছে, তৎপাঠে আমাদের মনে যে চিন্তার উদয় হইয়াছে, সেদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই আমাদের উদ্দেশ্য। উক্ত পত্রিকা বলেন—

"বিগত বর্ষে মার্কিণদেশীয় লোকগণ স্বদেশে ও বিদেশে ধর্ম্ম-সংরক্ষণকল্পে ৬৪,৮০,০০,০০০, (চৌষট্টি কোটী আশী লক্ষ) ডলার (এক ডলার তিন টাকার সমান ধরা যাইতে পারে) ব্যয় করিয়াছে। ইহার মধ্যে ইউনাইটেড্ ষ্টুয়ার্ডসিপ কাউন্সিল যে পঁচিশটি বড় প্রোটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায়ের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ব্যতীত রোমান ক্যাথলিক ও য়িহুদি সম্প্রদায়ের দানও ধরা হইয়াছে। এই পঁচিশটি প্রোটেষ্টাণ্ট মণ্ডলী ১৯২৫ সনে প্রচার ও অন্যান্য জনহিতকর কার্য্যে ৮,৮৮, ৪৫,০০০ (আট কোটী অষ্টাশী লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার) ডলার, মণ্ডলীর কার্য্যে ৩৩,২৫,৫২,০০০ (তেত্রিশ কোটী পঁচিশ লক্ষ বায়ান্ন হাজার) এবং বিবিধ দানকার্য্যে ৪৫,১০,০০,০০০ (পঁয়তাল্লিশ কোটী দশ লক্ষ) ব্যয় করিয়াছেন। ইহা হইতে দেখা যায় বিগত ৫ পাঁচ বৎসরের মধ্যে ব্যয়, বিশেষ ভাবে মণ্ডলীর ব্যয়, অনেক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। য়িহুদিগণ ১,৮৫, ০০,০০০ (এক কোটী পঁচাশী লক্ষ) এবং রোমাণ ক্যাথলিকগণ ১৬,৮০,০০,০০০ (ষোল কোটী আশী লক্ষ) এবং অপর বিবিধ সম্প্রদায় ১,০৫,০০,০০০ (এক কোটী পাঁচ লক্ষ) ডলার প্রদান করিয়াছেন বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। প্যালেষ্টাইনের উন্নতিকল্পে যে ব্যয় হইয়াছে য়িহুদিদের হিসাবে শুধু তাহাই ধরা হইয়াছে। আর খৃষ্টীয়মণ্ডলীর হিসাবে শিক্ষা, দাতব্য (দরিদ্রের সাহায্য), এবং গির্জ্জা ও মন্দির নির্ম্মাণের জন্য যে সকল দান প্রদত্ত হইয়াছে তাহা ধরা হয় নাই। ষ্টুয়ার্ড-সিপ কাউন্সিল বলেন প্রটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে মেথডিষ্টগণ সর্ব্বাগ্রগণ্য। ১৯২৫ সনে উত্তর দক্ষিণ মিলিয়া তাহাদের দান মোটামুটি ভাবে ১৩,৫০,০০,০০০ (তের কোটী পঞ্চাশ লক্ষ) ডলার হইয়াছে। ব্যাপ্টিষ্টদের দান ৭,৬০,০০,০০০ (সাত কোটী ষাট লক্ষ), প্রেস্‌বিটেরিয়ানদের ৭,২৫,০০,০০০ (সাত কোটী পঁচিশ লক্ষ), এপিস্কোপালীয়ানদের ৩, ৯০,০০,০০০ (তিন কোটী নব্বই লক্ষ) কংগ্রেগেসনেলিষ্টদের ২,৬৫,০০,০০০ (দুই কোটী পঁয়ষট্টি লক্ষ) এবং ডিসাইপ্‌লস্ অব্ ক্রাইষ্টদের ২,০৬০০,০০০ (দুই কোটী ছয় লক্ষ) ডলার।"

ধর্ম্ম-বিষয়ে উদাসীন লোকের সংখ্যা সে দেশে যথেষ্টই রহিয়াছে। তাহারাও শিক্ষা, দরিদ্রের দুঃখমোচন বা অবস্থার উন্নতিসাধক নানা জনহিতকর কার্য্যে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া থাকে। সে সম্বন্ধে এখানে কিছুই বলা হয় নাই। আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, পূর্ব্বোক্ত তালিকাতে শিক্ষা, দরিদ্রদিগকে সাহায্যদান ও মন্দিরনির্ম্মাণ প্রভৃতি কার্য্যে ব্যয়িত টাকার কোনও উল্লেখ নাই। এই সকল কার্য্যে যে সাধারণতঃ অধিকতর অর্থ ব্যয় হইয়া থাকে তাহা বলাই বাহুল্য। মার্কিণ দেশের আয়ের তুলনায় এদেশের আয় যে কত অল্প তাহা আমরা ভালরূপেই অবগত আছি। সুতরাং তাহাদের ব্যয়ের সম্মুখে আমাদের ব্যয় নিতান্তই নগণ্য হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহারা তাহাদের আয়ের অনুপাতে যেরূপ ব্যয় করে, আমাদের আয় ব্যয়ে তাহার অনুরূপ অনুপাত রক্ষিত হয় কি না, সে বিচার করিয়া দেখিলে বোধ হয় অন্যায় হইবে না। তবে তৎসঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সর্ব্বাবস্থায় এই অনুপাতের সমতাকেই যদি বিচারের মানদণ্ডরূপে গ্রহণ করা হয় তাহা হইলে তাহা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত হইবে না। কারণ, জীবনরক্ষার জন্য যে ব্যয় অপরিহার্য্যরূপে আবশ্যক তাহা সকলের পক্ষেই প্রায় সমান এবং আয়ের অনুপাতানুযায়ী নহে বলিয়া, আয়ের এবং প্রয়োজনাতিরিক্ত আয়ের অনুপাত সর্ব্বত্র সমান নহে; অর্থাৎ অতিরিক্ত ব্যয়ের জন্য প্রাপ্ত আয়ের অনুপাত গ্রহণ না করিয়া শুধু আয়ের অনুপাত গ্রহণ করিলে নিশ্চয়ই গুরুতর ভ্রমে পতিত হইতে হইবে। আমরা এখানে সেরূপ সূক্ষ্ম গণনার কথা বলিতেছি না; তবে মোটামুটী বিচার করিলেই যথেষ্ট হইবে। আর আমাদিগকে খুব কঠোর ভাবে বিচার না করিয়া, যতদূর সম্ভব সদয় ভাব অবলম্বন করিলেও আমরা আপত্তি করিব না। তবে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, আমাদের আয় কম বলিয়াই যে আমরা সকল দোষ হইতে মুক্ত হইলাম, আমাদের কোনও ত্রুটি নাই মীমাংসিত হইয়া গেল, তাহা নহে। আয়ের অল্পতার জন্যও আমরাই

দায়ী, উহাও আমাদেরই ত্রুটির ফল। সে যাহা হউক, এ বিষয়ে আর অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। সমগ্র দেশের কথা আলোচনা করিবারও বিশেষ কোনও আবশ্যকতা নাই। আমাদের সমাজের বিষয়েই আমাদিগকে বিশেষ ভাবে চিন্তা ও আলোচনা করিতে হইবে। আমাদের সমাজের বিবিধ প্রতিষ্ঠানের জন্য আমরা যে অর্থব্যয় করিয়া থাকি, তাহা যে নিতান্তই অল্প, গণনীয়ই নয়, এবং উপযুক্ত অর্থাভাবে যে আমাদের অনেক কার্য্যই পণ্ড হইতেছে, আমাদের সকল আয়োজন পঙ্গু হইয়া রহিয়াছে, তাহা ত অতি স্পষ্টই দেখা যাইতেছে—সে বিষয়ে ত কাহারও কোনও প্রকার সন্দেহই থাকিতে পারে না। এখন প্রশ্ন এই, আমরা কি দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি, আমাদের দরিদ্রতাই ইহার একমাত্র বা প্রধান কারণ? আমরা কি বলিতে পারি, আমাদের আয়ের অনুপাতানুযায়ী অর্থ সমাজের কাজের জন্য পাওয়া যাইতেছে? অথবা, আপনার সুখ সুবিধা, আরাম বিলাস ব্যসনের জন্য আমরা যেরূপ অর্থ ব্যয় করিয়া থাকি, সমাজের কাজের জন্য তাহা অপেক্ষা অধিক বা তাহার সমান অথবা তাহার উপযুক্ত অনুপাতানুযায়ী অর্থ প্রদান করিতেছি? আমাদের মণ্ডলী যখন সন্ন্যাসীর সমাজ নহে, তখন ইহার কাজের জন্য প্রচুর অর্থেরই প্রয়োজন আছে। আর আমাদের উচ্চ ধর্ম্ম সংসারকে যে নূতন দৃষ্টিতে দেখিতে শিক্ষা দিয়াছে, তাহাতে কি আমরা সমাজের কার্য্যে অর্থব্যয়কে অপরের জন্য কৃত শুধু একটা দয়ার কার্য্য—এমন একটা মহদনুষ্ঠান মাত্র, যাহা করিলে ভাল হয়, না করিলেও বিশেষ কিছু ক্ষতি নাই—মনে করিতে পারি? ইহা কি আমাদের আপনার উন্নতি ও কল্যাণের জন্য, প্রকৃত আনন্দ ও সুখের জন্য, বিশ্altবিধাতা-নির্দ্দিষ্ট অলঙ্ঘনীয় কর্ত্তব্য বলিয়া জানিতে পারি নাই? ইহারা কি আমাদের ধর্ম্মের অপরিহার্য্য অঙ্গ নহে? তবে এরূপ হয় কেন? তুলনা করিয়া দেখিতে গেলে, কল্যাণকর বিষয়ে, ধর্ম্ম কার্য্যে, ব্যয় সর্ব্বাপেক্ষা কম হয় কেন? ব্যয় ত আমরা কম করি না! কৃপণের ন্যায় সঞ্চয় আমাদের মধ্যে বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায় না। বরং আরাম ও বিলাসের জন্য ব্যয়টা কিছু অতিরিক্তই দেখা যায়। আমরা কোথায় ডুবিয়াছি, কেন টাকার অভাব হয়, তাহা একবার গভীর ভাবে চিন্তা ও পরীক্ষা করিয়া দেখা নিতান্তই আবশ্যক হইয়াছে। শুধু টাকার অভাবেই সমস্ত কার্য্য নষ্ট হইতেছে, টাকা হইলেই সমস্ত কাজ সুসম্পন্ন হইবে এবং প্রচুর পরিমাণে টাকা প্রদান করিলেই আমাদের কর্ত্তব্য সুনির্ব্বাহিত হইবে, উন্নতি ও কল্যাণ লব্ধ হইবে, আমরা এরূপ মনে করি না। আমাদের কর্ম্মীদের ভরণ পোষণের জন্য উপযুক্ত অর্থের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে সন্দেহ নাই। তাঁহারা সকলেই পরিবারবর্জ্জিত সন্ন্যাসী হইবেন, এরূপ আমরা কল্পনাও করিতে পারি না।—ইহা আমাদের আদর্শেরই বিরোধী। কিন্তু তাই বলিয়া প্রচুর অর্থ প্রদান করিয়া, বহু সংখ্যক লোক নিযুক্ত করিলেই যে আমাদের কার্য্য উপযুক্ত রূপে সম্পাদিত হইবে, আমরা এরূপও মনে করি না। এই উপায়ে হয়ত আমরা এক শ্রেণীর সুশিক্ষিত কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সুগায়ক, সুবক্তা, সুলেখক, [illegible] পাইতে পারি; তাহা হইলেও তাহাদের দ্বারা কার্য্য সুনির্ব্বাহিত হইবে না। এই উপায়ে অন্য কাজ চলিতে পারে, বিষয় বাণিজ্য চলিতে পারে, ধর্ম্মমণ্ডলীর কাজ চলিতে পারে না। অবান্তরকে প্রধান স্থান দিলে, প্রাণহীন দেহকে মানুষের স্থানে বসাইয়া দিলে, যাহা হয়, এক্ষেত্রে তাহাই হইবে। ধর্ম্মকে সর্ব্বোপরি স্থান না দিলে—বাহিরে নয়, কিন্তু অন্তরে, প্রকৃত সন্ন্যাসী না হইলে—ধর্ম্মসমাজের কার্য্য চলিতে পারে না। পূর্ব্বকালে দান প্রভৃতি বাহ্যিক অনুষ্ঠানের অলৌকিক শক্তিতে মানুষের যে বিশ্বাস ছিল তাহা যে নিতান্তই ভ্রান্ত, কার্য্যের মূল্য যে মৃত যন্ত্রের ন্যায় কাজ করিয়া যাওয়ার উপর নির্ভর করে না, যে ভাবের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া কার্য্য করা হয় তাহারই উপর নির্ভর করে, তাহা আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। সুতরাং শুধু প্রচুর অর্থদান দ্বারাই যে উন্নতি ও কল্যাণ, প্রকৃত আনন্দ ও সুখ লাভ করা যায় না, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। "অর্থ ব্যতীত কোন কাজ হয় না," কথাটা সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও "টাকা হইলেই সব হয়" ইহা কখনও সত্য নয়—প্রচুর অর্থ ব্যয়েও অনেক বিষয়ে সিদ্ধি লাভ করা সম্ভবপর হয় না। টাকা ভিন্ন আরও কিছু চাই। এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে আমরা সাধারণতঃ "অর্থ" বলিতে "মুদ্রা" বা "টাকা" অথবা সোণা রূপা মণি মুক্তা প্রভৃতি বুঝিলেও, "অর্থনীতি" শাস্ত্র এ সকলকে প্রকৃত "অর্থ" বলে না। তাহারা অর্থের নিদর্শন রূপে বিনিময়ে ব্যবহৃত হয় বটে, অনেক সময়ই, কিন্তু সকল সময় নয়, উহাদিগকে অর্থের নিদর্শন বলিয়া গ্রহণ করা যায় সন্দেহ নাই, তথাপি উহারা "অর্থ" নয়। শ্রমোৎপন্ন জিনিষ বা প্রয়োজনীয় বস্তু অথবা আরও সত্যরূপে তৎ উৎপাদনের শক্তিকেই 'অর্থ' বলে; সুতরাং অর্থ বা সম্পত্তি বলিতে প্রকৃত পক্ষে কার্য্য করিবার শক্তিই বুঝায়। এই জন্য মানুষই—শ্রমশীল, কর্ত্তব্যপরায়ণ, বুদ্ধিসম্পন্ন, চরিত্রবান মানুষই—সর্ব্বপ্রধান জাতীয় সম্পত্তি। এরূপ মানুষ যে দেশে যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে, তাহাদের কখনও বাহ্যিক অর্থের অভাব হয় না, তাহারা সহজেই অর্থের অভাব দূর করিতে, অর্থোৎপাদন করিয়া দেশকে সম্পৎশালী করিতে সমর্থ হয়। আর যে সকল কার্য্যে টাকার প্রয়োজন হয় না, বুদ্ধি মনের ও চরিত্রের শক্তিই আবশ্যক হয়, সে সকল কাজ ত একমাত্র ইহাদের দ্বারাই সম্পাদিত হইতে পারে। সুতরাং সমাজের কার্য্যে যথোপযুক্ত শক্তি ও সময় ব্যয় করিলেও অর্থ সাহায্যই করা হয়—বরং অনেক স্থলে টাকা অপেক্ষাও অধিক মূল্যবান অর্থই প্রদান করা হয়। তাহাতে উভয় পক্ষেরই অধিকতর কল্যাণও সাধিত হয়। ধর্ম্মসমাজের কার্য্য সুসিদ্ধ করিবার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বস্তু কি, ধর্ম্মমণ্ডলীর পক্ষে সকলের চেয়ে বড় অভাব কোন্‌টা, তাহা এখন সহজেই অনুমিত হইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত গুণসম্পন্ন লোক সকল সমাজের জন্যই অবশ্য আবশ্যক। কিন্তু ধর্ম্মসমাজের পক্ষে উহাই যথেষ্ট নয়। সর্ব্বোপরি তাহাদিগের ধার্ম্মিক হওয়া একান্ত আবশ্যক। ধার্ম্মিক লোকই ধর্ম্মসমাজের প্রকৃত সম্পত্তি। ধর্ম্মধনই প্রকৃত ধন, তাহা অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান 'ধন' বা 'অর্থ' আর কিছু নাই। তাহার অভাবে ধর্ম্মমণ্ডলীর কার্য্য কোনও রূপেই সুচারু ভাবে

নির্ব্বাহিত হইতে পারে না। আর এরূপ যথেষ্ট লোক থাকিলে কখনও 'অর্থের' বা টাকার অভাব হইবে না, সহজেই অর্থ সংগৃহীত হইবে এবং কখনও অর্থের অসদ্ব্যবহারও হইবে না, পূর্ণ সদ্ব্যবহারই হইবে। মানুষ হইলে টাকার অভাব কখনও থাকে না। সুতরাং এ বিষয়েই আমাদিগকে সর্ব্বোপরি মনোযোগী হইতে হইবে প্রধান ভাবে এই প্রকৃত 'অর্থ' অর্জ্জনের ও তাহার সদ্ব্যবহারের চেষ্টায়ই আমাদের প্রত্যেককে ও সমগ্র সমাজকে নিযুক্ত হইতে হইবে। তাহা হইলে আবশ্যকীয় টাকারও কোনও অভাব হইবে না। এ দিকে আমাদের সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হউক। মঙ্গলময় বিধাতা আমাদিগকে সে শুভবুদ্ধি ও শক্তি প্রদান করুন। আমরা তাঁহার অনুগত জীবন লাভ করিয়া সকলে কৃতার্থ হই। তাঁহার ইচ্ছাই জয়যুক্ত হউক।

ব্রাহ্মধর্ম্মই মিলনের ভূমি।

আমি যখন বরিশালে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম,—তখনও আমি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করি নাই, হিন্দু ধর্ম্মেই আস্থা ছিল, কিন্তু মনের ভাব ও চিন্তা অনেকটা উদার হয়েছিল; হিন্দু দেবতার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করিতাম না বটে, কিন্তু "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণঃ রূপকল্পনা", এই শ্লোকের অনুপ্রাণনায় মনে করিতাম, যে যে-ভাবেই পরমেশ্বরকে ডাকে তাঁর কাছে সেই ভাবেই, সেই রূপেই, তিনি প্রকাশিত হন—তখন আমি হিন্দু মন্দির হউক, খৃষ্টান গির্জ্জাই হউক, মুসলমান মসজিদই হউক, কিম্বা ব্রাহ্মসমাজের উপাসনামন্দিরই হউক, সর্ব্বত্রই নানা ভাবে ঈশ্বরের উপাসনা হয় বলিয়া প্রণাম করিতাম। বন্ধুগণ তাহাতে কেহ ঠাট্টা করিত, কেহ প্রশংসাও করিত; কিন্তু আমি চলিতে চলিতে কোনও ধর্ম্মমন্দির নিকটে পড়িলেই সেখানে প্রণাম করিতাম। ক্রমে ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোক প্রাপ্ত হ'লাম। এক সত্যস্বরূপ দেবতার সাক্ষাৎ ও আধ্যাত্মিক উপাসনাই জীবনের লক্ষ্য, ইহা বুঝিতে পারিলাম। এই ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোকে নূতন দৃষ্টি লাভ করিলাম, জগৎ নূতন চক্ষে দেখিতে লাগিলাম, মানুষকে নূতন ভাবে গ্রহণ করিতে লাগিলাম, সম্পর্কগুলি নূতন ভাব ধারণ করিল, নানা ধর্ম্মসম্প্রদায় ও তাহাদের মত বিশ্বাস উপাসনা-প্রণালী নূতন দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলাম। প্রাণ অনেকটা উদার হলো, বিশ্বজগৎ নূতন হলো। এই ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোকে মন্দির ও মসজিদ, গির্জ্জা ও বৌদ্ধবিহার, সকলই পবিত্র বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তখন মন্দির কিম্বা মসজিদের নিকট প্রণাম করা পরিত্যাগ করিলাম বটে, কিন্তু মন্দির হউক, কি মসজিদই হউক, কিম্বা অন্য কোনও স্থানই হউক, যেখানেই মানুষ ভক্তির সহিত দেবতার চরণে প্রাণের প্রীতি জ্ঞাপন করে, সেই স্থানই পবিত্র, সেই স্থানেই দেবতার আবির্ভাব হয়, মনে করিতে শিখিলাম। হয়ত অনেক কুসংস্কার আছে, অনেক কুপ্রথা আছে, সময় সময় দুর্নীতিও আছে—দুর্নীতি সর্ব্বতোভাবে দূর করিতে হইবে, তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিতে হইবে; নানা ভাবে কুপ্রথা ও কুসংস্কার মানবের মন হইতে দূরীভূত করিয়া ধর্ম্মকে শুদ্ধ ও নির্ম্মল করিতে হইবে—কিন্তু তথাপি যেখানে মানুষ, যে ভাবেই হউক, ভগবানের চরণে আত্মনিবেদন করে, সেখানেই শ্রদ্ধা অর্পণ করিতে হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোকে এই শিক্ষা লাভ করিলাম।

বর্ত্তমান সময়ে দেশের সম্মুখে কতকগুলি ভিন্ন সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। এই সকল সমস্যা সমাধান করিতে না পারিলে দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধন দুরূহ ব্যাপার হইবে। আজ যে সকলেই স্বরাজ লাভের জন্য ব্যাকুল, সে স্বরাজ সাধন করিতে হইলেও, এই সকল সমস্যার সমাধান হওয়া চাই। এই যে সাম্প্রদায়িক কলহ, হিন্দু-মুসলমানে বিবাদ, এই যে অস্পৃশ্যতা, এই যে নারীর প্রতি অত্যাচার, এই যে পানদোষ, এই যে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব হেতু বিলাস-বিভ্রমে প্রমাদ, এই সকল দূর করিতে হইবে। কিন্তু দেশের নেতৃবৃন্দ কোন রকমেই এই সকল দূর করিতে পারিতেছেন না। কি করিলে দেশকে একপ্রাণতা-সূত্রে আবদ্ধ করা যায়, সকল দুর্নীতি ও কুসংস্কার, অপ্রেম বিদ্বেষ দূর করিয়া, দেশকে উন্নতির পথে, স্বরাজের পথে, লইয়া যাওয়া যায়, মহাত্মা গান্ধি প্রমুখ দেশসেবকগণ রাজনৈতিক মতদ্বৈধ নির্ব্বিশেষে সকলেই এই বিষয় চিন্তা করিতেছেন। কিন্তু কিছুতেই সমস্যার সমাধান করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। স্থানে স্থানে হিন্দু মুসলমানে কি ভীষণ দাঙ্গাই উপস্থিত হইতেছে! বর্ত্তমানেই এই কলিকাতা নগরীতে, বঙ্গের রাজধানীতে, কি অরাজক কাণ্ড দেখিলাম! মসজিদের সম্মুখ দিয়া ভিন্ন সম্প্রদায়ের মিছিল যাইতেছে; তাহাতে বাদ্য বাজনা বন্ধ হবে কি হবে না, এই ত গোল-যোগের কারণ। আর এই সামান্য কারণে দাঙ্গা উপস্থিত হইল। কেবল সেই স্থানে নয়, সেই দাঙ্গা কলিকাতার সর্ব্বত্র, সহর-তলীতে পর্য্যন্ত, ব্যাপ্ত হইল,—মসজিদ ভাঙ্গিল, মন্দির ভাঙ্গিল, বিগ্রহ ভাঙ্গিল, মসজিদে দেবমূর্ত্তি বসান হইল! একে অন্যের রক্তপাত করিল; ভাই ভাইএর রক্তে হস্ত কলুষিত করিল; নির্ব্বিরোধ পথিক হত ও আহত হইল; বাড়ী দোকানপাট লুঠ হইল! কথায় বলিত, কুকুর বিড়ালের মত মানুষকে ব্যবহার করে; আজ দেখছি, কুকুর বিড়ালকেও মানুষ কত আদর করে, কিন্তু মানুষ মানুষকে আদর করতে পারিল না! প্রতিবেশী প্রতি-বেশীকে হত্যা করিতে উদ্যত হইল! কি ভীষণ ব্যাপার! এ কয় দিন কি দেখিলাম! প্রাণে কি বেদনা পাইলাম! দাঙ্গাকারি-গণ জয়োল্লাস করিতে পারেন; কিন্তু যাদের প্রাণ আছে, যাদের মনুষ্যত্ব আছে, যাদের দেশপ্রীতি আছে, যাদের সত্যস্বরূপ ঈশ্বরে ভক্তি আছে, তাদের প্রাণ কি কেঁদে উঠে না? ধর্ম্মের নামে রক্তারক্তি প্রাচীন কালে হয়েছে। কিন্তু আমরা বলি বর্ত্তমান যুগ উদারতার যুগ, বর্ত্তমান যুগে ধর্ম্মের জন্য রক্তপাত হয় না। কিন্তু, আজ কি দেখ্‌ছি? এই হিন্দু মুসলমান, কত শতাব্দী ধ'রে একত্রে বাস কচ্ছে, পরস্পরকে আত্মীয় স্বজন, দাদা, খুড়া, চাচা, ভাই, ব'লে সম্বোধন করেছে,—অনেক মুসলমানের ভিতরে হিন্দুর রক্ত প্রবাহিত হইতেছে,—

বর্ষশেষ ও নববর্ষোৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস কর্তৃক ৩০শে চৈত্র প্রাতঃকালীন উপাসনায় প্রদত্ত উপদেশ।

তাদের মধ্যে এই ভাব! এই বিদ্বেষ ভাব ভারতের সর্ব্বত্র ক্রমেই বাড়িতেছে। মহাত্মা গান্ধি এই দুঃখে একবিংশতিদিনব্যাপী অনশন-ব্রত গ্রহণ করেছিলেন; তার পর মিলনসভা হলো, কিন্তু ফল ত বিশেষ কিছু হলো না।

আবার ঐ যে অস্পৃশ্য জাতি রয়েছে—কোটি কোটি লোককে হীন ক'রে রাখা হয়েছে; তাদের ছায়াতেও তথাকথিত উচ্চ বর্ণের হিন্দুর পাপ হয়, তারা নগরপ্রান্তবাসী—তাদের কূপে জল লইবার অধিকার নাই, স্কুলে পড়িবার অধিকার নাই, রাস্তায় চলিবার অধিকার নাই। এমন কি দেব মন্দিরে প্রবেশ করিলে দেবতাও জাতিচ্যুত হয়! এক দুর্গাপূজা ব্রাহ্মণেও করে, নমঃশূদ্রেও ক'রে। কিন্তু ব্রাহ্মণের দুর্গামণ্ডপে নমঃশূদ্র উঠিতে পারে না। দুর্গাও কি দুই জন? মানুষ মানুষকে হীন ক'রে, অস্পৃশ্য ক'রে রেখেছে। কেবল কি এই দেশেই এরূপ ব্যবস্থা? ঐ আমেরিকায় যাও, নিগ্রোর প্রতি কি ব্যবহার! ঐ আফ্রিকায় যাও, ভারতবাসীর প্রতি কি ব্যবহার! অথচ সকলেই সভ্যতাভিমানী; সকলেই প্রেমের ধর্ম্ম প্রচার করেন; বেদ, বাইবেল, কোরাণের শিষ্যগণ, আর্য্য ঋষি, মহর্ষি ঈশা, হজরত মহম্মদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াও এইরূপ মানুষের প্রতি অমানুষিক ব্যবহার করিতেছে।

নারীজাতিকে এখনও হীন করিয়া রাখা হইতেছে; তাহাদের শিক্ষা ও স্বাধীনতার কথা শুনলে এখনও শিক্ষিত ব্যক্তিগণও শিহরিয়া উঠেন। এখনও তাহাদের উপর কত উৎপীড়ন, নির্য্যাতন হইতেছে! রাজদ্বারে কয়টি ঘটনা উপস্থিত হয়? নীরবে কত নারী গৃহে কত উৎপীড়ন সহ্য করেন—নীরবে ক্রন্দন করেন এবং অনেকে অত্যাচার সহিতে না পারিয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাদের দুঃখের কাহিনী, বেদনার ইতিহাস, কেহ জানিল না, কেহ তাদের জন্য এক ফোঁটা অশ্রু পাত করিল না! আবার এই যে দুর্ব্বৃত্তদের হাতে কত নারী নির্য্যাতিত হইতেছে! শুভসঙ্কল্প ব্যক্তিগণের চেষ্টায়, গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে, তাহাদিগকে উদ্ধার করা হলো, দুর্ব্বৃত্তগণ শাস্তি পাইল; কিন্তু নিরপরাধিনী হতভাগিনীগণ এখন দাঁড়ায় কোথায়! তাদের অপরাধ নাই—দুর্ব্বৃত্তগণ তাদের অনিচ্ছায় তাদের প্রতি অত্যাচার করেছে—কিন্তু তুমি পিতা, তুমি ভাই, তুমি স্বামী, আজ তাহাকে গ্রহণ করিতে নারাজ! তুমি স্ব ইচ্ছায় দশ জনের সমক্ষে কত দুষ্কার্য্য করিতেছ, কলঙ্কিত জীবন যাপন করিতেছ, তবুও তুমি সমাজপতি, আজ ঐ হতভাগিনীদিগের বিচারক হইয়া তুমিই তাহাদিগকে নরকে ডুবিবার পথ পরিষ্কার করিয়া দিতেছ! সমাজ—এই সমাজ, যে উৎপীড়িত লাঞ্ছিতকে রক্ষা করিতে পারে না, সেই সমাজ—কেমন করিয়া বাঁচিবে? তোমরা আর্য্যত্বের গর্ব্ব কর—তোমরা কি সত্যকাম জাবালীর উপাখ্যান পড়িয়াছ? সেই আর্য্যত্বের গৌরবের সময় মানুষ মানুষকে তুলিয়া ধরেছে, যে একবার পড়েছে, তাকে হাত ধ'রে তুলেছে। পাপকে প্রশ্রয় দেয় নাই, কিন্তু পাপীকে পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পুণ্য জীবন লাভ করিবার সুযোগ দিয়াছে। এইরূপ দেশের অনাচার অবিচার, বিদ্বেষ অপ্রেমের কাহিনী আর কত বলিব?

দেশকে, মানবসন্তানকে, এই সকল দুর্নীতি অত্যাচার, বিদ্বেষ অপ্রেম, পাপ কুসংস্কার হইতে মুক্ত করিবার জন্যই মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের ভিতর দিয়ে স্বয়ং ভগবান্ এই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রেরণ করিয়াছেন একবার যদি সত্যস্বরূপ প্রেম পুণ্যের আধার পরমেশ্বরকে স্বীকার কর, একবার যদি তাঁহার সাক্ষাৎ আধ্যাত্মিক উপাসনা জীবনের সম্বল ব'লে গ্রহণ কর, একবার যদি তাঁহাতে প্রীতি ও তাঁহার প্রেমদ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া, তাঁহার প্রিয়কার্য্য অনুভব করিয়া, মানবের কল্যাণসাধনই প্রকৃত ধর্ম্মের মূলমন্ত্র—প্রকৃত উপাসনা—বলিয়া স্বীকার কর, তবে দেখিবে সকল সমস্যার মীমাংসা হবে, সকল দ্বন্দ্ব ও অপ্রেম ঘুচে যাবে, সকল অত্যাচার অবিচার দূর হবে পুণ্য শান্তি প্রেম বিরাজ করিবে—দুঃখীর অশ্রু ঘুচিবে. অত্যাচারিত নিপীড়িত নির্য্যাতিত যারা, তারা আশ্রয় লাভ করিবে, পাপে পড়েছে যারা, তারা পুণ্য পথে যাইবার, পুণ্য জীবন লাভ করিবার, সুযোগ ও সুবিধা পাইবে।

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ—এই বিশ্বচরাচরে যা কিছু আছে, সমস্তই ঈশ্বরদ্বারা আচ্ছাদিত; সুতরাং যেদিকে তাকাই সে দিকেই ব্রহ্ম; বৃক্ষ লতা চন্দ্র তারা, মনুষ্য পশু পক্ষী, নদ নদী, পর্ব্বত, ফুল ফল, ব্রহ্মেরই প্রকাশ। সকল জিনিষ পবিত্র, সকল স্থান পবিত্র—সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং— ই এই সুবিশাল বিশ্ব ব্রহ্মেরই পবিত্র মন্দির। এই ভাব যদি হৃদয়ে ধারণা করা যায়, এই ভাব দ্বারা যদি অনুপ্রাণিত হওয়া যায়, ব্রহ্ম যে অন্তর ও বাহির সমস্ত পূর্ণ ক'রে রয়েছেন, তাহা যদি উপলব্ধি করা যায়, তবে অপ্রেম বিদ্বেষ আর কেমন ক'রে থাকিবে? সর্ব্বত্রই ত ব্রহ্মের মন্দির; বিশেষ ভাবে যে স্থানে তাঁহার উপাসনা হয়, যে স্থানে দশ জনে একত্রিত হ'য়ে, যে-ভাবেই হউক, তাঁহার নাম করে, যে স্থানে তুমি আমি যাই আর না যাই, তোমার আমার নিকটও, প্রত্যেকের নিকটই, তাহা পবিত্র। আমরা এক ব্রহ্মের সাক্ষাৎ ও আধ্যাত্মিক উপাসনা কর্‌বার জন্য এই মন্দিরে সমবেত হই: ইহা পবিত্র স্থান, ব্রহ্মসত্তায় পরিপূর্ণ। দেবমন্দির, কিম্বা গির্জ্জা, কিম্বা মস্‌জিদে যে ভাবে উপাসনা হয়, তাহার সমস্তটা আমরা সমর্থন করি না; তাহার ভিতরে অনেক কুসংস্কার আছে ব'লে মনে করি; সত্যস্বরূপ নিরাকার, প্রেম জ্ঞান ও পুণ্যের আধার, পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ ও আধ্যাত্মিক পূজা যে ভাবে করিতে হয়, সেভাবে সেখানে পূজা হয় না। অনেক স্থানে বাহ্য উপকরণে কল্পিত মূর্ত্তির পূজা হয়। অনেক স্থলে পশুবলি ধর্ম্মের অঙ্গ ব'লে বিবেচিত হয়; অনেক স্থলে ধর্ম্মের নামে দুর্নীতি কুরীতি প্রশ্রয় পায়। কিন্তু সে যাহাই হউক, সেখানেও যখন দেখি মানুষ নিষ্ঠার সহিত ভগবানের অর্চ্চনার জন্য সমবেত হইয়াছে,—মস্‌জিদে শত লোক, সহস্র লোক, ঈশ্বরের চরণে সমবেত হইয়াছে, মন্দিরে কত লোক ব্যাকুলচিত্তে উপাস্য দেবতাকে হৃদয়ের প্রীতির অঞ্জলি দিতেছে, দেব বিগ্রহের দিকে তাকাইয়া আছে, দুই চক্ষে অশ্রুধারা বহিতেছে, কত কষ্ট ক'রে লোকে ধর্ম্মের জন্য তীর্থস্থানে গমন করিতেছে; গির্জ্জায় ঈশ্বরের নামে শত শত লোক সমবেত হইয়া তাঁহারই গুণগান করিতেছে—তখন তোমার আমার হৃদয়েও

ভাবের সঞ্চার হয় এবং ঐ সকল স্থান পবিত্র বলিয়া মনে হয়। সুতরাং যে ঈশ্বরের প্রকৃত উপাসক, তাহার পক্ষে কোনও উপাসনাস্থান অপবিত্র করা, ভগ্ন করা, সম্ভাপর নহে। এমন কি, এই যে আমাদের মন্দির, পবিত্র মন্দির, ঈশ্বর না করুন, যদি কেহ ভাঙ্গিতে আসে, অপবিত্র কর্‌তে আসে, হয়ত প্রাণ দিয়াও ব্রাহ্মগণ তাহা রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবেন; যদি না পারেন, যদি ইহা ভেঙ্গে যায়, তবুও এরূপ মতি হবে না, এরূপ ইচ্ছা জাগ্‌বে না যে, অন্যের মন্দির যেয়ে হিংসাবশে অপবিত্র করি বা ধ্বংস করি। যার প্রাণে ধর্ম্ম আছে, ঈশ্বরনিষ্ঠা আছে, সে কখনও কোনও ধর্ম্মমন্দির অপবিত্র বা ধ্বংস করিতে পারে না সে অনেক উৎপীড়ন সহ্য করে, কিন্তু উৎপীড়ন করে না। ধর্ম্মের যে আস্বাদ পেয়েছে, সে কোন ভজনালয়কেই অপবিত্র করিতে, ধ্বংস করিতে পারে না। ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম কুসংস্কার সঙ্কীর্ণতাকে মানুষ প্রশ্রয় দেয়, ধর্ম্মের নামে হিংসা বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হয়, ধর্ম্মের আবরণে মানবের পশুবৃত্তিকে চরিতার্থ করিতে চায়, ধর্ম্মের সার ভুলিয়া অসার আড়ম্বর, খোসা, লইয়া মানুষ ঝগড়া করে। বেদ বাইবেল কোরাণ প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ কর, দেখিবে, মূলমন্ত্র এক—এক ঈশ্বরের সাক্ষাৎ ও আধ্যাত্মিক উপাসনা। বহিরাবরণে, অবান্তর বিষয়ে, উপাসনার প্রণালীতে, ভেদ আছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবর্ত্তক রাজা রামমোহন রায় সকল শাস্ত্র পড়িয়া এই একত্ব, মূলে ঐক্য, দেখিয়াছিলেন। আমরাও সেই উদার বিশ্বজনীন ধর্ম্মের আস্বাদ পাইয়া, সকল ধর্ম্মাবলম্বীর প্রতিই প্রীতি অর্পণ করিতে, সকলকেই আপনার বলিয়া গ্রহণ করিতে, অগ্রসর হইতেছি। সুতরাং এই উদার ধর্ম্মের আলোক যদি লোক পায়, হিন্দু মুসলমান ও খৃষ্টানগণও যদি উদার ভাবে ধর্ম্মের মূল ভিত্তি লক্ষ্য করেন, তবে ধর্ম্মে ধর্ম্মে বিরোধ থাকে না। ভজনালয়ের নিকট বাদ্য বাজান কি না বাজান, ধর্ম্মের অবান্তর বিষয় মাত্র; কোনও বিশেষ পশু বলি দেওয়া কি না দেওয়া, অতীব বাহিরের অঙ্গ। ধর্ম্মের সার ভক্তি প্রীতি ও প্রিয়কার্য্য-সাধন।

মানুষ মানুষকে হত্যা করে! মানুষের ভিতরে ব্রহ্ম, প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ে ব্রহ্ম বিরাজ করিতেছেন। মানুষ মানুষের ভাই; হিন্দু মুসলমান, খৃষ্টান সকলের ভিতরেই ত ব্রহ্ম বিরাজিত, সকলেই পরস্পরের ভাই। এই কথা ভুলিয়া গিয়া, মানুষের মধ্যে যে ব্রহ্মের স্ফুরণ তাহা না দেখিয়া, মানুষ মানুষের রক্তপাত করিতে প্রবৃত্ত হয়, ধর্ম্মের নামে ধরাতে নরক প্রতিষ্ঠিত করিতে যায়। প্রকৃত ভাবে দেখ, মানুষের মধ্যে ব্রহ্মের স্ফূর্ত্তি দেখ, ভাইকে ভাই ব'লে চেন, আর ভাইএর বক্ষে ছুরিকাঘাত করিতে, ভাইএর মস্তকে লাঠি তুলিতে, ভাইকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিতে, ইচ্ছা করিবে না। মানুষের মধ্যে ব্রহ্মের স্ফূর্ত্তি দেখিতে না পাইয়াই, এক শ্রেণীর লোক অপর শ্রেণীকে হীন অস্পৃশ্য করিয়া রাখিয়াছে। মানুষ ব্রহ্মের সন্তান, ব্রহ্ম তার প্রাণে বিরাজিত। সে হীন! সে অস্পৃশ্য! ব্রহ্মকে দেখ, তাঁর প্রকাশ দেখ, অস্পৃশ্যতা দূর হবে, জাতিভেদ, বর্ণভেদ দূর হবে; ব্রাহ্মণ ও পারিয়াতে ভেদ, শ্বেত কৃষ্ণেতে ভেদ, উচ্চ জাতি নিম্ন জাতির ভেদ, দূর হবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম মহা মিলন-কেন্দ্র! এই ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোকে দেখ্‌বে সকলে তোমার ভাই বোন; কেহ অস্পৃশ্য নয়, কেহ হীন নয়, ছোট নয়। মানুষে মানুষে পার্থক্য আছে—তাহা জ্ঞান, প্রেম পুণ্যে। কে কোন্ কূলে জন্মিল, কে শ্বেত হইল, কি কৃষ্ণ হইল, ব্রাহ্মণ হইল কি শূদ্র হইল, তাহাতে আসে যায় না। যাঁর হৃদয়ে প্রেম পুণ্য জ্ঞান আছে, যে মানবের সেবা করে, সে-ই ব্রাহ্মণ। এই তত্ত্ব না বুঝিয়া মানুষ মানুষকে হীন অস্পৃশ্য ক'রে রেখেছে, সকল সুখে বঞ্চিত ক'রে রেখেছে। কুকুর বিড়ালকে যতটা আদর করে, মানুষ মানুষকে ততটা আদর করে না। এ কি অবস্থা! একবার চক্ষু মেলিয়া দেখ, ব্রহ্মের স্ফূর্ত্তি দেখ, সকল মানুষ সুন্দর হবে, উজ্জ্বল হবে, আপনার ভাই ব'লে বোধ হবে।

নারীজাতিকেও মানুষ হীন চক্ষে দেখে; তাহারা যেন পুরুষের সুখ সুবিধা, পুরুষের কামনাচরিতার্থের জন্যই জন্মেছে! নারী পবিত্র, নারীর হৃদয়ে ব্রহ্ম। ব্রাহ্মধর্ম্ম তাঁহাকেও উন্নত অধিকার দিয়াছেন, তাঁহাকেও উচ্চ আসনে বসাইয়াছেন। কত নির্য্যাতিত নারীকে তুলিয়া লইয়া স্বর্গের অধিকার দিয়াছেন! মানুষ ভুল করে, ভ্রান্তি করে; কত বার পড়ে, কত বার উঠিতে চেষ্টা করে! তাহাকে চাপিয়া মারিও না, তাহাকে হাত ধরিয়া তোল। ঈশ্বর ত কাহাকেও তাঁহার প্রেমে বঞ্চিত করেন না! তুমি আমি কত অপরাধ করি! তিনি তাহা ক্ষমা করেন। তুমি আমি কত অপরাধ করি! তবুও সমাজ আমাদিগকে বক্ষ হইতে তাড়াইয়া দেয় না; ঈশ্বরের প্রেমেও বঞ্চিত হই না। পিতা মাতার স্নেহ ত তখনও তোমাকে আমাকে টানিয়া রাখে! আর নারীকে তুমি নির্য্যাতন করিবে? যে উৎপীড়িত তাহাকে কোলে তুলিয়া লইবে না? সে হয়ত এক বার ভ্রম করেছে, তাহাকে পুণ্য জীবন লাভ করিবার সুবিধা দিবে না! তাহাকে অতলে ডুবাইয়া দিবে! এই তোমার ধর্ম্ম, এই তোমার সমাজ! এই ভাবেই দেশ উদ্ধার কর্‌বে! এই ব্রাহ্মধর্ম্ম নারীর শিক্ষা ও স্বাধীনতার ব্যবস্থা করেছেন; নারীকে উচ্চ পদবীতে তুলিয়াছেন। কত নির্য্যাতিতা উৎপীড়িতাকে আশ্রয় দিয়া পবিত্র জীবন লাভে সহায়তা করিয়াছেন! যে প'ড়ে গিয়াছে তাহাকে হাত ধরিয়া তুলিয়াছেন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম কত দুর্নীতি, কত কুনীতি, কত কুসংস্কার দূর করিতে প্রাণপণ সংগ্রাম করেছেন! অনেকে সে ইতিহাস পড়েন না। এই স্ত্রী শিক্ষা ও স্বাধীনতার জন্য, এই জাতিভেদ দূর করিবার জন্য, এই ব্রহ্মের সাক্ষাৎ ও আধ্যাত্মিক পূজা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, এই দেশের রাজনৈতিক সামাজিক উন্নতি সাধন করিবার জন্য, সুরাপান, ধূমপান নিবারণের জন্য, নিরক্ষরকে শিক্ষা দানের জন্য, কত সংগ্রাম করেছেন; কত লাঞ্ছনা সহ্য করেছেন,—সমাজ হইতে তাড়িত হয়েছেন, পিতা মাতার স্নেহে বঞ্চিত হয়েছেন, দরিদ্রতাকে বরণ করিয়া লইয়াছেন। আজ অনেকে সে কাহিনী জানেন না। আজ দেশ যতটা জাগ্রত হইয়াছে, তাহা যে প্রাচীন ব্রাহ্মগণের সংগ্রাম, সাধনা, ত্যাগ ও নির্য্যাতন সহিবার ফল, তাহা ব্রাহ্ম সন্তানগণের মধ্যেও সকলে জানেন না। ইতিহাস পাঠ কর—ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস, ব্রাহ্ম জীবনের ইতিহাস, পাঠ কর—ব্রাহ্ম বলিয়া গৌরব অনুভব করিতে পারিবে।

এই ব্রাহ্মধর্ম্ম যদি আমরা লোকের দ্বারে দ্বারে প্রচার করতে পারতাম, লোককে যদি এই পরিত্রাণপ্রদ ধর্ম্মের আস্বাদ দিতে পারতাম, নিজেরা যদি প্রকৃত ব্রাহ্ম জীবন লাভ করিয়া অপরের কাছে সুধার ভাণ্ড লইয়া যাইতে পারিতাম, লোকসকল ব্রাহ্ম না হউক, তাহাদের দৃষ্টি ফিরিত, মন উদার হতো; কলহ বিদ্বেষ দূর হতো; মানুষ মানুষকে হীন করতে, মানুষ মানুষের বক্ষে ছুরি মারিতে, এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের মন্দির মসজিদ ভাঙ্গিতে বিরত থাকিত। কেবল মতে একেশ্বরবাদী হ'লেই হয় না—প্রকৃত ধর্ম্মজীবন লাভ করা চাই। বর্ত্তমান্ গোলমালে দেখেছি একেশ্বরবাদী যারা, তাঁহারাও ত অনেকে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ হইতে মুক্ত থাকেন নাই—তাঁহারাও ত অপর সম্প্রদায়ের লোকের প্রতি উৎপীড়ন করতে, তাহাদের ধর্ম্মমন্দির, উপাসনালয় অপবিত্র করতে বিরত হন নাই। "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" যাহাদের ধর্ম্মের ভিত্তি, তাহারাও অপরকে হিংসা করতে বিরত হন নাই। সুতরাং কেবল মতে একেশ্বরবাদী হ'লেই হবে না। আমরা ব্রাহ্মগণ যে নীরবে আছি, কাহারও সঙ্গে গোলমাল করি না, এই মন্দিরের নিকট দিয়া উপাসনার সময় কত মিছিল গণ্ডগোল করিয়া যায়—এখানে বরং অনেকে একটু বেশী করিয়া চীৎকার করে, আমাদের উপাসনার ব্যাঘাত জন্মে—আমরা কিছুই বলি না। কিন্তু যদি আমাদের সংখ্যা খুব বেশী হয়, এবং আমাদের ধর্ম্মভাব না থাকে, তবে আমরাও হয়ত লোকের প্রতি উৎপীড়ন আরম্ভ করিব, আমাদের ভিতরেও দ্বেষ হিংসা জ্বলিয়া উঠিবে। শুধু একেশ্বরবাদের মত আমাদিগকে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। প্রকৃত ধর্ম্মজীবন চাই; ঈশ্বরভক্তি চাই—মানুষকে মানুষ বলিয়া দেখা চাই, মানবে ব্রহ্মের স্ফূর্ত্তি দেখা চাই।

তাই বলি, আজ এই বর্ষশেষের দিনে বলি, আমরা যে উদার ধর্ম্ম, বিশ্বজনীন ধর্ম্ম পেয়েছি, তাহাই যে মিলনের ভূমি, তাহাই যে মানুষকে প্রকৃত মনুষ্যত্ব, প্রকৃত দেবত্বের পথে নিয়ে যাবে, তাহাই যে সাম্প্রদায়িক কলহ দূর করিবে, জাতিভেদ অস্পৃশ্যতা দূর করিয়া সকলকে এক প্রেমসূত্রে গ্রথিত করিবে, ধরাতে এক মহা মানবসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিবে, তাহাই যে সত্য প্রেম পবিত্রতা ও সেবার আদর্শ মানবচিত্তে স্থাপন করবে, তাহাই যে হিন্দু মুসলমান, খৃষ্টান বৌদ্ধ, জৈন শিখকে প্রেমে এক করিবে, তাহা বুঝিয়া লই। কাল নববর্ষ; আজ আমাদের বিগত অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হই; আমরা যে আমাদের ধর্ম্মের মহিমা ভু'লে গেছি, আমরা যে এত দিন সাধন ভুলিয়া ভোগৈশ্বর্য্যের পশ্চাতে ছুটিয়াছি, আমরা সে জন্য ঈশ্বরচরণে ক্রন্দন করি। তাঁহার আশীর্ব্বাদ লইয়া নূতন বৎসরে নূতন ভাবে ধর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত হই। ভাই বোনসকল, তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব—ঈশ্বরে, সত্যস্বরূপ, প্রেম ও পুণ্যের আধার পরমেশ্বরে, অকপট প্রীতি, আর সেই প্রীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া, তাঁহারই প্রিয় কার্য্য জ্ঞানে, জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে মানবের সেবা—ইহাই উপাসনা। এই উপাসনাই আমাদের সম্বল। এই উপাসনা সজনে নির্জ্জনে, চলিতে ফিরিতে সাধন কর; তাহ'লে —জীবন বৈরাগ্য আসিবে সেবা আসিবে, প্রাণে উদার ভাব আসিবে, প্রেমে সকলকে আপনার করিয়া লইতে পারিবে। ভগবান্ আমাদের হাতে কত বড় কাজের ভার দিয়াছেন, কত বড় দায়িত্ব দিয়াছেন! ব্রাহ্মধর্ম্ম—উদার বিশ্বজনীন ব্রাহ্মধর্ম্ম—ইহাকে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মে পরিণত করিও না। উহাকে প্রাণ দিয়া, সর্ব্বস্ব দিয়া, সাধন কর। ইহার আলোকে সমস্ত দর্শন কর, ইহার বাণী সকলকে শোনাও; জীবন দিয়া সকলকে জাগাও। সকল বিপদ্ ঘুচিবে,—সকল অপ্রেম দূর হইবে, ভাই ভাইকে চিনিবে। ঈশ্বরকে চিনিলেই ভাইকে চেনা যায়। সব দুর্নীতি কুসংস্কার, ভেদাভেদ, অশিক্ষা কুশিক্ষা, অত্যাচার উৎপীড়ন চলিয়া যাইবে—ধরাতে প্রেমের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।

স্যার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্তের জীবনস্মৃতি

আজ যাঁহার শ্রাদ্ধবাসরে আমরা সমবেত হইয়াছি, তাঁহার জন্ম, শিক্ষা, কর্ম্মজীবন, উচ্চপদে অধিষ্ঠান, রাজদ্বারে সম্মান, যশ, সকলই তাঁর দেহত্যাগের পরক্ষণেই দেশ বিদেশে কীর্ত্তিত হইয়াছে। ক'দিন ধরিয়া সংবাদপত্রসমূহে তাঁহার জীবন-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে; সে-সকল বিষয়ে নূতন করিয়া আর বিশেষ কিছু বলিবার নাই। তিনি ভিতরের মানুষটা কি ছিলেন, তাঁর অন্তর কত সদ্গুণে অলঙ্কৃত ছিল, তাহা সকলে না জানিতে পারেন। যদিও আমি জীবনে তাঁহার সঙ্গে বহু দিন একত্রে থাকিবার সুযোগ পাই নাই, তবুও তাঁর সঙ্গ যতটুকু লাভ করিয়াছি, এবং যতটুকু তাঁহাকে জানিয়াছি, নিজের নানা অযোগ্যতা সত্ত্বেও, সেইটুকুরই পরিচয় আজ তাঁহার আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবের নিকট দিবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছে। প্রিয়জন চোখের অন্তরালে গেলে, তাঁর প্রসঙ্গ, তাঁর আলোচনা, করিলেই প্রাণে আরাম পাওয়া যায়।

আমাদের পরলোকগত পূজনীয় পিতৃদেব কালীনারায়ণ গুপ্ত মহাশয় বাল্যকালেই গুপ্ত পরিবারে দত্তক পুত্ররূপে গৃহীত হন। তাঁহার পিতামহ রামরাজা গুপ্ত একজন মহা সাধক ছিলেন। সর্ব্বদা তীর্থে বাস করিতেন। অন্তিমকালে শ্রীক্ষেত্রে তাঁর দেহরক্ষা হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে তথায় লোকনাথ শিবের মন্দিরে পরিচারককে তাঁহার খোঁজ লইতে বলেন। তাঁহার প্রাণহীন দেহ কিছুক্ষণ পরে সমাধিস্থ অবস্থায় সেই মন্দিরে পাওয়া যায়। আমার পিতৃদেব বাল্যে তাঁহার পিতা-মহীর নিকট সেই সব পুণ্যকাহিনী শুনিতেন। এই রূপে শৈশবেই তাঁর অন্তরে ধর্ম্মের বীজ উপ্ত হইয়াছিল। উত্তরকালে তিনি "ভক্ত কালীনারায়ণ" নামে পূর্ব্ববঙ্গে পরিচিত ছিলেন। আমার দাদা এই ব্রহ্ম-ভক্তের জ্যেষ্ঠ সন্তান ছিলেন। তাই উত্তরাধিকার সূত্রে শৈশব হইতেই তিনি কতকগুলি সদ্গুণের অধিকারী হইয়াছিলেন। মায়ের নিকট শুনিয়াছি, শৈশব হইতেই তিনি অতি শান্তিপ্রিয় ও শান্তপ্রকৃতির ছিলেন। সমবয়স্কদিগের সহিত তিনি কখনও বিবাদ কিম্বা কলহ করিতেন না। কাহাকেও এরূপ করিতে দেখিলে নিতান্ত সঙ্কুচিত হইতেন। উত্তরকালেও

শ্রাদ্ধবাসরে কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী সুবালা আচার্য্য কর্ত্তৃক পঠিত

তাঁহার এ গুণের ব্যতিক্রম দেখি নাই। তিনি কাহারও সহিত কর্কশ ব্যবহার করিয়াছেন, এরূপ কখনও শুনি নাই। ক্ষমা ও সৌজন্যই তাঁর স্বভাবসিদ্ধ গুণ ছিল। শৈশবে বিদ্যালয়ে যাঁহাদের সঙ্গে বন্ধুতা জন্মিয়াছিল, আজীবন তাঁহাদের সঙ্গে সে বন্ধুত্ব রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। এমন কি কোনো কোনো স্থলে সে বন্ধুত্ব ভ্রাতৃত্বে পরিণত হইয়াছে। দাদার বন্ধুদিগকে আমরাও বাল্যকাল হইতে দাদা বলিয়া ডাকিয়াছি এবং দাদার মতই মনে করিয়াছি; তাঁহারাও সেই স্নেহের চক্ষে আমাদিগকে দেখিয়াছেন এবং এখনও দেখেন।

তাঁহার ব্যবহারের মধ্যে এমন কিছু ছিল, যাহার জন্য বালক বৃদ্ধ যুবা সকলেই নিঃসঙ্কোচে তাঁহার সহিত মিশিতে পারিত। যাঁহারা একটু ঘনিষ্ঠ ভাবে তাঁহার সহিত মিশিয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহার অন্তরের ভালবাসায় মুগ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার হৃদয়টি বড়ই কোমল ছিল, কাহারও দুঃখ কষ্টের কথা শুনিলে অত্যন্ত ব্যথিত হইতেন। আত্মীয়স্বজন ও সন্তানদের কোনো রোগের কথা শুনিলে অস্থির হইয়া পড়িতেন। মা-ই সন্তানের রোগে অস্থির হন; কিন্তু তাঁর অস্থিরতা দেখিয়া আমাদের বড়-বৌঠাকুরাণীকে অনেক সময় ব্যস্ত হইতে হইত। আমরা ১২টী ভাই বোন ছিলাম—পাঁচ ভাই ও সাত ভগিনী। তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ভাই ও একটি ভগিনী অতি শৈশবেই চলিয়া যায়; এই দাদাই আমাদের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং আমি সর্ব্বকনিষ্ঠা। দাদার বিবাহ হিন্দুমতে তাঁহার জন্মস্থান ভাটপাড়া গ্রামেই সম্পন্ন হয়। বিবাহের সময় বৌঠাকুরাণীর বয়স এগার ও দাদার বয়স পনর কি ষোল ছিল।

বাবা যৌবনেই ব্রাহ্মধর্ম্মে অনুরাগী হন। বাবার শৈশব হইতেই ধর্ম্মে অতিশয় নিষ্ঠা ছিল। বিবাহের পর অল্প বয়সেই সস্ত্রীক শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। সেই অবধি অতি নিষ্ঠার সহিত পূজার্চ্চনা করিতেন। যৌবনে মূর্ত্তিপূজার অসারতা বুঝিতে পারিলেন; কিন্তু তখনও পরিবারের অনুষ্ঠানাদি হিন্দুমতেই সম্পন্ন করিতেন। কিন্তু যখনই ব্রাহ্মধর্ম্মকে সত্যধর্ম্ম বলিয়া বুঝিতে পারিলেন, প্রাণে তাহা গ্রহণ করিলেন। তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ এক অতি স্বাভাবিক ও আশ্চর্য্য ব্যাপার। তিনি কাহারও নিকট ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের কথা শুনিয়া ব্রাহ্ম হন নাই। ভগবান স্বয়ংই গুরু হইয়া তাঁহাকে সেই ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। এই বিষয় তাঁহার জীবনচরিত পাঠে বিস্তৃত জানা যায়। যখন ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রাণের সত্যধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিলেন, তখনই আর হিন্দুসমাজে থাকা সম্ভবপর হইল না। কিন্তু তখনকার সময়ে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করা জীবনের অগ্নিপরীক্ষা ছিল। চারিদিকে যে কি ভয়ানক অত্যাচার ও নির্য্যাতন হইত, তাহা এখন কেহ কল্পনাও করিতে পারিবেন না। এই সময় দাদা মেজদাদা ও সেজদাদার ধর্ম্মোৎসাহ ও উদ্দীপনাই বাবার মনে দ্বিগুণ বলসঞ্চার করিয়াছিল এবং তাঁহার ব্রাহ্মসমাজে আসার বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। আমাদের বড়বৌঠাকুরাণীও এই অল্প বয়সে সকল কুসংস্কার ছিন্ন করিয়া আগ্রহের সহিত তাঁহাদের সঙ্গে যোগদান করেন। তাঁহাদের সেই সময়কার সাহস ধর্ম্মোৎসাহ ও উৎসাহের কথা বাল্যকালে মায়ের নিকট শুনিয়া শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিত।

দাদা আঠার বৎসর বয়সে শিক্ষার জন্য ইংলণ্ডে গমন করেন। বৌঠাকুরাণী শিক্ষায় দীক্ষায় সকল বিষয়েই তাঁহার যোগ্য হইবার জন্য তখন হইতেই প্রস্তুত হইতে আরম্ভ করেন। তিনি আজীবন দাদার পার্শ্বে থাকিয়া তাঁহার সকল কর্ম্মে সহায় হইয়াছিলেন। তাঁহাদের ৩ পুত্র ও ৫ কন্যা। কন্যাগণকে সুপাত্রস্থ করিয়া ও পুত্রদিগের শিক্ষা প্রায় সমাপ্ত করিয়া সংসারের সকল কর্ত্তব্য হইতে অবসর লইতেছিলেন, এমন সময় দাদা এখানকার কর্ম্মভার হইতে মুক্ত হইয়া বিলাতে নূতন কর্ম্মের জন্য আহূত হন। বৌ-ঠাকুরাণীও সেই সময়ে তাঁহার সঙ্গিনী হন। তিনি সেখানে গিয়া সর্ব্বদাই দাদাকে বলিতেন "ভগবান আমার সংসারের সকল সাধ পূর্ণ করিয়াছেন, এখন তোমার কোলে মাথা রাখিয়া যদি যাইতে পারি তবেই হয়।" ভগবান অল্পকালের মধ্যে তাঁহার যে সাধ পূর্ণ করিলেন। হঠাৎ হৃদ্‌রোগে আধঘণ্টার মধ্যে তিনি স্বামী পুত্রকন্যা আত্মীয় স্বজন সকলকে কাঁদাইয়া পরমজননীর ক্রোড়ে চলিয়া গেলেন। তাঁর লোকান্তরগমনের পর দাদা ১৮ বৎসর জীবিত ছিলেন। সেই সময় তিনি তাঁহার অভাব সর্ব্বদাই অনুভব করিতেন।

তাঁহার স্বদেশপ্রীতির কথা অনেকেই জানেন। রাজ কর্ম্মচারীরূপে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি সর্ব্বদাই তাঁহার যথাসাধ্য শক্তি নিয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। বহুকাল পূর্ব্বে একবার কলিকাতায় প্রথম স্বদেশী আন্দোলনের সময় এখানকার লোকেরা তাঁহার কুশপুত্তলিকা তৈয়ার করিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করে। তাহা শুনিয়া তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন "দেশের লোকে যদি জানিত যে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধ মতের সঙ্গে দেশের জন্য কত সংগ্রাম যে আমাকে করিতে হয়, তাহা হইলে তাহারা এরূপ করিত না। তাহারা আমাকে যাহাই ভাবুক, আমি দেশের মঙ্গলের জন্য আমার যথাসাধ্য করিয়া থাকি এবং আজীবন করিব।" দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি দেশের জন্য সুদূর ইংলণ্ডে থাকিয়া কি কি করিয়াছেন তাহাও বলিলেন। দেশের লোকে বহুদিন পূর্ব্বেই তাহাদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছিল। তিনি এইরূপ নিন্দা প্রশংসায় বিচলিত না হইয়া যথাসাধ্য নিজের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন।

জন্মভূমির প্রতি তাঁহার আশ্চর্য্য প্রীতি ছিল। পূর্ব্ব-বাঙ্গালার ঢাকা জিলার ভাটপাড়া গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। সেখানে তখন কোন স্কুল ছিল না। তাই শিক্ষার নিমিত্ত তিনি পিতা মাতার কোল ছাড়িয়া অতি শৈশবে বিদেশে বাস করিতেন। তার পর ইংলণ্ডযাত্রার পর হইতে জন্মভূমিতে যাওয়া তাঁর বড় ঘটিয়া উঠিত না। তবুও সুবিধা হইলেই যাইতেন। দেশের আত্মীয় স্বজন সকলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতে আনন্দ অনুভব করিতেন। এবং মাঠে চাষাদের সঙ্গে একবার দেখা করা, আলাপ করা এবং তাদের খোঁজ খবর লওয়া তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের মধ্যে ছিল। তিনি কতবার বলিয়াছেন "এদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিয়া বড় আনন্দ পাই; এদের কত সহজে সন্তুষ্ট করা যায়!" তাহারাও "কর্ত্তার" সঙ্গে মন খুলিয়া কথাবার্ত্তা বলিয়া নিজেদের কৃতার্থ মনে করিত। পেন্সন লইবার পর বহুবৎসর ইংলণ্ডেই থাকিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে যখনই দেশে আসিতেন, জন্মভূমি

দেখা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্যের মধ্যে ছিল। বলিতেন "যেখানে জন্মিয়াছি, বাড়িয়াছি, খেলাধূলা করিয়াছি, সে সকল স্থান দেখিলে প্রাণে কত মধুর স্মৃতি জাগিয়া উঠে।"

তাঁহার চাল চলন খুব সাদাসিধা রকমের ছিল। পরণ পরিচ্ছদে কখনও তাঁর কোনপ্রকার বিলাসিতা দেখি নাই। কত সময় তাঁহার গায়ে ছেঁড়া গেঞ্জি দেখিয়া আমরা তাহা আরো ছিঁড়িয়া দিতাম। ইহা লইয়া অনেক হাস্য আমোদ করিতাম। তাঁহার বুদ্ধি কিরূপ প্রখর ছিল সকলেই তাহা জানেন। উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সর্ব্বদাই নানা দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। কখন কি করিতে হইবে, কি রূপে চলিতে হইবে, অতি সহজেই তাহা স্থির করিয়া লইতেন। এই জন্যই সকল কাজই তিনি অতি সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন করিতেন। জমিদারীতে যখন যাইতেন, এত অল্প সময়ের মধ্যে সেখানকার হিসাবপত্র কাজকর্ম্ম দেখিয়া লইতেন যে, সকলে অবাক হইয়া যাইত। নায়েব গোমস্তা প্রজা সকলের সঙ্গেই তিনি ভদ্র ব্যবহার করিতেন। আপামর সকলের সঙ্গেই তিনি মিষ্ট ব্যবহার করিতেন।

কাওরাদি (জমীদারীর স্থান) বাড়ীর পাশেই পিতার নির্ম্মিত ব্রহ্মমন্দির; মন্দিরের পশ্চাতেই পরিবারস্থ সকলের সমাধি। দাদা বড় বৌঠাকুরাণীর চিতাভস্ম স্থাপন করিয়া, তথায় সমাধি নির্ম্মাণ করাইয়া উৎসবের আয়োজন করেন। সেই সময় আমরাও সেখানে উপস্থিত ছিলাম। তিনি সেই সময় বৌঠাকুরাণীর সমাধির পার্শ্বে নিজের সমাধির স্থান নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়া আসিয়াছিলেন। আজ ১৮ বৎসর পর তাঁহার চিতাভস্ম লইয়া তাঁহার পুত্রকন্যাগণ আবার সেই স্থানে যাইয়া উৎসবের আয়োজন করিয়াছেন। কাওরাইদের সেইস্থান এখন আমাদের নিকট তীর্থরূপে পরিণত হইয়াছে। সেই স্থানে গেলে প্রাণ যেন স্বতঃই পূর্ণ হইয়া উঠে।

এত কাজের মধ্যেও তিনি ছোট বড় সব কাজের জন্যই সময় রাখিতেন। যখনি যে কেহ তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছেন যথা-সময়ে তাহার উত্তর দিয়াছেন। কেহ পত্র লিখিয়া উত্তর পায় নাই, এমন কখনও হয় নাই। নিজের দৈনন্দিন জীবন অতিশয় নিয়মিত ছিল। তিনি কোনকালেই সবল সুস্থ ছিলেন না। বাল্যকাল হইতেই কোন কোন রোগ তাঁর চিরসঙ্গী ছিল। তৎসত্ত্বেও পরিমিত আহার ও নিয়মিত জীবন যাপন দ্বারা সুদীর্ঘ ৭৫ বৎসর কর্ম্মময় জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। কখনও তাঁহাকে লোভের বশবর্ত্তী হইয়া কিছু আহার করিতে দেখি নাই। নিয়মিত শরীর চালনা, পরিমিত আহার ও নিয়মিত নিদ্রা দ্বারা তিনি সমস্ত জীবন এত কর্ম্ম করিবার শক্তি পাইয়াছিলেন। বার্দ্ধক্যের নিরাশা কখনো তাঁহার মধ্যে দেখি নাই। বৃদ্ধ বয়সে কত বার কর্ম্মভার লইয়া বিদেশে গিয়াছেন। আমরা বলিতাম "দাদা, এই বয়সে এই শরীর লইয়া আর দূরদেশে যাইবেন না।" তিনি বলিতেন "তোমরা জান না, কাজের উৎসাহেই আমি ভাল থাকি। কর্ম্মহীন জীবন আমার নিকট মৃত্যু।" সেই জন্য দূরদেশে যাইবার সময়, আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে চক্ষের জল ফেলিলেও, কর্ম্মের আহ্বানে উৎসাহিত হইয়া উঠিতেন। তাঁহার কনিষ্ঠ তিন সহোদর জীবনের কাজ অসমাপ্ত রাখিয়া তাঁহার বহুপূর্ব্বেই পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের কথা মনে হইলেই, কিম্বা কোথাও ভ্রাতৃবিরোধের কথা শুনিলেই আক্ষেপ করিয়া বলিতেন, "আমার তিন ভাই চলিয়া গিয়াছে, আমার তো মনে হয় যেন আমার তিনখানি বুকের হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আজ তাহারা বাঁচিয়া থাকিলে আমার আর ভাবনা থাকিত না।" তিনি ভগ্নীপতিদিগকেও ঠিক নিজের কনিষ্ঠ ভাইএর মত মনে করিতেন। তাঁহাদের সঙ্গে যখনই দেখা হইত মন খুলিয়া কত কথা বলিতেন!

সাধুভক্তি তাঁহার জীবনে আশ্চর্য্য দেখিয়াছি। সাধুভক্তি মানুষকে বিনয়ী করে। সেই জন্যই তাঁহার সম্মান, উচ্চপদ, ও সম্পদ কিছুতেই তাঁহাকে অহঙ্কৃত বা অভিমানী করিতে পারে নাই। এই প্রসঙ্গে একটী ঘটনা স্মরণ হইতেছে। আমার পরলোকগতা শ্বশ্রূদেবী অতিশয় ধর্ম্মপ্রাণা নারী ছিলেন। দাদা যখনই আমাদের বাড়ী আসিতেন, তিনি এখানে থাকিলে তাঁর সঙ্গে দেখা না করিয়া যাইতেন না। একবার দাদা সস্ত্রীক পশ্চিম বেড়াইতে যান। তাঁহাদের বৃন্দাবন যাওয়ারও কথা ছিল। সে সময় আমার শ্বশ্রূ দেবীও বৃন্দাবন বাস করিতেছিলেন। দাদা যাবার পূর্ব্বে আমাকে এক দিন বলিলেন "তোমার শাশুড়ী ঠাকুরাণী তো এখন বৃন্দাবনে আছেন, তার ঠিকানাটা আমাকে লিখে দাও, সেখানে গেলে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করব।" আমি খুব আশ্চর্য্য হইলাম; বলিলাম "তিনি কোন্ গলিঘুঁজিতে থাকেন, সেখানে গিয়া তাঁর সঙ্গে দেখা করা কি আপনার সুবিধা হইবে?" তিনি বলিলেন "হাঁ, হইবে।" আমার কথাটা তেমন বিশ্বাস হইল না, কিন্তু ঠিকানা লিখিয়া দিলাম। কিন্তু আমার শ্বশ্রূ-দেবীর নিকট পরে শুনিলাম তিনি তাঁর সঙ্গে দেখা করিতে লোকদ্বারা পূর্ব্বে খবর পাঠান। আমার শাশুড়ীঠাকুরাণী তো ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, কোথায় তাঁহাকে বসিবার স্থান দিবেন। তার পর অপর একজন পরিচিত লোকের বাড়ীতে বসিবার স্থান নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বৃন্দাবনের সেই স্থানে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন সকলেই তাঁর অমায়িকতায় অবাক হইয়া গেলেন এবং বলিতে লাগিলেন "এত বড় লোক খুঁজিয়া খুঁজিয়া এমন সব নগণ্য লোকের সঙ্গে আসিয়া সাক্ষাৎ করেন!" পিতৃদেবের একটী সঙ্গীতে আছে "সমান মান, ফলে সমানেই মান, সমান সমান মান না দিয়ে কে পেয়েছে মান"। ভাবিয়া দেখিলাম সত্যই পরকে মান না দিলে জগতে কেহই মান পায় না।

আমার পরলোকগত মাতুল গিরিশচন্দ্র সেন অতি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম ছিলেন ও পারসিক ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি কোরাণ সরিফ, তাপসমালা ইত্যাদি বিখ্যাত গ্রন্থের রচয়িতা। যৌবনেই তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগ হয়, তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। তাই ভাগিনেয় ও ভাগিনেয়ীদের সন্তানবৎ স্নেহ করিতেন। তিনি আজীবন বৈরাগ্যব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। সামান্যরূপে গ্রাসাচ্ছাদন চলিতে পারে, এই জন্য মাসিক আট টাকা বৃত্তি লইয়া তাঁহার তালুকের বাকী টাকা সব ভ্রাতুষ্পুত্রদের দিতেন। শেষ বয়সে তিনি কঠিন হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হন। দাদা শুনিয়াই মামাকে লিখিলেন "এতদিন ত কষ্ট করিয়া কাটাইলেন, কখনও আমাদিগের কোন সাহায্য লন নাই, এখন তাহা লইবেন। আপনার যে দুরারোগ্য রোগ, এ রোগে ভাল থাকা খাওয়া ও

চিকিৎসার দরকার। আপনি যতদিন জীবিত থাকিবেন মাসিক যত টাকা আপনার সেবার জন্য ব্যয় হইবে সমস্তই আমি দিব।" সেই অবধি তিনি যে কয় বৎসর জীবিত ছিলেন মাসিক ১৫০৲ ২০০৲ টাকা তাঁহাকে সাহায্য করিতেন।

পিতৃদেবের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। দাদা মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সেই জীবন চরিত যে দিন প্রথম তাঁহার হাতে দেই, সেদিন তাঁর কি আনন্দ! কত বন্ধুবান্ধবকে তাঁহার সেই পুণ্যজীবনী উপহার দিবার জন্য আমার নিকট নামের তালিকা দিলেন। তিনি সর্ব্বদাই বিশ্বাস করিতেন এবং সভা সমিতিতে নিজের উন্নতির কথা বলিতে গিয়া বলিতেন "যে আমার পিতাঠাকুরই আমার সমস্ত উন্নতির মূলে, সেই দুর্দ্দিনে তাঁহার সহায়তা ও উৎসাহ না পাইলে, আমার এ সকল কিছুই সম্ভব হইত না।"

পিতৃদেবের লোকান্তরগমনের পর দাদা স্বগ্রামে পিতার নামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। তাহাতে দেশের জনসাধারণের বিশেষ উপকার হয়। পরে যখন বুঝিলেন পৃথিবীতে আর বেশী দিন তাঁর নাই, তখন ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের হস্তে ১৭০০৲ টাকা এবং সমস্ত ভার দিয়া, যাহাতে ভবিষ্যতে ইহার কাজ সুচারুরূপে চলিতে পারে তাহার বন্দোবস্ত করিয়া গেলেন।

শুনিয়াছি তিনি বহুদিন পূর্ব্বেই নিজের আত্মচরিত লিখিয়া র খিয়াছেন; আশা করি তাহা সময়ে প্রকাশিত হইলে উহা পাঠ করিয়া বহু লোক উপকৃত হইবেন। সুদীর্ঘ জীবনে সকল কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করিয়া তিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিয়া ছিলেন। অনেক সময় একাকী যখন থাকিতেন, ব্রহ্মসঙ্গীত শুনিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন। সে লোকে প্রস্থানের কিছু দিন পূর্ব্বে রোগযন্ত্রণার সময় পিতৃদেবের জপমন্ত্র "ওঁ ব্রহ্ম" নাম শুনিতে চাহিতেন। এবং নিজে সেই নাম উচ্চারণ করিয়া শান্ত হইতেন। তাঁহার রচিত "ভাব সঙ্গীত" গাহিতে আমাকে অনুরোধ করিতেন। যখনি গাহিতাম, রোগযাতনা যেন তাঁহার কোথায় চলিয়া যাইত, শান্ত ও স্থির হইয়া থাকিতেন; কখনও বলিতেন 'কি মধুর সঙ্গীত! আরও শুনাও'। ডাক্তারেরা আশা দিলেও তিনি বুঝিয়াছিলেন এবার তিনি আরোগ্য হইবেন না, তাই সকলকে বলিয়া দিয়াছিলেন "কত দূর হইতে কত লোক কষ্ট করিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসেন, সকলকেই আমাকে দেখে যেতে দিও।" আমি একদিন বলিলাম "দাদা, কত লোকে আপনাকে দেখিতে আসেন, এত লোক যে আপনাকে ভালবাসেন তাহা জানিতাম না। তিনি বলিলেন "তোমরাতো জান না কত লোককে আমি ভালবাসিয়াছি"। সময়ে জ্ঞান ও শক্তি থাকিতে, এক সপ্তাহ পূর্ব্বে, পুত্র, পুত্রবধূ, নাতিদের, জামাতাকে ডাকিয়া যাহাকে যাহা বলিবার কত আদর করিয়া ব. ল! পরে পুত্রদের বলিলেন "তোমাদের ঠাকুর দাদা saint ছিলেন, সর্ব্বদা তাঁর আদর্শ মনে রাখিয়া চলিও।" নাতিদের বললেন "বংশের নাম রাখিও, বংশের নামে যেন কলঙ্ক না হয়।" মাতাকে বলিলেন "মা! মেয়ের মত তুমি আমার অনেক করিয়াছ, তোমাকে আর কি বলিব"? কন্যাকে "মা লক্ষী" বলিয়া আদর করিলেন"। সর্ব্বদাই বলিতেন "আমি মৃত্যুর ভয় করি না, আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত; কিন্তু বোন, ভগবানে সেই বিশ্বাস নাই, তাই কষ্ট পাই; তাঁর নামেই ত সব কষ্ট দূর হয়, কিন্তু সেরূপ ভাবে নাম করিতে পারি কই?" তাঁহার সরলতা, তাঁহার দীনতা তাঁর অনুতাপ দেখিয়া, মনে হইয়াছে দীন না হইলে ত সে রাজ্যে শ করা যায় না। তাঁহার মৃত্যুশয্যায় তিনি আমাদিগকে এই শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন; তাই তাঁহার জন্য রাত্রি জাগরণ করিয়া ... হইয়াছি। রোগশয্যায় বহু দিন থাকিলে মানুষ ধৈর্য্য হারায়, কিন্তু তাঁর কি সহিষ্ণুতা, কি ধৈর্য্য, দেখিয়াছি। সকলের সঙ্গে কি মিষ্ট ব্যবহার করিয়াছেন। কন্যাকে ও আমাকে কত আদর করিয়া ডাকিতেন। যে যখন তাঁর সেবা করিয়াছে, সকলকে আদর করিয়া ডাকিয়াছেন ও মিষ্ট ব্যবহার করিয়াছেন। যে ইংরেজ nurse তাঁর সেবা করিয়াছে, সেও তাঁহার মিষ্ট ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া রাত্রির পর রাত্রি জাগরণে কষ্ট বোধ করে নাই। সে বলিত "তাঁকে আমার পিতার মত মনে হয়, আমার মনে হয় আমার পিতার সেবা করিতেছি।" শিশুকে যেমন আদর করিয়া খাওয়ায় ও যত্ন করে, সেও তাঁহাকে সেইরূপ করিত। তাই তিনি পুত্রদের পুনঃ পুনঃ ডাকিয়া বলিয়া গিয়াছেন "এই nurse আমার জন্য যে কত করিয়াছে তাহা বলিতে পারি না, তাকে বিশেষ করিয়া পুরস্কার দিও।" যে চাকর তাঁর সেবা করিত তার কাছেও মিষ্ট সম্ভাষণে বিদায় লইলেন এবং বলিলেন "আমি চ'লে গেলে আমার ছোট ছেলের কাছে তুমি থেকো, তাকে ছেড়ো না"। ব্রহ্মপ্রেমের আস্বাদ না পাইলে মানুষ কি এমন ভালবাসিতে পারে? তাই আজ তাঁর জন্য আর কি প্রার্থনা করিব? নিজের জন্যই প্রার্থনা করিতেছি— প্রভু, মৃত্যু আমাদের অমৃতের সোপান হউক। তাঁর শেষ প্রার্থনা ছিল "প্রভু, আমাকে দয়া কর, আমাকে কোলে নেও" আজ তিনি তাঁরই কোলে আছেন, ইহা যেন প্রাণে অনুভব করি। 'জীবনের যত পাপ তাপ ভার ব্রহ্মকৃপাগুণে হবে ছারখার, মরণ ঘুচবে, জীবন পাইবে, হইবে নিস্তার।" আজ তাঁর সকল পাপ তাপের নির্ব্বাণ হইয়াছে এবং অমৃতের কোলে স্থান পাইয়াছেন, সর্ব্বান্তঃকরণে ইহা বিশ্বাস করি। যে লোক হইতে তাঁহার আশীর্ব্বাদ আমাদের উপর বর্ষিত হউক।

ব্রাহ্মসমাজ

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মোৎসব—নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অষ্টচত্বারিংশত্তম জন্মোৎসব সম্পন্ন হইবে। উৎসবে যোগদান করিবার জন্য সকলকে সাদরে নিমন্ত্রণ করা যাইতেছে—

৩১শে বৈশাখ (১৪ই মে) শুক্রবার—সায়ংকালে উপাসনা। ১লা জ্যৈষ্ঠ (১৫ই মে) শনিবার—প্রাতে মহিলাদের উৎসব। সায়ংকালে বক্তৃতা। ২রা জ্যৈষ্ঠ (১৬ই মে) রবিবার—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজপ্রতিষ্ঠার দিন। প্রাতে উপাসনা; সায়ংকালে উপাসনা।

বর্ষশেষ ও নববর্ষের উৎসব—বর্ষশেষ ও নববর্ষ উপলক্ষে নিম্নলিখিত প্রণালীতে উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে:—

২৯শে চৈত্র (১২ই এপ্রিল) সোমবার সন্ধ্যায়—শ্রীযুক্ত ভবসিন্ধু দত্ত "ধর্ম্মের প্রকৃতি ও বিকৃতি" বিষয়ে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। ৩০শে চৈত্র (১৩ই এপ্রিল) মঙ্গলবার—প্রাতে উপাসনা; আচার্য্য শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশ অন্যত্র প্রকাশিত হইল। সায়ংকালে উপাসনা; শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশ পূর্ব্বের সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। ১লা বৈশাখ (১৪ই এপ্রিল) বুধবার—নববর্ষ দিন। প্রাতে উপাসনা; শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। ঈশ্বর আমাদের পরিধানের বস্ত্র, সেণ্ট পলও এই ভাব প্রকাশ করিয়াছেন—খৃষ্টকে পরিধান কর—তিনি আহার ও পানীয়, অমর জীবন। কতকগুলি ভাব বা চিন্তা আমাদিগকে চির যৌবন প্রদান করে, তাঁহাতেই আমরা সকলে সম্পৎশালী, আর সমস্তই তুচ্ছ, মান প্রতিপত্তি সবই তুচ্ছ, মালাইলের সম্মান লাভের ইচ্ছা থাকিলেও, যখন তাহা পাইলেন তখনই পত্নীবিয়োগ হইল, এবং সেই আঘাতের মধ্যেই যথার্থ ভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করিতে সমর্থ হইয়াছেন—এই সকল কথা নানা ভাবে বলিয়া নিজ জীবনের অভিজ্ঞতার কথা বলেন। ব্রহ্মকৃপায় সময় সময় উচ্চ অবস্থা পাও।। বার—একবার

বোটানিক্যাল গার্ডেনে বন্ধুদের সঙ্গে যাইয়া গোলাপ ফুলের সৌন্দর্য্যে ও গন্ধে গভীর ভাবে তাঁহাতে ডুবিয়াছিলেন; শোক তাপ পাপ বিদূরিত হয়, তাঁহার প্রকাশে সমস্ত পবিত্র ও সুন্দর হইয়া যায়, কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই অবস্থা স্থায়ী হয় না, সে উচ্চ অবস্থায় চিরদিন থাকা যায় না—কবে সেদিন আসিবে জানি না, তবে নিরাশ হইবার কারণ নাই। যাহা পাই তাহাতেই আশা হয় একদিন সেই অবস্থা আসিবে; তাহার জন্যই আমাদিগকে আকাঙ্ক্ষিত ও চেষ্টিত হইতে হইবে। নানা প্রকারে এই ভাবই উপদেশের মধ্যে সুন্দর করিয়া বিবৃত করেন। দুঃখের বিষয় উপদেশটি লিখিয়া লইবার কোনও ব্যবস্থা না থাকাতে আমরা উহা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। সায়ংকালে উপাসনা; শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। উপাসনান্তে শ্রীমান আনন্দমোহন বল নামক একটি যুবক পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহাকে দীক্ষার জন্য উপস্থিত করেন। আশা করি গুরুদাশ বাবুর উপদেশটি পরে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইব।

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ৪ঠা বৈশাখ কলিকাতা নগরীতে প্রবীণ ব্রাহ্ম বাবু শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েক মাস রোগে শয্যাশায়ী থাকিয়া ৬৯ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহাকে ধর্ম্মের জন্য অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে। বিগত ১২ই বৈশাখ তাঁহার আদ্য-শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র আচার্য্যের কার্য্য, পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ শাস্ত্রপাঠ ও জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান আশাকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে ব্রাহ্মসমাজের কাজে ৩১৲, প্রদত্ত হইয়াছে।

গত ২৭শে চৈত্র শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত আইচ কুমিল্লা নগরীতে পুত্রদিগের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার পরলোকবাসিনী পত্নীর আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়াছেন। প্রথমে কীর্ত্তন ও উপাসনা হয়; শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত উপাসনা করেন। উপাসনার পরে রাধাকান্ত বাবুর এক পুত্র মাতার জীবনচরিত পাঠ ও প্রার্থনা এবং রাধাকান্ত বাবু পত্নীর আত্মার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করেন। বৈকালে কাঙ্গালীদিগকে চাউল, পয়সা ও বস্ত্রাদি বিতরণ করা হয়। পরদিন সকালে রাধাকান্ত বাবুর ভবনে উপাসনা এবং মধ্যাহ্নে পরলোকবাসিনী আত্মার প্রীতির জন্য সহরের ব্রাহ্ম ও অন্যান্য বিস্তর লোককে ভোজন করান হয়। এই অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠানকর্ত্তাগণ নিম্নলিখিত অর্থ দান করিয়াছেন—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ইচ্ছাময়ী আইচ ফণ্ড স্থাপনের জন্য ২৫০৲, সাধনাশ্রম ১০৲, শিবনাথ মেমোরিয়াল ১০৲, নবদ্বীপ মেমোরিয়াল ১০৲, নোয়াখালী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ইচ্ছাময়ী আইচ ফণ্ড স্থাপনের জন্য ১০০৲, কুমিল্লা ব্রাহ্মসমাজ ২০৲, পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজ, ঢাকা ১০৲, পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজের অনাথ ধন ভাণ্ডার ১০৲, বিধবাশ্রম, ঢাকা ২৫৲, অনাথ আশ্রম, ঢাকা ১৫৲, কুষ্ঠাশ্রম দেওঘর ১০০৲ অভয়াশ্রম, কুমিল্লা ৭৫, মূক বধির বিদ্যালয়, কলিকাতা ২০৲, নোয়াখালী সদর হাঁসপাতাল ৫০৲, কুমিল্লা সদর হাঁসপাতালের রোগীদের আহারের জন্য ১০৲, মাদারীপুর বাত্যাপীড়িতদের জন্য ১০৲, কুমিল্লা মেয়ে হাঁসপাতালের রোগীদের আহারের জন্য ৫৲, কাঙ্গালীদের ভোজনের জন্য ৩০০৲, কাঙ্গালী বিদায়ের চাউল, পয়সা ও বস্ত্রাদির জন্য ১৮৪৲, মোট ১২১৪৲,

গত ১লা বৈশাখ স্যার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্তের জমিদারী কাছারি কাওরাদে, তাঁহার চিতাভস্ম স্থাপন করিবার জন্য, তাঁহার তিন পুত্র, এক কন্যা, তিন ভগিনী, এক ভ্রাতৃবধূ ও বিস্তর আত্মীয় স্বজন, ও স্থানীয় ব্রাহ্মগণ মিলিত হন। সর্ব্বাগ্রে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা হয়, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত উপাসনা করেন; তৎপরে শ্রীযুক্তা সুবালা আচার্য্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার জীবনচরিত পাঠ করেন। অবশেষে, যে স্থানে কৃষ্ণগোবিন্দের পিতা মাতা ভ্রাতা ও পত্নীর সমাধি রহিয়াছে, সেই স্থানে উপাসক বৃন্দ শ্রদ্ধাপূর্ণ অন্তরে দণ্ডায়মান হইলে জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত একটি প্রার্থনা পাঠ করিয়া পিতার চিতাভস্ম নবনির্ম্মিত সমাধির মধ্যে স্থাপন করেন। সর্ব্বশেষে অমৃত বাবু প্রার্থনা করেন। সে দিন অপরাহ্নে ও সন্ধ্যাকালে, পরলোকবাসী আত্মার তৃপ্তির জন্য বিস্তর হিন্দু ও মুসলমান প্রজাকে ভোজন করান হয়। পূর্ব্ব দিবস ব্রহ্মমন্দিরে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল; তাহাতে শ্রীযুক্ত হৃদয়চন্দ্র আচার্য্য আচার্য্যের কার্য্য করেন। শ্রীযুক্তা চপলা দত্ত একটি প্রর্থানা করেন।

বিগত ২৩শে এপ্রিল বগুড়া নগরীতে শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পালিতা কন্যা সুকেশী বন্দ্যোপাধ্যায় ৮ বৎসর বয়সে কালা-জ্বরে ভুগিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন।

বিগত ১২ই এপ্রিল কলিকাতা নগরীতে শ্রীমতী পুণ্যপ্রভা ঘোষ পিতা বাবু ভগবানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র রায় আচার্য্যের কার্য্য এবং কন্যা পিতার জীবনী পাঠ ও প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে সাধারণ বিভাগে ৪৲, প্রচার বিভাগে ৪৲, ও দাতব্য বিভাগে ৪৲ প্রদত্ত হইয়াছে।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চিরশান্তিতে রাখুন ও আত্মীয় স্বজনদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৮ই মে ১৯২৬ খৃঃ ২৫শে বৈশাখ ১৩৩৩ সন, শনিবার ৭ ঘটীকার সময় পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে সমাজের বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন হইবে। সভ্যগণের উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়।

আলোচ্য বিষয়:—

১। ১৩৩২ সনের বার্ষিক কার্য্যবিবরণী এবং পরীক্ষিত আয় ব্যয়ের হিসাব। ২। ১৩৩৩ সনের জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্যনির্ব্বাচন। ৩। মিঃ আর, দাস প্রস্তাব করিবেন:—

"পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজের যে সকল সভ্যের দুই বৎসর বা ততোধিক কালের চাঁদা বাকি পড়িয়াছে, তাঁহাদের নাম সভ্যের তালিকা হইতে উঠাইয়া দেওয়া হউক।" ৪। শ্রীযুক্ত প্রদোষচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রস্তাব করিবেন:—"পূঃ বাঃ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলীর কার্য্যনির্ব্বাহক সভার গঠন সম্বন্ধীয় ৯ম নিয়মের তৃতীয় পংক্তিতে "৭জন সভ্যের" এই কথার পরিবর্ত্তে "৯ জন সভ্যের" এই কথা বসান হউক। ৫। শ্রীযুত সুললিত সরকার প্রস্তাব করিবেন—"ইষ্টবেঙ্গল ইনষ্টিটিউসনের নিয়মাবলীর ম্যানেজিং কমিটি গঠন সম্বন্ধীয় 6 (c) এবং 6 (f) নং নিয়ম যথাক্রমে নিম্নলিখিত রূপে সংশোধিত হউক।

(a) Four members shall be elected by the Executive Committee of the E. B. Brahmo Samaj from among its own members and two shall be elected by the general Committe from among the members of the E. B. Brahmo Samaj.

(b) Two members shall be elected by the general Committe of the S. B. Brahmo Samaj from among the citizens of Dacca who may or may not be members of the E. B. Brahmo Samaj.

N.B. The present rule is that all the 8 members referred to above are elected by the Executive Committee of the E. B. Brahmo Samaj.

Executive Committee of the E. B. Brahma Samaj.

৬। শ্রীযুক্ত ললিতকুমার রায় প্রস্তাব করিবেন:—

সমাজের সম্পাদক, সমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা কর্ত্তৃক মনোনীত না হইয়া সাধারণ সভা কর্ত্তৃক মনোনীত হইবেন এই মর্ম্মে সমাজের নিয়মাবলীর ২৯ নং নিয়মের প্রথম পংক্তিতে "এক জন সম্পাদক" এই কথাটি তুলিয়া দিয়া ২৮ নিয়মে "মনোনীত হইবেন" এই কথার পরে "সম্পাদক সাধারণ বার্ষিক সভায় উপস্থিত সভ্যগণের অধিকাংশ ভোট দ্বারা মনোনীত হইবেন" এই কথাটি বসান হউক।

৭। বিবিধ

পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ, ঢাকা ৩রা এপ্রিল, ১৯২৬	শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন সম্পাদক পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ।

Registered No. 65

অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৬ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৪৯ম ভাগ।	১লা জ্যৈষ্ঠ, শনিবার, ১৩৩৩, ১৮৪৮ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯৭	প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০
৩য় সংখ্যা।	15th May 1926.	অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

প্রেম

মানব জীবনে প্রেম কি অমূল্য ধন,
সে-ই জানে প্রেম-ধনে ধনী যেই জন।
যে করেছে একবার প্রেম-সুধা পান,
প্রেম-সিন্ধুনীরে তার ডুবে' গেছে প্রাণ।
কি অপূর্ব্ব প্রেমলীলা হৃদয়ে তাহার,
যুগে যুগে প্রেমময় করেন প্রচার!
সৃষ্টিমাঝে হেরি' তার অপরূপ ছবি,
প্রেমানন্দে আত্মহারা কত ভক্ত কবি!
সুখে দুখে সম ভাব প্রেমিকের মন,
বিচলিত নহে তিল সে-ই মহাজন।
বাধা বিঘ্ন শোকতাপ কিছুতেই না টলে,
যে গড়েছে বাসগৃহ ব্রহ্মতরু-তলে।
সংসারের ঝঞ্ঝাবাতে শান্ত ধীর স্থির,
অটল অচল সম গভীর গম্ভীর!
প্রেমাস্পদ-মুখপানে অনিমেষ আঁখি,
আনন্দে সে কাটে দিন ব্রহ্মে নিষ্ঠা রাখি' ॥

শ্রীচন্দ্রনাথ দাস

হে সত্য ও কল্যাণের চির-প্রস্রবণ, জীবন্ত মঙ্গলবিধাতা, এ সংসারে তোমার সত্য ও কল্যাণের প্রতিষ্ঠার জন্য, তোমার পবিত্র ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনের জন্য, তুমি নিয়ত নিযুক্ত রহিয়াছ। মানুষ যে ভাবে যে পথেই চলুক না কেন, তুমি কখনও তাহাকে মঙ্গলের পথ দেখাইতে ক্ষান্ত হও না। তাই বিপথগামী মানুষকে সুপথে আনিবার জন্য যেমন নিয়ত তুমি প্রত্যেকের অন্তরে তোমার আলোক প্রকাশিত কর, তেমনি আবার বিশেষ বিশেষ সময়ে তোমার পবিত্র ধর্ম্মের আলোক জনসমাজের নিকট বিশেষ ভাবেও প্রকটিত কর। তাই বিভিন্ন কালে বিভিন্ন ধর্ম্ম-বিধানের উৎপত্তি আমরা দেখিতে পাই। যখনই মানুষ মোহ-বশতঃ কোনও প্রকারে তোমার বিশুদ্ধ ধর্ম্মকে মলিন করিয়াছে, তখনই তুমি সে গ্লানি দূর করিবার ব্যবস্থা করিয়াছ, দেখিতে পাই। এই হেতু বর্ত্তমান যুগে তুমি যে মহান্ ধর্ম্ম মানবের জন্য প্রকাশিত করিয়াছিলে, তাহাও আবার ম্লান হইতেছে দেখিয়া, তুমি তোমার অসীম করুণাতেই উহার বিশুদ্ধতা রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছ। আমাদের এই প্রিয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার মধ্যে আমরা তোমারই জীবন্ত বিধাতৃত্ব দেখিতেছি। বিশেষতঃ ইহার মধ্য দিয়া তুমি যে আমাদের নিকট এক নূতন আশার তত্ত্ব প্রকাশিত করিয়াছ, তাহার জন্য আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে তোমারই অপার করুণা বার বার স্মরণ করিতেছি। তুমি যে শুধু মহা-পুরুষদের মধ্যেই কার্য্য কর না, ছোট বড় সকলের মধ্যেই তোমার আলোক তুমি প্রকাশিত কর, তাহা তুমি এবার বিশেষ ভাবে দেখাইলে। কিন্তু হে হৃদয়দর্শী দেবতা, তুমি জান আমরা কত সময় তোমার সে আলোককে ম্লান করিয়া অন্ধকারে নিমজ্জিত হই—বিপথে চলিয়া যাই, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে তোমার যে পবিত্র ধর্ম্মের কার্য্যে ডাকিয়াছ, তাহা পরিত্যাগ করিয়া আপনার পথে চলি। আমাদের দ্বারা যে তোমার ধর্ম্মের গৌরব ক্ষুন্ন হয়! হে করুণাময় পিতা, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে তোমার উপযুক্ত কর—আমাদের দ্বারা যেন আর এ ধর্ম্ম ম্লান না হয়। তোমার মঙ্গল ইচ্ছাই আমাদের প্রত্যেকের ও সমগ্র সমাজের জীবনে জয়যুক্ত হউক। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

নিবেদন।

পর ত কেহ নাই—তোমরা আপন ও পর ব'লে একটা ভাগ করতে চাও,—হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ খৃষ্টানের মধ্যে তোমরা দেয়াল গাঁথতে চাও; ব্রাহ্মণ শূদ্রে, ম্লেচ্ছ কাফেরে, শ্বেত কৃষ্ণে, এদেশবাসী ও বিদেশীতে একটা পার্থক্য সৃষ্টি করতে চাও! আমি ত সে পার্থক্য দেখি না, আমি যে কাকেও পর ভাবতে পারি না। হিন্দু আমার, মুসলমান পর, শ্বেত আমার, কৃষ্ণ পর, এ কথা ত আমি ভাবতে পারি না। আমার যে নূতন দৃষ্টি খুলে গেছে! প্রভু যে আমার চোখে প্রেমের কাজল পরিয়ে দিয়েছেন; তিনি যে প্রাণে থেকে নূতন প্রেরণা দিচ্ছেন! আমি যে সকলের মুখেই তাঁর শোভা দেখতে পাই; আমি যে সকলকেই ভাই ব'লে চিনতে পেরেছি। যার গায়ে আঘাত কর, তাতেই যে আমার প্রাণে ব্যথা লাগে, যাকেই নির্য্যাতন কর, তাতেই যে আমার জ্বালা উপস্থিত হয়। তোমরা আপনার পর ব'লে ঝগড়া কর, কলহ কর, পরস্পরের মধ্যে অপ্রেমের সৃষ্টি কর; আমি যে তা সইতে পারি না; আমার প্রাণ যে কেঁদে উঠে; চোখের জলে বক্ষ ভেসে যায়; কিছুতেই সোয়াস্তি পাই না। ব্রহ্ম যখন সকলের প্রাণে, তখন সকলেই আমার আপনার, কেহই পর নহে।

পাওয়া না দেওয়া—তুমি কেবল কি পেতেই চাও? দিতে কি তুমি রাজী নও? তুমি কেবল তোমার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চাও? নিজের দাবী ছেড়ে অন্যের সেবা করতে পার না? সেরূপ যদি হয়, তবে তোমার ধর্ম্ম ফুটে উঠবে না। কেবল চাওয়া, কেবল পাবার ইচ্ছা, কেবল অধিকার-প্রতিষ্ঠা, এ ত পশুত্বের লক্ষণ। দেবত্ব যেখানে, ধর্ম সেখানে; সেখানে কেবল প্রেম, কেবল আত্মবিলোপ, কেবল আপন অধিকার খর্ব্ব ক'রে অপরকে দেওয়া, কেবল সেবার অধিকার আকাঙ্ক্ষা করা। তুমি কেবল প্রেম বিলাবে, সেবা করবে, নিজের সব বিলিয়ে দিবে, নিজের স্বার্থ, অধিকার খর্ব্ব করবে, নিজে মান ত্যাগ ক'রে, অপরকে সম্মান দিবে। যদি ধর্ম্ম চাও তবে পাবার জন্য, অধিকারপ্রতিষ্ঠার জন্য ব্যস্ত হ'য়ো না; কেবল দিয়ে যাও, সুখ বিলাও, সেবা কর, প্রেম দান কর। অপরের জন্য আপনাকে বিসর্জ্জন কর।

এত ভাবনা কেন?—দেশের অবস্থা দেখে, মানবের পাপ তাপ দেখে, নিজের অপরাধ স্মরণ ক'রে, তোমার দুঃখ হয়, প্রাণ কেঁদে উঠে? ইহা শুভ লক্ষণ; তোমার ঐ চোখের জলের মূল্য আছে—যার প্রাণ আছে, তারই মানবের দুঃখ দুর্দ্দশা দেখে নিজের অপরাধ স্মরণ ক'রে প্রাণে বেদনা জাগে। কিন্তু এত বেশী ভাবনা কেন? তুমি কি জান না, তিনি আছেন? তিনি সব দুঃখ দুর্দ্দশা দেখছেন; তিনি কত ভাল-বাসেন; তিনি ত কাহাকেও মরতে দিবেন না। তাঁর প্রেমের সীমা নাই। তাই বলি, দুঃখ বেদনার ভিতরেও আশায় বুক বাঁধ; তাঁর প্রেম স্মরণ ক'রে তাঁর মঙ্গল বিধানে নির্ভর ক'রে ভাবনা দূর কর; প্রাণে আশা ল'য়ে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হও। তিনি যখন সঙ্গে আছেন, তিনি যখন বিধাতা হ'য়ে আছেন, তিনি যখন প্রেমময় রূপে আছেন, তখন ভাবনা নাই। দুঃখ দুর্দ্দশা দেখে অশ্রুপাত কর; তাঁর চরণে প্রার্থনা কর, আশার সহিত তাঁর করুণার জন্য প্রতীক্ষা কর।

সম্পাদকীয়

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ—মঙ্গলময় বিশ্ববিধাতার মঙ্গল বিধানেই ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ১৫ই মে, (১৮০০ শকের ২রা জ্যৈষ্ঠ) তারিখে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। যদিও নিতান্ত নগণ্য ভাবে, অন্ধকারের মধ্যে, উহার প্রতিষ্ঠা হয় নাই—টাউন হলে, প্রকাশ্য সভাতে, নানাস্থানের ব্রাহ্মসমাজসমূহের উৎসাহ ও সহানুভূতির মধ্যেই তাহার জন্ম হয়—তথাপি সে ঘটনার গুরুত্ব আমরা সম্যক্ প্রকারে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। সেদিন যে মহা মহীরুহের বীজ উপ্ত হয়, তাহার অনন্ত সম্ভাবনার কথা কয় জন চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন, হৃদয়ে ধারণা করিতে সমর্থ হইয়াছেন, জানি না। ব্যক্তিবিশেষের কোন কার্য্যের প্রতিবাদপ্রসূত সাময়িক উত্তেজনা উহার অব্যবহিত কারণ হইলেও, যাহারা তাহার পশ্চাতে অপর কিছু দেখিতে পান না, তাঁহারা নিশ্চয়ই নিতান্ত ভ্রান্ত। যাঁহারা পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েক বৎসরের ইতিহাস অবগত আছেন, তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন কিরূপ ঘটনাপরম্পরা উক্ত অবস্থা আনয়ন করিয়াছিল, উহার জন্ম অনিবার্য্য করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু শুধু তাহারও দ্বারা কখনও উহার মূল কারণ নির্ণীত হইতে পারে না—বাহিরের কতকগুলি আনুষঙ্গিক কারণ মাত্র বুঝিতে পারা যাইবে। আরও গভীর ভাবে মূলে প্রবেশ করা, বিশেষতঃ উহার পশ্চাতে যে বিশ্ববিধাতার মঙ্গলবিধাতৃত্ব ও বিশেষ উদ্দেশ্য কার্য্য করিয়াছে, তাহা দেখা সর্ব্বোপরি একান্ত আবশ্যক। কিন্তু তাহা ত অনেক দূরের কথা, উক্ত পূর্ব্ব ইতিহাসও অতি অল্প লোকেই অবগত আছেন, অধিকাংশই শেষ ঘটনার কথাই শুনিয়াছেন, তাহাই মনে করিয়া রাখিয়াছেন—সে ঘটনা সম্বন্ধেও তাহাদের যথাযথ জ্ঞান আছে, বলা যায় না। উহা যে একটা উপলক্ষ মাত্র, তাহা অল্প লোকই চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন। যাহা হউক, সে সকল ইতিহাসের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার কোনও প্রয়োজন নাই, তাহা আমাদের অদ্যকার আলোচ্য বিষয় নহে। কোনও প্রকার ঐতিহাসিক গবেষণা বা সূক্ষ্ম আলোচনায় প্রবৃত্ত না হইয়াও অতি সাধারণ ভাবে, সহজ দৃষ্টিতে, দেখিতে গেলে, অপর সকল ধর্ম্মসমাজের উৎপত্তির সঙ্গে ইহার জন্মের একটা বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। অপর সকল ধর্ম্মসমাজই ব্যক্তি বিশেষকে অবলম্বন করিয়া জন্মিয়াছে—তিনি এক জন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষই হউন, আর সম্প্রদায় বিশেষের জন্মদাতা সংস্কারকই হউন। আমরা জানি খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর অসংখ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে এরূপ কয়েকটিও আছে, যাহাদের উৎপত্তি উক্ত প্রকারে ব্যক্তি বিশেষের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়।

রাজকীয় বিধান বা অত্যাচারই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে তাহাদের জন্ম দিয়াছে। তাহাদিগকে গণনার মধ্যে না ধরিলে বোধ হয় কোনও অন্যায় হইবে না। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসেও দেখিতে পাওয়া যাইবে, ইহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উহার উৎপত্তি ও বিকাশ ব্যক্তি বিশেষের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল। একমাত্র এই স্থলেই তাহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। অপর দিকে কোন কোন খৃষ্টীয় মণ্ডলীর মধ্যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার ভাব বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে সন্দেহ নাই, স্থল বিশেষে মণ্ডলীর ব্যবস্থার মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে সাধারণতন্ত্র প্রণালীরও স্থান রহিয়াছে বটে, তথাপি উহাদের সঙ্গেও এ সকল বিষয়ে ইহার একটা স্পষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। ইহা যেরূপ ভাবে সকলের সমবেত আলোকের উপর প্রতিষ্ঠিত, এরূপ আর কোনও ধর্ম্মসমাজই নয়। ইহাতে যে শুধু পূর্ণ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সংরক্ষিত হইয়াছে, প্রত্যেককে আপনার স্বাধীন জ্ঞানের আলোক ও বিবেকের বাণী অনুসরণ করিয়া চলিবার পূর্ণ অধিকার দেওয়া হইয়াছে, তাহা নহে। আপনার আলোক ও অন্তরের বাণীর অনুগত হইয়া চলা যে প্রত্যেকের অলঙ্ঘনীয় কর্ত্তব্য, শুধু তাহাই স্বীকৃত হয় নাই। ইহা ব্যতীত যে ধর্ম্মজীবনের পূর্ণ বিকাশ সাধিত হইতে পারে না, এ মত পূর্ব্ব হইতেই গৃহীত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু অপরের মধ্যেও যে আলোক প্রকাশিত হয়, প্রত্যেকের ভিতর দিয়া যে বাণী আসে, তাহা যে শুধু প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবনেরই পথপ্রদর্শক ও চালক নহে, তাহা ও তাহার সম্মিলনে যে আমাদের পরস্পরেরই, সকলের সমবেত জীবনেরই, পরম সহায়, কল্যাণ ও উন্নতির জন্য অপরিহার্য্য রূপেই আবশ্যক, এই তত্ত্ব কখনও স্বীকৃত ও গৃহীত হয় নাই। এই নূতন তত্ত্বই ইহার বিশেষত্ব। ইহাতে প্রত্যেকের দেবত্ব ও পরস্পরের সাপেক্ষত্ব যেরূপ স্বীকৃত হইয়াছে, এরূপ আর কদাচ কুত্রাপি হয় নাই। ইহাতে যে প্রত্যেকের পূর্ণ উন্নতি ও বিকাশের পথ বিশেষ ভাবে সুগম হইয়াছে তাহা সহজেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। সামাজিক জীবনের ইহা অপেক্ষা দৃঢ়তর ভিত্তি, মণ্ডলীবদ্ধ করিবার প্রবলতর অব্যর্থ যোগসূত্রও আর দ্বিতীয় কিছুই নাই। আশা করি এরূপ কেহ মনে করিবেন না যে, আমরা বিন্দুপরিমাণেও প্রেমের মহিমা ও একান্ত প্রয়োজনীয়তাকে খর্ব্ব করিতেছি। প্রেমই যে পারিবারিক ও মণ্ডলীগত জীবনের বন্ধন-রজ্জু, প্রেম ব্যতীত যে অপর কিছু কঠোর ব্যক্তিত্ব, অহঙ্কারের মিলন-বিরোধী স্বাতন্ত্র্য, বিদূরিত করিয়া আত্মবিসর্জ্জনের, আত্ম-বিলোপের, নিত্য সঙ্গী কোমলতা আনয়ন দ্বারা সংমিশ্রণ ও মিলন সাধন করিতে সমর্থ হয় না, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে,—সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই থাকিতে পারে না। কিন্তু এই প্রেমের মূল খুঁজিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, উহা যেমন শূন্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে না, তেমনি এই একত্ব ও দেবত্ব বোধ ব্যতীত, শ্রদ্ধা ও সম্মানকে অবলম্বন না করিয়া, প্রেম দাঁড়াইতে পারে না। আমাদের মধ্যে প্রেম যত অধিক পরিমাণেই থাকুক না কেন, উপযুক্ত পাত্রকে অবলম্বন না করিয়া উহা কিছুতেই পুষ্ট ও বিকশিত হইতে পারে না, জীবিতই থাকিতে পারে না। স্মরণে রাখিতে হইবে দয়া ও প্রেম এক জিনিস নয়। দয়া নিম্নগামী হইলেও, প্রেম কখনও তাহা হইতে পারে না—প্রেম হয় সমভূমিতে প্রবাহিত হইবে, নতুবা ঊর্দ্ধগামী হইবে, কখনও নীচের দিকে যাইবে না। যেখানে আপনার শ্রেষ্ঠত্ব বোধ আছে সেখানে দয়া থাকিতে পারে, কিন্তু কোন প্রকারেই প্রেমের অস্তিত্ব তথায় সম্ভবপর নহে। শ্রদ্ধা ও সমতা বোধ ব্যতীত কোন প্রকারেই প্রেম দাঁড়াইতে পারে না। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত অবস্থার মধ্যেই যে প্রেমের সুদৃঢ় ভিত্তি নিহিত রহিয়াছে, মিলনের সত্য অচ্ছেদ্য যোগসূত্র অবস্থিতি করিতেছে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। অপর দিকে ভ্রম প্রমাদ হইতে মুক্ত হইবার ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর উপায়ও কিছু নাই। প্রত্যেককে আপনার মধ্যে প্রকাশিত আলোকেই পথ দেখিয়া চলিতে হইবে, আপনার হৃদয়ে শ্রুত বাণীই অনুসরণ করিতে হইবে, সন্দেহ নাই। ইহাই প্রত্যেকের অলঙ্ঘনীয় কর্ত্তব্য, ইহাই উন্নতি ও বিকাশের বিধাতৃ-নির্দ্দিষ্ট পন্থা, সত্য। আর সাধারণতঃ এই উপায়ে যে আমরা সত্য পথেই চালিত হই, বিপথে, ভ্রম প্রমাদে, নীত হই না, তাহাও স্বীকার করিতেই হইবে। তথাপি আমরা যে একেবারে ভুল ভ্রান্তির অতীত, কোন অবস্থাতেই আমাদের ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা নাই, এরূপ কথাও কেহই বলিতে পারে না। বরং সময় সময় নানা কারণে আমাদের স্বাভাবিক শক্তির যে বিকৃতি ঘটে এবং তখন যে নানা প্রকার ভুল ভ্রান্তি উৎপন্ন হয়, তাহা আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই। শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক সকল প্রকার বৃত্তি বা শক্তি সম্বন্ধেই ইহা সত্য। তখন ভুল ভ্রান্তি দূর করিয়া সত্য নির্ণয়ের জন্য অপরের সাক্ষ্য ও অভিজ্ঞতার দ্বারাই বিচার করিতে হয়, অপরের নিকট প্রকাশিত আলোক ও বাণীর সঙ্গে মিল করিয়াই দেখিতে হয়—অন্য দ্বিতীয় উপায় নাই। স্পষ্ট নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ ব্যতীত কোথাও অপরের সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করা যুক্তিসঙ্গত নহে। যেখানেই এরূপ বিরোধিতা দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানেই সন্দেহের যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। সন্দেহের কারণ উপস্থিত হইলেই তাহাকে নানা প্রকারে ধীর ভাবে বিচার ও পরীক্ষা করিয়া প্রকৃত সত্যে উপনীত হইবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টিত ও যত্নশীল হইতে হইবে। সন্দেহকে উপেক্ষা ও অগ্রাহ্য করিয়া চলিলে কখনও সত্য নির্দ্ধারণ সম্ভবপর হয় না, এবং প্রকৃত সত্য নির্ণয় না করিয়া অন্ধ ভাবে মিথ্যার অনুসরণে নিশ্চয়ই কল্যাণ নাই—মৃত্যুও অকল্যাণই রহিয়াছে। স্পষ্ট প্রমাণ ব্যতীত কখনও সন্দেহের নিরূপণ হয় না। সরল সত্যান্বেষণকারীর পক্ষে সন্দেহ পরম বন্ধুর কার্য্যই করিয়া থাকে—সত্যনির্দ্ধারণে তাহার একান্ত প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। এই জন্য অনেক সময় সন্দেহ উপস্থিত না থাকিলেও তাহা জন্মাইয়া পরীক্ষা ও বিচার করিতে হয়। সে যাহা হউক, মূল কথা এই যে, সত্যের অনুসরণ দ্বারা প্রকৃত কল্যাণ লাভ করিতে হইলে যেমন আপনার উপর নির্ভর করিতে হইবে, তেমনি সমান ভাবে অপর সকলের, সমবেত মণ্ডলী বা জনসমাজের, উপরও নির্ভর করিতে হইবে। অবশ্য অপরের দ্বারা কখনও চালিত হওয়া উচিত হইবে না—প্রত্যেককে আপনার পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াই চলিতে হইবে। কিন্তু লঘু ভাবে অপর সকলকে অগ্রাহ্য করাও কর্ত্তব্য নহে—তাহাতে প্রকৃত

স্বাধীনতাও নাই, কল্যাণও নাই। বিনা বিচারে আপনার ভাবে চলাতে, অন্ধতা এ হঠকারিতা বশতঃ আপনার খেয়াল অনুসরণে স্বাধীনতা প্রকাশ পায় না। সকলের মধ্যেই একই মঙ্গলবিধাতা কার্য্য করিতেছেন। সুতরাং বিভিন্ন লোকের মধ্যে প্রকাশিত তাঁহার সত্য আলোক ও বাণী একই প্রকারের, তাহাদের মধ্যে কোনও বিরোধিতা নাই। যেখানে বিরোধিতা সেখানেই দেখিতে পাওয়া যাইবে, একের সঙ্গে নিশ্চয়ই অসত্য ও মিথ্যা জড়িত রহিয়াছে, ভুল ভ্রান্তি মিশ্রিত আছে। সত্যে সত্যে বিরোধ নাই,—পার্থক্য ও বিরোধিতা এক কথা নয়। এই যে প্রত্যেকের মধ্যে একই দেবতাকে দর্শন করা এবং আপনার অন্তরস্থিত দেবতার ন্যায় অপরের হৃদয়বাসী বিশ্ববিধাতার নিকট সম ভাবে খাঁটি থাকিবার প্রয়োজনীয়তা, এই নূতন বিশেষ তত্ত্বটি বর্ত্তমানে সকলকে গ্রহণ করিতে হইবে। ধর্ম্মজীবনের বিশুদ্ধতা ও পূর্ণতা সাধনের জন্য ইহার অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। কিন্তু ইহার মধ্যে একটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ করিয়া মনোযোগ প্রদান করিতে হইবে। প্রত্যেকের মধ্যে প্রকাশিত ব্রহ্মের আলোক ও বাণীকেই শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতে হইবে বলা হইয়াছে—ব্যক্তিগত ভাব ও খেয়ালকে, অন্ধকার ও মিথ্যাকে, ভুল ভ্রান্তিকে নহে। সুতরাং ইহার দ্বারা প্রত্যেকের উপর একটা নূতন দায়িত্বও অর্পিত হইয়াছে। শুধু আমাদের নিজেরই কল্যাণের জন্য নয়, সম ভাবে অপরের জন্যও, আমাদের প্রত্যেককে সত্য আলোক ও বাণী লাভের জন্য বিশেষ সচেষ্ট হইতে হইবে; কেননা, তাহা না করিলে কেবল আমাদের ব্যক্তিগত ক্ষতি নয়, অপরেরও গুরুতর অনিষ্ট সাধিত হইতে পারে। অপরের নিকটেও যখন আমার আলোক ও বাণীর একটা বিশেষ মূল্য আছে, তখন তাহা প্রকাশিত করিবার পূর্ব্বে বিশেষ সাবধানতাই অবলম্বন করিতে হইবে—তাহা যাহাতে আলোকের পরিবর্ত্তে অন্ধকার না হয়, সত্যের পরিবর্ত্তে মিথ্যা না হয়, বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। আপনার আলোক ও বাণী সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ না হইয়া, লঘু ভাবে যাহারা উহা অপরের নিকট উপস্থিত করিতে অগ্রসর হয়, তাহারা যে নিতান্তই দায়িত্বজ্ঞানবিহীন, সে কথা বোধ হয় অধিক করিয়া বলিতে হইবে না। যাহারা জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছা পূর্ব্বক অন্ধকারকে আলোক রূপে, মিথ্যাকে সত্য রূপে, উপস্থিত করিয়া লোককে প্রতারিত করিতে কুণ্ঠিত হয় না, মনুষ্য নামের অযোগ্য সে নরপিশাচদের কথা এ প্রসঙ্গে উত্থাপিত করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। তাহাদিগকে বাদ দিলেও পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর ভ্রান্ত লোক যে যথেষ্টই আছে, আমাদের প্রত্যেকেরই যে সময়ে সময়ে অজ্ঞাতসারে ও অনিচ্ছায় উক্ত শ্রেণীভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহা ভুলিয়া থাকিলে চলিবে না। আমরা যদি বিশেষ ভাবে সজাগ ও সতর্ক না থাকি, তবে আমাদের অনেকেরই ওরূপ ভ্রমে পতিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। আমরা যদি বিশেষ চিন্তা ও বিচার না করিয়া, নিঃসন্দিগ্ধ রূপে সত্য নির্ণয় না করিয়া, একটা অস্পষ্ট সংস্কারের উপর নির্ভর করিয়া, অনেক গুরুতর বিষয়েও অন্যায় দৃঢ়তার সহিত আপনার ভ্রান্ত মতকে প্রতিষ্ঠিত করিতে, শুধু সংখ্যাধিক্যবশতঃ অথবা অপর কোনও প্রকারে বলপূর্ব্বক অন্যের উপর চাপাইতে, চেষ্টা করি, তবে যে আমাদের পক্ষে গুরুতর অন্যায় হইবে, নিজের ও অপরের মহা অনিষ্ট সাধিত হইবে, তাহাতে ত কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা কি সকলে বলিতে পারি যে, আমরা কখনও এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হই না, আমাদের পক্ষে এরূপ কিছু করা অসম্ভব হইয়াছে? যদি তাহা বলিতে না পারি, তবে এ বিষয়ে যে আমাদিগের বিশেষ দৃষ্টি রাখা একান্ত আবশ্যক তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং এই তত্ত্ব আমাদের প্রত্যেককে যেমন একটা নূতন গৌরব ও অধিকার প্রদান করিয়াছে, তেমনি গুরুতর কর্ত্তব্য এবং দায়িত্বও দিয়াছে। এই গৌরব ও অধিকারের জ্ঞান স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব বোধকে বর্দ্ধিতই করিয়া থাকে, তৎপালনে উৎসাহিতই করে। কিন্তু যাহারা বিকৃতি বশতঃ দুইটাকে পৃথক করিয়া দেখে, শুধু গৌরব ও অধিকার লাভের জন্যই ব্যস্ত হয়, কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হয় না, তাহারা যে কল্যাণ হইতে চ্যুত হইয়া গৌরব ও অধিকার হইতেও বঞ্চিত হয়, সে কথা অনেকেই ভাবিয়া দেখে না। সেই জন্যই নানা বিরোধ কলহ বিবাদের সৃষ্টি হয়, যেখানে পূর্ণ মিল ও শান্তি বিরাজ করিবে, সেখানে অমিল ও অশান্তি উপস্থিত হইয়া ঘোর অনিষ্ট সাধন করে। আর তাহা না হইলেও উন্নতির পথ যে রুদ্ধ ও বাধাপ্রাপ্ত হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ ধর্ম্মমণ্ডলীর উন্নতি যখন প্রধান ভাবে—একমাত্র ভাবে বলিলেও বোধ হয় অন্যায় হইবে না—জীবনদেবতার আলোক ও বাণীর অনুসরণ করিবার উপরই নির্ভর করে, তখন প্রত্যেকের পক্ষে সত্য ভাবে এই আলোক ও বাণী লাভ করা যে কত প্রয়োজনীয়, সে বিষয়ে প্রত্যেকের যে কত গুরুতর কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব রহিয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। সুতরাং আমাদের প্রিয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মোৎসব উপলক্ষে আমাদের বিশেষ ভাবে এই গুরুতর কর্ত্তব্য ও দায়িত্বের কথাই স্মরণ করিতে হইবে। আমাদের আপনার ও জগতের কল্যাণের জন্য এই মহা তত্ত্বকে জীবনে মূর্ত্ত করিয়া তুলিতে হইবে, জগতের নিকট ইহাকে ঘোষণা করিতে হইবে। শূন্যগর্ভ বাক্যের ঘোষণার দ্বারা যে বিশেষ কিছু ফল হইবে না, বরং অপকারই সাধিত হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। সুতরাং আমাদিগকে জীবনের দ্বারাই উহা ঘোষণা করিতে হইবে। আমাদের বাক্যে কার্য্যে আচরণে, চিন্তা ও ভাবে, সর্ব্বপ্রকারে উহা চতুর্দ্দিকে ঘোষিত হইবে—সকলে তখন ইহাকে আর গ্রহণ না করিয়া দূরে যাইতে পারিবে না, উপেক্ষার সহিত পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। সত্য আপনার মহিমাতে আপনি উজ্জ্বল, সত্য আলোককে কেহ লুকায়িত রাখিতে পারে না। গভীর সূচিভেদ্য অন্ধকার ভেদ করিয়াও আলোকরশ্মি প্রকাশিত হয়। তাহা প্রকাশ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টার প্রয়োজন হয় না, লাভ করিবার জন্যই চেষ্টা করিতে হয়। লব্ধ হইলে, জীবনে সংগৃহীত ও মূর্ত্তিমান হইলে, তাহা আপনিই চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবে। আমরা দিন দিন ব্যক্তিগত ও সামাজিক ভাবে এ বিষয়ে অগ্রসর হইতেছি-

কি অবনতির দিকে চলিতেছি, আর অগ্রসর হইলেও আশানুরূপ গতিতে চলিতেছি কি না, তাহা গভীরভাবে চিন্তা ও পরীক্ষা করিয়া দেখিবার এই সময়। আমাদের সকলের দৃষ্টি এ দিকে আকৃষ্ট হউক। আমরা এই জন্মদিন উপলক্ষে নূতন ব্রত ও সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়া যাহাতে নূতন উৎসাহে এই পথে অগ্রসর হইতে পারি তাহার জন্য সকলে সচেষ্ট হই। মঙ্গলময় জীবনবিধাতা আমাদের সহায় হউন। আমরা তাঁহার অনুগত জীবন যাপন করিয়া, তাঁহার আলোকে তাঁহার পথ চলিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হই। তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছাই আমাদের প্রতি জীবনে ও সমগ্র সমাজে জয়যুক্ত হউক।

দেবেন্দ্রনাথের জীবনে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের পরবর্ত্তী পাঁচ বৎসর

ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের ফলে ১৮৪৪ হইতে ১৮৪৯ সাল পর্য্যন্ত দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম্মভাবের বিকাশ ও ধর্ম্মজীবনের সংগ্রাম তাঁহার আত্মজীবনীতে যে ভাবে বিবৃত হইয়াছে, এখানে তাহার একটি সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক সূচী প্রদত্ত হইতেছে। (ইহাতে আত্মজীবনীর প্রথম সংস্করণের পত্রাঙ্ক দেওয়া হইল।)

(১) যত দিন দেবেন্দ্রনাথ ঈশ্বর-জ্ঞান লাভ করেন নাই, তত দিন তিনি আপনাকে অতি দুর্ভাগ্য বলিয়া অনুভব করিতেছিলেন। 'পৃথিবীর সকলেরই উপাস্য দেবতা আছে, আমার নাই,' এই অনুভব তাঁহাকে কঠিন দুঃখ দিতেছিল। ক্রমে তিনি একাগ্র ও ব্যাকুল চিন্তাদ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইলেন যে, ঈশ্বর আছেন, তিনি জ্ঞানময়, ও তিনি জগতের নিয়ন্তা। অতঃপর ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, কখনও নির্জ্জনে একাকী, কখনও বা ব্রাহ্মসমাজে বন্ধুগণ সহ, সেই মহান্ পরমেশ্বরের উপাসনা করিয়া তাঁহার অন্তরের ক্ষোভ ও দুঃখ দূর হইল। (১৮৩৮—১৮৪৩; আত্মজীবনীর ৪৪, ৪৫ পৃষ্ঠা।)"

(২) দীক্ষার পর তিনি নিজে গায়ত্রী মন্ত্র অবলম্বন করিয়া দৈনিক ব্রহ্মোপাসনা করিতে লাগিলেন; কিন্তু গায়ত্রীর অর্থ সকলে বুঝিতে পারিবে না, ইহা অনুভব করিয়া, সর্ব্বসাধারণের উপযোগী ব্রহ্মোপাসনার পদ্ধতি কিরূপ হওয়া উচিত, এই চিন্তায় অচিরেই তাঁহাকে প্রবৃত্ত হইতে হইল। ইহার ফল, ব্রহ্মোপাসনার জন্য ব্যক্তিগত ও সামাজিক দুই প্রকার পদ্ধতি রচনা। (১৮৪৪ সাল; আত্মজীবনীর ৩৯-৪৩ পৃষ্ঠা।)

(৩) গায়ত্রী মন্ত্রের দ্বারা দৈনিক উপাসনা করিতে করিতে ক্রমশঃ তিনি এই নূতন উপলব্ধিতে প্রবেশ করিলেন যে, ঈশ্বর শুধু **জগতেরই** নিয়ন্তা নহেন, কিন্তু তিনি **আমার** অন্তরে থাকিয়া আমাকেও চালাইবেন। "তাঁহার আদেশ বলিয়া আমার ধর্ম্মবুদ্ধিতে যাহা প্রতিভাত হইতে লাগিল, তাহাতে আপনাকে নিয়োগ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম।" (১৮৪৪, ১৮৪৫; আত্মজীবনীর ৪৫—৪৭ পৃষ্ঠা।)

ঈশ্বর যে মানুষের অন্তরে থাকিয়া মানুষকে তাহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করেন, ব্রাহ্মসমাজ এই কথা বলিয়া ভারতবর্ষের ধর্ম্মে একটী নূতন ধারা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। শাস্ত্র নয়, গুরুর উপদেশ নয়, কিন্তু অন্তরবাসী দেবতার আদেশই যে মানুষের চালক, তাঁহার আদেশ যে শাস্ত্র দেশাচার প্রভৃতির অপেক্ষা অধিক পালনীয়, এ কথা ভারতে নূতন। বলিতে গেলে, ইহাই ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মতত্ত্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কথা। এই কথাটি দেবেন্দ্রনাথের মধ্য দিয়া এই সময়ে প্রথম প্রকাশিত হইল। তিন বৎসর পরে যখন দেবেন্দ্রনাথ এই তত্ত্বটিকে 'ব্রাহ্মধর্ম্মবীজে' "তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব" স্ব-রচিত এই মহাবাক্যের ভিতরে নিবদ্ধ করিলেন, তখন ইহা দেশবাসী সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিল। পরবর্ত্তী যুগে কেশবচন্দ্র 'বিবেক-বাণী' নামে এই তত্ত্বটিকে আরও উজ্জ্বল করিয়া তুলিলেন।

(৪) ঈশ্বরকে অন্তরের নিয়ন্তা (অর্থাৎ বিবেকের অধিপতি) রূপে জীবনে স্থাপন করিবার পর দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম্মজীবন আরও বিকশিত হইল। তাহার ফলে, ঈশ্বরের প্রেমরাজ্যে নিত্য সহবাস লাভের জন্য তাঁহার অন্তরে প্রার্থনার উদয় হইল; এবং ক্রমশঃ সে প্রার্থনা পূর্ণ হইল। "তাঁহার প্রেমের আভা আমার হৃদয়ে আসিতে লাগিল।.........আমার সৌভাগ্যের দিন উদয় হইল। আমি এখন প্রেম পথের যাত্রী হইলাম।" (১৮৪৫; আত্মজীবনীর ৪৮, ৪৯ পৃষ্ঠা।)

দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীর এই অংশ (একাদশ ও দ্বাদশ পরিচ্ছেদ) অতিশয় মূল্যবান্। ইহা গভীর প্রণিধানের সহিত অধ্যয়ন করা আবশ্যক। দেখিতে পাওয়া যায় যে, দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম্মজীবনের বিকাশের ক্রম এইরূপ:—প্রথম, ঈশ্বরকে জানা; তৎপরে, ঈশ্বরের আদেশের অধীন হওয়া; তৎপরে, ঈশ্বরের প্রেম অনুভব ও তাঁহার নিত্য সহবাস লাভ করা। **দেবেন্দ্রনাথ প্রেমানুভূতিতে পৌঁছিলেন, ভাবচর্চ্চার পথ দিয়া নয়, আজ্ঞাধীনতার পথ দিয়া**,—ইহা বিশেষ ভাবে লক্ষ করিবার বিষয়। সারবান্ সুদৃঢ় ঘাতসহ ধর্ম্মজীবন লাভের ইহাই চিরন্তন পদ্ধতি।

(৫) দৈনিক ধর্ম্মসাধনে নিষ্ঠার ফলে, যে-উপনিষদ্ হইতে তিনি স্বীয় ধর্ম্মজীবনে পূর্ব্বে এত সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার অন্তরে সেই উপনিষদের প্রতি নির্ভর বর্দ্ধিত হইল, ও তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের প্রধান সহায় হইবে, এই আশার উদয় হইল। (আত্মজীবনী, ৫৩ পৃষ্ঠা।)

(৬) ১৮৪৬ সাল হইতে দেবেন্দ্রনাথের জীবনে ঈশ্বরের আদেশ পালনের সঙ্কল্প হইতে উত্থিত পরীক্ষাসকল আসিতে লাগিল। এই বৎসরে তাঁহার পিতার মৃত্যু হইল। দেবেন্দ্রনাথ অপৌত্তলিক ভাবে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। এই সঙ্কল্প রক্ষা করিতে গিয়া তাঁহাকে সকল আত্মীয় স্বজনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে হইল।

ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে পারিবারিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানে-

[ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিকী উপলক্ষে মহর্ষির আত্মজীবনীর যে নূতন সংস্করণ প্রস্তুত হইতেছে, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী লিখিত তাহার পরিশিষ্টের পাণ্ডুলিপি হইতে গৃহীত।

ধর্ম্মকে ও সত্যকে রক্ষা করিবার জন্য সমাজের গঞ্জনা ও আত্মীয় স্বজনের বিরাগ অনেককেই সহ্য করিতে হইয়াছে, সহস্রের সম্মুখে একাকী অনেককেই দণ্ডায়মান হইতে হইয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের এই শ্রেণীর ধর্ম্মবীরগণের অগ্রণী সেই যুগে এই সংগ্রামে তাঁহার সঙ্গী ও সহায় প্রায় কেহই ছিল না; তাঁহার সম্মুখে অপরের দৃষ্টান্তও ছিল না। তিনি স্বভাবতঃ নম্র ও ধীর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন; সংস্কারকের উত্তেজনা তাঁহার ভিতরে ছিল না। কেবল ঐকান্তিক ধর্ম্মপ্রাণতাই তাঁহাকে এই সংগ্রামে এই অপূর্ব্ব বীর্য্য প্রদান করিয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ আত্মজীবনীতে (৬২-৬৯ পৃষ্ঠা) এই সংগ্রামের বর্ণনা করিয়া অবশেষে লিখিতেছেন, "জ্ঞাতি বন্ধুরা আমাকে ত্যাগ করিলেন, কিন্তু ঈশ্বর আমাকে আরো গ্রহণ করিলেন। ধর্ম্মের জয়ে আমি আত্মপ্রসাদ লাভ করিলাম। এ ছাড়া আর আমি কিছুই চাহি না।"

(৭) ব্যবসায় পতন ও বিষম ঋণভারের ভিতরে দেবেন্দ্রনাথের জীবনে ঈশ্বরের আদেশ পালনের দ্বিতীয় পরীক্ষা আসিল। আত্মীয়গণের বিষয়বুদ্ধিপ্রসূত পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া তিনি সঙ্কল্প করিলেন যে, পিতৃকৃত ট্রষ্ট ডীডের সুবিধা গ্রহণ করিয়া নিরপরাধ উত্তমর্ণগণকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হইবে না, সমগ্র সম্পত্তিই উত্তমর্ণদের হাতে সমর্পণ করিতে হইবে। প্রতিপত্তিশালী আত্মীয়গণের সনির্ব্বন্ধ পরামর্শ (ইন্‌সল্‌ভেন্সি লওয়া) তিনি ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিলেন। (১৮৪৮ সালের প্রথম ভাগ; আত্মজীবনীর ৮৫—৮৮ পৃষ্ঠা।)

(৮) সম্পত্তিনাশে দেবেন্দ্রনাথ দুঃখিত না হইয়া আনন্দিতই হইলেন। দ্রুতবেগে ব্যয়সঙ্কোচের ব্যবস্থাসকল করিতে লাগিলেন। রিক্ততার আনন্দে হৃদয়কে পূর্ণ করিয়া, বিপুল ঋণশোধের উদ্বেগ ও ঝঞ্ঝাটের ভিতরেও তিনি গভীর অভিনিবেশ সহকারে ধর্ম্মচিন্তায় শাস্ত্রাধ্যয়নে ও ধর্ম্মগ্রন্থপ্রণয়নে নিযুক্ত হইলেন। (১৮৪৮ সালের দ্বিতীয়ার্দ্ধ; আত্মজীবনীর ৮৯, ৯০ পৃষ্ঠা।)

(৯) ১৮৪৭ সালে দেবেন্দ্রনাথ কাশীতে গিয়া বেদ শ্রবণ করিয়া আসিয়াছিলেন (আত্মজীবনী, ৭৪ পৃষ্ঠা)। তদুপরি এই সময়ের গভীর অভিনিবেশপূর্ব্বক বেদ ও উপনিষদ্ আলোচনা হইতে দ্বিবিধ ফল উৎপন্ন হইল (আত্মজীবনী, ১৮, ২০ ও ২২ পরিচ্ছেদ)। প্রথম, ব্রহ্মোপাসনাপ্রণালীতে তৃতীয় বাক্য 'শান্তং শিবমদ্বৈতম্' যোগ করা হইল। দ্বিতীয়, উপনিষদে ব্রাহ্মধর্ম্মের পত্তনভূমি হইতে পারিবে না, এবং জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়ই তাহার পত্তনভূমি, দেবেন্দ্রনাথ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন।

(১০) যখন কোনও প্রাচীন ও প্রামাণ্য শাস্ত্রগ্রন্থকে ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তি করা গেল না, তখন ব্রাহ্মদিগের ঐক্যস্থল কোথায় হইবে, এই চিন্তা দেবেন্দ্রনাথের চিত্তকে অধিকার করিল। এই চিন্তায় চালিত হইয়া তিনি ক্রমে 'ব্রাহ্মধর্ম্মবীজ' ও ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থের প্রথম খণ্ড রচনা করিলেন। (১৮৪৮ সাল; আত্মজীবনী, ২৩ পরিচ্ছেদ।)

দেবেন্দ্রনাথের জীবনের এই বৎসরটির কথা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। এই ১৮৪৮ সালেই ব্যবসায় পতনের বজ্রাঘাত; উত্তমর্ণদের হাতে ট্রষ্ট সম্পত্তি সমর্পণরূপ অপূর্ব্ব মহত্ত্বের কার্য্য। সে জন্য আত্মীয়গণের বিরাগের তুমুল ঝটিকাবর্ত্তে পতিত হওয়া; ভোগবিলাসের সকল আয়োজন বিদায় করিয়া দিয়া অনভ্যস্ত দারিদ্র্যের জীবনে প্রবেশ; তদুপরি এই অবস্থার ভিতরে ধর্ম্মচিন্তায় ও শাস্ত্রাধ্যয়নে গভীর ভাবে নিমগ্ন হইয়া ব্রহ্মোপাসনাপদ্ধতির সংস্কার, 'ব্রাহ্মধর্ম্মবীজ' ও 'ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ' রচনা করা, এবং ঋগ্বেদের অনুবাদ আরম্ভ করা,—এই সকল গুরুতর ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে। এটি তাঁহার জীবনের একটি অতি আশ্চর্য্য ও অতি গৌরবময় বৎসর!

(১১) দেবেন্দ্রনাথের জীবনের এই সকল সংগ্রামের ফলে তাঁহার ধর্ম্মবন্ধুগণের সঙ্গে সম্বন্ধ গাঢ়তর হইল, ও ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাদিতে নূতন সরসতার আবির্ভাব হইল। ধর্ম্মরাজ্যের ইহাই চিরন্তন নিয়ম; ঈশ্বরের চরণে বিশ্বস্ততা হইতেই ধর্ম্মসমাজের সজীবতার দিন আসে। ১৮৪৯ সালের মাঘোৎসব নূতন সরসতার সহিত সম্পন্ন হইল। কেনেলন রচিত নূতন একটি স্তোত্র পাঠ করা হইল; তাহা শ্রবণ করিয়া অনেক উপাসক ভাবে মগ্ন হইয়া অশ্রুপাত করিলেন। "ইহার পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজে এ প্রকার ভাব কখনই দেখা যায় নাই। পূর্ব্বে কেবল কঠোর জ্ঞানাগ্নিতেই ব্রহ্মের হোম হইত, এখন হৃদয়ের প্রেমপুষ্পে তাঁহার পূজা হইল।" (আত্মজীবনী, ২৪ পরিচ্ছেদ।)

প্রচার ব্রত

প্রেমাস্পদ সতীশ, আজ প্রায় ৪০বৎসর তোমার সঙ্গে পরিচয়। ব্রাহ্মধর্ম্মকে বরণ করিবার জন্য পিতামাতা ও আত্মীয়দের বাধা অতিক্রম করিবার উদ্দেশ্যে এফ্. এ পরীক্ষা অপূর্ণ রাখিয়া পদব্রজে ঢাকা হইতে ১৪মাইল চলিয়া ট্রেন ধরিয়া ময়মনসিংহে গেলে—একেবারে সটান আমার পরিবারের মধ্যে প্রবেশ করিলে। নানা ভাবে ঘুরিয়া শেষে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিলে। তোমার সঙ্গে আশ্রমে, ব্রাহ্ম-বালক বোর্ডিংএ, আরো সাধনাশ্রমে ও বাঁকিপুরে এক সঙ্গে বাস করিয়া যে ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে, তাহা স্মরণ করিয়াই আজ এই পবিত্র দিনে আচার্য্যের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছি। ভক্তিভাজন শাস্ত্রী মহাশয় তোমাকে কত ভালবাসিতেন! আজ তিনি জীবিত থাকিলে এই পবিত্র অনুষ্ঠানে উপদেষ্টার পদগ্রহণ করিতে তিনি কত আনন্দিত হইতেন, কার্য্যও কত সুশোভন হইত!

মানুষ আপনার জীবনকে অতিক্রম করিয়া চলিতে ও বলিতে পারে না। আজ যাহা বলিব তাহা তোমার নিকট তত উচ্চ কথা মনে নাও হইতে পারে। তবে ভালবাসার দান ব'লে আদরেই গ্রহণ করিবে।

আজ সর্ব্ব প্রথম কথা—জীবনে বিশেষরূপে অনুভব কর, পিতা তোমাকে তাঁহার সেবকের পদে বরণ করিয়াছেন। আজ হৃদয়ের

৩১শে চৈত্র, ১৩৩১, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর প্রচারক পদে বরণ উপলক্ষে শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী কর্তৃক প্রদত্ত উপদেশ।

গভীর স্থানে এই স্পর্শ অনুভব কর। তাঁহার সেবক-পদে বৃত হইয়া আপনাকে গৌরবান্বিত মনে কর। মানুষ বরণ করিলেন, কমিটি বরণ করিলেন, আচার্য্য বরণ করিলেন, মনে ভাবিবে না। পিতা তোমাকে বরণ করিয়াছেন। ভক্তিভাজন শাস্ত্রী মহাশয় আশ্রমে আমাকে বলিতেন, "গুরুদাস, ভক্তি দুই প্রকার—বাঁদরে ভক্তি ও বিড়ালে ভক্তি। বাঁদরমাতা যখন লাফ দিয়া চলে, শাবক অনেক সময় পড়িয়া যায়। কিন্তু বিড়ালমাতা শাবককে আপনার মুখে করিয়া লইয়া যায়। আর তাহার পড়িবার ভয় থাকে না।" তাই আজ বলিতে ইচ্ছা হয়, আজ পিতার হাতে ধৃত হইলে, এইটি অনুভব কর। আজ নিজের বিদ্যা বুদ্ধি প্রতিভা কোন কথা মনে করিবে না: ভাবিবে 'তিনি যদি রাখেন তবে থাকি।' এই পথে কত জনের পতন ও পদচ্যুতি দেখিয়া, 'আমি ধরিয়া রহিয়াছি' এই ভাবিয়া নিজের গৌরব করিও না। কিন্তু পিতার কৃপা অনুভব কর। পিতাকে আরও ভাল করিয়া ধর ও তাঁহাতে আত্মসমর্পণ কর। জানিবে সে-ই স্থির থাকে যে ধৃত হয়। ভগবানের সেবার অধিকার অতি অল্প লোকেই প্রাপ্ত হয়। যদি তাঁহার দয়াতে সেই অধিকার পাইয়া থাক, সাবধান, সাবধান তাহা কখনও পরিত্যাগ করিবে না।

ঈশ্বরের সেবকের প্রধান সাধন কি? প্রধান সাধন মুক্তি—স্বাধীনতা। Iron bars do not make a prison. অন্তরের রিপুসকলের অধীনতা বন্ধনের কারণ। যে রাজ্য জয় করে সে বীর নয়, যে আপনাকে জয় করে সে-ই প্রকৃত বীর, সে-ই স্বাধীন। প্রাণের কথা বলি—জীবনের অধীনতা কত ছিল, তাহার বর্ণনা হয় না। কাম ক্রোধ লোভ, এই সকল মানুষের কত বড় বড় প্রভু! এই এক একটি দমন করিতে কত সংগ্রাম, তাহা অন্তর্যামী পুরুষ ভিন্ন কেহ জানেন না। কত প্রার্থনা, কত আত্মনির্য্যাতন, কত ক্রন্দন এই রিপু জয় করিতে দরকার! সর্ব্বদা স্বাধীনতার গর্ব্ব করি, কিন্তু নিজের মান, অভিমান, সুখলালসা থাকিতে জীবনে মুক্তির আনন্দ পাইবে না। "লজ্জা মান ভয়, এই তিন থাকতে নয়।" আজ প্রভুর দাসত্ব লইয়া বল "যে বলেছে দাস হব, তার কি গুমর আছে? তার লোকলজ্জা মান অভিমান ঐ চরণে বিকিয়াছে।"

এদেশে ধর্ম্মপ্রচারককে মুক্ত জীব বলে। কোন বন্ধন আর তার নাই। আজ ব্রত গ্রহণ কর, মুক্ত জীব হইয়া তাঁহার সেবা করিবে। স্ত্রী পুত্র পরিবার সব তাঁহার চরণে সমর্পিত হইল। এই মুক্তিসাধনে বৈরাগ্য পরম বন্ধু। এমন কোন বস্তু থাকিবে না, যাহা না হইলে আমার চলে না। আজ বন্ধুদের নিকট হইতে আদর সাহায্য পাইতেছ। ধর্ম্মপথের যদি তাহা অন্তরায় হয়, বিনা বাক্য ব্যয়ে বৃক্ষতলে যাইতে কুণ্ঠিত হইবে না। জীবনের মুখ্য সাধনা কি? তোমার প্রতিজ্ঞায় বলিয়াছ—পিতার সঙ্গ। এই সাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়া মুক্ত হও। আবার বলি, এমন কিছু থাকিবে না যাহা না হইলে আমার চলিবে না। অন্ন কোনও বস্তু, সুখ, আরাম অপরিত্যাজ্য হইলেই মুক্ত হইলে না; স্বাধীন হইলে না। প্রাচীনদের কথা এই—ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ হয়। তাই বার বার করিয়া বলি বৈরাগ্যকে জীবনের সম্বল কর।

আর দ্বিতীয় মন্ত্র—সকল দুঃখে অভাবে পিতার চরণে নির্ভর। যাহা প্রয়োজন তিনি নিশ্চয় নিশ্চয় দিবেন। God is our shepherd, we shall not want. তিনি প্রতিপালক, নিশ্চয়ই তিনি অভাব পূর্ণ করিবেন, এই অটল নির্ভর জীবনে সর্ব্বদা রক্ষা করিবে।

এই আত্মোৎসর্গের জীবন, এই দেবজীবন, এই মুক্ত জীবন যে পায় সে-ই প্রচারকের পদ পায়। ঈশাকে তাঁহার শিষ্য Philip বলিল Lord show us the Father and it sufficeth us. প্রভু পিতাকে দেখাও, তাহাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। ঈশা বলিলেন "Philip, এত দিন তোমার সঙ্গে রহিলাম তুমি পিতাকে এখনও জানিলে না? যে আমাকে দেখিয়াছে সে পিতাকে দেখিয়াছে। তবে কি ক'রে বল পিতাকে দেখাও?" Emerson বলেন, মানব ইতিহাসে ঈশার মত আর কেহ মানুষের মহত্বকে দেখে নাই, সেই জন্য তিনি প্রকৃত প্রচারক। আমার মধ্য দিয়া, তোমার মধ্য দিয়া, সকলের মধ্য দিয়া ঈশ্বর কার্য্য করেন; ঋষির ভাষায় বলি, God incarnates himself in man. এই সত্য যে অনুভব করে না, এই দৃষ্টি যে লাভ করে নাই, সে কি প্রচারব্রত গ্রহণ করিতে পারে? মানুষকে পতিত, মন্দ, ঘৃণিত বলিয়া তিরস্কার করা প্রচার নহে। কিন্তু মানুষ, তোমার মধ্যে দেবতা, তুমি দেবসন্তান, তুমি মহান্, তুমি দেবতা, এই দৃষ্টি খুলিয়া দেওয়া, এই অনুভূতিতে মানুষকে লইয়া যাওয়াই প্রকৃত ধর্ম্ম প্রচার। যে নিজে এই দৃষ্টি লাভ করিতে পারে, সেই প্রচার করিতে পারে। আমরা কি ইট পাথরের নিকট প্রচার করি? যেই খানে সাড়া পাওয়া যায় সেই খানেই প্রচার। সাড়া দিতে পারে কে? মানুষ, মানুষ, মানুষ, যাহার মধ্যে দেবত্ব আছে। আপনার মধ্যে দেবত্ব না দেখিলে কেহ অন্যের মধ্যে প্রচার করিতে পারে না। ঈশ্বরবিশ্বাস ঈশ্বরনির্ভর যেমন প্রচারকজীবনের বিশেষ সার কথা, তেমনি মনুষ্যবিশ্বাসও প্রচারকজীবনের সাধন। সকলকে যদি পশু মনে কর, তবে প্রচার কাহার নিকট করিবে? কে তোমার কথা শুনিবে? মানুষকে যদি বল্‌তে না পার, 'তোমার মধ্যে পিতাকে দেখ, আমার মধ্যেও পিতাকে দেখ,' তবে প্রচার কি হইবে? প্রচার কত হীন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে! কারণ, মানুষ মত প্রচার করে, মত (dogma) প্রচার করে; কিন্তু পরমাত্মার প্রকাশ দেখাইতে পারে না। সেই পথ দিয়া যায় না। অন্যের মধ্যে দেব-ভাব জানা যায় কি ক'রে? শোন ঋষি কি বলেন, :—Nothing responds more infallibly to the secret cry of goodness (in me) than the secret cry of goodness that is near. I doubt if any thing in this world can beautify a soul more spontaneously and naturally than the knowledge that somewhere in its neighbourhood there exists a pure and noble being whom it can unreservedly love—যাঁরা কাছে রয়েছেন তাঁদের সাধুতার জন্য অন্তরের গোপন আকাঙ্ক্ষা আমার অন্তর্নিহিত সাধুতার জন্য আকুলতাকে যেমন সাড়া ও সায় দেয় এমন আর কিছুতেই দেয় না। আমার

সন্নিকটেই কোথাও এমন একজন পবিত্রচরিত্র ও উন্নতমনা লোক আছেন যাকে সারা প্রাণ দিয়ে ভাল বাসিতে পারি, এই অনুভূতি যেমন সহজে ও স্বাভাবিক ভাবে আত্মাকে সুন্দর করিতে পারে, এমন আর এ জগতে কিছুই করিতে পারে না।

তাই বলি প্রচার করিবার পথ—Be a divine man to your neighbour. বক্তৃতা উপদেশ অনেক সময় আকাশে লীন হইয়া যায়,—কিন্তু আপনার মধ্যে পিতাকে দর্শন কর। আমার মধ্যে পিতাকে দেখ, এই কথা যদি বলিতে পার, তবে এত সহজে ও স্বাভাবিক রূপে প্রচার হইবে, যেমন আর কিছুতেই হয় না।

শেষ কথা এই—প্রচারকজীবনের আর একটী ভীষণ ভ্রান্তি আছে, তাহা দূর করা আবশ্যক। ঈশ্বরসাধন সম্বন্ধে আমরা কেবল সমবেত সাধন দ্বারা তুষ্ট হই না; কিন্তু নীরবে, গোপনে, ঈশ্বরকে ব্যক্তি রূপে, পিতামাতা রূপে, পাইতে চাই, যাহা না হইলে জীবনের সাধন পূর্ণ হয় না, মনে করি। ধর্ম্মসাধনে alone to the alone সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন। দশ জনে এক সঙ্গে কীর্ত্তন করিয়া, দুই শত লোক এক সঙ্গে উপাসনা করিয়াই আমরা তৃপ্ত হই না। ঈশ্বরকে প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন, বলিয়া গোপন সঙ্গ করিতে চাই। কারণ, তিনি একজন ব্যক্তি, তাঁহার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক, তাহা উপলব্ধি করিতে চাই। এইরূপ প্রচারের কার্য্যে একটা ভ্রান্তি আছে; তাহা এই:—অনেকে মনে করেন অনেক লোককে একত্রিত ক'রে উপদেশ দান ও বক্তৃতা করাই প্রচার। কিন্তু প্রকৃত প্রচার তাহাতে হয় না। এ সব কার্য্যের উপকারিতা নাই, তাহা বলি না; কিন্তু প্রকৃত প্রচার ব্যক্তিতে ব্যক্তিতেই সম্ভব। আপনার সংগ্রাম ও অভাব মন খু'লে না বলিলে অন্যের নিকট হইতে কি সাহায্য পাওয়া যায়? এই সংগ্রাম, দুঃখ বেদনা ও দুর্ব্বলতার কথা এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকেই বলিতে পারে। আবার এই সংগ্রাম, দুঃখ বেদনা ও দুর্ব্বলতা, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির জীবনে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আসে। তাই সম্বন্ধ ও যোগ ব্যক্তিগত না হইলে প্রকৃত প্রচার হয় না। পাঁচজনের মধ্যে মানুষ আপনার গূঢ় অভাব বলিতে পারে না। তাই প্রচারকজীবনের বিশেষ কথা এই—ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে মিলন ও প্রসঙ্গের জন্য যথেষ্ট সময় দিতে হবে। বৎসরে পাঁচ জনের সঙ্গেও যদি এই ব্যক্তিগত সম্পর্ক লাভ হয়, তবে মনে করিবে প্রকৃত প্রচার হইল। বহু লোকের মধ্যে বক্তৃতা উপদেশে এ ফল লাভ হইবে না। ব্রাহ্মসমাজে যে সাধনের অভাব তাহার কারণ এই ব্যক্তিগত সম্পর্কের অভাব। প্রকৃত ধর্ম্ম প্রচার এই ধর্ম্মবন্ধুতা—রোগে শোকে, পাপ দুঃখে, পরস্পরের সঙ্গী ও সহায় হওয়া। বিশেষ করিয়া এই নব ভাবে প্রচারব্রত সাধন করিবে, এই প্রার্থনা ও অনুরোধ।

ঈশ্বর তোমার সহায় হউন।

প্রচারপ্রার্থীর প্রতি উপদেশ

শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক বিবৃত।

পৃথিবীতে সকল কার্য্যেই সঙ্গী লাভ করা সহজ। বালক ও যুবক কত সহজে খেলার সঙ্গী লাভ করে। ব্যবসায় বাণিজ্যে সঙ্গী ও সাথী সহজেই পাওয়া যায়। কত জন পান ভোজনে একসঙ্গে মিলিত হয়। কিন্তু উপাসনার সঙ্গী বড়ই দুর্লভ। "যে জন ভাবের ভাবুক, পথের পথিক, সেই ত আপনার" —এই ভক্তের সঙ্গীত বড়ই সত্য। ধর্ম্মের পথে, বিশ্বাসের পথে, উপাসনার গভীরতার মধ্যে মানুষ যত প্রবেশ করে, তাহার সহচর ও সঙ্গীর সংখ্যা ততই কম হয়। "প্রকৃত বিশ্বাস" গ্রন্থে সত্য কথাই উক্ত হইয়াছে "বিশ্বাসী যতই অগ্রসর হন, তাঁহার সহচরের সংখ্যা ততই অল্প হয়, সহানুভূতির মণ্ডলী ততই সঙ্কীর্ণ হইয়া যায়।" তাই বলি সাধনপথের সঙ্গী অল্প। অনেক সময় একাকী সংগ্রাম করিতে হইবে ও পথ চলিতে হইবে। এই সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য উপাসনার সঙ্গী লাভ করা। এই সাধনাশ্রম সত্য উপাসকের মিলনস্থান। এই দৈহিক জীবন যেমন অনুকূল আবেষ্টন ভিন্ন বর্দ্ধিত হয় না, তেমনি আধ্যাত্মিক জীবন সাধকসঙ্গ ভিন্ন বাঁচে না। আশ্রম ভাবের ভাবুক লোকের (Kindred spirit) মিলনস্থান। আশ্রমে যোগ দেওয়া ও বাস করা সৌভাগ্যের বিষয়; এর পবিত্র আধ্যাত্মিক হাওয়া প্রস্তুত করা সাধনাশ্রমের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য।

পরিচারক-পদ গ্রহণ করিয়া আশ্রমে যোগ দেওয়ার উদ্দেশ্য ধর্ম্মপ্রচার। প্রচারব্রতের যদি কোন মূল সাধন থাকে, তবে তাহা ঈশ্বর-প্রেরণা জীবনে লাভ করা ও সেই প্রেরণার নিকট সর্ব্বদা বিশ্বস্ত থাকা। সাধ্বী নারী যেমন সৎপতির নিকট নিজের পবিত্র পাতিব্রত্য ধর্ম্ম রক্ষা করেন, তেমনি প্রচারক দেববাণীর নিকট দৃঢ় ভাবে অনুগত থাকেন। যে নিত্য প্রেরণা পায় না, পুস্তকের কথা বলিয়া মানুষের নিকট প্রচার করে, তাহার নীরব হওয়া কর্ত্তব্য।

প্রচারকজীবনের দ্বিতীয় কথা নিম্নোক্ত আখ্যায়িকাদ্বারা ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিব। একজন লোক সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্য কোন ত্যাগী সাধক সন্ন্যাসীর নিকট গমন করেন। সেই সন্ন্যাসী দীক্ষার্থীকে বলিলেন, "তুমি যদি এক সঙ্গে সাত ঘণ্টা ধ্যান করিতে পার, তবে দীক্ষা লইতে আসিবে। কারণ, তাহা না হইলে সংসারের কাজকর্ম্ম ছেড়ে অলস হইবে, আর একাকী বসিয়া বসিয়া সংসারচিন্তা করিবে।" ঈশ্বরসঙ্গে যে সময় কাটাইতে পারে না, তাহার যেমন সন্ন্যাস গ্রহণ করা উচিৎ নহে, তেমনি ঈশ্বরসঙ্গই যে জীবনে পায় না, তাহার এই ব্রত গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে। ইহার উপর আরও একটা কথা আছে। প্রসূতির স্তনে দুগ্ধ সঞ্চারিত হইলে যেমন সন্তানের জন্য ব্যাকুলতা অনুভব করেন, তেমনি প্রচারের প্রাণ অন্যকে ধর্ম্ম দিবার জন্য প্রাণ আকুল হইবে। মানুষের জন্য এই আকুলতা না হইলে প্রচারব্রত গ্রহণ কি ঠিক কাজ? মানবাত্মার মঙ্গলের জন্য এই ব্যাকুলতা (Longing) প্রচারকজীবনের বিশেষত্ব।

প্রচারকজীবনের আর একটা বিপদের কথা বলি। প্রকৃত প্রচার ব্যক্তিতে ব্যক্তিতেই হয়। অনেক গুলি লোককে একত্র করিয়া অনেক কথা বলাকে প্রচার বলি না। ঋষির কথা সর্ব্বদা মনে রাখিবে—Men are not saved by bundles মানুষকে আঁটী বাঁধিয়া স্বর্গে লওয়া যায় না। এই ব্যক্তিগত সম্পর্ক

ধর্ম্মপ্রচারের প্রাণ। ইহার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ধর্ম্ম-প্রচার যেন ব্যক্তিগত সম্পর্কবর্জ্জিত (impersonal) না হয়। ইহা আত্মার আত্মায় ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও যোগ।

উপদেষ্টার জীবনের আরও দুই একটা অভাবাত্মক কথা বলি। প্রচারককে সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশিতে হয়—ধনী নির্ধন, পণ্ডিত অজ্ঞান, পাপী ও পুণ্যবান। সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতে হইবে, কোন কার্য্যে যেন কোন ব্যক্তিগত অভিসন্ধি ও স্বার্থ না থাকে। ধনীর গৃহে ঈশ্বরের নাম করিতে যাইতে পার, কিন্তু কোন ব্যক্তিগত মতলব বা স্বার্থ যেন না থাকে। পতিত দুঃখীর দ্বারে যেতে পার, কিন্তু সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতে হইবে যেন অহঙ্কার না আসে। এক কথায় বলি Be free from personal motives, self-interests and vanity জীবনকে সর্ব্বদা অভিযোগশূন্য রাখিতে হইবে। মানুষ ও ঈশ্বরের হস্ত হইতে দুঃখ, বিপদ, নিন্দা যাহা আসুক, তাহা মস্তক পাতিয়া ঈশ্বরের দান বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

দুইটী কথা বলিয়া শেষ করিব।

১। দিনান্তে নিশান্তে উপাসনা গভীর হওয়া চাই। প্রতি দিন ঈশ্বরচরণে হিসাব পরিষ্কার করিবে। মনোমত চলিতেছি, না, তাঁহার আদেশে চলিতেছি, তাহা বিশেষ ক'রে জীবনে পরীক্ষা করিতে হইবে।

২। সমগ্র হৃদয়ের সহিত পিতাকে ভালবাসা; এই প্রেম ধর্ম্মপ্রচারের মূল মন্ত্র। এই প্রেম ও ভক্তি জীবনে না থাকিলে দুই পা চলিয়া ক্লান্ত হইবে ও অভিযোগ করিবে। সমগ্র হৃদয়ের সহিত পিতাকে ভালবাসিতে পারিলেই প্রচারক-জীবন সার্থক।

পরলোকগতা জয়কালী গুপ্তা

শ্রাদ্ধবাসরে পঠিত।

গত ৫ই পৌষ, ১৩৩২ সাল, তারিখে শ্রীখণ্ড গ্রামে পরলোকগত জগদীশ্বর গুপ্ত মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী জয়কালী গুপ্তা ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। তাঁহার স্বামীর ন্যায় তাঁহারও পুণ্যশ্লোক জীবনকাহিনী সকলেরই স্মরণীয়, অনুকরণীয়। ১২৫২ সনে জগদীশ্বর বাবুর জন্ম হয় এবং জয়কালী দেবীর জন্ম হইয়াছিল ১২৫৩ সালে। শ্রীখণ্ড, বর্দ্ধমান জেলায় একটী বিখ্যাত বৈদ্য সমাজ। ইনি তত্রস্থ বিখ্যাত চৌধুরী বংশের পরলোকগত রাধানাথ চৌধুরী মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা। জগদীশ্বর বাবুর বয়স যখন ১১ বৎসর এবং জয়কালী দেবীর বয়স ১০ বৎসর সেই সময়ে উভয়ে পরিণীত হয়েন। সেই জন্য তাঁহাদের জীবন প্রায় সমসূত্রে গ্রথিত, পৃথক করিলে সৌন্দর্য্যহানির সম্ভাবনা। রাধানাথ চৌধুরী মহাশয় সে সময়ে বাহারবন্দরের নায়েব ছিলেন। স্বর্ণময়ী দেবীর এই জমীদারীর নায়েবী পদ, তখন বিশেষ সুম্মানের এবং অর্থাগমের বিষয় ছিল। রাধানাথ বাবু ধনসম্পদে নিজ গ্রামে যখন প্রধান ব্যক্তি তখন বহু অনুসন্ধানের পর আদরিণী কন্যাকে এই বুদ্ধিমান বালকের হস্তে সম্প্রদান করেন। তখন জগদীশ্বর বাবু পাঠশালায় অধ্যয়ন করিতেন। রাধানাথ বাবুর প্রথম পক্ষে দুই কন্যা হয়। তিনি পুত্রাভাবে পুনর্ব্বার বিবাহ করেন, এবং দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর গর্ভজাত একপুত্র ও চারি কন্যা হয়। দ্বিতীয় পক্ষের কনিষ্ঠা কন্যা জয়কালী দেবী; তিনি বাল্যকাল হইতেই স্বামীর বিশেষ অনুরক্ত হয়েন। এজন্য ১২৬৩সালে যখন জগদীশ্বর বাবু কৃষ্ণনগরের স্কুলে পাঠ করিতে গমন করেন, তখনই স্বামীর সঙ্গে যাইবার জন্য জয়কালী দেবী ক্রন্দন করিয়া আকুল হইয়া উঠেন। এ জন্য কিছুকাল মধ্যে সত্যসত্যই জয়কালী দেবীকে তাঁহার স্বামী কৃষ্ণনগরে লইয়া যাইতে বাধ্য হয়েন। এইরূপ আচরণ সেকালের সমাজে বিশেষ দোষাবহ ছিল। জগদীশ্বর গুপ্ত মহাশয়ের মাতুলাশ্রম মেহেরপুরের স্বনামধন্য জমীদার ও বৈষ্ণব পরিবার "মল্লিক" গোষ্ঠীতে ছিল। জগদীশ্বর বাবু বালক কালেই পিতৃহীন হয়েন এবং ১৯বৎসর বয়সে মাতৃহীন হয়েন। এইরূপে তাঁহার বাল্যবয়সেই বৈরাগ্যের উদয় হয়। জয়কালী দেবীর পিতৃবংশ ঘোর শাক্ত, কিন্তু শাক্ত বৈষ্ণবের সঙ্গমস্থল—শ্রীচৈতন্যসখা নরহরি সরকারের লীলাভূমি—শ্রীখণ্ডের কন্যা জয়কালী দেবী বৈষ্ণ ধর্ম্মের এবং তাঁহাদের সর্ব্বজাতি নির্ব্বিশেষে সম ব্যবহারের প্রতি আস্থাবান হইয়া পড়েন। স্বামীর নিকট বিদেশে গমনের জন্য তখন আত্মীয়গণ, এমন কি জয়কালী দেবীর পিতৃকুলও, তাঁহাদের পরিত্যাগ করিয়াছেন; সমাজের এই অনাদরে এবং নিজেদের সাম্যভাবের মানসিক বৃত্তি দ্বারা ক্রমে তাঁহারা কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ পরলোকগত রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের ও তাঁহার ধর্ম্মমতের প্রতি আস্থাবান হইয়া পড়েন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় জগদীশ্বর বাবু ১৪৲ বৃত্তি পান এবং এল্ এ পরীক্ষায় ২৫৲ বৃত্তি পান ও ছাত্রগণকে অধ্যাপনা করাইয়া সেই আত্মীয়শূন্য প্রবাসে স্বামীস্ত্রীর অতি ক্লেশে চলিয়া যাইত। জয়কালী দেবীকে ইতোমধ্যে তাঁহার স্বামী মনোমত করিয়া শিক্ষা দিতেছিলেন। মিশনারী মেমগণের নিকটেও তিনি যথেষ্ট শিক্ষালাভ করিতে লাগিলেন। এই সব সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীখণ্ড ও মেহেরপুর সমাজ তাঁহাদের সমাজচ্যুত করিল। তাঁহারা ইতোমধ্যে পবিত্র ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছেন। নববিধান সমাজ হইতে ক্রমে সাধারণ সমাজের উপর তাঁহারা শ্রদ্ধাবান হইয়া পড়েন। বি-এল্ পরীক্ষায় পাশ হওয়ার পর, তাঁহার স্বামী যখন কৃষ্ণনগরে ও পরে দিনাজপুরে ওকালতি করিতে থাকেন, যখন অতি দুঃখে তাঁহাদের দিন কাটিতেছিল—তখনও পিতৃসম্পদের ভোগের জন্য তিনি তাঁর স্বামীর নির্য্যাতনকারী সংসারে কখনও আসিতে চাহেন নাই; চিরদিন স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার ন্যায় অনুগমন করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তাঁহার উৎসাহ এবং ধর্ম্মপ্রাণতায় অনুপ্রাণিত না হইলে, পরিণামে জগদীশ্বর বাবুর সাহিত্য-জীবন এত বাধা বিপত্তির ভিতর দিয়া সফল হইয়া উঠিতে পারিত না। স্ত্রীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধক্রমে জগদীশ্বর বাবু ওকালতির মোহ ত্যাগ করিয়া, কথঞ্চিৎ শান্তিময় মুন্সেফি চাকুরী গ্রহণ করেন। প্রথমে কাঁথি, পরে যথাক্রমে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, জাজপুরে অস্থায়ী ভাবে থাকিয়া নেত্রকোনায় স্থায়ী ভাবে বদলি হয়েন। জয়কালী দেবী বলিতেন, এ সময়ে অবকাশ মত তাঁহারা প্রথমতঃ ঐ সকল প্রত্যেক স্থানে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন, তৎপরে

ব্রহ্মমন্দির স্থাপন এবং বালকগণের জন্য ইংরাজী স্কুল স্থাপনের জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহাদের প্রাণ পড়িয়াছিল দেশের দিকে। কিরূপে শ্রীখণ্ডে নিকটবর্ত্তী স্থানে আসিয়া চৈতন্য-চরিত আলোচনায় মনোনিবেশ করিতে পারেন, এ জন্য নিত্য প্রার্থনা কালে তাঁহারা শ্রীভগবানকে জানাইতেন। শ্রীভক্তের বাসনা অপূর্ণ থাকে না—জগদীশ্বর বাবু শীঘ্রই দ্বিতীয় মুন্সেফিতে [illegible] বদলী হয়েন। এইরূপে তাঁহাদের শ্রীগৌরাঙ্গের চরিত আলোচনার পরম সুযোগ হয়। সেই সময়েই শ্রীখণ্ডে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়টীর ভিত্তি স্থাপিত হয়। তৎপরে বাগেরহাটে জগদীশ বাবু বদলি হইয়া চৈতন্য-চরিতামৃত সম্পাদনে একাগ্র হইলেন ও "নব্যভারত" পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে চৈতন্য-লীলামৃত প্রবন্ধাকারে লিখিতে থাকেন। জয়কালী দেবী বলিতেন যে, চৈতন্যচরিতাখ্যান আলোচনা করিতে করিতে কতই বিনিদ্র রজনী তাঁহারা অতিবাহিত করিয়াছেন, কত সময়ে কত ভাবে তন্ময় হওতঃ স্বামী স্ত্রীতে আহার,নিদ্রা ত্যাগ করিয়া নৈসর্গিক আনন্দে বিভোর হইয়া থাকিতেন। কাছারীর ভাত রান্না হয় নাই, কাছারী প্রত্যাগমনের পর পোষাক খুলিতে ভুলিয়া গিয়া, ক্ষুৎপিপাসায় কাতর না হওয়া পর্য্যন্ত উভয়ে ধ্যান-মগ্নের মত চৈতন্য-ধর্ম্মের আলোচনায় মুগ্ধ হইয়া থাকিয়াছেন—এক্ষণে সে সব কথা স্মরণ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া থাকে। সত্য কথা বলিতে কি, আজকালকার হাকিমদিগের পরিবারের মত যদি জয়কালী দেবীর স্বভাব হইত, তাহা হইলে

দুরূহ ভক্তি-গ্রন্থগুলির সঙ্কলন কার্য্য জগদীশ্বর বাবুর দ্বারা যে সম্ভবপর হইত না তাহা বলাই বাহুল্য! তাঁহাদের কোনও সন্তানাদি হয় নাই; স্বচ্ছন্দেই সেই অর্থকৃচ্ছতার পর এই আশাতীত আয় এবং সম্মান তাঁহারা সম্ভোগের আনন্দে ব্যয়িত করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা না করিয়া ধর্ম্মজীবন যাপন, ধর্ম্মশাস্ত্র পঠন পাঠন আলাপন এবং লেখন ও পরার্থে ভিক্ষুকের ন্যায় চাঁদা আদায় করিয়া জনহিতকর অনুষ্ঠানসকল স্থাপিতকরণ, প্রভৃতি কার্য্যে এবং সাধ্যাতিরিক্ত অর্থদানদ্বারা তাহা গড়িয়া তুলিতে, এই দম্পতি যাহা করিয়া গিয়াছেন তাহা এখনকার আদর্শস্থানীয়। জয়কালী দেবী এ সমস্ত বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে স্বামীর সহায় ছিলেন,

আমরা অনুমান করি না, তাহা অতি সত্য; যেহেতু তিনি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত স্ত্রীর সঙ্গচ্যুত হয়েন নাই বা স্ত্রীর সহিত পরামর্শ না করিয়া কোনও কার্য্য করেন নাই। জগদীশ্বর বাবু মেঘদূতের পদ্যানুবাদ এবং রামমোহন রায়ের বিষয়ে একখানি পদ্য পুস্তক প্রণয়ন করেন। অতঃপর তিনি কুষ্টিয়ায় ও শেষে নোয়াখালিতে বদলি হয়েন। তখন তিনি তিন শত টাকা বেতন পাইতেছিলেন। লীলাশুকের পদ্যানুবাদ তাঁহার শেষ গ্রন্থ। কুষ্টিয়ার ব্রাহ্মসমাজগৃহ ও উচ্চ ইংরাজী স্কুলবাটী তাঁহারই প্রচেষ্টার ফল। মহিলাদের ভারতের নানা-স্থান দর্শন করানো যে স্ত্রীশিক্ষার একটি বিশেষ অঙ্গ, ইহা তিনি সর্ব্বত্রই প্রচার করিতেন এবং জয়কালী দেবীকে ভদ্র-বেশে বিনামাদি সহ, বিশেষ বিশেষ বন্ধুবান্ধবগণের সহিত দেখা করিবার কালে সঙ্গে লইয়া যাইতেন ও কলিকাতায় বিশিষ্ট স্থল সকলেও লইয়া যান। ১৮৯১খৃঃ এক বৎসরের ছুটী লইয়া এ কারণে তাঁহারা উভয়ে ভারতভ্রমণে বহির্গত হয়েন প্রথমে কংগ্রেসে গমন করেন, তৎপরে কাশী বৃন্দাবন দিল্লি আগ্রা পুনা ও বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে গমন করেন। যেখানেই গিয়া-ছিলেন, কোন না কোনও ব্রাহ্ম পরিবারে আশ্রয় লয়েন, এবং প্রেমভক্তির স্রোতে সকলকে ভাসমান করেন। জয়কালী দেবী দুঃখের সহিত বলিতেন যে, তাঁহার স্বামী জীবিত থাকিয়া এই ভ্রমণকাহিনী মুদ্রিত করিয়া যাইতে পারেন নাই। যদি তাহা সম্ভব হইত তাহা হইলে তাহা একখানি উপাদেয় গ্রন্থ হইত। সকল স্থানের দ্রষ্টব্য তিনি স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া গিয়া দেখাইয়া ও বুঝাইয়া দিতেন। জগদীশ্বর বাবু, আদি নববিধান ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ত্রয়কে ধর্ম্মপ্রচারের কেন্দ্ররূপে একই চক্ষে দেখিতেন, এবং তাঁহার স্ত্রীও যে ঠিক সেইরূপ মনে করিতেন, তাহা যে-কেহ জয়কালী দেবীর ধর্ম্মজীবনের সহিত পরিচিত ছিলেন তিনিই সাক্ষ্য দিবেন। এই সকল স্থানে বহু টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। তীর্থভ্রমণের সমকালে বা তৎপরেই জগদীশ্বর বাবুর স্বাস্থ্য ভগ্ন হয় এবং এক 'উইল্' দ্বারা স্ত্রীকে সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী ও পোষ্য গ্রহণের অনুমতি প্রদান করেন। জগদীশবাবু তাঁহার বন্ধুদের মধ্যে সাহিত্যরথী পরলোকগত দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী মহাশয়কে বিশেষ ভালবাসিতেন এবং যকৃতের বেদনা ও তৎসহ জ্বরবিকারে তাঁহারই বাটীতে ২৫শে আষাঢ় ১৮৯২খ্রীঃ জগদীশ্বর বাবু তাঁহার আবাল্যের সহচরীকে ফেলিয়া রাখিয়া মহাপ্রয়াণ করেন। তাহার পর এই তেত্রিশ বৎসরকাল সাধ্বী জয়কালী দেবী সেই স্বামীর বিরহ সহ্য করিয়া তিলে তিলে মৃত্যুকে বরণ করিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি শ্রীখণ্ডে তাঁহার স্বামীর নির্ম্মিত গৃহে সমাগত হয়েন। কিন্তু আত্মীয়স্বজনের নিকট আশানুরূপ সহানুভূতি পাইলেন না; কারণ তিনি ব্রাহ্ম। তাঁহার ন্যায় নিষ্ঠাচারী বিধবা হিন্দুসমাজেও বিরল ছিল; কিন্তু তিনি একা-দশীতে অন্ন আহার করিতেন এবং স্বাধীনভাবে বিবাহেচ্ছু বিধবা-গণের স্বামী গ্রহণে মত প্রকাশ করিতেন। তাঁহার এক ভগ্নীর দৌহিত্রী বিধবা হইয়া, হস্তের বলয় ও পেড়ে সাটী পরিধান এবং রাত্রে ময়দার দ্রব্যাদি আহার করিতেছে দেখিয়া, তিনি তাঁহাকে ব্রাহ্ম মতে পুনর্ব্বার স্বামী গ্রহণ করতঃ সংসারী হইতে বলেন। বিধবা হওয়ার পর তিনি নিরামিষ আহার করিতে আরম্ভ করেন, কেশ কর্ত্তন করিয়াছিলেন, শয়নগৃহ ত্যাগ করিলেন, তথায় স্বামীর ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, এমন কি বিনামাটী পর্য্যন্ত, এখনও সযত্নে রক্ষিত হইতেছিল। জগদীশ্বর বাবু যে সমস্ত বস্তু আহার করিতে ভাল বাসিতেন তাহা তাঁহার সাধ্বী স্ত্রী ত্যাগ করিলেন। প্রথমে প্রায় ২৫বৎসর কাল, বৎসরে মাত্র দুইখানি বস্ত্র পরিধানে কাটাইয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর বা নিজের পাকায় ও কেবল সিদ্ধ পোড়া দিয়া দিবসের প্রায় তৃতীয় প্রহরে নিরামিষ ভোজন করিতে লাগিলেন ও রাত্রে একমুষ্টি আলো চাউলের মুড়ি বা চাউল ছোলা ভাজা খাইয়া জীবন ধারণ করিতেছিলেন। এরূপ কঠোর ব্রহ্মচর্য্য হিন্দু বিধবার মধ্যেই বা কয়টি দৃষ্ট হয়? অনেক সময়েই ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা প্রকাশিত ধর্ম্মপত্রিকাদি পাঠে রত থাকিতেন। ক্রমে গ্রামের হিতকর বহু প্রকার অনুষ্ঠানে যথা-সাধ্য দান করেন এবং আত্মীয়গণের অভাবেও সাহায্য করেন।

তাঁহার একমাত্র ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূ এবং বিধবা ভগ্নীদ্বয়, অবস্থা বিপর্য্যয়ে দরিদ্রতার কশাঘাতে তাঁহারই সংসারভুক্ত হইয়া পড়েন। তাঁহার স্বামীর, শ্বশুরের ও শাশুড়ী ঠাকুরাণীর সাম্বৎসরিক দিনে দরিদ্রনারায়ণকে ভোজন, বস্ত্রাদি দান ও অর্থদানে পরিতুষ্ট করিতেন। দরিদ্রগণ কখনও তাঁহার নিকট গিয়া বিফল মনোরথ হয় নাই। বিপন্নের তিনি একজন বিশেষ সহানুভূতিকারক ও সহায় ছিলেন। আত্মীয়গণের মধ্যে তাঁহার ভগ্নীর দৌহিত্র, নবদ্বীপের মিউনিসিপ্যালিটীর বর্ত্তমান চেয়ারম্যান ও অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত জনরঞ্জন রায়কে, বিশেষ স্নেহ ও বিশ্বাসের চক্ষে দেখিতেন। যখন সমস্ত আত্মীয়স্বজনেরা তাঁহার ধর্ম্মমতকে উপেক্ষা করিয়া, তাঁহার সেবাকে অগ্রাহ্য করিয়া, তাঁহার সামান্য বিত্তের উপরই বেশী আগ্রহ দর্শাইতে লাগিলেন, সেই সময়ে কতিপয় আত্মীয় এবং ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাসী বর্দ্ধমানের উকিল শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বসু ও জনবাবুর সাহায্যে, তাঁহার স্বামীর ইচ্ছা ও আদেশমত ব্রাহ্ম পরিবারের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিতে, শ্রীমান অবনী নাথ গুপ্তকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। ব্রহ্মোপাসনাদিদ্বারা সে গ্রহণ সিদ্ধ করেন, ও তাহাকে সমস্ত সম্পত্তি দান করতঃ একখানি উইলও রেজেষ্টারী করিয়া যান। তাহাতে প্রায় সমস্ত আত্মীয়গণই ক্রুদ্ধ হইলেন। কিন্তু নিষ্ঠাবতী অচল অটলপ্রায় রহিলেন। দেহের উপর দারুণ নিপীড়নের ফলে তাঁহার অন্নের পীড়া, পেটের অসুখ ও ক্রমে অন্ত্রে 'ক্যান্সার' হয়। কিছুদিন রোগভোগের পর ৫ই পৌষ তাঁহার এই সুদীর্ঘ বিরহের অবসান হয়। গত ৬ই মাঘ তারিখে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি, শ্রীমান অবনীনাথের আমন্ত্রণে শ্রীখণ্ডে গমন করতঃ, পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম মতে তাঁহার শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পাদন করেন। তাঁহার স্বামীর সমাধিস্তম্ভের পার্শ্বে, জয়কালী দেবীর সমাধিস্তম্ভের প্রস্তরফলকে জনবাবুর রচিত নিম্নোক্ত যে কবিতাটি লিখিত হইয়াছে, তাহা যেন তাঁহার জীবনেরই সংক্ষিপ্তসার—

দীর্ঘ বিরহ অবসানে মা গো মিলিলে অমর লোকে।
অবনীর শেষ স্থাপিল হেথায় 'অবনী' আকুল শোকে॥

—

নূতন সঙ্গীত।

৭

ঝিঁঝিট মিশ্র—কীর্ত্তন।

প্রাণ যদি চায়, কাতরে তোমায়
দূরে কি থাক্‌তে পারো?
কেবল, সাধুজনের নও হে তুমি,
(ঘোর) পাপীকেও যে তারো।
ডাক্‌লে পাপী চ'খের জলে
অমনি তোমার আসন টলে,
পাপের ধূলা ঝেড়ে মুছে,
আপ্‌নি তায় কোলে করো।
যখন হয় না কিছু মুখের ডাকে,
শূন্য প্রাণটা শূন্যই থাকে,
কাঁদলে তখন চরণে পড়ে',
চ'খের জলেতেই হারো।
কাঁদাও তবে ভাল ক'রে,
সদা, ডাকি তোমায় অশ্রুভরে,
দেখা দিয়ে হৃদয়-পুরে,
দুঃখতাপ সব হরো।

৮

জয়জয়ন্তী—এক তালা।

একেলা ফেলিয়ে রেখো না আমায়,
কাছে কাছে সদা থাকো।
সবাই যদি গো ছেড়ে যায় দূরে,
তুমি মোরে ছেড়ো নাকো।
বিষাদ-আঁধারে ঘেরিলে জীবন,
মরু সম শুষ্ক হয় যদি মন,
আশালোক দিয়ে, কৃপা বরষিয়ে,
নয়নে নয়নে রেখো।
দৈন্যভারে প্রাণ, হ'য়ে যদি ম্লান,
শান্তি-আশে মাগে বিরামের স্থান,
কোলে টেনে নিয়ে, জননী আমার,
স্নেহের অঞ্চলে ঢেকো।
তুমি যে আমার জীবনের জীবন,
চির-সাথী চির আপনার জন,
এই কথা প্রাণে বল অনুক্ষণ
ভুলিতে আর দিও নাকো।

৯

বাউলে সুর

তেম্‌নি করে' ডাক দেখি মন,
(যেমন), ডেকেছিলেন নদের গোরা।
হরি বলে' প্রেমে গলে'
নেচে কেঁদে পাগলপারা।
মহম্মদ কঠোর সাধনে,
ঘষেছেন মাথা পাষাণে,
না পেয়ে সেই প্রাণের প্রাণে,
নিশিদিন শান্তিহারা।
বোধিতলে শাক্যমুনি,
ধ্যানে মগ্ন দিনযামিনী,
সর্ব্বত্যাগী, পরমযোগী,
জীবপ্রেমে আত্মহারা।
চ'খের জলে যে ডেকেছে,
সেই প্রাণে সাড়া পেয়েছে;
তিনি, দয়ার নিধি, প্রেমজলধি,
ডাক্‌লে পাপী, দেন ধরা।

১০

ভৈরবী মিশ্র—যৎ

আমার প্রাণের ধন তো প্রাণেই আছে,
দূরে কোথায় খুঁজতে যাই?
প্রাণে তোমায় না দেখিলে
বিশ্বে কোথায় নাহি পাই।

লোকে নানা আয়োজনে,
পূজে তোমায় কত স্থানে,
প্রাণের মন্দির আঁধার হ'লে
আঁধার দেখি সকল ঠাঁই।
প্রাণে থাকলে তোমার আলো,
তাতেই সকল হয় উজ্জ্বলো,
দেখি জগৎ যুড়ে তুমই আছ,
তোমা ছাড়া কিছুই নাই।
ওগো আমার প্রাণের প্রভু,
প্রাণ ছেড়ে যেও না কভু,
তোমায়, অন্তরে বাহিরে দেখে,
নামগানে প্রাণ জুড়াই।

১১

সিন্ধু কাফি—এক তালা।

মাঝের আঁধার ঘনিয়ে আসে,
একলা যাব কেমন্ করে' ?
(ওগো) তুমি আমার সঙ্গে থাকো,
(আমায়) নিয়ে চলো হাতে ধরে'।
তোমার হাতে রাখিয়ে হাত,
(যারা) চলে' গেছে তোমার সাথ,
(তারা) পড়ে' গেলে, নেছ তুলে,
ছেড়ে' কভু যাও নি দূরে।
তোমার, হাত ধরে' তো পথ চলিনি,
তোমায়, ভাল তো বাস্তে পারিনি,
তাই চরণ ক্ষত, আশা হত,
কাঁদি এখন বিষাদভারে।
গত অপরাধের কথা,
উঠে প্রাণে দিচ্ছে ব্যথা,
মুখ তুলে' চাও, আলোক দেখাও,
ডাকো আমায় মধুর স্বরে।

শ্রীনীলমণি চক্রবর্ত্তী।

ব্রাহ্মসমাজ

দীক্ষা—বিগত নববর্ষ দিবসে সায়ংকালীন উপাসনান্তে চাঁদপুর নিবাসী শ্রীমান আনন্দমোহন বল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে পবিত্র ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। আমরা নবদীক্ষিতকে সাদরে গ্রহণ করিতেছি। করুণাময় পিতা তাঁহাকে তাঁহার পবিত্র ধর্ম্মের পথে দিন দিন বর্দ্ধিত করুন।

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পুরাতন সভ্য বাবু গোবিন্দচন্দ্র গুহ বিগত ২৯শে চৈত্র তিলি গ্রামে পরলোকগমন করিয়াছেন। বিগত ১২ই মে পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে তাঁহার আদ্য শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত উপাসনা, শ্রীযুক্ত বঙ্কবিহারী কর শাস্ত্রপাঠ এবং শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র বসু জীবন চরিত পাঠ করেন। এই উপলক্ষে তাঁহার পত্নী শ্রীযুক্তা কৈলাশবাসিনী গুহ নিম্নলিখিত রূপে একশত টাকা দান করিয়াছেন:—পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ স্থায়ী প্রচার ফণ্ড ২০৲ অনাথ ব্রাহ্মপরিবার সংস্থান ধন ভাণ্ডার ৫৲, ঢাকা অনাথ আশ্রম ৫৲ ঢাকা হিন্দু বিধবাশ্রম ৫৲ পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ সাধারণ ফণ্ড ৫৲ দরিদ্র ছাত্র ভাণ্ডার ৫৲ ঢাকা নববিধান সমাজ ৫৲ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থায়ী প্রচার ফণ্ড ২০৲ নবদ্বীপ স্মৃতিফণ্ড (মেয়েদের) ৫৲ শিবনাথ স্মৃতি ভাণ্ডার ৫৲ সাধনাশ্রম ৫৲ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ দরিদ্র ফণ্ড ৫৲ কলিকাতা নববিধান সমাজ ৫৲।

বিগত ৬ই মে কলিকাতা নগরীতে পরলোকগত প্রভাত কুসুম রায়চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রসূন অতি শোকাবহ ঘটনার মধ্যে ইহসংসার ত্যাগ করিয়াছেন। শ্রীমান এবার বি, এস, সি পরীক্ষা দিয়াছিলেন; তাহাতে উত্তীর্ণ হইবার বিশেষ আশাই আছে। শোকের উপর শোকের আঘাতে বিধবা মাতার কিরূপ অবস্থা হইয়াছে তাহা কল্পনাও করা যায় না।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চির শান্তিতে রাখুন ও আত্মীয়স্বজনদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

নামকরণ—বিগত ১৫ই এপ্রিল কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত শ্রীপতিনাথ দত্তের দ্বিতীয় পুত্রের নামকরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন। শিশুকে প্রেমশ্রী নাম প্রদত্ত হইয়াছে। এই উপলক্ষে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে ৩৲টাকা প্রদান করা হইয়াছে।

বিগত ২৭শে মার্চ্চ কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত অনিলকুমার রায়ের কন্যার নামকরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন। কন্যাকে 'অঞ্জলী' নাম প্রদত্ত হইয়াছে।

মঙ্গলবিধাতা শিশুদিগকে দিন দিন কল্যাণের পথে বর্দ্ধিত করুন।

শুভ বিবাহ—বিগত ১৬ই এপ্রিল কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বসুর তৃতীয়া কন্যা কল্যাণীয়া স্নেহকণা ও শ্রীমান অখিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ১৩ই মে কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ মল্লিকের জ্যেষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া কিরণময়ী ও শ্রীমান ভূপেন্দ্রনাথ সরকারের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ৩ই [illegible] কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত বসুর দ্বিতীয়া কন্যা কল্যাণীয়া সুলেখা ও শ্রীমান শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দত্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ১৩ই মে কলিকাতা নগরীতে পরলোকগত বাবু শশিমোহন দাসের কন্যা কল্যাণীয়া শান্তিপ্রভা ও শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র নাগের পুত্র শ্রীমান নির্ম্মলচন্দ্রের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। গিরিশ বাবু একটি উপদেশ পাঠ করিয়া প্রার্থনা করেন।

প্রেমময় পিতা নবদম্পতিদিগকে প্রেম ও কল্যানের পথে অগ্রসর করুন।

গিরিডি ব্রাহ্মসমাজ—"গিরিডি ব্রাহ্মসমাজের একনিষ্ঠ সেবক স্বর্গীয় তিনকড়ি বসু মহাশয়ের পরলোকগমনের প্রথম বার্ষিক দিন উপলক্ষে গত ১২ই মে গিরিডি ব্রহ্মমন্দিরে বিশেষ ভাবে ব্রহ্মোপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা এবং শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র নাগ তিনকড়ি বাবুর সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করেন।"

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় দ্বারা ৩রা জ্যৈষ্ঠ মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রীবরদাকান্ত বসু বি এ

Registered No. 65

অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ১৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৪৯ম ভাগ।	১৬ই জ্যৈষ্ঠ, রবিবার, ১৩৩৩, ১৮৪৮ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯৭	প্রতি সংখ্যার মূল্য ৶০
৪র্থ সংখ্যা।	30th May, 1926.	অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

হে প্রেমময় জীবনবিধাতা, তোমার অসীম প্রেমে ও করুণায় আমাদিগকে তোমার পবিত্র ধর্ম্মের আশ্রয়ে আনিয়া, এবং তোমার হইবার ও তোমাকে অনুসরণ করিবার উচ্চ অধিকার প্রদান করিয়া, তুমি আমাদের উপর অতি গুরুতর কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব ন্যস্ত করিয়াছ। কিন্তু আমরা তাহা সম্যক্ প্রকারে উপলব্ধি করিতে না পারিয়াই, নিতান্ত উদাসীনতা ও অবহেলাতে সময় কাটাইয়া, জীবনকে ব্যর্থ করিয়া ফেলিতেছি। তুমি যে জন্য আমাদিগকে ডাকিয়া আনিয়াছিলে, তাহার কিছুই করিতেছি না; তুমি প্রাণে যে উৎসাহ ও আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়াছিলে, তাহা দিন দিন যেন নির্ব্বাপিতই হইয়া যাইতেছে! কত অসার কাজে আমরা শক্তিক্ষয় করিতেছি, কত রূপে আপনাকে লইয়া বিব্রত হইতেছি; আর তোমার কাজ করিবার, তোমা হইতে নিত্য নূতন বল ও উৎসাহ লাভ করিয়া, সকল অবসন্নতা হইতে মুক্ত হইয়া, তোমার পথে অগ্রসর হইবার, অবসর হইতেছে না! তাই আমাদের দ্বারা তোমার পবিত্র ধর্ম্মের গৌরব বর্দ্ধিত না হইয়া খর্ব্বীকৃতই হইতেছে—আমরা পরিত্যক্ত ও পদদলিত হইবারই যোগ্য হইতেছি। হে সর্ব্বদর্শী দেবতা, তুমি আমাদের ত্রুটি দুর্ব্বলতা সমস্তই দেখিতেছ, তোমার করুণা ভিন্ন যে আমাদের আর অন্য কোনও উপায় নাই, জানিতেছ। হে করুণাময় পিতা, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে তোমার বলে বলীয়ান্ কর, নূতন উৎসাহে তোমার পথে চলিতে, তোমার কার্য্য সাধন করিতে, সমর্থ কর। আর আমাদিগকে মৃতের ন্যায় পড়িয়া থাকিতে দিও না। আমরা তোমার হইয়া, তোমার কার্য্য সাধন করিয়া, আমাদের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব পালন করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হই। তোমার শুভ ইচ্ছাই আমাদের প্রত্যেকের ও সমগ্র সমাজের জীবনে জয়যুক্ত হউক। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

নিবেদন।

দণ্ড—অপরাধ করলেই তার দণ্ড পেতে হয়। তুমি ভাব চুপি চুপি অন্যের অগোচরে দোষটা ক'রে যাবে—কেহ দেখ্‌ল না, কেহ জান্‌ল না, রাজদ্বারে দণ্ডিত হ'তে হলো না, সমাজের প্রতিপত্তি হারাতে হলো না। কিন্তু জান না, বিশ্বতশ্চক্ষু যিনি তিনি সব দেখ্‌ছেন! তাঁর দৃষ্টি লুকাবে কি ক'রে? আর তিনি দণ্ডেরও বিধান কচ্ছেন। কোন্ ভাবে তাঁর দণ্ড আসে, জানি না—কখনও রোগ শোক তাপের ভিতর দিয়ে, কখনও ব্যর্থতা সংগ্রাম বিপদের ভিতর দিয়া, সে দণ্ড আসে; কখনও বিবেকদংশন প্রপীড়িত ক'রে; মনের ক্লেশে অনিদ্র রজনী কাটাতে হয়। তিনি চা'ন আমাদিগকে শোধ্‌রাতে—কি ভাবে কোন্ অপরাধের কি দণ্ড দিবেন, জানি না; কোন্ ভাবে কা'কে পুণ্যের পথে ডাক্‌বেন, জানি না। কিন্তু দয়াময় তিনি; তিনি দয়াতেই দণ্ড দেন। অপরাধের দণ্ড অলঙ্ঘনীয়। তাই বলি যখনই কোনও বেদনা পাও, কোনও দুঃখ ক্লেশ আসে, জানিও তোমার কোনও অপরাধ হয়েছে। আর তিনি ঐ বেদনা দুঃখ ক্লেশের ভিতর দিয়াই তাঁর করুণাধারা ঢেলে দিচ্ছেন। তাই সাবধান হ'য়ে চলো। অপরাধ করলে তার জন্য ক্রন্দন কর, অনুতপ্ত হও; যাঁর কাছে অপরাধ তাঁর নিকট ক্ষমা চাও; প্রভুর চরণে প্রার্থনা কর; আর অম্লান বদনে দণ্ড গ্রহণ কর।

প্রেমের অপমান—সব অপরাধের বরং মার্জ্জনা আছে, প্রেমের অপমানের মার্জ্জনা নাই। প্রেম এক মাত্র সার বস্তু; সব চ'লে যাবে, এই বিশ্বচরাচর চূর্ণ বিচূর্ণ হ'য়ে যেতে পারে, তবুও প্রেম, প্রীতি, স্নেহ চিরদিন থাকবে। "প্রেমের সহে না অপমান।" ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ—প্রেমে তিনি এই বিশ্বচরাচর রচনা করেছেন; প্রেমেতেই রক্ষা কচ্ছেন; প্রেমের দিকেই সকলকে আকর্ষণ কচ্ছেন। তাই প্রেমের অপমান, প্রীতিতে উপেক্ষা, এর বড় আর অপরাধ নাই। যদি কেহ তোমাকে প্রীতি করে, স্নেহ করে, ততটা প্রীতি, ততটা স্নেহ তাকে তুমি না দিতে পার; কিন্তু তার স্নেহ প্রীতি ভালবাসার প্রতি অনাদর ক'রো না, উপেক্ষা দেখা'য়ো না। জেন, তোমার উপেক্ষা-জনিত তার প্রাণে যে বেদনা, তার যে এক ফোঁটা চোখের জল, তা প্রেমময় দেবতা সইতে পারেন না। প্রেমে উপেক্ষা দেখাবে না। প্রেমের আদর করবে; যে ভালবাসে তার স্নেহে সায় দিবে। নতুবা তোমার গুরুতর অপরাধ হবে।

এই কি ধর্ম্ম?—তোমার দেবমন্দিরে এক জন মানুষ প্রবেশ করল, আর তোমার দেবতা অপবিত্র হলেন! কেন? তিনি কি তার দেবতা নহেন? তার কি তিনি জননী নহেন? সেও কি তাঁর পূজা করে না? বিশ্বজননীকে তুমি সঙ্কীর্ণ ক'রে রেখেছ, ধর্ম্মের নামে তাঁর সন্তানকে তুমি উৎপীড়ন কচ্ছো। তোমার ভজনালয়ের সম্মুখ দিয়ে ভগবানের নাম কীর্ত্তন ক'রে গেল, আর তোমার ঈশ্বরের অবমাননা হলো? তুমি ক্রুদ্ধ হ'লে, তুমি তাদের প্রহার করলে। ভজনালয়ের সম্মুখে গান বাজনা হলো পাপ; আর ভাইএর বক্ষে ভাই ছুরি মারলে, ভাইএর প্রতি অপ্রেম বিদ্বেষ দেখালে, ধর্ম্মের নাম ক'রে, সে হোল পুণ্য! কোটি কোটি জীবহত্যা মানুষ কচ্ছে, নীরবে স'য়ে আছ; আর তোমার ভাই যদি একটা বিশেষ জীব হত্যা করে আর তোমার ধর্ম্মবুদ্ধি ক্ষেপে উঠল; তার প্রতি অপ্রেম হলো, বিদ্বেষ হলো, তকে জব্দ করতে চাইলে! ইহা কি হলো ধর্ম্ম? ধর্ম্ম কি অনুষ্ঠানে? ধর্ম্ম কি বিশেষ পশুবধে? ধর্ম্ম কি বাহ্য আচার আচরণে? অপ্রেমে, রক্তপাতে ধর্ম্মহানি হয় না? ধর্ম্মের খোসা নিয়ে থেকো না। ধর্ম্ম প্রেমে—ঈশ্বরপ্রেমে, মানব-প্রেমে। এই প্রেমের পরিবর্ত্তে অপ্রেম যেখানে, সহিষ্ণুতার পরিবর্ত্তে ক্রোধ যেখানে, সেখানেই ঈশ্বরের অবমাননা, ধর্ম্মের অবমাননা। কোনও স্থান দিয়ে সঙ্কীর্ত্তন গেল, না গেল, কোন্ ব্যক্তি মন্দিরে প্রবেশ করিল, কোন্ পশু বলি হলো, না হোলো, তাহা ত ধর্ম্ম নয়। উহা একান্ত বাহিরের কথা—অনেক সময় অধর্ম্ম। এই বাহিরের আচারকেই ধর্ম্ম ভেবে রক্তপাত কচ্ছো, ভাই এর রক্তে হস্ত কলুষিত কচ্ছো! বাহির ছাড়, ভিতরে প্রবেশ করো; সত্যং শিবং সুন্দরংকে দেখ। সব সমস্যার মীমাংসা হবে।

সম্পাদকীয়

প্রত্যেক ব্রাহ্মের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব—আমরা গত সংখ্যায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিশেষত্ব আলোচনা করিতে যাইয়া, উহা যে প্রত্যেকের মধ্যে প্রকাশিত আলোক ও বাণীকে একটা বিশেষ নূতন মূল্য প্রদান করিয়াছে, মানব মাত্রকেই অতি উচ্চ অধিকার দিয়াছে, এবং তদ্দ্বারা আমাদের উপর যে গুরুতর কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে, সে কথার উল্লেখ ও সামান্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছিলাম। উক্ত বিষয়ের আরও একটু বিস্তারিত আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক ও অনাবশ্যক বিবেচিত হইবে না মনে করিয়াই, আমরা তাহার পুনরুল্লেখ করিতে সাহসী হইলাম। সাধারণতঃ আমরা অধিকারের কথাটাই বিশেষ ভাবে স্মরণে রাখি, কর্ত্তব্য ও দায়িত্বের বিষয়টা অধিকাংশ সময়ই ভুলিয়া যাই। অথচ শুধু সমাজের ও অপরের নয়, নিজেরও, কল্যাণের জন্য শেষোক্ত তত্ত্বটাই বিশেষ ভাবে স্মরণে রাখা আবশ্যক। যিশু খৃষ্ট তাঁহার শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন "তোমরা পৃথিবীর আলোকস্বরূপ; আলো জ্বালিয়া কেহ লুক্কায়িত রাখে না, তাহা প্রকাশ্য স্থানেই রাখে, যেন তাহা দেখিয়া সকলে পথ চলিতে পারে। তোমাদের আলোক এমনি করিয়া মানুষের সম্মুখে ধর, যাহাতে তাহারা তোমাদের ভাল কাজসকল দেখিয়া মহান্ প্রভুকেই গৌরবান্বিত করিতে পারে।" তিনি বিশেষ ভাবে তাঁহার "প্রেরিতদিগকেই" এই কথা বলিয়াছিলেন। এবং তিনি যে তাঁহার ধর্ম্মের নূতন তত্ত্ব সর্ব্বত্র প্রচার করিবার কথাই এখানে বলিয়াছেন, তাহাও সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এই কথা শুধু প্রচারক এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্বন্ধেই প্রয়োগ না করিয়া, প্রধান অপ্রধান প্রত্যেক ব্রাহ্মকেই সমান উচ্চ অধিকার প্রদান করিয়া, সকলকেই উক্ত বাক্যের বিষয়ীভূত করিয়াছেন, সকলের সম্বন্ধেই উহা ব্যবহার করিতেছেন। আর প্রচার বলিতে যে আমরা শুধু আমাদের ধর্ম্মের নূতন তত্ত্ব ও মত লোকের নিকট উপস্থিত করা এবং কতকগুলি সদনুষ্ঠানে নিযুক্ত হইয়া লোকের কল্যাণ সাধন করাই বুঝি না, তাহা বলা বাহুল্য। এ সকলের পূর্ণ প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াও আমরা বলি, ইহাই সব নয়, যথেষ্ট নয়। আমরা মনে করি, যাহারা সাক্ষাৎ ভাবে এ সকল কার্য্যে নিযুক্ত নহে, তাহাদেরও এ বিষয়ে একটা বিশেষ কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব রহিয়াছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ আমাদের প্রত্যেককে, শুধু ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে নয়, সামাজিক জীবন বিষয়েও, যে উচ্চ অধিকার দিয়াছে, তৎসঙ্গে আমাদের উপর যে গুরুতর দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যও অর্পিত হইয়াছে, সে কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মতে আমাদের প্রত্যেককেই—অর্থাৎ প্রত্যেক ব্রাহ্মকেই—আলোক বলা হইয়াছে। এ কথার প্রকৃত অর্থ কি, সত্যই আমরা আলো হইয়াছি কি না, এবং না হইয়া থাকিলে কি প্রকারে তাহা হইতে পারি, সে কথার আলোচনায় আমরা একটু পরে প্রবৃত্ত হইব। তাহার পূর্ব্বে এ কথা বলা আবশ্যক যে, প্রকৃত আলো লুক্কায়িত রাখা সম্ভবপর, উহাকে প্রকাশ্য স্থানে রাখিবার জন্য সাক্ষাৎ ভাবে চেষ্টা না করিলে আর উহা প্রকাশিত হইতে পারে না, লোকের দৃষ্টিকে কিছুতেই আকৃষ্ট করিতে পারে না, ইহা সত্য নয়—এ ধারণা নিতান্তই ভ্রান্ত। আবরণে আচ্ছাদিত থাকিলে

আলো পূর্ণ উজ্জ্বলতার সহিত প্রকাশিত হইতে পারে না স্বীকার করিয়াও, সকলকেই বলিতে হইবে যে, প্রকৃত আলোক আপনার মহিমাতেই আপনি প্রকাশিত হয়, সকল আবরণ ভেদ করিয়াই আপনার জ্যোতি, অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণেও, চারিদিকে ছড়াইতে সমর্থ হয়। সুতরাং যাঁহারা প্রচারাদি কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া লোকের দৃষ্টির সম্মুখে সর্ব্বদা উপস্থিত না থাকেন, তাঁহারাও চারিদিকে কিছু না কিছু আলো বিস্তার করিয়া থাকেন। কিন্তু এই হেতু সর্ব্বোপরি যে নিজের মধ্যে আলো থাকা আবশ্যক, তাহা না হইলে যে কিছুতেই ইহা সম্ভবপর নয়, তাহা আর অধিক করিয়া বলিতে হইবে না। এই জন্যই নিজে আলোক লাভ করা অথবা আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতে গেলে, আলো হইয়া যাওয়া, প্রত্যেকের পক্ষে একান্তই কর্ত্তব্য; এই কর্ত্তব্য ও দায়িত্বের কথা ভুলিয়া থাকিলে নিতান্তই অন্যায় হইবে, গুরুতর অকল্যাণই সাধিত হইবে। এ বিষয়ে আমাদিগকে বিশেষ সাবধানই হইতে হইবে। যিশু তাঁহার শিষ্যদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন—"তোমাদের সেই আলোক যদি অন্ধকার হয়, তবে সে অন্ধকার কত গভীর!" বাস্তবিক যখন আমরা অন্ধকারকে অন্ধকার বলিয়া জানিতে পারি, তখন প্রমাণিত হয় যে, তাহার মধ্যে কিছু আলো আছে,—আলো না থাকিলে উক্ত জ্ঞানই সম্ভবপর হইত না। কিন্তু যখন অন্ধকারকেই আলো মনে করা যায়, তখন স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, আলো সম্বন্ধে কোনও জ্ঞানই নাই, আর সে অন্ধকার হইতে মুক্ত হইয়া আলোকে যাইবার আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টাও সে অবস্থায় থাকিতে পারে না। উহা যে অতীব ভীষণ অবস্থা, মৃত্যুরই কারণ, তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। এরূপ ভীষণ অবস্থা যাহাতে উপস্থিত না হয়, তাহার জন্য সকলকেই বিশেষ সচেষ্ট হইতে হইবে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, শুধু অনেক তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলেই এই আলোক লব্ধ হয় না। জড় জগতে দেখিতে পাওয়া যায়, আলোকের নিত্য প্রস্রবণ সূর্য্যমণ্ডলের নিকট হইতে সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ ভাবে আলো গ্রহণ না করিয়া, তাহার সহিত যুক্ত না হইয়া, কোনও বস্তুই অন্য উপায়ে আলোকমণ্ডিত হইতে পারে না, চারিদিকে আলোকরশ্মি বিকীর্ণ করিতেও সমর্থ হয় না। যাহার আছে তাহার নিকট হইতেই গ্রহণ করা সম্ভবপর; আর গ্রহণ না করিলে, নিজের মধ্যে কিছু না সংগৃহীত হইলে, অপরকে দেওয়া ত একেবারেই অসম্ভব। তাই সর্ব্বাগ্রে আমাদিগকে সেই জ্যোতিস্বরূপ জীবনদেবতার সঙ্গেই যোগযুক্ত হইতে হইবে, তাঁহার আলোকেই আলোকিত হইতে হবে, তাহা ব্যতীত অপর কোনও উপায়ই নাই—অন্য দ্বিতীয় পথ নাই। দিবালোকে যাহা নিতান্ত নিষ্প্রভ ও মলিন দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাও, দিবাভাগে যথাযথ রূপে সূর্য্যরশ্মি সংগ্রহ করিয়া থাকিলে, রাত্রির অন্ধকারে আলোক বিকীর্ণ করিয়া অতি উজ্জ্বল ও সুন্দর দেখায়। তেমনি, যে সত্য ভাবে সেই জীবন-সূর্য্যের আলোকে সামান্য পরিমাণেও আপনাকে আলোকমণ্ডিত করিয়াছে, সে তুলনায় যতই তুচ্ছ ও নগণ্য বিবেচিত হউক না কেন, সকলের পশ্চাতে পথিপার্শ্বে পরিত্যক্ত থাকুক না কেন, দুঃখ দুর্দ্দিনের অন্ধকারের মধ্যে সেই জীবন হইতে যে উজ্জ্বল আলোকরশ্মি বহির্গত হইয়া চারিদিক আলোকিত করিবে, অপরের পথ চলিতে সাহায্য করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইবে, এবং জীবনের অদ্বিতীয় প্রভু সেই প্রেমরবির গৌরব ঘোষণাদ্বারা মানবজন্ম সার্থক করিবে, তাহা আর অধিক করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। আর, ইহা না করিয়া শুধু খাইয়া শুইয়া আমোদে আহ্লাদে জীবন কাটাইয়া দিলে যে সমস্তই ব্যর্থ, আমরা মানব নামেরই অযোগ্য হই, মৃত্যু অপেক্ষাও শোচনীয় অবস্থাতেই পতিত হই, তাহাও অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। যদিও মানব মাত্রেরই এই কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব রহিয়াছে, তথাপি ব্রাহ্মসমাজের প্রত্যেক সভ্যের উপর অর্থাৎ প্রত্যেক ব্রাহ্ম নরনারীর উপর, যে ইহা বিশেষ ভাবে অর্পিত হইয়াছে, তাহা বিস্তারিত রূপে আলোচনা না করিলেও বোধ হয় চলিবে। ব্রাহ্মদের নিকটই যখন এই তত্ত্ব প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে, এই উদ্দেশ্যেই যখন আমরা বিশেষ ভাবে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয়ে আহূত ও সংবদ্ধ হইয়াছি, তখন এ বিষয়ে যে আমাদের বিশেষ কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব রহিয়াছে, সে সম্বন্ধে বিন্দু পরিমাণ সন্দেহও থাকিতে পারে না। আর এ বিষয়ে আমাদের কত ত্রুটি দুর্ব্বলতা, কত অভাব রহিয়াছে, তাহা আমাদের জীবন যে নিয়তই প্রকাশ করিতেছে, সে কথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

বিষয়টাকে আরও একটু পরিস্ফুট করিবার জন্য অপর একটা দিক হইতেও কিছু আলোচনা করা আবশ্যক বোধ করিতেছি। এ স্থলেও যিশুর অপর একটি উক্তি অবলম্বন করিয়াই আমরা আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। যিশু তাঁহার শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন—"তোমরা পৃথিবীর লবণস্বরূপ। কিন্তু লবণ যদি তাহার স্বাদ হারায়, তবে কিসের দ্বারা ইহা লবণাক্ত করা হইবে? তখন আর উহা কোনও কাজেরই যোগ্য থাকে না, তখন উহা পরিত্যক্ত ও পদদলিত হইবারই উপযুক্ত।" বলা বাহুল্য যে, আমাদের বিবেচনায় এই কথাও অধিকতর যুক্তিযুক্ত ভাবে প্রত্যেক ব্রাহ্মেরই প্রতি প্রয়োগ করা যায়। পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে এ স্থলেও সেই যুক্তিই খাটে। তাই আমরা আর তাহার পুনরুল্লেখ করিব না। "লবণস্বরূপ" বলিবার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করিয়া উক্ত বাক্যের গূঢ় মর্ম্ম গ্রহণ করিতে সচেষ্ট হইব। লবণের প্রধান কাজ আমাদের খাদ্যকে মিষ্ট ও সুস্বাদু করা। উহার অপর একটি তুল্য মূল্যবান্ কাজ পচন নিবারণ করা, বিষ নষ্ট করা। এই দুইটিই যে অতি প্রয়োজনীয় ও কল্যাণকর কাজ তাহা আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। ধর্ম্মের, সুতরাং ধর্ম্মাশ্রিত প্রত্যেক ব্যক্তির, ধর্ম্মমণ্ডলীর প্রত্যেক সভ্যেরও, যে ইহাই প্রধান কাজ, অলঙ্ঘনীয় কর্ত্তব্য, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। পৃথিবীকে আনন্দ ও আরামের, উন্নতি ও কল্যাণের নিকেতন, প্রীতি ও শান্তিতে, সৌজন্যে ও সৌহার্দ্দ্যে, পরস্পরের সাহায্যে সম্মিলিত ভাবে বাস করিবার উপযোগী স্থানে পরিণত করিতে এবং পাপ মলিনতার, দুর্নীতি দুর্গতির, বিষ বিনষ্ট করিয়া, স্বাস্থ্য সৌন্দর্য্য প্রদান করিতে যে ইহার কত প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে, ইহা ব্যতীত যে সংসার কিরূপ অসংখ্য হিংস্র পশু পরিপূর্ণ মানববাসের অযোগ্য কণ্টকাকীর্ণ গহন বনে, অথবা হিংসা বিদ্বেষের ভীষণ সমরক্ষেত্রে পরিণত

হয় এবং বিষময় মৃত্যুর বীজ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, তাহার বিস্তারিত আলোচনা অনাবশ্যক। সামান্য একটু চিন্তা ও পরীক্ষা করিলেই এই সহজ সত্যটা সকলেই বুঝিতে সমর্থ হয়। কিন্তু আলোকের ও লবণের কার্য্যের মধ্যে উপকারিতা বিষয়ক মৌলিক একতা থাকা সত্ত্বেও যে প্রণালীগত একটা প্রধান পার্থক্য রহিয়াছে, সে সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে—তাহা আমাদের বক্তব্য বিষয়কে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে আমাদিগকে সাহায্য করিবে। আলোর কাজ সহজেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে; কেনন', বাহিরে প্রকাশ হওয়াই উহার ধর্ম্ম। কিন্তু লবণের কাজ সেরূপ সহজে মানুষ দেখিতে পায় না; কেননা, আপনাকে বিলুপ্ত করিয়া সকলের মধ্যে লুকাইয়া রাখাই উহার ধর্ম্ম, বরং আপনাকে একটু অতিরিক্ত ভাবে প্রকাশ করিতে গেলেই উহার সমস্ত কাজ পণ্ড হইয়া যায়—খাদ্য সুস্বাদু না হইয়া বিস্বাদই হয়—গ্রহণীয় না হইয়া পরিত্যাজ্যই হয়। উহা যখন একান্ত ভাবে আপনাকে সকলের মধ্যে বিলাইয়া দেয়, অনুপ্রবিষ্ট হইয়া স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া ফেলে, তখনও কিন্তু উহার বিশেষত্ব পূর্ণ মাত্রায়ই বজায় থাকে—প্রত্যেক বিন্দুতেই উহার অস্তিত্বের প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, এমন কিছুই থাকে না, যাহার উপর তাহার কল্যাণকর প্রভাব বিস্তারিত না হয়। আর তাহা না হইলেই বুঝিতে হইবে উহার কার্য্য সুসিদ্ধ হয় নাই, অথবা উহার মধ্যে সে কার্য্যসাধনের শক্তিই নাই—উহা লবণত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছে। তখন যে উহা পরিত্যক্ত ও পদদলিত হইবারই যোগ্য তাহা আর বলিতে হইবে না। ধর্ম্ম-জীবনের কার্য্য সম্বন্ধেও ইহাই অতীব সত্য। ধর্ম্ম গৃহ পরিবার সংসার সমস্ত পরিবর্ত্তিত করিয়া সুন্দর ও উন্নততর করিবেই, কলুষ বিষ বিনষ্ট করিয়া মৃত্যু নিবারণ ও স্বাস্থ্য সম্পাদন করিবেই। আমাদের জীবনের প্রভাব যখন সকলের মধ্যে বিস্তারিত হইয়া সকলকে মধুময় কল্যাণময় করিতে, সকল প্রকার পাপ ও দুর্নীতির বিষ বিনষ্ট করিয়া সমাজকে সুস্থ সবল করিতে সমর্থ হয়, তখনই উহার সার্থকতা। তাহা না করিতে পারিলে নিঃসন্দিগ্ধরূপেই প্রমাণিত হইবে, আমাদের মধ্যে সে জীবনের অভাব হইয়াছে, আমরা প্রকৃত লবণত্ব বা ধর্ম্মজীবন হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। তখন যে আমাদের পক্ষে ঘৃণিত লাঞ্ছিত পদদলিত হওয়াই স্বাভাবিক, তাহাতে কি আর কোনও সন্দেহ আছে? কিন্তু এই বিশুদ্ধ ধর্ম্মজীবনের প্রয়োজনীয়তা ও অপরিহার্য্যতা যত অধিকই হউক না কেন, উহার একটা বিশেষত্বের কথা ভুলিলে চলিবে না। সে বিশেষত্ব এই যে, সে জীবন থাকা যেমন আবশ্যক, তাহা লুক্কায়িত বা অপ্রকাশিত রাখাও তেমনি প্রয়োজনীয়। উহার অতিরিক্ত প্রকাশ দ্বারা উপকারের পরিবর্ত্তে অপকারই সাধিত হয়। আমরা যদি অহঙ্কার ও কর্তৃত্বস্পৃহা দ্বারা চালিত হইয়া আমাদের ধর্ম্মজীবনকে প্রকাশ করিতেই চেষ্টিত হই, তাহা হইলেও আমাদের সকল কার্য্য পণ্ড হইবে, আমরা গৃহ পরিবার, মণ্ডলী ও সমাজ, সমস্ত জগৎ সংসারকেই তিক্ত ও বিস্বাদ করিয়া ফেলিব, আনন্দ ও আরাম, উন্নতি ও কল্যাণের স্থান না করিয়া কলহ বিবাদের, হিংসা বিদ্বেষের, অশান্তি ও অকল্যাণের নিকেতনেই পরিণত করিব—কর্ত্তব্যের পরিবর্ত্তে আমাদের দ্বারা মহা অকর্ত্তব্যই সাধিত হইবে। এরূপ জীবন থাকিয়াও যে বিশেষ কোনই লাভ নাই, বরং ক্ষতি আছে, তাহা আর অধিক করিয়া বলিতে হইবে না। ধর্ম্মের অতিরিক্ত বহিঃপ্রকাশ নিতান্তই অশোভন ও অনিষ্টকর। লুক্কায়িত থাকিলেই তাহার কার্য্য অধিকতর ফলপ্রদ হয়। মনে হইতে পারে যে, ইহা দ্বারা অপরের অনিষ্ট সাধিত হইলেও নিজের ত উপকার আছে; জীবনহীনতা অপেক্ষা ইহা ত ভাল। কিন্তু একটু বিচার ও পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ইহার দ্বারা নিজেরও মহা অনিষ্টই সাধিত হয়, জীবনের মূলকে ছিন্ন করিয়া প্রদর্শনের ভাব ক্রমে মৃত্যুই আনয়ন করে। সুতরাং লবণের ন্যায় আপনাকে সকলের পশ্চাতে রাখিয়া, আত্মবিলোপ সাধন দ্বারা সকলের মধ্যে আপনাকে অনুপ্রবিষ্ট করিয়াই যে কার্য্য করিতে হইবে, আপনাকে বিলাইয়া দিয়া সর্ব্বত্র প্রভাব বিস্তার করিতে হইবে, তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। আড়ম্বরহীন নীরব খাঁটি জীবনের প্রভাবই সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও শুভফলপ্রদ, সকলের আদরণীয় ও আনন্দদায়ক। আর লবণত্ব হারাইলে, প্রকৃত জীবন হইতে বঞ্চিত হইলে, কি প্রকারে তাহা পুনরায় লাভ করিতে হইবে, তাহা বিশেষ ভাবে আলোচনা না করিলেও বোধ হয় চলিবে। আলোক-মণ্ডিত হওয়া সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, এ ক্ষেত্রেও যে তাহাই একটু পরিবর্ত্তিত আকারে বলা যায়, সে কথা সকলেই বুঝিতে পারে। যিনি লবণত্বের একমাত্র প্রস্রবণ, আমাদের জীবনের জীবন, সকল শক্তির মূল, একমাত্র তাঁহার সঙ্গে যোগের দ্বারাই যে তাহা লাভ করা যায়, তাহা ব্যতীত যে আর অন্য কোনও উপায় নাই, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। সুতরাং আমাদের প্রত্যেকের গুরুতর কর্ত্তব্য ও দায়িত্বের কথা আমরা এখন অতি সুস্পষ্ট রূপেই বুঝিতে পারিতেছি। আশা করি, এ দিকে আমাদের সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে, আর উদাসীনতা ও অবহেলাতে অথবা অন্যায় অহঙ্কার ও কর্তৃত্বস্পৃহার মোহ বশতঃ প্রদর্শনেচ্ছায় আমরা আমাদের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব হইতে ভ্রষ্ট হইয়া জীবনকে ব্যর্থ হইতে দিব না—মহা মৃত্যুর পথে ধাবিত হইব না। মঙ্গলবিধাতা আমাদিগকে শুভ বুদ্ধি প্রদান করুন এবং নীরবে তাঁহার পথে চলিয়া জীবনের গুরুতর কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব পালনের বল দিউন। আমরা বিলুপ্ত হইয়া যাই, একমাত্র তিনিই জীবনে উজ্জ্বল ভাবে প্রকাশিত ও গৌরবান্বিত হউন। তাঁহার ইচ্ছাই আমাদের প্রত্যেকের জীবনে ও সমগ্র সমাজে জয়যুক্ত হউক।

ধর্ম্ম মণ্ডলীর ভিত্তি ও কার্য্য।

কয়েক দিন পূর্ব্বে বলেছিলাম, ব্যক্তিগত জীবনে প্রেমই একমাত্র ভিত্তি—সব চ'লে যায়, এক প্রেমই থাকে; যতটুকু প্রেম বিলা'তে পার, ততটুকুই তোমার আত্মার উন্নতি, আত্মার

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মোৎসব উপলক্ষে বিগত ৩১শে বৈশাখ, ১৩৩৩, সায়ংকালীন উপাসনায় শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস কর্ত্তৃক প্রদত্ত উপদেশ

প্রসারণ। যে ডুবেছে, যে পঙ্কে পড়েছে, তাকে ঠেলে ফেলে দিও না, একটি আত্মাকে অবজ্ঞা ক'রে, কঠোর শাসন ক'রে, বিনাশের পথে যেতে দিও না—তাকে প্রেমে আলিঙ্গন কর, তার প্রাণে অনুতাপ জাগ্রত কর, তাকে হাত ধ'রে তোল, তাকে প্রেমে টেনে আন। প্রেমই মানুষকে নরক হইতে স্বর্গে তুলিতে পারে, প্রেমই মানুষকে পাপপথ হইতে তুলিতে পারে; প্রেমই মানুষকে অমৃতময় জীবনের পথ দেখাইয়া দিতে পারে। সমাজ ও ধর্ম্ম-মণ্ডলী গঠনের ভিত্তিও প্রেম। অনেকবার এই কথা এই বেদী হইতে বলা হয়েছে। তবুও আবার সেই কথাই বলিব। আজ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মোৎসবে সেই কথাই বার বার মনে হইতেছে। আমরা যে সমাজ—মণ্ডলী—গঠন করিতেছি, প্রেমই হবে তাহার ভিত্তি। আজ ধর্ম্মমণ্ডলীর ভিত্তি ও কার্য্য সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই।

যীশু বলেছেন :—

Ye have heard that it hath been said, thou shalt love thy neighbour and hate thine enemy.

But I say unto you, Love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you and pray for them which despitefully use you and persecute you.

প্রাচীন শাস্ত্রে তোমরা শুনেছ, প্রতিবেশীকে ভালবাস এবং শত্রুকে ঘৃণা কর।

কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, শত্রুকে ভালবাস, যে তোমাদিগকে অভিসম্পাত করিবে, তাদের আশীর্ব্বাদ কর, যারা তোমাদের ঘৃণা করে, তাদের কল্যাণ কর, যারা তোমাদিগকে বিদ্বেষ করিবে, উৎপীড়ন করিবে, তাহাদের জন্য প্রার্থনা কর।

সেণ্ট পল তাঁর চিঠিতে বলেছেন :—

Though I speak with the tongues of men and of angels and have not charity, I am become as sounding brass or a tinkling cymbal.

And though I have the gift of prophecy and understand all the mysteries and all knowledge; and though I have all faith so that I could remove mountains and have not charity, I am nothing.

And though I bestow all my goods to feed the poor and though I give my body to be burned and have not charity, it profiteth me nothing.

যদি আমি দেবদূতগণের ন্যায়ও বাক্‌শক্তি লাভ করি, আর যদি আমার হৃদয়ে প্রেম না থাকে, তবে আমি শব্দমাত্র-সার কাংস ভাড় অথবা বাদ্যযন্ত্র ব্যতীত কিছুই নহি।

যদি আমার ভবিষ্যদ্বাণীর শক্তি থাকে, যদি আমি সকল জ্ঞান লাভ করি, যত রহস্য আছে সমস্ত জানি, যদি আমার এমন বিশ্বাস থাকে যে পর্ব্বতকেও স্থানচ্যুত করিতে পারি, আর যদি হৃদয়ে প্রেম না থাকে, তবে আমি অতি তুচ্ছ। আমার কোনও মূল্য নাই।

যদি আমি দরিদ্রের ভরণের জন্য অনেক অর্থ দান করি, যদি আমার দেহ ভস্মসাৎও করি, আর হৃদয়ে আমার প্রেম না থাকে, তবে উহাতে কিছুই লাভ নাই।

এই প্রেমই জীবনের ভিত্তি, প্রেমই ব্যক্তিগত জীবনের ভিত্তি, প্রেমই পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের ভিত্তি, প্রেমই ধর্ম্ম-মণ্ডলীর ভিত্তি।

একজন লোকের মনে একটা ভাব জাগিল, একটা নূতন আদর্শ আসিল, দেশের ও দশের কল্যাণসাধনের একটা ইচ্ছার উদয় হইল, সমাজনীতি, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতিকে একটা নূতন দিকে প্রবাহিত করিবার আকাঙ্ক্ষা প্রাণে জন্মিল, নূতন ভাবে কর্ম্মের প্রবৃত্তি জন্মিল। সে মনের ভাব বন্ধুদিগকে জানাইল, দশ জনের সঙ্গে আলোচনা করল; কেহ তাহার সঙ্গে সহানুভূতি করিল, কেহ সহানুভূতি করিল না,—অনেকে হয় ত বিপক্ষে দাঁড়াইল। কিন্তু যাহারা একমত হইল, তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইল; একযোগে কাজ করিতে লাগিল; দশ জনের সহানুভূতি পাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল; কাজ আরম্ভ করিয়া সুফল দেখাইয়া লোককে আকৃষ্ট করিতে লাগিল। এই ভাবেই সভা সমিতির সৃষ্টি হইয়াছে, সঙ্ঘের জন্ম হইয়াছে, মণ্ডলী গঠিত হইয়াছে। মানুষ একা কতটুকু কাজ করিতে পারে? একা মানুষের শক্তি কতটুকু! তাই সে অপরের সহানুভূতি চায়, সাহায্য চায়; দশ জনের শক্তি, ভাব ও শুভ ইচ্ছা লইয়া কর্ম্ম-ক্ষেত্রে অগ্রসর হয়। সঙ্ঘবদ্ধ মানুষ জগতে নবযুগের অবতারণা করিয়াছে, কর্ম্মক্ষেত্রে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে—নূতন আদর্শ, ধর্ম্মের আদর্শ, সমাজের আদর্শ, রাজনীতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। তাই সংসারের সকল কাজে, সকল প্রচেষ্টায়, সকল সংস্কার কার্য্যে, সকল ব্যবসা বাণিজ্যেই সঙ্ঘের সৃষ্টি দেখিতে পাওয়া যায়। এক দল লোক এক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইল, আর সেই কার্য্যে দশজনের চেষ্টা ও সাহায্যে কৃতকার্য্যতা লাভ করিল; একের পক্ষে যাহা কঠিন ছিল, দশজনের পক্ষে তাহা সহজ হইল।

ধর্ম্মসমাজেও আদি কাল হইতেই মণ্ডলীর প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইয়াছে। মণ্ডলী গঠিত হইয়াছে; মণ্ডলীবদ্ধ ধর্ম্ম-সাধকগণ আপনাদের সাধনপথে অগ্রসর হইয়াছেন, দশজনকে আকর্ষণ করিয়াছেন, ধর্ম্মজীবনের প্রভাবে ধর্ম্মমত, ধর্ম্মের আদর্শ, মানবসমাজে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এক জন ঋষি, এক জন শাক্যসিংহ, এক জন ঈশা, এক জন মহম্মদ, এক জন রামমোহন, প্রাণে নূতন আলোক পাইলেন, ধর্ম্মের নূতন বাণী শুনিলেন, সমাজগঠনের নূতন আদর্শ প্রাপ্ত হইলেন, নূতন তত্ত্ব লাভ করিলেন; তাঁহারা স্থির থাকিতে পারিলেন না, তাঁহারা যাহা পাইলেন, তাহা সাধন করিলেন, অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া তৃপ্ত হইলেন, আপনাদের প্রাণে শান্তি পাইলেন; কিন্তু তাঁহাদের উদার হৃদয় তাহাতেই তৃপ্ত হইল না। এমন মিষ্ট ফল লোকে আস্বাদন করিবে না? পাপতাপক্লিষ্ট মানুষ শান্তি লাভ করিবে না? তাই তাঁহারা সকলকে ডাকিলেন—ভারাক্রান্ত পরিশ্রান্ত নরনারী আমার নিকট এস, আমি তোমাকে শান্তি দিব। এক জন আসিল, দুই জন আসিল, দশ জন আসিল,

তাঁহারা নব আলোক প্রাপ্ত হইয়া তৃপ্ত হইল; তাহাদের একটি সঙ্ঘ গঠিত হইল, গোষ্ঠীর সৃষ্টি হইল, তাহারা মণ্ডলীবদ্ধ হইলেন। তাঁহারা এক প্রাণে, এক যোগে সাধন করিতে লাগিলেন, প্রচার করিতে লাগিলেন; দশ জনের দ্বারে দ্বারে যাইয়া অমৃত বিলাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কেহ এই রসের আস্বাদ পাইয়া এসে মণ্ডলীতে যোগ দিল, অনেকে উদাসীন রহিল; আবার অনেকে ক্ষুদ্র মণ্ডলীকে দেশের ও সমাজের শত্রু মনে করিয়া বিপ্লবকারী মনে করিয়া, পিষিয়া মারিতে চেষ্টা করিল। মণ্ডলীর প্রতি কত উৎপীড়ন হইয়াছে, কত নির্য্যাতন আসিয়াছে! এক এক সময় মণ্ডলী ভেঙ্গে গিয়াছে, সাধকগণ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু সত্য যায় না, প্রেমের বন্ধন ছিন্ন হয় না; ঈশ্বরের বিধান কার্য্য করিবেই। আবার মণ্ডলী গঠিত হইয়াছে, আবার দুই জন দশ জন এসে একত্রিত হইয়াছে. আবার তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছে। এই ভাবেই ধর্ম্মমণ্ডলী গঠিত হইয়াছে। প্রত্যেক ধর্ম্মসমাজেই একটি মণ্ডলী আছে. একটি গোষ্ঠী আছে; এই মণ্ডলীই ধর্ম্মসমাজকে পোষণ করে, রক্ষা করে, প্রসার বৃদ্ধি করে, অধর্ম্ম কুসংস্কার হইতে সমাজকে রক্ষা করে, দুর্ব্বলকে বল দেয়, যে চলিতে পারে না, তাকে হাত ধরিয়া সম্মুখের দিকে লইয়া যায়, যে কাতর তাহাকে সহানুভূতির কথা বলে। মণ্ডলীই ধর্ম্মসমাজের শক্তি রূপে বর্ত্তমান থাকিয়া ধর্ম্মের রক্ষণ পোষণ ও বর্দ্ধন করে।

যখনই কোনও সাধু পুরুষের প্রাণে ধর্ম্মজীবন লাভের উপায় সম্বন্ধে নূতন আলোক উদ্ভাসিত হয়, তখনই তিনি ঐ আলোক মানবের চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত করিতে চেষ্টিত হন; তিনি নিজে যাহা পাইয়াছেন, যে পরিত্রাণের বার্ত্তা শুনিয়াছেন, তাহা মানবমণ্ডলীকে দিতে না পারিলে তাঁর তৃপ্তি হয় না। তিনি যাহা পাইয়া পাপ তাপ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, শান্তি ও আনন্দ লাভ করিয়াছেন, কোটি কোটি নরনারী তাহা হইতে বঞ্চিত থাকিবে, ইহা তাঁহার কোমল প্রেমপ্রবণ প্রাণে সহ্য হয় না। তাই তিনি তাহা প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন। লোকে তাঁহার কথা বোঝে না, শুনিতে চায় না, লোকে তাঁহাকে উৎপীড়ন করে; তবুও তিনি অমৃতের ভাণ্ড লইয়া দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হন। যাহারা তাঁহার কথা শোনে, ধর্ম্মের মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হয়, তাঁহারা এসে তাঁহার সঙ্গে যোগ দেয়। লোকের নিন্দা গঞ্জনা, উৎপীড়নের মধ্যে এই রূপে ক্ষুদ্র মণ্ডলী গঠিত হয়; তাঁহারা পরস্পরের প্রতি অকৃত্রিম প্রেমে আবদ্ধ থাকে, জীবনে মরণে পরস্পর সঙ্গী থাকে। তাঁহারা একত্রে সাধন ভজন করে, নূতন নূতন তত্ত্ব লাভ করিবার চেষ্টা করে, পরমেশ্বরের করুণায় আপনাদিগকে ছাড়িয়া দেয়, তাঁহার প্রেমের মহিমা মানবের নিকট প্রচার করে। ক্রমে ধর্ম্মের প্রসার বৃদ্ধি হয়, বহু লোক এসে ধর্ম্ম গ্রহণ করে; যে মণ্ডলী কয়েক জন লোকে গঠিত হইয়াছিল, তাহা বহু বিস্তৃত হইয়া পড়ে; ক্রমে বিস্তীর্ণ ধর্ম্ম-সমাজ গঠিত হয়। ধর্ম্মসমাজে যতই লোক আসিতে থাকে, ততই ক্রমে ক্রমে ধর্ম্মের গভীরতা হ্রাস পায়। সকলেই যে ধর্ম্মের প্রবল টানে ধর্ম্মসমাজে প্রবেশ করে তাহা নহে। নানা দ্বার দিয়া লোক এসে ধর্ম্মসমাজে যোগ দেয়; আবার অনেক নিষ্ঠাবান ধর্ম্মপ্রাণ লোকও নানা অবস্থায় পড়িয়া প্রকৃত ধর্ম্ম হইতে দূরে সরিয়া পড়ে। কিন্তু বহু বিস্তৃত ধর্ম্মসমাজে সকলের প্রাণে প্রকৃত ধর্ম্ম লাভের জন্য গভীর আকাঙ্ক্ষা না থাকিলেও, প্রত্যেক জীবন্ত ধর্ম্মসমাজেই একটি মণ্ডলী থাকে যাহা ধর্ম্ম-জীবনের উৎস; এক দল লোক থাকে, এক দল সাধক থাকে, যাহারা ধর্ম্মের জন্যই বাঁচে, ধর্ম্মের জন্যই মরে—তাঁহারা সাধন করেন, তাঁহারা ঈশ্বর-প্রেমে উদ্দীপ্ত থাকিয়া ধর্ম্মের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত থাকেন। ব্রহ্মধ্যান ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মানন্দরসপান, ইহাই তাঁহাদের জীবনের ব্রত থাকে। তাঁহারা নানা কাজ করেন, কিন্তু প্রাণ ব্রহ্মচরণে অর্পিত থাকে। ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম যে আলোক আনয়ন করিয়াছেন, তাহাতেও এই রূপ উপাসকমণ্ডলী গঠিত হইয়াছে। রাজা রামমোহন রায়ের সময়েও তাঁহার সহচরবর্গ দ্বারা গঠিত একটি মণ্ডলী ছিল; কিন্তু সে মণ্ডলী ততটা ঘননিবিষ্ট ছিল না। মহর্ষিই প্রথম উপাসক-মণ্ডলী গঠন করিবার চেষ্টা করেন—তাঁহার গৃহে আলোচনা-ক্ষেত্রে, সঙ্গতে, যাঁহারা মিলিত হইতেন, তাঁহাদের লইয়া একটি ঘননিবিষ্ট মণ্ডলী গঠিত হইল। এই মণ্ডলীর বাহিরেও ব্রহ্মো-পাসক ছিলেন; কিন্তু শক্তির কেন্দ্র, নব জীবনের উৎস ছিল ঐ সঙ্গত, আলোচনাসভা বা মণ্ডলী। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সময়েও একটি ঘননিবিষ্ট মণ্ডলী তাঁহার বাটীতে উপাসনাশেষে আলোচনাতে মিলিত হইত। সেখানে কার্য্যপ্রণালী স্থির হইত, নূতন নূতন ভাব জাগ্রত হইত; সেখানে বসিয়াই আলোচনা করিতে করিতে লোক নূতন আলোক দেখিতে পাইত; অনেকের জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইত; অনেকে বিষয় পরিত্যাগ করিয়া প্রচারকার্য্যে আত্মোৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইতেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজেও এই রূপ মণ্ডলী গঠিত করিবার চেষ্টা দেখা গিয়াছে। এখানে সমাজ পরিচালন-প্রণালী অনুরূপ। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রথম হইতেই প্রত্যেক মানবে যে ব্রহ্ম বিরাজ করিতেছেন, তাহা অনুভব করিয়া প্রত্যেক ব্রাহ্মকেই সমাজসেবার অধিকার প্রদান করিলেন। আদি ব্রাহ্মসমাজে মহর্ষিই সমাজপরিচালনের ভার নিয়েছিলেন; ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে প্রচারকদল, শ্রীদরবার, সমাজের সেবার কাজ করিতেন; কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ (Universal church of God) দেখিলেন, সমাজের সেবা করিবার প্রত্যেক ব্রাহ্মেরই অধিকার, প্রত্যেক মানবে ঐশী শক্তি রহিয়াছে। সে প্রচারক হউক আর না-ই হউক, 'তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব' এই মন্ত্র সকলকেই গ্রহণ করিতে হইবে, সকলেই ঈশ্বর-প্রেমদ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া মানবের সেবা, সমাজের সেবা করিবে—কর্ত্তৃত্বজ্ঞানে নয়, প্রভুত্ব দেখা'তে নয়—সেবা করিতে অগ্রসর হইবে। ঈশ্বরে প্রীতি রেখে কে কি দিতে পারে, কে কতটুকু সময় শক্তি অর্থ দান করতে পারে, ধর্ম্মের জন্য, সমাজের জন্য কতটুকু ত্যাগ স্বীকার করতে পারে, ইহাই হলো সাধারণতন্ত্রের ভিত্তি; ঈশ্বরে প্রেম ও মানবে প্রেম, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ইহাই ভিত্তি। মানুষের মধ্যে ব্রহ্ম, তাহা দেখে' স্বীকার কর, প্রত্যেকের সেবা গ্রহণ কর, প্রত্যেক ব্রাহ্ম প্রচারক, বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্র, কেবল

প্রীতিসাধন নয়, সমাজসেবা, দেশসেবা, আর্ত্তসেবা সকলই ধর্ম্ম। ঈশ্বরপ্রীতিতে অনুপ্রাণিত হইয়া সেবা কর্‌বার অধিকার প্রত্যেকেরই। সুতরাং সকল ব্রাহ্মই প্রেম পরিবারভুক্ত। কার্য্যের সুবিধার জন্য তাঁরাই প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিলেন, প্রচারক পরিচারক সেবক অধ্যক্ষ সভা কার্য্যনির্ব্বাহক সভার উপর বিশেষ ভাবে সেবার ভার দিলেন। তাই এখানে আমাদের নেতৃবৃন্দ, সভ্যগণের মনোনীত ব্যক্তিগণ, আচার্য্য প্রচারক ও পরিচারকগণই একত্রিত হইয়া আমাদের কল্যাণচিন্তা করেন; তাঁহারা নিজেরা সাধন করেন এবং দেশবাসীদের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোক বিস্তার করিবার ব্যবস্থা করেন, দেশহিতকর নানা কার্য্যের রচনা করেন। সমাজে বহু লোক আছে; কিন্তু সমাজের কর্ম্মপ্রচেষ্টার কেন্দ্র ঐ আচার্য্য প্রচারক পরিচারক গোষ্ঠীর ভিতরে, ঐ অধ্যক্ষ সভা কার্য্যনির্ব্বাহক সভাতে। সত্য বটে, ইঁহাদের মধ্যে একত্রে সাধন ভজন, একত্রে আলাপ আলোচনা আরও বর্দ্ধিত হওয়া আবশ্যক; ইঁহাদের পরস্পরের মধ্যে সৌহৃদ্য ও একপ্রাণতা আরও গাঢ় হওয়া আবশ্যক। ইঁহারা একপ্রাণ হইয়া নিজেদের ও সমাজের সর্ব্ববিধ কল্যাণচিন্তা ও কল্যাণচেষ্টা করিবেন, ইহাই ইঁহাদের উদ্দেশ্য।

প্রত্যেক ধর্ম্মসমাজেই এই রূপ ঘনিবিষ্ট মণ্ডলী থাকে; ব্রাহ্মসমাজেও সেইরূপ মণ্ডলীর বিশেষ প্রয়োজন আছে। ইঁহাদের কার্য্য কি, তৎ সম্বন্ধে আলোচনা করাই আজ আমার উদ্দেশ্য। কোন ধর্ম্মসমাজের সকল লোক ধর্ম্মপ্রাণ, সাধনে অনুরক্ত হয় না। কিন্তু সমাজের হাওয়া ঈশ্বরাভিমুখীন্ হওয়া আবশ্যক। সমাজের সকলের আশা ও আকাঙ্ক্ষা ধর্ম্মের দিকে থাকা আবশ্যক; সকলেই ত্যাগশীল ঈশ্বরপরায়ণ না হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা ত্যাগের মর্য্যাদা বুঝিবেন, যাঁহারা ধর্ম্মপ্রাণ তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করিবেন, তাঁহাদের সাধনপথের সহায় হইবেন, প্রতিষ্ঠানগুলির সাহায্য করিবেন, সকল শুভকার্য্যেই তাঁহাদের সহানুভূতি থাকিবে,—এক কথায় বলিতে গেলে, তাঁহাদের মধ্যেও ধর্ম্মের হাওয়া প্রবাহিত হইবে। ধর্ম্মসমাজে এই ভাব রাখিতে গেলে, যাঁহারা সমাজের অগ্রণী, প্রচারক পরিচারক আচার্য্য কার্য্যনির্ব্বাহক, তাঁহাদের গঠিত মণ্ডলীর সাধন-নিষ্ঠা থাকা প্রয়োজনীয়। তাঁহাদের প্রাণ ঈশ্বরের দিকে থাকিবে, তাঁহারা সাধনশীল হইবেন; তাঁহারা সকল শুভ কর্ম্মে উৎসাহী হইবেন, তাঁহারা বিলাসিতা বর্জ্জন করিয়া ত্যাগশীল হইবেন, তাঁহাদের হৃদয় প্রশস্ত ও উদার হইবে, তাঁহারা সকলকে প্রেমে আপনার করিতে চেষ্টা করিবেন। আপনারা ধর্ম্ম লাভ করিয়া, ঈশ্বরকে প্রাণে পাইয়া, দশ জনকে আহ্বান করিবেন; আপনারা ঈশ্বরের প্রেমে প্রেরণায় লোকশ্রেয়ঃসাধনে নিযুক্ত হইয়া দশজনকে কর্ম্মক্ষেত্রে নিমন্ত্রণ করিবেন। আপনারা ত্যাগী হইয়া, অপরকে ত্যাগ করিবার জন্য ডাকিবেন, এবং সকলের প্রতি প্রেমের সহিত সরল ব্যবহার করিবেন। তাঁহারাই ধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ আপনাদের জীবনে প্রতিফলিত করিবেন। তাঁহারা যদি ঈশ্বরের নামে মাতিতে না পারেন, তাঁহারা যদি প্রেমে অনুরঞ্জিত না হইতে পারেন, তাঁহারা যদি "ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্ব মানশুঃ" এই ঋষিবাক্য নিজ জীবনে দেখাইতে না পারেন, তাঁহারা যদি ধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ হইতে স্খলিত হন, তবে ধর্ম্মভাব সমাজে ম্লান হইবে, সমাজ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে, সমাজে পাপ, বিলাসিতা, সাংসারিকতা প্রবেশ করিবে। সুতরাং সমাজের নেতৃস্থানীয় যাঁরা, আচার্য্য প্রচারক পরিচারক যাঁরা, কার্য্যনির্ব্বাহক যাঁহারা, তাঁহাদের গুরুতর দায়িত্ব আছে। তাঁহারা যদি মুক্তির মন্ত্র পাইয়া থাকেন, তবে সে মন্ত্র সাধন করুন; এবং অন্যকে সেই মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে চেষ্টা করুন। সেই জন্যই বলি, ধর্ম্মমণ্ডলীর প্রধান কাজ, আপনাদের জীবনে সাধনদ্বারা, নিষ্ঠাদ্বারা, ত্যাগদ্বারা, সেবাদ্বারা প্রেমদ্বারা, ধর্ম্মের মহান্ আদর্শ প্রতিফলিত করা। ধর্ম্ম কি, তাহা বুঝিতে ধর্ম্মমত পাঠ করিতে হইবে না; এক একটি জীবন দেখিবে, আর লোক মুগ্ধ হইবে। "নিতাই আপনি পড়িয়া বলে সামালিও ভাই"—ইহাই ধর্ম্মাচার্য্যগণের, নেতৃবৃন্দের, জীবনের আদর্শ হইবে। তাঁহাদের দ্বিতীয় কাজ হইবে, এই ধর্ম্মের আদর্শ প্রচারের ব্যবস্থা। যাহা আমরা পাইয়া তৃপ্ত হইলাম, যে রস আস্বাদন করিয়া আমরা নবজীবন লাভ করিলাম, যাহাতে আমাদের শোক তাপ পাপের জ্বালা দূর হইল, সে অমৃত রস অন্যেরা পান করিবে না? তবে যাই, পাপতাপগ্রস্ত নরনারীর দ্বারে দ্বারে যাই—"লোকের পায়ে ধরি, ভজাইব হরি"—তাঁদের ডেকে বলি, এস, ঈশ্বরের নামে আহ্বান করিতেছি—"কর তাঁর নাম গান" এই মন্ত্র লইয়া এসেছি—"ঈশ্বরে প্রেম ও তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধন, নরনারীর সেবা," এই মহা মন্ত্র এনেছি, তোমরা গ্রহণ কর, ইহাতে আমরা তৃপ্ত হইয়াছি, আনন্দ পেয়েছি, ঈশ্বরের স্পর্শ পেয়েছি, তোমরাও তৃপ্ত হইবে, আনন্দ পাইবে। প্রাচীন ঋষির মত জগজ্জনকে আহ্বান করিয়া বলিবে—

শোন বিশ্ব জন,
শোন অমৃতের পুত্র যত দেবগণ,
দিব্যধামবাসী,
আমি জেনেছি তাঁহারে,
মহান্ত পুরুষ যিনি, আঁধারের পারে
জ্যোতির্ম্ময়;
তাঁরে জেনে, তাঁর পানে চাহি'
মৃত্যুকে লঙ্ঘিতে পার, অন্য পথ নাহি।

এই ভাব যখন প্রাণে আসে, তখন মানুষ প্রচারের জন্য উদ্যত হয়; কোথায় যাইব, কি রূপে যাইব, পাথেয় নাই, শরীর চলিতে পারে না, কোথায় যাইয়া উঠিব, এ সব চিন্তা তখন আসে না। সে তখন তার নাম প্রচার করিয়া যায়; লোকে হয় ত শোনে না, বিদ্রূপ করে, উৎপীড়ন করে; সব দিন হয় ত আহার জোটে না, মাথা রাখিবার স্থান থাকে না, কিন্তু প্রিয়তম যিনি তিনি সঙ্গে আছেন, তাঁর ক্রোড়ে আছি; তিনি বলিতেছেন "বেশ হয়েছে", তাতেই আমি সুখী। সকলে যে বক্তৃতা করিবেন, তাহা নহে। ঈশ্বরপ্রেমিক যিনি তিনি যেয়ে এক স্থানে দাঁড়াবেন আর লোক মুগ্ধ হবে।

অন্ধকার নাহি যায় বিবাদ করিলে,
মানে না বাহুর আক্রমণ,

একটি আলোক শিখা সম্মুখে ধরিলে
নীরবে করে সে পলায়ন।

* * * *

এই কল্লোলের মাঝে নিয়ে এস দেহ,
পরিপূর্ণ একটি জীবন,
নীরবে কাটিয়া যাবে সকল সন্দেহ,
থেমে যাবে সহস্র বচন।

ধর্ম্মমণ্ডলীর প্রথম ও প্রধান কার্য্য ধর্ম্মসাধন, আদর্শ আপনাদের জীবনে প্রতিষ্ঠা, ঈশ্বরের প্রীতি ও প্রিয় কার্য্য সাধন, এবং দ্বিতীয় কার্য্য ধর্ম্মপ্রচার। যে ধর্ম্ম পাইয়াছে, ঈশ্বরকে লাভ করিয়া তৃপ্ত হইয়াছে, তাঁহার স্পর্শসুখ অনুভব করিয়াছে, সে ঈশ্বরের নাম প্রচার না করিয়া পারে না। কেবল নামপ্রচার নয়, লোকশ্রেয়ঃসাধনের নানারূপ প্রচেষ্টাও ধর্ম্মসাধন ও ধর্ম্মপ্রচারের অঙ্গ। আমাদের উপাসনারই অঙ্গ প্রীতিসাধন ও প্রিয়কার্য্যসাধন। কেবল ঈশ্বরের নামকীর্ত্তন, ধ্যান ধারণা করিলেই পূর্ণাঙ্গ উপাসনা হলো না; তাঁর প্রীতিপ্রণোদিত হইয়া লোকসেবা করিতে হইবে। লোকশ্রেয়ঃসাধনের জন্য নানা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে; লোকের দুঃখ বিমোচনের চেষ্টা, নিরন্নকে অন্নদান, পতিতের উদ্ধার, শিক্ষাবিস্তার, দেশের রাজনৈতিক সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন, সকলই ধর্ম্মসাধনের অঙ্গ। সুতরাং ধর্ম্মমণ্ডলীকে এই সকল কাজের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্তু ধর্ম্মমণ্ডলীর আর একটি কার্য্য ধর্ম্মের আদর্শ অক্ষুণ্ণ, বিশুদ্ধ, রক্ষা করা। ধর্ম্মমণ্ডলীকে সর্ব্বদা প্রহরীর ন্যায় থাকিতে হইবে, কখন কোন্ শত্রু কোন্ পথে প্রবেশ করে, তাহা দেখিতে হইবে। জগতে কত প্রেমের ধর্ম্ম, পরিত্রাণপ্রদ ধর্ম্ম, প্রচারিত হইয়াছে! কিন্তু সেই ধর্ম্মে যত লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মভাব ম্লান হইয়াছে, পাপ কুসংস্কার প্রবেশ করিয়াছে, এমন কি অনেক সময় পাপ দুর্নীতি ধর্ম্মের বেশ ধারণ করিয়াছে! জীবন্ত ধর্ম্মমণ্ডলীকে সর্ব্বদা জাগ্রত থাকিতে হইবে; তাঁহারা উচ্চ স্থানে দাঁড়াইয়া সমগ্র সমাজটি দেখিবেন, সকল কথা উৎকর্ণ হইয়া শুনিবেন। কোথায় কোন্ ছিদ্র পেলে শনি প্রবেশ করিবে, কোথায় কোন সূত্রে কোন্ পাপ, কোন্ দুর্নীতি, কোন্ কুসংস্কার, কোন্ দূষিত ব্যবহার সমাজে প্রবেশ করিতেছে, তাহা তাঁহারা দেখিবেন। এবং যাহাতে সমাজের আদর্শ ক্ষুণ্ণ না হয়, ধর্ম্মভাব ম্লান না হয়, পাপ কুসংস্কার প্রবেশ না করে, তার ব্যবস্থা করিবেন। অধর্ম্ম পাপ কুসংস্কারের সঙ্গে সন্ধি করা চলে না। পাপকে একবার প্রবেশ করিতে দাও, কুসংস্কারকে একবার প্রশ্রয় দাও, সে ক্রমে ক্রমে সমাজদেহের ব্যাধি হয়ে দাঁড়াবে। তখন সমাজের অঙ্গ কর্ত্তিত করিলেও সকল সময় ব্যাধির হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবে না। ধর্ম্মসমাজে নানা ভাবে নানা পথে লোক প্রবেশ করে; তাহারা তাহাদের মজ্জাগত কুসংস্কার, পাপবাসনা লইয়া আসে; মানুষ আরাম চায়, সংগ্রাম সকল সময় ভালবাসে না। আবার ধর্ম্মসমাজের নেতাগণেরও দুর্ব্বলতা আছে; তাঁহারা লোকবৃদ্ধির জন্য সকল সময় পরীক্ষা করিয়া ধর্ম্মসমাজে লোক গ্রহণ করেন না; ধন পদ মান ও জ্ঞানের প্রভাবে অনেক অনুপযুক্ত লোক ধর্ম্মসমাজে প্রবেশ করে। অনেকে ধর্ম্মভাবদ্বারা প্রণোদিত হইয়া ধর্ম্মসমাজে প্রবেশ করিয়াও, সকল সময় আদর্শ রক্ষা করিতে পারে না। অনেক লোক ব্রাহ্মসমাজেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছে; বিনা আয়াসে অতুল সম্পত্তি লাভ করিয়া তাঁহারা তাহার গৌরব ও মর্য্যাদা বুঝিতে পারে না। এই রূপ নানা কারণে ধর্ম্মসমাজের দ্বারে পাপ ও কুসংস্কার যে আকারেই আসুক, যে গৃহেই আসুক, তোমার প্রিয় জনের মধ্যেই হউক, নেতৃবৃন্দের মধ্যেই হউক, যখনই আসিবে, তখনই বাধা দিতে হইবে; তাহার প্রতি বিরাগ দেখাইতে হইবে। সমাজকে ঐ পাপ ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। এই কার্য্য কঠিন হইতে পারে, ইহাতে প্রিয়জনের, আপনার জনের, বিরাগভাজন হইবার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু ধর্ম্মসমাজকে রক্ষা করিতে হইবে, আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। ধর্ম্মসমাজের শক্তির উৎস কোথায়? অনেক ধনী, মানী, পদস্থ, জ্ঞানী লোক সমাজে থাকিলেই যে সমাজ শক্তিশালী হইল, তাহা নহে; লোকসংখ্যা—জ্ঞানী ধনীর সংখ্যা—দ্বারা সমাজের শক্তির পরিমাপ হয় না। যদি অল্পসংখ্যক বিশ্বাসী লোক থাকে, যদি ব্রহ্মপ্রাণ লোক, প্রেমিক লোক, ত্যাগী লোক কয়েক জন মাত্র থাকে, তাহাতে ধর্ম্মসমাজের শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ধর্ম্মসমাজের শক্তি ঈশ্বরপ্রেম, মানবপ্রেমে, ত্যাগে ও সেবার শক্তিতে। সুতরাং ধর্ম্মের আদর্শ, সামাজিক আদর্শ রক্ষা করিতে যাইয়া যদি ধর্ম্মসমাজের লোকসংখ্যা হ্রাস হয়, অনেক ধনী মানী বিজ্ঞ লোক চলিয়াও যান, তবুও ধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ রক্ষা করিতে হইবে। পাপ ও কুসংস্কারের সঙ্গে সন্ধি করা হবে না। ধর্ম্মমণ্ডলীকে এই কার্য্যে বিশেষ ভাবে জাগ্রত থাকিতে হইবে। ধর্ম্মসমাজে পাপ ও কুসংস্কার প্রবেশ করিতে পারিলেই সে সমাজকে আর বাঁচান সম্ভবপর হইবে না। ধর্ম্মসমাজের বক্ষে থাকিয়া লোক নানারূপ দুর্নীতির পথে চলিবে, ঈশ্বরোপাসনা করিবে না, উপাসনা-ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিবে না, অসংযত ব্যবহার করিবে, বিলাসিতাতে ডুবিবে, কুসংস্কারের প্রশ্রয় দিবে, ধর্ম্মহীনতার পরিচয় দিবে, নাস্তিকের মত জীবন যাপন করিবে, ইহা বড়ই কষ্টকর। ভক্তিভাজন আচার্য্য নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় বলিয়াছিলেন, "আমার ব্যারামে এক এক সময়ে অসহ্য যন্ত্রণা হয়, তাহাতে চক্ষে জল আসে নাই; কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা ভাবিয়া চক্ষে জল এসেছে।" তিনি শেষ যে উপদেশ লিখিতেছিলেন, যাহা সমাপ্ত করিবার পূর্ব্বেই তিনি চলিয়া গেলেন, সে উপদেশেও দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, "আদর্শপরিবার গঠিত হইল না।" সমাজের অবস্থা চিন্তা ক'রে ভক্তিভাজন আচার্য্য শাস্ত্রী মহাশয় শেষ জীবনে কত দুঃখ করিয়া গিয়াছেন, নিজেকে ইহার জন্য দায়ী মনে করিয়া আপনাকে কত ধিক্কার দিয়াছেন! তাই বলি, সমাজে ধর্ম্মের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য মণ্ডলীকে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু এই কার্য্য প্রেমের সঙ্গে করিতে হইবে; প্রেম ভিন্ন মণ্ডলী গঠিত হয় না; প্রেম ভিন্ন সমাজকে ঠিক পথে রাখিতে পারা যায় না ঈশ্বরে প্রেম, পরস্পরের প্রতি প্রেম, সমাজের সকল লোকের প্রতি প্রেম, ইহাই ধর্ম্মমণ্ডলী গঠনের একমাত্র ভিত্তি। ধর্ম্মমণ্ডলী যৌথ কারবার নহে, স্বার্থসিদ্ধির জন্য সংঘবদ্ধ হওয়া নহে,

ইহা প্রেমপরিবার। তাই সেণ্ট পল বলিয়াছেন, আমার যদি দেবদূতগণের মত বক্তৃতাশক্তি থাকে, আমার যদি ভবিষ্যদ্বাণী করিবার শক্তি থাকে, আমি যদি দীন দুঃখীদিগকে সমস্ত সম্পদ্ দান করি, অথচ যদি হৃদয়ে প্রেম না থাকে, তবে আমার সকল বাক্য, সকল কার্য্য, বৃথাই। তিনি এই প্রেমের গুণ বলিতে যাইয়া বলিয়াছেন—

Charity suffereth long, and is kind; charity envieth not; charity vaunteth not itself, is not puffed up.

Doth not behave unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil;

Rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth;

Beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things.

Charity never faileth.

প্রেম যার আছে, তাহাকে অনেক বেদনা সহিতে হয়; তবুও সে প্রেমদানে বিরত হয় না; সকলের প্রতি সদয় ব্যবহার করে, কাহারও প্রতি তাহার হিংসা বিদ্বেষ নাই, অন্যের সুখে সুখী বই দুঃখিত হয় না; সে অপরের জন্য যতই ত্যাগস্বীকার করুক, কিছুতেই তার শ্লাঘা করে না, গর্ব্বিত হয় না, বেশী কিছু করিয়াছে বলিয়া মনে করে না।

তার ব্যবহার মধুর; নিজের স্বার্থ সে খোঁজে না। সহজে সে বিচলিত হয় না, বিরক্ত হয় না, কাহারও অকল্যাণ চিন্তা করে না।

পাপে তার আনন্দ হয় না, সত্যেতেই সে আনন্দ পায়। প্রেমের জন্য, অপরের কল্যাণসাধনের জন্য, সকলই সহ্য করে; তার বিশ্বাস আছে, আশা আছে, সহনশীলতা আছে। সে প্রেম কখনও পরাজয় স্বীকার করে না।

যিশুকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, আমার ভাই যদি অপরাধ করে, কতবার ক্ষমা করব? সাত বার? যীশু বলিয়াছিলেন seventy times seven অর্থাৎ যতবার অপরাধ করবে ততবারই ক্ষমা করিবে। যীশু নিজে, যাহারা তাঁহাকে ক্রুশ কাঠে বিদ্ধ করেন, তাহাদিগকেও প্রেম দান করিয়া প্রার্থনা করিলেন, "ভগবান্, ইহাদিগকে ক্ষমা কর, কারণ, ইহারা কি করিতেছে জানে না।" এই প্রেমই ব্যক্তিগত ধর্ম্মজীবনের ভিত্তি, এই প্রেমই মণ্ডলীগঠনের ভিত্তি; এই প্রেমের জন্যই মানুষ ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হয়, এই প্রেমেতেই বিপথগামী যে তাহাকে টানিয়া আনিতে ইচ্ছা হয়। যে দূরে যায়, তাহাকে ডাকিতে হবে, প্রেমে কোলে টানিতে হবে, তার জন্য অশ্রুপাত করিতে হইবে; তার জন্য প্রার্থনা করিতে হবে। তোমার ধন থাকুক, জন থাকুক, মান প্রতিপত্তি থাকুক, জ্ঞানে প্রবীণ হও, বক্তৃতাশক্তি থাকুক, অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞান থাকুক, যদি প্রেম না থাকে, তবে তোমার দ্বারা ধর্ম্ম প্রচারও হবে না, মণ্ডলীগঠনও হবে না। তুমি লোককে, বিপথগামীকে, ফিরাতে পারিবে না।

খৃষ্ট বলিয়াছেন, পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে ঘৃণা করিও না। মহাত্মা গান্ধি বলিয়াছেন God is love not hatred—ঈশ্বর প্রেমময়, তাঁহাতে বিদ্বেষ নাই। তিনি আমাদিগকে অপরাধী মলিন জানিয়াও কত ভালবাসেন! আমরাও সকলকে প্রেমের সহিত আহ্বান করিব।

মানুষ দুর্ব্বল; সকল সময় সংগ্রাম করিতে পারে না—ক্লান্ত শ্রান্ত হ'য়ে পড়ে; সকল সময় নানা কারণে আদর্শ অনুসারে চলিতে পারে না—পাপে ও কুসংস্কারে যাইয়া পড়ে। তাহাকে তখনই রূঢ় ভাবে তাড়াইয়া দিও না। অঙ্গের কোনও স্থানে যদি ফোঁড়া হয়, তবে তখনই সেই অঙ্গ কাটিয়া ফেলিও না; ফোঁড়াটি সারাইতে চেষ্টা কর, আবশ্যক হইলে অস্ত্র প্রয়োগ কর; তবুও যদি না সারে, ঐ ফোঁড়ার জন্য যদি সমস্ত অঙ্গ দূষিত হইতে যায়, তবেই অঙ্গচ্ছেদ amputate করিতে হইবে। যদি কোনও ভাই দুর্ব্বলতাবশতঃ কোনও পাপে পতিত হয়, অথবা কোনও কুসংস্কারে জড়িত হন, তাহাকে রূঢ় ভাবে ব্যবহার করিও না, অবজ্ঞার চক্ষে দেখিও না। তাঁহাকে সমাজে উচ্চ স্থান না দিতে পার; কিন্তু প্রেমের সহিত তাঁহার সঙ্গে ব্যবহার কর। তাঁহার এই পতনে উল্লাস প্রকাশ করিও না, তাঁহার জন্য অশ্রু পাত কর। তোমার একটি ভাই, একটি ছেলে, যদি বিপথগামী হয়, একটি ভাই, একটি ছেলে, এক জন প্রিয়-জন যদি বিগড়িয়া যায়, তা হ'লে তোমার চক্ষে কি জল আসে না? ব্রাহ্মসমাজ আমাদের পরিবার। আমাদের একজন ভাই কি ভগ্নী যদি আদর্শচ্যুত হয়, তবে বেদনা অনুভব কর, ক্রন্দন কর, তার জন্য প্রার্থনা কর, তাহাকে প্রেমের সহিত আলিঙ্গন করিয়া তাহাকে শুভ বুদ্ধি দাও, তাহাকে সংশোধনের সুযোগ দাও। ধর্ম্মসমাজকে রক্ষা করিবার জন্য প্রেমই প্রকৃষ্ট ঔষধ। যেখানে প্রেম আছে, সেখানে কেহ পিছড়াইতে পারে না। যাঁহারা নেতা, যাঁহারা মণ্ডলীভুক্ত, তাঁহাদের প্রাণে প্রেম থাকিবে, তাঁহাদের হৃদয় উদার প্রশস্ত হইবে। তাঁহারা বন্ধুর ব্যবহারে আঘাত পাইতে পারেন, বন্ধু হয়ত তাঁহার কথা শুনিবে না, কটু বাক্য বলিবে,—তবুও তাহাকে প্রাণে জড়াইয়া বলিতে হইবে, 'ভাই, ও পথে যেও না, ও পথে বড় বিপদ।' তবুও যদি তাহাকে রক্ষা করা না যায়, তাকে ছাড়িতে হইবে বই কি? কিন্তু তার জন্য বেদনা অনুভব করিতে হইবে—আমার ভাই, আমার পুত্র, চলিয়া গেল! আমার শান্তি কোথায়? আমি তার জন্য ক্রন্দন করি, ব্যাকুল ভাবে প্রার্থনা করি, তার সঙ্গে সস্নেহ ব্যবহার করি। আশার সহিত প্রতীক্ষা করি, সে আবার ফিরিয়া আসিবে, আমার ক্রন্দন ও প্রার্থনা বৃথা যাবে না।

তার জন্য বেদনা অনুভব করা চাই; সে দুর্ব্যবহার করুক, আমি প্রেমের চক্ষে দেখিব। ইহাই জীবন্ত ধর্ম্মমণ্ডলীর লক্ষণ। সুতরাং প্রেমদ্বারা সংশোধনের চেষ্টা করিতে হইবে। ধর্ম্ম-মণ্ডলীর গুরুতর দায়িত্ব আছে। ব্রাহ্মসমাজের নেতৃস্থানীয় যাঁরা, আচার্য্য প্রচারক পরিচারক সেবক ও কার্য্যনির্ব্বাহক যাঁরা, তাঁহারা প্রকৃত ধর্ম্মমণ্ডলী গঠন করুন। তাঁহারা জীবনে ধর্ম্মের মহান্ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করুন, তাঁহারা আপনি ধর্ম্মের রস আস্বাদ করিয়া লোকের দ্বারে দ্বারে তাহা বিলাইয়া দিন, তাঁহারা পাপ

ও কুসংস্কার হইতে ধর্ম্ম সমাজকে মুক্ত রাখিতে চেষ্টা করুন, যে বিপথে যায়, তাহাকে প্রেমের শক্তিতে টানিয়া আনুন। ধর্ম্মমণ্ডলীর শক্তি প্রেমে, ঈশ্বরভক্তিতে, মানবপ্রেমে, প্রেমের জন্য ত্যাগে ও সেবাতে। কেহ বিপথে গেলে উল্লাস করিবে না। তাকে ছাড়িতে হইলে বেদনা অনুভব করিবে, প্রেমের শক্তিতে প্রার্থনার শক্তিতে তাহাকে ফিরাইয়া আনিবে। এই ভাবে আমরা মণ্ডলী গঠন করি। ভগবান আশীর্ব্বাদ করুন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মোৎসব।

প্রেমময় পিতার কৃপায় নিম্নলিখিত ভাবে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অষ্টচত্বারিংশত্তম জন্মোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে:—

৩১শে বৈশাখ (১৪ই মে) শুক্রবার— সায়ংকালে উৎসবের উদ্বোধন সূচক উপাসনা। শ্রীযুক্ত ললিত মোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশ অন্য স্তম্ভে প্রকাশিত হইল।

১লা জ্যৈষ্ঠ (১৫ই মে) শনিবার— প্রাতে উপাসনা; শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত হইল।

সায়ংকালে উপাসনা ও দেশের বর্ত্তমান সাম্প্রদায়িক কলহ বিবাদের মধ্যে শান্তি স্থাপনের জন্য বিশেষ প্রার্থনা। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং সকল হৃদয় হইতে শান্তির জন্য আকুল প্রার্থনা উত্থিত হয়। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম মাত্র আমরা প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলাম—

আমরা আজ ঈশ্বরের নিকট আমাদের প্রাণের বেদনা জানাইতে আসিয়াছি। কি দারুণ ক্লেশে ক্লিষ্ট হইয়া আসিয়াছি, তাহা বাক্যে প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিতেছি না। এই দীর্ঘ জীবনে কখনও এরূপ প্রত্যক্ষ করি নাই। মানুষ যে এরূপ প্রচণ্ড দৈত্যের মত ব্যবহার করিতে সমর্থ, তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। এমন নৃশংস ভাবে মানুষ মানুষকে হত্যা করিতে পারে, তাহা কল্পনাও করিতে পারি নাই। যাহা ভাবি নাই, যাহা শুনি নাই, তাহাই এই কলিকাতা মহানগরীর বক্ষে সত্য সত্যই সম্পাদিত হইয়াছে।

গত এপ্রিল মাসের প্রথম ভাগে মানুষে মানুষে যে রক্তারক্তি করিয়াছে, তাহাতে পুলিশ বিবরণে প্রকাশিত হইয়াছে যে, ৪২ জন ব্যক্তি আহত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। এতৎ ব্যতীত আহত হইয়া গৃহে গোপনে পরলোকে গমন করিয়াছে কত লোক, তাহার সংবাদ সাধারণে কিছুই জানিতে পারে নাই। কলিকাতায় চিকিৎসালয় ও হাঁসপাতালগুলিতে ৫০০ পাঁচ শতের অধিক ব্যক্তি আহত হইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। হাসপাতালের বিবরণ হইতে ইহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। কত লোক গৃহে চিকিৎসিত হইয়াছে, তাহার কোন সংবাদ জানা যায় নাই। ভাবিতেও কষ্ট হয় যে, এত বড় মহা নগরীর বক্ষে দিবালোকে প্রকাশ্য রাজপথে এইরূপে ৪২ জন হত ও ৫০০ পাঁচশতের অধিক আহত হইয়া রাস্তায় পড়িয়া রহিল।

এপ্রিল মাসের শেষ ভাগে দ্বিতীয় বারে অবস্থা ভীষণতর হইয়া উঠিয়াছিল। পুলিশের বিবরণে প্রকাশ যে, ৬২ জন হত হইয়াছে, ছয় শতেরও অধিক আহত হইয়াছে। এই অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব হইয়াছে। মানবের মধ্যে বিদ্বেষের ফলে ইহা সংঘটিত হইয়াছে। এই বিদ্বেষ-বহ্নি নির্ব্বাপিত না হইয়া যেন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে।

হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে প্রীতি সংস্থাপনার্থ স্থানে স্থানে যত সভা আহূত হইয়াছে, তাহার অনেক গুলিতেই আমি উপস্থিত ছিলাম। তাহাতে দেখিয়াছি যে, সেই সমস্ত সভায় হিংসা ও বিদ্বেষ প্রশমিত না হইয়া আরও প্রবল হইয়া উঠিতেছে। মিলনের চেষ্টা যত হইতেছে, বিরোধ ততই বর্দ্ধিত হইতেছে। এই অবস্থায় আমাদের কর্ত্তব্য কি?

বহুকাল হইতে এই দেশে হিন্দু ও মুসলমান বাস করিয়া আসিতেছে। এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়কে বিতাড়িত করিতে পারিবে না। যদি তাহারা উভয়ে পরস্পরে ভ্রাতৃভাবে বাস করে, তাহা হইলেই তাহারা এই দেশে সুখে ও শান্তিতে বাস করিতে পারিবে এবং নিজেদের অবস্থার উন্নতিও করিতে পারিবে। নচেৎ সুখ শান্তি ও উন্নতির আশা চিরদিনের মত এ দেশ হইতে লুপ্ত হইবে।

কেহ কেহ বলেন যে, যদি একটি ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হয় এবং এক দল অন্য দলকে সর্ব্ব প্রকারে লাঞ্ছিত করিতে পারে, তবেই শান্তি পুনঃ স্থাপিত হইবে। আমার বিশ্বাস কিন্তু অন্যরূপ। যতদিন মানুষের মধ্যে তাহাদের বিশ্বাসের, সংস্কারের ও ব্যবহারের পরিবর্ত্তন না হইতেছে, তাহাদের হৃদয় ও মন পরিবর্ত্তিত হইয়া উদার না হইতেছে ততদিন এই ব্যাপারের নিবৃত্তি নাই। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সমস্ত শাস্ত্রাদি আছে, যদি তাঁহারা সকলে সেই সমস্ত শাস্ত্রের উপদেশ সম্যক্‌রূপে শিক্ষা করেন ও তৎপালনে যত্নবান হন, তাহা হইলে অনায়াসেই সকল বিরোধ মিটিয়া যায়। অনেকেই শাস্ত্রের উপদেশ জানেন, কিন্তু তৎপালনে সেরূপ তৎপর নহেন; সেই জন্য এই ভীষণ ব্যাপারের নিবৃত্তি হইতেছে না।

শঙ্করাচার্য্য উপদেশ দিয়াছিলেন "জগতে যাহা কিছু দেখিতেছ সকলেই ব্রহ্ম।" হিন্দু যদি তাহা মানিতেন, তাহা হইলে কি এ হিন্দু, এ মুসলমান, এ খ্রীষ্টান, এরূপ বলিতে বা এরূপ বিভিন্ন ব্যবহার করিতে পারিতেন? লোকে শঙ্করাচার্য্যকে কত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন ও কত ভক্তি করেন! কিন্তু তাঁহার উপদেশ কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন না। অন্যের কথা ছাড়িয়া দিই, শঙ্কর নিজেই তাঁহার প্রদত্ত উপদেশ মানিয়া চলিতে পারেন নাই। এক দিন তিনি নদীতে স্নান করিতেছেন, এমন সময় একজন নিম্ন শ্রেণীর লোক তথায় উপস্থিত হইল। শঙ্কর কিছু বিরক্ত হইয়া তাহাকে বলিলেন, "দেখ, তোমার স্পৃষ্ট জল যেন আমার অঙ্গে না লাগে।" সেই ব্যক্তি বিনীত ভাবে উত্তর করিল "আচার্য্য, আপনি উপদেশ দিয়াছেন 'সকলেই ব্রহ্ম'। আমিও যখন ব্রহ্ম, তখন আমা কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট জল আপনার অঙ্গে লাগিলে আপনি অপবিত্র হইবেন, এ কি রকম কথা?" শঙ্কর তাহাতে কিছু অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন। হিন্দুগণ যদি শাস্ত্রের এই মহাবাক্য মানিয়া

চলেন, তাঁহারা যদি বিশ্বাস করেন যে সমুদয় পদার্থ ব্রহ্মে অবস্থিত এবং ব্রহ্ম সমুদয় পদার্থে বিদ্যমান

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে।

তাহা হইলে, তাঁহাদের মধ্যে পরস্পরকে ঘৃণা করা অসম্ভব হইয়া উঠিবে। যে ব্রহ্ম হিন্দুর মধ্যে সেই ব্রহ্ম মুসলমান ও খৃষ্টানের মধ্যে সমভাবে বিদ্যমান আছেন। ইহাই সাধন করিতে হইবে।

প্রাচীন কালে ইহুদী সম্প্রদায়ের মধ্যে এই ভাব প্রবল ছিল যে, দন্তের পরিবর্তে দন্ত ভাঙ্গিতে হইবে, চক্ষুর পরিবর্তে চক্ষু উৎপাটন করিতে হইবে। পরবর্ত্তী কালে মহতী বাণী আসিল, "যে তোমাকে ঘৃণা করে, তাহাকে প্রীতি কর।" লোকে সেই বাণী অগ্রাহ্য করিল। চক্ষুর পরিবর্ত্তে চক্ষু উৎপাটন করিতেই ব্যস্ত হইল। সেই জন্যই তো এই বিদ্বেষের অগ্নি উজ্জ্বলতররূপে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতেছে।

মহম্মদ আরব দেশের লোকদিগের দ্বারা কত প্রকারে লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন! কিন্তু তিনি যখন মক্কা ত্যাগ করিলেন, তখন কি বলিয়াছিলেন, যাহারা আমাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিয়াছে তাহাদিগের সর্ব্বনাশ কর? না, তিনি শিষ্যদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "যাও, উচ্চ মন্দিরের শিখরে আরোহণ করিয়া ঘোষণা কর, 'ঈশ্বরের ন্যায় শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই?" তিনি সকলকে অসাধুতা হইতে সাধুতার দিকে, অপবিত্রতা হইতে পবিত্রতার দিকে আনিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

ইহুদীগণ মহম্মদের প্রধান শত্রু ছিলেন। তাহারা তাঁহাকে মদিনা হইতে তাড়াইবার জন্য সর্ব্বদাই নানা প্রকার কল কৌশল অবলম্বন করিত। এমন কি তাঁহাকে বিষ প্রদান করিয়া মারিতেও চেষ্টা করিয়াছিল। তিনি তাহা বিস্মৃত হইয়া ইহুদী ও মুসলমান যাহাতে প্রীতির সহিত একই নগরে বাস করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। যাহাতে সকলে সদ্ভাবে ও প্রীতিতে বাস করিতে সমর্থ হয়, তাহা তিনি করিয়া গিয়াছিলেন। মানুষ এখন কেবল মুখে স্বীকার করে—ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী; কিন্তু ব্যবহারিক সংস্কার এমনই বিকৃত হইয়া গিয়াছে যে, মানুষ ভগবানকে ক্ষুদ্র মন্দির বা মসজিদে আবদ্ধ করিয়া মনে করে, মন্দির বা মসজিদই ভগবানের এক মাত্র গৃহ। এই ক্ষুদ্র বিশ্বাস বা বিকৃত সংস্কারের জন্যই যত বিদ্বেষ।

ঈদ্ প্রভৃতি বৃহৎ পর্ব্বের সময় সহস্র সহস্র মুসলমানকে মাঠের মধ্যে অথবা প্রশস্ত রাজপথের উপরেও উপাসনা করিতে দেখা যায়। অথচ অন্য সময় কেবল মসজিদই আল্লার গৃহ, এই বলিয়া তর্ক বিতর্কে নিযুক্তও দেখা যায়।

যদি মুসলমানগণ মহম্মদের সেই উদার বাণী স্মরণ করিয়া কার্য্যে রত থাকিত, তাহা হইলে তাহাদের নিকট সমুদয় স্থানই পবিত্র স্থান হইয়া উঠিত। স্থান বিশেষে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর বিবিধ বাদ্যভাণ্ডে তাঁহারা আপত্তি করিতেন না। মসজিদের সম্মুখে বাজনা বাজাইলে যে আল্লাকে অপমান করা হয় না, তাহা অতি সহজেই তাঁহাদের বোধগম্য হইত। ক্ষুদ্র নগণ্য মানব যে কিছুতেই ঈশ্বরের অবমাননা করিতে সমর্থ হয় না, তাহা সহজেই বুঝিতে পারিতেন।

পক্ষান্তরে হিন্দুগণ যদি শঙ্করের সেই মহৎ উপদেশ মানিয়া কার্য্য করিতে তৎপর হইতেন, তাহা হইলে বর্ত্তমানে তাঁহারা মুসলমানকে যে চক্ষে দেখিতেছেন সেই ভাবে দেখিতে পারিতেন না, তাহাদিগকে ঘৃণা করিতে পারিতেন না। উভয় সম্প্রদায়ই এই মহৎ ভাব বিস্মৃত হইয়াছেন বলিয়াই এই ভীষণ পরিণাম।

শিখদিগেরও স্মরণে রাখা উচিত যে, তাঁহাদের প্রধান আচার্য্যের যে কয়েকজন প্রিয় শিষ্য ছিলেন, তাহাদের মধ্যে এক জন মুসলমান; তাঁহার নাম ছিল মর্দানা। তাহাদেরও এইটি মনে করিয়া কার্য্য করা উচিত।

বর্ত্তমান সময়ে এমন এক শ্রেণীর লোকের উত্থানের প্রয়োজন, যাঁহারা মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিবেন "ঈশ্বর সকল মানবের পিতা। হিন্দু, মুসলমান, ইহুদী, খৃষ্টান সকলেই তাঁহার সন্তান। হিন্দু মুসলমান পরস্পর পরস্পরের ভাই।" এইরূপ প্রচারের একান্ত আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত যত প্রকার চেষ্টা করা হউক না কেন, কিছুতেই প্রীতি স্থাপিত হইতে পারিবে না। প্রাণের পরিবর্ত্তন ভিন্ন অন্য কিছুতেই ইহা সম্ভবপর নয়।

ভারতবর্ষে যে ভাবে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিগণ বাস করিতেছেন, এমন আর কোনও দেশে নয়। এখানে হিন্দুগণ মুসলমানদ্বারা উপকৃত এবং মুসলমানগণও হিন্দুদ্বারা প্রতি নিয়তই উপকৃত হইতেছেন। এক জনের সহায়তা ব্যতীত অপর জন থাকিতেই পারেন না।

এই কার্য্য সর্ব্বোপরি ব্রাহ্মদের উপর পতিত হইয়াছে। এই পরম সত্য প্রচার করিবার ভার, দেশের সকলকে এই ভাবে জাগাইয়া তুলিবার ভার, ব্রাহ্মসমাজের উপর অর্পিত হইয়াছে। সকলকে আত্মীয় বলিয়া গ্রহণ করাইবার জন্য এবং কুসংস্কার দূরীভূত করিয়া উদার ধর্ম্মনীতি সংস্থাপনের জন্য, সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা এখন হইতেই আরম্ভ করিতে হইবে। কেবল মসজিদই আল্লার গৃহ নহে। দেখ, মহম্মদ ঈশ্বরের মহাসত্তার আবির্ভাব কোথায় দেখিয়াছিলেন? তিনি এক পর্ব্বতের উচ্চ চূড়ায় সেই মহাসত্তায় নিমগ্ন হইয়া আরব দেশে তাঁহার মহৎকার্য্য সাধিত করিয়াছিলেন। এই বার্ত্তা মুসলমানকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। ব্রাহ্মসমাজ যদি এই ভাবে কার্য্য করিতে পারেন, তাহা হইলে কতক পরিমাণে ইহা সফল হইবে। আজই আমার সহিত দুইজন মুসলমান নেতার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁহারা বলিলেন "এই বিষয়ে আপনারা অগ্রসর হউন, যদি কিছু সম্ভাবনা থাকে তাহা হইলে আপনাদের দ্বারাই হইবে।" যখন ব্রাহ্মসমাজের উপর লোকের এরূপ প্রগাঢ় বিশ্বাস, তখন আমরা নীরব হইয়া থাকিব কেন?

ভগবানই আমাদের রক্ষাকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা ও পরিত্রাতা। তিনি ভিন্ন আর কেহই এ কার্য্য করিতে পারেন না। তিনিই সকলকে সুমতি দিতে পারেন। আজ আমরা সকলে কাতর কণ্ঠে তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করি। প্রার্থনার কি আশ্চর্য্য শক্তি তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। যাহা অসম্ভব তাহা সম্ভব হইবে ও হইতেছে। তাঁহার কৃপায় সকল বিদ্বেষ, সকল মনোমালিন্য, দূর হইবে। তিনি যোগসূত্র হইয়া সকলকে প্রাণে প্রাণে যুক্ত করিবেন। তাঁহার কৃপাই আমাদের একমাত্র সম্বল।

২রা জ্যৈষ্ঠ (১৬ই মে) রবিবার—উৎসবের প্রধান দিন—জন্ম তারিখ। প্রাতে উপাসনা। পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের সারমর্ম পরে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

সায়ংকালে সংকীর্ত্তন ও উপাসনা। শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম পরে প্রকাশ করিব। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া মিলিতকণ্ঠে একটী বন্দনা গান করিলে উৎসব শেষ হয়। অতি অল্প সময়ব্যাপী উৎসব হইলেও এবং যদিও লোকসমাগম আশানুরূপ হয় নাই, তথাপি প্রেমময়ের কৃপালাভে আমরা বঞ্চিত হই নাই। তাঁহার করুণা উপভোগ করিয়া আমরা ধন্য হইয়াছি।

ব্রাহ্মসমাজ

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ১৭ই মে কলিকাতা নগরীতে মিসেস্ তরলা গুপ্ত (মিসেস্ পি এম্ গুপ্ত) দীর্ঘকাল রোগশয্যায় শায়িত থাকিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার মধুর প্রকৃতিতে ও ধর্ম্মভাবে বন্ধুবান্ধবগণ সকলে বিশেষ আকৃষ্ট ছিলেন।

বিগত ১৫ই মে পরলোকগত প্রসূন রায় চৌধুরীর আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী আচার্য্যের কার্য্য করেন।

গত ৪ঠা মে লাহোর-প্রবাসী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের জ্যেষ্ঠা কন্যা সুলেখা প্রায় ১৯ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। গত ১৬ই মে উপরত আত্মার কল্যাণের জন্য পারলৌকিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত কোঁয়াড় উপাসনা করেন এবং শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রশশী গুপ্ত শাস্ত্র পাঠ করেন। কনিষ্ঠা ভগিনী জীবনী পাঠ করেন, এবং পিতা প্রার্থনা করেন। কন্যার পিতা নিম্নলিখিত দান পত্র পাঠ করেন, কাশীরাম স্মৃতিফণ্ডে ৪০৲, অবিনাশচন্দ্র মজুমদার স্মৃতিফণ্ডে ৪০৲, পাঞ্জাব ব্রাহ্মসমাজ ৫৲, লাহোর সাধনাশ্রম ৫৲, রামমোহন বালিকা বিদ্যালয় ১০৲, নববিধান সমাজ, কলিকাতা ১০৲, নববিধান প্রচার ফণ্ডে, ৩০৲, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, ১০৲, বাঁকিপুর নববিধান সমাজ ৫৲, সিমলা ব্রাহ্মসমাজ ৫৲, অনাথ ও বিধবা ৩০৲, বিনয়ভূষণ বালিকা বিদ্যালয় ২৫৲, ভিকটোরিয়া বিদ্যালয় মেডাল ১০৲, কুইন মেরী বালিকা বিদ্যালয়, দিল্লী, উপহার ১০৲, গানের বই এবং একতারা ২০৲, ফটো ২০৲, ধুতি এবং গৈরিক ৫৫৲, ছাতা ৬৸০, ধর্ম্ম পুস্তক ২০৲, ভোজ্য ১৫৲, বস্ত্র ১২৲, কমণ্ডলু ১২৷৷০, আসন ৫৷৷০, স্মৃতি পুস্তিকার জন্য ৫০৲।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চিরশান্তিতে রাখুন ও আত্মীয় স্বজনদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

শুভ বিবাহ—বিগত ১৫শে মে কলিকাতা নগরীতে পরলোকগত বাবু মন্মথনাথ দত্তের তৃতীয়া কন্যা কল্যাণীয়া সুজাতা ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান হরিপদের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে সতীশ বাবু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ২৫৲, বরিশাল ব্রাহ্মসমাজে ২৫৲ দান করিয়াছেন।

বিগত ২১শে মে রেঙ্গুন নগরীতে পরলোকগত বাবু কাশীচন্দ্র ঘোষালের কনিষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী বিভা ও শ্রীমান ফণীন্দ্র-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

প্রেমময় পিতা নবদম্পতিদিগকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

কৃতিত্ব—আমরা জানিয়া সুখী হইলাম শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেনের তৃতীয় পুত্র শ্রীমান অমূল্যকুমার গ্ল্যাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ত্ত (ইঞ্জিনিয়ারিং) বিভাগের বি এস্ সি, উপাধি লাভ করিয়াছেন।

ছাত্রীদের কৃতিত্ব—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাই স্কুল পরীক্ষায় নিম্নলিখিত ছাত্রীগণ উত্তীর্ণ হইয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম:—১ম বিভাগে—লাবণ্যলতা সেন গুপ্ত (৪র্থ স্থান অধিকার করিয়া), জ্যোতির্ম্ময়ী গুপ্ত, স্নেহমুকুল গুহ, পঙ্কজিনী দে, প্রতিভাময়ী চন্দ, লতিকা দাস গুপ্ত। দ্বিতীয় বিভাগে—জ্যোতির্ম্ময়ী দাস, নির্ম্মলা রায়, বেনেডিক্ট রোজেরিও, পরিমল-হাসিনী সরকার, মনীষা সেন, কমলা সেন গুপ্ত।"

আরও আনন্দের বিষয় যে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ইণ্টার মিডিয়েট পরীক্ষায় নিম্নলিখিত ছাত্রীগণ উত্তীর্ণ হইয়াছেন:—প্রথম বিভাগে—প্রভাবতী দাস (৩য় স্থান অধিকার করিয়া), বনলতা চট্টোপাধ্যায়, শশিমুখী লাহিড়ী, স্নেহলতা চৌধুরী। দ্বিতীয় বিভাগে—লীলাবতী দত্ত, প্রভাবতী সেন, বিভাতী সেন গুপ্ত। তৃতীয় বিভাগে—সুমতি দাস গুপ্ত, হিরণ দত্ত।

প্রাত্যহিক উপাসক মণ্ডলীর উৎসব—প্রাত্যহিক উপাসক মণ্ডলীর অষ্টম সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে বিগত ২৮এ মে প্রাতের উপাসনায় পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ আচার্য্যের কার্য্য করেন ও সায়ংকালে 'ব্রহ্মসাধন—প্রাচীন ও আধুনিক" বিষয়ে আলোচনা সভা হয়। তাহাতে শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস, শ্রীযুক্ত ভবসিন্ধু দত্ত ও শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র সোম বক্তৃতা করেন এবং শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র সভাপতির কার্য্য করেন। "এতদ্ব্যতীত প্রাতে ও সন্ধ্যায় সংকীর্ত্তন হয়।

প্রাপ্তি স্বীকার—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক আনুযায়ী মাসে প্রাপ্ত নিম্নলিখিত দান কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছেন—

পরলোকগত অবিনাশচন্দ্র মজুমদারের ভাগিনেয় এবং ভাগিনেয়ী তাঁহাদের মাতুলের আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে প্রচার বিভাগে দান ১৭৲ শ্রীমতী বসন্তকুমারী দত্ত স্বামীর আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে প্রচার বিভাগে দান ২৲ শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার লাহিড়ী পিতৃব্যের বাৎসরিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে সাধারণ বিভাগে দান ৫৲ শ্রীযুক্ত সত্যজীবন দত্ত পিতার আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে প্রচার বিভাগে দান ২৲ দাতব্য বিভাগে দান ১৲ Lay Worker's Mission Lantern lectures ২৲ মিসেস্ ক্ষিরোদবাসিনী মিত্র মহিলাদের নবদ্বীপ স্মৃতি ভাণ্ডারে ৬১৲ মিঃ রঘুনাথ রাও কন্যার বিবাহে প্রচার বিভাগে ১৫৲ মিসেস্ এস্. কে মল্লিক স্বামীর বাৎসরিক শ্রাদ্ধে দাতব্য বিভাগে ৫০৲ মিঃ পি এন্ দত্ত—তারিণী চরণ গুপ্ত ফণ্ডে একখানা জি পি নোট ১০০৲ মিঃ এবং মিসেস্ এইচ মৈত্রেয় নবদ্বীপ স্মৃতি ভাণ্ডারে ১৫৲ মিঃ রামলাল বানার্জ্জি পুত্র বধূর আদ্যশ্রাদ্ধে প্রচার বিভাগে ১০৲ মিঃ ডি জি বৈদ্য নবদ্বীপ স্মৃতি ভাণ্ডারে ৫৲ মিঃ নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী শিবনাথ স্মৃতি ভাণ্ডারে ৫৲ রায় বাহাদুর হেমেন্দ্রনাথ খাস্তগীর স্ত্রীর বাৎসরিক শ্রাদ্ধে প্রচার বিভাগে ২০৲ মিঃ শচীন্দ্র-নাথ মল্লিক পিতামহের বাৎসরিক শ্রাদ্ধে প্রচার বিভাগে ১৲ এবং দাতব্য বিভাগে ১৲ স্যার কে জি গুপ্ত নিখিল ভারত প্রচার বিভাগে ২৫০৲ মিঃ গোবিন্দচন্দ্র গুহ উৎসব ফণ্ডে ১৲ এবং স্থায়ী প্রচার ফণ্ডে ৬৲ মিঃ বি এন্ সাহা নবদ্বীপ স্মৃতি ভাণ্ডারে ৫৲ মিসেস্ সুদেবী মুখার্জ্জি পিতার বাৎসরিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে প্রচার বিভাগে ৩৲ এবং দাতব্য বিভাগে ২৲ মিসেস্ মনোরমা বানার্জ্জি পিতার বাৎসরিক শ্রাদ্ধে ৩৲ প্রচার বিভাগে ২৲ মিঃ ভুজেন্দ্রনাথ মিত্র মাতার বাৎসরিক শ্রাদ্ধে প্রচার বিভাগে ২৲ মিঃ টি সি গাঙ্গুলী কাঙ্গালী বিদায় ফণ্ডে ২৲ মিঃ কনকচন্দ্র গুপ্ত পিতার আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে প্রচার বিভাগে ৪৲ ডাঃ ভূদেব চাটার্জ্জি উৎসব ফণ্ডে ১৲ মিসেস্ প্রমদা চাটার্জ্জি উৎসব ফণ্ডে ১৲ শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু সাধারণ ফণ্ডে ১৲ মিসেস্ কৈলাসচন্দ্র বাগচী উৎসব ফণ্ডে ৪৲ কবিরাজ দুর্গানন্দ দাসগুপ্ত প্রচার বিভাগে ১৲ মিসেস্ ক্ষিরোদবাসিনী মিত্র মহিলাদের নবদ্বীপ স্মৃতিভাণ্ডারে ৬১৲ মি, কুমারনাথ মুখার্জ্জি উৎসব ফণ্ডে ৫৲ মিঃ বিপিন বিহারী মুখার্জ্জি উপাসক মণ্ডলী ৬৲ মিসেস্ সুমতি মল্লিক ভ্রাতুষ্পুত্রীর জন্ম দিনে সাধারণ বিভাগে ২৲ মিঃ শচীন্দ্রনাথ মল্লিক পিতামহীর বাৎসরিক শ্রাদ্ধে প্রচার বিভাগে ২৲ মাঃ মিঃ বরদা-কান্ত বসু মাঘোৎসবের সময় সংগৃহীত বাল্যদান ফণ্ডে ২৮।৫

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় দ্বারা ১৫ই জ্যৈষ্ঠ মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রীবরদাকান্ত বসু বি,এ

Registered No 650

অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৬ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৪৯শ ভাগ।	১৬ই আষাঢ়, বৃহস্পতিবার, ১৩৩৩, ১৮৪৮ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯৭	প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০
৬ষ্ঠ সংখ্যা।	1st July, 1926.	অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

বৈরাগ্য

আসক্তি-বন্ধন করিয়া ছেদন
নিবারো বিষয়-তৃষা,
বিলাসবাসনা রেখো না রেখো না,
পূরাও মনের আশা।
হে জগৎপতি, দেও শুভ মতি,
ছিন্ন করি' মায়া-জাল,
জপি তব নাম, হ'য়ে পূর্ণকাম,
আজীবন চিরকাল।
আকুল পরাণে তব গুণগানে
কবে হবো আত্মহারা,
প্রেমানন্দে মন হইবে মগন,
বহিবে প্রেমাশ্রুধারা!
কবে প্রেমানন নিরখিয়া মন,
অরূপ রূপ-সাগরে
ডুবিবে আমার, (ত্যজিয়ে অসার)
চির জনমের তরে!
দেও ও চরণ, হে দীনশরণ,
হৃদয়ে করি ধারণ;.
করি' আরাধনা পূরুক কামনা
ধন্য হ'ক এ জীবন।

শ্রী চন্দ্রনাথ দাস

হে মঙ্গলময় বিশ্ববিধাতা, আমাদের কল্যাণের জন্যই, তুমি চির আনন্দ ও সুখের প্রস্রবণ হইয়াও, তোমার বিশ্ববিধানে আমাদের জন্য আনন্দ ও সুখের সঙ্গে অনেক দুঃখেরও ব্যবস্থা করিয়াছ। সে-সকল দুঃখকে অপরাজিত চিত্তে বহন না করিলে, তোমার প্রেমের বিধান রূপে বরণ করিয়া না লইলে, আমরা প্রকৃত আনন্দ সুখও ভোগ করিতে পারি না, উন্নতি এবং কল্যাণও লাভ করিতে পারি না। কিন্তু এই ভাবে তাহাদিগকে অনিবার্য্য করিলেও, দুঃখকে তুমি কখনও বাঞ্ছনীয় বা লক্ষ্যস্থানীয় কর নাই—তাহা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবার একটা স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষাই আমাদের হৃদয়ে নিহিত করিয়াছ। অথচ আমরা সর্ব্বদা দুঃখ হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টিত হইলেও, মোহবশতঃ অনেক সময়ই আমরা এরূপ পথে চলি, এরূপ কার্য্য করি, যাহাতে অনর্থক নানা নিবার্য্য দুঃখকেই ডাকিয়া আনি এবং সঙ্গে সঙ্গে অশেষ প্রকার অনিষ্টও সাধন করি। কেন যে আমরা এরূপ বিভ্রান্ত হই জানি না। আমরা নিজেরা ইহাতে যেরূপ দগ্ধ বিদগ্ধ হই, অপরকেও সেরূপ ঘোর দুঃখ তাপে জর্জ্জরিত করি, ইহা দেখিয়াও আমাদের চৈতন্যোদয় হয় না। শুভবুদ্ধিদাতা পিতা, তুমি প্রাণে শুভবুদ্ধি না জাগাইলে, আর কিছুতেই আমাদের দুর্ব্বুদ্ধি বিদূরিত হইবে না। তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে তোমার অনুগত হইয়া চলিতে সমর্থ কর। আমাদের সকল বিরুদ্ধ খেয়াল প্রবৃত্তি দূর কর। আমরা যেন আর আপনার পথে চলিয়া অনর্থক দুঃখ তাপে জর্জ্জরিত না হই, অপরকেও দগ্ধ বিদগ্ধ না করি— তোমার আনন্দময় সংসারকে নিরানন্দে পূর্ণ না করি। তোমার মঙ্গল ইচ্ছাই আমাদের জীবনে জয়যুক্ত হউক। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

নিবেদন।

বলা ও শোনা—মানুষের কি এক স্বভাব যে, সে কেবল বল্‌তেই চায়! অপরের কথা শুন্‌তে চায় না। তুমি এমন কি বল্‌বে যে লোকে কেবল তোমার কথা শুন্‌বার জন্যই কাণ পেতে থাক্‌বে? মহাজনগণ কত কথা বলেছেন, তা শোন্‌বারই লোকের সময় নাই। তুমি যে দিন রাত লোকের কাণের কাছে কত কথা বল্‌ছ, লোকে তা শুন্‌তে চাইবে কেন? একবার তুমিও কাণ পাত; ঐ দ্যাখ, কত জন তাদের প্রাণের কত কথা তোমাকে বল্‌তে এসেছে; একটু সহানুভূতি পাবে ব'লে, একটা "আহা" কথা শুন্‌বে ব'লে, একটা সুপরামর্শ পাবে ব'লে, তোমাকে বল্‌তে এসেছে। ওরা সব কথা গুছিয়ে বল্‌তে পারে না, আসল কথা বল্‌তে গিয়ে অনেক বাজে কথা বলে, বল্‌তে বল্‌তে কাঁদিতে থাকে, তোমার তা শুন্‌বার ধৈর্য্য নাই। কেবল তোমার কথাই শুনাবে? অপরে একটা কথা বল্‌তে গেলেই তার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিবে? ওরূপ ক'রো না; লোকের কথা শোন, ধৈর্য্য ধ'রে শোন; একটু মন দিয়া শোন; একটা সহানুভূতির কথা বল। এ যে তোমার প্রভুরই আদেশ। প্রভুই এদের পাঠিয়েছেন; ওদের কথার ভিতরে প্রভুরই যে স্বর। তাদের কথা শোন, অবহেলা ক'রো না। বলার চেয়ে শোনাতেই কল্যাণ।

ম'রে আবার হওয়া—তোমাকে হ'তে হ'লে একবার ম'রতে হবে। নূতন জীবন পেতে হ'লে পুরাণ জীবনকে বিনাশ ক'র্‌তে হবে। যে ওস্তাদের নিকট গান শিখ্‌বে, তাকে পূর্ব্বে সে যে ভুল গান শিখেছিল, তা ভু'লে যেতে হয়। যে মোটেই গান শিখে নাই, তাকে শিখান সহজ; যে ভুল শিখেছিল, তাকে শিখান কঠিন। আগে তার ভুল ভাঙ্গতে হবে, পুরাণ সুর ভুলাতে হবে, তবে নূতন ক'রে গান শিখান যাবে। তুমি যে নূতন জীবনের আদর্শ দেখেছ তা লাভ কর্‌তে হলে, পুরাণ জীবনকে একেবারে মুছে ফেল্‌তে হবে। এত দিন ধ'রে কত দূষিত মত পোষণ করেছ, কত কুরীতি কুসংস্কারের অনুসরণ করেছ, কত ভ্রান্ত পথে চলেছ! আজ সে-সব ভু'লে যাওয়া কত কঠিন, সে-সব মুছে ফেলা কত শক্ত! অথচ সব ভু'লে যেয়ে নূতন ক'রে জীবন আরম্ভ কর্‌তে হবে। তোমাকে যেতে হবে উত্তরে, তুমি চলেছ দক্ষিণে; এতটা পথ আবার ফিরে আস্‌তে হবে। তাই বলি, জীবন গঠন কর্‌বে? নূতন জীবন লাভ কর্‌বে? পুরাণকে বিদায় দাও। পুরাণের সহিত স্নেহ প্রীতি জড়ান আছে? চড়্ চড়্ ক'রে সে বাঁধনগুলি ছিঁড়ে ফেল। পুরাণ ম'রে যা'ক্, নূতন ক'রে হও।

প্রভুত্ব না দাসত্ব?—দাসত্বকে তোমরা ঘৃণা কর—তোমরা বল দাসত্বে মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় না, মানুষ ছোট হয়, হীন হয়। আমি দেখি দাসত্বেই আমার কল্যাণ, দাসত্বেই আমার মুক্তি, দাসত্বেই আমার শক্তি। যখন আমি প্রভু হ'য়ে বসি আমার শক্তি নিয়ে কার্য্যে অগ্রসর হই, আমি একটু পরেই দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ি; আমার শক্তির স্রোত বন্ধ হ'য়ে যায়—আমাকে উৎসাহ দিবার কেহ থাকে না, প্রাণে অনুপ্রাণনা আসে না, দশ জনের সঙ্গে বিরোধ হয়। তাহাও যে প্রভুত্ব ল'য়ে আসে! আর আমি যখন দাসত্ব ল'য়ে কর্ম্মক্ষেত্রে যাই, প্রভুর দাস আমি, তিনি শক্তির উৎস, তিনি যা বলেন, তা-ই আমি কর্‌ব, আমার নিজের ইচ্ছা নাই, নিজের প্রশংসা নাই, নিজের আশা আকাঙ্ক্ষা নাই, তিনি যা বলেন তাহাই ক'রে যাই, আমি তাঁর দাস, তখন দেখি আমরা দুর্জ্জয় বল, অনন্ত শক্তির প্রস্রবণ, হ'তে বল পাচ্ছি। যদি আমি অকৃতকার্য্য হই, আমার ভয় নাই, দুঃখ নাই, নিরাশা নাই; কারণ, কাজ তাঁরই, তিনিই বিফলতা এনে দিয়েছেন। আমি ত তাঁর হুকুমে চলি। তাই বলি, তোমরা প্রভু হ'ও না; দাস হও—তাঁর দাস হ'য়ে, তাঁর হুকুমে কাজ ক'রে যাও—বল পাবে, ধৈর্য্য পাবে, আশা পাবে, আনন্দ পাবে।

সম্পাদকীয়

নিবার্য্য দুঃখ—প্রেমময় বিশ্ববিধাতা যেমন এই সংসারকে অশেষ প্রকার আনন্দ ও সুখের নিকেতন করিয়া গড়িয়াছেন, তেমনি তাঁহার বিশ্ববিধানের মধ্যে দুঃখ তাপেরও যথেষ্ট ব্যবস্থা রহিয়াছে। জ্ঞানী পণ্ডিত ও বিশ্বাসী ভক্ত জানেন, মানবের উন্নতি ও কল্যাণের জন্য এই দুঃখ তাপের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে, দুঃখ বেদনা না থাকিলে মানুষ সৌন্দর্য্য ও মহত্বে, বলে ও শক্তিতে, মণ্ডিত হইয়া পূর্ণতার পথে অগ্রসর হইতে পারিত না, প্রকৃত আনন্দ ও সুখও সম্যক্ প্রকারে উপভোগ করিতে সমর্থ হইত না—যে অসীম প্রেম ও মঙ্গল ভাব এত আনন্দ ও সুখের ব্যবস্থা করিয়াছেন, দুঃখ বেদনাও তাঁহারই হস্তের দান। সংসারের সাধারণ লোক নিশ্চয়ই এই কথা বুঝে না, স্বীকার করে না। তাহারা অনেকেই মনে করে, উহা কোনও নির্ম্মম বিরোধী শক্তি বা শয়তান হইতেই আসিয়াছে, প্রেমময় দেবতা কখনও এরূপ ব্যবস্থা করিতে পারেন না। তাহাদিগের এই ভ্রম দূর করিবার জন্য দুঃখ তাপের একান্ত আবশ্যকতা প্রমাণ করা আমাদের বর্ত্তমান আলোচনার উদ্দেশ্য নহে। এ কথা সত্য হউক আর না হউক, দুঃখ তাপকে যে ইহারা কেহই চাহে না, বাঞ্ছনীয় মনে করে না, বরং সর্ব্বথা তাহা হইতে দূরে থাকিতেই চেষ্টিত ও আকাঙ্ক্ষিত, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। এমন কি যাহারা ইহার আবশ্যকতা ও উপকারিতা স্বীকার করে বা বুঝিতে পারে, তাহাদের মধ্যেও অল্প লোকই ইহাকে পরিত্যাগ করিতে ব্যস্ত না হইয়া সাদরে বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত। অনেকেই অপরিহার্য্য বলিয়া কেবল সহ্য করিয়া যায়, বিদ্রোহী না হইয়া অভিযোগ করিতে ক্ষান্ত থাকে মাত্র। শুধু উচ্চ শ্রেণীর দুই চারি জন ভক্তই, আনন্দ ও সুখের ন্যায়, দুঃখ বেদনাকে সম ভাবে প্রেমময়ের

প্রেমের দান বলিয়া সাদরে বরণ করিয়া লইতে ও অপরাজিত চিত্তে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে গ্রহণ করিতে পারেন। ইহা ছাড়া এরূপ ভক্তও যে একেবারে দেখা না যায় এমন নহে, যিনি বাস্তবিক দুঃখ তাপের মধ্যেও আনন্দই অনুভব করেন। কিন্তু এ সকল অসাধারণ লোককে গণনার মধ্যে ধরিয়া লাভ নাই—অধিকাংশ লোক যে পথ অনুসরণ করিয়া চলে, তাহাই স্বীকার করিয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। তাহা হইলে বুঝিতে পারিব কেন দুঃখ তাপ হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় আবিষ্কারেই চিরদিন মানব মন এত ব্যস্ত হইয়াছে, চিন্তাশীল দার্শনিকগণ ও প্রেমিক ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণ আপনাদের গভীরতম চিন্তা ও সাধনাকে নিযুক্ত করিয়াছেন। সে প্রচেষ্টায় কে কতদূর সফলতা লাভ করিয়াছেন তাহা বিচার করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। তবে সর্ব্ব প্রথমেই স্মরণে রাখিতে হইবে ইহাতে পূর্ণ সফলতালাভের কোনও সম্ভাবনা নাই। কেননা, আমরা যে কোনও উপায়ই অবলম্বন করি না কেন, পূর্ণ রূপে সকল দুঃখ তাপ হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার কোনই সম্ভাবনা নাই। অনেক দুঃখ তাপ সম্পূর্ণ অনিবার্য্য রূপেই আমাদের উপর নিপতিত হয়, তাহা আমাদের কোনও কার্য্যের উপর নির্ভর করে না, বিন্দু পরিমাণে নিবারণ করিবার শক্তিও কোনও মানুষের নাই। সুতরাং সে বিষয়ে আলোচনা করিবার যে প্রয়োজন নাই, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। বাস্তবিক যাহা অনিবার্য্য তাহার সম্বন্ধে আমাদের কিছুই করণীয় নাই, তাহাকে বহন করিতেই হইবে। তবে অনেক সময় মানুষ সে কথা ভুলিয়া অনিবার্য্যের সঙ্গে নিবার্য্য কিছু যোগ করিয়া উহার চাপকে গুরুতর ও অধিকতর অসহনীয় করিয়া তোলে। সেখানে নিশ্চয়ই তাহার করণীয় কিছু আছে,—অনর্থক দুঃখ বেদনা যাহাতে বর্দ্ধিত না হয় তাহা তাহাকে করিতেই হইবে। কোন্ গুলি অনিবার্য্য ও আর কোন্ গুলি নিবার্য্য সে আলোচনাতে নিযুক্ত হওয়ার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। তাহা সকলেই সহজেই নির্দ্ধারণ করিতে পারে। যাহা আমাদের কোনও ভাবের বা কার্য্যের উপর নির্ভর করে না, তাহা নিশ্চয়ই অনিবার্য্য। সে-সকলের একটা তালিকা উপস্থিত না করিলেও কাহারও বুঝিতে কোনও অসুবিধা হইবে না। নিবার্য্য দুঃখই আমাদের আলোচ্য। বাসনাই সে-সকল দুঃখ তাপের অধিকাংশের মূল এবং বাসনার নির্ব্বাণই যে তাহাহইতে পরিত্রাণ লাভের প্রকৃষ্ট পন্থা, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। বুদ্ধদেবের সে মহা আবিষ্কারের পুনরালোচনা অনাবশ্যক। সে বিষয়ে কিছু বলা আমাদের উদ্দেশ্যও নহে। কিন্তু যদিও বাসনাই অধিকাংশ দুঃখের মূল—শুধু নিবার্য্য নয়, অনেক অনিবার্য্য দুঃখও বাসনার সঙ্গে যুক্ত হইয়া প্রবলতর এবং একান্ত অসহনীয় হইয়া উঠে—তথাপি উহাই সকল নিবার্য্য দুঃখের কারণ নহে—কোনও বাসনার দ্বারা চালিত না হইয়াও আমরা আপনার দোষেই এমন অনেক দুঃখ তাপ অনর্থক ডাকিয়া আনি, যাহা সহজেই পরিহার করা সম্ভবপর ছিল। অনেক সময় সে-সকল কারণ কিছুই গুরুতর নয়, অতি সামান্যই; তথাপি তাহাদের ফলে যে দুঃখ বেদনা আসে তাহা মোটেই অগ্রাহ্যের বিষয় নহে, তাহা অতি ভীষণ হইয়াই উঠে। বিশেষতঃ এ সকল দুঃখ বেদনা আবার কোনও প্রকারেই কল্যাণকর নহে, বিশেষ অনিষ্টকরই। এ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা একান্তই আবশ্যক মনে হইতেছে।

এই প্রসঙ্গে স্বভাবতঃই সর্ব্বাগ্রে বিরোধ ও সংঘর্ষের কথা মনে উদয় হয়। সামাজিক জীব মানুষের সাংসারিক আনন্দ সুখ যে বহু পরিমাণে পরস্পরের প্রীতি ও সদ্ভাবের উপর নির্ভর করে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এই প্রীতি ও সদ্ভাবের যেখানে অভাব ঘটে, সেখানে যে অতি অল্পেতেই বিরোধ ও সংঘর্ষ উপস্থিত হয়—অনেক সময় বিনা কারণেও নানা ভুল ধারণা জন্মিয়া অপ্রীতি ও অসদ্ভাব ঘটে—এবং তাহা না হইলেও অবশ্যম্ভাবী রূপে দুঃখ বেদনা উৎপন্ন হয়, তাহা বলা বাহুল্য। প্রীতি ও সদ্ভাবের অভাব কেন ঘটে, তাহা অনুসন্ধান করিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায়, অধিকাংশ স্থলেই সন্দেহ ও অবিশ্বাসই উহার মূল কারণ। সংসারে যে প্রকৃত অপ্রেম ও অসদ্ভাব, সত্য বিরোধ ও সংঘর্ষ, অন্যায় অত্যাচার উৎপীড়ন মোটেই নাই, আমরা এমন কথা বলিতেছি না—তাহা নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু একটু অনুসন্ধান করিলেই দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা যত বেশী আছে বলিয়া আমরা মনে করি প্রকৃত পক্ষে তত নাই। আর যাহা আছে তাহাও নিবার্য্য নহে, তাহার দূরীকরণ আমাদের উপর নির্ভর করে না। সুতরাং তাহা আমাদের আলোচনার বহির্ভূত। সহজেই বুঝিতে পারা যায়, আমরা যত অধিক আছে মনে করি যদি যথার্থই তত বেশী থাকিত, তাহা হইলে এই সংসার বাসেরই অযোগ্য হইত। যাহারা কোন বিষয়ে, স্বার্থের জন্যই হউক কি অন্য কোনও কারণেই হউক, অসদ্ভাবের দ্বারা চালিত হইয়াই কার্য্য করে, তাহারাই অপর অনেক বিষয়ে সত্য প্রীতি ও সদ্ভাবের দ্বারাই চালিত হয়। মানুষের মধ্যে স্বভাবতঃই যথেষ্ট প্রীতি ও সদ্ভাব আছে বলিয়া যাহারা মনে করে না, তাহাদিগকেও স্বীকার করিতে হইবে যে, অন্ততঃ নিজের স্বার্থ ও সুখের জন্যও, অনেক স্থলে মানুষ এরূপ করিয়া থাকে। সে যাহা হউক, যেখানে সত্য প্রীতি ও সদ্ভাব আছে, সেখানেও যে অনেক সময় সন্দেহ ও অবিশ্বাস বশতঃ আমরা তাহা দেখিতে পাই না, মিথ্যা বিরোধিতা ও অসদ্ভাব কল্পনা করি, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমাদের চক্ষুরাদি শারীরিক যন্ত্র রুগ্ন ও বিকৃত হইলে যেমন আমরা সত্য জ্ঞানলাভে অসমর্থ হইয়া মিথ্যা ভ্রমে পতিত হই, তেমনি আমাদের স্বাভাবিক বিশ্বাস ও সদ্ভাব হারাইয়া যখন আমরা বিকৃত প্রকৃতি লাভ করি, তখন আমরা স্পষ্ট সত্যকেও দেখিতে পাই না,—সত্যকেই মিথ্যা ও মিথ্যাকেই সত্য বলিয়া মনে করি। বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক সত্যানুসন্ধানে উপযুক্ত রূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য যদিও সন্দেহ ও অবিশ্বাসের একটা স্থান আছে, তথাপি তাহার আধিক্য যে সেখানেও সত্য-নির্ণয়ের ঘোর প্রতিবন্ধক তাহা সকলেই বলিবে। কতকটা বিশ্বাসের চক্ষে না দেখিলে কোনও সত্যকেই দেখিতে পাওয়া যায় না—অবশ্য বিশ্বাসের আতিশয্যও সত্যনির্দ্ধারণের প্রতিবন্ধক। আমরা নিশ্চয়ই সেরূপ বিচারহীন বিশ্বাসাধিক্যের কথা বলিতেছি না। "অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথম্ তদুপলভ্যতে" ইহা যে শুধু ব্রহ্মোপলব্ধি বিষয়েই সত্য তাহা নহে, অপরাপর জ্ঞান-

লাভ সম্বন্ধেও সেই কথাই খাটে। 'আছে' বিশ্বাসে অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিলে, কঠিন পরীক্ষার মধ্যেও অস্তিত্বের অনেক প্রমাণ সংগৃহীত হইতে পারে। কিন্তু 'নাই' বলিয়া খুঁজিতে গেলে, কোথাও তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাবে না। যেখানে অতি স্পষ্ট প্রমাণকেও সন্দেহ ও অবিশ্বাস গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নয়, সেখানে সত্য লাভের কোনই সম্ভাবনা নাই। সন্দেহ ও অবিশ্বাস সকল ঘটনাকেই বিকৃত আকারে উপস্থিত করে, প্রত্যেক বিষয়েরই অন্য রূপ ব্যাখ্যা প্রদান করে। সরল সহজ ভাবে যাহা বুঝিতে পারা যায় তাহা গ্রহণ না করিয়া, সকল বিষয়েরই মধ্যে ইহা একটা গূঢ় কূট অর্থ খুঁজিয়া বেড়ায়। নিঃস্বার্থ প্রেম ও মহৎ আত্মত্যাগের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্তের মধ্যেও ইহা লুকায়িত স্বার্থপরতা ও নীচ আত্মম্ভরিতার অন্ধকারময় ছায়া ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পায় না। মানুষের মধ্যে মহত্ত্ব ও দেবত্ব, প্রেম ও নিঃস্বার্থপরতা, থাকিতে পারে, এ বিশ্বাসেরই যেখানে একান্ত অভাব, সেখানে এরূপ হইবারই কথা। কিন্তু ইহা যে প্রীতি ও শ্রদ্ধা, প্রেম ও সদ্ভাবের মূলোচ্ছেদদ্বারা আমাদের জীবনকে বিষে জর্জ্জরিত করিয়া, সংসারের একটা প্রধান সুখ ও শান্তি হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত ও অনর্থক দুঃখ তাপে দগ্ধ বিদগ্ধ করে, অপরের অপেক্ষা আমাদের নিজেরই অধিকতর অনিষ্ট সাধন করে, তাহা আমরা অনেক সময়ই ভাবিয়া দেখি না, তাই বুঝিতেও পারি না। সামান্য একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, ইহার দ্বারা কিছু পরিমাণে অপরের দুঃখ বেদনা উৎপন্ন হইলেও কোনই অনিষ্ট সাধিত হয় না,—আর সে দুঃখ বেদনাটাও আমাদেরই অবস্থা ভাবিয়া, আমরা অনর্থক কষ্ট পাইতেছি দেখিয়াই জন্মে,—তাহাতে তাহাদের মহত্ত্ব কিছুমাত্র খর্ব্ব হয় না। আমরাই প্রেম ও সদ্ভাব হারাইয়া ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ হই, মহত্ত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়া মনুষ্যত্ব হারাই, এবং অপরের অপ্রেম ও অসদ্ভাব কল্পনা করিয়া দুর্ব্বিষহ দুঃখ বেদনাতে নিমজ্জিত হই। ইহা যে আমাদের প্রকৃত ব্যাধি ও সহজে নিবার্য্য তাহা আর অধিক করিয়া বলিতে হইবে না। সামান্য একটু বিশ্বাস ও সদ্ভাব লইয়া যদি আমরা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই, তবে প্রকৃত সত্য প্রতিভাত হইয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃশ্য আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইবে, মিথ্যা বিরোধ ও সংঘর্ষজনিত দুঃখ বেদনার কাল্পনিক কারণ বিদূরিত হইয়া জীবন আনন্দ ও শান্তিতে পূর্ণ হইবে, সকল মধুময় হইবে —নিজের একটা মহা অনিষ্টও নিবারিত হইবে। আমরা নিজে এ সকল দোষ হইতে মুক্ত থাকিলেও, অপরের ত্রুটির জন্যও অনিবার্য্য রূপে দুঃখ বেদনা আসিতে পারে। কিন্তু সে স্থলেও যদি সহিষ্ণু ভাবে বহন করিতে না পারিয়া উহাকে বর্দ্ধিত করি, তবে তাহার জন্য বহু পরিমাণে আমরাই দায়ী—বলা বাহুল্য তাহা অনিবার্য্য নহে, নিবার্য্যই।

সন্দেহ ও অবিশ্বাসের পরেই মনে হয় এই দুঃখ বেদনার দ্বিতীয় কারণ—আত্মম্ভরিতা বা আপনার প্রতি অতিরিক্ত দৃষ্টি-প্রদান ও অপরের সম্বন্ধে উদাসীনতা। এই সংসারে যখন আমাদিগকে দশজনের সঙ্গে মিলিয়াই কাজ করিতে হয়, কখনও অন্যনিরপেক্ষ হইয়া একাকী বাস করা সম্ভবপর নয়, তখন অপরের সুখ সুবিধা, ইচ্ছা অভিরুচি প্রভৃতির দিকে যদি কিছু মাত্র দৃষ্টি না রাখিয়া কেবল আপনাকেই লক্ষ্য স্থানে রাখিয়া চলি, আপনার সুখ সুবিধা ও ইচ্ছা রুচি ভাবকেই সর্ব্বোপরি প্রতিষ্ঠিত করিতে অগ্রসর হই, তবে যে অনেক সময় অপরের সঙ্গে সংঘর্ষ ও বিরোধ উপস্থিত হইবে এবং তাহা হইতে দুঃখ বেদনা উৎপন্ন হইবে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। অপর দিকে এরূপ লোক নিজের কর্ত্তব্যের কথা না ভাবিয়া সর্ব্বদা দাবী ও অধিকার লইয়াই ব্যস্ত হয়, (সে দাবীও অনেক সময় ষোল আনার পরিবর্ত্তে আঠার আনাই), তাহার কি করিবার আছে একবারও মনে না করিয়া অন্যে কিছু করিল না, যথেষ্ট করিল না, এই অভিযোগ মনে পোষণ করিয়া সদা অসন্তুষ্ট, সদা অতৃপ্ত ও অসুখী, দুঃখ বেদনায় নিমজ্জিত থাকে। তাই তাহার পক্ষে অতি তুচ্ছ বিষয়ও মহা দুঃখের কারণ হইয়া উঠে। এই প্রসঙ্গে বিশেষ রূপে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, যে-সকল স্থলে অপরের নিকট হইতে কোনও বিরোধিতা না আসে, সে-সকল স্থানেও এই রূপ লোক অনেক সময় বিরোধিতা কল্পনা করিয়া বৃথা দুঃখ কষ্ট পায়। পরস্পরের মধ্যে সময় সময় স্বার্থের সংঘর্ষ উপস্থিত হইলেও, একটু অনুসন্ধান করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে, এরূপ ঘটনা খুব বেশী ঘটে না। প্রকৃত পক্ষে বিশ্ববিধাতার এমনই ব্যবস্থা যে, প্রত্যেকে যদি আপনার সত্য স্বার্থ ও কল্যাণের সীমার মধ্যে থাকে, তবে কখনও কোনও সংঘর্ষ উপস্থিত হয় না। আকাশে যেমন অগণ্য গ্রহ নক্ষত্র আপন আপন নির্দ্দিষ্ট পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কখনও একে অন্যের উপর নিপতিত হয় না, তেমনি প্রত্যেক মানুষ আপনার নির্দ্দিষ্ট পথে চলিয়া নিজের প্রকৃত স্বার্থ সাধনে নিযুক্ত থাকিলে, কিছুতেই পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয় না। যে সকল স্থলে ওরূপ সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, সেখানে প্রকৃত সীমালঙ্ঘন করিয়া অন্যায় অতিরিক্ত স্বার্থের সেবা করিতে যাইয়াই উহা ঘটে। যাহা হউক, সে বিষয়ে অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। কেননা, ইহা সকল সময় নিবার্য্য নহে,—আমাদের কোনও ত্রুটি না থাকিলেও, অপরের অন্যায় স্বার্থপরতার জন্যও কোন কোন সময় সংঘর্ষ উপস্থিত হইতে পারে। তাহা আমাদের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্গত নহে। কিন্তু অনেক সময় প্রকৃত সংঘর্ষ না থাকিলেও, আমাদের উক্ত প্রকার ভাবের জন্য আমরা শত্রুতা ও বিরোধিতা কল্পনা করি। কার্লাইল এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রারম্ভিক অভিভাষণে ছাত্রদিগকে সেই কথাই বলিয়াছিলেন। আমরা অপরকে যে পথে চলিতে দেখিতে চাই, তাহারা সে পথে না চলিলেই, অথবা আমি যে পথে যে ভাবে চলিতে ইচ্ছা করি, অপরের জন্য সে পথে সে ভাবে চলিতে না পারিলেই যে আমার বিরোধিতা করা হইল, সকলে আমার শত্রু হইল, ইহা সত্য নহে। কল্যাণসাধন ও কর্ত্তব্যপালনের আদর্শ ও পন্থা সকলের এক নহে। তাই একই সাধু উদ্দেশ্যের দ্বারা চালিত হইয়াও বিভিন্ন লোক বিভিন্ন প্রকার কার্য্য করিয়া থাকে। এরূপ স্থলে প্রকৃত পক্ষে সহায়তার জন্য যাহা করা হয়, তাহাকে বিরোধিতা বলিয়া ভ্রম করিলে, সম্যক্ চিন্তা ও বিচারের অভাব, আপনার উপর অতিরিক্ত আস্থা ও অপরের প্রতি অন্যায় অনাস্থা ও অবিচারই সূচিত হয়। আমারও যে একটা নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকিতে হইবে, আপনাকে

সংযত রাখিতে হইবে, অপরেরও একটা ন্যায্য অধিকার আছে, তাহাকে তাহার সীমার মধ্যে চলিতে দিতে হইবে, এই আত্মদৃষ্টি ও উদারতা থাকিলে কখনও উক্ত প্রকার ভাব জন্মে না, এবং তজ্জনিত দুঃখ তাপও উৎপন্ন হয় না। আর অপরের নিকট হইতে কি পাইবার আছে, সে দাবী ও অধিকারের কথা ভুলিয়া, তাহাদের সম্বন্ধে নিজের কি কর্ত্তব্য আছে সে দিকে দৃষ্টি রাখিলে যে, বৃথা অভিযোগ ও অসন্তোষের বেদনা ভোগ করিতে হয় না, যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহাতেই হৃদয় আনন্দ ও তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠে, তাহাও সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এ সম্বন্ধে কার্লাইল তাঁহার অদ্ভুত ভাষায় অতি সুন্দর কথাই বলিয়াছেন—"আমরা নিজেরা হিসাব করিয়া আমাদের একটা প্রাপ্য বা দাবী নির্দ্ধারণ করি, মনে করি উহা আমাদের স্বাভাবিক ও অলঙ্ঘনীয় অধিকার। উহা শুধু আমাদের প্রাপ্য উপযুক্ত বেতন, তাহার জন্য ধন্যবাদ দেওয়ার প্রয়োজন নাই। উহার অতিরিক্ত যাহা কিছু তাহাই সুখ, আর যে টুকু কম তাহাই দুঃখ। এখন যদি বিবেচনা করিয়া দেখ যে, আমাদের উপযুক্ত প্রাপ্য নির্দ্ধারণের ভার আমাদেরই হাতে এবং আমাদের প্রত্যেকেরই কতটা অহঙ্কার ও আত্মম্ভরিতা রহিয়াছে, তাহা হইলে মাপের পাল্লাটা যে অধিকাংশ সময় অন্যায় দিকেই নত হইয়া পড়িবে এবং অনেক মূর্খ যে বলিয়া উঠিবে, 'দেখ, আমাকে কি বেতন দেওয়া হইল, কোনও ভদ্রলোক কি কখনও এরূপ ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াছে'—তাহাতে কি আশ্চর্য্য হইবার কিছু আছে? আমি বলি, 'মূর্খ, তুমি যাহা তোমার উপযুক্ত প্রাপ্য বলিয়া কল্পনা কর, তাহা সবই তোমার মিথ্যা অহঙ্কারপ্রসূত। কল্পনা কর তুমি ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিবার উপযুক্ত (যাহা খুবই সম্ভবপর), তাহা হইলে বন্দুকের গুলিতে মরাটাই সুখকর বলিয়া অনুভব করিবে; ভাব তুমি চুলের দড়িতে ফাঁসি ঝুলিবার উপযুক্ত, তাহা হইলে শণের দড়িতে ফাঁসি যাওয়াটাই বিলাসজনক মনে করিবে।' অঙ্ক শাস্ত্র হইতে জানা যায়, 'এককে' 'শূন্য' দিয়া ভাগ করিলে ভাগফল হয় 'অনন্ত'; 'শূন্য' তোমার বেতনের দাবী হউক, তাহা হইলে দেখিবে সমস্ত পৃথিবী তোমার পদানত হইয়াছে।" এ সব সমস্তই যে আমাদের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন এবং এ সকলের দুঃখ যে সহজেই নিবার্য্য, আর তাহা অনর্থক ভোগ করাতে যে অকল্যাণ ব্যতীত কল্যাণও নাই, তাহা আর অধিক করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই।

দুঃখ ও বেদনার চাপে যে আমরা অত্যধিক প্রপীড়িত ও নিরাশাগ্রস্ত হই, তাহার তৃতীয় কারণ প্রেমস্বরূপ মঙ্গলময় বিশ্ববিধাতার মঙ্গল বিধানে বিশ্বাস ও নির্ভরের অভাব এবং সকল ঘটনার মন্দ দিকটাকেই, বর্ত্তমান সাময়িক দুঃখ তাপটাকেই, বড় করিয়া দেখা; প্রত্যেক বিষয়েরই যে একটা ভাল দিক আছে, কৃষ্ণবর্ণ মেঘের অন্তরালে যে উজ্জ্বল সূর্য্যালোক চির বিরাজিত রহিয়াছে, বর্ত্তমান বেদনা যতই তীব্র হউক না কেন, উহা যে চিরস্থায়ী কল্যাণ ও সুখেরই পূর্ব্বসূচনামাত্র, কিছুতেই চিরদিন থাকিবার জিনিষ নয়, সে দিকে দৃষ্টি না করা, সে কথা একেবারে ভুলিয়া থাকা। ঈশ্বরবিশ্বাসী লোকদের মধ্যেও অনেকে বিশ্বাস করিতে পারে না যে, দুঃখ তাপ তাঁহারই প্রেমের দান, তাহার মধ্য দিয়া তিনি পরিণামে মঙ্গলই সাধন করিবেন। অনেকেই মনে করে উহা শয়তান বা অন্য কোনও বিরোধী শক্তিরই কার্য্য, অথবা আমাদের পাপের নির্ম্মম শাস্তি। জগতের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল ঘটনাকে যে কোনও প্রেমস্বরূপ মঙ্গলময় বিধাতা সর্ব্বদা নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, তিনি যে সকল ঘটনারই মধ্য দিয়া আমাদের সমস্ত পাপ ও বিরোধিতা সত্ত্বেও, সকলকে নিয়ত উন্নতি ও কল্যাণের পথেই লইয়া যাইতেছেন, তাঁহার শাস্তিও যে আমাদের সংশোধনের জন্যই, অসীম প্রেম ও করুণা হইতেই প্রসূত, এই আশাপ্রদ মহা সত্যটা অতি অল্প লোকেই অন্তরের অন্তরে দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করে বা নিঃসন্দিগ্ধরূপে বুঝিতে পারে। তাই অনেকেই তাঁহাকে চিরসহায় ও আশ্রয় জানিয়া, পূর্ণ আশার সহিত তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া, নিশ্চিন্ত হইতে পারে না। তৎপরিবর্ত্তে আপনার দুর্ব্বল শক্তির উপর নির্ভর করিতে যাইয়া ব্যর্থকাম হওয়াতে, দিন দিন গভীর হইতে গভীরতর রূপে নিরাশার আবর্ত্তে হাবুডুবু খায় এবং ক্রমে সকল চেষ্টা যত্ন ছাড়িয়া দেয়,—অনেক সময় বিশ্বাসও হারাইয়া ফেলে। কেহ কেহ আবার অন্যায় ভাবে উৎপীড়িত অত্যাচারিত হইতেছে মনে করিয়া বিদ্রোহীও হইয়া উঠে। ইহার ফলে যে দুঃখ বেদনা কিছুমাত্র লঘু না হইয়া তীব্রতরই হইয়া উঠে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এরূপ অবস্থায় যে সামান্য দুঃখ তাপও অনেক বড় হইয়া উঠে, নিতান্ত অসহনীয় হইয়া পড়ে, তাহা আর বলিতে হইবে না। অপর দিকে বিশ্বাস নির্ভর ও আশা থাকিলে যে কোনও দুঃখ তাপই অসহনীয় হয় না, বরং অনেক সময় মঙ্গলময়ের প্রেমের দান বলিয়া আর দুঃখ বলিয়াই অনুভূত হয় না, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। আর মন্দ দিকটা অপেক্ষা ভাল দিকটার দিকে অধিকতর দৃষ্টি রাখিবার অভ্যাস করিলেও দুঃখ তাপ যে বহু পরিমাণে লঘুতরই এবং অনেক স্থলে একেবারে বিদূরিতই হয়, তাহাতেও কোনও সন্দেহ নাই। অথচ জগতের ও জীবনের ঘটনাবলী একটু ধীর ভাবে পর্য্যালোচনা করিলে এই বিশ্বাস নির্ভর ও আশা প্রাণে জাগান কিছুই কঠিন নহে। স্বাভাবিক ভাবেই সহজে তাহা প্রাণে উদয় হয়। আর মন্দ দিকটা না দেখিয়া ভাল দিকটার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে অভ্যস্ত হওয়াও কাহারও সাধ্যাতীত নহে। সকল বিষয়েরই একটা ভাল দিক আছে, ক্ষণিকের পশ্চাতে একটা চিরন্তন আছে, সকল মেঘের অন্তরালেই সূর্য্যালোক আছে। ইহা খাঁটি সত্য, কল্পনা করিয়া মানিয়া লইতে হয় না। সামান্য চেষ্টা যত্ন করিলেই ইহা জানিতে ও বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং ইহার অভাবে আমরা যে সামান্য দুঃখ বেদনাকেও গুরুতর করিয়া তুলি, তাহার চাপে অনর্থক পিষ্ট হই, তাহা আমাদের ত্রুটিতেই ঘটে, তাহা বহু পরিমাণেই নিবার্য্য এবং অনিষ্টকরও। এরূপ আরও অনেক বিষয় রহিয়াছে। সকল কথার নিঃশেষ আলোচনা অসম্ভব ও অনাবশ্যক। আশা করি আমাদের সকলের দৃষ্টি এ বিষয়ের দিকে আকৃষ্ট হইবে। আমরা যেন আর বৃথা জীবনের দুঃখ তাপের বোঝা না বাড়াই, যাহা সহজে নিবার্য্য ও অকল্যাণকর, তাহা নিবারণ করিতে যেন কখনও উদাসীন না হই। মঙ্গলময় বিধাতা আমাদিগকে শুভ বুদ্ধি প্রদান করুন। আমরা সকল বিষয়ে তাঁহারই অনুগত হইয়া, তাঁহাতে আশা বিশ্বাস ও নির্ভর রাখিয়া, জীবনপথে চলি। তাঁহার ইচ্ছাই সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হউক।

নানকবাণী

৩৬

গুর মুখ নাম দান ইসনান।
গুর মুখ লাগৈ সহজ ধিআন।
গুর মুখ পাবৈ দরগহ মান।
গুর মুখ ভউভনজন পরধান।
গুর মুখ করণী কার করাএ।
নানক গুর মুখ মেল মিলাএ।

ভাবানুবাদ

ভগবৎমুখীন ব্যক্তি নাম জপ করেন, দান ও স্নান করেন।
ভগবৎমুখীন ব্যক্তির পক্ষে ধ্যান সহজ হয়।
ভগবৎমুখীন ব্যক্তি পরমেশ্বরের দরবারে সম্মান পান।
ভগবৎমুখীন ব্যক্তি ভয়ভঞ্জনে প্রধান।
ভগবৎমুখীন ব্যক্তি কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করেন।
নানক বলেন, ভগবৎমুখীন ব্যক্তি পরমেশ্বরের সহিত মিলিত হন।

৩৭

গুর মুখ সাসত্র সিম্রিত বেদ।
গুর মুখ পাবৈ ঘট ঘট ভেদ।
গুর মুখ বৈর বিরোধ গবাবৈ।
গুর মুখ সগলী গণত মিটাবৈ।
গুর মুখ রাম নাম রংগ রাতা।
নানক গুর মুখ খসম পছাতা।

ভাবানুবাদ

ভগবৎ মুখীন ব্যক্তি শাস্ত্র স্মৃতি ও বেদস্বরূপ।
ভগবৎ মুখীন ব্যক্তি ঘটে ঘটে ভেদ অনুভব করেন।
ভগবৎ মুখীন ব্যক্তি বৈরতা ও বিরোধ ভাব নষ্ট করেন।
ভগবৎ মুখীন ব্যক্তি সকল গণনা মিটাইয়া দেন।
ভগবৎ মুখীন ব্যক্তি ভগবানের নামের অনুরাগে রঞ্জিত।
নানক বলেন ভগবৎ মুখীন ব্যক্তি স্বামীকে চেনেন।

৩৮

বিন গুর ভরমৈ আবৈ জাই।
বিন গুর ঘাল ন পবঈ থাই।
বিন গুর মনুআ অতি ডোলাই।
বিন গুর ত্রিপত নহী বিখ খাই।
বিন গুর বিসীঅর ডসৈ মর বাট।
নানক গুর বিন ঘাটে ঘাট।

ভাবানুবাদ

গুরু বিনা জীব কেবল পৃথিবীতে ঘোরে—জন্মে আর মরে।
গুরু বিনা তার পরিশ্রম বিফল হয়।
গুরু বিনা মন অতিশয় চঞ্চল থাকে।
গুরু বিনা মন তৃপ্ত হয় না, বিষয় ভোগ করিয়া।
গুরু বিনা বিষধর সর্প দংশায়, পথেই মরে পড়ে থাকে।
নানক বলেন গুরু বিনা কেবল ক্ষতিই হয়।

৩৯

জিস গুর মিলৈ তিস পার উতারৈ।
অবগণ মেটৈ গুণ নিসতারৈ।
মুকত মহা সুখ গুর সবদ বীচার।
গুর মুখ কদৈ ন আবৈ হার।
তন হটড়ী ইহ মন বণ জারা।
নানক সহজে সচ বাপারা।

ভাবানুবাদ

যাঁহার পরম গুরু লাভ হয় তিনি পারে উত্তীর্ণ হন।
দোষ নষ্ট করেন, গুণ দিয়া নিস্তার করেন।
ভগবৎ বাণীর চিন্তন করিলে মুক্তির মহা সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়।
ভগবৎ মুখীন ব্যক্তির কদাপি হার হয় না।
শরীরকে দোকান পাট ও মনকে ব্যাপারী করিয়াছেন।
নানক বলেন, তথায় সত্যের ব্যাপার সহজে হইতেছে।

দেবেন্দ্রনাথ, বেদান্ত, ও ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থ। (১)

[ব্রাহ্মসমাজের শতাব্দীপূর্ত্তি উপলক্ষে মহর্ষির আত্মজীবনীর যে নূতন সংস্করণ প্রস্তুত হইতেছে, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক লিখিত তাহার পরিশিষ্টের পাণ্ডুলিপি হইতে গৃহীত।]

আত্মজীবনীর দ্বাবিংশ ও ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে দেবেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন যে, কোনও প্রাচীন ও প্রামাণ্য গ্রন্থে ব্রাহ্মধর্ম্মের পত্তনভূমি হইতে পারিবে না, ইহা যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন, তখন ব্রাহ্মদিগের ঐক্যস্থল কোথায় হইবে, এই চিন্তা তাঁহার চিত্তকে অধিকার করিল; এবং এই চিন্তার দ্বারা চালিত হইয়া তিনি প্রথমে 'ব্রাহ্মধর্ম্মবীজ' ও তৎপরে 'ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ' রচনা করিলেন। 'প্রামাণ্য গ্রন্থ' 'পত্তনভূমি' প্রভৃতি শব্দের দ্বারা দেবেন্দ্রনাথ কি বুঝিতেন, প্রথম যুগে বেদান্তকে তিনি কি চক্ষে দেখিতেন, এবং তৎপরে 'ব্রাহ্মদিগের ঐক্যস্থল' বলিতে তিনি কিরূপ গ্রন্থের অভাব অনুভব করিতেছিলেন, এই সকল বিষয়ে এখানে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।

এই আলোচনাসূত্রে দেবেন্দ্রনাথের প্রথম জীবনে বেদান্তের প্রতি নির্ভর, ও কয়েক বৎসর পরে বেদান্ত পরিত্যাগ, এ সকল প্রসঙ্গ অনিবার্য্যরূপে আসিয়া পড়িবে বটে; কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ-কর্ত্তৃক পরিচালিত ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে বেদান্ত-পরিত্যাগরূপ কার্য্যটি প্রশংসনীয় কি নিন্দনীয় হইয়াছিল, এবং প্রশংসনীয় হইয়া থাকিলে তাহার প্রশংসা দেবেন্দ্রনাথের প্রাপ্য কি অক্ষয়-

নোট—গুরু অর্থে সৎগুরু পরমেশ্বর।

কুমার হস্তের প্রাপ্য, এই সকল প্রশ্নের বিচার এ আলোচনার উদ্দেশ্য নহে। এ আলোচনাতে কেবল দেবেন্দ্রনাথের মনের গতি বুঝিতে চেষ্টা করা হইবে।

'পত্তনভূমি' ও 'ঐক্যস্থল'।

আমার বিশ্বাস, দেবেন্দ্রনাথ 'পত্তনভূমি' ও 'ঐক্যস্থল' এই শব্দদ্বয়ের দ্বারা এমন কোনও প্রামাণ্য গ্রন্থ বা বাক্যাবলী অন্বেষণ করিতেছিলেন, (১) যাহা সকল ব্রাহ্মই আপনাদের ধর্ম্মের মূল সত্য বলিয়া শ্রদ্ধার সহিত স্বীকার করিবেন, এবং যে মূল সত্যের সহিত মিলাইয়া ধর্ম্মসম্বন্ধীয় যাবতীয় প্রশ্নের মীমাংসা করিবেন, (২) যাহা প্রতিবাদীর তর্কের আঘাতের সম্মুখীন হইবার সময়ে ব্রাহ্মদিগের হস্তে পরীক্ষিত সত্যাস্ত্র-সকলের কোষস্বরূপ হইয়া তাঁহাদিগকে সে আঘাত হইতে এবং নাস্তিকতা ও ভ্রান্তি হইতে রক্ষা করিবে; এবং (৩) যাহা নিয়মিতরূপে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পাঠ ও মনন করিয়া ব্রাহ্মদিগের চিত্তে বিমল জ্ঞান, ঈশ্বরভক্তি, ও সাধু ভাবসকল উজ্জ্বল থাকিবে।

এক সময়ে দেবেন্দ্রনাথের এই ধারণা জন্মিয়াছিল যে উপনিষদই ব্রাহ্মদিগের ঐরূপ প্রামাণ্য গ্রন্থ হইবে। পরে যখন বুঝিতে পারিলেন যে তাহা হইবে না, তখন তিনি মনে বড়ই ক্লেশ পাইয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের প্রকৃতি অতিশয় শ্রদ্ধাপরায়ণ ছিল। মানুষকেই হউক, গ্রন্থকেই হউক, শ্রদ্ধা দিতে ও হৃদয়ে রাখিতে পারিলেই তাঁহার তৃপ্তি হইত। উপনিষদ্ এ দেশের মানুষের হৃদয় হইতে উত্থিত ধর্ম্মজিজ্ঞাসার ও ধর্ম্মমীমাংসার প্রাচীনতম শাস্ত্র; উপনিষদ্ রামমোহন রায়ের গভীর শ্রদ্ধার বস্তু ও তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারকার্য্যের প্রধান সহায়; দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং যখন সংশয়ের অন্ধকারের ভিতরে পথ খুঁজিতেছিলেন, তখন উপনিষদ্ হইতেই তিনি নিজ চিন্তার সায় পাইয়া অপূর্ব্ব বল ও সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিলেন। এই উপনিষদের সাহায্যে ভারতের সকল বিভিন্নতা দূর করিয়া, ভারতকে ঐক্যবন্ধনে বাঁধিয়া, তাহার স্বাধীনতার পথ মুক্ত করা যাইবে, দেবেন্দ্রনাথের মনে এক সময়ে এতদূর পর্য্যন্ত আশার উদয় হইয়াছিল। এই উপনিষদ্ যে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রামাণ্য গ্রন্থ হইতে পারিল না, ইহাতে তাঁহার চিত্ত ক্ষুব্ধ হওয়া অনিবার্য্য ছিল।

বেদান্ত কি এক সময়ে ব্রাহ্মদিগের "বাইবেল" স্বরূপ ছিল?

দেবেন্দ্রনাথের উপনিষদ্ ত্যাগ, (অথবা "বেদান্ত ত্যাগ", discarding the Vedanta) সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজে এবং ব্রাহ্মসমাজের বাহিরে অনেক বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে। যখন উপনিষদে তাঁহার পূর্ণ আস্থা ছিল, তখন কি তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মে উপনিষদকে সেই স্থান দিতে চাহিয়াছিলেন, খ্রীষ্টানগণ স্বীয় ধর্ম্মে বাইবেলকে যে স্থান দেন? তাঁহার উপনিষদ্ 'পরিত্যাগের' অর্থ কি বাইবেলের অনুরূপ একটি স্থান হইতে তাহাকে অধঃকৃত করা? আমার তাহা মনে হয় না।

পত্তনভূমি ও ঐক্যস্থলের যে অর্থ উপরে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ তাঁহাদের শাস্ত্রগ্রন্থ বাইবেল সম্বন্ধে তাহার অতিরিক্ত আরও অনেক কথা বিশ্বাস করেন। যথা, (১) বাইবেল অলৌকিক প্রণালীতে ঈশ্বর কর্তৃক প্রকাশিত, (২) বাইবেলের প্রতি-কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য, (৩) সমগ্র মানবজাতির পরিত্রাণের জন্য বাইবেলই একমাত্র শাস্ত্র, (৪) অতএব সকল মানুষকে বাইবেলে (এবং বাইবেলের অলৌকিকতা অভ্রান্ততা প্রভৃতিতে) বিশ্বাসী করিতে হইবে, (৫) মানবের ধর্ম্মজীবনের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, এক বাইবেলেই তাহার সব আছে; ইত্যাদি।

প্রামাণ্য গ্রন্থ ও অভ্রান্ত গ্রন্থ।

এই ভাবে কোনও অলৌকিক অভ্রান্ত ও অদ্বিতীয় শাস্ত্রে বিশ্বাস করিবার প্রয়োজনীয়তা দেবেন্দ্রনাথের মনে কখনও উদয় হয় নাই, ইহা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু তিনি 'প্রামাণ্য গ্রন্থের' প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেন। 'প্রামাণ্য গ্রন্থ' ও 'অভ্রান্ত গ্রন্থ', এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। মানবমনের ইহা স্বাভাবিক বৃত্তি যে, যে-গ্রন্থ অথবা যে-শিক্ষক হইতে সে সর্ব্বোচ্চ তত্ত্বের অন্বেষণে বা সর্ব্বোচ্চ প্রশ্নসকলের মীমাংসায় আলোক প্রাপ্ত হয়, সে-গ্রন্থকে বা সে-শিক্ষককে সে বিশেষ ভক্তির চক্ষে দেখে; এবং নিজ চিন্তা হইতে অথবা অপরের সহিত তর্কবিতর্ক হইতে উত্থিত সংশয়ের আন্দোলনের ভিতরে সে এরূপ আশা করে যে, সেই-গ্রন্থ অথবা সেই-মানুষের নিকটে গেলেই তাহার সন্দেহ ভঞ্জন হইয়া যাইবে, তাহার চিত্তের অশান্তি ও আন্দোলন নিরস্ত হইবে। এইরূপ গ্রন্থ বা মানুষকেই 'প্রামাণ্য' (authoritative) আখ্যা দেওয়া হয়। ইহাতে সে-মানুষকে সর্ব্বজ্ঞ অথবা সে-গ্রন্থকে অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করা আবশ্যক হয় না; সংশয় নিরসন করিতে সমর্থ বলিয়া বিশ্বাস করাই যথেষ্ট।

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ও বেদান্ত।

কিন্তু রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় বিশ্বাস করিতেন যে (১) বেদ অপৌরুষেয়, অতএব নিত্য, এবং অভ্রান্ত; এবং (২) বেদান্ত অনুসরণ করিয়া পরমাত্মা এবং জীবাত্মার অভেদ চিন্তনই মুখ্য উপাসনা। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম বৎসরে মাঝে মাঝে বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের ঐ দুই ভাবের পরিচায়ক লেখা বাহির হইত। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রথম হইতেই প্রধানতঃ দেবেন্দ্রনাথের উদ্যোগে ও অর্থানুকূল্যে পরিচালিত হইতেছিল বটে; কিন্তু ইহা মনে করিলে ভুল হইবে যে উহাতে প্রকাশিত সকল প্রবন্ধই দেবেন্দ্রনাথের মতানুসারী ছিল। অন্ততঃ প্রথম অবস্থায় তাহা যে ছিল না, ইহা নিশ্চিত। অতএব দেবেন্দ্রনাথ প্রথম প্রথম বেদের অভ্রান্ততায় বিশ্বাস করিতেন কি না, ইহা শুধু তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রবন্ধাবলী দেখিয়া নির্ণয় করা সম্ভব নহে।

১৮৪৭ সালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দেবেন্দ্রনাথ বেদ পড়েন নাই; এবং উপনিষদও খুব তন্ন তন্ন করিয়া পড়েন নাই। উপনিষদ্ সম্বন্ধে ১৮৪৬ সাল পর্য্যন্ত দেবেন্দ্রনাথের মনে কোনও সন্দেহের উদয় হয় নাই। বিদ্যাবাগীশ মহাশয় ১৮৪৪ সালে (অর্থাৎ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার দ্বিতীয় বৎসরে) পরলোকগত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর কিছুকাল পর্য্যন্ত বেদ ও বেদান্ত সম্বন্ধে তাঁহার প্রবর্ত্তিত মতই তত্ত্ববোধিনীতে নির্ব্বিচারে চলিতে লাগিল।

এস্থলে ইহাও বলা উচিত যে বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের ন্যায় রামমোহন রায়ের অন্যান্য শিষ্যগণও বেদান্তকে অভ্রান্ত বলিতেন।

যথা, রামমোহন রায়ের ব্রহ্মসঙ্গীতের ৭৯ সংখ্যক (কৃষ্ণমোহন মজুমদার রচিত) সঙ্গীতে আছে, "অভ্রান্ত বেদান্ত শাস্ত্র, কহে না পাইয়া অন্ত, 'এ নহে, এ নহে,' হয় এই নিরূপণ" ; ৯৬ সংখ্যক (কাশীনাথ রায় রচিত) সঙ্গীতে আছে, "ন্যায় সাংখ্য পাতঞ্জল, ভাবিয়ে না পায় স্থল, অভ্রান্ত বেদান্ত অন্ত না জানে তাঁহার ; মীমাংসা সংশয়াপন্ন হ'য়ে করে তন্ন তন্ন, বাক্যমনোতীত তিনি সকল-কারণ।"

বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের এই দুই মতের প্রতি দেবেন্দ্রনাথের ভাব কিরূপ ছিল, তাহা জানিতে আমাদের কুতূহল হয়। আত্মজীবনীতে দেখিতে পাই যে, ১৮৪৩ সাল হইতেই (অর্থাৎ বেদান্ত দর্শনাদির সবিশেষ আলোচনার পূর্ব্ব হইতেই) তিনি শাঙ্কর অদ্বৈতবাদের একান্ত বিরোধী। কিন্তু বেদান্তের অভ্রান্ততা বিষয়ে আত্মজীবনী নীরব। প্রশ্ন এই যে, এ বিষয়ে কোন্ সময়ে দেবেন্দ্রনাথের মনের ভাব কিরূপ ছিল ?

বেদান্তের অভ্রান্ততা ও ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্টতা বিষয়ে খ্রীষ্টানদিগের সহিত তর্কবিতর্ক।

'বেদান্তের অভ্রান্ততা' কথাটি রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের প্রভাব বশতই ব্রাহ্মসমাজে চলিয়া আসিতেছিল। বিদ্যাবাগীশ মহাশয়কে দেবেন্দ্রনাথ অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের প্রবন্ধ সকলে অদ্বৈতবাদ থাকিলে দেবেন্দ্রনাথ তাহার প্রতিবাদ করিতেন। কিন্তু বেদান্তের অভ্রান্ততা বিশ্বাসযোগ্য কি না, এই প্রশ্নের প্রতি দেবেন্দ্রনাথের চিত্ত সম্যক্‌রূপে আকৃষ্ট হয় নাই বলিয়া বহুকাল তিনি ইহার প্রতিবাদ করেন নাই।

শুধু তাহাই নহে। বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের পরলোকগমনের অল্পকাল পরেই (অর্থাৎ ১৮৪৪ সালেই) খ্রীষ্টীয়দিগের সহিত দেবেন্দ্রনাথের তর্ক বাধিল। তখনও তাঁহার উপনিষদের অধ্যয়ন অসম্পূর্ণ ছিল। অসম্পূর্ণ অধ্যয়নের ফলে, তিনি পূর্ব্বাগত 'অভ্রান্ততা' কথাটিকে স্পষ্টতঃ অথবা পরোক্ষভাবে মানিয়া লইয়াই এই তর্কে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সকল বাদ প্রতিবাদ ১৮৪৪ হইতে ১৮৪৬ সাল পর্য্যন্ত অবিচ্ছেদে চলিয়াছিল। এই সময়ের তর্কবিতর্কের উক্তিসকল হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, পত্তনভূমি ও ঐকাস্থলের প্রথম ও দ্বিতীয় অর্থ বলিয়া যাহা উপরে নির্দ্দেশ করা গিয়াছে, (অর্থাৎ বিশুদ্ধ সত্যসকলেরই আধার, এবং প্রতিবাদীর তর্কের আঘাতের সম্মুখীন হইবার সময়ে পরীক্ষিত সত্যান্নসকলের কোষস্বরূপ), এই চক্ষেই তখন দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদ্‌কে দেখিতেছিলেন।

এই বাগ্‌যুদ্ধ দুই জন বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত হয়। প্রথম ব্যক্তি, খ্রীষ্টীয় মিশনরী আলেগ্‌জাণ্ডার ডফ্ সাহেব। রামমোহন রায়ের অনুরোধপত্র পাইয়া, এবং তাঁহারই উৎসাহে, স্কটলণ্ডস্থ জেনারেল্ এসেমব্লিজ্ মিশন্ ১৮৩০ সালে ডফ্ সাহেবকে কলিকাতায় প্রেরণ করেন। রামমোহন রায় ডফ্‌কে বিধিমত সাহায্য করেন। তাঁহাকে খ্রীষ্টধর্ম্ম শিক্ষাদানের জন্য স্কুল খুলিতে কলিকাতার উত্তরাঞ্চলে কেহ বাড়ী ভাড়া দিতেছিল না ; রামমোহন রায় চেষ্টা করিয়া চিৎপুর রোডের ব্রাহ্মসমাজের পরিত্যক্ত বাড়ীখানি তাঁহাকে ভাড়া করিয়া দেন। ছাত্র জুটিতেছিল না ; রামমোহন রায় নিজের স্কুলের কয়েকটি উৎকৃষ্ট ছাত্রকে বুঝাইয়া ডফের স্কুলে প্রেরণ করেন। বাইবেল পড়ান হয় বলিয়া ছাত্রগণ চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল ; রামমোহন রায় বহুদিন পর্য্যন্ত প্রতিদিন স্কুলে আসিয়া ছাত্রদিগকে অভয়দান করেন। এই প্রকারে রামমোহন রায় যাঁহাকে একরূপ হাতে ধরিয়া কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়া গেলেন, সেই ডফ্ সাহেবই, মিশনরী সাহেবগণের চিরাচরিত রীতি অনুসারে, য়ুরোপ ও আমেরিকায় গিয়া ভারতবর্ষকে মসীবর্ণে চিত্রিত করিয়া, তত্তৎদেশবাসীদিগকে তাঁহার মিশনে অর্থদান করিতে উৎসাহিত করেন। স্ব-রচিত India and India's Missions নামক পুস্তকে ডফ্ সাহেব হিন্দুধর্ম্মের ও বেদান্তের প্রভূত নিন্দাবাদ করেন।

দেবেন্দ্রনাথ ইহাতে অতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে ১৮৪৪ সালের আশ্বিন (সেপ্টেম্বর) এবং ১৮৪৫ সালের মাঘ, শ্রাবণ, ও আশ্বিন (জানুয়ারী, জুলাই ও সেপ্টেম্বর) মাসে, ঐ পুস্তকের, এবং এই বাগ্‌যুদ্ধে অবতীর্ণ কলিকাতার তৎকালীন খ্রীষ্টিয় পত্রিকাসকলের আক্রমণের, চারিটি প্রতিবাদ প্রকাশিত হইল ; এবং ঐ চারিটি প্রতিবাদ ১৮৪৫ সালেই একত্রে Vedantic Doctrines Vindicated নামক পুস্তকের আকারে মুদ্রিত হইল। এই সকল বাদ প্রতিবাদের মধ্যেই আর এক ঘটনা ঘটিল। ১৮৪৫ সালের বৈশাখ (এপ্রিল) মাসে ডফ্ সাহেব, অভিভাবকগণের নিষেধ সত্ত্বেও, ১৪ বৎসর বয়স্ক বালক উমেশচন্দ্র সরকার ও তাহার ১১ বৎসর বয়স্কা বালিকা পত্নীকে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। তাহাতে দেবেন্দ্রনাথের ক্ষোভ ও উত্তেজনা বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় বাগ্‌যুদ্ধ দেবেন্দ্রনাথের খ্রীষ্টধর্ম্মানুরাগী জ্ঞাতি-ভ্রাতা (প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয়ের পুত্র) জ্ঞানেন্দ্রমোহনের সহিত উপস্থিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ ১৮৪৬ সালে সমুদয় হিন্দু আত্মীয়গণকে অসন্তুষ্ট করিয়া অপৌত্তলিক বৈদিক মতে নিজ পিতৃশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। এই শ্রাদ্ধের বিরুদ্ধে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ১৮৪৬ সালের অক্টোবর মাসে *Englishman* পত্রিকায় লেখনী চালনা করেন। জ্ঞানেন্দ্রমোহন বলেন, 'শ্রাদ্ধ' একটি বৈদিক অনুষ্ঠান। তাহার সহিত নানা কুসংস্কারের ও পরিমিত দেবতায় বিশ্বাসের সংস্রব আছে ; যুক্তিবাদী ধর্ম্মে শ্রাদ্ধ বলিয়া একটি অনুষ্ঠানের স্থান থাকিতে পারে না ; দেবেন্দ্রনাথ তাহা অনুষ্ঠিত হইতে দিয়া কুসংস্কারের প্রশ্রয় দিয়াছেন। তাহার উত্তর দিতে গিয়া দেবেন্দ্রনাথ এই ভাবের কথা বলেন যে, "আমরা বেদকে আমাদের ধর্ম্ম-বিশ্বাসের মানদণ্ড মনে করি। আমরা ব্রাহ্ম হইয়া বেদের জ্ঞানকাণ্ড মাত্র গ্রহণ করিয়াছি বটে ; কিন্তু কর্ম্মকাণ্ডকে (শ্রাদ্ধাদি যাহার অন্তর্গত) আমরা নিরর্থক মনে করিলেও দূষণীয় মনে করি না।" এই জ্ঞানেন্দ্রমোহন পরে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন।

এই সকল বাদানুবাদের ভিতরে দেবেন্দ্রনাথ বেদান্তকে ইংরাজীতে ' Revelation' অর্থাৎ ঈশ্বরপ্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থ বলিয়াছিলেন। 'Revelation' বলিতে তাঁহার অভিপ্রায়টি ঠিক কি ছিল, তাহা রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের আত্মচরিত হইতে নিম্নে উদ্ধৃত অংশ পড়িলে বুঝিতে পারা যাইবে। এই উদ্ধৃত উক্তিগু-

আরম্ভে ১৮৪৮-৫০ সালের উল্লেখ আছে বটে ; কিন্তু রাজনারায়ণ বাবু তাঁহার আত্মচরিতের এই অংশে দেবেন্দ্রনাথের খ্রীষ্টান-সংঘর্ষের যুগের (অর্থাৎ ১৮৪৪-১৮৪৬ সালের) মতামতই ব্যাখ্যা করিতেছেন।

"Revelation" শব্দে দেবেন্দ্রনাথ কি বুঝিতেন ?

রাজনারায়ণ বসু মহাশয় বলিতেছেন, "ইংরাজী ১৮৪৮-৫০ এই তিন বৎসর, বেদ ঈশ্বরপ্রত্যাদিষ্ট কি না, ইহা সর্ব্বদা আমাদিগের মধ্যে বিচারিত হইত। আমরা তখন ঈশ্বরপ্রত্যাদেশে বিশ্বাস করিতাম বটে, কিন্তু, বেদ কেবল যুক্তিযুক্ত বাক্যপূর্ণ বলিয়া, তাহা ঈশ্বরপ্রত্যাদিষ্ট বলিয়া বিশ্বাস করিতাম। আমরা যে এইরূপে বিশ্বাস করিতাম তাহা আমার *Defence of Brahmoism and the Brahmo Samaj* নামক পুস্তিকা হইতে নিয়ে উদ্ধৃত বাক্যদ্বারা প্রমাণিত হইবে। 'After the death of Ram Mohan Ray, the catholic character of the Samaj was not destroyed. Even while its leaders admitted the Vedas to be a revelation, they did so solely on account of the "reasonableness and cogency of these doctrines" (see *Vedantic Doctrines Vindicated*) as compared with the other Shastras of the Hindus and the religious scriptures of other nations. They rejected the idea of a revelation supported by external evidence....The Revd. Mr. Mullens in his *Essay on Vedantism, Brahmoism and Christianity* says : "Though the Brahmos claim the Vedas as a revelation of divine truth, they look primarily upon the works of Nature as their religious teacher. From Nature they learned first, and because the Vedas, (as they assert,) agree with Nature, therefore they regard them as inspired". ... It is, therefore, evident that the leaders of the Samaj at this time considered the Vedas to be revealed solely on account of the reasonableness and cogency of these doctrines. Their error lay in believing that whatever they contained was reasonable and cogent. As soon as they perceived their mistake after a wider study of the Vedas, they shook it off at once. Now, why did they do so easily ? The reason is, that a higher standard of belief had always predominated in their minds ... over that of written revelation, viz., the standard of Reason ; and, as conscientious men, they could not continue professing that to be a revelation, which was found to contain errors.

উপরে যাহা উদ্ধৃত হইল তাহাতে প্রমাণিত হইবে যে, দেবেন্দ্র বাবুর প্রথম সময়ের ব্রাহ্মেরা প্রকৃত প্রস্তাবে বেদকে ঈশ্বরপ্রত্যাদিষ্ট বলিয়া কখন বিশ্বাস করিতেন না।

যে চারি জন যুবক পণ্ডিত দেবেন্দ্র বাবু দ্বারা কাশীতে প্রেরিত হয়েন, তাঁহারা বেদাধ্যয়ন করিয়া ফিরিয়া আইলে পর বেদকে উপরে উল্লিখিত দুর্ব্বলাকারেও ঈশ্বরপ্রত্যাদিষ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন করা যাইবে কি না, এই লইয়া আমাদিগের মধ্যে মহা তর্ক উপস্থিত হইল। দেবেন্দ্রবাবু চিরকাল ভক্তিপ্রধান ও রক্ষণশীল ব্যক্তি, অথচ সংস্কারক ; অক্ষয় বাবু যুক্তির অত্যন্ত অনুরাগী ও সংস্কার বিষয়ে অগ্রসর। দুই জনে তর্ক হইয়া স্থির হইল যে, বেদকে আর ঈশ্বরপ্রত্যাদিষ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন করা কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু উহাতে ভ্রম ও অযুক্তিযুক্ত বাক্য দৃষ্ট হইতেছে। 'বেদ ঈশ্বরপ্রত্যাদিষ্ট নহে, বিশ্ববেদান্তই প্রকৃত বেদান্ত,' এই মত অক্ষয় বাবু দ্বারা ১৭৭২ শকের ১১ই মাঘ দিবসের সাম্বৎসরিক উৎসবের বক্তৃতাতে প্রথম ঘোষিত হয়।"—(রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত, ৬৫—৬৮ পৃষ্ঠা)।

['বেদ' ও 'বেদান্ত' বলিতে এখানে উপনিষদই বুঝিতে হইবে।]

"দুর্ব্বলাকারে ঈশ্বরপ্রত্যাদেশে" বিশ্বাস ত্যাগ।

রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের ইংরাজী উক্তিতে যেখানে আছে যে, "ব্রাহ্মগণ বেদ ও উপনিষদ্ অধিক সূক্ষ্মভাবে পাঠ করিয়া যখন বুঝিলেন যে তাহাতে ভ্রম আছে, তখনই তাঁহারা তাহার ঈশ্বরপ্রত্যাদিষ্টতায় বিশ্বাস ত্যাগ করিলেন," সেখানে "ব্রাহ্মগণ" অর্থে প্রধানতঃ দেবেন্দ্রনাথকেই বুঝিতে হইবে। অধ্যয়নের কাজটি বিশেষভাবে দেবেন্দ্রনাথই করিয়াছিলেন।

ব্যবসায় পতনের ফলে যখন তাঁহার বিষয় সম্পত্তি সব গিয়াছে, এবং দারিদ্র্যের সহিত কঠোর সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে, সেই সময়েই (১৮৪৮ সালে) দেবেন্দ্রনাথ এই "অধিক সূক্ষ্ম ভাবে বেদ ও উপনিষদ্ অধ্যয়নে" নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই সময়ে দেবেন্দ্রনাথ সারাদিন অধ্যয়নের পর সন্ধ্যাকালে ছাতের উপরে কম্বল পাতিয়া বসিতেন, ব্রাহ্মগণ (বিশেষতঃ তাঁহার তত্ত্ববোধিনী সভার বন্ধুগণ,) তাঁহার সহিত ধর্ম্মালোচনা করিতে আসিতেন, এবং ধর্ম্মপ্রসঙ্গে প্রায়ই রাত্রি দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত হইয়া যাইত,—এই সকল কথা আত্মজীবনীর ৮৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে।

উপরের উদ্ধৃতাংশ হইতে ইহাও স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে যে, খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ অথবা রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় যে-ভাবে অভ্রান্ত পুস্তকে বিশ্বাস করিতেন, দেবেন্দ্রনাথ যতদিন বেদান্তকে রাখিয়াছিলেন ততদিনও সে-ভাবে তাহার অভ্রান্ততায় বিশ্বাস করিতেন না। খ্রীষ্টানগণের ও বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের চিন্তার ক্রম এইরূপ,—"এই পুস্তক ঈশ্বরপ্রত্যাদিষ্ট, অতএব ইহা অভ্রান্ত, ও অক্ষরে অক্ষরে সত্য।" দেবেন্দ্রনাথের চিন্তার ক্রম ছিল অন্যরূপ। তাহা এই,—"এই পুস্তকে কোনও ভুল পাওয়া যাইতেছে না, সব কথা যুক্তির সঙ্গে মিলিতেছে, অতএব ইহাকে ঈশ্বরপ্রত্যাদিষ্ট বলা যায়।" এই দুই প্রকার চিন্তাপ্রণালীর মধ্যে পার্থক্য অনেক।

যাহা হউক, দেবেন্দ্রনাথ খ্রীষ্টানগণের সহিত এই তর্কের ভিতরে

বেদান্তকে যেরূপ "দুর্ব্বলাকারে ঈশ্বরপ্রত্যাদিষ্ট" বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতেই অক্ষয়কুমার দত্ত, এবং রামতনু লাহিড়ী প্রমুখ ডিরোজিও-শিষ্যগণ, অতিশয় বিরক্ত হন; এমন কি, লাহিড়ী মহাশয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা গ্রহণ করাও ত্যাগ করেন; ("রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ," তৃতীয় সংস্করণ, ১৮০,১৮১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

১৮৪৬ সাল পর্য্যন্ত দেবেন্দ্রনাথ বেদান্ত সম্বন্ধে এইরূপ "দুর্ব্বলাকারে ঈশ্বরপ্রত্যাদেশ" মানিতেন। যে গভীরতর অধ্যয়নের ফলে দেবেন্দ্রনাথ বুঝিলেন যে বেদ ও উপনিষদে অনেক অযৌক্তিক কথা আছে, এবং তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রামাণ্য গ্রন্থ হইতে পারিবে না, তাহা ১৮৪৭ সালেই (অর্থাৎ কাশীতে বেদ শ্রবণ হইতেই) আরব্ধ হইয়াছিল; ১৮৪৮ সালে তাহা সম্পূর্ণ হয়। ১৮৪৭ সালের মে মাসে তত্ত্ববোধিনী সভার এক অধিবেশনে স্থির হয় যে, অতঃপর 'বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্য ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' নামটি ব্যবহৃত হইবে। তদবধি তত্ত্ববোধিনী সভায় ও পত্রিকায় এই নাম চলিতে লাগিল। ১৮৪৮ সালে 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রস্তুত হইল; ১৮৪৯ ও ১৮৫০ সালে তাহা বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত ও প্রচারিত হইল। ১৮৫১ সালের মাঘোৎসবে ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হইল যে বেদ ঈশ্বরপ্রত্যাদিষ্ট নহে।

এই ঘোষণা অক্ষয়কুমার দত্তের বক্তৃতার মধ্য দিয়া করা হয় বটে, কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের অনুমতিক্রমেই ইহা করা হইয়াছিল। অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতির ইচ্ছা ছিল যে এই ঘোষণা আরও বহু পূর্ব্বে করা হয়, এবং তাঁহারা এ বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথের এই ধীর গতিতে অতিশয় বিরক্ত হইতেছিলেন।

(আগামীবারে সমাপ্য)

শ্রবণ।

এই যে ধর্ম্মমণ্ডলীর মধ্যে আমরা বাস করিতেছি, আজ সেই মণ্ডলীর জন্মদিনে চিন্তা করি, ইহা দ্বারা আমাদের ধর্ম্মজীবন কি ভাবে ও কি রূপে পরিপুষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে। বড় বড় সাধনের কথা জানি না; যাঁহারা ধর্ম্ম সাধনে কিছু অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারাই তাহা বলিতে পারেন। ছোট খাট কথা যাহা জানি, তাহাই বলিতেছি। ব্রহ্মের মাহাত্ম্য ও চরিতকথা শ্রবণের কি যে কল্যাণদায়িনী শক্তি, তাহা আজ অনুভব করিবার দিন। যখন উপাসনার কথা কিছুই বুঝিতাম না, তখন এই মণ্ডলীর মধ্যে যে-সকল কথা শুনিয়াছিলাম, সেই বাল্য কালের শ্রুত কথা হইতে এখন কত যে কল্যাণ জীবনে সাধিত হইতেছে, আজ তাহা চিন্তা করি। কেবল যাঁহারা সাধু, ভক্ত, জীবনে ধর্ম্মসাধনে অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহাদের কথাদ্বারা নয়, যাঁহারা ও পথের পথিক নন তাঁহাদের কথাদ্বারাও, কত যে উপকৃত হইয়াছি তাহ বলিতে পারি না। অসাধু ব্যক্তির মুখেও ভগবানের নাম শ্রব করিলে, অশেষ উপকার ও কল্যাণ সাধিত হয়। যখন অনেককে এমন কথা বলিতে শুনি যে, যাঁহারা বেদীতে বসেন। তাঁহাদে প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধা নাই, এ জন্য তাঁহারা মন্দিরে আসেন না তখন অত্যন্ত ব্যথিত হই। তাঁহারা তো এখানে উপস্থিত নাই যদি তাঁহাদিগকে নিকটে পাইতাম, তাহা হইলে বলিতাম, "ভাই যাঁহারই মুখে ব্রহ্মের নাম শ্রবণ কর না কেন, তাহার দ্বারা তোমার কল্যাণ হবে।" অন্যের কথা জানি না, নিজের জীবনের কথা বলিতে পারি; বাল্যকালে ব্রাহ্মসমাজের উপাসক মণ্ডলীর মধ্যে গিয়া বসিতাম, তখন যে-সকল কথা শুনিতাম তাহ কিছুই বুঝিতাম না; এখন তাহা স্মরণ করিয়া নিরাশার আঁধারে আশার আলোক পাই। "অখিলতারণ ব'লে ডাক তাঁরে," "অে দেখা'য়ে দেন স্বর্গের পথ"—বহুকাল পূর্ব্বে শ্রুত এই সকল বাক মন্ত্রের মত উচ্চারণ করিয়া ঘোর অবসাদের সময় বল পাই— যখন মনে হয় পথ দেখিতে পাইতেছি না, তখন গন্তব্য পথের সন্ধান পাই।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মাবধি আচার্য্য ও গায়কগণের মুখে ব্রহ্মকৃপার কথা যাহা শুনিয়াছি, তাহা এই দুর্ব্বল প্রাণে বল ও আশা আনিয়া দিতেছে। ইহা স্মরণ করিয়া আজ ব্রহ্মচরণে কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিবার দিন। যে-ই তাঁহার নাম করুক না কেন—ভিখারী অর্থোপার্জ্জনের জন্য পথে পথে তাঁহার নাম গান করিয়া বেড়ায়, তাহাও যদি তুমি ভক্তির সহিত, বিশ্বাসের সহিত, শ্রবণ কর—তোমার অশেষ কল্যাণ হবে।

নানাগ্রন্থে ব্রহ্মচরিত সম্বন্ধে যাহা পড়িয়াছি, তাহাতে আমাদের ধর্ম্মজীবন পরিপুষ্ট হইয়াছে—

The spirit of the worm beneath the sod
In love and worship blends itself with God.

যিনি ভক্তি ও উপাসনার মাহাত্ম্য এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি তাঁহার জীবনের দ্বারা ব্রহ্মকে গৌরবান্বিত করিতে পারেন নাই; তবুও জগৎ তাঁহার এই অমূল্য উপদেশের জন্য তাঁহার নিকট চির ঋণী। ঋষিকল্প রাজনারায়ণকে অতি ভক্তিভাবে এই কথাগুলি উচ্চারণ করিতে শুনিয়াছি। "মাটীর নীচের কীটও প্রেমে ভক্তিতে ব্রহ্মের সঙ্গে মিলিত হয়।" ইহা অপেক্ষা আর আমাদের পক্ষে অধিক আশার কথা কি আছে? ব্রহ্মের কৃপাতে কাহার মুখ দিয়া কখন কি মহাবাক্য উচ্চারিত হয় বলা যায় না। যিনি এই রূপে ভক্তির শক্তি ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তিনিই ব্রহ্মকে O Thou awful Loveliness বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। যিনি ব্রহ্মরূপের আভাস পান নাই, তিনি কখনও "awful Loveliness" কথাটীর অর্থ বুঝিবেন না। যাঁহার নিকটে ব্রহ্ম প্রকাশিত হইয়াছেন, তিনিই জানেন তাঁহাতে গাম্ভীর্য্য ও মাধুর্য্যের কিরূপ অপূর্ব্ব সমাবেশ। এই মন্ত্র আমাদের সাধনের বিষয়। যিনি এই বাক্য উচ্চারণ করিয়াছেন তাঁহার জীবন যেমনই হউক, তিনি ভক্তিরসাস্বাদন করিয়াছেন, সন্দেহ নাই।

"Pray in the darkness if there be no light. ইহার চেয়ে সাধননিষ্ঠার সম্বন্ধে সার উপদেশ আর কি হইতে পারে?

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ৪৯ চত্বারিংশৎ জন্মোৎসব উপলক্ষে ২রা জ্যৈষ্ঠ সায়ংকালীন উপাসনায় শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম।

এই কথাগুলি যখন স্মরণ করি, তখন উপদেষ্টার জীবন কি রূপ ছিল, তাহা আলোচনা করিবার প্রবৃত্তি আমাদের থাকে না।

এই তো কিছু দিন পূর্ব্বে আমাদের প্রিয় মাঘোৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। কি উৎসব করিলাম, যদি উৎসবের মধ্যে উচ্চারিত সকল বাণী এখনই বিস্মৃত হইয়া থাকি? দুই একটী কথা আমার স্মরণ হইতেছে—"**তিনি সবার কলঙ্ক-ভঞ্জন**" "**একমাত্র তোমারই শরণাপন্ন হইলাম, আর কাহারও দ্বারে যাইব না**" যদিও এগুলি অতি পুরাতন কথা, তথাপি এ সকল কথা যতবার শুনি ততই আমাদের মঙ্গল। পরমপুরুষ যে নিজে প্রতি নিয়তই বলিতেছেন—"**মামেকং শরণং ব্রজ**"। প্রতি পদে পদে তিনি দেখাইতেছেন যে, তিনি ব্যতীত আর কেউ আমাদিগকে ক্ষমা করিতে পারে না; তাঁর শরণাপন্ন হইলেই তিনি সর্ব্ব প্রকারে আমাদিগকে রক্ষা করেন। তিনি যে শরণাগতবৎসল। তিনি ছাড়া আর কাহার কাছেই বা যাইব।

আমি যে বৎসর M. A. পরীক্ষা দিলাম, পরীক্ষার কয়েক দিন পূর্ব্বে মাঘোৎসব সম্পন্ন হইতেছিল। বাড়ী হইতে এই মনে করিয়া আসিলাম যে মন্দিরে বেশী ক্ষণ থাকিব না, উদ্বোধনের পরেই চলিয়া আসিব ও বাড়ীতে আসিয়া পড়াশুনা করিব। উপাসনায় যোগ দিয়া উঠিয়া আসিবার শক্তি চলিয়া গেল, পড়াশুনার ভাবনা দূরে গেল, বসিয়া গেলাম তাঁহার পূজায়। এইরূপে মণ্ডলীর সঙ্গে যুক্ত হইয়া, কত দিন আনন্দে বিভোর হইয়া, তাঁহার পূজার রসাস্বাদন করিয়াছি বলিতে পারি না। অনেক সময় অনুভব করিয়াছি যে-দিন ব্রহ্মকৃপায় আমাদের সকল জ্বালা দূরে যাইবে, এখানে আসিলে সেই দিনের পূর্ব্বাভাস পাওয়া যায়, সামাজিক উপাসনা অশেষ কল্যাণের উৎস। অনেক বিশ্বাসী ব্যক্তির সহিত একত্র হইয়া পরম পুরুষের পূজা করিবার অধিকার লাভ করিয়াছি, এ আমাদের ন্যায় দীন জনের প্রতি ব্রহ্মের অপার করুণা।

আমরা সকল দেশের সাধুগণের নিকট ব্রহ্মচরিতমাহাত্ম্য শ্রবণের উপদেশ শুনিয়াছি। নারদ যখন বালক ছিলেন, তখন তিনি ঋষির আশ্রমে বাস করিতেন, প্রতিদিন ঋষিদিগের মুখে ব্রহ্মচরিতকথা শ্রবণ করিতেন; তাঁহার অন্তরে ভক্তি ভাবের উদয় হইল। সেন্টপল Romans দিগকে লিখিলেন, "I long to see you that I may be comforted together with you by the mutual faith that is in you and me. রোমবাসী খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে সেন্ট পলের তুল্য বিশ্বাসী কে ছিল? তবুও তিনি সমবিশ্বাসীদের সঙ্গলাভ করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে ভাব ও চিন্তার বিনিময়ের জন্য, তাঁহাদের মুখে প্রেম ও ভক্তির কথা শুনিবার জন্য, ব্যাকুল হইলেন! তিনি রোমে যাইবার জন্য যেরূপ ব্যাকুল, তাহাতে আমরা বেশ বুঝিতে পারি, যাঁহাদের অন্তরে প্রকৃত ব্যাকুলতা আসিয়াছে, সাধকমণ্ডলীর সহিত মিলিত হইবার জন্য তাঁহাদের কি রূপ আগ্রহ হয়। তাঁহারা ধর্ম্মপথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াও, যাঁহারা তাঁহাদের শিষ্যস্থানীয় তাঁহাদের সঙ্গলাভের জন্য ব্যস্ত হন। ব্যাকুল প্রাণে অহংকারের স্থান থাকে না। যিনি পরমপুরুষের অভয়পদের ভিখারী, তিনি ভুলিয়া যান তিনি কত আধ্যাত্মিক সম্পদ্ লাভ করিয়াছেন, তিনি নিয়ত খুঁজিয়া বেড়ান কাহার কাছে গেলে প্রাণ যাহা চায় তাহার সন্ধান পাইবেন। আমরা সঙ্গীতে শুনি "এ নাম আমরা বলি তোমরা শোন, তোমরা বল আমরা শুনি।" এ ভাবুকতার কথা নয়। এ ধর্ম্মসাধনের একটি অঙ্গ। গীতার বাক্য—"মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্ কথয়ন্তশ্চ, মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ—সাধকগণের অভিজ্ঞতাপ্রসূত।

আমরা ব্রহ্মকৃপার কতটুকু পরিচয় পাইয়াছি তাহা বারম্বার বলিয়া ও শুনিয়া উপকৃত হই। আমি যাহা জানি তাহা অপরের মুখে শুনিলে, আমার বিশ্বাস পরিপুষ্ট হয়। মণ্ডলীর সঙ্গে একপ্রাণ হইয়া পরস্পরের সহায়তা লাভ করিতে হইবে। নিজের মধ্যে যাহা আছে তাহা অপরকে দিতে হইবে, অপরের নিকট যাহা পাইতে পারি তাহা আদর করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। যাঁহারা এই বেদীতে বসিয়া ব্রহ্মকৃপার সাক্ষ্য দিতেছেন, যে গায়কগণ এই মণ্ডলীকে তাঁহার নাম শ্রবণ করাইতেছেন, যে নীরব উপাসকগণের মুখশ্রী ভক্তিরসে সিক্ত, তাঁহাদের সকলেরই দ্বারা ব্রহ্মমাহাত্ম্য প্রচারিত হইতেছে। এই ভাবে এই মণ্ডলীর সঙ্গে যুক্ত হইয়া, প্রতিনিয়তই কল্যাণের পথে আমরা অগ্রসর হইতেছি। তাই বলিতেছি, এই মণ্ডলীর মাহাত্ম্য আজ সর্ব্বান্তঃকরণে স্মরণ করি ও পরমেশ্বরের চরণে অন্তরের কৃতজ্ঞতা অর্পণ করি।

কিন্তু অপর দিকে আমাদের অনেক আক্ষেপের ও ক্ষোভের কারণ আছে। আমাদের কত ভাই, কত ভগ্নী, দূরে রহিয়াছেন! কত যুবক, কত প্রবীণ ব্যক্তিও সমাজের প্রতি শ্রদ্ধা হারাইয়া সমাজ হইতে দূরে পড়িয়া আছেন! সমাজের সঙ্গে যোগ রাখিবার আবশ্যকতা তাঁহারা বুঝিতে পারিতেছেন না। কতজনকে চেষ্টা করিয়াও আমাদের সঙ্গে আনিতে পারিতেছি না। গীতায় অমূল্য উপদেশ সেই 'বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্' কথার অর্থ তাঁহারা বুঝিতেছেন না। এ বিষয়ে আমাদের কাহার কি কর্ত্তব্য আছে ভাবিয়া দেখা উচিত। যিনি যাঁহার কাছে যাইতে পারেন তাঁহার নিকটে যাউন, যাইয়া তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিন পরস্পরকে স্নেহ করিলে তাহাতে কত আরাম, কত শান্তি—স্বার্থপরতা অপেক্ষা অপরের দুঃখ বুক পাতিয়া লওয়াতে কত আরাম, কত শান্তি। যদি দেশের দুঃখের কথা না ভাবি, প্রাণে যদি দেশের দুঃখে আঘাত না লাগে, তাহা হইলে আর patriotism কিসে? চারি দিকে যদি চাহিয়া দেখি কি দেখিতে পাই? এ যে জীবন নরকের মধ্যে বাস করিতেছি। মানুষ সব ব্যাঘ্র ভল্লুকের ন্যায় রক্তপিপাসু হইয়া চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এই অন্ধকারের মধ্যে পড়িয়া, এই নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে, সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া ব্রহ্মের নিকট প্রার্থনা করি, তাঁহাকে ডাকি। কেবল তাঁহারই কৃপায় এই নরক স্বর্গে পরিণত হইতে পারে। অন্ধকারের মধ্যে পড়িয়াই তাঁহাকে ডাক। তুমি আমি সকলেই ব্রহ্মের সন্তান। আমরা এই ভাবে তাঁর কার্য্যের সহায়তা করি। কত জন ব্যথিত, কত জন শোকার্ত্ত হইয়া রহিয়াছেন, সকলের জন্য প্রার্থনা করিতে হইবে। এই ভাবেই পিতার কার্য্যের সহায়তা করিতে হইবে, আমাদিগকে ব্যাকুল প্রার্থনাদ্বারা পরমপুরুষের সহকারী হইতে হইবে।

এক দিন বন্ধুদের সহিত মিলিত হইয়া ঢাকাতে নৌকায় বেড়াইতেছিলাম,—যেই নৌকার মুখ ফিরিল অমনি সুস্নিগ্ধ বায়ুহিল্লোলে আমাদের শরীর যেন শীতল হইল। নৌকার মুখ ফিরিবার পূর্ব্বে এই শান্তি এক বিন্দুও সম্ভোগ করিতে পারি নাই। এই যে ব্রাহ্মসমাজ, এখানে প্রতি নিয়তই সত্য, প্রেম, ন্যায় পবিত্রতার নির্ম্মল বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। হায়! হায়! আমরা অন্য দিকে চলিয়া যাইতেছি, তাই তাহা উপভোগ করিতে পারিতেছি না। আজ সকলে মিলিয়া ভগবচ্চরণে প্রার্থনা করি, যেন আমাদের সকলের মুখ সেই দিকে ফিরিয়া যায়।

অগষ্টিনের মাতা মনিকাদেবী চল্লিশ বৎসর তাঁহার পুত্রের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। George Muller ষাট বৎসর এক ব্যক্তির কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার এক আত্মীয় Mullerএর জীবনচরিত-লেখককে বলিলেন, তিনি যাঁহার জন্য প্রার্থনা করিয়া গিয়াছেন তাঁহার জীবনে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে," তিনি নবজীবন লাভ করিয়াছেন। প্রার্থনা, প্রকৃত প্রাণের প্রার্থনা, কখনও বৃথা হয় না। তিনি যে নিয়তই সঙ্গে সঙ্গে আছেন, আমাদের হৃদয় দেখিতেছেন। আমরা তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করি, আমাদের মুখ তাঁহার দিকে ফিরিবেই ফিরিবে।

ব্রাহ্মসমাজ

দীক্ষা—বিগত ২৩সে মে প্রাতঃকালে ডিগবয় প্রবাসী শ্রীযুক্ত হরেশ্বর বড়পূজারী ও তাহার পত্নী শ্রীমতি ধর্ম্মেশ্বরী বড়পূজারী ডিব্রুগড় নগরে পরলোকগত লক্ষীনাথ দাসের গৃহে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী আচার্য্যের কার্য্য করেন ও শ্রীমান পবিত্রকুমার দাস দীক্ষার্থিগণকে আচার্য্যের নিকট উপস্থিত করেন। ডিব্রুগড়ের ব্রাহ্ম ও সহানুভূতিকারী কতিপয় নরনারী এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এই উপলক্ষে দীক্ষার্থিগণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার ফণ্ডে ৫৲ দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। হরেশ্বর বাবু ব্রাহ্মসমাজের সহিত বহুদিন হইতে সংশ্লিষ্ট আছেন এবং ইতিপূর্ব্বে দুইটি পারিবারিক অনুষ্ঠান ব্রাহ্মধর্ম্ম অনুসারে সম্পন্ন করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, গত ১৮ই মার্চ্চ ডিগবয়নগরে শ্রীযুক্ত হরেশ্বরের গৃহে একটি প্রার্থনাসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়; তথায় প্রতি রবিবারে প্রার্থনা, ব্রহ্মসঙ্গীত, ব্রাহ্মধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থপাঠ ও আলোচনা হইয়া থাকে। করুণাময় পিতা নব দীক্ষিতদিগকে তাঁর পবিত্র ধর্ম্মের পথে অগ্রসর করুন।

ছাত্রীদের কৃতিত্ব—আমরা দেখিয়া আনন্দিত হইলাম যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত আই এস্ সি ও আই এ পরীক্ষায় নিম্নলিখিত ছাত্রীগণ উত্তীর্ণ হইয়াছেন :—

আই এস্ সি—১ম বিভাগ—তিলোত্তমা দাস, সুপ্রভা ঘোষ, সুষমা রুদ্র। ২য় বিভাগ—সাধনা বসু, সুমনা মিত্র। সুহাসিনী দেবী পদার্থ বিদ্যায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

আই এ—১ম বিভাগে—লীলা রায় (২য় স্থান অধিকার করিয়া) শান্তিসুধা ঘোষ (তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া) সান্ত্বনা বসাক (১৩শ স্থান), সুষমা মিত্র, লিলি সেন, ক্যাথলীন নাহাপীট, ভায়োলেট রাওক্লিফ, কল্যাণী দাস, ডিনা কুকা, নীতা মুখোপাধ্যায়, সুধা ঘোষ, এলিস্ ডাকওয়ার্থ, শোভনা চৌধুরী, হেজেল জেব, এনিদ্ ডি লা ফো, অমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিকা দত্ত, নীহারনলিনী দত্ত, গ্ল্যাডিস ওয়েষ্ট, মার্সি এমেলিয়া আইরিন দাস, ইন্দিরা গুপ্ত, জনিয়াব রহিম, বকুলা দেশপাণ্ডে, ভায়োলেট নিরুপমা রায়, মনোরমা গুহ। ২য় বিভাগে—এগ্নিস্ গৌড়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, রত্নাবলী বেজবড়ুয়া, বিনীতা বিশ্বাস, রমোলা বিশ্বাস, দীপ্তি চট্টোপাধ্যায়, অরুণা দাস, ভবেনবালা দাস, কমলা দাসগুপ্ত, সরস্বতী দাসগুপ্ত, সুপ্রভা দত্ত, নলিনী দেবী, ধর্ম্মশীলা জয়সাল, বীণা গুপ্ত, জয়ন্তী গুপ্ত, বেল হাড্‌সন্, ইন্দিরা বাই খোদকার, এলি জোফেদ, কুসুমকুমারী শোকী, নয় লাহা, মনোরমা মল্লিক, পি কামেশ্বরাম্মা, হেমলতা রায়, ষ্টেলা দিনকর, উইনিফ্রেড্ ব্রাউলেও। তৃতীয় বিভাগ—নীলনলিনী বিশ্বাস, পুষ্পলতা বিশ্বাস, গয়ামতী ভাণ্ডারী, কে মীনাক্ষী আম্মব, ঊমালিকা সরকার, কণিকাবর্ণা সেন, সুলেখা সেন।

ইহার মধ্যে শ্রীযুক্ত প্রমোদারঞ্জন রায়ের কন্যা লীলার কৃতিত্বে আমরা বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি—লীলা ইংরাজী সাহিত্য, ন্যায়শাস্ত্র, অঙ্ক ও উদ্ভিদ্ বিদ্যায় শতকরা ৮০ নম্বরের বেশী পাইয়া দ্বিতীয় হইয়াছেন।

বাণীবন ব্রাহ্মসমাজ—নিম্নলিখিতরূপে বাণীবন ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে :—

১লা, ২রা, ৩রা, ৪ঠা, ৫ই, ৬ই জ্যৈষ্ঠ সন্ধ্যায় পাঠ, কীর্ত্তন ও প্রার্থনা। ৭ই জ্যৈষ্ঠ সন্ধ্যায় উৎসবের উদ্বোধন—আচার্য্য পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ। ৮ই জ্যৈষ্ঠ প্রাতে উপাসনা, আচার্য্য পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ; সন্ধ্যায় সংকীর্ত্তনে উপাসনা। ৯ই সমস্তদিনব্যাপী উৎসব—প্রাতে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত হেরম্ব-চন্দ্র মৈত্রেয়; অপরাহ্নে আলোচনা; সন্ধ্যায় উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১০ই জ্যৈষ্ঠ প্রাতে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায়; অপরাহ্নে বার্ষিক সভা, ও বালক বালিকা সম্মিলন; সন্ধ্যায় উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত এককড়ি সিংহ রায়।

টাঙ্গাইল ব্রাহ্মসমাজ—নিম্নলিখিত প্রণালীতে টাঙ্গাইল ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চত্রিংশ বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে :—

২১শে জ্যৈষ্ঠ সন্ধ্যায় উদ্বোধনসূচক উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায়। ২২শে জ্যৈষ্ঠ প্রাতে ঊষাকীর্ত্তন ও উপাসনা, আচার্য্য শ্রীমতী হেমলতা ভট্টাচার্য্য; অপরাহ্নে পাঠ ও ব্যাখ্যা; সন্ধ্যায় উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায়। এই দিন মন্দির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। ২৩শে জ্যৈষ্ঠ প্রাতে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য; অপরাহ্নে আলোচনা, শ্রীযুক্ত বরদা-প্রসন্ন রায় আলোচনা আরম্ভ করেন; সন্ধ্যায় উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত মহেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী। ২৪শে জ্যৈষ্ঠ প্রাতে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায়; অপরাহ্নে বালকবালিকা সম্মিলন শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় ও শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী উপদেশ ছলে কয়েকটী গল্প বলেন এবং ছেলে মেয়েরা সমবেত হইয়া ২।৩টী সঙ্গীত করিলে সামান্য জল-যোগান্তে উৎসব শেষ হয়। সন্ধ্যায় রমেশচন্দ্র হলে "সামাজিক সমস্যা" বিষয়ে বক্তৃতা, বক্তা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র। ২৫শে জ্যৈষ্ঠ প্রাতে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুত কৃষ্ণকুমার মিত্র; সন্ধ্যায় রমেশচন্দ্র হলে "ধর্ম্ম জগতে যুগের প্রভাব" বিষয়ে বক্তৃতা, বক্তা শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। এই দিন প্রীতি ভোজন হয়। শ্রীমতী কুমুদিনী বসু ও শ্রীমতী বাসন্তী চক্রবর্ত্তী উপাসনা এবং বক্তৃতাতে আংশিক ভাবে সঙ্গীত করিয়াছেন। প্রেমময় পরমেশ্বরের কৃপাতে এবারকার উৎসব সুচারু রূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

কালীকচ্ছ ব্রাহ্মসমাজ—কালীকচ্ছ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসব নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে :—

১৫ই জ্যৈষ্ঠ প্রাতে উপাসনা, আচার্য্য বাবু রজনীনাথ নন্দী, অপরাহ্নে রায় বাহাদুর সুরেশচন্দ্র সিংহ বক্তৃতা করেন; সন্ধ্যায় কীর্ত্তন ও উপাসনা, আচার্য্য বাবু রজনীনাথ নন্দী। ১৬ই জ্যৈষ্ঠ প্রাতে ঊষাকীর্ত্তন ও উপাসনা, আচার্য্য বাবু সুরেশচন্দ্র সিংহ; সন্ধ্যায় উপাসনা ও কীর্ত্তন, আচার্য্য বাবু রজনীনাথ নন্দী। ১৭ই জ্যৈষ্ঠ প্রাতে উপাসনা, আচার্য্য বাবু সুরেশচন্দ্র সিংহ; অপরাহ্নে মহিলা-উৎসব, আচার্য্য বাবু রজনীনাথ নন্দী; অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র নন্দীর পারিবারিক ব্রহ্মমন্দির হইতে নগর সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া গ্রামের অনেক স্থানে কীর্ত্তন করিয়া ব্রহ্মমন্দিরে সমবেত হইলে অনেক ক্ষণ কীর্ত্তনের পর বাবু প্রকাশ চন্দ্র সিংহ ভক্তি সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সন্ধ্যায় উপাসনা, আচার্য্য বাবু রজনীনাথ নন্দী।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় দ্বারা ১৭ই আষাঢ় মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রীবরদাকান্ত বসু বি,এ

Registered 560N

অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৬ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৪৯ম ভাগ। ৭ম সংখ্যা। | ১লা শ্রাবণ, শনিবার, ১৩৩৩, ১৮৪৮ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯৭ 17th July, 1926. | প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০ অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

ব্যাকুলতা

কবে সে বনের তরে
তৃষিত পরাণ মোর,
ছুটিবে আবেগ ভরে
ভাবেতে হইয়া ভোর!
শম দম সাথী ল'য়ে
হবো পথে অগ্রসর,
সমস্ত ঝঞ্ঝাট স'য়ে
দলিয়ে রিপুনিকর।
একান্তে আকুল প্রাণে
ডাকি আজ প্রাণেশ্বরে,
এ দাসে অভয় দানে
নিয়ে চল হাতে ধ'রে।
আশা ক'রে এসেছি হে,
ও-চরণ পাবো ব'লে,
পথশ্রান্ত ক্লান্ত দেহে
ধুয়ে দেও শান্তি-জলে।
পূর্ণ কর মনোবাঞ্ছা
ও হে বাঞ্ছা-কল্পতরু
তব পদে করি যাচ্ঞা
দেখা দেও দীক্ষা-গুরু।

শ্রী চন্দ্রনাথ দাস

হে জীবনবিধাতা, আমাদের শিক্ষা ও বিকাশের জন্য আমাদিগকে এই সংসারে পাঠাইলেও, তুমি ইহাকে আমাদের চিরবাসস্থান করিয়া দেও নাই—তোমার জ্ঞান প্রেম পুণ্যের অনন্ত জীবন দিয়াই আমাদিগকে গড়িয়াছ, তাহার জন্যই আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছ। এ সংসারের পক্ষে প্রয়োজনীয় দেহাদি আমাদিগকে দিয়াছ বটে, কিন্তু তাহাকে চিরস্থায়ী কর নাই, সাময়িক উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী করিয়াই গড়িয়াছ। অপর দিকে, অমর জীবনের জন্য জ্ঞান প্রেমাদি অনন্তকাল-স্থায়ী মহৎ গুণাবলীর মধ্যেই আমাদের প্রকৃত ব্যক্তিত্ব নিহিত করিয়াছ। পরিতাপের বিষয়, মোহ ও অজ্ঞতা বশতঃ আমরা যাহা অসার ও ক্ষণস্থায়ী, তাহা লইয়াই অধিকাংশ সময় ব্যস্ত থাকি, আর যাহা সার ও চিরস্থায়ী তাহার কথাই ভুলিয়া যাই! তাই আমরা এই দেহের জন্য যত চেষ্টা যত্ন আয়োজনাদি করি, অমর আত্মার জন্য তাহার শতাংশের একাংশও করি না—অনেক স্থলে কিছুই করি না। ইহার ফল আমাদের গৃহ পরিবারে জীবনে স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াও আমাদের চৈতন্যোদয় হইতেছে না—আমরা দিন দিন গভীর হইতে গভীরতর মৃত্যুর দিকেই ধাবিত হইতেছি। হে করুণাময় পিতা, তুমি কৃপা করিয়া এই মোহ ভাঙ্গিয়া না দিলে যে আর অন্য উপায় নাই! সামান্য দুঃখ বেদনা সংঘাতে আমাদের মোহ ভাঙ্গিতেছে না। তুমিই জান আমাদের জন্য কি রূপ বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন। তুমি সেরূপ ব্যবস্থাই কর। তোমার পবিত্র ধর্ম্মের আশ্রয়ে থাকিয়াও যদি আমরা ক্ষুদ্র নীচ বিষয়েই ব্যস্ত থাকি, তবে তাহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? তুমি আমাদিগকে তোমার পবিত্র ধর্ম্মের উপযুক্ত কর। আমাদের দ্বারা যেন আর তোমার ধর্ম্মের অগৌরব না হয়। তুমিই আমাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও চালক হও। তোমার পবিত্র ইচ্ছাই আমাদের জীবনে ও সমাজে জয়যুক্ত হউক। তোমার ইচ্ছাই সর্ব্বোপরি পূর্ণ হউক।

নিবেদন।

আর যে পারি না—আমি যতই ছাড়াতে যাই, ততই জড়িয়ে পড়ি। এ যে জড়ান স্থতো—খুলতে চাই, খোলে না; আরও বেশী জড়িয়ে যায়। আমি শত চেষ্টা ক'রে বন্ধন খুলতে চাই, আর দশটা বন্ধন এসে আমাকে বেঁধে ফেলে! আমি প্রাণ পণ ক'রে বোঝা নামাতে চাই, কোথা থেকে শত বোঝা এসে ঘাড়ে চাপে! আমি সমস্ত দায়িত্ব এড়িয়ে দূরে থাকতে চাই, অলক্ষিতে অনিচ্ছাতে শত দায়িত্ব এসে চেপে ধরে! ওগো সর্ব্বদুঃখহারী, সর্ব্ব বন্ধন দূর করো। আমার এ বন্ধন কি টুটবে না? এ বোঝা কি ঘাড় থেকে নামবে না? এ জড়ান স্থতোর গিড়ে কি খুলবে না? আমাকে যে পিষে মেরে ফেলল! এক বার তুমি এস তবু ঠাকুর! তুমি এ স্থতোর জড়ান খুলে দাও, তুমি এসে বন্ধন টুটিয়ে দাও; তুমি এসে বোঝা নামিয়ে দাও। আমি ভক্ত রামপ্রসাদের মতন বলি, "ব্রহ্মময়ী, বোঝা নামাও, ক্ষণিক জিরুই"; নইলে আর যে বইতে পারি না, আর যে সইতে পারি না।

ইচ্ছা ত আছে, পারি না যে—আমার ইচ্ছা ত হয়, দিন রাত তাঁরই প্রেমের কথা বলি, তাঁরই গুণ গাই; কিন্তু আলস্য জড়তা এসে বাধা দেয় যে, শত ভাবনা এসে মনকে কোথায় নিয়ে যায় যে! আমার ইচ্ছা ত হয়, সকলকে প্রেম বিলিয়ে যাই, সকলের সেবা করি, দশের জন্য দেশের জন্য আত্মবিসর্জ্জন করি; কিন্তু সুখলালসা আরামস্পৃহা, স্বার্থচিন্তা এসে যে আমাকে অন্য পথে নিয়ে যায়! আমার ইচ্ছা ত হয়, তাঁর চরণে জীবনের ভার অর্পণ ক'রে নিশ্চিন্ত হই, নিরুদ্বেগ হই; কিন্তু যখনই সংগ্রাম আসে, পরীক্ষা আসে, তখনই যে তাঁকে ঠেলে ফেলে দিয়ে আপনি কর্ত্তা হ'য়ে বসি, কর্ণধারকে দূর ক'রে দিয়ে নিজেই হাল ধরতে চাই। ইচ্ছা ত হয়, কাহাকেও বিদ্বেষ করবো না, দুঃখ দিব না, সকলকেই ভালবেসে যাব; কিন্তু সময়কালে তা পারি না যে! আমার ইচ্ছা ত হয়, প্রভুর নামে সব দুঃখ বহন করবো, সকল ত্যাগ ক'রে তাঁর আদেশ পালন করবো; কিন্তু সময়কালে মন যে ফিরে যায়! তাই বলি, ও আমার জীবনস্বামী, তুমি এসে জোর ক'রে আমাকে তোমার ক'রে লও; তবেই আমার সকল দুর্ব্বলতা দূর হবে, সকল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে।

অসীম দয়া—তুমি দয়া দিয়েই আমাকে গড়েছ, দয়াতেই রক্ষা কচ্ছো, দয়ার দিকেই টানছো। জীবনের কাহিনী যখন ভাবি, তোমার করুণার লীলা দেখে মুগ্ধ হ'য়ে যাই। জীবনে সুখ পেয়েছি, দুঃখ বেদনাও পেয়েছি; কত বিপদ-জাল এসে জড়িয়েছে; কত পাপ প্রলোভন চারিদিক ঘিরেছে; কত অসহ্য ক্লেশ ভোগ করেছি; কত শোক তাপ, কত বিরহ বেদনা, কত প্রিয় জনের উপেক্ষা, নির্ম্মম ব্যবহার! কত আপনার জন বিগড়িয়ে গিয়েছে—কোথায় তারা যে চ'লে গিয়েছে! এ সব দুঃখ বেদনা ত এড়ান যায় না। আবার কত সুখ সম্পদ, কত মিলনের আনন্দ! কিন্তু সুখই হউক, আর দুঃখই হউক, মিলনই হউক আর বিচ্ছেদই হউক, প্রিয় সম্ভাষণই হউক আর নির্ম্মম ব্যবহারই হউক, তার ভিতরে দেখি তুমি রয়েছ, তোমার করুণার লীলা চলছে, তোমার প্রেম-বাহুর আবেষ্টনে আমি রয়েছি; তোমার স্নেহ-দৃষ্টি আমার উপর রয়েছে। এত প্রেম, এত দয়া আর কার? তাই ভেবে আমি আনন্দ-রসে ডুবে যাই।

সম্পাদকীয়

আত্যন্তিক দেহ-প্রীতি—আমাদের এ সংসারের জীবনের পক্ষে দেহ যে অপরিহার্য্যরূপেই প্রয়োজনীয়, তাহা ব্যতীত যে আমরা এক মুহূর্ত্তের জন্যও সামান্য কোনও কাজ পর্য্যন্ত সম্পাদন করিতে পারি না, জ্ঞান প্রেম পুণ্যাদির অর্জ্জন প্রভৃতি মানসিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাপারও যে উহারই সাহায্যে সম্পন্ন করিতে হয়, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই—সে কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। দেহের সঙ্গে আমরা এমন অচ্ছেদ্য ভাবে যুক্ত যে, উহার অতিরিক্ত, উহা হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, একটা জীবনের অস্তিত্ব কল্পনা করাও অনেক সময় কঠিনই মনে হয়,—সে সম্বন্ধে গভীর সন্দেহই উপস্থিত হয়। যদিও প্রকৃত পক্ষে আমরা দেহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, দেহের উপর আমাদের প্রকৃত জীবন কিছু মাত্র নির্ভর করে না, উহা আমাদের কার্য্যসাধনের যন্ত্র ব্যতীত আর কিছুই নহে; তথাপি উহা এরূপ যন্ত্র নহে যাহা কেবল বিশেষ বিশেষ সময়ে বা কার্য্যেই আবশ্যক হয়, যাহাকে ইচ্ছা করিলেই দূরে ফেলিয়া রাখা যায়। এরূপ অবস্থায় দেহের প্রতি যে আমাদের বিশেষ অনুরাগ ধাবিত হইবে, উহার রক্ষা ও পালন, স্বাস্থ্য ও সুখবর্দ্ধনের জন্য যে আমরা সতত যত্নশীল থাকিব, তাহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে—সম্পূর্ণ স্বাভাবিকই। দেহ সুস্থ ও সবল না হইলে যখন আমরা কোনও কাজই—এমন কি ধর্ম্মসাধনাদিও—সুন্দর রূপে সম্পন্ন করিতে পারি না, তখন ইহাকে কোনও প্রকারে দূষণীয়ও মনে করা যায় না, বরং অবশ্যপালনীয় কর্ত্তব্যের মধ্যেই গণ্য করিতে হয়। তাই বলা হইয়াছে, "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং।" আমরা বলিয়া থাকি শরীরের প্রতি সম্যক্ দৃষ্টি না রাখিলে, উহার প্রতি কর্ত্তব্য পালন না করিলে, উহাকে অগ্রাহ্য করিয়া চলিলে, কর্ত্তব্য-লঙ্ঘনজনিত পাপই হয়, আমরা ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুতই হই। শরীরের রক্ষা পালন ও উন্নতিসাধন যে ধর্ম্মসাধনের একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া, অপর সকল পরিত্যাগ করিয়া, একমাত্র উহাকেই লক্ষ্য স্থানে রাখিয়া চলিলে, মন ও আত্মার দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া শুধু এই কার্য্যেই নিযুক্ত থাকিলে যে ধর্ম্মহানি হয় না, আমরা

গুরুতর কর্ত্তব্যলঙ্ঘনজনিত পাপে লিপ্ত হই না, এরূপ কথা কিছুতেই বলা যায় না। এমন কি, মহত্তর কর্ত্তব্যপালনের জন্য যখন সময় বিশেষে লঘুতর কর্ত্তব্যকে লঙ্ঘন করিতে হয়, তখন নিশ্চয়ই এমন অবস্থা উপস্থিত হইতে পারে, যে সময় শুধু শারীরিক স্বাস্থ্য সুখ বিসর্জ্জন নয়, দেহত্যাগ পর্য্যন্ত অলঙ্ঘনীয় কর্ত্তব্য, ধর্ম্মরক্ষার অপরিহার্য্য অঙ্গস্বরূপ, প্রকৃত জীবন রক্ষার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়, বলিয়া গণ্য হইতে পারে। যে শরীর আমাদের জীবন পোষণ ও বর্দ্ধনের সহায়, তাহা যখন বিনাশের কারণ হইয়া দাঁড়ায়, তখন তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াই জীবন রক্ষা করিতে হইবে; কেননা, জীবনই লক্ষ্য, দেহ নহে—দেহ তৎসাধনের উপায় মাত্র। যাহা হউক, এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনায় আমরা এখন প্রবৃত্ত হইতেছি না। মোট কথা, দেহ যতই আবশ্যক হউক না কেন, উহার প্রয়োজনীয়তার একটা সীমা আছে; সুতরাং দেহ সম্বন্ধীয় চেষ্টা যত্ন অনুরাগেরও একটা নির্দ্দিষ্ট মর্য্যাদা আছে,—তাহার বাহিরে গেলেই উহা দূষণীয় ও অকল্যাণকর হইয়া উঠে। অথচ আমরা দেখিতে পাই, সংসারের অধিকাংশ লোকই সর্ব্বদা এই সীমাকে অতিক্রম করিয়া চলে,—একমাত্র দেহের জন্যই তাহাদের সমস্ত চেষ্টা যত্ন অনুরাগ নিয়োগ করে, আত্যন্তিক দেহ-প্রীতির দ্বারা চালিত হইয়াই সংসারের যাবতীয় কার্য্য সম্পাদন করে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে দেখা যাইবে, অনেকেই এই শারীরিক জীবনটাকেই সমগ্র জীবন মনে করে, ইহার অতিরিক্ত আর কিছু যে আছে, বা থাকিতে পারে, সে চিন্তাই তাহাদের মনে উদয় হয় না। ছান্দোগ্যোপনিষদের 'প্রজাপতি ও ইন্দ্র-বিরোচন সংবাদ' হয়ত অনেকেই পাঠ করিয়াছেন; তথাপি এই প্রসঙ্গে উহার একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা আবশ্যক বোধ করিতেছি। প্রজাপতি এক সময়ে বলিয়াছিলেন 'যে আত্মা পাপরহিত, জরা-রহিত, মৃত্যুরহিত, শোকরহিত, অশনেচ্ছারহিত, পিপাসারহিত, যিনি সত্যকাম ও সত্যসংকল্প, তাঁহাকেই অন্বেষণ করিতে হইবে, তাঁহাকেই বিশেষ করিয়া জানিতে হইবে। যিনি তাঁহাকে অনুসন্ধান করিয়া অবগত হন, তিনি সমুদয় লোক ও সমুদয় কামনা লাভ করেন।" দেব ও অসুরগণ উভয়েই লোকপরম্পরায় এই উপদেশের কথা শুনিয়াছিলেন। তাই দেবগণের পক্ষ হইতে ইন্দ্র ও অসুরগণের পক্ষ হইতে বিরোচন প্রজাপতির নিকট গমন করিয়া শিক্ষার্থীরূপে বহু বৎসর বাস করিলেন। প্রজাপতি তাঁহাদের উভয়কে একই উপদেশ প্রদান করিলেন বটে, কিন্তু প্রথমেই পরম তত্ত্ব প্রকাশ না করিয়া তাহাদের জ্ঞানের বিভিন্ন স্তর অনুসারে ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর শিক্ষা প্রদান করাই সমীচীন মনে করেন। একটি উপদেশ শ্রবণ করিয়াই সন্তুষ্টচিত্তে কিছু দূর গমন করিলে পর যখন তাহাদের মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়, উপদেশ অসম্পূর্ণ বলিয়া ধারণা হয়, তখন স্বভাবতঃই তাহাদিগকে ফিরিয়া আসিতে হয় এবং বহুবৎসর বাসের পর আবার তাহারা নূতন উপদেশ প্রাপ্ত হয়। তাহাদের মধ্যে বিরোচন অল্পেতেই সন্তুষ্ট হইয়া, শেষ তত্ত্ব লাভ না করিয়াই, ভ্রান্ত সংস্কার লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন, আর ইন্দ্র বহু বৎসরে পরম তত্ত্ব লাভ না করিয়া কিছুতেই সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। সে সকলের বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। বিরোচন যে ভ্রান্ত সংস্কার লইয়া সন্তুষ্টচিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন করেন, তাহার উল্লেখ করিলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। প্রজাপতি দ্বিতীয় উপদেশে তাহাদিগকে সুন্দর অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া, সুবসন পরিধান করিয়া পরিষ্কৃত হইয়া, জলপাত্রে দর্শন করিতে বলিলেন; তাঁহারা জলের মধ্যে আপনাদের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইলেন। তখন প্রজাপতি বলিলেন "ইনিই আত্মা, ইনিই অমৃত ও অভয়, ইনিই ব্রহ্ম।" "প্রজাপতির কথার প্রকৃত মর্ম্ম না বুঝিয়া, ইহার সাধারণ অর্থ গ্রহণ করিয়াই দুইজনে শান্তহৃদয়ে প্রতিগমন করিলেন। কিন্তু তাহাদিগকে যাইতে দেখিয়া প্রজাপতি মনে মনে বলিলেন—"ইহারা আত্মাকে উপলব্ধি না করিয়াই, আত্মাকে অবগত না হইয়াই চলিয়া গেল। ইহাদিগের মধ্যে যে ইহাকেই উপনিষৎ অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞান বলিয়া গ্রহণ করিবে—দেবতাই হউক বা অসুরই হউক—সে বিনাশপ্রাপ্ত হইবে।" উক্ত উপদেশ পাইয়া বিরোচন অসুরগণের নিকট চলিয়া গেলেন এবং তাহাদিগকে এই শিক্ষা দিলেন—"এই পৃথিবীতে দেহেরই পূজা করিবে ও দেহেরই পরিচর্য্যা করিবে; দেহকে মহীয়ান্ করিলে এবং দেহের পরিচর্য্যা করিলেই ইহলোক ও পরলোক এই উভয় লোকই লাভ করা যায়।" ইহাই অসুরগণের উপনিষদ্, ইহারই নাম আসুরী উপনিষদ্। ইন্দ্র অবশ্য এই শিক্ষায় সন্তুষ্ট না হইয়া অল্প পরেই প্রজাপতির নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাহার পরও, একবার নয়, বহুবার গমন ও প্রত্যাগমন অন্তে, অনেক ভ্রম কাটাইয়া, তাঁহাকে প্রকৃত শিক্ষা লাভ করিতে হয়। সে যাহা হউক, আজকাল বোধ হয় এরূপ অজ্ঞ ও স্থূলদর্শী লোক কেহ নাই, যাহারা এই দেহকেই আত্মা মনে করিবে, অথবা আপনাদিগকে এই আসুরী উপনিষদের অনুসরণকারী বলিয়া স্বীকার করিবে। "দেহের অতিরিক্ত আত্মা বলিয়া কিছু নাই" এই কথা কেহ বলিলেও বলিতে পারে, তথাপি "দেহই আত্মা" এরূপ বলিবে না। কিন্তু মতে ও মুখে যে যাহাই বলুক না কেন, কার্য্যতঃ যে কেহই ইহাকে অনুসরণ করে না, এরূপ কথা কিছুতেই বলা যায় না। বরং ইহাই সত্য যে, অনেকেই কার্য্যতঃ দেহেরই উপাসক, উক্ত আসুরী উপনিষদেরই সেবক ও পরিপোষক। এমন কি, যাহারা আত্মার কথা জানেন ও বলেন, উচ্চতর ব্রহ্মতত্ত্বের আলোচনা করেন, তাঁহাদের মধ্যে কখনও এরূপ লোক নাই, এ কথাও দৃঢ়তার সহিত বলা যায় না, বরং অনেক আছে বলিয়াই সহজে অনুমিত হয়। কেননা, একটু অনুসন্ধান করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে, অধিকাংশ লোকেরই সমস্ত চিন্তা ভাবনা, চেষ্টা যত্ন, দেহেতেই আবদ্ধ, দেহ ব্যতীত আত্মার কথা যে কিছু পরিমাণেও কার্য্য-কালে তাহাদের মনে থাকে, এরূপ কোন প্রমাণই তাহাদের চাল চলনে কার্য্যাদিতে পাওয়া যায় না। তাহারা যে শুধু দেহের রক্ষণ পোষণ ও উন্নতি সাধনেই নিযুক্ত, দেহের সম্বন্ধে আপনার কর্ত্তব্য পালনেই যত্নশীল থাকে, এরূপ নহে। তদ্ব্যতীত তাহারা অন্যায়রূপে দেহের অতিরিক্ত আরাম সুখ বিলাস সৌন্দর্য্য সাধনে ব্যস্ত হইয়া, শ্রেষ্ঠতর কর্ত্তব্য লঙ্ঘন ও অকল্যাণ সাধন, মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। অপর

পক্ষে আত্মা ও মনের কল্যাণ ও বিকাশ সাধনের, চেষ্টা আয়োজন দূরের কথা, কোনও চিন্তাও যে তাহাদের আছে, এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। শিক্ষার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা যত্ন দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সে শিক্ষা হৃদয় মন আত্মার বিকাশের জন্য নয়, প্রকৃত মানুষ করিয়া তুলিবার জন্য নয়, শুধু অর্থ মান প্রতিপত্তি লাভেরই জন্য, দৈহিক প্রয়োজন সিদ্ধিরই হেতু। উচ্চ নীতি ও ধর্ম্ম দূরের কথা, সাধারণ একটু মনুষ্যত্ব ও জ্ঞান, হৃদয়ের একটু প্রসার, যাহাতে জীবনে ফুটিয়া উঠে, সে দিকেও কোনও দৃষ্টি আছে দেখিতে পাওয়া যায় না। অর্থোপার্জ্জন ও আপনার ক্ষুদ্র স্বার্থসাধনেচ্ছার সঙ্গে সঙ্গেও প্রকৃত জ্ঞানলাভের জন্য জ্ঞানানুশীলনের আকাঙ্ক্ষা, নিজ গণ্ডীর বহির্ভূত অপরের সুখ দুঃখের কল্যাণ অকল্যাণের জন্য ভাবিবার প্রবৃত্তি, জাগাইবার কোনও চেষ্টা বা আয়োজন এ সকল স্থলে মোটেই দৃষ্ট হয় না। বরং মনুষ্যত্ব ও সকল প্রকার মহত্ব, নীতি ও ধর্ম্ম, প্রেম ও পরার্থপরতা পরিত্যাগ করিয়াও, সাংসারিক আরাম ও সুখ, উন্নতি ও প্রতিপত্তির জন্য অশোভন আগ্রহ ও ব্যস্ততা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার যে স্বাভাবিক ফল আমরা চারিদিকে দেখিতেছি, তাহাতে এ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহই থাকিতে পারে না। যেরূপ বপন করা হয়, সেরূপ শস্যই কর্ত্তন করা যায়, যে বীজ রোপিত হয় তদনুরূপ বৃক্ষই উৎপন্ন হয়,—কিছুতেই তাহার অন্যথা হইতে পারে না। সুতরাং শস্য ও ফল দেখিয়া যদি আমরা বীজ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করি, তাহাতে ভ্রান্তির বিশেষ কোনও সম্ভাবনা থাকে না। আমরা চারিদিকে যে অবস্থা দেখিতেছি তাহা নিশ্চয়ই আকস্মিক নহে, উহা কারণ পরম্পরার স্বাভাবিক ফল ব্যতীত অপর কিছু হইতে পারে না। এ জগতে বিনা কারণে কিছুই ঘটিতে পারে না, অমোঘ নিয়মে শৃঙ্খলিত বিশ্বে আকস্মিক ঘটনা কিছুই নাই, এবং সেই অর্থে কিছুতেই আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কোনও কারণ নাই। সামান্য একটু অনুসন্ধান করিলেই দেখিতে পাইব বর্ত্তমান অবস্থায় আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কোনও হেতু নাই—আমাদের কার্য্যের যুক্তিসঙ্গত যে স্বাভাবিক ফল আমরা আশা করিতে পারি ঠিক তাহাই ঘটিতেছে, তাহার কোনও রূপ ব্যতিক্রম হইতেছে না। উক্ত প্রকার কার্য্যের অন্যরূপ ফল আশা করাই অযৌক্তিক, অস্বাভাবিক। সুতরাং যাঁহারা বর্ত্তমান অবস্থা দর্শনে সন্তুষ্ট না হইয়া শঙ্কিত হইতেছেন, তাঁহাদিগকে অন্যরূপ চেষ্টায়ই নিযুক্ত হইতে হইবে, দেহের প্রতি অত্যধিক প্রীতি পরিত্যাগ করিয়া, হৃদয় মন আত্মার জন্যও একটু যত্নশীল হইতে হইবে। তাহা না হইলে কিছুতেই এই অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে না। শুধু হায় হায় করিয়া বিলাপে কোনই লাভ নাই। জগতের ও দেশের চিন্তা ছাড়িয়া যদি আমাদের এই অতি প্রিয় ব্রাহ্মসমাজের, আমাদের নিজ নিজ আত্মীয় স্বজন ও পরিবারের কথা ভাবি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব আমরাও অনেকেই এই মহা বিনাশকর ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত আছি। আমরা নিতান্ত চিন্তাবিহীন বলিয়াই ইহা বুঝিতে পারিতেছি না। একটু চিন্তা ও অনুসন্ধান করিলেই আমরা বুঝিতে পারিব, প্রকৃত পক্ষে আমরা কি করিতেছি, কোন্ পথে চলিতেছি। ——ই যদি এরূপ দুর্গতি ঘটিয়া থাকে, তবে অপরের ত ঘটিতেই পারে। আমাদের এই দুর্গতি যতই দুঃখের কারণ হউক না কেন, আমরা যে তাহা বুঝিতে পারিতেছি না, তাহা চিন্তা ও পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছি না, ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিতাপের বিষয়। কেননা, তাহা বুঝিলে ও জানিলে নিশ্চয়ই আমরা অন্য পথ অবলম্বন করিতাম। আমরা সন্তানগণের পালনে ও শিক্ষায় কোন্ দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখি, কি রূপ চেষ্টা আয়োজনে নিযুক্ত থাকি, তাহা একটুকু ধীর ভাবে বিচার করিলে আমাদের কার্য্যের মূল উৎস কোথায়, সকল প্রচেষ্টার নিয়ামক কোন ভাব, তাহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে বুঝিতে কোনও কাঠিন্য উপস্থিত হইবে না, অতি সহজে স্পষ্ট ভাবে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইব। আমরা চিন্তাবিহীন ভাবে যাহাই ভাবি বা মনে করি না কেন, অন্তরের অন্তরে সকল কার্য্যের মধ্যে দেহকেই সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রদান করি কি না, দেহের প্রতি অত্যধিক প্রীতিই আমাদের সকল কার্য্যের নিয়ামক কি না, তাহা ভাল করিয়া পরীক্ষা করা একান্ত আবশ্যক হইয়াছে। তাহা ব্যতীত অপর কিছুতেই বর্ত্তমান অবস্থার প্রতীকার হইবে না। আমরা যে অনেকেই হৃদয় মন আত্মার কল্যাণ উন্নতি ও বিকাশ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিয়া দেহের পূজা ও সেবাতেই আমাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতেছি এবং সকল প্রকার মনুষ্যত্ব ও মহত্ব হইতে বিচ্যুত হইয়া, আসুরী জীবনই অনুসরণ করিতেছি, দ্রুত বিনাশের পথেই ধাবিত হইতেছি, তাহা পরিষ্কার রূপে অনুভব করিয়া অচিরে আমাদিগকে তন্নিবারণের উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। এদিকে আমাদের সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হউক। আমরা সকলে এ বিষয়ে বিশেষ চেষ্টিত হই। তাহা না হইলে আমাদের ব্যক্তিগত পারিবারিক ও সামাজিক কল্যাণ নাই। আর যেন আমরা এ সম্বন্ধে উদাসীন থাকিয়া দুর্গতির পথে ধাবিত না হই। মঙ্গলময় বিধাতা আমাদিগকে শুভ বুদ্ধি প্রদান করুন, আমাদের হৃদয়ে শুভসংকল্প জাগ্রত করুন। আমরা সকল বিষয়ে তাঁহাকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও চালক করিয়া ধন্য হই। তাঁহার ইচ্ছাই আমাদের জীবনে পরিবারে সমাজে জগতে সর্ব্বত্র জয়যুক্ত হউক।

নানকবাণী

৪০

গুর মূর্খ বাঁধিউ সেত বিধাতৈ।
লংকা লুটী দৈত সন্তাপৈ।
রামচন্দ মারিউ অহি রাবণ।
ভেদ বিভীখণ গুরমুখ পরচাইণ।
গুরমুখ সাইর পাহণ তারে।
গুরমুখ কোট তেতীস উধারে।

ভাবানুবাদ

ভগবৎমুখীন ব্যক্তি বিধাতার সেতু বাঁধিলেন।
লঙ্কা লুটিয়া দৈত্যকে বধ করিলেন।

রামচন্দ্র অহঙ্কারী রাবনকে বিনাশ করিলেন।
ভগবৎমুখীন ব্যক্তি বিভীষণের পরিচয় করাইলেন।
ভগবৎমুখীন ব্যক্তি সমুদ্রে পাষাণ ভাসাইলেন।
ভগবৎমুখীন ব্যক্তি তেত্রিশ কোটীর উদ্ধার করিলেন।

৪১

গুর মুখ চুকৈ আবণ জাণ।
গুর!মুখ দরগহ পাবৈ মান।
গুরমুখ খোটে খরে পছাণ।
গুরমুখ লাগৈ সহজ ধিআন।
গুরমুখ দরগহ সিফতি সমাই।
নানক গুরমুখ বন্ধ ন পাই।

ভাবানুবাদ

ভগবৎমুখীন ব্যক্তির জন্ম জন্মান্তর মিটিয়া যায়।
ভগবৎমুখীন ব্যক্তি পরমেশ্বরের দরবারে সম্মান পান।
ভগবৎমুখীন ব্যক্তি মন্দ ও ভাল চিনিতে পারেন।
ভগবৎমুখীন ব্যক্তি সহজেই ধ্যানে মগ্ন হন।
ভগবৎমুখীন ব্যক্তি ঈশ্বরের দরবারে তাঁহার গুণে তন্ময় হইয়া থাকেন।
নানক বলেন, ভগবৎমুখীন ব্যক্তিরা বন্ধন দশা প্রাপ্ত হন না।

৪২

গুরমুখ নাম নিরনজন পাএ।
গুরমুখ হউমৈ সবদি জলাএ।
গুরমুখ সাচেকে গুণ গাএ।
গুরমুখ সাচৈ রহৈ সমাএ।
গুরমুখ সাচ নাম পত উত্তম হোই।
নানক গুরমুখ সগল ভবণকী সোঝী হোই।

ভাবানুবাদ

ভগবৎমুখীন ব্যক্তি নিরঞ্জন নাম প্রাপ্ত হন।
ভগবৎমুখীন ব্যক্তি অহংভাবকে ভগবানের বাণীদ্বারা পোড়াইয়া ফেলেন।
ভগবৎমুখীন ব্যক্তি সত্যস্বরূপের গুণগান করেন।
ভগবৎমুখীন ব্যক্তি সত্যস্বরূপে সমাহিত হইয়া থাকেন।
ভগবৎমুখীন ব্যক্তির গতি সত্য নামদ্বারা উত্তম হয়।
নানক বলেন, ভগবৎমুখীন ব্যক্তির সমস্ত ভুবনের জ্ঞান হয়।

৪৩

কবণ মূল কবণ মত বেলা।
তেরা কবণ গুরু জিসকা তূ চেলা।
কবণ কথা লে রহহু নিরালে।
বোলৈ নানক সুনহু তুম বালে।
এস কথা কা দেই বীচার।
ভব জল সবদ লংঘাবণ হার।

ভাবানুবাদ

মূল কারণ কে, সকল বুদ্ধি ও সময়ের মূল কে?
তোমার গুরু কে, যাহার তুমি শিষ্য?
কোন্ কথা লইয়া তুমি নির্জ্জনে থাক।
নানক বলেন, হে বালক, তুমি শোন।
এই কথার তত্ত্বজ্ঞান বিচার কর।
যে বাণী ভবজলধি পার করিতে পারে।

৪৪

পবন অরংভ সত গুর মত বেলা।
সবদ গুরু সুরত ধুন চেলা।
অকথ কথা লে রহউ নিরালা।
নানক জুগ জুগ গুর গোপালা।
এক সবদ জিত কথা বীচারী।
গুরমুখ হউমৈ অগনি নিবারী।

ভাবানুবাদ

পবন জীবের আরম্ভ, সত গুরুর শিক্ষা তাহার চলিবার পথ।
ভগবৎবাণী গুরু, ধ্যান যোগের আমি শিষ্য।
অকথ্য কথা লইয়া এ সংসারে নির্লিপ্ত থাকি।
নানক বলেন, যুগে যুগে গুরু আমার রক্ষক।
এক ব্রহ্মবাণী, যাহার দ্বারা সমস্ত কথার অর্থ হয়।
ভগবৎমুখীন ব্যক্তি অহংভাবের অগ্নিকে নিবারিত করিয়াছেন।

দেবেন্দ্রনাথ, বেদান্ত, ও ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ। (২)

[ব্রাহ্মসমাজের শতাব্দীপূর্ত্তি উপলক্ষে মহর্ষির আত্মজীবনীর যে নূতন সংস্করণ প্রস্তুত হইতেছে, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক লিখিত তাহার পরিশিষ্টের পাণ্ডুলিপি হইতে গৃহীত।]

দেবেন্দ্রনাথের বেদান্তত্যাগে বিলম্বের দুই কারণ।

দেবেন্দ্রনাথের বেদান্তত্যাগে বিলম্বের যে কারণ রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাঁহার উপরে (তত্ত্বকৌমুদীর বিগত সংখ্যায়) উদ্ধৃত উক্তির ভিতরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন ("দেবেন্দ্র বাবু চিরকাল ভক্তিপ্রধান ও রক্ষণশীল ব্যক্তি, অথচ সংস্কারক,") তাহাই একমাত্র কারণ অথবা মুখ্য কারণ নহে।

মুখ্য কারণ দুইটি। প্রথম কারণ, উপনিষদের ঋষিদিগের সহিত দেবেন্দ্রনাথের হৃদয়ের যোগ। দেবেন্দ্রনাথের প্রকৃতির গভীরতা তাঁহার অনুবর্ত্তীদিগের অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল। তাঁহারা অনেকেই ধর্ম্মজিজ্ঞাসু মাত্র ছিলেন, দেবেন্দ্রনাথ ধর্ম্মপিপাসু ছিলেন। তাঁহাদের প্রধান অম্বেষণের বস্তু ছিল 'যুক্তি', দেবেন্দ্রনাথের প্রধান অম্বেষণের বস্তু ছিল 'ব্যক্তি'। এই ব্যক্তি-অম্বেষণ বিবিধ আকারে দেবেন্দ্রনাথের প্রকৃতিতে প্রথম হইতেই বিদ্যমান ছিল। তাঁহার প্রথম জীবনের অন্ধকারের অবস্থার ভিতরেও তিনি কেবল জ্ঞানালোকই অম্বেষণ করেন নাই; কিন্তু (১) ভক্তিভাবে, নম্র হৃদয়ে, "আমার পূজা কে লইবে" বলিয়া

পরম বন্দনীয় পুরুষকে অন্বেষণ করিতেছিলেন (৪৪ পৃঃ); এবং (২) জ্ঞানালোকের দু একটি কিরণ লাভ করিবামাত্র, তাহাতে যিনি সায় দিতে পারেন এমন মানুষের সঙ্গ পাইবার জন্য লালায়িত হইয়াছিলেন।

উপনিষদ্ দেবেন্দ্রনাথের প্রকৃতিনিহিত এই দ্বিবিধ ব্যক্তি-অন্বেষণ চরিতার্থ করিল। উপনিষদুক্ত পরব্রহ্ম দিনে দিনে তাঁহার 'চিরজীবনসখা' হইলেন, উপনিষদের ঋষিগণ তাঁহার ধর্ম্মজীবনের গুরু ও বন্ধু হইলেন। দেবেন্দ্রনাথের উপনিষদ্ অধ্যয়ন যখন একান্ত অসম্পূর্ণ, তখনও উপনিষদ্ তাঁহার কাছে কতকগুলি সদুক্তির সমাবেশ মাত্র নহে; তখন হইতেই তিনি উপনিষদের ঋষিগণকে নিজ গুরু ও বন্ধুরূপে অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই জন্য দেবেন্দ্রনাথের অনুবর্ত্তিগণের নিকটে উপনিষদের যে মূল্য ছিল, দেবেন্দ্রনাথের নিকটে তাহার তদপেক্ষা অনেক অধিক মূল্য ছিল।

ধর্ম্মসাধকের পক্ষে এই 'সায় পাওয়া' যে কত আবশ্যক, তাহা দেবেন্দ্রনাথ আত্মজীবনীর চতুর্থ পঞ্চম ও সপ্তম পরিচ্ছেদে জ্বলন্ত ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। আত্মজীবনীর এই অংশ পাঠ করিবার সময়, এই সায়ের প্রকৃতিটি কি, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করা একান্ত আবশ্যক। এই সায় কেবল ধর্ম্মজিজ্ঞাসুর প্রার্থিত সায় নহে, ইহা ধর্ম্মপিপাসুর প্রার্থিত সায়। দেবেন্দ্রনাথ সায় বলিতে শুধু ইহা বুঝেন নাই যে একজন জিজ্ঞাসু ব্যক্তি যুক্তির দ্বারা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন, দ্বিতীয় একজনকেও তিনি চিন্তা ও যুক্তি দ্বারা সেই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে দেখিয়া আশ্বাস লাভ করিলেন। জিজ্ঞাসুর পক্ষে, যুক্তিপথের যাত্রীর পক্ষে, ইহা যথেষ্ট হইতে পারে; কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ কোনও দিনই শুধু জিজ্ঞাসু মাত্র ছিলেন না। তাঁহার প্রকৃতির ভিতরে যে সকল গভীর আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান ছিল, তাহার ফলে, যে-সময়ে তিনি সংশয়ের আন্দোলনে আন্দোলিত, সে-সময়েও শুধু চিন্তা-লব্ধ জ্ঞান তাঁহাকে তৃপ্ত করিতে পারে নাই; সে-সময়েও তাঁহার চিত্ত, সকল জ্ঞানের উৎস যে পরম পুরুষ, তাঁহার সান্নিধ্যের সাক্ষাৎ উপলব্ধির জন্য লালায়িত ছিল; এবং সে-সময়েও তাঁহার চিত্ত, এই পরমপুরুষের মুখ সাক্ষাৎ ভাবে যিনি দর্শন করিয়াছেন, এমন আপ্তকাম সাধকের সায় অন্বেষণ করিতেছিল। যে পদ্মার মাঝীর দৃষ্টান্তের দ্বারা তিনি নিজ আকাঙ্ক্ষিত সায়ের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন, সে মাঝী যুক্তিপথের সহযাত্রীর উপমাস্থল নহে, পারগামী সাধকেরই উপমাস্থল।

তৎপরে, উপনিষদের ঋষিদিগের প্রতি দেবেন্দ্রনাথের ভাবটি বুঝিতে হইলে আরও একটি বিষয়ে প্রণিধান করা আবশ্যক। দেবেন্দ্রনাথ চিন্তা ও যুক্তিকে (Reasonকে) তাহার প্রাপ্য মূল্য সর্ব্বদাই দিয়াছেন বটে, কিন্তু চিন্তা ও যুক্তিকেই সত্যলাভের একমাত্র উপায় বলিয়া তিনি কখনও গ্রহণ করেন নাই। উপনিষদের (মুণ্ড ৩।১।৮) অনুসরণে তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, যে-সাধক জ্ঞানোজ্জ্বলিত পবিত্র হৃদয়ে ধ্যায়মান হন, তাঁহার সেই চিত্তে ঈশ্বর সাক্ষাৎভাবে প্রকাশিত হন, এবং সাক্ষাৎভাবে (অর্থাৎ যুক্তির পথ দিয়া না গেলেও) পবিত্র সত্যসকল প্রকাশিত করেন। শ্রবণ (অধ্যয়ন) এবং মনন (যুক্তির সাহায্যে সিদ্ধান্ত-মালা গ্রন্থন) জ্ঞানের একটি পথ; ধ্যানলব্ধ 'অপরোক্ষা-নুভূতি' জ্ঞানের দ্বিতীয় পথ। উচ্চ তত্ত্বজ্ঞান লাভের পক্ষে দেবেন্দ্রনাথ এই দ্বিতীয় পথকে যুক্তির পথ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন; এবং এই অপরোক্ষানুভূতি-লব্ধ জ্ঞানের সহিত যখন যুক্তিলব্ধ সিদ্ধান্তের মিল হইত, তখন সেই 'সায়' পাইয়া তিনি তৃপ্ত ও নিশ্চিন্ত হইতেন।

প্রথম জীবনে যখন তিনি কেবল যুক্তিলব্ধ সিদ্ধান্তে পঁহুছিয়াছিলেন, যখন তিনি অপরোক্ষানুভূতির অধিকারী হন নাই, তখন নিজের সেই যুক্তিলব্ধ সিদ্ধান্তসকলের সহিত উপনিষদের জ্ঞানোজ্জ্বলিত পবিত্র হৃদয়-সম্পন্ন ঋষিদিগের অপরোক্ষানুভূতির মিল দেখিয়া পুলকিত হইয়াছিলেন। এই জন্যই আত্মজীবনীতে ঐ সময়ের বর্ণনায় তিনি এইরূপ আশ্চর্য্য ভাষা ব্যবহার করিতেছেন,—"আমি মানুষের নিকট হইতে সায় পাইতে ব্যস্ত ছিলাম, এখন স্বর্গ হইতে দৈববাণী আসিয়া আমার মর্ম্মের মধ্যে সায় দিল,—আমার আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হইল!" (১৯ পৃষ্ঠা)। "এ আমার নিজের দুর্ব্বল বুদ্ধির কথা নহে, এ সেই ঈশ্বরের উপদেশ। সে ঋষি কি ধন্য, যাঁহার হৃদয়ে এই সত্য প্রথমে স্থান পাইয়াছিল!" (২০ পৃষ্ঠা)। উপনিষদের বিশুদ্ধ-হৃদয় ঋষিদিগের ধ্যায়মান চিত্তে ঈশ্বর সাক্ষাৎ ভাবে আপনার জ্ঞান প্রকাশ করিয়াছিলেন, দেবেন্দ্রনাথের এই বিশ্বাস ছিল; তাই তিনি উপনিষদের সারকে 'দৈববাণী' ও 'ঈশ্বরের উপদেশ' বলিয়াছেন।

পরবর্ত্তী জীবনের ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থের প্রথম খণ্ড রচনা ব্যাপারের বর্ণনায় তিনি বলিতেছেন, "কে আমার হৃদয়ে এই সত্যসকল প্রেরণ করিলেন? "ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ", যিনি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষে আমাদের বুদ্ধি-বৃত্তি পুনঃ পুনঃ প্রেরণ করেন, সেই জাগ্রৎ জীবন্ত দেবতাই আমার হৃদয়ে এই সকল সত্য প্রেরণ করিলেন। ইহা আমার দুর্ব্বল বুদ্ধির সিদ্ধান্ত নহে, ইহা মোহবাক্যও নহে, প্রলাপবাক্যও নহে। ইহা আমার হৃদয়ে উচ্ছ্বসিত তাঁহারই প্রেরিত সত্য। যিনি সত্যের প্রাণ, যিনি সত্যের আলোক, তাঁহা হইতেই এই জীবন্ত সত্যসকল আমার হৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়াছে।" (আত্মজীবনী, ১১০, ১১১ পৃষ্ঠা)। এ সময়ে দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং অপরোক্ষানুভূতিতে পহুঁছিয়াছেন।

দেবেন্দ্রনাথের তৎকালীন অনুবর্ত্তিগণের মধ্যে অধিকাংশ মানুষ যুক্তি তর্কের রাজ্যেই বাস করিতেন। ধর্ম্ম যে মানুষের জীবনের অভিজ্ঞতার বস্তু, ইহা তাঁহারা জানিতেন না। উপনিষদের পশ্চাতে কোনও মানুষকে তাঁহারা অনুভব করিতেন না। 'যুক্তিসিদ্ধতার দিক হইতে যাহা অপূর্ণ, তাহা তৎক্ষণাৎ ত্যাজ্য', ইহার অধিক কোনও অনুভূতি তাঁহাদের চিত্তে উদিত হইত না। গভীর ঈশ্বরপিপাসার দ্বারা নিরন্তর চালিত, গভীর ঈশ্বরপিপাসার দ্বারা লব্ধদৃষ্টি, প্রাচীন ঋষিদিগের জীবনের অভিজ্ঞতা ইহাতে নিবদ্ধ আছে, এই বলিয়া দেবেন্দ্রনাথের কাছে উপনিষদের যে একটি অপূর্ব্ব মূল্য ছিল, তাঁহাদের কাছে তাহা ছিল না।

ঋষিদিগের সহিত এইরূপ ব্যক্তিগত সম্বন্ধ ভিন্ন, দেবেন্দ্র-নাথের উপনিষদ্ত্যাগে বিলম্বের আরও একটি কারণ ছিল। সাধক প্রতিদিন যাহা পাঠ করিয়া নিজ হৃদয়কে বিমল ভক্তির

ভাবে পূর্ণ ও ঈশ্বরপূজার জন্য উন্মুখ করিয়া লইবেন, এমন কোনও গ্রন্থ সাধকের হাতে থাকা দেবেন্দ্রনাথ একান্ত আবশ্যক বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। উপনিষদ্ কাড়িয়া লইলে তাহার পরিবর্ত্তে এই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার জন্য ব্রহ্মোপাসককে কি দেওয়া হইবে, এই প্রশ্নের সুমীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত দেবেন্দ্রনাথ স্থির হইতে পারিতেছিলেন না। তর্কবিতর্কের সময়ে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গিগণ মনে করিতেছিলেন যে, তাঁহাদের ন্যায় দেবেন্দ্রনাথের দৃষ্টিতেও, শুধু যুক্তিযুক্ত বাক্যের ও সুপরীক্ষিত সত্যের আধার বলিয়াই বেদান্ত মূল্যবান্ হইয়াছে; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। দেবেন্দ্রনাথ, দৈনিক পবিত্র পাঠের বিষয় বলিয়া, মানবহৃদয়ে ধর্ম্মভাব উদ্দীপ্ত করিবার ও উজ্জ্বল রাখিবার উপায়স্বরূপ বলিয়া, উপনিষদ্‌কে মূল্যবান্ মনে করিতেছিলেন। 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' গ্রন্থখানি ক্রমশঃ ব্রাহ্মদিগের অন্তরের শ্রদ্ধাতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে, ব্রাহ্মদিগের দৈনিক ধর্ম্মসাধনে ধর্ম্মগ্রন্থপাঠের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিতেছে, এবং ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্মপ্রসঙ্গের ও ধর্ম্মসাহিত্যের প্রধান উৎসের স্থান অধিকার করিতেছে, ইহা দেখিয়া যখন দেবেন্দ্রনাথের মন নিশ্চিন্ত হইল, সেই সময়ে তিনি প্রকাশ্যভাবে 'বেদান্ত পরিত্যাগ' ঘোষণা করিতে অনুমতি করিলেন।

উপনিষৎকার ঋষিদিগের সহিত যোগ, তাঁহাদিগের ধ্যানলব্ধ অপরোক্ষানুভূতিতে আস্থা, এবং নিত্যপাঠের জন্য পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থের প্রয়োজনবোধ,—এ সকল দেবেন্দ্রনাথের প্রকৃতির গভীর স্থানে নিহিত ছিল বলিয়াই তিনি তাঁহার অনুবর্ত্তীদিগের ন্যায় লঘুভাবে সহজে ও অল্প সময়ে বেদান্তকে (অর্থাৎ উপনিষদ্‌কে) ত্যাগ করিতে পারেন নাই।

ভারতীয় প্রকৃতি, এবং অলৌকিক অভ্রান্ত ও অদ্বিতীয় শাস্ত্র।

আজকাল অনেকেই এ কথাটি বুঝিতে পারেন না যে, একজন খ্রীষ্টানের চিত্তে বাইবেলকে একমাত্র ও অভ্রান্ত ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য যে ব্যাকুলতার উদয় হয়, দেবেন্দ্রনাথের চিত্তে, (অথবা, যাহার মন ভারতীয় ভাবে গঠিত এমন কোনও মানুষের চিত্তে) কোনও গ্রন্থকে ঐরূপ একমাত্র বা অক্ষরে-অক্ষরে অভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য তদনুরূপ ব্যাকুলতার উদয় হওয়া সম্ভব নহে। খ্রীষ্টানদের সঙ্গে সংঘাতের ফলে এ দেশের কোনও কোনও নূতন ধর্ম্মসম্প্রদায়ে যুক্তি তর্কের অদ্ভুত ব্যায়ামের সাহায্যে বেদের অক্ষরে-অক্ষরে অভ্রান্ততা ও সর্ব্ব-মানবের পরিত্রাণের দ্বার হইবার যোগ্যতা প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস দেখা যাইতেছে বটে। কিন্তু এই ব্যস্ততা ও এই প্রয়াস অতি আধুনিক কালের বস্তু, ও ইহা ভারতীয় চিরাগত প্রকৃতির একান্ত বিরুদ্ধ।

খ্রীষ্টীয় জগতে ধর্ম্মমতের উপরে একটি শাসনকেন্দ্র আছে। পোপ অথবা রাজশক্তিসমর্থিত church সেখানে মানুষের মত ও বিশ্বাসের উপরে নিজের চাপ প্রয়োগ করিতে পারেন। তাই সেখানে, (১) এই বইখানি ঈশ্বর অলৌকিকভাবে প্রকাশিত করিয়াছেন, (২) ইহা ব্যতীত আর কোন বই ঈশ্বর মানুষকে দেন নাই, (৩) এই বই খানির প্রতিটি কথা সত্য, (৪) এই একখানি বই হইতে মানুষের সব ধর্ম্মজ্ঞান লাভ হইবে,—এ সকল কথা মানুষকে বিশ্বাস করাইবার জন্য churchএর গুরুভার যাঁতাকল মানুষের মনের উপরে চাপিয়া থাকিতে পারিয়াছে; যুক্তির একটি দানা উঠিবামাত্র তাহাকে গুঁড়া করিয়া ফেলিতে পারিয়াছে।

ভারতীয় সমাজে বাহ্য আচার বিষয়ে এইরূপ প্রবল একশাসনতন্ত্র ছিল বটে; কিন্তু মত, বিশ্বাস, ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রভৃতি আন্তরিক বিষয়ে সাধারণতঃ তাহা ছিল না। এ দেশে শৈব যখন বলিয়াছেন যে আমার শাস্ত্র ঈশ্বরের মুখনিঃসৃত, তখন তিনি জানিতেন যে বৈষ্ণবও নিজের শাস্ত্র সম্বন্ধে ঠিক ঐরূপ কথাটি বলিবেন। এ দেশে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ভক্তিভাবাপন্ন মানুষেরা নিজ নিজ দেবতার ও শাস্ত্রের অলৌকিক মহিমা পুরাণাদির দ্বারা যথেচ্ছ ঘোষণা করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা জানিতেন যে তাঁহাদের পাশে বসিয়াই যুক্তিবাদী দার্শনিকগণ সে সকলের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ ও সংশয় প্রচুর পূর্ব্বক যথেচ্ছভাবে স্বীয় স্বীয় সিদ্ধান্ত নির্ম্মাণ করিবেন। ইহাতে তাঁহারা ক্ষুন্ন হইতেন না। তাঁহারা ভাবিতেন, যাহারা বিশ্বাস করিতে উৎসুক তাহাদের জন্য আমরা লিখিয়া যাই; বিশ্বাস করিবার মানুষ জগতে যথেষ্ট পাওয়া যাইবে। এই রূপে, এ দেশে ভক্তি ও যুক্তি, পরস্পরকে পথ ছাড়িয়া দিয়া, নিজ নিজ স্বতন্ত্র পথ ধরিয়াছিল। ভক্তি, যুক্তিকে আক্রমণ করে নাই, চাপিয়া মারিতে চাহে নাই; সকল মানুষের জন্য একখানি মাত্র অভ্রান্ত শাস্ত্র সৃষ্টি করিতে চাহে নাই। এ দেশে, যে বিশ্বাস করিতে চায়, তাহার জন্য স্বয়ং ভগবানের বাক্য ও কার্য্য বিষয়ক অদ্ভুত গল্পের অভাব নাই; যে বিশ্বাস করিতে চায় না, তাহার জন্য যুক্তিরও অভাব নাই। এ দেশের ভক্তিতে ছেলেমানুষী যথেষ্ট আছে, কিন্তু বিশ্বাসের উপর উৎপীড়নের (tyranny) চেষ্টা নাই।

দেবেন্দ্রনাথের মন এ বিষয়ে ভারতীয় ছাঁচে গঠিত ছিল। তাঁহার মনে শ্রদ্ধা ভক্তি প্রচুর ছিল। যে-পুস্তক হইতে ধর্ম্মজীবনের সাহায্য পাওয়া যায়, তাহার প্রতি তাঁহার মন শ্রদ্ধাভরে অবনত হইত। খ্রীষ্টীয়দিগের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত না হইলে, তিনি যেরূপ শ্রদ্ধার সহিত ও শান্তভাবে উপনিষদ্ অধ্যয়ন ও প্রচার করিতেছিলেন, তাহাই করিয়া চলিয়া যাইতেন। উপনিষদের সহিত বাইবেলের তুলনা ও উৎকর্ষ অপকর্ষের বিচার, এবং উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থের গৌরব পাইবার যোগ্য, অথবা যোগ্য নয়, তাঁহার মনে এ সকল প্রশ্নের উদয়ই হইত না।

ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ কি একখানি নূতন অভ্রান্ত গ্রন্থ ?

এই জন্য আমার বিশ্বাস যে, এক সময়ে যাঁহারা বলিতেন, দেবেন্দ্রনাথ বেদান্তের অভ্রান্ততা রক্ষা করিতে না পারিয়া, আর একখানি অভ্রান্ত পুস্তক রচনা করিতে উৎসুক হইলেন, ও সেই জন্য 'ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ' সঙ্কলন করিলেন, তাঁহারা দেবেন্দ্রনাথের প্রতি অতিশয় অবিচার করিতেন।

দেবেন্দ্রনাথের ১৮৬৪ সালের রচনা ("ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত") হইতে এ বিষয়ে কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া এই প্রসঙ্গ সমাপ্ত করা যাইতেছে।

"রামমোহন রায়ের মনের ভাব, কিসে সকল প্রকার পৌত্তলিকতা গিয়া এক ঈশ্বরের উপাসনা পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হয়। এই জন্য এক দিক হইতে যেমন ভারতবর্ষের লোকদিগের বেদান্ত-প্রতিপাদ্য একমেবাদ্বিতীয়ং পরব্রহ্মের উপাসনার জন্য এই ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিলেন, তেমনি আবার পৃথিবীর সমুদয় লোককে ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত করিবার জন্য আর দিক হইতে তিনি কি করিলেন? না, বাইবেল্‌কে নিয়ামক বলিয়া, তাহাতে যে পৌত্তলিক ভাগ আছে তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, বাইবেল দ্বারাই এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা সিদ্ধান্ত করিলেন। সেই প্রকার, কোরাণকে নিয়ন্তা করিয়া, মহম্মদকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক, কোরাণদ্বারাই এক ঈশ্বরের উপাসনা প্রতিপন্ন করিলেন। ইহাতে হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান সকলের সহিত তাঁহার বিবাদ হইল। ... এক মাত্র সহজ জ্ঞান ও আত্মপ্রত্যয়ের বিষয় বলিয়া ঈশ্বরকে লোকের নিকটে প্রতিপন্ন করিবার তাঁহার ভরসা ছিল না। যদিও তিনি জানিতেন, ধর্ম্ম প্রচার ও রক্ষার জন্য এক এক আপ্ত পুস্তকের অবলম্বন চাই, কিন্তু তাঁহার বিশ্বাসের ভূমি সহজ জ্ঞান ছিল; তাহা না হইলে সকল ধর্ম্মের মধ্য হইতে তিনি সার সত্য কেমন করিয়া সংকলন করিলেন? যদিও তিনি ভরসা করিয়া আত্মপ্রত্যয়ের উপর লোকদিগকে নির্ভর করিতে বলিতে পারেন নাই, কিন্তু তিনি নিজে আত্মপ্রত্যয় দ্বারা চালিত হইতেন। তিনি বেদ কোরাণ, বাইবেল পুরাণ, তন্ত্র মন্ত্র, সকল হইতেই সহজ জ্ঞানের আলোতে আত্মপ্রত্যয়ের উপর নির্ভর করিয়া এক ঈশ্বরের উপাসনা বাহির করিলেন। ইহাতে তিনি মনে করিলেন যে, তবে ধর্ম্ম লইয়া এত কলহের আবশ্যক কি? এই জন্য তিনি প্রত্যেক ধর্ম্মপুস্তক লইয়া এক ঈশ্বরেরই উপাসনা-বিধি প্রচার করিতে গেলেন। কিন্তু তাঁহার কথা কাহারো মনে সংলগ্ন হইল না; খ্রীষ্টানদিগের সহিত তাঁহার বিবাদ হইল, হিন্দুরা তাঁহাকে গৃহ হইতে নির্ব্বাসিত করিল, মুসলমানেরা তাঁহাকে কাটিতে গেল। ...

রামমোহন রায় মনে করিয়াছিলেন, যাহারা বেদ মানে, তাহাদের মধ্যে বেদ রক্ষা করিয়া পরব্রহ্মের উপাসনা প্রচলিত করা। কিন্তু, যাহারা জ্ঞান বিজ্ঞানে উন্নত হইয়া বেদকে আপ্তবাক্য বলিয়া না মানিবে, তাহারদের মধ্যে কি করা, ইহা তখন তাঁহার বিবেচনায় আইসে নাই। ক্রমে সেই কাল উপস্থিত হইল; ক্রমে বেদের দোষসকল পরিস্ফুটিত হইয়া পড়িল। তখন আমরা মনে করিলাম যে, বেদের মধ্যে যে সত্য আছে, তাহাই সংকলন করা। এই জন্য দুই বৎসর লইয়া শ্রুতি স্মৃতি হইতে টীকার সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ তাহাতে অন্তর্নিবেশিত করা হইল। ... যে-ধর্ম্ম সহজ জ্ঞান ও আত্মপ্রত্যয়ের উপর নির্ভর করে, সে-ধর্ম্ম হইতে যে অনুষ্ঠান-পদ্ধতি নিবদ্ধ হওয়া ও কার্য্যেতে তাহা পরিণত হওয়া, ইহা পৃথিবীর কোন পুরাবৃত্তে নাই। ভারতবর্ষেই কেবল এই নূতন সৃষ্টি। ভারতবর্ষ ব্যতীত এমন দৃষ্টান্ত আর পৃথিবীতে নাই।" (২৭—৩৩ পৃষ্ঠা)।

প্রাপ্ত

সাম্প্রদায়িক বিরোধ।

দলাদলি—একতার মহা অন্তরায়,—
দূর না হইলে, শুধু মুখের কথায়
উদ্ধার হবে না দেশ; দ্বেষ হিংসা ছাড়ি'
একতা বন্ধনে বদ্ধ হ'তে যদি পারি,
নিশ্চয় ঘুচিবে তবে দেশের দুর্দ্দিন;
অচিরে দেশের ভাগ্যে আসিবে সুদিন।
দেশের দুর্ভাগ্য, তাই হিন্দু মুসলমান
দেশোদ্ধারে দিতে নারে স্বার্থ বলিদান।
সামান্য স্বার্থের লাগি' স্বদেশের হিত
বিসর্জ্জন দিয়া, ফল লভে বিপরীত!
ক্রমে ক্রমে অধোগতি, বাধা পদে পদে,
অতলে ডুবিল দেশ বাদ বিসম্বাদে!
ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই,—শাস্ত্রের বচন—
যে দেশেতে সে দেশের নিশ্চয় পতন।
তাই বলি, হিংসা দ্বেষ দলাদলি ভু'লে,
কোলাকোলি কর সবে, ভাই ভাই মিলে।
দেখিবে দেশের দশা ফিরিবে ত্বরায়,
ঢেলে দেও মন প্রাণ দেশের সেবায়।
মারামারি কাটাকাটি করিও না আর,
মিলে মিশে সাধ হিত দেশমাতৃকার।
সকলেই মোরা এক পিতার সন্তান,
তাই বলি সবে মিলে হও একপ্রাণ;
উদিবে ভারতে পুনঃ সুখের তপন,
ভেদাভেদ জ্ঞান আর রবে না তখন।
একতা-বন্ধন কর মূলমন্ত্র সার,
নিশ্চয় নিশ্চয় হবে ভারত উদ্ধার।

শ্রী চন্দ্রনাথ দাস।

হে অনন্ত, হে অসীম শক্তির আধার,
অপার রহস্যপূর্ণ এ সৃষ্টি তোমার।
দেখে বিমোহিত জড় বৃক্ষলতা যত,
কে করিবে ভেদ তাতে রহস্য যে কত?
জলে স্থলে আকাশেতে কত প্রাণী রয়,
কত লীলা কত রঙ্গ দেখিয়া বিস্ময়!
সৃষ্টি মধ্যে নর নারী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গণি,
দেব দেবী কত সব দেখে ধন্য মানি।
স্বার্থ সুখ লাগি অধম মানব কত
হিংসানলে পাপপঙ্কে ডুবিছে নিয়ত!
ক্ষুদ্র ল'য়ে হিংসাদ্বেষ জগতে বিদিত,
(কিন্তু) অনন্ত, তোমাকে নিয়ে কলহে লাঞ্ছিত।

হিন্দুর ঈশ্বর তুমি হরি ব্রহ্ম নাম,
তাকে আল্লা ব'লে যত মুসলমান।
ইহুদির জোহবা তুমি, খৃষ্টানের প্রভু,
এক মহান্ তুমি সকলের বিভু;
তোমায় লইয়া বিবাদ সম্ভবে না কভু।
(কিন্তু) আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য অতি, বলা নাহি যায়,
(হায়) অনন্ত, তোমাকে ল'য়ে বিবাদ বাজায়!
হিন্দু মুসল ঈশাই বিবাদ করিছে;
প্রত্যেকে তোমার প্রিয় মনেতে ভাবিছে।
হিন্দুকে কাফের বলে ম্লেচ্ছ মুসলমান,
ঈশাই বিধর্ম্মী ব'লে করে অপমান।
তব নামে এ বিবাদে বড় ব্যথা পাই,
সবে দয়া ক'রে দাও তব পদে ঠাঁই।
এক পিতা তুমি দেব, সবে ভাই বোন;
এই মহা সত্য বলুক সবার মন।
ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই, এ কি অশোভন!
মিলাও সকলে, পিতা, তোমার সদন।

শ্রী গুরুদাস চক্রবর্ত্তী।

উদ্ধৃত

রঙ্গালয় ও দেশোন্নতি।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এস্ সি)

সকলেই বলিতেছেন যে এখন আমাদের দেশের ভয়ানক দুর্দ্দিন আসিয়া উপস্থিত। কিন্তু এই দুর্দ্দিনে আমরা কি করিতেছি? বিগত যুদ্ধের সময়ে বিলাতের দুর্দ্দিনে সেই দেশের অনেক রঙ্গালয় ও আমোদ প্রমোদের ক্ষেত্র বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। সকলেই তখন লড়াই করিতে ছুটিয়াছিল। আমরা তো বিলাতের নকলে এ দেশেও মহিলাগণকে রঙ্গালয়ে নামাইতে প্রবৃত্ত; কিন্তু বিলাতের নকলে দেশের দুর্দ্দিনে কি রঙ্গালয়ের অভিনয় বন্ধ করিতেছি? না, আরও নূতন নূতন রঙ্গালয় খুলিয়া দেশকে উন্নতির (?) পথে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিতেছি—মহিলাগণকে নাট্যশালার মিথ্যার আসরে নামাইতে চাহিতেছি? দেশের ভূমিলক্ষ্মী আজ আমাদের প্রতি কাতর নয়নে চাহিয়া রহিয়াছেন, কিন্তু আমরা চলিয়াছি অভিনেত্রীর চটুল হাস্যে ও নৃত্যভঙ্গিমার মোহে অন্ধ হইতে! দেশের শিল্পবাণিজ্য আমাদিগকে কর্ম্মের ভেরীনিনাদে আহ্বান করিতেছে, কিন্তু আমরা চলিয়াছি আমোদ প্রমোদের পঙ্কিল স্রোতে ভাসিতে! আজ কোনও শিল্প বা বাণিজ্যের জন্য সামান্য টাকাও পাওয়া যায় না, কিন্তু সুবৃহৎ রঙ্গালয় স্থাপন ও পরিচালনের উপযোগী যথেষ্ট অর্থ দেখিতে দেখিতে সংগ্রহ হইয়া যায়! আজ আমরা শিল্পবাণিজ্যের উন্নতিচিন্তায় আমাদের মস্তিষ্কের অপব্যয় না করিয়া, রঙ্গালয়ের উন্নতিকল্পে প্রাণপাত করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছি। আমাদের উন্নতির আর বাকী কি? কোনও দরিদ্রকে একটী পয়সা দান করিতে হইলেও আমরা মূর্চ্ছা যাই, কিন্তু রঙ্গালয়ে দশ বিশ টাকাও অনায়াসে হাসিমুখেই ব্যয় করি। এই সবই কি উন্নতির লক্ষণ নয়?

কেহ কেহ আবার বলেন যে, রঙ্গালয় নাকি সত্যসত্যই আমাদের উন্নতির লক্ষণ। উহা নাকি আমাদের উন্নতির পক্ষে প্রয়োজনীয় না হইলে, এত দিন টিকিয়া থাকিতে পারিত না। কিন্তু এই যুক্তি একেবারে ভিত্তিহীন। তাহা হইলে ত সর্ব্ববিধ নেশাই উন্নতির পক্ষে প্রয়োজনীয় বলিতে হয়; কারণ, সুরা হইতে কোকেন পর্য্যন্ত যত মাদকদ্রব্য আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের সবগুলিই ত এ পর্য্যন্ত বেশ টিকিয়া আছে। অতএব স্পষ্টই বোঝা যায়, টিকিয়া আছে বলিয়াই যে সেটি প্রয়োজনীয়, তাহা হইতেই পারে না। এ যুক্তি যুক্তিই নয়। জীবনের উন্নতির জন্য মাদকদ্রব্যাদির ন্যায় রঙ্গালয়েরও কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি না। কিন্তু তথাপি লোকে তাহা জানিয়া অথবা না জানিয়া উহাতে আকৃষ্ট হইতেছে। কে তাহাতে বাধা দিবে? দেশের চিন্তাধারার পরিচালকগণ? তাঁহারাই যে এ সকলের কর্ত্তা। তাঁহাদেরই দৃষ্টান্তে দিন দিন অশিক্ষিত দরিদ্রগণও বিলাসিতার পথে গমন করিয়া স্বকীয় সর্ব্বনাশের পথ উন্মুক্ত করিতেছে। এ দেশের দারিদ্র্যের প্রধান কারণ কেবল অজন্মা নয়, কেবল বিদেশে রপ্তানি নয়—কিন্তু বিলাসিতা, অমিতব্যয়িতা ও চরিত্রহীনতা। এই সমুদয় দোষেরই অন্যতম প্রধান কারণ রঙ্গালয়। আর দেশের তথাকথিত পরিচালকগণ ধ্বংসের মূল রঙ্গালয়গমনের কুদৃষ্টান্ত দেখাইয়া দেশের কি অমঙ্গলই না ডাকিয়া আনিতেছেন! কে এ অমঙ্গলকে প্রতিরুদ্ধ করিবে? শিক্ষিত সমাজ? এ দেশ রক্ষার পক্ষে শিক্ষিতসমাজকে এক সময়ে প্রধান সহায় মনে হইত; মনে হইত, শিক্ষিতসমাজ আদর্শের উজ্জ্বল বর্ত্তিকা লইয়া অগ্রসর হইলে এ দেশের সকলেই সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইবে; কিন্তু হায়, শিক্ষিতসমাজে এখন সারি সারি অনিষ্টকর আসক্তির বাতি জ্বালাইবার বহুল চেষ্টা চলিতেছে! ক্ষণস্থায়ী আমোদের লোভে তাঁহারা অজ্ঞানীর ন্যায় দেশের কি অনিষ্টই না করিতেছেন! আর আমোদই বা কিসের? যদি আজ কোন ম্যাট্‌সিনি, রাণেজী, পার্কার বা গ্যারিবল্ডি এ দেশে জন্মিতেন, তবে তিনি কি আজ আমোদে প্রমত্ত হইতেন? না, গভীর দুঃখের কালিমায় আচ্ছন্ন হইয়া নির্জ্জনে দেশের দুঃখের জন্য কাঁদিতে বসিতেন? কিন্তু আমরা আজ আমোদে মাতিয়া—লঘুভাবে ডুবিয়া, হাসিয়া বেড়াইতেছি—দেশের উন্নতি অপেক্ষা 'আর্ট'এর উন্নতিসাধনে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছি; তাহাতে দেশ যায় ত যাউক; ক্ষতি নাই! চারুকলা বা আর্ট ত পরিপুষ্টি লাভ করিবে—তাহা হইলেই হইল!!!

যে দেশের চিন্তাধারার পরিচালকগণও লালসা সংযম করিতে পারেন না—যে দেশের নেতৃবৃন্দের অধিকাংশ বিলাসে বিমুগ্ধ, সে দেশের উন্নতি কোথায়? মহাজনের পথেই ত জনসাধারণ চলিবে। যে দেশে মহাজনরূপে কথিত ব্যক্তিগণও কামনার

পঙ্কিলহ্রদে হাবুডুবু খান, সে দেশে কিরূপে আশা করা যায় যে, জনসাধারণ দুর্নীতিকে বিষবৎ দেখিবে? এবং যে দেশের জনসাধারণ দুর্নীতিনিমগ্ন, সে দেশের লোক সময় কোথায় পাইবে যে দেশের অন্নচিন্তার সমাধান করিবে? আমরা দেশবাসীকে আহ্বান করিয়া বলিতেছি, যাঁহারা দেশকে বিলাসের পথে লইয়া যান, ধ্বংসের পথে লইয়া যান, তাঁহারা যত বড়ই হউন, তাঁহারা দেশনেতা নন। তাঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধি যতই থাকুক না কেন, দেশ যেন তাঁহাদের অনুসরণ না করে। দেশবাসীর প্রধান কর্ত্তব্য, দেশের বর্ত্তমান বিলাসস্রোতকে সবলে বাধা দেওয়া।

অনেকে আবার এই বাধা দেওয়াকে স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ মনে করেন। আশ্চর্য্য ধারণা ইহাদের স্বাধীনতা সম্বন্ধে!! যে বিলাসিতার কারণে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ জাতিসকল ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, যে বিলাসিতার কুফল চাক্ষুষ ও যুক্তির সাহায্যেও প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহাতে বাধা দেওয়া কি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ? মানুষের শরীর মন আত্মাকে বিলাসের অনলে ধ্বংস হইতে না দিলে কি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয়, অথবা তাহারি উন্মত্ততায় বাধা দেওয়া হয়? যদি কেহ আত্মহত্যা করিতে যায়, অথবা নিজের ঘরে আগুন লাগাইতে চায়, তাহাতে বাধা দেওয়াও কি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ? ইহা যদি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ হয়, তবে আমরা সহস্র বার স্বাধীনতায় এইরূপ হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করি। আমরা স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতা বা উন্মত্ততা চাহি না।

শেষে আমরা একটী কথা বলিতে চাহি। ব্রাহ্মধর্ম্মকে হৃদয়ে উপলব্ধি করিলে কেহ আধুনিক রঙ্গালয়ে গমন সমর্থন করিতে পারেন কি না সন্দেহ। ব্রাহ্মধর্ম্মের, সকল সত্যধর্ম্মেরই, মূলমন্ত্র ভগবানের সঙ্গে আত্মার যোগসাধন। রঙ্গালয়ে অভিনয় করা বা দেখা যে এই যোগসাধনে সহায়তা করে না, তাহা বিবেচক ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন। রঙ্গালয়েও গমন করিবেন, আর নিজেকে ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দিবেন, অধিকাংশ স্থলেই ইহাও অসম্ভব। ব্রাহ্ম নামধারীদের মধ্যে কেহ কেহ রঙ্গালয়ে যান ও অভিনয় করেন বলিয়া ব্রাহ্মসমাজ যে উহার পক্ষপাতী ধরিতে হইবে এমন কোন কারণ নাই। বুঝিতে হইবে যে, তাঁহারা ব্রাহ্মবংশীয় হইলেও ব্রাহ্ম নন, বা ব্রাহ্মধর্ম্ম পালন করেন না। যিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম পালন করেন, তিনি যে দেশ, যে কাল বা যে জাতিরই হউন না কেন, তিনিই ব্রাহ্ম। 'জাতব্রাহ্ম' বলিয়া কথাই হইতে পারে না। যেমন ব্রাহ্মণের পুত্র হইলেই ব্রাহ্মণ হওয়া যায়, তদ্রূপ ব্রাহ্মের পুত্র হইলেই ব্রাহ্ম হওয়া যায় না। কার্য্য ও গুণ দ্বারাই ব্রাহ্মত্ব নিরূপিত হয়; কখনই জন্মদ্বারা ব্রাহ্মত্ব নিরূপিত হইতে পারে না। রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ অথবা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রকে ভক্তি করিলেই ব্রাহ্ম হওয়া যায় না; ব্রাহ্মপদ্ধতিমতে বিবাহাদি অনুষ্ঠানমাত্র করিলেও ব্রাহ্ম হওয়া যায় না; কিন্তু যিনি সত্যের উপাসক, যিনি আপনাকে যোগসাধনের পথে অগ্রসর করেন তিনিই ব্রাহ্ম। আমি যদি দুষ্কর্ম্মের অভিমুখে মনকে পরিচালিত করি, তাহা হইলে আমি ব্রাহ্মবংশে জাত হওয়া সত্ত্বেও ব্রাহ্ম নহি। ব্রাহ্মত্ব বংশগত নহে, কিন্তু কর্ম্মগত; ব্রাহ্মবংশে জাত হইয়াও, ব্রাহ্মপদ্ধতিমতে অনুষ্ঠানাদি করিয়াও যে ব্যক্তি মদ্যপানাদি দুষ্কর্ম্ম করে, সে সেই সকল দুষ্কর্ম্ম দ্বারাই সুস্পষ্ট প্রমাণ করে যে সে ব্রাহ্ম নহে; কারণ, প্রকৃত ব্রাহ্ম কখন জানিয়া শুনিয়া দুষ্কর্ম্ম করিতে পারেন না। তবে দুষ্কৃতকারী যে ব্রাহ্মপদ্ধতিমতে অনুষ্ঠানাদি করে, তাহা সে ব্রাহ্মধর্ম্ম মানে বলিয়াই যে করে তাহা নহে, কিন্তু সাংসারিক স্বার্থের সুখের অনুরোধেই সে ঐ কার্য্য করে। মুখে ব্রাহ্ম বলিয়া দাবী করিলেও সে ব্রাহ্ম নহে। রঙ্গালয়ে যদি স্ত্রীলোকের অংশ স্ত্রীলোকের দ্বারা অভিনীত না হয়, তবে সে রঙ্গালয় যে টিকিতে পারে না, তাহা পরীক্ষিত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ইহা সুস্পষ্ট যে, রঙ্গালয় সুনীতিপূর্ণ গ্রন্থ অভিনয় করিলেও সুনীতির পরিপোষক নয়। অতএব সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিকামী ব্রহ্মপরায়ণ সাধুর পক্ষে রঙ্গালয়গমন কিছুতেই সমর্থন করা যায় না; কারণ, তিনি কখনই দুর্নীতির পৃষ্ঠপোষক হইতে পারেন না।

উপসংহারে বক্তব্য, এই বিপদের দায়িত্ব কোনও বিশেষ একটী সমাজের উপর ফেলিয়া নিশ্চিন্ত হইলেও চলিবে না। যে কারণেই হউক বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে—এই বিপদ আমাদের দেশের—মাত্র কোনও বিশেষ সমাজের নহে। দেশের সকল হিতৈষী ব্যক্তির—সকল হিতৈষী সংবাদপত্রের কর্ত্তব্য, দেশকে এ বিপদের বিষয়ে সাবধান করিয়া দেওয়া। যাঁহারা ভারতমহিলাদের সম্বন্ধে বিদেশীয়দের অন্যায় ও অসঙ্গত উক্তিতে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলেন, আজ সেই উক্তিরই সত্যতা প্রতিপন্ন করিবার পথে যে সকল আয়োজন চলিয়াছে তাহার প্রতিবাদ না করিয়াও তাঁহারা কিরূপে স্থির আছেন? যে চারুকলা বা আর্ট স্পষ্টই বিজ্ঞাপনের সাহায্যে সাধারণকে লালসার কীট হইবার জন্য আহ্বান করে, যে রঙ্গালয়ের বিজ্ঞাপন দিবার জন্য বিদেশীয়দের উক্ত উক্তি অপেক্ষাও হীন ভাষা ও ভাব ব্যবহার করিতে হয়—সেই দেশবিধ্বংসী রঙ্গালয়ের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ না করিয়া শিষ্টসমাজসেবিত সংবাদপত্রসমূহ কিরূপে মৌন অবলম্বন করিয়া আছেন, বুঝি না। সংবাদপত্রসম্পাদকগণ নাট্যশালা সম্বন্ধে এতটা নির্ব্বাক কেন? তাঁহারা কি রঙ্গালয়ের নিয়মিত ভক্তগণের অধিকাংশের অবনতি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়াও নাট্যশালার অপকারিতা বুঝিতেছেন না, অথবা রঙ্গালয়সমূহ হইতে বিনা মূল্যে প্রবেশপত্র (pass) পাইয়া অভিনয় দর্শনের ক্ষণস্থায়ী সুখের লোভে দেশের এত বড় অমঙ্গল কার্য্যের বিরুদ্ধে সামান্যমাত্রও আপত্তি করিতে সাহস করিতেছেন না? অথবা 'বড়' 'বড়' লোক ইহার পৃষ্ঠপোষক বলিয়া ভয়ে সত্য সমালোচনা করেন না? যদি ইহারা সেই ভয়েই সমালোচনা না করেন তবে বলিতে হইবে যে, এ দেশের উদ্ধারের আশা এখনও বহু দূরে। যে দেশের সম্পাদকগণের লোকমতগঠনের সাহস নাই—যে দেশের সম্পাদকগণ অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে ভয় পান—যে দেশের সম্পাদকগণ 'গ্রাহক কমিয়া যাইলে অর্থহানি হইবে' এই ভয়ে সত্য কথা বলিতে সাহস করেন না, সেই অর্থলিপ্সু দেশে স্বরাজের চীৎকার বৃথা। অর্থলাভ হইলেই যদি অন্যায় কার্য্যেও উৎসাহ দেওয়া বা তাহার বিরুদ্ধে না দাঁড়ান দোষের না হয়, তবে মীরজাফর প্রভৃতি আর কি দোষ করিয়াছেন? তাঁহারাও ত অর্থপ্রাপ্তির আশাতেই অন্যায় কার্য্যে উৎসাহ দিয়াছিলেন—অর্থলোভেই ত তাঁহারা জানিয়া শুনিয়াও অন্যায়ের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন নাই। আমরা আজ এই সকল

সম্পাদককে ডাকিয়া বলিতেছি, মীরজাফর আদির পন্থা পরিত্যাগ করুন, অর্থলোভে দেশের সর্বনাশ ডাকিয়া আনিবেন না। ক্ষণস্থায়ী অর্থের লোভে তাঁহারা যদি দেশের এই মহা অনিষ্টের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে ইতস্ততঃ করেন তবে তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, তাঁহাদের এই ইতস্ততঃ করার ফল কেবল যে দেশ ভোগ করিবে তাহা নহে—দেশের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাদের সন্তানসন্ততিকেও উহা ভোগ করিতে হইবে। দেশকে পরাধীন করিতে সাহায্য করায় মীরজাফর আদির সন্তানসন্ততি যে সেই পরাধীনতার দুঃখ কষ্ট হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে তাহা নহে—দেশের আর সকলের সহিত তাহাদিগকেও সমান ভাবেই পরাধীনতা পাপের ক্লেশ ভোগ করিতে হইতেছে। মনে রাখিবেন, অর্থলিপ্সু হইয়া আজ দেশের দুর্নীতির তালে তাল দিলেও ইহার পরিণাম ভীষণ হইবে। আজ দেশ বিলাসমোহে অচেতন হইয়া বুঝিতে পারিতেছে না কোন্ পথে চলিয়াছে। কিন্তু কাল যখন মোহ কাটিয়া যাইবে—যখন জ্ঞান ফিরিয়া আসিবে—তখন যাহারা জানিয়া শুনিয়াও তাহাকে অবনতির পথে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছিল তাহাদের সে কিছুতেই ক্ষমা করিবে না—তাহা নিঃসন্দেহ। ফরাশীবিপ্লবের সময়ে যাহারা উন্নতির ছদ্মবেশে দেশকে অবনতিতে লইয়া যাইতেছিল, তাহাদের নামে বিপ্লবের মোহে মুগ্ধ ফরাশীগণ মাতিয়া উঠিত। কিন্তু যখন মোহ কাটিয়া যাইল—চেতনা ফিরিয়া আসিল, তখন রোব্‌স্পীয়র প্রমুখ সেই সকল ব্যক্তিকেই, দেশকে অবনতির পথে লইয়া যাওয়ার দোষে, হত্যা করিবার জন্য ফরাশী জনসাধারণ উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সেই জন্যই আমরা সকল মান্য গণ্য লোককে আহ্বান করিয়া বলিতেছি, জানিয়া শুনিয়া ও ক্ষণস্থায়ী অর্থের বা যশের বা সুখের লোভে দেশের দুর্নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে ভয় পাইয়া, অধর্ম্মকে ডাকিয়া আনিবেন না। এখন কিছু দিন অধর্ম্মের ফলে সুখ অর্থমানযশলাভ হইলেও ইহার পরিণাম ভীষণ। সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন—

অধর্ম্মেণৈধতে তাবত্ততো ভদ্রাণি পশ্যতি
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি ॥

অধর্ম্মের দ্বারা আপাততঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও কুশল লাভ করে, এবং শত্রুগণকে জয় করে, কিন্তু শেষে সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ, ১৮৪৮ শক।

ব্রাহ্মসমাজ

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে,

বিগত ১৯ শে জুন ঢাকা নগরীতে বাবু কুঞ্জবিহারী গুহ পত্নী ও সন্তানদিগকে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় রাখিয়া পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি বহু দিন যাবতই রোগে ভুগিতেছিলেন।

বিগত ৪ঠা জুলাই কলিকাতা নগরীতে পরলোকগত বাবু ব্রজেন্দ্রকিশোর বিশ্বাসের দ্বিতীয়া কন্যা কনকলতা বিশ্বাস দীর্ঘকাল ক্ষয় রোগে ভুগিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন।

বিগত ৫ই জুলাই গৌহাটী নগরীতে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর পিতা পরলোকগমন করিয়াছেন। বিগত ১৫ই জুলাই কলিকাতা নগরীতে সতীশ বাবু ও তাঁহার ভ্রাতাগণ পিতার আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য এবং সতীশ বাবু জীবনী পাঠ ও প্রার্থনা করেন। পুত্রগণ গৌহাটী কলেজে স্মৃতি ভাণ্ডারের জন্য ২৫০৲ ও নানা প্রতিষ্ঠানে ১৫০৲ দান করিয়াছেন।

বিগত ৮ই জুলাই কলিকাতা নগরীতে ডাক্তার পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের উপযুক্ত পুত্র কল্যাণকুমার চট্টোপাধ্যায় অল্প কয়েক দিনের টাইফয়েড জ্বরে পরলোকগমন করিয়াছেন। ডাক্তার চাটার্জ্জির উপর উপর্য্যুপরি এত শোকের আঘাত কেন পতিত হইতেছে, মঙ্গলময় বিধাতাই জানেন।

বিগত ১৪ই জুলাই কলিকাতা নগরীতে পরলোকগত জ্যোতিরিন্দ্র প্রসাদ মিত্রের তৃতীয়া কন্যা শোভনা ক্রুপ্‌সি রোগে পরলোক গমন করিয়াছেন।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চির শান্তিতে রাখুন ও আত্মীয় স্বজনদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

ছাত্রীদের কৃতিত্ব—বিগত বি, টি, এল্ টি, ও প্রথম এম্ বি পরীক্ষায় নিম্নলিখিত ছাত্রীগণ উত্তীর্ণ হইয়াছেন দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইলাম :—

বি, টি,—লাবণ্যপ্রভা বসু, উষালতা বিশ্বাস, লীলা বসু, মুক্তাপ্রভা বসু, কনকলতা চাটার্জ্জি, পরিমল দাস, অমিয়বালা দাসগুপ্ত, প্রভাসনলিনী দাসগুপ্ত, সরস্বতী এড্‌কী, ট্রীলসিবন ফ্রাঙ্কলীন, সুষমা গুপ্ত, ডরোথী নীহারবালা হাঁসদা, লীলিয়ান মিত্র, বিনোদিনী সারঙ্গী। এল্ টি—ডরোথী ক্লেইটন, এগ্নিস পুবোল, এনা সুইনী (পারদর্শিতার সহিত); মার্জ্জরী এম্ খাঁ, ক্যাথলীন পার্টন, মেরী সালদান। প্রথম এম্ বি—মৈত্রেয়ী বসু।

বিলাত যাত্রা—গত ১২ই এপ্রেল শ্রীযুক্ত হরদত্ত সিংহের পুত্র শ্রীমান কুন্দনলাল ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার জন্য জর্ম্মাণী যাত্রা করেছেন। এই উপলক্ষে তাঁহার গৃহে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত হরিপদ ত্রিবেদী আচার্য্যের কার্য্য করেন। তদুপলক্ষে হরদত্ত বাবু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার ফণ্ডে ১৲ টাকা এবং ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচার ভাণ্ডারে ॥০ আনা দান করিয়াছেন। মঙ্গলময় বিধাতা যুবকের কল্যাণ করুন।

নূতন বি, টি—শ্রীযুক্ত মুকুন্দকৃষ্ণ বাগচী বিগত বি, টি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম।

পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ—বিগত ৮ই মে পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন হয়; মিঃ আর কে দাস, সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বর্ত্তমান বৎসরের জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য মনোনীত হইয়াছেন :—

(১) শ্রীযুক্ত মথুরানাথ গুহ (২) শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র নাগ, বি এ (৩) ডাক্তার নেপালচন্দ্র রায়, এল্ এম্ এস্ (৪) ডাক্তার সুরেশ চন্দ্র গুপ্ত এল্ এম্ এস্ (৫) শ্রীযুক্ত বঙ্কবিহারী কর (৬) শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র বসু, এম্ এ, বি এল (৭) শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সমাজের কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছেন :—

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন সম্পাদক, শ্রীযুক্ত বঙ্কবিহারী কর ও শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র বসু সহকারী সম্পাদক, মিঃ আর কে দাস, রামমোহন রায় লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ। শ্রীযুক্ত নবকুমার সমাদ্দার হিসাব-পরীক্ষক।

বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ—সম্পাদক শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দাস লিখিতেছেন :—

"আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ প্রচারক শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বিদেশস্থ বন্ধুগণের অবগতির জন্য অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, তিনি গিরিডি হইতে প্রত্যাগমনের পর হইতে নানা প্রকার উৎকট ব্যাধিতে শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছেন এবং তাঁহার এইরূপ অবস্থায় আমাদের সকলেরই চিন্তার কারণ হইয়াছে। মঙ্গলময় ঈশ্বর তাঁহাকে সত্বর আরোগ্য দান করুন।"

ধুবড়ী ব্রাহ্মসমাজ—গত ২০শে মে, গৌরীপুর (আসাম) নগরীতে চট্টগ্রাম নিবাসী বাবু কালীমোহন চৌধুরীর পুত্র শ্রীমান্ পঙ্কজকুমারের সঙ্গে গৌরীপুর নিবাসী Mr. J. R. Melhouseএর প্রথমা কন্যা শ্রীমতী যুথিকা মেলহাউসের শুভ বিবাহ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় আচার্য্যের

কার্য্য করেন। মনোরঞ্জন বাবু ধুবড়ীতেও একটী বক্তৃতা দেন। বিষয়—সত্য ও মিথ্যা।

রাঁচি শান্তিধাম—শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দাস গুপ্ত লিখিয়াছেন:—

পরলোকগত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত রাঁচি মোরাবাদী পাহাড়ের শিখরদেশস্থিত ব্রহ্মমন্দিরে ভজন সাধনের জন্য সাধনার্থী ব্যক্তিগণের জন্য কতিপয় "সিট" গঠিত করা হইয়াছে। যাঁহারা সাধনার্থী রূপে আসিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দাস গুপ্তের নিকট পত্র লিখিলে সমস্ত সংবাদ জানিতে পারিবেন।

আন্দুল ব্রাহ্মসমাজ—গত ১৬ই জ্যৈষ্ঠ ব্রাহ্ম সমাজের বার্ষিক অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সংক্ষিপ্ত প্রার্থনান্তে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মল্লিক বার্ষিক রিপোর্ট পাঠ করেন। সভাতে নিম্নলিখিত সভ্যগণ কার্য্যকারী সভার সভ্য ও কর্ম্মচারী নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—

(১) শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র বি এ,—সভাপতি (২) শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু বি এ, (৩) শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—সম্পাদক, (৪) শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মল্লিক (৫) শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (৬) শ্রীযুক্ত ফুটবিহারী চট্টোপাধ্যায় (৭) শ্রীযুক্ত নলিন বিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ,—সহকারী সম্পাদক (৮) শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এবং নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ট্রাষ্টী নিযুক্ত হইয়াছেন:—

(১) শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র বি এ, (২) শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য এম্ এ, এম্ বি, (৩) শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু বি এ, (৪) শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মিত্র বি এ, (৫) শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (৬) শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মল্লিক (৭) শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

উল্টাডাঙ্গা ব্রহ্ম মন্দির নির্ম্মাণ ভাণ্ডার—সম্পাদক কৃতজ্ঞ হৃদয়ে নিম্নলিখিত দানপ্রাপ্তি স্বীকার করিতেছেন:—

শ্রীসুবিনয় রায় ৫৲ শ্রীশশাঙ্কনারায়ণ দাস গুপ্ত (২য় ও ৩য়) ৭৲, শ্রীসৌরিন্দ্রনাথ দত্ত ২॥০ শ্রীনলিনীকান্ত রায় চৌধুরী ৫৲ শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চৌধুরী ২৲ শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ হালদার ১৲ ডাঃ শৈলেন্দ্রনাথ গুপ্ত ৫৲ শ্রীস্মৃতিকণ্ঠ মল্লিক ২য় ২৲ শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত ২৲ শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু ৫৲, শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ ৫৲ শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ৫৲ শ্রীশ্রুতীশ ও সুধীশচন্দ্র বসু মাতৃশ্রাদ্ধে ২৲ শ্রীঅন্নদাচরণ সেন ১ম ও ২য় ৪৲ শ্রীসুবোধচন্দ্র রায় ১০৲ শ্রীঅমূল্যচরণ দাস ১৲ শ্রীঅনুপচাঁদ দে ৫৲ শ্রীগোবিন্দনারায়ণ সিংহ (শ্রীহট্ট) ১৲ শ্রীঅশ্বিনীকুমার রুদ্র (বাঁকিপুর) ১৲ শ্রীইন্দ্র নারায়ণ দাস (কাঁথি) ১৲ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস (ঢাকা) ১৲ শ্রীগোবিন্দচন্দ্র সেন (দিনাজপুর) ১৲ শ্রীনিবারণচন্দ্র রায় ৫৲ শ্রীরমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (২য়) ৫৲ বন্ধু ৩৪৵০ মোট—১১৭॥৵০

১৯২৫ সালের হিসাব

জমা— গত বৎসরের মজুত ০ এককালীন দান ১৷৭॥৵০ শ্রীআশুতোষ সেন ৪০৲ (কানাইলাল সেনের ঋণ) নানাবিধ ২০৲ হাওলাত ৫৭৸৶০ মোট জমা ২৩৫॥৶০

খরচ—ইট (৺কানাইলাল সেনের ঋণ) ৮০৲ টালি ২৭৲ চুণ, সুরকি ইত্যাদি ৭৭৲ মজুরি ৬৮৶০ নানাবিধ ৮৵০ মোট ২৩০॥৶০ হাতে মজুত ৫৲ ২৩৫॥৶০

পূর্ব্বেকার ঋণ (১৮৮৵৫ এবং বাকী বিলের টাকা (৪৩৲) ধরিলে মোট ঋণ ২৮৭৶৫ হয়। উক্ত ঋণ পরিশোধের জন্য এবং প্রতিষ্ঠাতার সমাধি-মন্দির ও অন্যান্য কাজের জন্য সহৃদয় ব্যক্তিগণ যৎকিঞ্চিৎ দান করিলে সম্পাদক বাধিত হইবেন।

প্রাপ্তি স্বীকার—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ১৯২৬ সনের ১লা হইতে ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত দানপ্রাপ্তি কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছেন—শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র খেম্না উৎসব ফণ্ডে ৫৲; শ্রীযুক্ত সুধীশচন্দ্র বসু ও শ্রীযুক্ত শ্রুতীশচন্দ্র বসু পিতার আদ্য শ্রাদ্ধে সাধারণ ফণ্ডে ৩৲, প্রচারে ৫৲, দাতব্য বিভাগে ২৲, শিবনাথ স্মৃতিফণ্ডে ৩৲, ও সাধনাশ্রমে ৩৲; লেডি বি, কে, বসু উৎসব ফণ্ডে ১০৲; মিঃ ও মিসেস্ এইচ্, সি, মৈত্রেয় নবদ্বীপ স্মৃতিফণ্ডে ১৫৲; শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ দেব মাতুলানীর মৃত্যু উপলক্ষে শিবনাথ স্মৃতিফণ্ডে ১০৲, নবদ্বীপ স্মৃতিফণ্ডে ৫৲, দাতব্য বিভাগে ২৲, সাধনাশ্রমে ২৲, মন্দির মেরামত ২৲, ঢাকা অনাথ পরিবার ফণ্ডে ২৲, ও ঢাকা বিধবাশ্রমে ২৲; শ্রীযুক্ত সাতকড়ি দেব মাতামহীর শ্রাদ্ধে প্রচারে ২৲ ও উৎসব ফণ্ডে ২৲; মিসেস্ সুবালা ঘোষ পতির বার্ষিক শ্রাদ্ধে প্রচারে ২৲; মিসেস প্রফুল্লকুমারী সরকার প্রচারে ৪৲, শ্রীযুক্ত রাজারাম মল্লিক সাধারণ ফণ্ডে ২৲, মিসেস্ সুকৃতি চৌধুরী পিসীর বার্ষিক শ্রাদ্ধে প্রচারে ১৲, ও সাধনাশ্রমে ১৲; শ্রীযুক্ত এম্, আর, চন্দ্র পিতৃশ্রাদ্ধে সাধারণ ফণ্ডে ৫৲; মিস্ পুণ্যপ্রভা দাস পিতৃশ্রাদ্ধে সাধারণ ফণ্ডে ৫৲, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু সাধারণ ফণ্ডে ১৲, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল সরকার মাতার বার্ষিক শ্রাদ্ধে প্রচারে ১৲ ও সাধনাশ্রমে ১৲, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধে প্রচারে ৫৲, শ্রীযুক্ত ডি, জি, বৈদ্য নবদ্বীপ স্মৃতিফণ্ডে ৫৲, শ্রীযুক্ত অবনীনাথ গুপ্ত মাতার আদ্যশ্রাদ্ধে প্রচারে ৫৲, শ্রীযুক্ত দেবব্রত মল্লিক পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধে প্রচারে ৫৲ ও বাণীবন ব্রাহ্ম সমাজে ৫৲, শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার লাহিড়ী পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধে প্রচারে ৫৲ ও সাধনাশ্রমে ৫৲, মিসেস্ শশিপ্রভা গুপ্ত কন্যার বিবাহে প্রচারে ১৫৲, নবদ্বীপ স্মৃতিফণ্ডে ২৫৲, মন্দির মেরামত ২০৲, ও ঢাকা অনাথ পরিবার ফণ্ডে ২৫৲; মিসেস্ ক্ষীরোদবাসিনী মিত্র মহিলাদের নবদ্বীপ স্মৃতি ফণ্ডে ২১৲, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ দত্ত বিবাহ উপলক্ষে সাধারণ ফণ্ডে ৫৲, শ্রীযুক্ত ই, সুব্ব কৃষ্ণায়া আলেপী ব্রাহ্মসমাজের জন্য ৬০৲, শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ সরকার মাতার আদ্যশ্রাদ্ধে প্রচারে ৫৲ ও সাধনাশ্রমে ৫৲; শ্রীমতী স্নেহপ্রভা নিয়োগী ও শ্রীমতী বাসন্তী সরকার আত্মীয়ের বার্ষিক শ্রাদ্ধে প্রচারে ৫৲ ও দাতব্য বিভাগে ৩৲।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

ঈশ্বরের স্বরূপতত্ত্ব ও প্রার্থনা—জেলা খুলনা, পোঃ আঃ ছুঙ্গ বরিয়ায় অন্তর্গত আম্রতলা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য ১৲ টাকা। আমরা ইহা পাঠ করিয়া সুখী হইয়াছি; অনেকেই ইহা পাঠে উপকার লাভ করিবেন। অনেক বিষয়ই কিছু বাহুল্য ভাবে লিখিত হইয়াছে; আরও একটু সংযত ও সংহত হইলে ভাল হইত। স্থানে স্থানে ভাষা ও তথ্য সম্বন্ধে কিছু কিছু ত্রুটি পরিলক্ষিত হইল। অনুসন্ধান না করিয়া কোনও শ্রুত কথা প্রকাশ করা নিরাপদ নহে। স্থানে স্থানে যে সকল অবান্তর বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা পরিত্যাগ করিলে পুস্তকের সৌন্দর্য্য আরও বর্দ্ধিত হইত। যাহা হউক, আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় দ্বারা ৩১শে আষাঢ় মুদ্রিত ও প্রকাশিত। —শ্রীবরদাকান্ত বসু বি এ, সম্পাদক

Registered NO 65

অসতো মা সদগময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৬ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৪৯ম ভাগ।	১৬ই শ্রাবণ, রবিবার, ১৩৩৩, ১৮৪৮ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯৭	প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০
৮ম সংখ্যা।	1st August, 1926.	অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

বিশ্বাস !

প্রকৃত বিশ্বাসী জন, অক্ষয় অমৃত ধন,
প্রাপ্ত হয় বিশ্বাসের বলে ;
টলে না সে এক পদ, আসুক [illegible]
নিমেষে বিনাশে রিপুদলে।
সুবিশাল হিমাচল, অগাধ জলধি-জল,
রোধিতে না পারে তার গতি ;
বিশ্বাসে করিয়া ভর, হয় পথে অগ্রসর,
বীর-দাপে কাঁপে বসুমতী !
নাহিক সংশয় লেশ, নাহি কোন ছদ্ম বেশ,
সরল শিশুর মত ভাব ;
ধরমেতে দৃঢ় মতি, নির্ভীক তেজস্বী অতি,
ফুল সম নির্ম্মল স্বভাব।
জীবন্ত বিশ্বাস যার, কি ভয় ভাবনা তার,
অতুল সম্পদ্ অধিকারী ;
ধনী সে পরম ধনে, (তুচ্ছ রাজসিংহাসনে),
ব্রহ্মতরু-মূলে যার বাড়ী।
দেও সে বিশ্বাস মোরে, রেখো না সংশয় ঘোরে,
প্রেম-ডোরে বেঁধে রাখো পায় ;
আর কিছু নাহি চাই, যেন গো তোমারে পাই,
চিরদাস এই ভিক্ষা চায়।

শ্রী চন্দ্রনাথ দাস

হে জীবনের অদ্বিতীয় প্রভু, তুমিই তোমার অসীম প্রেমে, বিঘ্নসঙ্কুল অন্ধকারময় জীবনপথে আমাদের চির সহায় হইয়া, আমাদিগকে নিয়ত লইয়া চলিয়াছ। নানা সংশয় সন্দেহের অন্ধকারের মধ্যে, তুমি পথপ্রদর্শক হইয়া আলোক না দেখাইলে, আমরা বিভ্রান্ত হইয়া বিপথে চলিয়া যাইতাম। অশেষ বিঘ্ন বাধা সংগ্রামের মধ্যে তুমি আশ্বাসবাণী না শুনাইলে, আমরা [illegible] করিয়া, অবসন্ন প্রাণে মৃতের ন্যায় পড়িয়া থাকিতাম। তুমি যে কেবল স্বয়ং প্রতি হৃদয়ে এই ভাবে কার্য্য করিতেছ, তাহা নহে। তোমারই মঙ্গল ব্যবস্থাতে অপর সকলকেও আমাদের সাহায্যে নিযুক্ত করিয়াছ— যখন স্পষ্ট ভাবে তোমাকে বন্ধু ও সহায় রূপে দেখিতে না পাই, তখনও তাহাদের সায় ও আশ্বাস প্রাপ্ত হইয়া, আমরা অনেক সময় নিশ্চিন্ত প্রাণে জীবনপথে চলিতে সমর্থ হই। পরস্পরের নিকট হইতে এরূপ সায় ও সহায়তা না পাইলে, আশ্বাস ও উৎসাহবাক্য না শুনিলে, আমাদিগকে যে সময় সময় মহা সন্দেহ ও সংশয়ের মধ্যে পতিত ও বিমূঢ়চিত্ত হইতে হয়, তাহা নিবারণ করিবার জন্যই তোমার এই ব্যবস্থা। মঙ্গলবিধাতা তুমি, সর্ব্বদাই আমাদিগকে নানা ভাবে তোমার কল্যাণের পথে অগ্রসর করিতে নিযুক্ত রহিয়াছ। তবুও আমরা মাঝে মাঝে তোমার ব্যবস্থাকে অগ্রাহ্য করিয়া মোহবশতঃ মিথ্যা ও অকল্যাণের পথে যাইয়া পড়ি। হে করুণাময় পিতা, তুমি আমাদিগকে সকল ভুল ভ্রান্তি খেয়াল পরিত্যাগ করিয়া, একমাত্র তোমারই আলোকে ও আদেশে চলিতে সমর্থ কর। আমরা যেন আর বিভ্রান্ত হইয়া বিপথে ঘুরিয়া না বেড়াই। তোমার মঙ্গল ইচ্ছাই আমাদের জীবনে জয়যুক্ত হউক। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

নিবেদন।

দাসের নিবেদন।

দশের দেশের কাছে প্রভু!
তব বাণী—মোর নিবেদন—
জানাইতে করেছি কি কভু
আলস্য বা ঔদাস্য কথন?
রসনায় দিলে কত কথা,
কণ্ঠে দিলে কত শত গান,
উৎসাহ উদ্যম আশাভরে,
পূর্ণ করি' দিয়েছিলে প্রাণ!
এ সম্পদ্ সহজে লভিয়া,
ভাবি নাই অলিক স্বপন।
অথবা এ জড় জগতের—
তুচ্ছ ধূলি—নশ্বর সে ধন!
আমি ত বিহ্বল প্রীতি ল'য়ে,
প্রসারিত করিয়া পরাণ,
মানিলাম, বরিলাম সে-বে,
জেনে তব গৌরবের দান!
আজিও সেবায় কত আশা
জাগাইয়া রেখেছে হৃদয়!
তবে কেন সহসা আজ ঘরে
বসাইলে? এই কি সময়?
অভিযোগ কি আছে আমার?
আমি ক্ষুদ্র তুচ্ছ দাস তব।
শিক্ষা দিবে রোগের শয্যায়,
বুঝি বা পথের ধৈর্য্য নব!

শ্রী মনোমোহন চক্রবর্ত্তী

আঁধার রজনী—রজনী অন্ধকার—অমাবস্যার নিশি—উপরে ঘনঘটা; তরণী বাহিয়া চলেছি,—বিদ্যুৎ-আলোকে সময় সময় পথ দেখা যায়। সকলে সাবধান কচ্ছে, আজ যেও না, বড় বিপদ্; জলমগ্ন কত শৈল আছে; তবুও তরণী বাহিয়া চলেছি,—ঐ বিদ্যুতের চমকই আমার সহায়। যদি হাল ছিঁড়ে যায়, যদি নৌকা স্রোতের টানে অজানা দেশে ভেসে যায়, গভীর সমুদ্রে যেয়ে যদি পড়ি, যদি গুপ্ত শৈলে আঘাত পেয়ে ছিদ্র হয়, যদি তরঙ্গের আঘাতে ভেঙ্গে যায়,—অনেক বিপদ আছে—তবুও আমি চলিব। ঐ দূরে সুদূরে, অতি দূরে আশার আলোক-রেখা—কে যেন ডাক্‌ছে, কে যেন গান গাইছে—আমি আর স্থির থাক্‌তে পারি না। প্রভুর নাম নিয়ে তরণী ছেড়ে দিয়েছি; যদি তরণী ডোবে, যদি এ জীবন পাত হয়, তবুও আমার সৌভাগ্য, তবুও তাঁর নামে আমি ঐ আলোক-রাজ্যের পথে চল্‌ব। এ আঁধার রজনীর কি অবসান হবে না? এ দীর্ঘ পথ কি কমে' আস্‌বে না? এ ঝড় ঝঞ্ঝাবাত কি থাম্‌বে না? নব সূর্য্যের কিরণরেখাপাত কি হবে না? তা তিনি জানেন; তাঁর ডাক শুনে', তাঁর নাম নিয়ে, আমি যেয়ে চল্‌লাম।

তোমাকে নমস্কার—হে প্রভু, জীবনের প্রাতে ও সন্ধ্যায় তোমাকে নমস্কার; জীবনের আলোকে ও আঁধারে তোমাকে নমস্কার; সুখে ও দুঃখে, আশায় ও নিরাশায়, উত্থানে ও পতনে, হে প্রভু, তোমাকে নমস্কার। যখন উৎসবানন্দে মাতিব তখন তোমাকে নমস্কার, যখন শোক তাপে দগ্ধ হইব, তখনও তোমাকে নমস্কার। যখন প্রিয়জনের মিলনসম্ভাষণে আনন্দ সম্ভোগ করিব তখনও তোমাকে নমস্কার, আবার যখন প্রিয়জনের বিচ্ছেদ বেদনা উপেক্ষা ও অনাদরের যন্ত্রণা অনুভব করিব, তখনও তোমাকে নমস্কার। যখন অনুকূল বায়ুতে অনুকূল স্রোতে জীবন-তরণী আনন্দের গান গাহিতে গাহিতে সুখে বাহিয়া চলিব, তখনও তোমাকে নমস্কার; আবার যখন গভীর অমানিশাতে ঝড় ঝঞ্ঝাবাতের তাণ্ডব নৃত্যের মধ্যে বিপদসঙ্কুল পথে উত্তাল তরঙ্গ-বিক্ষোভিত সমুদ্র মধ্যে ক্ষুদ্র তরণী ভয়ে ভয়ে বাহিয়া যাইব, তখনও তোমাকে নমস্কার। জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে, প্রতি কর্ম্মে, প্রতি মননে তোমাকে নমস্কার। এ জীবনই তোমার চরণে প্রণতি—আমার বাক্য, মনন, কার্য্য, চিন্তা, সবই তোমার ধ্যান, তোমার আরাধনা, তোমার নমস্কার।

ফেলে' যেও না—তোমাদের সঙ্গেই আমি চলেছি; আমি ক্ষুদ্র ব'লে, দুর্ব্বল ব'লে, তোমরা আমাকে তুচ্ছ কর! তবুও তোমাদের আমি শ্রদ্ধা করি, তোমাদের সঙ্গেই চলেছি। আমাকে তোমরা ফেলে' যেও না—আমার কোনও দল নাই, আমার কেহ সঙ্গে নাই,—আপনার মনে আমি চলি, আপনার মনে আমি গান গাই; যে ডাকে তার কাছে যাই; যে অবজ্ঞা করে, তার কাছেও যাই। তোমরা যে লক্ষ্যপথে চলেছ, আমিও সেই লক্ষ্য ধ'রে চলেছি। তোমাদের সঙ্গে সকল বিষয়ে আমার মিল হয় না, তোমাদের কোনও সাহায্য কর্‌তে আমি পারি না, তবুও চলেছি—আমাকে তুচ্ছ কর, আপত্তি নাই; তোমাদের প্রতি আমার রাগ নাই। কিন্তু ফেলে' যেও না। আমি দূরে দূরে থাকি, ভয়ে ভয়ে চলি; তবুও একটি আলোক-রেখা দেখেছি; একটি বাণী শুনেছি; তা-ই অনুসরণ ক'রে চলি। তোমাদের তা বুঝাতে পারি না। কি কর্‌ব? এক দিন হয়ত বুঝ্‌বে; আজ আমাকে তোমরা ফেলে' যেও না।

সম্পাদকীয়

সাক্ষ্য ও আত্মপ্রত্যয়ী—মানুষকে আপনার আলোক ও শক্তির উপর নির্ভর করিয়াই জীবনপথে চলিতে হয় এবং যাহাতে সে প্রকৃত কল্যাণের পথ চিনিয়া, সকল বাধা বিঘ্নের মধ্যে

অটল থাকিয়া, নিয়ত নির্ভীক ভাবে কল্যাণের দিকে অগ্রসর হইতে পারে, জীবনবিধাতা তাহাকে সে জ্ঞান ও বল প্রদান করিয়াছেন—আপনার উপর বিশ্বাস এবং নির্ভরও দিয়াছেন। কিন্তু নানা অবস্থা ও ঘটনার মধ্যে, বিবিধ প্রকার বাধা বিঘ্ন ও সংগ্রামের ভিতর, সময় সময় সে আলোক অন্ধকারে আবৃত হয়, হৃদয়ের বল হ্রাস প্রাপ্ত হয়, আপনার উপর সে বিশ্বাস ও নির্ভর চলিয়া যায়, সন্দেহ সংশয়ে দোলায়মান ও নিরাশায় ম্রিয়মাণ হইয়া, সকল উন্নতির আশা পরিত্যাগ করিতে হয়—কখন কখন আবার মোহ বশতঃ বিভ্রান্ত ও বিপথে চালিত হইয়া অবনতি ও অকল্যাণের দিকে ধাবিত হইতে হয়। এরূপ অবস্থায় স্বভাবতঃই মানবহৃদয় অপরের নিকট হইতে সায় ও আশ্বাসবাণী পাইবার জন্য লালায়িত হয়, এবং তাহা পাইলে নিশ্চিন্ত নির্ভয় হইয়া নূতন উদ্যমে ও উৎসাহে জীবনপথে চলিতে সমর্থ হয়। আর যখন সত্য সত্যই ভুল ভ্রান্তি বশতঃ প্রকৃত পথ দেখিতে না পাইয়া বিপথে চলিবার আশঙ্কা উপস্থিত হয়, তখনও ইহা ব্যতীত আর কোনও উপায়েই প্রকৃত পথ নির্ণয় করা সম্ভবপর হয় না। ইহার প্রয়োজনীয়তা যে শুধু আমাদের ন্যায় সাধারণ জীবনেই অনুভূত হয়, তাহা নহে—অনেক উন্নত জীবনেও সময় সময় ইহার আবশ্যকতা দেখিতে পাওয়া যায়। সাধকদিগের জীবন আলোচনা করিলে আমরা ইহার বহু দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হইতে পারি। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনে যে এক সময়ে ইহার প্রয়োজনীয়তা অতি তীব্র ভাবেই অনুভূত হইয়াছিল, তাহা আমরা সকলেই বিশেষ ভাবে অবগত আছি। আমাদের অনেকের নিজ নিজ জীবনেও যে এরূপ অবস্থা কখনও না কখনও আসিয়াছে, একটু অনুসন্ধান করিলেই তাহা জানিতে পারি। যে সকল জীবনে ইহা ঘটে নাই, তাহার অধিকাংশ স্থলেই প্রকৃত জীবনের অভাবই, সংসারস্রোতে ভাসমান তৃণের ন্যায় মৃত জড়ীয় ভাবই, দৃষ্ট হইবে। সুতরাং এরূপ অবস্থা কোনও প্রকারেই কল্যাণকর বা বাঞ্ছনীয় নহে। তাই বলিয়া ভুলিলে চলিবে না যে, এই অবস্থা স্থায়ী ভাবে থাকাটা মোটেই স্বাভাবিক নহে, সম্পূর্ণ অস্বাভাবিকই,—রুগ্ন বিকৃত স্বভাবেরই পরিচায়ক। যে নিজের আলোক ও শক্তিকে, জ্ঞান ও বলকে, সর্ব্বদা সন্দেহের চক্ষেই দেখে, অপরের সায় ও সহায়তার জন্য, আশ্বাস ও উৎসাহের জন্য, নিয়ত ব্যস্ত,—সে কখনও জীবনপথে অগ্রসর হইতে পারে না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সাধারণতঃ আপনার উপর আস্থা ও নির্ভর থাকাই স্বাভাবিক, না থাকাই অস্বাভাবিক। সে যাহা হউক, সময় বিশেষে যখন স্বাভাবিক ভাবেই সন্দেহ ও অবিশ্বাস আসে, তখন বিশ্ব-বিধানে যে তাহা দূর করিবার প্রাকৃতিক ব্যবস্থা না থাকিলে চলে না, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এ বিষয়ে দুই প্রকার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়—কখনও অন্তরের মধ্যে সাক্ষাৎ ভাবে জীবন-দেবতার নিকট হইতে আলোক ও বল আসে, তাঁহার সায় ও আশ্বাসবাণী পাওয়া যায়, আবার কখনও বা তাহার পরিবর্ত্তে অপরের মধ্য দিয়াই সে সাহায্য আসে। ধর্ম্মজীবনের ইতিহাসে উভয় প্রকার ঘটনাই যথেষ্ট দেখা যায়। ইহার মধ্যে প্রথম প্রকারের ঘটনা নিশ্চয়ই অপেক্ষাকৃত বিরল। কিন্তু তাহা হইলেও তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। এ বিষয়ে লোকে অনেক সময় অনেক ভুল করিয়াছে, স্বীকার করি—কেহ কেহ প্রবঞ্চিত হইয়াছে, আবার অপর কেহ হয়ত লোককে প্রবঞ্চনাও করিয়াছে সত্য,—তথাপি নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণিত, সত্যে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত এত ঘটনা রহিয়াছে যে, সে প্রমাণ অগ্রাহ্য করিবার কোনও উপায়ই নাই। তাহার বিস্তারিত আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। সে সৌভাগ্য সকলের পক্ষে সকল সময় ঘটে না, আর ঘটিলেও সে সম্বন্ধে আমাদের অল্পই করণীয় আছে। অবশ্য, আকুল প্রার্থনা লইয়া তাঁহার দ্বারে প্রতীক্ষা করিলে অনেক সময়ই সুফল পাওয়া যায়। কিন্তু উহা সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মকৃপার উপরই নির্ভর করে। ঘোর অন্ধকারের মধ্যে যখন আমরা কোনও রূপেই পথ খুঁজিয়া পাই না, একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়ি, তখন অনেক সময় এই ভাবে তাঁহার কৃপা অবতীর্ণ হয়। কিন্তু সকল সময়ে সকলের জীবনে তাহা ঘটেও না। কেন তাহা ঘটে না, কোন সূক্ষ্ম নিয়মে তিনি কার্য্য করেন, আমরা কিছুই জানি না। কিন্তু এই ভাবে কার্য্য না করিলেই যে তাঁহার কৃপার অভাব হইল, তিনি উদাসীন ভাবে আমাদিগকে মহা দুর্গতির মধ্যে পরিত্যাগ করিলেন, এরূপ মনে করিবার কোনও কারণ নাই। এরূপ অবস্থায় অনেক সময় বাহির হইতে আমরা যে সাহায্য প্রাপ্ত হই, অপরের নিকট হইতে যে সায় ও আশ্বাস পাই, তাহাতেও কি তাঁহারই কৃপা প্রকাশিত হয় না? সে ব্যবস্থা কি তাঁহারই কৃত নয়? বাস্তবিক একটু অনুসন্ধান করিলেই দেখিতে পাইব, ইহা আমাদের পরস্পরের উন্নতি ও কল্যাণের জন্য তাঁহার বিশ্ব-বিধানেরই একটি ব্যবস্থা। এরূপ সাহায্য পাইবার ব্যবস্থা আমাদের সকলের জন্যই রহিয়াছে—আমরা একটু ইচ্ছা ও চেষ্টা করিলে সহজেই পাইতে পারি; আবার অযাচিত ভাবেও আমাদের নিকট যে উপস্থিত না হয় এমনও নহে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যে পদ্মা নদীতে ঝড় তুফানের মধ্যে জনৈক মাঝির আশ্বাসবাণী শুনিয়া নির্ভয় হইয়াছিলেন, উপনিষদের ছিন্ন পত্র প্রাপ্ত হইয়া অন্তরে লব্ধ মহা সত্য সম্বন্ধে সায় পাইয়াছিলেন, নিঃসন্দেহ হইতে পারিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ অযাচিত ভাবেই তাঁহার নিকট আসিয়াছিল—উহা বাহিরের দৃষ্টিতে আকস্মিক বলিয়া অনুমিত হইলেও যে প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে, বিশ্ববিধাতার মঙ্গল ব্যবস্থারই অন্তর্গত, সে কথা বিশ্বাসী মাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু এই ব্যবস্থাটাকে শুধু এই পাওয়ার দিক দিয়া দেখিলেই যথেষ্ট হইল না। যদিও তাহাতে আমাদের বিশ্বাস কিছু পরিমাণে বর্দ্ধিত হইতে পারে, এবং অধিকাংশ সময় অযাচিত ভাবে পাইলেও আমাদের নিজ চেষ্টাদ্বারা সংগ্রহ করিবার একটা প্রয়োজনও রহিয়াছে, তথাপি এ সম্বন্ধে আমাদের করণীয় অল্পই আছে, এবং যাহা আছে তাহাও নিজ প্রয়োজনেই করিতে হয়। এই হেতু এ বিষয়ে অধিক আলোচনার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ইহার আর একটা দিক্ আছে, একটা কর্ত্তব্যের দিক্, একটা দেওয়ার ও করার দিক্ আছে। তাহার একটু আলোচনা নিতান্তই আবশ্যক বোধ করিতেছি এবং সেই উদ্দেশ্যেই এই বিষয়টার অবতারণা করিতেছি। নিজের জন্য সায় ও আশ্বাস পাওয়া যেমন আবশ্যক, অপরকে তাহা দেওয়াও যে আমাদের একটা তেমনি অবশ্যপালনীয় কল্যাণকর কর্ত্তব্য, তাহা লঙ্ঘন করিলে যে বিশ্ববিধাতার মঙ্গল

ব্যবস্থাকে অগ্রাহ্য করা হয় এবং নিজের ও অপরের অকল্যাণ সাধন করা হয়, সে কথা ভুলিলে চলিবে না,—তাহা আমাদিগকে বিশেষ ভাবেই স্মরণে রাখিতে হইবে। আমাদের ন্যায় প্রত্যেকের জীবনেই সন্দেহ সংশয়, নিরাশা অবিশ্বাস, নিরুৎসাহ নিরুদ্যম আসে, অনেকেই অন্ধকারের মধ্যে পথ নির্ণয় করিতে পারে না, সংগ্রামের মধ্যে আশা ও বল রাখিতে সমর্থ হয় না। তাহাদিগকে পথ দেখান, বা সংশয় সন্দেহ দূর করিয়া অবলম্বিত পথে সুদৃঢ় করা এবং নিরাশা নিরুদ্যমের মধ্যে তাহাদের হৃদয়ে আশা ও বল সঞ্চার করিয়া নির্ভীক ভাবে সংগ্রামে অগ্রসর হইতে সমর্থ করা, আমাদের একটি অতি গুরুতর সামাজিক কর্ত্তব্য। বিশেষ ভাবে ধর্ম্মসমাজের অন্তর্গত ব্যক্তিদিগের পক্ষে এই দায়িত্বটা যে কত বেশী, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আর ইহার পালনে যে শুধু অপরেরই কল্যাণ তাহাও নহে, ইহাদ্বারা আমাদেরও মহদুপকার সাধিত হয়, আমাদের ধর্ম্ম-জীবনকেও ইহা অনেক অগ্রসর করিয়া দেয়। বর্ত্তমানে সমাজস্থ অধিকাংশ লোক যেরূপ সংশয় সন্দেহে দোলায়মান, নানা দুঃখ বিষাদের সংগ্রামে অবসন্নপ্রাণ, শোকতাপের আঘাতে মূহ্যমান, আশা ও বিশ্বাস হারাইয়া ধূলিতে শয়ান, তাহাতে এ প্রকার সহায়তার কত প্রয়োজন, কত অভাব! কিন্তু চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলে কি দেখিতে পাই? নিজ নিজ জীবনের দিকে চক্ষু ফিরাইলে কি দেখা যায়? আমাদের মধ্যে সেরূপ সাহায্য করিবার লোক কি যথেষ্ট রহিয়াছে? আমরা কি উক্ত কর্ত্তব্য-পালনে সমর্থ? আমাদিগকে দুঃখের সহিত স্বীকার করিতেই হইবে, আমাদের ভিতর সেরূপ লোকের সংখ্যা যথেষ্ট নাই। যাঁহারা এক সময়ে এই মহা ব্রত পালন করিয়া গিয়াছেন, যাঁহাদের এ বিষয়ে বিশেষ উপযুক্ততা ছিল, তাঁহারা অনেকেই একে একে এ লোক হইতে চলিয়া গিয়াছেন। অল্প সংখ্যক যাঁহারা এখনও আছেন, তাঁহারাও আর পূর্ব্বের ন্যায় সমাজের সেবা করিতে সমর্থ নহেন। অথচ সমাজের অভাব পূর্ব্বাপেক্ষা কত বাড়িয়াছে! ঘরে ঘরে কি দারুণ শোকের আগুন জ্বলিয়াছে! সে অনল নির্ব্বাপিত করিয়া কে তাহাদিগকে সত্য সান্ত্বনা দিতে পারে? শোকের অতীত রাজ্যে লইয়া যাইতে পারে? সে রাজ্যের কথা সত্য ভাবে বলিয়া আশ্বস্ত করিতে পারে, এরূপ লোক কয় জন আছে? বাজে কথা বলিবার লোক যথেষ্ট থাকিতে পারে, কিন্তু যোবের (Job) অভিজ্ঞতা লইয়া গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে যে বলিতে পারে "তুমি আমাকে হত্যা করিলেও আমি তোমাতেই বিশ্বাস ও নির্ভর স্থাপন করিব"—এরূপ লোক কয় জন আছে? এরূপ লোক যে আমাদের মধ্যে মোটেই নাই তাহা বলিতেছি না। আমরা জানি, এখনও আমাদের মধ্যে এরূপ কেহ কেহ আছেন। ইহা সৌভাগ্যের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা কত অল্প! আমরা কয় জনে তাঁহাদের সেই অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে পারিয়াছি বা সে চেষ্টায় নিযুক্ত আছি? যদি আমাদের সত্য অভিজ্ঞতা কিছু না থাকে, নিজেরা সত্য কিছু অর্জ্জন না করিয়া থাকি, তবে অপরকে কি দিব? নিজেই বা কি লইয়া বাঁচিয়া থাকিব? আর যদি তাহার জন্য চেষ্টা যত্নই না করিব, তবে পাইবই বা কি প্রকারে? এই মৃত্যুময় সংসারে শোকে সান্ত্বনা লাভের প্রয়োজন কাহার নাই? নিজের এবং সমাজের ও জগতের জন্য এ বিষয়ে কি আমাদের বিশেষ চেষ্টায় নিযুক্ত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য নহে? এরূপ গুরুতর বিষয়ে উদাসীনতা কি শোভা পায়! উহা কি নিতান্তই মারাত্মক নহে? তাহার পর, সংশয় সন্দেহের ত কোনও অভাবই নাই। আমাদের তরুণ তরুণীদের মধ্যে কয় জন তাহার অতীত হইয়া একটা সত্য ভূমি লাভ করিতে পারিয়াছেন—কয় জনই বা সে জন্য চেষ্টিত? এই প্রাণঘাতী সন্দেহ সংশয় অবিশ্বাস দূর করিয়া তাঁহাদিগকে বিশ্বাস ও সত্যের দৃঢ় ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে কি আর সমাজের কল্যাণ আছে? এই মহামারী ব্যাপ্ত হইয়া চারি দিকে যে মৃত্যুর বীজ ছড়াইতেছে, তাহার প্রতিরোধ করা কি আমাদের প্রত্যেকের একটি কর্ত্তব্য নহে? শুধু যুক্তি বিচারের দ্বারা এ কর্ত্তব্য সম্পাদিত হইবার নহে। অভিজ্ঞতার সুদৃঢ় ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সত্য বাণী বলিতে হইবে, যাহাতে সকল হৃদয় সায় পায়, আশ্বস্ত হয়। যাহাদের জীবনে সংগ্রাম উপস্থিত হয় নাই, তাহারা সায় খুঁজিবে না, 'তোমার সহায়তা চাহিবে না, সত্য। কিন্তু তাই বলিয়া যে তাহাদের সহায়তার প্রয়োজন নাই, এরূপ নহে। মহর্ষি ত মাঝির আশ্বাসবাণী চাহেন নাই! মাঝি নিজেই তাঁহাকে বিপদ্‌গ্রস্ত দেখিয়া আশ্বস্ত করিয়াছিল। অপরের ঘরে আগুন লাগিয়াছে দেখিলে, গৃহস্থ না জানিলেও তাহা নির্ব্বাপিত করিতে হয়, গৃহস্থকে সতর্ক করিতে হয়। যাহারা নিজের বিপদ্ না বুঝিয়া উদাসীনতার মধ্যেই আরামে জীবন কাটাইতেছে, তাহাদিগকেও সতর্ক করিতে হইবে, সত্যের সঙ্গে পরিচিত করিতে হইবে, তাহাদের প্রাণে মহত্তর আকাঙ্ক্ষা, শ্রেষ্ঠতর বস্তু লাভের জন্য আগ্রহ, জাগাইতে হইবে। কিন্তু নিজে সত্যের স্পর্শ না পাইলে অন্যকে তাহা দেওয়া যায় না। মানুষ বাক্যের সায় চায় না, তাহাতে তৃপ্ত হয় না; সত্যের সায়ই চায়, তাহাতেই তৃপ্ত হয়। যাহাদের মধ্যে সন্দেহ সংশয়ের সংগ্রাম আসিয়াছে, তাহারা ত অপর কিছুতে পরিতৃপ্ত বোধ করিতেই পারে না। তাহারা যে সায় চায়, নিরাশা অবসন্নতার মধ্যে যে আশ্বাসবাণী শুনিতে চায়, তাহা যদি আমরা দিতে চাই,—তাহা দেওয়া যে একটা অলঙ্ঘনীয় কর্ত্তব্য তাহাতে সন্দেহ নাই—তবে আমাদিগকে সর্ব্বাগ্রে নিজেদের জীবনে তাহা অর্জ্জন করিতে হইবে। আমরা সত্য সত্য এরূপ সায় দিতেও আশ্বস্ত করিতে সমর্থ কি না, তাহা ভাল করিয়া দেখিতে হইবে। আমরা অনেকেই যে সে বিষয়ে সমর্থ নহি, তাহা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। গভীর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লোকের সংখ্যা যে দিন দিন হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে, তাহা আমরা একটু অনুসন্ধান করিলেই বুঝিতে পারিব। কেন না নবীন শ্রেণীর মধ্যে এরূপ লোক খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা এ বিষয়ে বিশে[ষ] কোনও চেষ্টায় নিযুক্ত আছে। এ বিষয়ে আগ্রহান্বিত লোকও খুব বেশী আছে, তাহাও বলা যায় না। যাহাদের কিছু আ[গ্রহ] ও চেষ্টা যত্ন আছে, তাহাদেরও সেরূপ গভীর সাধননিষ্ঠা নাই। অনেকেই ভাসা ভাসা ভাবে কিছু করিয়া যাইতেছে মাত্র। গ[ভীর] আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন যাঁহারা এখনও আমাদের [মধ্যে] আছেন, তাঁহাদের অবর্ত্তমানে লোকে কাহাদের নিকট

সায় ও আশ্বাসবাণী প্রাপ্ত হইবে? অথচ ইহার অভাবে দুই চারি জন আপনার শক্তি ও চেষ্টায় উন্নতিলাভ করিতে পারিলেও, সমাজের অধিকাংশ লোককেই যে তাহা হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। সুতরাং এই শ্রেণীর সায় দিবার ও আশ্বাসবাণী শুনাইবার লোক যে দিন দিন হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা সমাজের পক্ষে নিতান্তই বিপজ্জনক। এ বিষয়ে বিশেষ ভাবে চিন্তা এবং তন্নিবারণের উপায় অবলম্বন করা আমাদের সকলের পক্ষেই নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। আশা করি এ দিকে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে এবং আমরা যাহাতে পরস্পরকে এ বিষয়ে সাহায্য করিতে পারি, সায় ও আশ্বাস প্রদান করিবার উপযুক্ত হইতে পারি, তাহার জন্য সকলেই বিশেষ ভাবে সচেষ্ট হইব। করুণাময় পিতা আমাদিগকে এ বিষয়ে আগ্রহান্বিত ও যত্নশীল করুন। তাঁহারই ইচ্ছাই আমাদের জীবনে ও সমাজে জয়যুক্ত হউক।

নানকবাণী

৪৫

মৈণ কে দন্ত কিউ খাঈএ সার।
জিত গরব জাই সু করণ আহার।
হিবৈ কা ঘর মন্দর অগনি পিরাহন।
কবন গুফা জিত রহৈ অবাহন।
ইত উত কিস কউ জাণ সমাবৈ।
কবণ ধিআন মন মনহি সমাবৈ।

ভাবানুবাদ

মোমের দন্ত দ্বারা কি প্রকারে কঠিন লৌহ আহার করা যায়?
যাহাতে গর্ব্ব দূর হয় সে কোন্ আহার?
অগ্নির আচ্ছাদনের ভিতর তুষারের গৃহ হইতে পারে?
সে কোন্ গুহা, যথায় নিশ্চল হইয়া থাকা যায়?
এখানে সেখানে কাহাকে জানিয়া তাহাতে নিবিষ্ট হইবে?
সে কোন্ ধ্যান, যেখানে মন মনেতেই প্রবিষ্ট হয়?

৪৬

হউ হউ মৈ মৈ বিচহু খোবৈ।
দুজা মেটৈ একো হোবৈ।
জগ করড়া মন মুখ গাবার।
সবদ কমাঈঐ খাঈঐ সার।
অন্তর বাহর একো জাণৈ।
নানক অগনি মরৈ সত কৈ ভাণৈ।

ভাবানুবাদ

আমি আছি আমি আছি ইহা অন্তর হইতে দূর করিলে।
দ্বিত ভাব মিটিয়া গেলে এক হওয়া যায়।
জগত লৌহবৎ কঠিন, মন্মুখ মূর্খ।
ব্রহ্মবাণী অর্জ্জন করিলে কঠিন লৌহকে খাওয়া যায়।
অন্তরে বাহিরে এককে জানিলে।
নানক বলেন সৎ গুরুর কৃপা হইলে অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়।

৪৭

সচ ভৈ রাতা গরব নিবারৈ।
একো জাতা সবদ বীচারৈ।
সবদ বসৈ সচ অন্তরি হীআ।
তন মন সীতল রংগ রংগীআ।
কাম ক্রোধ বিখ অগনি নিবারে।
নানক নদরী নদর পিআরে।

ভাবানুবাদ

সত্য স্বরূপের ভয়ে ভীত হইলে গর্ব্ব নষ্ট হয়।
এককে জানিলে ও ব্রহ্মবাণীর অনুশীলন করিলে।
ব্রহ্মবাণীতে বাস করিলে হৃদয়ে সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।
শরীর ও মন শীতল হয় ও প্রেমে অভিষিক্ত হয়।
কাম ক্রোধ ও বিষয়ের অগ্নি নিবারিত হয়।
নানক বলেন কৃপাময় প্রিয়তমের কৃপাদৃষ্টি হইলে ইহা হয়।

৪৮

কবন মুখ চন্দ হিবৈ ঘর ছাইআ।
কবন মুখ সুরজ তপৈ তপাইআ।
কবন মুখ কাল জোহত নিত রহৈ।
কবন বুধ গুরমুখ পত রহৈ।
কবন জোধ জো কাল সংঘারৈ।
বোলৈ বানী নানক বীচারৈ।

ভাবানুবাদ

চন্দ্রের শীতলতা কোথা হইতে হৃদয়কে আচ্ছাদিত করিল?
প্রখর সূর্য্যের উত্তাপ কিরূপে উত্তপ্ত করিল?
কাল করাল কোথা হইতে নিত্য দেখিতে থাকে?
কোন্ বুদ্ধি সাধুদিগের সম্মান রক্ষা করে?
কোন্ যোদ্ধা সেই যে মৃত্যুকে সংহার করে?
যোগী বাণী বলেন, নানক বিচার করিয়া উত্তর প্রদান করুন।

৪৯

সবদ ভাখত সসি জোত অপারা।
সসি ঘর সুর বসৈ মিটৈ অনধিআরা।
সুখ দুখ সমকর অধারা।
আপে পার উতারণ হারা।
গুরু পরচৈ মন সাচ সমাই।
প্রণবত নানক কাল না খাই।

ভাবানুবাদ

ব্রহ্মবাণী উচ্চারণ করিলে চন্দ্রমা-জ্যোতির আধার হয়।

শশি অর্থাৎ শান্তির সহিত সূর্য্য অর্থাৎ জ্ঞান একত্র হইলে অন্ধকার দূর হয়।

সুখ দুঃখকে সমান করিয়া গ্রহণ করিবে।

ভগবান আপনি পারে উত্তীর্ণ করেন।

গুরুর উপদেশে মন সন্তোতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

নানক বলেন বিনয়ে নম্র হইলে তাহাকে মৃত্যু গ্রাস করিবে না।

পরলোকগত জয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

আমাদের পিতৃদেব জয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় বাংলা ১২৫১ সালের ১৩ই অগ্রহায়ণ, (১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে নভেম্বর,) ঢাকা জেলার অন্তর্গত ফুলশালী গ্রামে বাৎস্য গোত্রীয় রাঢ়ী শ্রেণীর এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। আমাদের কৌলিক পদবী 'কাঞ্জিলাল'; কৌলিক ব্যবসায়, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কার্য্য, অর্থাৎ যজন যাজন অধ্যয়ন ও অধ্যাপন। আমাদের 'চক্রবর্ত্তী' পদবী কবে ও কি কারণে হয়, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। আমাদের বংশে কয়েকজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত জন্মিয়াছিলেন, এইরূপ একটি জনশ্রুতি প্রচলিত আছে; সম্ভবতঃ সেই সূত্রে কোনও পূর্ব্বপুরুষ চক্রবর্ত্তী নাম অবলম্বন করিয়া থাকিবেন।

আমাদের বৃদ্ধ-প্রপিতামহ শ্রীনারায়ণ ও প্রপিতামহ কেবলরাম এইরূপ বড় পণ্ডিত ছিলেন। পিতামহ বিদ্যাধর রুগ্ন ছিলেন, ও অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে পরলোকগত হন; তিনি পাণ্ডিত্যখ্যাতি অর্জ্জন করিতে পারেন নাই; তদুপরি তাঁহার অনেকগুলি সন্তান ছিল। এই সকল কারণে তাঁহার সময়ে আমাদের বংশের চিরাগত দারিদ্র্য অতি কঠোর আকার ধারণ করে। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র (আমাদের জ্যেঠতাত) জগচ্চন্দ্র বিক্রমপুরে ও নবদ্বীপে ন্যায় স্মৃতি প্রভৃতি অধ্যয়ন করিয়া সার্ব্বভৌম উপাধি প্রাপ্ত হন, এবং অল্পকালের মধ্যেই বিক্রমপুরের সর্ব্বপ্রধান স্মার্ত্ত পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হইয়া বংশের পাণ্ডিত্য-যশ পুনরায় উজ্জ্বল করিয়া তোলেন। তিনি উত্তরে রঙ্গপুর, দক্ষিণে ত্রিপুরা, পশ্চিমে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত সমগ্র বঙ্গদেশে পূজিত হইতেন। দ্বিতীয় পুত্র গোলোকচন্দ্র নিজের চেষ্টায় তৎকালীন সীনিয়র বৃত্তির পাঠ পর্য্যন্ত পড়িয়া, পরে সরকারী কাজে (ইংরাজী স্কুলের হেডমাষ্টার রূপে) যশস্বী হন। তৃতীয় পুত্র আমাদের পিতা জয়চন্দ্র। তাঁহার কোনও বিদ্যালয়ে পড়িবার সুযোগ হয় নাই। তাঁহার যখন পড়িবার বয়স, তখন পরিবারের আর্থিক অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল; কোনও রূপে যজন যাজনাদির আয়ে কষ্টে সংসার চলিতেছিল। জ্যেঠতাত জগচ্চন্দ্র যখন পাঠ সমাপ্ত করিয়া স্বগ্রামে চতুষ্পাঠী খুলিয়া বসিলেন, তখন পিতৃদেব অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে তাঁহাতে কাব্য ব্যাকরণ ও ন্যায়শাস্ত্র পড়িতে আরম্ভ করেন; কিন্তু তাঁহার এই পাঠ সমাপ্ত করা হইল না। তাঁহার অগ্রজ গোলোকচন্দ্রের বিশ্বাস হইয়াছিল যে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কৌলিক ব্যবসায়ের দ্বারা আর কাহারও উন্নতি হইবে না। তিনি চেষ্টা করিয়া আসামে একটি সরকারী স্কুলে মাষ্টারীর কাজ পাইলেন। বোধ হয় আমাদের বংশে এই প্রথম চাকরী গ্রহণ। তিনি আমার পিতাকে বুঝাইয়া, টোলের পড়া ছাড়াইয়া, বাড়ীতে কাহাকেও না জানাইয়া, নিজের সঙ্গে সুদূর আসামে লইয়া গেলেন। আমার পিতার বয়স তখন ২৫ বৎসর হইবে।

তখনকার দিনে অল্প বয়সেই ছেলে মেয়ের বিবাহ হইত। কিন্তু সম্ভবতঃ পিতামহের মৃত্যু ও বাড়ীর দারিদ্র্য, এই দুই কারণে আমার পিতার বিবাহ ২৪ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে হয় নাই। তখন আমাদিগের বংশে পণ দিয়া কন্যা গ্রহণ করিতে হইত। সাড়ে সাত শত টাকা পণ দিয়া ১১ বৎসর বয়স্কা আমাদের মাতাঠাকুরাণীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

বাবা তেজপুরের ইংরাজী স্কুলে ৩০৲ বেতনে একটি পণ্ডিতের কর্ম্ম পাইলেন। ইহার অল্পকাল পরেই তাঁহার অগ্রজ আসাম হইতে মালদহে বদলী হইয়া চলিয়া গেলেন। বাবা বোধ হয় ১৮৭২ সালে মাতাঠাকুরাণীকে তেজপুরে লইয়া গেলেন। ইহার পর সুদীর্ঘ জীবনে তাঁহার দুইবার মাত্র বদলী ও বেতন বৃদ্ধি হয়। তিনি ১৮৮০ সালে ৪০৲ বেতনে সিলেট্ নর্ম্মাল স্কুলের হেড্ পণ্ডিত (প্রধান শিক্ষক), ও ১৮৮৪ সালে ৫০৲ বেতনে গৌহাটী নর্ম্মাল স্কুলের হেড্ পণ্ডিত (দ্বিতীয় শিক্ষক) নিযুক্ত হন। এই শেষোক্ত কাজ করিতে করিতেই ১৯০৩ সালে ৫৯ বৎসর বয়সে তিনি ২৫৲ টাকা পেন্সনে সরকারী কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

কর্ম্মজীবনের আরম্ভকালে তাঁহার শিক্ষা অসম্পূর্ণ ছিল; মুরুব্বী কেহ ছিল না; অর্থ সম্বল কিছুই ছিল না; সুদূর বিদেশে কোন আত্মীয়ও ছিলেন না। কিন্তু আত্মোন্নতির জন্য অদম্য আকাঙ্ক্ষা, অসাধারণ পরিশ্রমশীলতা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতা, এবং কঠোর আত্মনির্ভর ও মিতব্যয়িতার গুণে তিনি সর্ব্বপ্রকার সফলতায় মণ্ডিত হইয়া পৃথিবী হইতে অবসৃত হইলেন।

তাঁহার প্রকৃতির ভিতরে দুইটি ভিন্ন ভিন্ন ধারা বিদ্যমান ছিল। তাঁহার ঐ সকল গুণ, এবং তাঁহার তেজস্বিতা, লোকমত উপেক্ষা করিবার সাহস, দারিদ্র্যে সন্তোষ, ও সর্ব্বপ্রকার অসারতায় অনাস্থা, তিনি ব্রাহ্মণপণ্ডিত কুলে জন্ম হেতু রক্তের সহিতই লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া আমার বোধ হয়। এই সকল গুণের দ্বারা মানুষ জীবনসংগ্রামে সফল হইয়া লোকসমাজে সম্মান অর্জ্জন করিতে পারে বটে; কিন্তু শুধু এ সকলের দ্বারা মানুষের সঙ্গে মানুষের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সৃষ্টি হয় না; পারিবারিক জীবন মধুর হয় না। আমাদের বংশে অনেকের মধ্যে এই গুণসকলের কোন কোনটি অতিরিক্ত মাত্রায় বর্দ্ধিত হইয়া দোষে পরিণত হইয়াছে; ব্রাহ্মণপণ্ডিতসুলভ উগ্র, ক্রোধপরায়ণ, ও গর্ব্বিত স্বভাব উৎপন্ন করিয়াছে। আমাদের এক জ্যেঠা মহাশয় নিজের এক পুত্রকে একদিন আমাদের সম্মুখে যে ভাবে প্রহার করিয়া

[৩০শে আষাঢ় (১৫ই জুলাই, ১৯২৬), শ্রাদ্ধবাসরে তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক পঠিত, ও পরে ঈষৎ পরিবর্ত্তিত।]

প্রায় অচৈতন্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন. তাহা স্মরণ করিলে এখনও আমার শরীর শিহরিয়া উঠে। বাবার ভিতরেও সেই প্রচণ্ড ক্রোধের উপাদান বিদ্যমান ছিল। তাহা অনেক সময়ে প্রবল আকারেই প্রকাশিত হইত। কিন্তু তাঁহার প্রকৃতিতে কতকগুলি কোমল গুণের সমাবেশও ছিল; এজন্ত তিনি অনেক সময়েই সে উত্তেজনা সংবরণ করিয়া লইতেন।

এই কোমল গুণসকলকেই আমি তাঁহার প্রকৃতির দ্বিতীয় ধারা বলিতেছি। তাঁহার সহৃদয়তা, উদারতা, পারিবারিক জীবনের উন্নত আদর্শ, এবং ভগবদ্‌বিশ্বাস, তাঁহার প্রকৃতিতে যে বংশগত তেজস্বিতা ও কঠোরতা ছিল, তাহাকে স্নিগ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। আমি তাঁহার প্রথম সন্তান। আমার জন্মের পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার প্রকৃতিতে এই দ্বিতীয় ধারাটির সঞ্চার হয়।

সেই সময়ে, তেজপুরে প্রথম চাকরী পাইবার পর, তিনি অনেক সদ্‌গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন, এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাবের ভিতরে আসিয়া পড়েন। আমার বাল্যস্মৃতির ভিতরে মনে পড়ে যে, তাঁহাকে আমি ব্রাহ্মসমাজে গিয়া উপাসনা করিতে দেখিয়াছি; উপাসনাস্থলে তাঁহার কোলে গিয়া আমিও বসিয়াছি। মনে পড়ে, বাড়ীতে তিনি সর্ব্বদা ব্রহ্মসঙ্গীত গান করিতেন, এবং 'ব্রহ্মসঙ্গীত' পুস্তকের শেষে নূতন অনেক গান নিজ হাতে লিখিয়া লইয়াছিলেন। মনে পড়ে, তেজপুরে উৎসব হইত; আমরা নিশান হাতে লইয়া বাল্যস্বরে গান করিতে করিতে নগরসংকীর্ত্তনের অনুগমন করিতাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই সদ্‌গ্রন্থ পাঠ এবং প্রথম জীবনে ব্রাহ্মধর্ম্মের এই প্রভাব, তাঁহার চরিত্রে ঐ কোমল গুণসকল সঞ্চার ও বিকাশ করিবার পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল।

তাঁহাকে দেখিলে মানুষের প্রথমেই চোখে পড়িত, তাঁহার শ্রমশীলতা ও স্বাবলম্বন। তাঁহার দীর্ঘ জীবনের শেষার্দ্ধ (প্রায় ৪২ বৎসর) তিনি গৌহাটী নগরেই যাপন করেন। সেই নগরে তাঁহার যৌবনকালের সঙ্গিগণ একে একে গৃহকোণবাসী বৃদ্ধে পরিণত হইয়া, সকল প্রকার কর্ম্মিষ্ঠ জীবন হইতে সরিয়া পড়িতে লাগিলেন। কিন্তু "পণ্ডিত মহাশয়কে" শেষ পর্য্যন্ত রাজপথ দিয়া হন্ হন্ করিয়া ছুটিয়া, কখনও বাজারে, কখনও পুত্রদের শস্যক্ষেত্রে, কখনও সহরের রুগ্ন ও বিপন্ন লোকদের বাড়ীতে-বাড়ীতে, নিত্য যাইতে দেখা যাইত। অনেক সময়েই তিনি শুধু-হাতে যাইতেন না, হাতে কিছু মোট বা বোঝা থাকিত। শেষ রোগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রায় কখনও তিনি অন্যের সেবা গ্রহণ করেন নাই; কিন্তু বাড়ীর সকল প্রকার কাজ ও পরিবারের সকলের সকল প্রকার সেবা তিনি আজীবন নিজ হস্তে করিয়াছেন।

তিনি স্কুলের দৈনিক কাজ ব্যতীত, বাড়ীতে পত্নী, পুত্র-কন্যা, বধূ, ও পৌত্র-পৌত্রীগণকে নিজে লেখাপড়া শিখাইয়াছেন; রোগের শুশ্রূষা, এবং অধিকাংশ সময়ে রোগের চিকিৎসা পর্য্যন্ত, নিজেই করিয়াছেন; নিজ হাতে প্রতিদিনের বাজার করিয়াছেন। তাহার উপরে, কোদাল লইয়া বাড়ীর জঙ্গল পরিষ্কার করা, ঘরের খড়ের চাল ও বেড়ার দেয়াল বাঁধা ও লেপা প্রভৃতি ঘরামির কাজে, শাক সবুজির ও নানা ফলের গাছের পরিচর্য্যায়, এবং গোরুর সেবা ও গোরু দোহা প্রভৃতি কাজে, তিনি অবিশ্রান্ত লাগিয়া থাকিতেন। ক্রমাগত কয়েকদিন ধরিয়া কুড়ালি দিয়া রাশি রাশি কাঠ চেলা করিয়া বৎসরের জ্বালানি কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন। বাহিরের কোনও কাজ সারিয়া ঘরে আসিয়া জুতা ছাতা রাখিতে রাখিতে ও কাপড় খানি ছাড়িতে ছাড়িতেই তিনি নূতন কাজের আয়োজন বিষয়ে মৌখিক আদেশ দিতে থাকিতেন; এক মুহূর্ত্ত সময় নষ্ট করিতেন না। এই সকল ছুটাছুটির কাজ ব্যতীত, অবসর পাইলেই তিনি সেলাই করিতে বসিতেন। তিনি হাতে খুব ভাল সেলাই করিতে পারিতেন। শেষ রোগের সময় শয্যাতে বসিয়াও তিনি জামা সেলাই করিয়াছেন। আমি এণ্ট্রেন্স পরীক্ষার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বরাবর তাঁহার হাতের সেলাই করা জামা পরিয়া আসিয়াছি। ঐ পরীক্ষা দিতে যাইবার সময় দরজির তৈয়ারী কোট প্রথম আমার গায়ে উঠিল।

এইরূপ শারীরিক পরিশ্রমের বিচ্ছেদের ভিতরেই তিনি পুস্তক ও সংবাদপত্রসকল পাঠ করিতেন, এবং পুস্তক রচনা করিতেন। তিনি আসামীয় ভাষায় স্কুলপাঠ্য সাতখানি পুস্তক রচনা ও প্রকাশ করিয়াছিলেন। এক সময়ে সে সকল পুস্তকই সমগ্র আসামের একমাত্র পাঠ্য পুস্তক ছিল। যখন তিনি তেজপুরে ছিলেন তখন তাঁহার পূর্ণ যৌবন ও সতেজ দেহ। সে সময়ে তিনি এই সকল কার্য্য ভিন্ন, Calcutta School Book Societyর Agent হইয়া পুস্তক বিক্রয় করিতেন, এবং সকালে নিজের বাহির বাড়ীতে একটি বালিকাবিদ্যালয় বসাইয়া তাহার সব কাজ একা চালাইতেন।

তিনি স্বয়ং এইরূপ শ্রম করিতেন, এবং যাহাতে স্বীয় পরিবারে এই শ্রমের আদর্শটি প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেন। আমাদের গৌহাটীর বাড়ীতে প্রায় কখনও চাকর রাখা হয় না; অধিকাংশ সময়ে ধোপাও থাকে না। জল তোলা, রান্না করা, বাসন মাজা, গোরুর জাবনা দেওয়া, সাবান দিয়া কাপড় কাচা ও তাহাতে নীলের কলপ দেওয়া, কিছু কিছু ঢেঁকির কাজ, প্রভৃতি, আমাদের বাল্যকালে আমরা ভাই বোনে মিলিয়া বাবা মার সঙ্গে করিয়াছি; এখনও বধূগণ পুত্রকন্যা সহ তাহা করিতেছেন।

বাড়ীতে অতিথি আসিলে অতিথির সর্ব্বপ্রকার পরিচর্য্যা বাবার সঙ্গে মিলিয়া আমরা নিজ হাতেই করিতাম। ইহাতে অতিথিগণ কখনও কখনও লজ্জিত ও বিব্রত হইয়া পড়িতেন। কিন্তু আমাদের বাড়ীর ধারাটি বুঝিয়া লইতে তাঁহাদের অধিক দিন লাগিত না। অনেক সময়ে বন্ধুগণ রেলে বা ষ্টীমারে যাইবার সময় আমাদের কাছে খাদ্য বা অন্য কোনও প্রকার বস্তু চাহিয়া পাঠাইতেন। বাবা, কখনও একা, কখনও পুত্রগণ সহ, তাহা নিজ হাতে বহিয়া, রেলে বা ষ্টীমারে দিয়া আসিতেন।

ক্রমশঃ যখন বাবার রচিত পাঠ্য পুস্তকের আয় হইতে আমাদের আর্থিক অবস্থা বেশ সচ্ছল হইয়া উঠিল, যখন তিনি অতিথি অভ্যাগত ও স্বদেশবাসী আত্মীয়দিগের জন্য এবং পারিবারিক শুভ অনুষ্ঠানাদিতে মন খুলিয়া ব্যয় করিতে লাগিলেন, তখনও তিনি এই নিজ হাতে কার্য্য করিবার রীতিটি পরিত্যাগ করিলেন না। গৌহাটী সহরের সমুদয় সম্ভ্রান্ত লোকের সঙ্গে তখন তাঁহার আলাপ

ছিল, এবং তখন তিনি সকলের সম্মানভাজন হইয়াছিলেন; তথাপি তিনি সতেজে অকুণ্ঠিত ভাবে রাজপথ দিয়া জিনিস বহিয়া লইয়া চলিতেন, এবং শারীরিক শ্রমের আদর্শটি সর্ব্বদা অক্ষুণ্ণ রাখিতেন। অনেক বিষয়ে দেখিয়াছি, যাহা তিনি ভাল বলিয়া বুঝিতেন, তাহা করিতে গিয়া চক্ষুলজ্জা ও লোকমত অগ্রাহ্য করিবার তাঁহার আশ্চর্য্য শক্তি ছিল। *

পরিবারে এই শ্রমের আদর্শটিকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি কাহারও উপরে জোর করিতেন না। শুধু নিজে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াই তিনি সকলকে এই আদর্শ অনুসরণে প্রবৃত্ত করিতেন। নাতি নাত্নীরা তাঁহাকে দেখিয়া দেখিয়াই শ্রমদক্ষতা ও কর্ম্মনিপুণতার আদর্শটি শিক্ষা করিত।

১৯২৪ সালে ধুবড়ীর East Bengal Brahmo Conference-এর পরে আমি বাবা মার সঙ্গে দেখা করিতে গৌহাটীতে গিয়াছিলাম। যেদিন ফিরিয়া আসিব, ষ্টেশনে আসিবার সময় তিনিও সঙ্গে আসিলেন। আমার বাক্স বিছানা মুটের কাছে দিয়া দু একটি ছোট ছোট বস্তু আমি আমার হাতে লইয়াছিলাম। রাজপথে গিয়া বাবা তাহা দেখিতে পাইয়া, স্নেহ বশতঃ আমাকে তাহা বহিবার শ্রম হইতে মুক্তি দিবার অভিপ্রায়ে, আমার হাত হইতে জোর করিয়া নিজে তাহা লইলেন। আমি অনেক চেষ্টা করিয়া এবং অনেক ক্ষণ টানাটানি করিয়াও কিছুতেই তাঁহাকে নিরস্ত করিতে পারিলাম না। পথের মধ্যে তাঁহার সঙ্গে জিনিস লইয়া বহুক্ষণ টানাটানি করাও অতিশয় অশোভন, এবং তিনিও কিছুতেই ছাড়িবেন না; আমি বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িলাম। অবশেষে আমাকেই হারিতে হইল। অশীতিপর বৃদ্ধ পিতার হাতে সেই বস্তুটি দিতে বাধ্য হইয়া আমি লজ্জায় অনেক দূরে দূরে পিছনে পিছনে আসিতে লাগিলাম।

এই শারীরিক পরিশ্রমের গুণে, ৪০ বৎসর বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া ৮১ বৎসর বয়সে মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত, তাঁহার দেহের গঠন বরাবর একরূপই ছিল। তিনি কখনও স্থূল হন নাই, আবার কখনও অতিরিক্ত কৃশও হন নাই। জীবনের শেষ এগারো বৎসর কাল তিনি অনেকবার অনেক সঙ্কট রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। কত বার ডাক্তার বলিয়া গেলেন, "আজ রাতটা কাটিবে না।" তিনি বলিলেন, "ও সব কিছু নয়; আমাকে ভাত দাও, আমি ভাল হইয়া উঠিব।" তখন অগত্যা ডাক্তার আমাদের বলিলেন, "বাঁচিবার তো কোন আশা নাই, অতএব যাহা চাহেন, খাইতে দিন।" আশ্চর্য্য এই যে বাবা সত্যসত্যই ভাত খাইয়া ভাল হইয়া উঠিলেন। কতবার ডাক্তার বলিয়াছেন, "আপনি শয্যা হইতে উঠিবেন না।" তিনি বলিয়াছেন, "শুইয়া থাকিলে, ও না খাটিলেই আমি মরিয়া যাইব।" জীবনের শেষ এগারো বৎসর তিনি এইরূপে মনের তেজে চিকিৎসা-শাস্ত্র ব্যর্থ করিয়া, ও তাহার অতীত হইয়া, বাঁচিয়া ছিলেন,। শুধু যে বাঁচিয়া ছিলেন, তাহাই নয়; সতেজে খাটিয়া বাঁচিয়া ছিলেন। এই ভাবে ক্রমাগত রোগ অগ্রাহ্য করিয়া চলার ফলে গত ডিসেম্বর মাস হইতে তাঁহার হৃদ্‌যন্ত্রের অবস্থা অতিশয় খারাপ হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে শরীরের প্রায় সব যন্ত্র বিকল হইল। তখন ডাক্তার বলিয়া দিলেন যে, "ইনি যখন শুইয়া থাকিতে একান্ত অসম্মত, তখন আপনারা প্রস্তুত থাকিবেন, ইনি হঠাৎ পথে-ঘাটে কোথাও মারা যাইবেন।" বাবা শেষ দুই দিন অত্যধিক দুর্ব্বলতা হেতু শয্যাত্যাগ করিতে অসমর্থ হওয়াতে, এইরূপ অঘটন ঘটিতে পায় নাই। বিগত ৫ই জুলাই সকাল-বেলা, একজন প্রতিবেশীর সঙ্গে কথা কহিয়া তাঁহার বাড়ীর খোঁজ খবর লইবার অল্পকাল পরে, হঠাৎ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া নিমেষের মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হয়।

তাঁহার স্বাবলম্বন ও কর্ত্তব্যপরায়ণতার একটি বিশেষ ফল এই হইয়াছিল যে, তাঁহার সম্মুখে যখন যে কর্ত্তব্য আসিয়া উপস্থিত হইত, তিনি আপনাকে তাহার জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত করিয়া লইতে প্রাণপণ করিতেন। বিদ্যালয়ে পড়িতে পান নাই বটে; কিন্তু স্কুলের কর্ত্তব্য করিবার জন্য তিনি নিজ অগ্রজের নিকটে ইংরাজী পড়েন; বাড়ীতে বসিয়া অজস্র বাংলা পুস্তক ও সংবাদপত্র পাঠ করিয়া, ও লিখিয়া লিখিয়া, নিজের বাংলা ভাষার উন্নতি সাধন করেন। তাঁহার বাংলা ভাষায় রচনা অতি সুন্দর হইত; চিঠি পত্রের ভাষা যেমন গাঢ় তেমনি প্রাঞ্জল হইত। স্কুলে পড়াইবার জন্য তিনি বাড়ীতে প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারীর বাংলা বীজগণিত ও ব্রহ্মমোহন মল্লিকের বাংলা ক্ষেত্রতত্ব পড়িয়া লইয়াছিলেন। শেষোক্ত পুস্তক পড়িবার সময়ে আমার অনুজ যতীশচন্দ্র ক খ পড়িত। সে বাবাকে বার বার "ক খ গ ত্রিভুজ, ক খ গ কোণ", প্রভৃতি পড়িতে শুনিয়া বলিত, "আমি যা পড়ি, বাবাও দেখি তাই পড়েন।"

তাঁহার এই যথোচিত রূপে প্রস্তুত হওয়ার ভাবটি কেবল তাঁহার চাকরীতে নয়, তাঁহার গৃহধর্ম্মেও প্রকাশ পাইত। আমি তাঁহার প্রথম সন্তান। আমার জন্মের পূর্ব্বে তিনি ধাত্রীবিদ্যা সম্বন্ধীয় পুস্তক আনাইয়া পাঠ করেন। তখন তেজপুর সহরে ডাক্তার ধাত্রী প্রভৃতির সাহায্য প্রায় কিছুই ছিল না; এবং তাঁহার কাছে একটি নিরক্ষর ঝি বই আর কেহ সাহায্য করিবার লোকও ছিল না। আমার ও আমার অনুজের জন্মকালে নানা বিপদ্ উপস্থিত হয়। তখন বাবাকে তাঁহার সেই স্বয়ং অর্জ্জিত বিদ্যার দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা করিতে হইয়াছিল। তাঁহার পরিণত বয়সে গৌহাটীতে বাসকালে প্রতিবেশী জনের ও বন্ধুজনের খোঁজ খবর লওয়া তাঁহার নিত্যকর্ম্ম হইয়াছিল। এই সময়ে প্রায়ই নানা শ্রেণীর লোক তাঁহার নিকটে রোগের বিষয়ে পরামর্শ লইতে আসিত। তিনি এই কার্য্যের জন্যও যথোচিত রূপে প্রস্তুত হইবেন বলিয়া, সেই সেই রোগের ও তাহার চিকিৎসার বিশেষ বিবরণ অধ্যয়ন করিতে নিযুক্ত হইতেন। ইহার পূর্ব্বেই তিনি হোমিওপ্যাথী চিকিৎসাপ্রণালী শিখিয়া লইয়াছিলেন।

এই সুদীর্ঘ জীবনে অতি সামান্য আয়ে বহু সন্তান লইয়া তাঁহাকে একাকী কত রোগ ও কত বিপদ্ অতিক্রম করিতে হইয়াছে। এই সকল সময়ে কতবার তাঁহাকে অশ্রুপূর্ণ চক্ষে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতে দেখিয়াছি। সন্তান-জন্মের মুহূর্ত্তেও ধাত্রী আসিয়া পৌঁছে নাই; নিজেই নাড়ী কাটিয়া অপেক্ষা করিতেছেন, ভগবানের নাম করিতেছেন, এবং নিজের যাহা করিবার আছে, সব দ্রুত বেগে ও সাহসের সহিত করিয়া যাইতেছেন। রুগ্ন, মুমূর্ষু সন্তান বা পৌত্র পৌত্রীকে কোলে

করিয়া ভগবানের নাম করিতেছেন;—এমন কত দৃশ্য কতবার দেখা গিয়াছে। আমরা আমাদের বাবার মতন, বাড়ীর জন্য এত বেশী খাটিতে ও এত বেশী সেবা করিতে আর কোনও পরিচিত লোকের পিতাকে দেখি নাই। তাঁহার পরিবারের প্রতি স্নেহ ভালবাসা, আদরের কথায় তত অধিক প্রকাশ পাইত না; কিন্তু অজস্র সেবার মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইত।

এই সকল বিপদ্ ও সঙ্কটের জন্যও তিনি পূর্ব্ব হইতে যথাসম্ভব প্রস্তুত হইয়া থাকিতেন। কষ্টে অর্জ্জিত সামান্য আয় হইতে একটু একটু সঞ্চয় করিয়া ভবিষ্যতের সংস্থান করিয়া রাখিতেন। তাই কোনও বিপদে সঙ্কটে তাঁহাকে কখনও ঋণ করিতে হয় নাই। আমরা আমাদের পিতাকে একটি দিন, এমন কি একটি ঘণ্টার জন্যও, ধার করিতে দেখি নাই। ঋণ করাকে তিনি অতিশয় ঘৃণা করিতেন। পুত্রগণ যখন কলেজে পড়িতে বিদেশে যাইত, তিনি সর্ব্বদা তাহাদিগকে এবিষয়ে সাবধান করিয়া দিতেন। বাজার হইতে আনীত কোনও দ্রব্যের দাম দিতে বাকী থাকিলে, যতক্ষণ না তাহা পাঠাইয়া দেওয়া হইত, অস্থির হইয়া উঠিতেন।

উনষাট বৎসর বয়সে তিনি মাসিক ২৫৲ টাকা পেন্সন্ ও সারাজীবনে কষ্টে সঞ্চিত সামান্য কয়েকটি টাকা সম্বল লইয়া বার্দ্ধক্যে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু এমনই তাঁহার স্বাবলম্বন-প্রিয়তা যে, বয়স্ক উপার্জ্জনক্ষম ও উপার্জ্জনশীল পাঁচ পুত্র থাকা সত্বেও তিনি সর্ব্বদা বলিতেন, "আমি পুত্রগণের উপার্জ্জনের উপরে নির্ভর করিয়া জীবিত থাকিব না।" তাঁহার এই তেজস্বী সংকল্প তিনি আমরণ অক্ষুন্ন রাখিয়া গিয়াছেন। এমন কি, নিজ শ্রাদ্ধের ব্যয় যেন নিজের পরিত্যক্ত টাকা হইতেই নির্ব্বাহ করা হয়, এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। আমাদের কাছে তিনি কখনও এক পয়সা চাহেন নাই; আমরা যখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দিয়াছি, তখনও তিনি তাহা সহজে লইতে চাহেন নাই। বিদেশ হইতে উপার্জ্জনশীল পুত্রগণ তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গৌহাটীতে যাইতেন; তাঁহারা ফিরিয়া যাইবার সময় বাবা সর্ব্বদাই জিজ্ঞাসা করিতেন যে পথখরচ দিতে হইবে কি না।

তিনি আপনি কন্যাপণ দিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার পুত্রকন্যাগণের বিবাহকালে বঙ্গদেশে বরপণ প্রথা প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। এই জন্য চারি কন্যার বিবাহে তাঁহাকে অনেক ব্যয় করিতে হইল। কিন্তু যে তিন পুত্রের বিবাহ তিনি নিজে (হিন্দু সমাজে) দিয়াছেন, তাহাতে এক পয়সা পণ গ্রহণ করেন নাই। আমাদের সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রথম হইয়া ইংলণ্ডে গিয়া পড়িবার জন্য ষ্টেট স্কলার্শিপ পাইয়াছিলেন; তাঁহাকে বহু সহস্র টাকা পণ দিয়া জামাতা করিবার জন্য অনেকে প্রস্তাব পাঠাইতেছিলেন। কিন্তু আমাদের দরিদ্র পিতা, "আমি অপত্য-বিক্রয়ী নহি" বলিয়া সতেজে সে সকল প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। এমন কি, এই পুত্রের শ্বশুর মহাশয়ের স্বতঃপ্রবৃত্ত দানও তিনি গ্রহণ করেন নাই।

আমার এণ্ট্রেন্স পরীক্ষার সময় পর্য্যন্ত বাবার রচিত পাঠ্য-পুস্তকের আয়ের দ্বারা আমাদের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল হয় নাই। আমি যত দিন স্কুলে পড়িয়াছি, কখনও নিজে খরচ করিবার জন্য একটি পয়সা পাই নাই। আমার যখন নয় বৎসর বয়স ও আমি যখন 5th Classএ পড়ি, সেই সময়ে বাবা সিলেট হইতে গৌহাটী বদলী হন। মাকে ও ছোট ভাই বোন গুলিকে মামা-বাড়ীতে রাখিয়া শুধু আমাকে লইয়া বাবা গৌহাটীতে গেলেন। সেখানে গিয়া, তিনি স্কুলের আগে ও পরে আমাদের জন্য কয়েক খানি ঘর তৈয়ারী করাইতে ব্যস্ত থাকিতেন; সেই কাজে তিনি ঘরামিদের সঙ্গে নিজেও খাটিতেন; আমি স্কুলে যাইতাম ও দুবেলা বাবার ও আমার জন্য রান্না করিতাম। সেই দিন-গুলিতে সন্ধ্যাকালে বার বার বাবার সস্নেহ গাঢ় স্বরের নানা প্রশ্ন শুনিয়া আমি বুঝিতে পারিতাম যে আমাকে এভাবে খাটাইয়া তাঁহার মনে বড় ক্লেশ হইতেছে; কিন্তু উপায়ান্তর ছিল না। আমার তখন একে মা কাছে নাই, তাহাতে এই পরিশ্রম; তার উপরে ছেঁড়া জুতার জন্য স্কুলের ছেলেদের অবিশ্রান্ত বিদ্রূপ; আমার তখনকার মনের অবস্থা অবর্ণনীয়। বাবা সেই সময়ে মাঝে মাঝে আমাকে বলিতেন, "বাবা, সর্ব্বদা মনে রাখিও, আমরা দরিদ্র; কিন্তু আমরা যে কাহারও মুখাপেক্ষী নহি, ইহাই আমাদের গৌরব।" বালক আমি, তখন তাঁহার এই কথার মর্ম্ম সম্পূর্ণ বুঝিতে না পারিয়াও অন্তরে সান্ত্বনা অনুভব করিতাম; পরবর্ত্তী জীবনে যখন বুঝিতে পারিলাম, তখন তাঁহার ঐ উক্তি স্মরণ করিয়া কত গর্ব্ব অনুভব করিয়াছি।

তাঁহার প্রকৃতিগত দায়িত্ববোধ ও কর্ত্তব্যপরায়ণতার একটি ফল এই হইয়াছিল যে, তিনি, কি স্কুলের কাজ, কি নিজের কাজ, সব কাজই অতি নিপুণ ভাবে সম্পন্ন করিতেন। আমাদিগকে উৎসাহ দিবার জন্য তিনি সতেজে বলিতেন, "দেখিও, আমি যে কাজে হাত দিব, তাহা অতি সুন্দর রূপে সম্পন্ন হইবে।" তদ্বিপরীত চিন্তাও তাঁহার পক্ষে অসহ্য ছিল। তাঁহার ঘর বাঁধা, ঘর লেপা, খাতায় রুল টানা, সেলাই, ইংরাজী ও বাংলা উভয় ভাষার হস্তাক্ষর, সবই অতি সুন্দর হইত। বাংলা লেখা তিনি ঠিক ছাপার অক্ষরের অনুকরণে লিখিতেন; জটিল যুক্তাক্ষর-গুলিরও আকার পরিবর্ত্তিত হইতে দিতেন না। তাঁহার কর্ত্তব্য-বোধ তাঁহাকে কর্ম্মক্ষেত্রে ও গৃহে, উভয়ত্র, এমন সকল কার্য্য করিতে ও এত অধিক পরিশ্রম করিতে নিযুক্ত করিত, যাহা সচরাচর দেখা যায় না। স্কুলের প্রধান শিক্ষক হইয়া, তিনি প্রধান শিক্ষকের কাজ ও চাকরের কাজ উভয়ই করিতেন। তিনি যখন সিলেট নর্ম্ম্যাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক, সেই সময়ে একবার স্কুল-গৃহের অতি সন্নিকটে একখানি চালা ঘরে আগুন লাগিল। তিনি তাঁর স্কুলগৃহ বাঁচাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। প্রকাণ্ড অগ্নিশিখা আকাশের দিকে লম্ফ দিয়া উঠিয়াছে; বায়ু-চালিত হইয়া তাহা বার বার তাঁহার স্কুলের দিকেই ঝুঁকিতেছে; এই অগ্নিশিখা অগ্রাহ্য করিয়া, চাকরদের নিষেধ না শুনিয়া, তিনি স্কুলগৃহের চালের উপরে উঠিলেন, ও জল দিয়া চাল ভিজাইয়া ঘরখানি রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে অসম্ভব চেষ্টা। আমি তখন ৮ বৎসরের বালক। তাঁহাকে এই ভীষণ অগ্নিশিখার সম্মুখে স্কুলঘরের চালের উপরে উঠিতে দেখিয়া, আমি

ভয়ে কাঁপিতেছিলাম, ও কাঁদিতেছিলাম। তাঁহার চেষ্টা নিষ্ফল হইল; তিনি নামিয়া আসিবার দুএক মিনিট পরেই তাঁহার স্কুলগৃহের চালে আগুন ধরিল, ও তাহা ভস্মসাৎ হইয়া গেল। সেই দিন সন্ধ্যার সময় যখন তিনি বাড়ী ফিরিলেন, তখন তাঁহার সর্ব্ব শরীর ঝল্‌সান, ছাই মাথা; চক্ষু রক্তবর্ণ, মুখ বিশীর্ণ। হাতে স্কুলের কয়েকখানি record এর কাগজ। তাঁহার সেই শোচনীয় মূর্ত্তি দেখিয়া আমাদের যত কষ্ট হইয়াছিল, তাঁহার কথা শুনিয়া ততোধিক কষ্ট হইয়াছিল। কারণ, তিনি অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া বলিতেছিলেন, "আমি সরকারের চাকর হইয়াও সরকারের সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারিলাম না।" নিজের সম্পত্তি দগ্ধ হইলে লোকের যত ক্ষোভ হয়, তাঁহার তদপেক্ষা অধিক হইয়াছিল। নিজ কর্ত্তব্যসম্বন্ধে তাঁহার অনুভূতি এমনি তীক্ষ্ণ ছিল।

তাঁহার ছাত্রগণ তাঁহার এই কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও শ্রমশীলতা নিত্য দেখিতে পাইত, ও দেখিয়া মুগ্ধ হইত। তদুপরি, তিনি শিক্ষকতা কার্য্যে অতিশয় সুদক্ষ ও ছাত্রদের সম্বন্ধে অতি সহৃদয় ছিলেন। যেমন নগরবাসী বন্ধুদের, তেমনি বোর্ডিংনিবাসী ছাত্রদের, কাছে গিয়া, তাহাদের সুখ দুঃখের খোঁজ লওয়া, তাঁহার নিত্য কর্ম্ম ছিল। সমগ্র আসামপ্রদেশ বাবার ছাত্রে পরিপূর্ণ। তাঁহারা তাঁহাদের "পণ্ডিত মহাশয়কে" অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করেন। কি বিক্রমপুরে, কি বিদেশে, ছাত্রগৌরব ও ছাত্রদের শ্রদ্ধাই আমাদের বংশের প্রধান গর্ব্বের বিষয়। বাবার দ্বারা বংশের সে গৌরব পূর্ণমাত্রায় রক্ষিত হইয়াছে।

বাবার কতকগুলি প্রিয় প্রবাদবাক্য ছিল। তন্মধ্যে একটি ছিল, "আপনার হাত, আর জগন্নাথ", অর্থাৎ যে অন্যের উপরে নির্ভর না করিয়া নিজের হাতে নিজের কাজ করে, ভগবান্ তাহাকে সফলতা দান করেন। আমাদিগকে সর্ব্বদাই পত্রে লিখিতেন, "ছাত্রাণামধ্যয়নং তপঃ," এবং ছাত্রাবস্থায় অন্যদিকে মন না দিয়া পাঠে একাগ্র হইতে উপদেশ দিতেন। "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন" এ কথাও তাঁহাকে বহুবার বলিতে শুনিতাম। "সিদ্ধির জন্য মন্ত্রগুপ্তি আবশ্যক," অর্থাৎ মনের শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্প লোকের কাছে বলিয়া বেড়াইলে তাহা সফল হয় না, ইহাও তাঁহার মুখে শুনিতাম। এই সকল হইতে তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্বগুলি বুঝিতে পারা যায়।

তাঁহার আর একটি কথা ছিল, "তৃণ হ'তে কার্য্য হয় রাখিলে যতনে।" সকল বস্তুতে যত্ন করা, ক্ষুদ্রতম বস্তুরও অপচয় না করা, তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল। প্রত্যেক খানি ধুতি ও জামা যত দিন চলিতে পারে, তার একটি দিন কম তাহাকে চালাইতেন না। ধুতির মাঝখানটাই নরম হইয়া যায়, পাশগুলি মজবুত থাকে, এইজন্য মাঝখানে ছিঁড়িয়া দুই পাশ জুড়িয়া তাহা দিয়া বাড়ীতে পরিবার কাপড় করিতেন। এ সকল যে তাঁহার বিলাসবিমুখতা এবং ব্রাহ্মণপণ্ডিতোচিত সরল জীবনের আদর্শেরও পরিচায়ক, তাহা সকলে অবশ্য বুঝিতে পারিতেছেন।

যেমন কতকগুলি গুণ তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল, তেমনি আবার মানবচরিত্রের কতকগুলি দুর্ব্বলতা তাঁহার বিশেষ অপ্রিয় ছিল। যাহারা শ্রমকাতর এবং সংসারে শুধু চাকরের উপরেই নির্ভর করে; যাহারা প্রতিবেশীর প্রতি সহানুভূতি ও সৌজন্য শুধু বাক্যেই প্রকাশ করে, শরীর খাটাইয়া প্রকাশ করিতে পারে না; যাহারা কর্ত্তব্যজ্ঞানে শিথিল; যাহারা ধনের জন্য গর্ব্বিত; যাহারা চরিত্রে দুর্ব্বল কিন্তু ধর্ম্মের আড়ম্বর করে, —এই সকল শ্রেণীর লোককে তিনি মনে মনে অবজ্ঞা করিতেন। "ন চ ধন-গর্ব্বিত-বান্ধব-শরণং" এই বাক্য তাঁহার মুখে প্রায়ই শুনিতে পাইতাম। আমাদের মাতা ঠাকুরাণী একবার আমাদের পৈতৃক গুরুর নিকটে মন্ত্র লইতে চাহিয়াছিলেন; বাবা বলিলেন, "তার চেয়ে বরং আমার কাছে মন্ত্র লও।" যাহার চরিত্র উন্নত নহে, এমন ধর্ম্মব্যবসায়ীর উপরে তাঁহার কোনও দিন আস্থা ছিল না।

শ্রেষ্ঠ সাহিত্য পাঠ হইতে ও ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব হইতে যে সকল কোমল গুণ বাবার প্রকৃতিতে সঞ্চারিত হইয়াছিল, পারিবারিক জীবনের উন্নত আদর্শই তাহার মধ্যে প্রধান। আমার বাল্যকালে আমি আমাদের বাড়ীর যে ছবি দেখিয়াছি, বর্ত্তমান কালে তাহা দুর্লভ। এজন্য অনেক সময়ে আমার মনে গভীর খেদ উপস্থিত হয়। সে ছবি কিরূপ? বাবা মা খাটিতেছেন; আমরা শিশু পুত্রকন্যাগণ যথাসাধ্য তাঁহাদের শ্রমে সঙ্গী হইতেছি। আমাদের সকলের জীবনগুলি পরস্পরকে লইয়াই পরম তৃপ্ত; বাড়ীতে বাহিরের কোন আমোদ নাই, কোন হুজুগ নাই। বাড়ী না বদ্‌লাইয়া একটি বাড়ীতেই তেরো বৎসর কাল কাটিল। এই কালের মধ্যে দৈনিক জীবনযাত্রার কোনও পরিবর্ত্তন ঘটিল না। এই অচঞ্চল জীবনযাত্রা কোনও নিয়মের বা রুটীনের বাঁধনের দ্বারা রক্ষা করিতে হয় নাই; শুধু বাহিরের আন্দোলনজনিত ব্যাঘাত কিছু নাই বলিয়াই, বাড়ীর মানুষগুলির পরস্পরের প্রতি টানটি আপনা হইতে এই শান্তিময় জীবনযাত্রা সৃষ্টি করিতে পারিল। এই তেরো বৎসরের মধ্যে জন্ম মৃত্যু রোগই বাড়ীর বিশেষ ঘটনা; তাহার প্রত্যেকটি ঘটনা বাড়ীর লোকগুলির মধ্যে ভালবাসার বন্ধনটিকে আরও দৃঢ় করিয়া দিয়া গেল। সন্ধ্যাকালে বাড়ীর সকলে একত্র হইয়া বসি। ছেলে মেয়েরা বড় হইয়া কেমন ভাল হইবে, কেমন কৃতকার্য্য হইবে, এ বিষয়ে বাবা মা যাহা আশা করেন, তাঁহাদের মুখে সেই কথা শুনি। বাবা মার ছোট বেলার গল্প, তাঁহাদের অতীত জীবনের নানা দুঃখ সংগ্রামের গল্প, তাঁহাদের কাছে শুনি। কাজ করিতে করিতে ও বিশ্রাম করিতে করিতে প্রায়ই বাবা ব্রহ্মসঙ্গীত গান করেন। তাঁর মুখ হইতে শুনিয়া শুনিয়া আমরা তাহা শিখিয়া ফেলি; বাল্যস্বরে কখনও কখনও বাবার সঙ্গে, মার সঙ্গে, তাহা গাই। বিশেষ বিশেষ রোগের বিপদের কি বিদেশযাত্রার দিনে বাবা আমাদের লইয়া ব্যাকুল ভাবে ছোট একটি প্রার্থনা করেন। কখনও তিনি আমাদের লইয়া শিক্ষাপ্রদ গল্প বলেন; কখনও কখনও সংবাদপত্র হইতে, বিশেষ জ্ঞাতব্য সংবাদ কিছু থাকিলে তাহা পড়িয়া শোনান। কখনও ভাল বই পড়িয়া শোনান। এই সকল সময়ে আমরা বাবা মার যে সঙ্গ টুকু পাই, তাহা আমাদের পরম লোভনীয় বস্তু হয়।

একটি দিনের কথা বিশেষ ভাবে মনে পড়িতেছে। শাস্ত্রী মহাশয়ের "পুষ্পমালা" তখন সবে-মাত্র বাহির হইয়াছে। তাহার "হরিষে বিষাদ" শীর্ষক কবিতাটি বাবা সন্ধ্যাবেলা আমাদের

সম্মুখে পড়িতে লাগিলেন। পড়িতে পড়িতে শেষ দিকটার করুণ বর্ণনা পড়িবার সময় ভাবাবেগে বাবার গলা ধরিয়া গেল; চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল; গদ্‌গদ্ কণ্ঠে কবিতাটির পাঠ শেষ হইল। সেই কবিতার গল্পটি সামান্য; পাঠক, আমার বাবা, নানা দোষ দুর্ব্বলতায় জড়িত সামান্য মানুষ মাত্র। কিন্তু যাহাই হউক, তিনি আমাদের বাবা। আমরা যে সেই হৃদয়স্পর্শী গল্পটিকে আমাদের বাবার কাছে বসিয়া, তাঁহার মুখের পড়া শুনিয়া, তাঁহার উদ্বেলিত ভাবের স্পর্শ পাইয়া, আস্বাদন করিলাম, ইহার ফল, ইহার মূল্য, আমাদের জীবনে অপরিমেয়। জগতের শ্রেষ্ঠ উপদেষ্টা বা বক্তার মুখের কথাতেও সেরূপ ফল হওয়া সম্ভব ছিল না।

যত বার আমি আমার শৈশবের সেই শান্তিময় গৃহকে স্মরণ করি, আমার মনের খেদ প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারি না। যখন ভাবি যে বর্ত্তমান যুগে আমাদের পরিবারগুলিকে এইরূপে ঘিরিয়া রাখিবার, ও পরস্পরের সঙ্গ ও প্রভাব তাহার মধ্যে সঞ্চিত ও ঘনীভূত করিবার কোন চেষ্টা নাই; যখন দেখি যে বর্ত্তমান যুগে গৃহ ও রাজপথ, গৃহ ও বাজার, যেন পরস্পরের সঙ্গে প্রায় যুক্ত ও মিশ্রিত হইয়া চলিয়াছে; যখন ভাবি যে বর্ত্তমান যুগে আমাদের ছেলেমেয়েরা বাপ মায়ের গল্প অপেক্ষা উপন্যাসের গল্পেই অধিক মত্ত হয়, বাপ মায়ের প্রভাব অপেক্ষা বাহিরের প্রভাবেই অধিক আন্দোলিত হয়; যখন দেখি যে আমাদের পরিবারসকলে সন্ধ্যাকালটিতে পরস্পরের সঙ্গচর্চ্চায় কাটাইবার সুযোগ একটুও অবশিষ্ট না রাখিয়া, তাহা কেবল আমোদ প্রমোদে সভাসমিতিতে অথবা ধর্ম্মসমাজের নানা কার্য্যে নিঃশেষে ব্যয় করা হয়,—তখন আমাদের হৃদয়ে ক্ষোভ আর ধরে না। মানব জীবনকে বিকশিত ও উন্নত করিবার সর্ব্বপ্রধান স্থান, গৃহ। এ বিষয়ে গৃহ ও গৃহের মানুষগুলির প্রভাব যাহা করিতে পারে, ধর্ম্মসমাজই হউক, বিদ্যালয়ই হউক, বক্তৃতাসভাই হউক,—কিংবা সাধুভক্তই হউন, মহাত্মাই হউন, জননায়কই হউন,—এ সকলের কিছু, বা এ সকলের কেহ, তাহার শতাংশের একাংশও করিতে পারে না। সেই গৃহকে আমরা বর্ত্তমান যুগে কি ভাবে অবহেলা করিতেছি!

বাবা যখন মাকে লইয়া তেজপুরে সংসার পাতিয়া বসেন, তখনও পূর্ব্ববঙ্গে নূতন আদর্শের বাতাস প্রায় পৌঁছে নাই। তদুপরি, আমাদের বংশে কন্যাপণ দিয়া বিবাহ করিতে হইত বলিয়া, সাধারণতঃ শ্বশুরবাড়ীতে বধূগণ অতিশয় অনাদর ও অসম্মানের পাত্রী হইতেন। পুরুষের পক্ষে পত্নীর সেবা করা তো দূরে থাকুক, পত্নীর প্রতি বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শনও তখন পূর্ব্ববঙ্গে লোকচক্ষে নিন্দার বস্তু ছিল। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, আমার বাবার প্রকৃতিতে, ব্রাহ্মণপণ্ডিতের সমুদয় তেজ দর্প ও কোপনস্বভাবকে অতিক্রম করিয়া, মাতাঠাকুরাণীর প্রতি একটি অতি সুকোমল প্রগাঢ় অনুরাগ এবং য়ুরোপের chivalryর অনুরূপ একটি সেবার ভাব, যৌবনকাল হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সমভাবে বর্ত্তমান ছিল। আমার বাল্যকালে আমি আমার বাবার ও মার ভিতরে যেরূপ প্রগাঢ় সদ্ভাব দেখিয়াছি, আমার সমবয়স্ক কাহারও বাড়ীতে গিয়া তাঁহার সদৃশ ভাব দেখিতে পাইতাম না। আমি বাল্যকালে একবার হঠাৎ বাবাকে লেখা মার এক খানি পত্র দেখিতে পাইয়াছিলাম। তাহাতে এই অনুরাগের দু একটি প্রকাশ ছিল; তাহা পড়িয়া আমি চমৎকৃত হইয়াছিলাম। আমি আপনাকে সৌভাগ্যবান্ মনে করি যে, এমন দাম্পত্যর ভিতরে আমার বাল্যজীবন কাটিয়াছে।

মাকে বাবা নিজে অতি যত্ন করিয়া লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। মা যত ভাল ভাল বাংলা বই পড়িয়াছেন, আজকালকার কলেজে শিক্ষিতা মেয়েদের অনেকে তাহা পড়েন নাই। আমার বাল্যকালের যে সকল পুস্তক এবং তদন্তর্গত কিছু কিছু বিষয় এখনও উজ্জ্বল ভাবে স্মরণ করিতে পারি, মাতাঠাকুরাণীর জন্য বাড়ীতে যে "বামাবোধিনী পত্রিকা" আসিত, তাহা তন্মধ্যে একটি।

এই পত্নীবৎসলতার জন্য বাবাকে নিজের ভাইদের, গ্রামবাসী লোকেদের, এবং কর্ম্মস্থলের বন্ধুগণের নিকটে অনেক বিদ্রূপভাজন হইতে হইত। কিন্তু হৃদয়ের এই শ্রেষ্ঠ আদর্শটি রক্ষা করিবার বিষয়েও বাবা আজীবন লোকমত অগ্রাহ্য করিয়া চলিয়াছেন। বাবা ও মা উভয়েই যখন বৃদ্ধ, তখনও বাবা অবিশ্রাম বিশ্বস্ত সেবকের ন্যায় আমাদের রুগ্না মাতার শুশ্রূষা করিয়াছেন। বাবার সঙ্গে যখন আমরা শেষ দেখা করিতে যাই, তখনও তিনি, "মাকে আমরা ভাল করিয়া দেখিব তো," এই বলিয়া নিজের ব্যস্ততা প্রকাশ করিয়াছেন। কয়েক মাস পূর্ব্বে মাতাঠাকুরাণী যখন কলিকাতায় আমার নিকটে আসিয়া বাস করিতেছিলেন, তখন তাঁহাকে গৌহাটীতে লইয়া যাইবে কে, এই প্রশ্ন উঠাতে, বাবা গৌহাটী হইতে তাঁহার এক পত্রে সগর্ব্বে লিখিয়াছিলেন, "এখনও আমি কলিকাতায় গিয়া, পথে তোমাকে রক্ষা করিয়া, তোমাকে এখানে লইয়া আসিতে সমর্থ।" মাতাঠাকুরাণী এখন তাঁহার দীর্ঘ ৫৮ বৎসর ব্যাপী বিবাহিত জীবনের পরে, তাঁহার এই বিশ্বস্ত সেবকের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন।

আমার জন্মের পূর্ব্ব হইতে বাবার জীবনে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাব পতিত হইতে আরম্ভ হয়। তখন ব্রাহ্মসমাজে কেশবচন্দ্রের নব অভ্যুদয়ের যুগ। তেজপুরে তখন ক্ষুদ্র একটি ব্রাহ্মসমাজ ছিল। বাবা ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া ব্রহ্মোপাসনা গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু প্রাচীন সমাজের সহিত যোগ ছিন্ন করা কখনও ভাল মনে করেন নাই। আমি যখন ব্রাহ্মসমাজে আসি, তখন আমাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেন নাই; সমাজ পরিত্যাগ ও আত্মীয়গণের সহিত বিচ্ছেদ ঘটানো অনুচিত, ইহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

আমি ব্রাহ্মসমাজে আসাতে তিনি যে কিরূপ মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন, তাহা বাক্যে বর্ণনা করা অসম্ভব। তাঁহার ক্লেশের এক একটি দৃশ্য এখনও মনে পড়িলে আমার শরীর মন শিহরিয়া উঠে। প্রথম সন্তান বলিয়া আমি তাঁহার অতিশয় যত্ন ও ভালবাসার বস্তু হইয়াছিলাম। সে যত্ন কিরূপ? আমার সাড়ে তিন বৎসর বয়সের সময় হইতে তিনি আমাকে মুখে মুখে পড়াইতে আরম্ভ করেন; শেষ রাত্রিতে শয্যায় বসিয়া ব্যাকরণ ও নানা শ্লোক মুখস্থ করাইতেন। আমার এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পর্য্যন্ত তিনি এইরূপে অবিরাম আমার পড়ার সাহায্য করিয়াছেন। একবার আমার একখানি পাঠ্য পুস্তক বাজারে শীঘ্র কিনিতে পাওয়া যাইবে না, ইহা শুনিয়া তিনি অন্যের পুস্তক হইতে তাহা হাতে লিখিয়া লইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে তাঁহার ন্যায় পুত্রবৎসল ও যত্নশীল পিতা আজ পর্য্যন্ত আমার চক্ষে পড়ে নাই। কেবল John Stuart Mill এর আত্মজীবনী পড়িবার সময়, তাঁহার পিতার তাঁহার শিক্ষাবিষয়ে যত্নের কথা পড়িয়া, আমার বাবার সঙ্গে তাঁহার পিতার সাদৃশ্য অনুভব করিয়াছিলাম। আমার বাবা নিজের অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা আমার সহিত জড়িত করিয়াছিলেন। আমি ব্রাহ্ম হওয়াতে সে সকল ভগ্ন হইয়া যায়।

বাবার মনে এই আঘাত দিয়া বহু বৎসর পর্য্যন্ত আমার অন্তরের গোপনে যে কি গভীর বিষাদ ও অন্ধকার সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা করিতে পারি না। এক এক সময় মনে হইত, বাবার চোখের জলে আমার জীবনের সব কৃতকার্য্যতা, সব সাধনা, ভাসিয়া চলিয়া যাইবে। কিন্তু আমার প্রতি ঈশ্বরের আশ্চর্য্য করুণা এই যে, ক্রমে ক্রমে বাবার সহিত আমার সম্বন্ধ আবার ভাল হইয়া গেল। তিনি উদারহৃদয় মানুষ ছিলেন; ক্রমে তিনি আমার সরল বিশ্বাসকে বুঝিলেন ও শ্রদ্ধা দিতে লাগিলেন। আমার উপবীতত্যাগ এবং অসবর্ণ বিবাহও আমার মহামনা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত পিতার পিতৃস্নেহকে রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিল না। ক্রমে তিনি এ অধম পুত্রকে পুনরায় নিজ স্নেহের ও আদরের ভিতরে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তখন হইতে আমি তাঁহার নিকট হইতে যে-আদর, ও শুধু আদর নহে, যে সম্মানপূর্ণ

ব্যবহার, প্রাপ্ত হইয়াছি, আমি কদাচ তাহার যোগ্য নহি। তাহা তাঁহার প্রকৃতির মহত্ত্বেরই পরিচায়ক।

ব্রাহ্মসমাজ আমাকে তাঁহার কোল হইতে ছিনিয়া লইয়াছে, এই বলিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তাঁহার যে বিরাগ ও ক্রোধ জন্মিয়াছিল, তাহা অধিক দিন রহিল না। ব্রাহ্মসমাজের অনেক লোক পরে আমাদের গৌহাটীর বাড়ীতে গিয়াছেন, ও বাবার উদার ব্যবহার ও গুণগ্রাহী স্বভাব দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া আসিয়াছেন। ভক্তিভাজন শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রতিই বাবার বিশেষ আক্রোশ হইবার কথা। কিন্তু সেই শাস্ত্রীমহাশয় ১৮৯৮ সালে যখন গৌহাটীতে গিয়া "জাতীয় উন্নতি" বিষয়ে কয়েকটি বক্তৃতা করেন, বাবা তাহা শ্রবণ করিয়া প্রীত হইয়া তাহার অনেক প্রশংসা করেন, ও বাড়ীতে আসিয়া মাকে সেই বক্তৃতার মর্ম্ম ব্যাখ্যা করেন। নিম্নশ্রেণীর উন্নতি, ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, ভারতের সর্ব্বজাতির মিলন ও একতা, এই সকল বিষয়ে শাস্ত্রীমহাশয় বক্তৃতা করিয়াছিলেন; এই সকল বিষয়ে বাবার বিশেষ উৎসাহ ছিল। শাস্ত্রী মহাশয় সেইবার গৌহাটী ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে বাবার সঙ্গে দেখা করিতে আমাদের বাড়ীতে গিয়াছিলেন। বাবা স্বয়ং পাখা হাতে করিয়া শাস্ত্রী মহাশয়কে বাতাস করিতে গেলেন; শাস্ত্রী মহাশয় বাতাস করিতে দিলেন না। আমার প্রসঙ্গ উঠিলে বাবা বলিয়াছিলেন, "সে তো আর এখন আমার ছেলে নাই, এখন সে আপনারই ছেলে হইয়া গিয়াছে।"

আমরা এই দরিদ্র অথচ তেজস্বী বহু লোকের সম্মানভাজন অথচ অনাড়ম্বর, সেবা গ্রহণে চিরকুণ্ঠিত, সেবাদানে চির উন্মুক্ত, বন্ধু-বৎসল পত্নী-বৎসল পুত্র-বৎসল, ও স্বাবলম্বনে কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় ও শ্রমে দৃঢ়, ভগবদ্‌বিশ্বাসী পিতার সন্তান। ভগবান তাঁহার আত্মাকে চিরশান্তি প্রদান করুন, এবং আমাদিগকে তাঁহার সদ্‌গুণসকলে চিরপ্রতিষ্ঠিত রাখুন।

ব্রাহ্মসমাজ

সম্পাদক পরিবর্ত্তন :—অসুস্থতা নিবন্ধন শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেন সম্পাদকের পদ পরিত্যাগ করাতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ সভাতে তাঁহার স্থানে শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর রায় সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন।

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ১৯শে জুলাই কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত হরকুমার গুহের জামাতা বাবু সতীশচন্দ্র সরকার দুইটি শিশুসন্তান ও বিধবা পত্নীকে অসহায় অবস্থায় রাখিয়া ইরিসিপিলাস্ রোগে অল্প সময় মধ্যে পরলোক গমন করিয়াছেন। বন্ধুবান্ধবগণ ইঁহার ধর্ম্মপ্রাণতায় মুগ্ধ ছিলেন।

বিগত ১৮ই জুলাই কলিকাতা নগরীতে পরলোকগত কল্যাণকুমার চট্টোপাধ্যায়ের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং পিতা ডাক্তার পূর্ণানন্দ চাটার্জ্জি সংক্ষিপ্ত জীবনী বর্ণনা করিয়া গভীর বিশ্বাসপূর্ণ হৃদয়ে প্রার্থনা করেন।

শান্তিদাতা পিতা পরলোগত আত্মাদিগকে চিরশান্তিতে রাখুন ও আত্মীয় স্বজনদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

শুভ বিবাহ—বিগত ১৩ই জুলাই কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সরকারের কনিষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া মাধুরী ও পরলোকগত বাবু হেমেন্দ্রমোহন বসুর চতুর্থ পুত্র শ্রীমান সুধীন্দ্রমোহনের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ১৭ই জুলাই কার্সিয়াং নগরীতে পরলোকগত বাবু মতিলাল হালদারের চতুর্থকন্যা কল্যাণীয়া কুমারী উষালতিকার সহিত পরলোকগত মহেন্দ্রনাথ সেনের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ পাঁচুগোপালের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে কন্যার মাতা নিম্নলিখিত দান করিয়াছেন:—সাঃ ব্রাঃ সমাজ স্থায়ী প্রচার ফণ্ড ১০৲, কলিকাতা অনাথ আশ্রম ১০৲, একটি নিরুপায় ব্রাহ্ম পরিবার ১০৲, কুষ্ঠাশ্রম (বৈদ্যনাথ) ১০৲, দুর্ভিক্ষ ফণ্ড ১০৲।

বিগত ২১শে জুলাই কলিকাতা নগরীতে পরলোকগত গুরুপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া রমলা ও শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ করের মধ্যম পুত্র শ্রীমান মহানন্দের শুভ পরিণয় সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ২৩শে জুলাই কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র সরকারের জ্যেষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া তমালিকা ও শ্রীযুক্ত শরদিন্দু বিশ্বাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান বিমলেন্দুর শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য আচার্য্যের কার্য্য করেন।

প্রেমময় পিতা নবদম্পতিদিগকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

ছাত্রীর কৃতিত্ব—বিগত বি, এস্ সি পরীক্ষায় অমিয়লতা ঘোষ উত্তীর্ণ হইয়াছেন দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম।

ব্রাহ্ম ছাত্রদের কৃতিত্ব—বিগত বি, এস্ সি পরীক্ষায় নিম্নলিখিত ব্রাহ্ম ছাত্রগণ (আমরা যত দূর জানিতে পারিয়াছি) উত্তীর্ণ হইয়াছেন দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম:—শিবসুন্দর দেব, শচীন্দ্রনাথ মল্লিক, প্রসূন রায় চৌধুরী।

দুঃখের বিষয় প্রসূনের পরলোকগমনের পর তাহার পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে।

কৃতী ছাত্র—শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন খাস্তগিরের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান সতীশরঞ্জন এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি, এস্, সি, উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন জানিয়া আমরা বিশেষ সুখী হইলাম। ইতি পূর্ব্বে ইনি পি, এইচ ডি, ও এফ্ আর এস্ ই, উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

পূর্ব্ব বাঙ্গলা ব্রাহ্ম-সম্মিলনী—"মঙ্গলময় পরমেশ্বরের শুভ ইচ্ছায় ময়মনসিংহের ব্রাহ্ম বন্ধুগণ পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসম্মিলনীর আগামী বড়ত্রিংশৎ বার্ষিক অধিবেশন সারদীয় অবকাশের সময় ময়মনসিংহে সম্পাদনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। সম্মিলনীর বার্ষিক অধিবেশন ব্রাহ্মগণের এবং ব্রাহ্মসমাজের হিতাকাঙ্ক্ষিগণের বর্ষমধ্যে ব্রহ্মোৎসব সম্ভোগের উত্তম ক্ষেত্র। আমরা একান্ত মনে আশা করি এই উৎসবে যোগদান করিবার জন্য এখন হইতে সকলে প্রস্তুত হইবেন। উপযুক্ত সময়ে উৎসবের কার্য্যপ্রণালী-সমন্বিত নিমন্ত্রণপত্র প্রেরিত হইবে।" সম্পাদক

দান—গিরিডি প্রবাসী শ্রীযুক্ত রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার পরলোকগতা সহধর্ম্মিণী আতরমণি দেবীর পঞ্চম বার্ষিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠান উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার বিভাগে ৪৲, সাধনাশ্রমে ২৲ এবং গিরিডি ব্রাহ্মসমাজে ২৲ দান করিয়াছেন।

এ দান সার্থক হউক ও পরলোকগত আত্মা চিরশান্তি লাভ করুন।

ভুলসংশোধন—বিগত ১লা শ্রাবণের তত্ত্বকৌমুদীতে গৌরীপুর নগরীতে অনুষ্ঠিত যে বিবাহের সংবাদ "ধুবড়ী ব্রাহ্মসমাজ" হেডিংএর নীচে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার সহিত ধুবড়ী ব্রাহ্মসমাজের কোন সম্পর্ক নাই, সমাজের সম্পাদক এরূপ জানাইয়াছেন। গৌরীপুর ধুবড়ীর অন্তর্গত মনে করাতে আমাদের উক্তপ্রকার ভুল হইয়াছিল।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় দ্বারা ১৮ই শ্রাবণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত। —শ্রীবরদাকান্ত বসু বি এ, সম্পাদক

Registered NO 65

অসতো মা সদগময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৬ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৪৯ম ভাগ।	১লা ভাদ্র, বুধবার, ১৩৩৩, ১৮৪৮ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯৭	প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০
৯ম সংখ্যা।	18th August, 1926.	অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

তোমা বিনা

এ জগৎ তোমা বিনা
শূন্য সুদূরতর,
দিবস আঁধারে ঘেরা—
রূপ ভয়ঙ্কর।
যত আশা ভালবাসা—
সব যায় মুছে,
ধরার দুর্ব্বহ ভার,—
সব যায় ঘুচে।
জাগে এক অন্ধ ভীতি,—
নির্ম্মম নিবিড়,—
ছায়া বিস্তারিয়া যেন
মৃত্যু-সমাধির!
বিস্মৃতি বিস্তারি' তার
তিমির অঞ্চল,—
ঢেকে ফেলে অতীতের,
সম্পদসকল।
সে আনন্দ, সে সুগন্ধ
সে প্রেম-লহরী,
খেলে না জীবনে নব—
নব রূপ ধরি'।
তোমা ছাড়া—সব হারা—
আমি কি আমারি?
সুদূরতর অন্ধকার—
কি ক'রে সাঁতারি?

শ্রী মনোমোহন চক্রবর্ত্তী

হে বিশ্বমানবের চির পরিত্রাতা, জীবনের অদ্বিতীয় প্রভু, তোমার অসীম প্রেমে তুমি যেমন মানবের উদ্ধারের জন্য চিরদিন তোমার বিশুদ্ধ ধর্ম্মের বার্ত্তা প্রকাশ করিয়া আসিয়াছ, তেমনি তোমার অপার করুণাতে জগতের পরম কল্যাণের জন্যই তোমার উদার বিশ্বজনীন পবিত্র ধর্ম্ম আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছ,—জীবনপ্রদ সত্য পূজা এ দেশে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ। আমরা এখনও তোমার সে পরম দয়ার মূল্য সম্যক্ প্রকারে উপলব্ধি করিতে পারি নাই—এখনও সে পূজা এ দেশে উপযুক্তরূপে বিস্তার লাভ করে নাই। আমরা যাহারা তোমার কৃপায় ইহার আশ্রয়ে আসিয়াছি, আমরাও যে সমগ্র মন প্রাণ দিয়া ইহাকে অবলম্বন করিতে পারিয়াছি, তাহা বলিতে পারিতেছি না। আমরা যদি তোমার সত্য পূজাতে আপনাদিগকে সে ভাবে অর্পণ করিতে পারিতাম, তবে আমাদিগকে এরূপ দুঃখ দুর্গতির মধ্যে জীবন কাটাইতে হইত না, তোমার মহান্ ধর্ম্মও এরূপ ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিত না। আমাদের অনুপযুক্ততা, আলস্য, উদাসীনতা, সকলই তুমি দেখিতেছ। হে দুর্ব্বলের বল, তুমি বল প্রদান না করিলে আমরা বল কোথায় পাইব? আমরা যে দিন দিন অধিক হইতে অধিকতর দুর্ব্বলই হইয়া পড়িতেছি! তুমি কৃপা করিয়া আমাদের প্রাণে নূতন উৎসাহ, নূতন বল, প্রদান কর। তোমার পবিত্র উপাসনাকে আমরা দৃঢ় ভাবে অবলম্বন করিয়া আমাদের জীবনকে সার্থক করি। তোমার পবিত্র ধর্ম্মের গৌরবও রক্ষা করি। তোমার মঙ্গল ইচ্ছাই আমাদের প্রতি জীবনে ও সমগ্র সমাজে জয়যুক্ত হউক। তোমার সত্য পূজা আমাদের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হউক। তোমার ইচ্ছাই সর্ব্বোপরি পূর্ণ হউক।

নিবেদন।

মননের দ্বারা জীবন—সংসারে কত লোক আসে যায়—তারা পশুপক্ষীর মত খায় দায়, আমোদ আহ্লাদ করে, যখন উপর থেকে ডাক আসে চ'লে যায়! কেহ তাদের জানে না, খবর লয় না। কিন্তু এক এক জন লোক আছেন, যাঁরা সাধারণ লোকের মতন চলেন না; তাঁরা মননের দ্বারাই জীবিত থাকেন। তাঁরা আদর্শ দেখিয়া চলেন, তাঁরা "তারা দেখা" লোক, তারার দিকে চেয়ে চলেন। পথে কত বন জঙ্গল, খানা গর্ত্ত আছে, তার দিকে লক্ষ্য নাই; দৃষ্টি ঊর্দ্ধ দিকে; সকল বিপদ তাঁরা বরণ ক'রে লন—ঐ আদর্শের দিকে চেয়ে ধন জন, সুখ স্বার্থ সমস্তই তাঁরা বিসর্জ্জন দেন। বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ, চৈতন্য, রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, ইহারা "তারা দেখা" লোক। তাঁরা এক একটী আদর্শ বেছে নিয়েছিলেন; ঐ আদর্শের জন্য বেঁচেছেন, আদর্শের জন্য মরেছেন, তাঁরা আপনার সুখ স্বার্থের দিকে তাকান নাই; নিন্দা প্রশংসায় বিচলিত হন নাই; বিপদ, অপমান, নির্য্যাতন, মৃত্যুভয় তাঁহাদিগকে শঙ্কিত করতে পারে নাই। ইহারাই প্রকৃত মানুষ ছিলেন। ইহারাই প্রকৃত জীবন ধারণ ক'রেছিলেন। ইহাদের আদর্শ ধ'রে চলতে হবে। মননের দ্বারা যে জীবিত থাকে, সেই প্রকৃত জীবন ধারণ করে।

প্রকৃত সাহস—বিপদকে বরণ করা, আক্রমণের প্রতিরোধ করা, নিপীড়িতকে রক্ষা করতে যেয়ে আপনাকে বিপদগ্রস্ত করা, ইহাতে প্রকৃত সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও সাহসের কার্য্য আছে। যেখানে সত্যে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে জনমতের বিরুদ্ধে কথা বলা যায়, যেখানে সত্যের খাতিরে প্রিয় জনেরও অপ্রীতিকর কার্য্য করা যায়, যেখানে সত্যের জন্য সকলের দ্বারা পরিত্যক্ত হওয়া যায়, সেখানেই প্রকৃত সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়। আবার যেখানে নিজের ভ্রম বুঝিলে অম্লান বদনে তাহা স্বীকার করা যায়, যেখানে অপরাধ ক'রে তাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা যায়, যেখানে আপনার কলঙ্ক আপনি মুক্ত কণ্ঠে বলতে পারা যায়, সেখানেই প্রকৃত সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়। অপরকে আক্রমণ করা বরং সহজ; নিজকে আক্রমণ করা, নিজের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান্ হওয়া, নিজের অপরাধ, ক্রুটি, ভ্রম, কলঙ্ক স্বীকার করা, কঠিন ব্যাপার। এখানেই প্রকৃত সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়।

সত্য পথে চল—সত্যস্বরূপের উপাসক তোমরা, সত্যে প্রতিষ্ঠিত হও; সত্য পথ হ'তে ভ্রষ্ট হ'লে সত্যস্বরূপের উপাসনা করা চলে না। সে উপাসনা কপটতা হবে। সত্যকাম জাবালী সত্য ব'লেই ব্রাহ্মণ ব'লে পরিচিত হলেন। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির একটু সত্যের অপলাপ ক'রে নরক দর্শন ক'রেছিলেন; নচিকেতা পিতাকে সত্যে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য যমপুরে গমন করলেন; মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সত্যের জন্য বিশ্বজিৎ যজ্ঞে ট্রাষ্ট সম্পত্তি পর্য্যন্ত, হাতের অঙ্গুরীয় পর্য্যন্ত, দিয়ে ফেল্‌লেন; ব্রাহ্ম সত্যের অনুরোধে আপনার কৃত অপরাধ অযাচিত ভাবে রাজদ্বারে স্বীকার ক'রে কারা বরণ করতে গেলেন। ব্রাহ্ম যুবক ঘোর দরিদ্রতার তাড়নেও ভীত না হ'য়ে সত্য বয়স স্বীকার ক'রে উৎকৃষ্ট গবর্ণমেণ্ট পদপ্রাপ্তির আশা পরিত্যাগ ক'রে দারিদ্র্যই বরণ করলেন। সত্যস্বরূপের যাঁরা উপাসক সত্যই তাঁদের সম্বল, ভয়ে কিম্বা প্রলোভনে, আমার সুবিধার জন্য কিম্বা গুরুতর প্রয়োজনে, এই সত্য পথ হ'তে বিচ্যুত হবে না। সত্য বাক্য, সত্য কার্য্য, সত্য ভাব, সত্য চিন্তা, ইহাই সত্যস্বরূপের পূজার উপকরণ, ইহাই জীবনের ভিত্তি। সত্য পথে চল; যদি জীবন যায়, সর্ব্বস্ব যায়, তবুও সত্যকেই জীবনের সম্বল ক'রে চল।

সম্পাদকীয়

ভাদ্রোৎসব—৬ই ভাদ্র, আমাদের পক্ষে ত কথাই নাই, জগতের ইতিহাসেই একটি বিশেষ স্মরণীয় দিন। ১৭৫০ শকের এই তারিখে (১৮২৮ সালের ২০শে আগষ্ট দিবসে) কমললোচন বসুর চিৎপুর রোডস্থিত গৃহের একটি ক্ষুদ্র কক্ষে অল্প কয়েকটি অন্তরঙ্গ বন্ধুকে লইয়া রাজর্ষি রামমোহন যে পবিত্র ব্রহ্মোপাসনার বীজ রোপিত করেন, তাহার অনন্ত সম্ভাবনার কথা যদি আমরা কল্পনাবলে ধারণা করিতে পারি, তবেই ইহার মাহাত্ম্য আমাদের পক্ষে কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করা সম্ভবপর। অপর লোকের কথা দূরে থাকুক, আমাদের মধ্যে কয় জন তাহা সম্যক্‌প্রকারে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছি, তাহা জানি না। যদিও এই ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার দুই বৎসর মধ্যেই উহার জন্য প্রশস্ত গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তথাপি অচিরকাল মধ্যে রামমোহন বিদেশযাত্রা এবং পরে লোকান্তরগমন করাতে যে সম্যক্ পরিচর্য্যার নিতান্তই অভাব হইয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। এরূপ অবস্থায় যে শিশু সমাজটি বাঁচিয়া ছিল, তাহা প্রেমময় পিতার বিশেষ করুণারই পরিচায়ক সন্দেহ নাই। তাঁহারই নির্দ্দেশে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় অসাধারণ নিষ্ঠার সহিত একাকী উহাকে কোনও প্রকারে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন। যদিও উহার বিকাশসাধনে সাহায্য করিবার শক্তি তাঁহার ছিল না, তথাপি তিনি যাহা করিয়াছেন তাহার জন্যই আমরা তাঁহার নিকট একান্ত ঋণী। তাঁহার শক্তি সামর্থ্য অনুসারে তিনি অতি বিশ্বস্ততার সহিতই উহার সেবা করিয়াছিলেন; তাহা না হইলে অঙ্কুরিত হইবার পূর্ব্বেই উহা বিনাশপ্রাপ্ত হইত—উহার অস্তিত্ব একেবারে লুপ্ত হইত। নবধর্ম্মের বিশালতা তিনি সম্যক প্রকারে ধারণা করিতে না পারিলেও, উহার মূল প্রকৃতিটি বুঝিতে তিনি ভুল করেন নাই। তাই তিনি আর যাহাই করুন বা না করুন, ব্রহ্মোপাসনাটি কখনও পরিত্যাগ করেন নাই। ব্রহ্মোপাসনার প্রকৃত স্বরূপও যে তিনি যথার্থভাবে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, রাজর্ষির অন্তরের আদর্শটি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারি না।

তাহা না বুঝিবারই কথা। তাঁহার ব্যক্তিগত সাধনপ্রণালী, প্রকৃত ব্রহ্মোপাসনা, তিনি তখনকার ব্রাহ্মসমাজে প্রচলিত করিতে পারেন নাই; যাহাদিগকে অবলম্বন করিয়া তিনি কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের কাহারই তাহা ধরিবার বুঝিবার অবস্থা ছিল না। কাজেই প্রকৃত ব্রহ্মোপাসনার সংক্ষিপ্ত ক্রম বা প্রণালীর কথা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া প্রচার করিলেও, তিনি উহা কার্য্যতঃ প্রচলিত করিয়া যাইতে পারেন নাই। হয়ত তিনি মনে করিয়াছিলেন, জমি প্রস্তুত না করিয়া উহা প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা বৃথা। তাই প্রথম জমি প্রস্তুত করার মত প্রারম্ভিক কার্য্যের মাত্র সূচনা করিয়াছিলেন,—অবস্থায় বাধ্য হইয়াই সমাজের কার্য্যে তদনুরূপ প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন। আশা করিয়াছিলেন পরে পূর্ণতর প্রণালী প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবেন। তাঁহাকে তত তাড়াতাড়ি সমস্ত কার্য্য অসম্পূর্ণ অবস্থায় ফেলিয়া বিদেশযাত্রা করিতে না হইলে, নিশ্চয়ই আমরা প্রকৃত ব্রহ্মোপাসনা অবলম্বিত হইয়াছে দেখিতে পাইতাম। সে যাহা হউক, এরূপ অবস্থায় বিদ্যাবাগীশ মহাশয় যদি ব্রহ্মোপাসনার পূর্ণ স্বরূপটি বুঝিতে সমর্থ না হইয়া থাকেন, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। কিন্তু ব্রহ্মোপাসনাই যে তাঁহার ধর্ম্মের প্রাণ, তাহা বুঝিতে তিনি একটুকুও ভুল করেন নাই। তিনি সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্মানুভূতিতে পৌঁছিতে না পারিয়া, পরোক্ষ পরম্পরা উপাসনাই অবলম্বন করিয়াছিলেন সত্য; অপরাপর ধর্ম্মসম্বন্ধে অজ্ঞতাহেতু হিন্দুধর্ম্মের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ ছিলেন বটে; তথাপি তাঁহার জ্ঞান বুদ্ধিতে যতটুকু বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তদনুসারে উহাকে যে অতি নিষ্ঠার সহিত ধরিয়া ছিলেন, ইহাও সামান্য গৌরবের বিষয় নহে। সেই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে তিনি ক্ষীণ আলোকবর্ত্তিকাটি জ্বালাইয়া না রাখিলে, বীজটিকে বাঁচাইয়া না রাখিলে, মহর্ষি প্রভৃতি পরবর্ত্তী নেতাগণ তাঁহাকে পুনর্জ্জীবিত ও বিকশিত করিতে পারিতেন কি না বলা যায় না। যদিও তাঁহারা তাঁহার অপেক্ষা স্পষ্টতর ও সত্যতর ভাবে উহার প্রকৃতিটা বুঝিয়া, উহাকে অনেক উন্নত ও বিকশিত করিয়াছিলেন, নানা মিথ্যা আবর্জ্জনা হইতে মুক্ত করিয়া বিশুদ্ধতর করিয়াছিলেন, তথাপি মহর্ষি যে তাঁহার নিকট হইতেই প্রথম শিক্ষা পাইয়াছিলেন, তাহা না হইলে হয়ত পথ পাইতেন না, অন্ততঃ পাওয়া খুবই কঠিন হইত, এবং পরবর্ত্তিগণও যে আবার মহর্ষির নিকট শিক্ষা পাইয়াই যাহা কিছু উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সে কথা ভুলিলে চলিবে না। বটবৃক্ষ কালে যতই বিস্তারলাভ করুক না কেন, উহা যে ক্ষুদ্র বীজেরই পরিণতি, তাহাতে ত আর কোনই সন্দেহ নাই। মানুষ পরে জ্ঞান বিজ্ঞানে যতই উন্নত হউক না কেন, প্রথম শিক্ষা নিশ্চয়ই তাহার ভিত্তিভূমি। বহু যোজনব্যাপী বিশাল নদীর উৎপত্তি অন্ধকারময় গিরিগুহায় লুক্কায়িত ক্ষুদ্র উৎস-নিঃসৃত সংকীর্ণ জলধারা হইতে। যতই ক্ষুদ্র ও অলক্ষিত হউক না কেন, কোথাও আদি জন্ম উপেক্ষণীয় নহে, বরং সর্ব্বাপেক্ষা বরণীয়ই। কারণ, উহাই সমস্ত ভবিষ্যৎ উন্নতি ও বিকাশের ভিত্তি-ভূমি। অথচ অনেক সময়ই মানুষ তাহার মূল্য বুঝে না, সে দিকে লক্ষ্য করে না। আমাদেরও তাহাই হইয়াছে। আমরা দীর্ঘকাল উহার কোনও সংবাদই রাখিতাম না, পরে সংবাদ পাইয়াও উপযুক্ত আদর করিতেছি না। যদি তাহা করিতাম, তবে নিশ্চয়ই অধিকতর উৎসাহের সহিত এই উৎসব সম্পন্ন করিতাম এবং তাহা হইতে অধিকতর উন্নতি এবং কল্যাণও লাভ করিতে সমর্থ হইতাম। বলা বাহুল্য, আদিকে সমাদর করিতে যাইয়া তাহার অবিকশিত অবস্থায় আবদ্ধ হইয়া থাকিলে, প্রকৃত সম্মান প্রদর্শিত হয় না—তাহাকে উন্নতি ও বিকাশের পথে অগ্রসর করিলেই যথার্থ আদর দেখান হয়। এই মাপকাঠি দ্বারা বিচার করিলে কি দেখিতে পাই? ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রহ্মোপাসনার মূল প্রকৃতি বুঝিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী নেতাগণ উহাদের যতটা উন্নতি ও বিকাশ সাধন করিয়া গিয়াছেন, আমরা কি তাহা হইতে একপদও অগ্রসর করিতে পারিয়াছি, না, সে বিষয়ে যত্নশীল আছি? যদি অন্ততঃ সেরূপ চেষ্টা যত্নও না করি, তবে কি আমরা যথার্থ সেবক বলিয়া গণ্য হইতে পারি? আমরা ধর্ম্মের উপযুক্ত সমাদর করিতেছি বলা যায়? বাস্তবিক উহার মূল্য যদি আমরা সম্যক্ প্রকারে হৃদয়ঙ্গম করিতাম, তবে নিশ্চয়ই উহার সেবাতে আপনাদিগকে অর্পণ করিতাম। প্রকৃতপক্ষে আমরা কি দেখিতে পাই? ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রহ্মোপাসনাকে জীবনে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য আমাদের আগ্রহ ও যত্নের নিতান্ত অভাব কি দৃষ্ট হয় না? উন্নতি ও বিকাশ ত দূরের কথা, পূর্ব্বাবস্থাই কি আমরা রাখিতে সমর্থ হইয়াছি? দিন দিন কি শিথিলতা ও উদাসীনতা, অবনতি ও অধোগতিই দেখা যাইতেছে না? ইহা যে মৃত্যুই সূচনা করিতেছে। উন্নতি ও বিকাশই জীবনের লক্ষণ—স্থিতিশীলতাও নহে। জীবন্ত ধর্ম্ম একই অবস্থায়ও থাকিতে দেয় না, অবশ্যম্ভাবীরূপেই সকল প্রকার উন্নতি ও বিকাশের পথে লইয়া যায়। আমরা কি দেখি নাই, যাঁহাদের জীবনে যথার্থ ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রহ্মোপাসনার বীজ উপ্ত হইয়াছিল, তাঁহারা নানাদিকে কি প্রকার পরিবর্ত্তিত ও বিকশিত হইয়াছিলেন? তাঁহারা কেহই পূর্ব্বাবস্থায় থাকিতে পারেন নাই। যেমন ব্যক্তিগত তেমনি সামাজিক জীবনেও তাহারই পরিচয় আমরা পাইয়াছি। উহা সামাজিক জীবনকে কত উন্নত ও বিকশিত, কত পরিবর্ত্তিত, কত সংশোধিত, বিশুদ্ধ ও সর্ব্বপ্রকার মলিনতাবর্জ্জিত করিয়াছিল! ক্ষুদ্রতা ও সংকীর্ণতাকে বিদূরিত করিয়া কত সম্প্রসারিত করিয়াছিল! কত কদর্য্যতা দূর করিয়া সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়াছিল! যদি বর্ত্তমানে তাহা দেখিতে না পাওয়া যায়, তবে কি বলিতে হইবে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রহ্মোপাসনা সে শক্তি হারাইয়াছে; উহা মৃত হইয়া গিয়াছে? না, ইহাই বলিতে হইবে যে, উষর ভূমিতে পতিত হওয়াতে এবং উপযুক্ত পরিচর্য্যার অভাবে সে বীজ আমাদের জীবনে ও সমাজে অঙ্কুরিত ও বিকশিত হইতে পারিতেছে না? নিশ্চয়ই সকলকে স্বীকার করিতে হইবে আমাদের দোষেই এরূপ ঘটিতেছে, একমাত্র আমরাই এই জন্য দায়ী। উহা আমাদের জীবনের উপরি ভাগেই পতিত হইয়াছে, ভিতরে প্রবেশ করিয়া আর রস সঞ্চয় করিতে পারিতেছে না, অঙ্কুরিত ও বিকশিত হইবার সুযোগ পাইতেছে না—আমরা উহার উপযুক্ত আদর ও পরিচর্য্যা করিতেছি না। যদি আমরা যথার্থ আগ্রহ ও যত্নের সহিত উহার সেবা করিতাম, উহাকে হৃদয়ের অভ্যন্তরে গ্রহণ করিতাম, সত্যভাবে জীবনে অবলম্বন করিতাম, তবে যে শুধু আমরা পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতাম,

ইহা অপেক্ষা উন্নততর ও মহত্তর হইতাম, তাহা নহে, ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজকে পূর্ব্ববর্ত্তিগণ যে উচ্চ অবস্থায় রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহা হইতেও অন্ততঃ কিছু অগ্রসর করিতে সমর্থ হইতাম। কেন না ইহাই ক্রমোন্নতির প্রাকৃতিক নিয়ম। অনন্ত উন্নতিশীল জীবন্ত ধর্ম্ম ও ব্রহ্মোপাসনা যেখানে সত্যভাবে কাজ করিবে সেখানে এই রূপই হইবে, কদাচ ইহার অন্যথা হইবে না। আমাদের পক্ষে জগতের সাধারণ নিয়ম অন্য প্রকার হইয়া যাইতে পারে না। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণ করিতেছে, আমরা সত্য ভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রহ্মোপাসনাকে অবলম্বন করি নাই, আমাদের কাজ আমরা ঠিক ভাবে করিতেছি না। এ বিষয়ে আমাদের যে গুরুতর কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব রহিয়াছে, তাহা আমরা পালন করিতেছি না। আমরা আত্মদোষ স্খালনের জন্য যত প্রকার যুক্তি বিচারই অবলম্বন করি না কেন, বর্ত্তমান অবস্থার অন্য কোনও কারণই বাহির করিতে পারিব না, কোনও রূপেই আমাদের উক্ত দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারিব না। আনুষঙ্গিক আরও অনেক কারণ থাকিতে পারে বটে। কিন্তু তাহা নিশ্চয়ই মুখ্য কারণ নহে; আর তাহাতে আমরা আমাদের দায়িত্ব হইতে কিছু মাত্রও মুক্তি পাইতে পারি না। আমাদের এই দায়িত্ব অনুভব না করিতে পারিলে, আমরা ভাদ্রোৎসবের গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব না, প্রকৃত ভাবে উহা সম্পাদন ও সম্ভোগ করিতে সমর্থ হইব না। বাহিরের একটা কার্য্য-প্রণালী অবলম্বন করিয়া কয়েক দিন উপাসনা বক্তৃতাদি করিলেই ভাদ্রোৎসব সুসম্পন্ন করা হইল মনে করা কখনই উচিত হইবে না। সত্য উৎসব সম্পাদন ও সম্ভোগ করিতে হইলে, যথার্থ উৎসবের ভাব প্রাণে জাগা চাই। উৎসবের সত্য ভাব, প্রেমময় পিতার অতুল দানের জন্য কৃতজ্ঞতা ও তাঁহাকে সমগ্র হৃদয় মন দিয়া বরণ করিয়া লইবার এবং তদ্দ্বারা জীবনকে ও সমাজকে উন্নত ও বিকশিত করিয়া তুলিবার জন্য চেষ্টা যত্ন ও আগ্রহ, দায়িত্ববোধহীন উদাসীন জীবনে আসিতে পারে না; ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রহ্মোপাসনার প্রকৃত স্বরূপ ও প্রকৃতি হৃদয়ঙ্গম না করিলে, নিষ্ঠার সহিত তাহার সাধন জীবনে অবলম্বন না করিলে, জন্মে না। আমরা যেরূপ লঘুভাবে জীবন যাপন করি ও উৎসবের আয়োজনাদি করি বা তাহাতে যোগ দেই, তাহা সত্য উৎসবের মোটেই অনুকূল নহে। সম্পূর্ণ প্রতিকূলই। অনেক ভাদ্রোৎসব আসিল ও গেল। আমরা অনেকে দীর্ঘকাল ব্রাহ্মসমাজে আছি, ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছি। এই সময় একটু গভীর ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক, আমরা এত দিন কি করিতেছি, কোথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, আমাদের জীবনে প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রহ্মোপাসনা কতটা বিকাশ পাইতেছে, জীবনের অদ্বিতীয় প্রভু করুণাময় পিতা তাঁহার অসীম প্রেমে আমাদিগকে তাঁহার মহান্ ধর্ম্মের আশ্রয়ে আনিয়া আমাদের উপর যে গুরুতর কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব ন্যস্ত করিয়াছিলেন, তাহার কতটুকু পালন করিয়াছি, সে জন্য কতটুকু চেষ্টাযত্ন করিতেছি; আমাদের দ্বারা তাঁহার পবিত্র ধর্ম্মের গৌরব বর্দ্ধিত হইয়াছে, না, দিন দিন পরিম্লান হইতেছে, পূর্ব্ববর্ত্তি গণ হইতে আমরা যে অবস্থায় ইহাকে পাইয়াছিলাম অন্ততঃ সেই অবস্থায়ই ইহাকে রাখিতে পারিয়াছি কি না, স্থির ভাবে এই সকল চিন্তা না করিলে আমরা কখনও উৎসবের জন্য প্রস্তুত হইতে পারিব না—উৎসব প্রকৃত জীবনপ্রদ উৎসব না হইয়া একটা প্রাণহীন বাহ্যিক অনুষ্ঠানে পর্য্যবসিত হইবে। আশা করি, এ দিকে আমাদের সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে। আমরা যাহাতে যথার্থ ভাবে উৎসব সম্ভোগ করিতে পারি তাহার জন্য সকলে চেষ্টিত হইব। আর উদাসীন ভাবে হেলায় জীবন নষ্ট করিব না। শুভবুদ্ধি-দাতা পিতা আমাদিগকে শুভবুদ্ধি প্রদান করুন—সত্যভাবে তাঁহার উৎসব সম্ভোগ করিয়া আমরা ধন্য ও কৃতার্থ হই। তাঁহার মহান্ ধর্ম্ম আমাদের জীবনে ও সমাজে গৌরবান্বিত হউক। তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছাই সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হউক। তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

নানকবাণী

৫০

নাম তত সভহী সির জাপৈ।
বিন নাবৈ দুখ কাল সনন্তাপৈ।
তত্তো তত মিলৈ মন মানৈ।
দুজা জাই ইকত্তু ঘর আনৈ।
বোলে পবনা গগন গরজৈ।
নানক নিহ্চল মিলন সহজৈ।

ভাবানুবাদ

নামতত্ত্ব সকল জপের শিরোমণি।
নাম না পাইলে দুঃখ ও মৃত্যু সন্তাপ দেয়।
তত্ত্বের তত্ত্ব সার তত্ত্ব পাইলে মন বিশ্বাস করিলে।
দ্বিত্ব ভাব দূর হয়, একত্বকে হৃদয়ে লইয়া আসে।
যাঁহার শক্তিতে পবন শব্দ করে, আকাশ গর্জ্জন করে।
নানক বলেন, সেই নিশ্চলের সহিত মিলন সহজেই হয়।

৫১

অন্তর সুন্নং বাহর সুন্নং ত্রিভবন সুন্নম সুন্নং।
চউথে সুন্নৈ জো নর জানৈ তাকউ পাপ ন পুন্নং।
ঘট ঘট সুন্ন কা জানৈ ভেউ।
আদি পুরখ নিরনজন দেউ।
জো জন নাম নিরনজন রাতা।
নানক সোঈ পুরখ বিধাতা।

ভাবানুবাদ

অন্তরে শূন্য, বাহিরে শূন্য, ত্রিভুবনে শূন্যই রহিয়াছে।
চতুর্থ অবস্থায় শূন্যকে (অর্থাৎ এ সকলের উপরে যিনি তাঁহাকে) যে ব্যক্তি জানে তাহাকে পাপ পুণ্য স্পর্শ করে না।
প্রতি ঘটে যে শূন্য, তাহার ভেদাভেদ যে জানে।
আদি পুরুষ নিরঞ্জন দেবতা।
যে ব্যক্তি সেই নিরঞ্জন নামেতে অনুরক্ত।
নানক বলেন, সে বিধাতা পুরুষকে জানিতে পারে।

বিবাহ সম্বন্ধীয় সঙ্কট,—প্রভৃতি সাংসারিক নানা কঠিন সমস্যায় ব্রাহ্মসমাজে তাঁহার সমান সুপরামর্শদাতা আর এক জন ছিলেন না। আবার, তিনি যেমন বুদ্ধিঘটিত পরামর্শ দিতে জানিতেন, তেমনি বিপদে সঙ্কটে 'ভয় নাই' বলিয়া দুর্ব্বল ও ভীরুকে সবল করিতেও জানিতেন।

তাঁহাকে অনেক বিবাহের ঘটকালী করিতে হইয়াছে। তিনি সমভাবে সকলেরই বন্ধু ছিলেন, বিশেষ কোন মানুষের সহিত জড়িত ছিলেন না, এবং চিরদিন নির্ভীক ও স্পষ্টবাদী ছিলেন; তাই, তিনি কোথাও বিবাহের প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত হইলে, পাত্রের বা পাত্রীর দোষ ও গুণ উভয়ই বলিয়া দিতেন। এই সকল সময়ে কখনও কখনও তাঁহার পরামর্শের অংশী হইয়া দেখিয়াছি যে, আমরা যে-স্থলে মানুষের খুঁতগুলি দেখিয়া একেবারে ভীত হইয়া সরিয়া পড়িতে প্রস্তুত হইয়াছি, তিনি সেখানেও এই বিশ্বাস লইয়া অগ্রসর হইয়াছেন যে, "সব মানুষই দোষে গুণে জড়িত; এবং এই দোষে-গুণে জড়িত মানবদম্পতীর দ্বারাই সংসার চলিতেছে। প্রকৃতি ও অবস্থা বুঝিয়া ঠিক ভাবে মিলাইতে পারিলে, বিবাহ বন্ধনই মানুষকে ভাল করিয়া তোলে।" এ বিষয়ে তাঁহার মধ্যে যে robust optimism দেখিয়াছি, তাহার পশ্চাতে তাঁহার গভীর ঈশ্বরবিশ্বাস ও মানবচরিত্র-সম্বন্ধে গভীর অভিজ্ঞতা বর্ত্তমান ছিল।

ব্রাহ্মসমাজে তাঁহার এই বিবাহবিষয়ক সাহায্যের মূল্য যে কত অধিক ছিল, তাহা আমরা সব সময়ে বুঝিতে পারি না। তিনি অনেক স্থানে ঘুরিতেন ও অনেককে চিনিতেন বলিয়া তাঁহার কাছে সহজে পাত্র পাত্রীর সন্ধান মিলিত,—অনেকে শুধু এই টুকুই জানেন। কিন্তু ইহা অপেক্ষা অনেক বড় কথা এই যে, তিনি মানবপ্রকৃতির ও মানবসংসারের অভিজ্ঞতায় অধিকাংশ গৃহীদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন; তাই উপযুক্ত পাত্র পাত্রী নির্ব্বাচন বিষয়ে তাঁহার নিকট হইতে অতি মূল্যবান্ সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া যাইত।

এই সাহায্য তিনি ব্রাহ্মসমাজের পরিবারসকলকে অকুণ্ঠিত ও উদার ভাবে দান করিয়াছেন। এক দিন দেখিলাম, তিনি এক গৃহে কন্যার বিবাহের পরামর্শ করিতে আসিয়াছেন। তখন তিনি নিজেও রুগ্ন, সে বাড়ীর গৃহিণীটিও রুগ্না ও শয্যাশায়িনী। একখানি মাত্র ঘর, সে ঘর খানিকে নির্জ্জন করিবার কোন উপায় নাই, অথচ সব কথা সকলকে শুনাইয়া বলাও যায় না। তিনি গৃহিণীর শয্যাপ্রান্তে বসিলেন, এবং কাগজে লিখিয়া লিখিয়া তাঁহার সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

এই অতি কঠিন কাজটি করিতে গিয়া সব সময়ে তিনি যে নিজ কার্য্যের আশানুরূপ পরিণতি দর্শন করিতে পাইতেন, তাহা নহে। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বের এক দিনের কথা মনে হইতেছে। নবদ্বীপ বাবু নিজের চশমা খুঁজিয়া না পাইয়া আমাকে তাঁহার একখানি ডাকের চিঠি পড়িয়া শুনাইতে বলিলেন। কিছু দূর পড়িয়া আমি বলিলাম, "আমাকে দিয়া এ পত্র পড়ান বোধ হয় ঠিক হইবে না; ইহাতে স্বামী স্ত্রীর মনোমালিন্যের কথা রহিয়াছে।" তিনি বলিলেন, "পড়িয়া যাও। আমাকে অনেক বিবাহ দিতে হয়, কাজেই মাঝে মাঝে স্বামী স্ত্রীর ঝগড়াও মিটাইতে হয়। ইহারা আমাকে আপনার লোক মনে করে বলিয়াই এ সকল প্রশ্ন আমার হাতেই ফেলিয়া দেয়। আমার তো এ নিত্য কর্ম্ম।" আমি সে পত্র আর পড়িতে সম্মত হইলাম না। কিন্তু বুঝিয়া লইলাম যে, নবদ্বীপ বাবু শুধু নবদম্পতীর বিবাহে পুরোহিতই হন না, বিবাহটি দিয়াই তাঁহাদের সঙ্গে সম্বন্ধ শেষ করেন না; তিনি তাঁহাদের আজীবনের বন্ধু হন।

এই সহায়তা, পরামর্শ, ও সর্ব্বোপরি সহৃদয়তার গুণে তিনি ব্রাহ্মসমাজের বহু পরিবারে একেবারে আপনার লোক হইয়া গিয়াছিলেন, এবং আবাল-বৃদ্ধ বনিতা সকলের "দাদা মহাশয়" হইয়া সকলের ভালবাসা কাড়িয়া লইয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের এমন অনেক পরিবার আছেন, যাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে অন্য কোনও যোগ নাই; কেবল, নবদ্বীপ বাবুকে তাঁহারা সকলেই ভালবাসেন এই তাঁহাদের মধ্যে যোগ, এবং তাঁহাকে লইয়া তাঁহারা পরস্পরের বন্ধু।

সাধনাশ্রমের প্রথম যুগে তাহার অঙ্গীভূত আমরা কয়েক জন লোক, আমাদের মণ্ডলীর গাঢ়তা কিসে হয়, এই বিষয় লইয়া অতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলাম। আমাদের মধ্যে অনেকেই তখন অভিজ্ঞতাবিহীন যুবক; আমার বয়স তখন উনিশ কুড়ি বৎসর মাত্র। আমাদের মনে হইত যে ধর্ম্মসাধনের আদর্শটি একরূপ হইলেই নিশ্চয় পরস্পরের মধ্যে গাঢ় ধর্ম্ম-বন্ধুতার সম্বন্ধ জন্মিবে। আমরা কয়েক জন এই আশায় চালিত হইয়া এত অধিক পরিমাণে সম্মিলিত উপাসনায় ও সৎপ্রসঙ্গে কাল যাপন করিতে আরম্ভ করিলাম যে আমাদের "বস" কথাটি কাহারও কাহারও নিকটে কৌতুকের বিষয় হইয়া উঠিল; তাঁহাদের মধ্যে নবদ্বীপ বাবুও একজন ছিলেন। আমাদের মণ্ডলীর গাঢ়তার আকাঙ্ক্ষাটিকে এই প্রণালীতে প্রবাহিত হইতে দেখিয়া তিনি যখন তাহাতে অনাস্থা প্রকাশ করিতেন, তখন আমাদের বড়ই দুঃখ হইত। নবদ্বীপ বাবু সারা জীবনে মানুষের মানবীয় ব্যবহার ও মানবীয় প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি বুঝিতেন যে সে-দিক দিয়া যদি মানুষ উদার ও সহৃদয় হইতে না পারে, তবে ধর্ম্মের উত্তাপে মানুষে মানুষে যে টুকু যোড়া লাগে, তাহা বার বার সহজেই খসিয়া যায়। আমরা তখন অনভিজ্ঞতা বশতঃ ইহা বুঝিতাম না। ক্রমশঃ আমরাও বুঝিতে পারিলাম যে, মণ্ডলীর গাঢ়তা মানুষগুলির মানবীয় ব্যবহারের উদারতা ও সহৃদয়তার উপরেই প্রধান ভাবে নির্ভর করে; এবং ক্রমশঃ নবদ্বীপ বাবুও এই দিক দিয়া আশার কারণ দেখিতে পাইয়া আমাদের মণ্ডলীর সম্বন্ধে আস্থাবান্ হইয়া উঠিলেন।

শেষ পর্য্যন্ত দেখিয়াছি যে সাধনাশ্রমের উপাসনালয়ে বসিয়া কে কত ভাল ভাবের কথা বলিল, কিংবা ভাল প্রার্থনা করিল, তার উপরে তাঁহার যত দৃষ্টি ছিল, কে কাহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিল, সে বিষয়ে তাঁহার তদপেক্ষা অনেক অধিক দৃষ্টি ছিল। মাঘোৎসবের সময় মফঃস্বল হইতে আগত অতিথিদের আহারের ও সুখ সুবিধার উপযুক্ত ব্যবস্থা হইল কি না, এ বিষয়ে তিনি রোগ-শয্যায় পড়িয়া পড়িয়াও সর্ব্বদা সন্ধান লইতেন; এবং এ বিষয়ে শিথিলতা কিংবা অমনোযোগ দেখিলে অতিশয়

অসন্তুষ্ট হইতেন। পঞ্জাবীদের রুচির ভাল ব্যবস্থা হয় নাই বলিয়া কত বার তাঁহাকে ক্ষুব্ধ হইতে দেখিয়াছি।

তিনি স্পষ্টবাদী ছিলেন; আবশ্যক স্থলে মানুষকে তিরস্কার করিতে ছাড়িতেন না। কিন্তু এ-বেলা যাহাকে তীব্রভাবে ভৎর্সনা করিলেন, ও-বেলাই হয়তো তাহার বাড়ীর সুখ দুঃখের খবর লইতে তাহার কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন। গুরুতর দোষেও কেহ তাঁহার এই স্নেহের সেবা হইতে বঞ্চিত হইত না। এক এক সময়ে এক এক জন মুগর ও জবরদস্ত-প্রকৃতিসম্পন্ন মানুষের সঙ্গে তাঁহার এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে সক্রোধ ভৎর্সনা ও সস্নেহ সাহায্য এত দীর্ঘ দিন ধরিয়া চলিত যে, আমাদের কাছে উভয়ের সাক্ষাৎকার কৌতুকমিশ্রিত আশঙ্কার বিষয় হইয়া উঠিত। আমরা বুঝিতে পারিতাম না যে এ-বেলা ঐ মানুষটির প্রতি তাঁহার মন প্রসন্ন, না অপ্রসন্ন; এবং এ-বেলা ঐ মানুষটি উপস্থিত হইলে তখন কিরূপ ব্যাপার ঘটিবে। কিন্তু তাঁহার বিরক্তি ও অসন্তোষ অতিশয় ক্ষণস্থায়ী হইত, কারণ তাহা তাঁহার প্রকৃতির উপরিভাগে থাকিত মাত্র; তাঁহার স্নেহ ও সহানুভূতিই স্থায়ী হইত, কারণ তাঁহার প্রকৃতির অন্তস্তল তাহাতেই পরিপূর্ণ ছিল।

নবদ্বীপচন্দ্র তেজস্বী ও স্বাধীনপ্রকৃতিসম্পন্ন মানুষ ছিলেন। জগতে এমন কোনও ভীরুতা দেখা যায় না, সুখাসক্তি অথবা সাংসারিক অভাব যাহার মূলে নাই। নবদ্বীপচন্দ্র প্রথম যৌবনে কর্ম্মদাতা জমিদারের কাছে নির্ভীক ছিলেন; শেষ বয়সে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকরূপেও নির্ভীক ছিলেন। কারণ, তিনি সুখাসক্তিতেও বাঁধা ছিলেন না, অর্থ বিষয়েও স্বাধীন ছিলেন। জনসেবার অথবা ধর্ম্মসমাজের সেবার পথে চলিয়া, যাঁহারা শুধু কর্ম্মের দ্বারা নয়, কিন্তু চরিত্রের দ্বারা মানুষকে উন্নত করিতে আকাঙ্ক্ষা করেন, এমন মানুষের চরিত্রে এই তেজস্বিতা ও স্বাধীনতা একটি অমূল্য উপাদান।

শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

ভক্তি!

ভক্তাধীন হরি, ভক্তকে পাশরি',
থাকিতে নারেন কভু;
কাতরে যখন ডাকে ভক্ত জন,
দেখা দেন তারে প্রভু।
ভক্তি-সুধা পান করি', ভক্ত-প্রাণ
তিরপিত চির তরে,
ভাবের তরঙ্গে লীলা-রস-রঙ্গে
বিভোর ভকতি ভরে!
অন্তরে তাহার ওঠে অনিবার
অনন্ত প্রেমের ঢেউ;
কি আনন্দে তার সুখ-পারাবার
উথলে জানে না কেউ!
ভকত-বৎসল ভক্তেরি কেবল
মিটান মনের সাধ,
মনোকষ্ট হ'লে, তুলে', নেন কোলে,
ঘুচান সে অবসাদ!
কবে সে ভকতি ভগবৎ প্রীতি
লভিব জীবনে মোর;
গাবো ব্রহ্ম-নাম মুখে অবিরাম
ভাবেতে হইয়া ভোর!
পূরিবে কামনা ঘুচিবে যাতনা
শীতল হইবে প্রাণ;
ডুবিব অতলে প্রেম-সিন্ধু-জলে,
ভক্তি-সুধা করে' পান!

শ্রী চন্দ্রনাথ দাস

নূতন কীর্ত্তন।

(ব্যাঙের ভাঙ্গা সুর)

রোগে শোকে সন্তাপে নাম বল্ রে বদনে।
ত্রিতাপহারী দয়াল হরি আছেন ঐ নামে।
যে ডাকে সেই জানে—যে ডাকে সেই জানে।
(বল দয়াল, বল দয়াল, বল দয়াল একমনে।)
দেখ্‌লাম এই দুনিয়া মাঝে, ভ্রমি' কাজে কি অকাজে,
কি এক আগুন জ্ব'লে দ্বিগুণ—পোড়ায় দহনে—
যত জীবগণে—বারণ না মানে।
(বল দয়াল, বল দয়াল, বল দয়াল একমনে)
দিন থাকিতে ধরেছিলাম, তাইত বেঁচে আছে এ প্রাণ,
সহি' অসহন জ্বালা, ভুলি' মরণে!
সে ত ঐ নামের গুণে, ঐ নামের গুণে।
(বল দয়াল, বল দয়াল, বল দয়াল, বদনে)

শ্রী মনোমোহন চক্রবর্ত্তী

নূতন সঙ্গীত

১২

লুম খাম্বাজ—যৎ।

(তোমায়) ভু'লেও যে ভুলতে পারি না
তোমার প্রেম তো তারই মূলে।
আমার, প্রাণ টানে তাই তোমার পানে,
যখন তোমায় থাকি ভু'লে।
মিষ্টি লাগ্‌লে সংসারের ছাই,
তোমার দিকে ফিরেও না চাই,
অমনি, প্রাণের ভিতর আগুন জ্বালো,
তাতেই আমি মরি জ্ব'লে'।

বাহিরের যত অসার বাঁধন,
জড়ায়ে তাতে পড়ে যে মন,
আমার টান সদা তোমার পানে,
সকল বাঁধন দাও খুলে'।
তুমি যে গো আমারে চাও,
তাই তো প্রাণে বেদনা দাও,
যদি তোমার করে' নেবে আমায়,
ডুবাও তোমার প্রেম-সলিলে।

১৩
ঝিঁঝিট মিশ্র—কীর্ত্তন

ভক্তি বিনা হয় না সাধন,
শুধু, নাম করিয়ে ফল কি আছে?
প্রাণে, ভক্তি হ'লে, পাষাণ গলে,
মরা মানুষ উঠে বেঁচে'।
প্রাণে পেলে, ভক্তি-কণা,
সার্থক হয় সব সাধনা,
সেই ভক্তি-বিন্দু হ'য়ে সিন্ধু
জীবন গড়ে নূতন ছাঁচে।
হয়, ভক্তিরসে মিষ্ট জীবন,
পুলকিত দেহ প্রাণ মন,
তাই, নাম বরষে এত সুধা,
সাধু ভক্ত জনের কাছে।
ব্যাকুল হ'য়ে তাঁরে ডাক,
তাঁর, নামটী ধরে' পড়ে' থাক,
ভক্তি-চক্ষু ফুটবে যখন,
দেখ্‌বে তাঁরে প্রাণের মাঝে।

১৪
মুলতান—যৎ

এত যে প্রেম, এত করুণা,
তবু, তোমার হ'তে পাল্লাম না।
আমি, সকল পেয়েও তোমার হাতে,
জীবন কেন দিলাম না!
এ কি কঠোর শুষ্ক জীবন,
অকৃতজ্ঞ নির্ম্মম মন,
তোমায় পেয়েও যে হারিয়ে ফেলি,
(প্রাণে) ধরে' রাখ্‌তে পাল্লাম না।
আমি, দূরে গেলেও কাছে থাক,
ভুল্‌লে তোমায় ভুল নাক,
তবু, দিবানিশি প্রেম-নয়নে,
প্রাণে তোমায় দেখ্‌লাম না।
তুমি, সত্যই যদি আমার হ'বে,
আমায়, তোমার করে', লওগো তবে,
এবার, এমন যোগে যুক্ত কর,
যাতে তোমায় ছেড়ে' বাঁচ্‌বো না।

শ্রী নীলমণি চক্রবর্ত্তী

ব্রাহ্মসমাজ

ভাদ্রোৎসব—কার্য্যনির্ব্বাহক সভা নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে আগামী অষ্টনবতিতম ভাদ্রোৎসব সম্পন্ন করিবেন। সকলে সপরিবারে ও সবান্ধবে উৎসবে যোগ দান করিয়া ব্রহ্মকৃপার আনন্দ সম্ভোগ ও সমবিশ্বাসিবর্গের আনন্দ ও উৎসাহ বর্দ্ধন এবং বালক-বালিকা সম্মিলনে সন্তানদিগকে প্রেরণ করিয়া উৎসবের শ্রীসম্পাদন করেন, এই প্রার্থনা।

২১শে আগষ্ট, (৪ঠা ভাদ্র) শনিবার—সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় বক্তৃতা। বক্তা—শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ, এম এ। বিষয়—ধর্ম্ম ও জাতীয় চরিত্র।

২২শে আগষ্ট, (৫ই ভাদ্র) রবিবার—প্রাতে ৭ ঘটিকায় উপাসনা। আচার্য্য শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় বালক-বালিকা-সম্মিলন। সন্ধ্যা—৭ ঘটিকায় উপাসনা —আচার্য্য শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস, এম এ।

২৩শে আগষ্ট, (৬ই ভাদ্র) সোমবার—উষাকীর্ত্তন—প্রাতে ৫॥০ ঘটিকায় জোড়াশাঁকো আদি ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের সম্মুখস্থ কমললোচন বসুর বাড়ীর নিকট হইতে আরম্ভ হইয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা-মন্দিরে উপস্থিত হইলে পর উপাসনা—আচার্য্য শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী। সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় উপাসনা—আচার্য্য শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়, এম এ।

শুভবিবাহ—বিগত ৩১এ জুলাই কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের তৃতীয়া কন্যা কল্যাণীয়া প্রীতিলতা ও শ্রীমান নির্ম্মলচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ১৪ই আগষ্ট কলিকাতা নগরীতে পরলোকগত মিঃ উপেন্দ্রমোহন দাসের কনিষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া নলিনী ও শ্রীমান পুলিনবিহারী দিন্দার শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ আচার্য্যের কার্য্য করেন।

প্রেমময় পিতা নব দম্পতিদিগকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

ধুবড়ী ব্রাহ্মসমাজ—ধুবড়ী ব্রাহ্মসমাজের একপঞ্চাশত্তম বার্ষিক উৎসব নিম্নলিখিত প্রণালীতে সম্পন্ন হইয়াছে:— ১১ই জুলাই উৎসবের উদ্বোধন উপলক্ষে গৌহাটী-প্রবাসী শ্রীযুক্ত কমললোচন দাস উপাসনা করেন। ১২ই জুলাই সন্ধ্যায় বক্তৃতা; বক্তা শ্রীযুক্ত যোগজীবন পাল, বি এ, বিষয়—"উৎসব"। ১৩ই জুলাই উৎসবের দিন—প্রাতে শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার চক্রবর্ত্তী উপাসনা করেন। সন্ধ্যায় রায় সাহেব শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করেন।

গত ৩০শে জুলাই, পরলোকগত পণ্ডিত অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায়ের চতুর্বিংশতিতম বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে রায় সাহেব শরৎচন্দ্র দাস উপাসনা এবং মিসেস্ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার চক্রবর্ত্তী প্রার্থনা করেন। মিসেস্ বসন্তকুমারী মুখোপাধ্যায় ২৲ দুই টাকা ও তাঁহার ভৃত্য শ্রীযুক্ত ধনবীর নেপালী ১৲ টাকা ধুবড়ী ব্রাহ্মসমাজে দান করিয়াছেন।

দান—শ্রীযুক্ত হিমাংশুমোহন গুপ্ত পিতা পরলোকগত গঙ্গাগোবিন্দ গুপ্তের বার্ষিক শ্রাদ্ধে প্রচার বিভাগে ১০৲ দান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার বিশ্বাস পিতা পরলোকগত হরকিশোর বিশ্বাসের প্রথম বার্ষিক শ্রাদ্ধে প্রচার বিভাগে ৭৲ সাধনাশ্রমে ৩৲ দুঃস্থ ব্রাহ্মপরিবার বিভাগে ৩৲ ও দাতব্য বিভাগে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত শ্রীপতিনাথ দত্ত পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধে দাতব্য বিভাগে ২৲ টাকা এবং জ্যেষ্ঠ পুত্রের জন্মদিনে প্রচার বিভাগে ২৲ দান করিয়াছেন।

পরলোকগত বাবু কেদার নাথ কুলভীর বাৎসরিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে মিসেস্ কুলভি রাঁচি ব্রাহ্মসমাজে ২৲, কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ২৲ দান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত সুধীশচন্দ্র বসু ও শ্রীযুক্ত শতীশচন্দ্র বসু তাঁহাদের মাতার প্রথম বার্ষিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠান উপলক্ষে প্রচার বিভাগে ২৲ টাকা, সাধনাশ্রমে ১৲ ও হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজ মন্দির-সংস্কার ফণ্ডে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

পরলোকগতা সরযূবালা সিংহের বাৎসরিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে তাঁহার প্রথমা কন্যা শ্রীমতী প্রতিভা রায় প্রচার বিভাগে ২৲ দান করিয়াছেন।

এ সকল দান সার্থক হউক এবং শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চির শান্তিতে রাখুন ও শিশুকে কল্যাণের পথে বর্দ্ধিত করুন।

কৃতী ছাত্র—শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেনের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান অরুণকুমার বিগত বি এ, পরীক্ষাতে অর্থনীতি শাস্ত্রে প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন দেখিয়া আমরা বিশেষ সুখী হইলাম।

এতদ্ব্যতীত (আমরা যত দূর জানিতে পারিয়াছি) বীরেন্দ্র-কুমার বিশ্বাস, প্রেমকুমার চক্রবর্ত্তী, রমেশচন্দ্র দেব, ও সুমন্ত্র মহলানবীশ বিগত বি, এ পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম।

ছাত্রীদিগের কৃতিত্ব—বিগত বি, এ পরীক্ষাতে নিম্নলিখিত ছাত্রীগণ উত্তীর্ণ হইয়াছেন দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম:—ইংরাজী সাহিত্যে অনার্স (দ্বিতীয় বিভাগে)—এড্‌না এডি, শান্তি দাস, সুধীরা রায়, নীলিমা বসু, মণিকাশোভনা দত্ত, লীলা দে, স্নেহলতা মুখার্জ্জী। সংস্কৃতে—দ্বিতীয় বিভাগে—পুষ্পময়ী বসু। দর্শন শাস্ত্রে—দ্বিতীয় বিভাগে—শান্তা চৌধুরী। অঙ্ক শাস্ত্রে—দ্বিতীয় বিভাগ—পরিমল সেন গুপ্ত, সুষমা পাইন। পারদর্শিতার সহিত—এপারুকুটী আম্মা, বনজ্যোৎস্না ভট্টাচার্য্য, কণিকা চৌধুরী, ডরোথী কর্বেট, বাসন্তীলতা দাস গুপ্ত, সুখলতা দাস গুপ্ত, করুণাকণা দত্ত, সত্যবতী ঘোষে, মভিস ডান, আশালতা সরকার, মীরা সরকার, টিল্ডা নোলা ভজুর। পাস—অমিয়া বসু, জ্যোতির্ম্ময়ী বসু, সুষমা বসু, বেট্রিসিমন লিংডো, লাবণ্যলতা চন্দ, হৃদয় বালা চৌধুরী, নীহারবালা দাস, বীণা দাস গুপ্ত, রেণুকা দাস গুপ্ত, অমিয়া দত্ত, বীণা দে, ভারতী দেবী, বিলাসমণি খান, লতিকা ঘোষ, কেনোয়ার আনন্দী, প্রভা মজুমদার, মেটিল্ডা প্রেমকুসুম মণ্ডল, ইন্দিরা নারায়ণ, জগৎমোহিনী পাল, পাঁচুমণি রায়, উষারাণী রায়, রেণুকা রায় চৌধুরী, কঙ্কাবতী সাহু, সাবিত্রী লাল, লীলাবতী সেন, হীরামণি সেন গুপ্ত, সুব্রতা সেন গুপ্ত, সুলতা সিংহ রায়, এলিজাবেথ টমাস, ত্রিপুরারী এস্ নাইডু।

ছাত্রীদের বৃত্তি—বিগত মেট্রিকিউলেসন পরীক্ষায় নিম্নলিখিত ছাত্রীগণ বৃত্তিপ্রাপ্ত হইয়াছেন দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম—

২০৲ টাকা—জ্যোৎস্নাকুমারী দেবী, তাপস্ চট্টোপাধ্যায়। ১৫৲ টাকা—কমলা সেন গুপ্ত, কিরণ রায়, মণিকুন্তলা দত্ত, লীলা মজুমদার, দীপিকা বেজবড়ুয়া। ১০—টাকা অমিয়া রায়, বিনয়বালা গুহ, চারুলতা দাস গুপ্ত, মীরা ঘোষ, রমা দত্ত, উমা বসু, শোভনা গুহ, ঊর্ম্মিলা বিশ্বাস, লাবণ্যপ্রভা ঘোষ, তরু সেন।

বিগত ইণ্টার মিডিয়েট পরীক্ষায় নিম্নলিখিত ছাত্রীগণ বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন দেখিয়া আমরা আহ্লাদিত হইলাম:—

২৫৲ টাকা (ছাত্রদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায়) লীলা রায়, শান্তিসুধা ঘোষ। ২০৲ টাকা (ছাত্রীদের জন্য বিশেষ বৃত্তি) সান্ত্বনা বসাক, সুরমা মিত্র, লীলি সেন, ক্যাথলীন মেহোপীট, ভায়োলেট রাইট্রিফ, তিলোত্তমা দাস, কল্যাণীয়া দাস, বীনা কুকা, সীতা মুখার্জ্জি, সুধা ঘোষ, শোভনা চৌধুরী, হেজেল জেব, এনিদ্ লা ফোঁ।

ভারত মহিলা সমিতি—গত ১৯শে জুলাই তারিখের বিশেষ অধিবেশনে শ্রীমতী সান্ত্বনা রায় সম্পাদিকার পদ ত্যাগ করেন এবং শ্রীমতী অবন্তী দেবী তৎপদে নিযুক্তা হন।

গত ৪ঠা আগষ্ট সমিতির জন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীমতী অবন্তী দেবী উপাসনার কার্য্য করেন। সমবেত মহিলা ও বালক বালিকাদিগকে জলযোগ করান হয়। এতদুপলক্ষে সমিতি সাধনাশ্রমে ৫৲ পাঁচ টাকা দান করিয়াছেন।

ফরিদপুর ব্রাহ্মসমাজ—গত ১লা আগষ্ট শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্রের পুত্রের জন্মদিন ও হাতে খড়ি উপলক্ষে তাঁহার গৃহে বিশেষ উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মিত্র আচার্য্যের কার্য্য করেন। শৈলেন্দ্র বাবু একটি প্রার্থনা করেন। উপাসনান্তে প্রীতিভোজন হয়। শিশুর পিতামহ রায় বাহাদুর যোগেন্দ্রনাথ মিত্র এই শুভানুষ্ঠান উপলক্ষে স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজে ৫৲ এবং নারী-রক্ষা সমিতিতে ২৲ দান করেন। ঈশ্বর শিশুকে দিন দিন জ্ঞান, প্রেম ও পুণ্যের পথে অগ্রসর করুন।

প্রাপ্তি স্বীকার—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক, বর্ত্তমান বর্ষের ১লা হইতে ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত দান-প্রাপ্তি কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছেন—

শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ সমাদ্দার মাতার বার্ষিক শ্রাদ্ধে প্রচারে ১৲ ও দাতব্য বিভাগে ১৲; শ্রীযুক্তা শরৎকুমারী মিত্র ও শ্রীযুক্তা সুকুমারী চন্দ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আদ্যশ্রাদ্ধে প্রচারে ৫৲; শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু সাধারণ ফণ্ডে ১৲; শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার চক্রবর্ত্তী তৃতীয়া কন্যার বার্ষিক শ্রাদ্ধে দাতব্য বিভাগে ২৲; শ্রীযুক্ত ডি, জি, বৈদ্য নবদ্বীপ স্মৃতিফণ্ডে ৫৲; শ্রীযুক্ত সুধানলিনীকান্ত দে জন্মদিনে প্রচারে ১৲; শ্রীযুক্ত প্রশান্ত রাও সাধনাশ্রমে ৩৲; শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র মহলানবিশ কন্যার বিবাহে প্রচারে ২৫৲, মেসেঞ্জার ফণ্ডে ২০৲, সঙ্গীত বিদ্যালয়ে ২০৲ দাতব্য বিভাগে ১৫৲ ও সাধনাশ্রমে ২০৲; শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ ব্রাহ্মপরিবার পরিদর্শনের ব্যয় ৫৲; শ্রীযুক্ত ললিতকুমার রায় শিবনাথ স্মৃতিফণ্ডে ৫৲ ও মন্দির মেরামত ফণ্ডে ৫৲; শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় নবদ্বীপ স্মৃতিফণ্ডে ১৫৲; শ্রীযুক্ত অশোককুমার বসু সাধারণ ফণ্ডে ৫৲ শ্রীযুক্ত মথুরানাথ নন্দী কন্যার বিবাহে প্রচারে ৫৲, সাধনাশ্রমে ৫৲, শিবনাথ স্মৃতি ফণ্ডে ৫৲ ও নবদ্বীপ স্মৃতিফণ্ডে ৫৲; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রকুমার বিশ্বাস দ্বিজদাস বিশ্বাস ফণ্ডের মূলধন বৃদ্ধি ১০০৲; শ্রীযুক্তা লাবণ্যলতা চক্রবর্ত্তী কন্যার বিবাহে মেসেঞ্জার ফণ্ডে ৫৲ শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার বসু ও তদীয় ভ্রাতৃগণ মাতার বার্ষিক শ্রাদ্ধে প্রচারে ২৲, দাতব্য বিভাগে ২৲, দুর্ভিক্ষ ফণ্ডে ২৲, শিবনাথ স্মৃতি ফণ্ডে ২৲ ও নবদ্বীপ স্মৃতিফণ্ডে ২৲; শ্রীযুক্তা সুধাংশুবালা রায় পিতার আদ্য শ্রাদ্ধে প্রচারে ৫৲ ও শিবনাথ স্মৃতিফণ্ডে ৫৲; শ্রীযুক্তা সত্যবতী দত্ত মাতার বার্ষিক শ্রাদ্ধে প্রচারে ১৲; ডাক্তার বিজলীবিহারী সরকার কন্যার নামকরণে সাধারণ ফণ্ডে ১০৲; শ্রীযুক্ত হরকিশোর শর্ম্মা মেসেঞ্জার ফণ্ডে ২৲ শ্রীযুক্তা সংযুবালা ভদ্র আত্মীয়ের শ্রাদ্ধে দাতব্য বিভাগে ৫৲; শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী বসু পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধে প্রচার ফণ্ডে ৩৲ শ্রীযুক্তা ক্ষীরোদবাসিনী মিত্র মহিলাদিগের নবদ্বীপ স্মৃতিফণ্ডে ৩০৲; ডাক্তার ব্রজগোপাল হালদার কন্যার জন্ম উপলক্ষে প্রচার ২৲; ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ের ছাত্রীনিবাস প্রচারে ১৲।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় দ্বারা ২রা ভাদ্র মুদ্রিত ও প্রকাশিত। —শ্রীবরদাকান্ত বসু বি এ, সম্পাদক

Registered No 65

অসতো মা সদগময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৬ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৪৯ম ভাগ। ১০ম সংখ্যা। | ১৬ই ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, ১৩৩৩, ১৮৪৮ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯৭ 2nd September, 1926. | প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০ অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

"আমি"র নিগড়

আর কিছু নয় পথের বাধা, আমার বাধা "আমি";
সাক্ষী চেতা হ'য়ে আমার, কি না জান তুমি?
তোমার দেওয়া ওজন-করা "আমি"র স্বাধীনতা,
সেই কি নহে চির দিনের তোমার অধীনতা?
অফুরন্ত দিগ্‌দিগন্ত-প্রসারিত পথ!
আমারে ভুলা'য়ে নিয়ে ধায় মনোরথ!
উত্থান পতন, শত জয় পরাজয়,—
এ পথে করিছে কুরুক্ষেত্র-অভিনয়।
দুঃখ তাপ পরিতাপ, বিরহ-দহন,
"আমি"র কর্ম্মফল হ'য়ে দেয় দরশন!
তোমার অধীন না হইলে কতই বিপদ্
পদে পদে স্বেচ্ছাচারী ধরি যে বিপথ!
যে দিন থাকি অধীন তব—কি কহিব আর?—
দেখি মুক্ত মিষ্ট উদার অখিল সংসার।
"আমি"র নিগড় কাটবে কবে, মুক্ত মহীয়ান্,
অধীন হ'য়ে হব কবে স্বাধীন সন্তান?

শ্রীমনোমোহন চক্রবর্ত্তী

হে করুণাময় পিতা, তোমার অপার কৃপাতেই তুমি আমাদিগকে তোমার পবিত্র ধর্ম্মের আশ্রয়ে আনিয়াছ—তোমার মহান্ ধর্ম্মের তত্ত্বসকল আমাদের নিকট প্রকাশিত করিয়াছ। কিন্তু তোমার অশেষ করুণা পাইয়াও যে আমরা আমাদের নানা ত্রুটি দুর্ব্বলতাহেতু তাহার উপযুক্ত সেবক হইতে পারিতেছি না, তাহাকে জীবনে সম্যক্ প্রকারে ফুটাইয়া তুলিতে পারিতেছি না, তাহাও, হে সর্ব্বদর্শী পুরুষ, তুমি দেখিতেছ। আলস্য উদাসীনতা বশতঃ আমরা তাহার জন্য উপযুক্তরূপ চেষ্টা যত্ন আকাঙ্ক্ষাও করিতেছি না। তাই আমাদের দ্বারা তোমার ধর্ম্মের গৌরব বর্দ্ধিত না হইয়া ম্লানপ্রাপ্তই হইতেছে। সত্য ভাবে তোমার প্রাণপ্রদ উপাসনা অবলম্বন করিলে ত আর কেহ মৃতের ন্যায় পড়িয়া থাকিতে পারে না। আমরা ত মৃতের ন্যায়ই সংসার-স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছি, জীবন্ত ভাবে তোমার দ্বারা চালিত হইয়া তোমার পথে অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। আমরা যে কোন্ ভাবে কোন্ পথে চলিয়াছি, অনেক সময় তাহা ভাবিয়াও দেখি না। তোমার প্রকৃত উপাসক ত কখনও এরূপ হয় না। তোমার সঙ্গে যাহার একটুও সত্য যোগ স্থাপিত হয়, সে যে আর তোমার দ্বারা প্রভাবান্বিত না হইয়া পারে না। আমরা তোমা হইতে দূরে থাকিয়াই এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতেছি। হে করুণাময় পিতা, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে তোমার সত্য উপাসক করিয়া লও—তুমি প্রাণে সে আগ্রহ ও চেষ্টা জাগাও, আমাদের সকল উদাসীনতা অবহেলা, ত্রুটি দুর্ব্বলতা দূর কর। তুমি আমাদিগকে আমাদের প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে সমর্থ কর। আমরা যেন আর আত্মপ্রতারিত না হই, আমাদের বর্ত্তমান অবস্থাতে তৃপ্ত হইয়া না থাকি। তুমি আমাদের জীবনের চালক ও প্রভু হও। তোমার ইচ্ছাই আমাদের প্রতি জীবনে ও সমাজে জয়যুক্ত হউক। তোমার ইচ্ছাই সর্ব্বোপরি পূর্ণ হউক।

নিবেদন।

সৌন্দর্য্য কিসে—সৌন্দর্য্য বাহিরে নয়—সৌন্দর্য্য ভিতর হইতে ফুটে বে'র হয়। সৌন্দর্য্য রূপে নয়, সৌন্দর্য্য গঠনে নয়; সৌন্দর্য্য পোষাক পরিচ্ছদে নয়। সৌন্দর্য্য সুধু মিষ্ট

বাক্যে নয়, মিষ্ট ব্যবহারে নয়। রূপ, গঠন, পারিপাট্য, মিষ্ট বাক্য, মিষ্ট ব্যবহার মনকে ক্ষণিক মুগ্ধ করতে পারে বটে; কিন্তু ভিতর হ'তে সৌন্দর্য্য ফু'টে বে'র না হ'লে, প্রকৃত সৌন্দর্য্যের আভাস পাওয়া যায় না। চিত্ত যখন শুদ্ধ হয়, নির্ম্মল হয়, প্রাণে যখন প্রেম জাগে, সত্যে যখন নিষ্ঠা দেখা যায়, ঈশ্বরে যখন ভক্তির উদয় হয়, সেবার ভাব যখন জাগ্রত হয়, তখনই প্রকৃত সৌন্দর্য্য ফু'টে উঠে। সে সৌন্দর্য্যের ছটা বাহিরে প্রকাশ পায়। যাকে লোকে কুরূপ বলে, যার পোষাক পরিচ্ছদ জীর্ণ ও মলিন, সেও সুন্দর হ'য়ে যায়, যখন ভিতরে প্রকৃত সৌন্দর্য্য ফু'টে উঠে, যখন প্রেম পুণ্য ও সেবা প্রাণে জাগ্রত হয়। সুন্দর হ'তে চাও? শুদ্ধ হও, প্রেমে হৃদয় পূর্ণ কর, ভক্তিতে আপ্লুত হও, সেবায় নিযুক্ত হও, সত্যং শিবং সুন্দরংকে বরণ কর। বাহিরের সৌন্দর্য্য ক্ষণিক, ভিতরের সৌন্দর্য্য স্থায়ী; ইহা স্বর্গের প্রতিবিম্ব।

চিত্তশুদ্ধি—মুকুর যদি ময়লাযুক্ত থাকে, তবে তাতে মুখ দেখা যায় না; চস্‌মাতে যদি ময়লা থাকে, তবে তার ভিতর দিয়ে দেখা যায় না; আকাশ যদি মেঘাচ্ছন্ন থাকে, তবে সূর্য্যকিরণ আসিতে পারে না। তোমার চিত্ত যদি মলিন থাকে, তবে ঈশ্বরের প্রকাশ তাঁতে প্রতিভাত হবে না। যদি তাঁর দর্শন চাও, তবে চিত্তকে শুদ্ধ কর, অনুতাপের অশ্রুজলে হৃদয়কে ধৌত কর। প্রার্থনাদ্বারা চিত্ত নির্ম্মল কর। কোনও অপবিত্র ভাব পোষণ করিবে না; অভিমান ল'য়ে কাজে যাবে না। কারও প্রতি অপ্রেম রাখ্‌বে না; অসত্যের আশ্রয় নিবে না। পবিত্র হও, সত্যনিষ্ঠ হও, সরল হও, প্রেমে পূর্ণ হও। আপনাকে বিলিয়ে দাও অপরের স্বার্থে, তবেই চিত্ত নির্ম্মল হবে, স্বচ্ছ হবে; তখন শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্ প্রেমময় দেবতা প্রাণে প্রকাশিত হবেন।

মূল্য বুঝ্‌লে না—তোমরা কি অমূল্য রত্ন পেয়েছ, তার মূল্য বুঝ্‌লে না; কস্তুরী মৃগ সুগন্ধ পেয়ে তার সন্ধানে চারি দিকে ছোটে; তারই নাভিতে যে সুগন্ধির উৎস রয়েছে, তাকে জানে না। তোমরা সার ধর্ম্ম, উদার ধর্ম্মের সন্ধানে ছুটেছ; তোমরা যে ধর্ম্ম পেয়েছ তাই যে উদার পরিত্রাণপ্রদ, তাতেই যে সকল দুঃখ বেদনার শান্তি হয়, সকল আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হয়, তা ত বুঝ্‌লে না। রাজর্ষি রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, আচার্য্য শিবনাথ, প্রভৃতি মনীষিগণ দিব্য দৃষ্টি লাভ ক'রে যে অমৃত ফল দিয়ে গেলেন, তোমরা তা' পেয়ে, তার আদর করতে শিখ্‌লে না! আজ দেশ বিদেশে এই মহান্ আদর্শের কত আদর আছে, আর তোমরা ইহা গ্রহণ করলে না! ইহার সাধন করলে না। ব্রহ্ম দ্বারে এলেন, হৃদয়ে প্রবেশ করতে চাইলেন, তাঁকে উপেক্ষা করলে, অমৃত ফল হাতে পেয়ে তাহা দূরে নিক্ষেপ করলে! এখনও সময় আছে; প্রভুর চরণে বস; আর কাওকেও যদি বিশ্বাস করতে না পার, তাঁর চরণে ব'সে কাতর প্রাণে উপদেশ চাও। তাঁর চরণে ক্রন্দন ক'রে প্রার্থনা জানাও। তিনি তোমাকে আলোক দিবেন। সত্যং শিবং সুন্দরং এর সাধনা কর। তোমার নিজের ঘরে যে অতুল বিভব রয়েছে, তার মর্য্যাদা বুঝ্‌বে, তার অধিকারী হয়েছ ব'লে গৌরব কর্ব্বে।

সম্পাদকীয়

কেন এরূপ হইল—আমরা গত সংখ্যায় বলিয়াছিলাম, আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণ করিতেছে যে, আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রহ্মোপাসনাকে এখনও ঠিক ভাবে অবলম্বন করি নাই, উপযুক্ত আদর ও পরিচর্য্যার দ্বারা জীবনে ও সমাজে উহা ফুটাইয়া তুলিবার জন্ম যথেষ্ট আগ্রহ ও যত্ন আমাদের নাই, সেবার কাজ আমরা ঠিক ভাবে করিতেছি না,—আমাদের গুরুতর দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য পালন করিতেছি না। আত্মদোষস্খালনের জন্ম যত প্রকার যুক্তি বিচারই অবলম্বন করি না কেন, আমরা কোনও প্রকারেই উক্ত দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারিব না। দুই এক জনে হয়ত ব্যক্তিগত ভাবে কোনও কোনও বিষয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নতি লাভ করিয়াছেন, সমাজও হয়ত দুই এক বিষয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা অগ্রসর হইয়াছে। আমরা সে কথা অস্বীকার করিতে চাহি না, বা কঠোর ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে ইচ্ছা করি না। তাহা স্বীকার করিয়া লইলেও আমাদের মূল কথাটা অপ্রমাণিত হয় না। স্বাভাবিক ভাবে যতটা হওয়া উচিত ছিল বলিয়া মনে করা যায়, ততটা যে হয় নাই তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। কেহই যথেষ্ট হইয়াছে মনে করিয়া আত্মতৃপ্ত হইবেন বলিয়া বোধ হয় না। কাজেই এ বিষয়ে আর অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু কেন এরূপ হইল, তাহা একটু ধীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখা নিতান্তই আবশ্যক অনুমিত হইতেছে। কেন না, তাহা ব্যতীত আমরা এই অবস্থা দূর করিবার কোনও উপায় বাহির করিতে সমর্থ হইব না। কারণটা জানিতে ও বুঝিতে পারিলে সহজেই তন্নিবারণের উপায়ও আবিষ্কৃত হইবে এবং তৎসঙ্গে তাহা অবলম্বন করিবার আগ্রহ আকাঙ্ক্ষা, চেষ্টা যত্নও বর্দ্ধিত হইবে। আমাদের মনে হয়, এই কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে সর্ব্বাগ্রে সাধনের অল্পতাই সকলের নয়নপথে পতিত হইবে। যাহারা সাধন ভজনাদি পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণরূপে সংসারের সেবাতেই আপনাদিগকে অর্পণ করিয়াছে, তাহাদের কথা বলিতেছি না,—তাহাদিগকে একেবারে আলোচনার বাহিরেই রাখিতেছি। যাঁহারা, অল্প পরিমাণেই হউক আর কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণেই হউক, ধর্ম্মসাধনে নিযুক্ত আছেন, যাঁহারা সাধনশীল বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন, কেবল তাঁহারাই আমাদের আলোচনার অন্তর্গত। আমরা জানি এখনও এমন কেহ কেহ আছেন, যাঁহারা সাধনাদিতে অনেক সময় প্রদান করেন এবং জীবনে বেশ অগ্রসর হইয়াছেন, একটা উচ্চ অবস্থা লাভ করিয়াছেন, স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। তথাপি আমরা সত্যকে অতিক্রম না করিয়াই বলিতে পারি, বর্ত্তমানে উক্ত উদ্দেশ্যে যথেষ্ট সময় দেওয়া হয় না, সেরূপ আকুলতাও দেখিতে পাওয়া যায় না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনা করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। তাঁহার কথা ছাড়িয়া দিলেও, সাধারণ ভাবে বেশ বলা যাইতে পারে, পূর্ব্বে নানা বিঘ্ন বাধার মধ্যেও যেরূপ অনুরাগ ও ব্যাকুলতার সহিত সাধনাদিতে যত অধিক সময় ব্যয় করিতে দেখা যাইত, যেরূপ আকুল ক্রন্দন ও প্রার্থনা শুনা যাইত,

পরস্পরের সম্মিলনে ও সাহায্যলাভে যেরূপ যত্ন ও উৎসাহ প্রকাশ পাইত, তাহা আর এখন দৃষ্ট হয় না। আমরা জানি, স্বাভাবিক ভাবেই জীবনের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রন্দন ও অস্থিরতা বিদূরিত হইয়া শান্ত ভাব আসিতে পারে। সুতরাং শুধু একটা বিষয় দেখিয়া কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যুক্তিযুক্ত হইবে না। সকল দিক দিয়াই বিচার করিতে হইবে। প্রকৃত উন্নতিকে অবনতি বলিয়া ভ্রম করিবার বিশেষ আশঙ্কা আছে মনে হয় না। আমরা যেরূপ ভাবেই বিচার করি না কেন, মোটের উপর যে সাধনশীলতা বর্দ্ধিত না হইয়া হ্রাসই প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কর্ম্মবাহুল্য ইহার একটা প্রধান কারণ বলিয়া সহজেই অনুমিত হইবে। আমাদের কর্ম্মবাহুল্য যে ক্রিয়াশীলতার সম্প্রসারণ বুঝাইতেছে, বিবিধ প্রকার সদনুষ্ঠানে অধিকতর সময় ও শক্তি ব্যয় প্রকাশ করিতেছে, তাহা নহে। বরং অনুসন্ধান করিলে ইহার বিপরীত অবস্থাই প্রমাণিত হইবে। দেশের নানা কাজেই আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তিগণ আপনাদিগকে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। তাঁহাদের তুলনায় আমাদের কার্য্যক্ষেত্র যে আমরা সম্প্রসারিত না করিয়া সঙ্কুচিতই করিয়াছি, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আমরা আপনার ক্ষুদ্র সংসার লইয়াই যে অধিকতর বিব্রত, অন্য কাজের অবসর অতি অল্পই প্রাপ্ত হইয়া থাকি, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই নাই। বর্ত্তমান যুগের কঠোর জীবনসংগ্রামের মধ্যে এই কর্ম্মবাহুল্য হয়ত অনেকটা অনিবার্য্যই। কিন্তু তাই বলিয়া যে উহার অনিষ্টকারিতা কিছু পরিমাণেও হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে, এরূপ বলা যায় না। আর একটু অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইব যে, উহা বহু পরিমাণে আমাদের স্বকৃত—আমরা নানা প্রকার অনাবশ্যক প্রয়োজনের সৃষ্টি করিয়াই জীবনসংগ্রাম কঠোরতর করিয়াছি, কর্ম্মের চাপে পিষ্ট হইতেছি, মহত্তর কার্য্যে নিযুক্ত হইবার অবসর পাইতেছি না। অতি তুচ্ছ সাংসারিক সুখ সুবিধা, শারীরিক আরাম প্রভৃতির জন্যই যদি অধিকাংশ সময় ও শক্তি ক্ষয় করিতে হয়, তবে উচ্চতর কল্যাণলাভের চেষ্টা যে আর কোনও প্রকারেই সম্ভবপর হইতে পারে না, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এরূপ অবস্থায় যে আমাদের প্রকৃত মঙ্গলের জন্য আমাদিগকে সর্ব্বপ্রযত্নে অনেক অপেক্ষাকৃত কম আবশ্যকীয় প্রয়োজন বর্জ্জন করিয়াও কর্ম্মবাহুল্য হ্রাস করিতে হইবে, তাহা ব্যতীত যে কিছুতেই কল্যাণ নাই, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই থাকিতে পারে না। অথচ নিতান্ত চিন্তাবিহীন ভাবে নিত্য নূতন অনাবশ্যক প্রয়োজন বৃদ্ধি করিতেই আমরা অধিকতর প্রয়াসী। সুতরাং আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় কর্ম্মবাহুল্য অনিবার্য্য হইলেও, আমরা উক্ত অসার ওজর দেখাইয়া আমাদের গুরুতর দায়িত্ব হইতে কিছুতেই মুক্ত হইতে পারি না। উন্নতিপথের যাহা পরিপন্থী তাহাকে নির্ম্মম ভাবে বিদূরিত করিতেই হইবে। তাহার পর দেখিতে পাওয়া যায় আগ্রহ ও যত্ন থাকিলে কর্ম্মবাহুল্যের মধ্যেও অবসর করা যায়—ইচ্ছা থাকিলে পথ বাহির করা বেশী কঠিন হয় না। সাংসারিক ব্যাপারেও দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা যত অধিক কাজে নিযুক্ত আছে, তাহারাই তত অধিক অবসর পাইয়া থাকে। চলিতে ফিরিতে পথে ঘাটে নানা কাজের মধ্যেও যথেষ্ট সাধন চলিতে পারে—সাধন কেবল নির্দ্দিষ্ট সময়ের নিয়মিত উপাসনাদির মধ্যেই আবদ্ধ নহে। সুতরাং আগ্রহ আকাঙ্ক্ষার অভাব বা উদাসীনতা ও অবহেলা যে সাধনের অল্পতার অপর একটি প্রধান কারণ, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এই উদাসীনতা ও অবহেলার কারণ আবার কি হইতে পারে, তাহা একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখা নিতান্ত আবশ্যক। ক্ষুদ্র অসার বিষয়ে নিমগ্ন থাকা যে একটা কারণ তাহা না বলিলেও চলিবে। তুচ্ছ বস্তুতে যে মজিয়া থাকে সে আর মহৎ বিষয়ের জন্য লালায়িত হয় না। এই হেতু সর্ব্বদা ক্ষুদ্র চিন্তা ক্ষুদ্র লালসা পরিত্যাগ করিয়া, উচ্চ বিষয়ের চিন্তনে ও মহৎ আকাঙ্ক্ষার দ্বারা হৃদয়কে পূর্ণ করিবার চেষ্টায় নিযুক্ত থাকা যে একান্ত আবশ্যক, তাহা আর অধিক করিয়া বলিতে হইবে না। অনেকে বলেন, ঈশ্বরের দয়া ও পাপের শাস্তি বিষয়ে আমাদের মত ও বিশ্বাস ধর্ম্মসাধনের জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগাইবার পক্ষে বিশেষ প্রতিকূল—উদাসীনতা অবহেলা জাগাইবারই অনুকূল। ইঁহারা মনে করেন ভয়ই ধর্ম্মভাবের মূল, পরকালে পাপের শাস্তি বা অনন্ত নরকের ভয়ই মানুষকে তাহা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য আকুল করিয়া, ধর্ম্মসাধনের জন্য উৎসাহিত করে। আমরা যখন অনন্ত নরকে বিশ্বাস করি না, অপর পক্ষে মনে করি প্রেমময় পিতার অপার কৃপাতে সকলেই উদ্ধার পাইবে, ঘোর পাপীও তাঁহার করুণা হইতে বঞ্চিত হইবে না, চিরদিন পাপে ডুবিয়া থাকিবে না, অনন্ত শাস্তি ভোগ করিবে না, তখন আর আমরা পাপপথে চলিতে ভয় পাইব কেন? সংশোধনের জন্য ব্যস্তই বা হইব কেন? বরং নির্ভয়ে নিশ্চিন্ত মনে পাপের পথে চলিতেই উৎসাহিত হইব। এই প্রকার যুক্তি যে নিতান্তই অসার, তাহা অধিক করিয়া বলিতে হইবে না। পাপের শাস্তি যে সঙ্গে সঙ্গেই ভোগ করিতে হয়, তাহার হস্ত হইতে যে কেহই মুক্তি লাভ করিতে পারে না, সে কথা যাহারা না জানে না বুঝে, তাহারা পরকালে নরকযন্ত্রণা-ভোগের আশঙ্কায় কখনও অধিকতর ভীত হইবে না। আর বাস্তব জগতে সে দৃষ্টান্তের কোনই অভাব নাই। প্রকৃত পক্ষে পাপের পথ তিনি যেরূপ কণ্টকাকীর্ণ করিয়াছেন, প্রতি পদক্ষেপে যে দুঃখ যন্ত্রণা শাস্তি ভোগ করিতে হয়, তাহাই মানুষকে পাপের পথে চলিতে ভীত ও সন্ত্রস্ত করিবার এবং সংশোধিত ও ধর্ম্মপথে চলিবার জন্য আকুলিত করিবার পক্ষে যথেষ্ট। বাস্তবিক প্রেমময় পরমেশ্বরের অসীম দয়া ও ক্ষমার জন্যই মানুষের ধর্ম্মপথে চলিতে অধিকতর আগ্রহান্বিত হইবার কথা। এ ক্ষেত্রে উদাসীনতা ও অবহেলা বর্দ্ধিত হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। বরং তাঁহার প্রেম ও করুণাস্মরণে আগ্রহ ও অনুরাগ বৃদ্ধি পাইবারই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত কারণ রহিয়াছে। অনুরাগ আকর্ষণ করিবার পক্ষে ভয় অপেক্ষা প্রেমই যে অধিকতর কার্য্যকারী, তাহা আর অধিক করিয়া বলিতে হইবে না। এই হেতু তাঁহার প্রেম ও করুণা দর্শনে উক্ত মতাবলম্বী ব্রাহ্মেরই অধিকতর অনুরাগী ও ব্যাকুলচিত্ত হইবার কথা। আর প্রকৃত পক্ষে পূর্ব্ববর্ত্তী ব্রাহ্মগণের জীবনে তাহা দেখিতেও পাওয়া গিয়াছে। তাঁহারা তাঁহার অতুল প্রেম ও করুণার পরিচয় পাইয়াই সংসারের সুখ

সুবিধা, আত্মীয় স্বজন পরিবার, যাহা কিছু আকর্ষণের বস্তু সমস্ত তুচ্ছ করিয়া আকুল প্রাণে প্রেমময় প্রিয়তম দেবতার পশ্চাতে ছুটিয়া আসিয়াছিলেন, উন্নততর—মহত্তর—জীবন লাভের জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন, ধর্ম্মসাধনকে সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রদান করিয়া প্রধান ভাবে তাহাতেই আপনাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অবশ্য এইরূপ জীবন্ত অনুভূতি চির জীবন সমভাবে থাকিবার কথা নয়। সময় সময় তাহা অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া থাকে। তখন তাহার স্মৃতির উপরই নির্ভর করিয়া বিশ্বাসের সহিত প্রতীক্ষা করিতে হয়, আশায় ভর করিয়া পথ চলিতে হয়। সেই অনুভূতিকে আবার নূতন ও উজ্জ্বল করিয়া লইবার জন্য বিশেষ সচেষ্ট হইতে হয়। এখানেই সাধনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা। তাঁহারা তাহা করিতেন, তাঁহাদের সাধননিষ্ঠা ছিল; আমরা তাহা করি না, আমাদের তাহা নাই। ইহাতেই তাঁহাদের ও আমাদের মধ্যে এত পার্থক্য। তাঁহারা শুধু স্মৃতি বা কল্পনা লইয়া তৃপ্ত থাকিতেন না, সত্যকেই চাহিতেন। একমাত্র সত্য শিব ও সুন্দরই তাঁহাদের লক্ষ্য হইয়াছিলেন, তাঁহার সেবাতেই তাঁহারা আপনাদিগকে অর্পণ করিয়াছিলেন। যাহা কিছু মিথ্যা, অকল্যাণকর ও কুৎসিত, তাহা হইতেই তাঁহারা আপনাদিগকে সর্ব্বতোভাবে দূরে রাখিতেন, তাহাদের সঙ্গে বিন্দুমাত্রও সন্ধি করিয়া চলিতেন না। এই চিত্তের শুদ্ধতাই তাঁহাদিগকে সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অদম্য উৎসাহের সহিত উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়াছিল, ইহাই তাঁহাদিগকে সরল সত্য উপাসনায়, আকুল প্রাণের প্রার্থনায় নিযুক্ত করিয়াছিল। তাঁহাদের হয়ত তেমন ভাষার পারিপাট্য ও প্রণালীর সুশৃঙ্খলা ছিল না, কিন্তু সরল প্রাণ ও সত্য ভাবের প্রতি প্রবল দৃষ্টি ছিল। তাই তাঁহারা কখনও বাক্যে বা তত্ত্বে ও প্রণালীতে আবদ্ধ ছিলেন না। তাঁহারা আর যাহাই করুন বা না করুন, অনেক সময়ই সত্যে ও ভাবে পূজা করিতেন—তাঁহাদের উপাসনার মধ্যে একটা গভীর আন্তরিকতা থাকিত। আমরা বোধ হয় বাহিরের উন্নতি ও পারিপাট্য সাধন করিতে যাইয়া, অনেক পরিমাণে আন্তরিকতা হারাইয়াছি, আমাদের উপাসনাদি হয়ত তাই অধিকাংশ স্থলে জীবনপ্রদ হয় না, নিতান্ত শুষ্ক প্রাণহীন হইয়া যায়। আমরা যে ভাষা ও দার্শনিক তত্ত্ব বিচারের সাহায্যে, চিন্তা ও কল্পনা বলে, গড়া দেবতার পূজায় আবদ্ধ থাকিয়া আত্মপ্রতারিত হইতে পারি, তাহা ভুলিয়া থাকিলে চলিবে না। এ বিষয়ে ঋষি ইমার্সন আমাদিগকে বিশেষ ভাবে সতর্ক করিয়াছেন। এ ভ্রমের হস্ত হইতে রক্ষা না পাইলে সত্য ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করা যায় না—পূজা সত্য হয় না, জীবনপ্রদ হয় না। তীক্ষ্ণ আত্মদৃষ্টি, গভীর আত্মপরীক্ষা ব্যতীত এই ভ্রম বুঝিতে পারা যায় না। অনেক সময়ই দেখিতে পাওয়া যায়, ভাষা ও তত্ত্ব হিসাবে নিখুঁত বহু উপাসনাও হৃদয়কে স্পর্শ করে না, আত্মাকে উচ্চতর লোকে লইয়া যায় না, জীবনে আমূল পরিবর্ত্তন সাধন করে না, প্রাণে নূতন বল ও শক্তি সঞ্চার করিতে পারে না। তাই রাজর্ষি রামমোহন গাহিয়াছিলেন "সত্যসূচনা বিনা সকলি বৃথায়, যেমন বদন থাকিতে অদন করা নাসিকায়।" "সত্যে কর প্রীতি পাইবে পরিত্রাণ।" —সত্যে প্রীতি স্থাপিত না হইলে পরিত্রাণ নাই। আমাদের উপাসনাদি কেন বৃথা হইয়া যাইতেছে, সেরূপ ফলপ্রদ হইতেছে না, তাহা গভীর ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। প্রাণহীন প্রণালীবদ্ধ উপাসনা করিয়া তৃপ্ত থাকিলে চলিবে না। তাহাতে উন্নতি ও কল্যাণ নাই, বরং অকল্যাণ আছে—তাহাতে অহঙ্কার ও উদ্যমহীনতা বর্দ্ধিতই হয়, সত্য ধর্ম্মানুরাগ ও ব্যাকুলতা, উচ্চজীবনলাভের আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা, হ্রাসই প্রাপ্ত হয়। ইহার মধ্যে এক প্রকার সাধননিষ্ঠা থাকিলেও প্রকৃত সাধনশীলতার অভাবই দৃষ্ট হইবে। কারণ, ইহাতে নিয়মিত বিধিপালন থাকিলেও, অবিশ্রাম চেষ্টা যত্ন উদ্যম থাকিতে পারে না। যেখানে নিত্য নূতন আদর্শের প্রকাশ নাই, সেখানে উচ্চ হইতে উচ্চতর অবস্থায় উপনীত হইবার অবিরাম আকাঙ্ক্ষা এবং চেষ্টাও নাই,—কোনও প্রকার গতি ও সংগ্রাম নাই। আত্মতৃপ্তি ও অহঙ্কারের ন্যায় অনিষ্টকর শত্রু আর কিছুই নাই। চির দিনই সাধকগণ সে কথা বলিয়া আসিয়াছেন। আমরাও নিজ নিজ জীবনে ও চারিদিকে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাইতেছি। দীনতা ও অহঙ্কারহীনতা প্রকৃত ধর্ম্মজীবনের একটি বিশেষ লক্ষণ। যেখানে তাহার অভাব সেখানে সত্য ধর্ম্ম আছে, ব্রহ্মসংস্পর্শ আছে, বলা যায় না। যে মহান্ ব্রহ্মের একটু সত্য আভাসও পাইয়াছে, সে কি আর আপনার ক্ষুদ্রতা ও অক্ষমতায় অভিভূত না হইয়া অহঙ্কারে, আপনার তত্ত্বজ্ঞান ও সাধনশীলতার গৌরবে, স্ফীত হইতে পারে? সে নিশ্চয়ই আপনার শক্তি ও প্রয়াসের অকিঞ্চিৎকরত্ব অনুভব করিয়া বিনীত অন্তরে গভীরতর সাধনে নিযুক্ত না হইয়া পারে না। সে কিছুতেই আত্মতৃপ্ত হইয়া থাকিতে পারে না। আপনার শক্তি সামর্থ্যের উপর নির্ভরস্থাপনও করিতে পারে না। এ সকল কথা আর বিস্তারিত ভাবে বলিবার কোনও প্রয়োজন নাই। আমরা এই অসম্পূর্ণ আলোচনা হইতে সহজেই বুঝিতে পারিতেছি, আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা কেন এমন হইল, আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রহ্মোপাসনাকে কতটা অবলম্বন ও সাধন করিতেছি, এবং তাহার পরিণাম কোথায়। আমাদিগকে এই দিকে বিশেষ দৃষ্টি প্রদান করিতে হইবে, গভীর আত্মপরীক্ষায় নিযুক্ত হইয়া উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। বৃথা আত্মপ্রবঞ্চিত হইয়া উদাসীনতা ও অবহেলার মধ্যে নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। আমাদিগকে কঠোরতর ও গভীরতর সাধনে নিযুক্ত হইতে হইবে। কোনও প্রকার ওজর আপত্তি না করিয়া, তাহার জন্য অধিকতর সময় দিতে হইবে। সকল প্রচেষ্টাকে অধিকতর সত্য ও প্রাণবন্ত করিতে হইবে। শুধু প্রাণহীন নিয়মপালন দ্বারা কার্য্যসিদ্ধির কোনও আশা নাই। এ বিষয়ে আমাদের সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হউক। আমরা সমগ্র হৃদয় মন প্রাণ ইহাতে অর্পণ করি। মঙ্গলময় বিধাতা আমাদিগকে উপযুক্ত আকাঙ্ক্ষা ও বল প্রদান করুন। তাঁহার পবিত্র ইচ্ছাই আমাদের জীবনে ও সমাজে জয়যুক্ত হউক। তাঁহার সত্য রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হউক। আমরা সম্পূর্ণরূপে তাঁহার হইয়া ধন্য ও কৃতার্থ হই। তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

সমবেত উপাসনা।

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তিচ রমন্তিচ।

যাঁহাদের চিত্ত আমাতেই আসক্ত, যাঁহাদের প্রাণ আমাতেই সমর্পিত, তাঁহারা আমার কথা পরস্পরকে বুঝাইয়া দেয়; আমার বিষয়ই কথা বলে, কীর্ত্তন করে; তাহাতেই তাহারা আনন্দ পায়, রমণ করে।

ঈশ্বরভক্ত যাঁরা, তাঁতে আত্মসমর্পণ করেছেন যাঁরা, তাঁরা চিরদিনই একত্র হ'য়ে তাঁর প্রসঙ্গ, তাঁর গুণকীর্ত্তন, তাঁর প্রেমের লীলাবর্ণন করিতে ভালবাসেন, তাতেই আনন্দ পান। সংসারেও ত আমরা দেখি, যদি দশ জন আমরা কাহাকে ভক্তি করি, শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি, দশ জন মিলে তাঁহার গুণের কথা বল্তে, তাঁহার প্রসঙ্গ কর্তে, আনন্দ পাই। ভগবানে যাঁদের প্রেম অর্পিত হয়েছে, তাঁরাও একত্রে তাঁর প্রসঙ্গ ক'রে তৃপ্তি ও আনন্দ অনুভব করেন। সেই জন্যই সকল দেশেই উপাসকমণ্ডলী গঠিত হয়েছে, সমবেত উপাসনা, কীর্ত্তন, বন্দনা, প্রসঙ্গের ব্যবস্থা হয়েছে। এ দেশের ধর্ম্মসাধন অনেকটা ব্যক্তি-গত; কত যোগযুক্ত ঋষি, নির্জ্জনে ধ্যানে নিমগ্ন হ'য়ে আছেন,—তাঁহারা হয়ত লোকালয়েই আসেন না। কিন্তু তাঁর মধ্যে মণ্ডলীর সৃষ্টি হয়েছে, গোষ্ঠী স্থাপিত হয়েছে। গীতাকার এই সমবেত উপাসনা, একত্রে তাঁর নামকীর্ত্তন, প্রেমের লীলা-বর্ণনের কথা বলেছেন। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে ব্রহ্মসাধকমণ্ডলীর কথা আছে। বৈষ্ণবদের সংকীর্ত্তন, শিখদের সঙ্গত, শাস্ত্রপাঠ ও ব্যখ্যা প্রভৃতি নানা প্রকার সমবেত ধর্ম্মসাধনের ব্যবস্থা এ দেশে রহিয়াছে। খৃষ্ট জগতে, মুসলমান সমাজে, বৌদ্ধদের সংঘেও সমবেত সাধনের ব্যবস্থা রহিয়াছে। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ও তাঁহার সহযোগিগণ প্রথমে অ্যাডাম সাহেবের জন্য প্রতিষ্ঠিত ইউনিটেরিয়ান্ গির্জ্জায় সমবেত উপাসনাক্ষেত্রে উপস্থিত হইতেন; সেই সমবেত উপাসনার রস আস্বাদন করিয়াই তাঁহারা, নিজেদের আদর্শ অনুসারে, নিজেদের মনের মতন ব্রহ্মোপাসনা করিবার জন্য, ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে, ৬ই ভাদ্র, কমল বসুর বাড়ীতে প্রথমে সমবেত ব্রহ্মোপাসনার ব্যবস্থা করেন। বলিতে গেলে, সেই দিনই বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইল; তদবধি ব্রাহ্মগণ সপ্তাহে অন্ততঃ একবার একত্রিত হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করেন; এতদ্ব্যতীত পারিবারিক উপাসনা, অনুষ্ঠানে উপাসনা, সংকীর্ত্তন, সঙ্গতে আলোচনা প্রভৃতিতে ব্রহ্মভক্তগণ সমবেত হইয়া আনন্দ অনুভব করেন। প্রিয়জনের প্রসঙ্গ কর্তে সকলের ভাল লাগে, সকলেরই আনন্দ হয়। পরম প্রিয় যিনি, জীবন-দেবতা যিনি, আনন্দ রূপে-অমৃত-রূপে যিনি প্রকাশিত, সকল প্রেমের প্রস্রবণ যিনি, যাঁহারা তাঁহার একটু স্পর্শ পেয়েছেন, তাঁহার মধুর রস একটু আস্বাদন করেছেন, তাঁহারা স্বয়ং একত্র হ'য়ে তাঁর ভজন করেন, তাঁহার নাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহার প্রসঙ্গ করেন, নিজেদের জীবনে তাঁর প্রেমের যে পরিচয় পেয়েছেন, সাধুজীবনে তাঁর যে লীলা দেখেছেন, তাহা পরস্পরের নিকট ব্যক্ত করেন। ইহাতে তাঁহারা সুখ পান, আনন্দ পান। তাই তাঁরা একদিকে যেমন সমবেত উপাসনা, নামকীর্ত্তন করেন, তাঁর প্রসঙ্গ তেমন অপর দিকে তাঁহারা করেন। এই সমবেত সাধনে যে কেবল ভক্তগণ, যাঁহারা সাধনে অগ্রসর হয়েছেন তাঁহারা, আনন্দ পান তাহা নহে। যাহাদের ধর্ম্মজীবন মাত্র আরম্ভ হয়েছে, এমন্ কি যাহাদের জীবন এখনও উদ্বুদ্ধ হয় নাই, তাঁহারাও ইহাতে আনন্দ পান, তাহাদের জন্যও সমবেত সাধনার বিশেষ প্রয়োজন। এই দশ জনে, শত জনে একত্র হ'য়ে ঈশ্বরের মিষ্ট নামকীর্ত্তনে, তাঁর বন্দনা আরাধনায়, তাঁর প্রসঙ্গে সকলেই আনন্দ লাভ করেন। এ আনন্দের তুলনা নাই। যাঁহারা আনন্দের অন্বেষণে আমোদ প্রমোদে রত হন, তাঁহারা ভ্রান্ত, কৃপাপাত্র। যাহাদের জীবন উদ্বুদ্ধ হয় নাই, তাঁহারাও দশ জনে মিলে ঈশ্বরের নামকীর্ত্তনে যে আনন্দ পেতে পারেন, অন্য আমোদ প্রমোদে যে সুখ পাওয়া যায়, তাহা তার নিকট অতি তুচ্ছ। সেই জন্যই দাউদ নরপতি বলেছিলেন O taste and see the Lord is good. ধর্ম্মপিপাসু নরনারীর পক্ষে সমবেত উপাসনা কীর্ত্তন, প্রসঙ্গ একান্ত আবশ্যক; তাহাতে ধর্ম্ম ভাব প্রাণে জাগ্রত হয়, প্রাণে ভাবের সঞ্চার হয়, নির্জীব প্রাণ সজীব হয়, মৃতপ্রাণে আশার সঞ্চার হয়।

অবশ্য নির্জ্জনে একান্তে ঈশ্বরচরণে আত্মনিবেদন করা সাধনের ভিত্তি। নির্জ্জন সাধন ব্যতীত ধর্ম্মজীবন ত গড়েই না। Alone to the Alone ইহা ত চাই-ই। আমার হৃদয়-দেবতাকে আমি প্রাণে একান্তে দেখিব, তাঁর চরণে আত্মনিবেদন করিব, তাঁর প্রেমের লীলা জীবনে দেখ্‌ব; ইহা না হইলে ত সাধনই হইল না। আর একথাও ঠিক, ভজন সাধন না করলে যে মানুষ ঈশ্বরকে লাভ কর্তে পার্বেই না, এমনও নয়। কিন্তু সমবেত সাধনে আনন্দ আছে, শান্তি আছে, সমবেত সাধনের প্রয়োজন আছে; নূতন সাধনার্থীর পক্ষেও ইহা একান্তই প্রয়োজনীয়। যাঁহারা সাধনপথে অগ্রসর হয়েছেন, তাঁহাদের পক্ষেও সজন সাধন প্রয়োজনীয়।

ধর্ম্মসাধনের প্রথম অবস্থাতে নির্জ্জন সাধন সহজ নহে—মন কিছুতেই ঈশ্বরে নিবিষ্ট হইতে চায় না; তাঁর নামে যে রস আছে তাহা তখন অনুভূত হয় না। তখন সজন সাধনে প্রাণে আরাম ও আশা পাওয়া যায়। যাহাদের মন উদ্বুদ্ধ হয় নাই, যাহাদের ধর্ম্মজীবন আরম্ভ হয় নাই, তাঁহারাও সজন উপাসনা, নামকীর্ত্তন, ধর্ম্মপ্রসঙ্গে যোগ দিয়া ধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। জর্জ্জ মুলারের প্রথম জীবন অতি উচ্ছৃঙ্খল ছিল; কোনও বন্ধুর অনুরোধে এক পারিবারিক উপাসনাতে যোগ দিতে তিনি গেলেন। সেই উপাসনা হইতে নূতন লোক হ'য়ে তিনি ফিরিলেন। সেই অবধি তাঁর জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হ'য়ে গেল। ব্রাহ্মসমাজেও কত জনের কথা জানি, তাঁহারা কৌতূহলবশে ব্রহ্মোপাসনাতে আসিতেন, কেহ কেহ গান শুনিবার জন্য আসিতেন, কেহ কেহ অন্য ভাবেও আসিতেন, তাঁহারা কিছু দিন উপাসনাতে যোগ দিয়া ঈশ্বরচরণে বসিয়া গেলেন, তাঁদের

ভাদ্রোৎসব উপলক্ষে ৫ই ভাদ্র, রবিবার, রাত্রিকালীন উপাসনান্তে শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস কর্ত্তৃক বিবৃত।

জীবনের পরিবর্ত্তন হলো। Those who came to scoff remained to pray—যারা বিদ্রূপ করিতে এসেছিল, তারা উপাসনায় ব'সে গেল। আমরাও নিজেদের জীবনে দেখেছি, সজন উপাসনায় আস্‌তে আস্‌তে উপাসনা ভাল লাগ্‌তে লাগ্‌ল। কোন্ দিন কার কথাতে প্রাণে পরিবর্ত্তন আস্‌বে, তা ত জানি না। ভগবান আমাদিগকে ধর্‌বার অবসর খোঁজেন। আমি নিজে প্রথমে ব্রাহ্মসমাজে আস্‌তাম না। তখন বরিশালে পড়ি। ছাত্রসমাজ রবিবার সকালে হইত। প্রথমে আচার্য্য গিরিশচন্দ্র উপাসনা করিতেন, তৎপরে বক্তৃতা হইত। তখন ভক্তিভাজন অশ্বিনী কুমার দত্ত "সরকারে খাব" "জলের মধ্যে আগুন" প্রভৃতি অদ্ভুত বিষয়ে বক্তৃতা করিতেন। আমি উপাসনার পরে বক্তৃতাতে যেতাম। একদিন যেয়ে দেখি, বক্তৃতা আরম্ভ হয়েছে, অশ্বিনী বাবু বক্তৃতা কচ্ছেন, কিন্তু আস্তে আস্তে একটী একটী কথা বাহির হচ্ছে, কিছুক্ষণ পরে তিনি প'ড়ে গেলেন, আর "কবে সহজে মা ব'লে জুড়াব প্রাণ" এই সঙ্কীর্ত্তনটি আরম্ভ হলো। বেলা ১টা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন চল্‌ল। তখন কি ভাবের তরঙ্গ দেখা গেল, সকলেই বিমুগ্ধ। পরে শুন্‌লাম উপাসনার সময় থেকে এই বিভোর ভাব হয়েছিল। তদবধি উপাসনাতেও যেতে আরম্ভ কর্‌লাম। উপাসনা ভাল লাগ্‌তে লাগ্‌ল। রবিবারে আবার উপাসনাতে যাব, এই প্রতীক্ষায় সমগ্র সপ্তাহ থাকিতাম। নির্জ্জন উপাসনাতে মন বিক্ষিপ্ত হতো, কিন্তু মন্দিরের উপাসনাতে প্রাণ সরস হ'তো। তাই বলি, যাঁরা সাধনপথের যাত্রী, অথবা সাধন আরম্ভই করেন নাই, তাদের পক্ষে সজন উপাসনা, প্রসঙ্গ, কীর্ত্তন, একান্ত প্রয়োজনীয়। অনেকে উপাসনাতে রস পান না ব'লে আসেন না, তাদের বলি তারা আসুন, উপাসনায় যোগ দিতে দিতে রস পাবেন, প্রাণের দুয়ার খু'লে যাবে। তিনি কৃপা কর্‌বেন। তখন নির্জ্জন উপাসনাতেও মন বস্‌বে, আনন্দ পাবেন। সজন উপাসনাতে কেবল যে আচার্য্যের উপাসনা ও উপদেশেই মন জাগ্রত হয়, প্রাণে সরস ভাব আসে, তা নয়। এখানে কত ভক্ত, কত ব্যাকুলপ্রাণ লোক আসেন, তাঁহাদের সঙ্গে একত্রে উপাসনাতে প্রাণে নূতন ভাবের সঞ্চার হয়। শুষ্ক প্রাণ সরস হয়, পাপচিন্তা দূর হয়। একের প্রাণের প্রেমের বাতাস অন্যের প্রাণে যেয়ে স্পর্শ করে, একের প্রাণের সরস ভাব, আকুল ক্রন্দন অন্যের হৃদয়কে স্পর্শ করে! একের প্রেম ও ভক্তি অপরকে উদ্বুদ্ধ করে। এ যে অধ্যাত্ম জীবনের স্পর্শ, ইহা দৈহিক স্পর্শ অপেক্ষাও যে বেশী শক্তি সঞ্চারিত কর্‌তে পারে। তাই ভগবান যেন বলেছেন—

নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ
মদ্ভক্তাঃ যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।

আমি বৈকুণ্ঠেও বাস করি না, যোগীদের হৃদয়েও বাস করি না: আমার ভক্তগণ যেখানে আমার নাম গান করেন, হে নারদ, সেখানেই আমি বাস করি।

দশ জনে শত জনে মিলিত হ'য়ে যখন ব্রহ্মোপাসনা হয়, তাঁর নামকীর্ত্তন হয়, তখন যে সকলের প্রাণেই ভাবের তরঙ্গ খেল্‌তে থাকে, সে শোভন দৃশ্য, সে স্বর্গের মোহন ছবি আমরা কত প্রত্যক্ষ করেছি! কত লোক নূতন জীবন লাভ করেছে, জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হয়েছে! কত জনে ঈশ্বরের নামে সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রে ব্রহ্মদাস হ'য়ে গিয়েছেন! আমাদের প্রাণেও কত নব ভাব, নব আনন্দ জেগেছে! এখনও এক এক দিন, বিশেষতঃ উৎসবের সময়, সে দৃশ্য দেখি। তখন ধরাতলে স্বর্গধাম অবতীর্ণ হয়।

সমবেত উপাসনাতে আমরা যে এক—এক ব্রহ্মের উপাসক, এক পিতার সন্তান, এক সূত্রে সহস্রটি প্রাণ যে গ্রথিত হয়েছে, তাহা বুঝিতে পারি; পরস্পরকে এই খানেই আমরা প্রকৃত ভাবে চিনিতে পারি। আমরা নানা প্রকার আমোদে অনুষ্ঠানে সমবেত হই; তাহাতে প্রাণের যোগ হয়, আনন্দ হয়। কিন্তু উপাসনা-ক্ষেত্রে, ধর্ম্মপ্রসঙ্গে নামকীর্ত্তনে ব্রহ্মের চরণে যখন আমরা মিলিত হই, তখন প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই আমরা পরস্পরের কত নিকটে, কত আপনার—যে দূরে ছিল, সে নিকট হয়; যে অজানা ছিল, সে পরিচিত হয়, যে শত্রু ছিল, সে মিত্র হয়। সকলের প্রাণেই যে ব্রহ্ম, সকলেই যে একপ্রাণে ব্রহ্মের নাম কচ্ছি; সকলের প্রাণে যে এক প্রেম-স্রোত প্রবাহিত! কেহ দূরে নয়, কেহ ত পর নয়। একত্রে ব্রহ্মচরণে বসিলে সকলের মধ্যে একতা, একপ্রাণতা আসে, একই সাম্য ভাব আসে, ধনী নির্ধন, ব্রাহ্মণ শূদ্র, উচ্চপদস্থ নীচপদস্থ, এই যে নানা প্রকার ভেদ ভাব ইহা বিদূরিত হয়। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে যে একটা সাম্য ভাব Democratic Spirit দেখ্‌তে পাওয়া যায়, তার প্রধান কারণ উপাসনা-ক্ষেত্রে উচ্চ নীচ ভু'লে তাঁরা এক হয়। উপাসনা-ক্ষেত্রে, ঈশ্বরের চরণে, বাদসা ও ভিখারী পাশা পাশি বসে। তখন তাঁরা যে এক—এক পিতার সন্তান—তাহা অনুভব করে। সুতরাং সমবেত উপাসনা-ক্ষেত্রে একত্র হইলে আমরা যে এক পরিবারভুক্ত তাহা বুঝিতে পারিব, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি হইবে, সুখে দুঃখে সমবেদনা জন্মিবে। অনেক সময় অভিযোগ আসে ব্রাহ্মগণ পরস্পরের খোঁজ লয় না। অভিযোগটা যে একেবারে মিথ্যা তা নয়। কিন্তু ইহার কারণ কি? আগে ত এরূপ ছিল না। আগে উপাসনা-ক্ষেত্রে সকলে মিলিত হ'ত, সকলের সঙ্গে দেখা হ'ত, একদিন এক জনকে না দেখিলেই তার কি হয়েছে, এই অনুসন্ধান চলিত, তার দুঃখে বিপদে দশজন যেয়ে উপস্থিত হ'ত প্রাণ হ'তে সহানুভূতি আসিত। আজ বৎসরের মধ্যেও অনেকের সঙ্গে দেখা হয় না, সহানুভূতি—প্রাণের সহানুভূতি—আস্‌বে কিরূপে? কর্ত্তব্য জ্ঞানে, ভদ্রতার খাতিরে আর কতটা হয়?

এই ব্রহ্মের চরণে উপাসনা-ক্ষেত্রে যখন বসি, তখন যাঁরা সেখানে সশরীরে উপস্থিত, তাহাদিগকেই যে কেবল নিকটে দেখি, আপনার ব'লে মনে করি, তা নয়; যাঁরা ব্রহ্মভক্ত অথচ দূরে রয়েছেন, পরলোকে রয়েছেন, তাঁহারাও নিকটে আসেন। সকল দেশের সকল কালের ইহলোক-পরলোকবাসী সাধু সাধ্বীগণ, ভক্ত জ্ঞানী কর্ম্মিগণ আমাদের সঙ্গে একই ব্রহ্মের আরাধনা করিতেছেন, ইহা অনুভব করিতে পারি। তখন কি আনন্দধারা প্রবাহিত হয়, প্রাণ কত উদার হ'য়ে যায়, দৃষ্টি কত দূরে প্রসারিত হয়! হৃদয় কত বড় হ'য়ে যায়! তখন জাতিতে জাতিতে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে পার্থক্য থাকে না। এক ব্রহ্ম-

পূজাতেই হিন্দু মুসলমান, খৃষ্টান বৌদ্ধ, সকলে মিলিত হইতে পারি। তাঁতে প্রীতি ও তাঁর প্রিয়কার্য্যসাধন, ইহাইত উপাসনা। এই উপাসনাতে হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, খৃষ্টান হউক, সকলেই যোগ দিতে পারেন। প্রেম ভক্তি দ্বারা এক ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পূজা ও উদার প্রেমপ্রেরণায় নরসেবা, জীবসেবা, এই ত আমাদের উপাসনা। কে আছে জগতে যে এই উপাসনাতে আসিতে অমত করিতে পারে? এখানে সকল গণ্ডী ভেঙ্গে যায়, সকল সংকীর্ণতা চ'লে যায়, সকল অপ্রেম বিদ্বেষ দূর হয়, সকল কুসংস্কারজনিত কলহ নির্ব্বাপিত হয়, সকল জাতি ও বর্ণ এক হয়। ইহাই মহা মিলনভূমি; সমগ্র মানব এক, এক জাতি, এক ভগবান, এক উপাসনা-ক্ষেত্র, এক মন প্রাণ। আমরা যদি ব্রহ্মচরণে একত্রে মিলিত না হই, যদি একত্রে উপাসনা, একত্রে নামকীর্ত্তন, একত্রে ব্রহ্মপ্রসঙ্গ না করি, তবে এই ব্রাহ্মধর্ম্ম যে কত উচ্চ, ইহার সাধনা যে কত শ্রেষ্ঠ, ইহার মত যে কত উদার, ইহাই যে মুক্তিপ্রদ ধর্ম্ম, ইহা বুঝিতে সমর্থ হইব না। ব্রাহ্মধর্ম্ম এ দেশে যে কি যুগান্তর এনেছেন, এ দেশের সকল প্রচেষ্টার উৎস যে ছিলেন ব্রাহ্মসমাজ, তাহা বুঝিতে পারিব না। আমরা তখন বিকৃত উদারতার দ্বারা পরিচালিত হ'য়ে ধর্ম্মের বিশুদ্ধ ভাব ভু'লে যাব। এক পরব্রহ্মের সাক্ষাৎ ও আধ্যাত্মিক উপাসনা ও কল্পিত দেব দেবীর উপাসনাকে একই পদবীতে অনেকে স্থান দিবেন। আর যত কুসংস্কার দুর্নীতি এসে আমাদের মধ্যে প্রবেশ করিবে। আমি দেখেছি, যখন মানুষের প্রকৃত ধর্ম্মভাব ম্লান হয়, তখনই সে ঈশ্বরকে ছেড়ে কুসংস্কারের আশ্রয় করে। সে জ্ঞানগর্ব্বে, তর্কের জোরে, ঈশ্বর মানে না, উপাসনা মানে না, কিন্তু হাঁচি টিকটিকি মানে, বৃহস্পতিবারের বার-বেলা মানে, যত রকম কুসংস্কার মানে। দশ জন ধর্ম্মবন্ধুর সঙ্গে ধর্ম্মালোচনা না ক'রে একাকী থাকিলে, যত অদ্ভুত মত ও ভাব এসে মনকে অধিকার করে। এই সব দোষ হইতে মুক্ত থাকার জন্যও সমবেত উপাসনা ও সঙ্গতে আসা আবশ্যক। আজ কত লোক এমন উদার উপাসনা-ক্ষেত্র হইতে দূরে থাকেন; তাঁহারা সপ্তাহে দুই ঘন্টা সময় ভাই বোনদের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে ঈশ্বরচরণে বস্‌তে পারেন না। তাঁরা কেহ কেহ বলেন, আচার্য্যগণ যে উপাসনা করেন, উপদেশ দেন, তাহা জীবন্ত হয় না, সরস হয় না, সত্য হয় না, তাহাতে প্রাণ স্পর্শ করে না, উদ্দীপনা জাগে না, দৃষ্টি খোলে না। স্বীকার করি, আমরা যারা আচার্য্যের কার্য্য করি, সকলে আচার্য্যের উপযুক্ত নই; আমাদের সেরূপ জীবন লাভ হয় নাই যাতে তোমাদের প্রাণ স্পর্শ কর্‌তে পারে, উদ্দীপনা জাগ্রত কর্‌তে পারে। তাই

কেহ শোনে না গান, জাগে না প্রাণ,
বিফলে গীত অবসান।

তোমরা এই অধমকেও এই স্থানে বসায়েছ; তোমরা এস না তাইত আমরা এসেছি। যাঁদের ঈশ্বর আহ্বান কর্‌লেন তাঁরা এলেন না, তাই তিনি পথের ভিখারী কাঙ্গালকে ধ'রে এনে তাঁর কাজের ভার দিলেন। তোমরা জ্ঞানী, তোমরা উপযুক্ত, আমরা তোমাদের তৃপ্তি দিতে পারব কেন? কিন্তু তবুও বলি, তোমরা কেন এসে এ ভার নেও না? তোমরা কেন এসে আমাদের সহায় হও না? উপাসনাতে কি কেবল আচার্য্যেরই দায়িত্ব? তা ত নয়! তোমরা যদি এস, তোমাদের মুখ যদি উপাসনার সময় দেখ্‌তে পাই, তোমরা যদি তোমাদের প্রীতি ও ব্যাকুল ভাব ভক্তি দ্বারা আচার্য্যদিগকে উদ্দীপ্ত কর, তবে এই যে আমরা, আমাদের উপাসনাও সরস হয়, আমাদের কথাও মিষ্ট লাগে, নগণ্য যে আমরা, আমাদের দ্বারাও ঈশ্বরের কাজ হয়। তাই বলি, এখানে তোমাদের দায়িত্ব আছে। উপাসনা-ক্ষেত্রে আচার্য্যের দায়িত্ব খুব বেশী, কিন্তু উপাসকগণেরও দায়িত্ব আছে; তাঁহাদের সরস ভাব, প্রেম ভক্তি ব্যাকুলতা, আচার্য্যকে অনুপ্রাণিত করে। তাই বলি, তোমরা দূরে থেক না, তোমরা এসে কার্য্যের ভার নেও, অন্ততঃ তোমরা আমাদের সহায় হও।

লোকে বলে, আমরাও দেখি, ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যের প্রসার ক'মে গিয়েছে। এক সময় ছিল, ব্রাহ্মসমাজই এ দেশের সকল শুভ কার্য্যের অগ্রণী ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এ দেশে সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির সূত্রপাত করিয়া গিয়াছিলেন। উন্নতি সর্ব্বাঙ্গীণ ও সর্ব্বতোমুখীন্; তাই তিনি এমন এক ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিলেন, যাহার দৃষ্টি সকল দিকে ধাবিত হইবে। সমাজসংস্কার, রাজনৈতিক সংস্কার, শিক্ষা-সংস্কার, শিক্ষাবিস্তার, শাস্ত্র-প্রচার, সাহিত্যের উন্নতি, সকল দিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল; বিশুদ্ধ ঈশ্বরজ্ঞান, তাঁর সাক্ষাৎ ও আধ্যাত্মিক উপাসনা প্রতিষ্ঠা করা সকল প্রচেষ্টার মূলসূত্র ছিল। ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সকল উন্নতির চেষ্টা এক জীবনে তিনি করিয়া গিয়াছেন। তদবধি ব্রাহ্মগণ একদিকে যেমন এক পর-ব্রহ্মের পূজা নিজ জীবনে ও দেশে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেছেন, তেমনি অপর দিকে নরসেবা, দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি, সমাজসংস্কার, রাজনৈতিক উন্নতি, সাহিত্যের উন্নতি, রোগীর সেবা, দরিদ্রের দুঃখবিমোচন, বিপদে অশ্রুমোচন, দুর্ভিক্ষে জলপ্লাবনে মানবের সেবা, প্রভৃতি সকল কার্য্যে তাঁহারাই অগ্রণী ছিলেন—অন্য লোক তাঁহাদের সঙ্গে এসে জুটিত। আজ দেশে কার্য্যের সাড়া পড়েছে, দেশ জাগ্রত হয়েছে, নানা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; ইহা আনন্দের কথা। ব্রাহ্মসমাজের দীর্ঘকালব্যাপী চেষ্টার সুফল প্রসূত হয়েছে; দেশ জাগ্রত হয়েছে। যে সকল কুপ্রথা দূর করিবার জন্য ব্রাহ্মগণ কত চেষ্টা করেছেন, কত লাঞ্ছনা সহ্য করেছেন, সে সকল কুপ্রথা দেশ-বাসী এখন জাতীয় উন্নতির অন্তরায় বলিয়া বুঝিতে পেরেছে। আজ জাতিভেদের নিগড় ভগ্ন হ'তে যাইতেছে; নারীজাতির শিক্ষা ও স্বাধীনতার দ্বার উন্মুক্ত হইতেছে, বিধবাদের দুঃখে দেশবাসীর প্রাণ কেঁদে উঠেছে। দুর্ভিক্ষে জলপ্লাবনে চারি দিক হ'তে সাহায্য আসিতেছে, রাজনৈতিক উন্নতির জন্য মানুষ সর্ব্বস্ব অর্পণ করিতে প্রস্তুত হইতেছে। চারি দিকেই একটা নূতন বাণীর সাড়া পাইতেছি। কিন্তু আমরা কোথায়? আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলি যে মৃত প্রায়! ব্রাহ্মসমাজ হ'তে যে সেবার কার্য্যের চেষ্টা হইতেছে না, ব্রাহ্মগণ যে দেশের কার্য্য করেন না, তাহা নয়। অনেকে নানা প্রতিষ্ঠানের সহিত সংসৃষ্ট আছেন। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ হ'তে কোনও প্রচেষ্টা আরম্ভ

করিতে হ'লে লোক পাওয়া যায় না। দেশ তাই ব্রাহ্মসমাজের অস্তিত্ব ভুলিয়াই গিয়াছে। আমাদের মধ্যে কি কর্ম্মী নাই? সে কথা বলিতে পারি না—আমাদেরই যুবকগণকে নানা কর্ম্মক্ষেত্রে ত দেখ্‌তে পাচ্ছি! তবে তাদের সমাজের কাজে পাই না কেন? তাহার মূল অনুসন্ধান ক'রেও দেখ্‌তে পাই, এই সামাজিক সমবেত উপাসনাতে তাঁরা আসেন না ব'লে, তাঁদের ধর্‌তে পারা যাচ্ছে না, তাঁদের শক্তি একত্রীভূত করিতে পারা যাচ্ছে না। তারা আপনার মনে যে যেখানে পারেন কাজ কচ্ছেন, কেহ বা সুযোগ ও সুবিধার অভাবে কাজে লাগ্‌তে পাচ্ছেন না। তাঁরা যে আমাদের, তাঁরা যে আমাদের সহকর্ম্মী, সহযোগী, এ কথা বুঝ্‌তে পাচ্ছি কোথায়? তাদের প্রাণের ভাব, হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা জান্‌তে পাচ্ছি কোথায়? তাঁহারাও যে দশের জন্য, দেশের জন্য আত্মত্যাগ কর্‌তে প্রস্তুত, এ কথা বুঝ্‌তে পারি কি কোরে? তাঁরা যদি এই সমবেত উপাসনাতে আসেন, তাঁদের সঙ্গে পরিচয় হয়; পরস্পরের প্রাণের ভাব, মনের আকাঙ্ক্ষা, জীবনের আদর্শ জান্‌তে পারি, ব্রহ্মচরণে ব'সে পরস্পরকে আপনার ব'লে চিন্‌তে পারি, পরস্পরের ভাববিনিময় কর্‌তে পারি, একে অন্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হ'তে পারি। এ সুযোগ হ'তে তাঁরা আমাদের বঞ্চিত করেন কেন? ওগো ব্রাহ্মসমাজের নর নারী, ওগো ব্রহ্মের উপাসক ও উপাসিকাগণ, চেয়ে দেখ তোমাদের দারিদ্র কত! তোমরাই প্রথমে অন্ধকারাচ্ছন্ন ভারতে নবীন উষার আলোক এনেছিলে, তোমরাই প্রথমে এই দেশে সকল প্রকার উন্নতির বীজ ছড়াইয়াছিলে। তখন তোমরা মুষ্টিমেয় ছিলে, তোমাদের পদ ছিল না, মান ছিল না, সম্পদ্ ছিল না; কিন্তু ছিল তোমাদের ধর্ম্মপ্রাণতা, ছিল তখন একত্রে ব্রহ্মোপাসনা। একজন ব্রহ্মোপাসক কত দূর দূরান্তর হ'তে এসে সমবেত উপাসনাতে যোগ দিতেন! একজন ব্রাহ্মকে দেখ্‌লে আর এক জনের প্রাণে কত আনন্দ হতো! তাই মুষ্টিমেয় লোক দেশে নূতন যুগের অবতারণা কর্‌তে সমর্থ হয়েছিলেন। আজ তোমরা কত দূরে দূরে রয়েছ, নিকটে থাকৃতেও তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান কত! এই ব্যবধান দূর হবে কিসে? যদি ব্রহ্মচরণে একত্রে বস্‌তে পার, একত্রে তাঁর প্রসঙ্গ কর্‌তে পার। ব্রাহ্মসমাজের অগ্রণিগণের মধ্যে যে ভাব জাগে তা ত তোমাদের নিকট পৌঁছায় না! এখানে উপাসনাক্ষেত্রে তোমরা সকলে এসে তাহা শুনতে পাও না; সমাজের কাগজ তোমাদের পড়্‌বার সুবিধা হয় না। সুতরাং এদের প্রাণে যে ভাব জাগে তা সমাজ মধ্যে ত অনুপ্রাণনা জাগ্রত করে না, বরং তা বিকৃত হ'য়ে সকলের কর্ণে পৌঁছায়। আবার অপর দিকে তাদের ভাব ও চিন্তা অগ্রণীদের কর্ণে পৌঁছায় না। এই একটা ব্যবধান থেকে যায়। তাই আজ তোমাদিগকে বলি, এই যে সমবেত ব্রহ্মোপাসনা, এখানে সকলে এসে ব্রহ্মের চরণে বস। রাজা রামমোহন রায় ঋষি ছিলেন, তিনি ঋষিদৃষ্টিতে দেখেছিলেন, ভারতে যদি ধর্ম্মের নব আদর্শ প্রতিষ্ঠিত কর্‌তে হয়, যদি ভারতবাসীকে এক সূত্রে গ্রথিত ক'রে দেশের উন্নতিতে উৎসাহিত কর্‌তে হয়, তবে তাদের মধ্যে সমবেত ব্রহ্মোপাসনা প্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যক। এই সমবেত উপাসনাতে ব্রহ্মের চরণে ব'সে আমরা পরস্পরকে চিনিব, পরস্পর এক হব, একপ্রাণ হব, কর্ম্মের উদ্দীপনা লাভ কর্‌ব, এখানে পরস্পরের-প্রেম ভক্তি পরস্পরকে অনুপ্রাণিত করিবে, নিরাশ প্রাণে আশা দিবে, যে পাপে ডুবেছে তাকে হাত ধ'রে তুল্‌তে আগ্রহ জন্মাবে, যে দূরে রয়েছে তাকে নিকটে আনিবে। এই ব্রহ্মের চরণে বসেই আমরা এই দেশের প্রাচীন ঋষিদের সঙ্গে, মৈত্রেয়ী গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যের সঙ্গে, ভিন্ন দেশীয় সাধকগণের সঙ্গে, খৃষ্ট মহম্মদ্ কন্‌ফিউসিয়সের সঙ্গে যোগ অনুভব কর্‌তে পার্‌ব। ব্রহ্মোপাসনা-ক্ষেত্র মিলনের ভূমি। এখানে হিন্দু মুসলমান্ খৃষ্টান, বৌদ্ধ পারসী সকলে এসে যোগ দান ক'রে ব্রহ্মকৃপা সম্ভোগ কর্‌তে পারে। এমন মিলনের ভূমি আর নাই। ঈশ্বরে প্রীতি আর তাঁর প্রেমানুপ্রাণিত মানবসেবা, ইহাইত ধর্ম্ম—ইহা বিশ্বজনীন ধর্ম্ম। বিশ্বের লোক এই ধর্ম্মসাধনে এক হবে, ইহাই আমাদের আকাঙ্ক্ষা, ইহাই ভগবানের বাণী। আমরা কি সেই বাণীতে সায় দিব না? ভাই বোন সকল, আর দূরে থেকো না; আর উপাসনা-ক্ষেত্রে আস্‌তে বাধা করো না। সকলে মিলে পরব্রহ্মের চরণে বসি, আসুন প্রার্থনা তাঁর চরণে জানাই। তা হ'লে নূতন বল আসিবে, নূতন শক্তি জাগিবে, নব প্রেমধারা প্রবাহিত হবে, নূতন ভাবে জাতিগঠন হবে, সকল বাদ বিসম্বাদ, হিংসা দ্বেষ, সাম্প্রদায়িক কলহ দূর হবে। ভগবানের ডাক এসেছে। তোমরা ব্রহ্মের নামে মিলিত হও, ব্রহ্মের পতাকাতলে সমবেত হও। ব্রহ্ম এক, তোমরাও এক ভাই বোন, ভাই বোনকে তাঁরই আলোকে চিনিয়ে লও। আজ তবে উপাসনান্তে ঈশ্বরকে প্রণাম ক'রে গৃহে যাই। আমরা সমবেত উপাসনাতে ব্রহ্মের চরণে মিলিত হব, এই ব্রত নিয়ে গৃহে যাই; আমরা ব্রহ্মের কার্য্যে পরস্পরের সহায় হব, ব্রহ্মের আহ্বানে আমরা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে একপ্রাণ হ'য়ে নিযুক্ত হব, এই ব্রত নিয়ে গৃহে যাই; নির্জ্জন ও সজন সাধনা দ্বারা ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে ব্রহ্মের কাজে নিযুক্ত হব, পরস্পরকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিব, প্রেমে আমরা এক হব, আমরা দেশের ও দশের সেবাতে ব্রহ্মের কাজে সময় শক্তি অর্থ প্রদান করিব, এই ব্রত ল'য়ে গৃহে যাই। পরম দেবতা আমাদের আশীর্ব্বাদ করুন।

পরমার্থের জীবন।*

(উদ্বোধন)

যে পুণ্যময় পরমেশ্বর অপার কৃপাগুণে এই পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের রস জীবনে দিয়াছেন, যাহার কৃপা-রসাস্বাদন করিয়া শোকে সান্ত্বনা, দুঃখে অভয় প্রাপ্ত হইয়াছি, যিনি দয়া ক'রে আমাদিগকে এই পবিত্র মহোৎসবে মিলিত করিয়াছেন—সেই মঙ্গলময় পরমেশ্বরের চরণে ভক্তির সহিত সর্ব্বাগ্রে বার বার প্রণিপাত করি।

উৎসবের দিনে তর্পণ করিয়া মহাপূজায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। যে প্রাচীন ভারতীয় ঋষিদের বিশাল হৃদয় হইতে ব্রহ্মজ্ঞানের

* ৬ই ভাদ্র প্রাতঃকালীন উপাসনায় শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক বিবৃত।

ধারা প্রবাহিত হইয়া আসিয়া আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করিয়াছে, তাঁহাদিগকে স্মরণ করি—তাঁহাদের স্মৃতি ধন্য হউক। পশ্চিম-দেশীয় যে সকল ঋষি আপনাদের জীবন দিয়া, উপদেশ দিয়া, মানবজাতির মঙ্গলসাধন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ভক্তির সহিত স্মরণ করি। ঈশা, মুশা, মহম্মদ, শাক্য, কবীর, নানক, সকল পবিত্র আত্মাদিগকে স্মরণ করি—তাঁহাদের স্মৃতি ধন্য হউক। আজ মহাত্মা রাজা রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, প্রতাপচন্দ্র, অঘোরনাথ, গৌরগোবিন্দ, শিবনাথ, নগেন্দ্রনাথ, উমেশচন্দ্র; সকলকে স্মরণ করি—তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ ও প্রার্থনা আমাদের উপাসনার সঙ্গী হউক। আজ উৎসবের দিনে দেশী ও বিদেশীর মধ্যে ভেদাভেদ চলিয়া যা'ক। আজ আনন্দে সকলে মিলিয়াছি। ভগবৎনাম-স্মরণে সকলে আজ ডুবিব। আজ তাঁহার করুণার প্রবাহ প্রবাহিত হইবে।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে স্মরণ করি। পরলোকগত জনক জননীকে স্মরণ করি। তাঁহাদের পবিত্র স্মৃতি হৃদয়ে লইয়া অদ্যকার মহা আরাধনায় প্রবৃত্ত হই।

এই বৎসরে কত প্রিয় আত্মা পরলোকে গমন করিয়াছেন—কত পরিবার, কত গৃহ, হতশ্রী হইয়াছে! সেই বিদেহীদিগকে স্মরণ করি। ইঁহাদের শোকার্ত্ত পরিবারকে আজ হৃদয়ে লইয়া ঈশ্বরের নাম করি। শোকার্ত্ত ও তাপিত জনকে লইয়া ঈশ্বর-চরণে যাইতে হইবে। এই শোক তাপের মধ্যে পিতা আজ কত নিকটে—আজ তাঁহার আশ্বাসবাণী সকল প্রাণকে অধিকার করিয়া বসিয়াছে। সকল ভগ্ন, দুঃখী, আর্ত্তজনকে হৃদয়ে লইয়া উৎসবের দ্বারে প্রবেশ করি। সকল পাপী, তাপী, উৎপীড়িত, নিরাশ্রয় জনদিগকে প্রাণে লইয়া পিতার চরণে মিলিত হইয়াছি। আজ অনুরাগের দৃষ্টিতে তাকাই—বলি, তুমি আমাদের পিতা, তোমার অপার স্নেহ-গুণে আমরা আসিয়াছি।

ভাই বোন, উৎসবের মধ্যে প্রবেশ করিবার প্রস্তুতি আর কি বলিতে হইবে? আপনাকে ছেড়ে দেওয়া, পিছু টান না রাখা। সাধুরা বিষয়ীকে বড় নিন্দা ক'রেন। বিষয় কর্ম্ম করাই নিন্দনীয় নহে। কিন্তু তাহাদের দোষ এই, বিষয়ের নেশা পরিত্যাগ করিতে পারে না। বিষয় চিন্তাতে এত আসক্ত হয় যে, তীর্থে যাইয়া দেবতাকে দেখে না—দেখে তাহার বিষয়-চিন্তাকে।

আজ ভারতের পক্ষে, বঙ্গ দেশের পক্ষে বিশেষ দিন—ব্রাহ্ম-সমাজ ব্রহ্মোপাসনার জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখন পিতা উপাসকের অন্বেষণ করিতেছেন। তাঁহার সত্য উপাসনা কোথায়? কে ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়া ব্রহ্মকে দেখেনি? কে এখানে তাহার ক্ষুদ্র আসক্তির বস্তুকে দেখে, আর কেই বা চিন্ময় দেবতাকে দেখে? আজ ৫০ বৎসরের অধিক হইল ব্রহ্মসাধনের পথ ধরিয়াছি। জীবনের উপর দিয়া শোক, দুঃখ, নির্যাতন, দারিদ্র চলিয়া গিয়াছে। কত চক্ষের জল জীবনকে অভিষিক্ত করিয়াছে! আজ প্রাণ চাহিতেছে, ভাই বোনদের সঙ্গে বসিয়া পিতাকে এক বার ভাল ক'রে দেখি। এস ব্যাকুল আত্মাসকল—দেশী ও বিদেশী সকলে মিলিত হও। আজ প্রাণ ভ'রে পিতার পূজা কর। দেহে থাকিয়া আবার কি ভাদ্রোৎসব করিব?

কি দিয়ে পূজা করিবে? একটা মন্ত্র পাইয়াছি—প্রাণটাকে ছেড়ে দেওয়া। পিছনে টান রাখিবে না। সকল বিষয়ে চিন্তা পরিত্যাগ করিতে হইবে। কিছু রাখিব না, এই প্রাণ লও—এই ব'লে ছেড়ে দিলাম।

ঈশ্বর এই রূপ উপাসক চান, যাহারা সত্য সত্যই তাঁহাকে চায়। বিষয়ী ব্রাহ্ম, প্রচারক ব্রাহ্ম, পুরুষ নারী, সকলকে বলি—আপনাকে ছাড়িতে কি পারিবে? একবার ডুবিবার সাধ কি হইয়াছে? ব্রহ্মরস কে পায়? ডুবে যে আপনাকে ছাড়ে। ঈশ্বর বন্দোবস্ত সহিতে পারেন না। আধখানা প্রাণ তাঁহাকে দিবে, আর আধখানা প্রাণ তোমার আসক্তিকে দিবে, তাহাতে হইবে না। আজ উৎসবের দিন। ধরা দিব—মাকে সব দিব। যে ব্যাকুলতা পাইয়াছে সে-ই ধন্য। কিন্তু যে পায় নাই, তাহার কি গতি হইবে না? হইবে বলিয়াই ত ডাকিয়া আজ সকলকে তিনি এখানে আনিয়াছেন:

(উপদেশ)

প্রথমে দার্জ্জিলিং বোটানিকেল গার্ডেনে লিখিত একটি প্রার্থনা পাঠ করি:—"পিতা, প্রাচীন চিন্তা ও সংস্কার অতিক্রম করা কত কঠিন! শাস্ত্র ও শিক্ষক মানুষের বন্ধু; কিন্তু এই সব আবার বাঁধনের কারণ হয়। তোমার নিকট হইতে নিরেট সত্য ধরিতে হইলে মনকে প্রাচীন সংস্কারবর্জ্জিত করিতে হয়। সকল দেশ, কাল ও সংস্কারের উপর উঠা কত কঠিন! পিতা, দেখ মানুষ কেমন পূর্ব্ব সংস্কারের অধীন হইয়া চলে। সকল চিন্তা ও জ্ঞানের মধ্যে, ভাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ ভাব থাকে। পিতা, তোমাতেই নিরপেক্ষ সত্য, নিরপেক্ষ জ্ঞান। হে পরম সত্য, হে পরম জ্ঞান, আমাকে সত্যের আলো দাও, আমাকে পারমার্থিক জ্ঞান, সংস্কার-বর্জ্জিত আলো দাও—সেই সত্য ভূমিতে বসিয়া তোমাকে দর্শন করি, এই প্রার্থনা।"

মানুষের জীবন সর্ব্বদাই তিন অবস্থাতে দেখিতে পাই। সর্ব্ব প্রথম স্বার্থের জীবন। তখন পশুর ন্যায় মানুষ আপনার সুখ ও সুবিধা ভিন্ন আর কিছুই বুঝে না। একটা কুকুর যেমন অন্য কুকুরের মুখ হইতে খাদ্য হরণ করিয়া পলায়ন করে, তেমনি মানুষ নিজের সুখ ও স্বার্থের অধীন হইয়া অন্যের গ্রাস কাড়িয়া লইতে কুণ্ঠিত হয় না। নিজের আহার, নিজের আরাম ও সুখ ভিন্ন আর কিছু বুঝে না। অন্যের ক্লেশ ও অসুবিধার কথা তাহার মনে জাগে না। এই পশু-জীবন, স্বার্থের জীবন কি, তাহা আর কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। এই রূপ শত শত জীবন চক্ষুর সম্মুখে রহিয়াছে।

ইহার উপরে পরার্থের জীবন। এই জীবনে মানুষ নিজের সুখ ও সুবিধাকে অগ্রাহ্য ক'রে অন্যের সুখ সুবিধার জন্য ব্যস্ত হয়। যে বালিকা ১৮ বৎসর পর্য্যন্ত নিজের সুখ ও সুবিধার জন্য ব্যস্ত—তাহার নিদ্রা কেহ ভঙ্গ করিলে কত বিরক্ত হইত, আজ সে সন্তানের মাতা হইয়াছে—সে শিশুর জন্য ব্যস্ত। সে এখন রাত্রি জাগিয়া শিশুকে খাওয়াইতে ব্যস্ত, শিশুর মল মূত্র পরিষ্কার করিতে নিযুক্ত। ইহাকে মায়া বলি, কি ভালবাসা বলি, ইহারই অনুরোধে সে নিজের সুখকে খাট ক'রে অন্যের জন্য ব্যস্ত। পূর্ব্বে যে স্বার্থের জন্য প্রতিবেশীর সহিত

বিবাদ করিত, আজ দেশহিতৈষী হইয়া নানা সাধু কার্য্যে দেশের জন্য সে কত শ্রম করে ও আপনার সুখ সুবিধাকে অগ্রাহ্য করে। আজ জলপ্লাবনে পীড়িতদের জন্য অর্থ সাহায্য করিতেছে, বা নিজ হস্তে নানা কষ্ট ক'রে তাহাদের সেবা করিতেছে। যে অর্থকে মানুষ এত ভাল বাসে, তাহা দিয়া কোথায় শিক্ষার ব্যবস্থা করে, কোথাও বা চিকিৎসালয় স্থাপন করে। এই পরার্থের জীবনে মানুষের কিঞ্চিৎ উন্নতি হয়। পরিবার সমাজ ও দেশের জন্য মানুষ অনেক পরিমাণে আত্মসুখ ছাড়িতে পারে ও সৎকার্য্যেরও অনুষ্ঠান করিতে পারে। কিন্তু এই পরার্থের জীবনেও মোহ ও ক্ষুদ্র আসক্তি থাকে। আত্মসুখের স্থান অন্য বস্তু অধিকার করে; সীমাবদ্ধ ভাব, গণ্ডী যায় না। নিজের সন্তানটির জন্য সে খাটিতে পারে, কিন্তু অন্যের জন্য সে ত্যাগ আসে না। বরং অনেক সময় অন্যের সন্তানের অনিষ্ট ক'রেও নিজ সন্তানের জন্য কাজ করিয়া থাকে।

সেই রূপ, নিজ দলের, বা সম্প্রদায়ের মঙ্গল করিতে যাইয়া অন্যের অনিষ্ট করিতে কখনও কুণ্ঠিত হয় না। আবার নিজ দেশের মঙ্গল করিতে যাইয়া অন্য দেশের অনিষ্ট করা কখনও অন্যায় মনে করে না। স্বার্থের জীবনে যেমন অন্যের মুখের গ্রাস নিজে ভোজন করিতে বিরত হয় না, তেমনি এই পরার্থের জীবনে গণ্ডীর বাহিরে যারা, তাহাদের অনিষ্ট করাও কখনও অসঙ্গত মনে করে না। ফাদার ডামিয়ান যেমন কুষ্ঠ রোগের সেবা করিয়া প্রাণ দেন সত্য, তেমনি ইংরাজ ইংলণ্ডের মঙ্গলকামনা ক'রে শত শত ভারতবাসী বা বোয়ারকে গুলি বা ফাঁসীকাষ্ঠে হত করিতে প্রস্তুত হয় ও করিয়া থাকে। এই পরার্থের জীবনকে ভাল ক'রে বিচার করিলে দেখা যায়—ইহার মধ্যে স্বার্থের জীবন বিশেষ ভাবে রহিয়াছে। এই পরার্থের জীবনে নাম যশ রহিয়াছে; ইহাও আত্মসুখের একটা ভিন্ন আকার মাত্র। এই পরার্থের জীবনে খাঁটি মানুষ কেহ নাই, তাহা বলিতে পারি না। তবে তাঁহারা পরার্থের জীবন অতিক্রম ক'রে উন্নতর জীবনে গিয়াছেন, সেই উচ্চতর জীবনের আস্বাদন পাইয়াছেন; তাই তাঁহাদের নাম যশের স্পৃহা নাই, তাই অন্যের অনিষ্ট ক'রে পরিবার কি সমাজ, কি দেশের উন্নতি করিতে যান না। সেই শ্রেণীর লোক দুর্লভ; তাঁহাদের কথাই কিঞ্চিৎ বলিব।

ইহা পরমার্থের জীবন। যাঁহারা এই জীবনে প্রবেশ করেছেন তাঁহারা বলেন এই জীবনের বর্ণনা হয় না। আমার পক্ষে—যে সেই জীবনের অধিকারী হয় নাই, যে সময় সময় সেই জীবনের একটুকু আভাস পায়—তাহার পক্ষে কি সেই জীবনের বর্ণনা করা সম্ভবপর?

কোন সাধু পুরুষকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, আপনার জন্মস্থান কোথায়? তিনি উত্তর করিলেন, দেহের জন্মস্থান যদি জানিতে চাও, তাহা সেই ক্ষুদ্র আতুর-ঘর—তাহার চিহ্ন নাই। আর আত্মার বিষয় যদি জিজ্ঞাসা কর, এই অনন্ত ব্রহ্ম আমার জন্মভূমি, কোন দেশ ও কালে আমি আবদ্ধ নই। পরমার্থের জীবনের প্রথম লক্ষণ, কোন সীমাবদ্ধ ভাব থাকে না। জ্ঞান এত উন্নত হয়, কোন প্রাচীন সংস্কারে ও শাস্ত্রে আবদ্ধ থাকে না। প্রেমে কোন গণ্ডী ও সীমাবদ্ধ ভাব নাই। শিক্ষক, গুরু, শাস্ত্র মানুষের অনেক উপকার করে, তাহা সত্য। কিন্তু এই সব সীমাবদ্ধ অবস্থার উপরে উঠিতে অনেক বন্ধনের কারণ হয়। শাক্য মুনি বলিতেন প্রাচীন সংস্কার বর্জ্জিত না হইলে সত্যকে ধরিতে পারিবে না। ভাল আবেষ্টন ও সঙ্গী সহায়তা করে সত্য, কিন্তু হৃদয় মনের বন্ধনের কারণ হয়। যেমন বড় বৃক্ষের তলায় কোন বৃক্ষ জন্মে না—নিস্তেজ হয়—তেমনি অন্যের শাখার চাপে সেই পরমার্থের জীবন গড়ে না। পরমার্থের জীবন সাক্ষাৎ ব্রহ্মানুভূতি ও ব্রহ্ম-প্রেরণার ভূমিতে জন্মে। বিজ্ঞান দর্শন ও কবিত্বের ভাব মানুষের উপকার করে; কিন্তু পরমার্থের জীবনে প্রবেশের পক্ষে এই সকল অনেক অন্তরায় রূপে পরিণত হয়। শরীরের যেমন Measles and Whooping cough আছে, তেমনি মনের পক্ষে কতকগুলি তর্ক যুক্তি মনকে বিকৃত অবস্থায় লইয়া যায়। ঝড় যেমন ঘর বাড়ী ও বৃক্ষলতাকে উলট পালট করে, তেমনি কবিত্ব ভাব মনকে এক দিকে গড়াইয়া লইয়া যায়।

সেই পরমার্থের জীবনে বাস করিবার প্রথম অবস্থা মনের শান্ত ভাব; serenity and camlness of spirit. আর অভাবাত্মক অবস্থা গণ্ডীহীনতা। এই সীমাবদ্ধ ভাব চ'লে যায়, যতই অনন্তের চিন্তা ও ধ্যানে মন যায়। অনন্তের চিন্তা প্রথমে দেশ ও কালকে লইয়া মানুষ করে। জগতের অসীমতা মানুষ ধারণাই করিতে পারে না। এই সৃষ্টির অসীমত্ব (immensity of creation) মানব চিন্তার অতীত। তবে যখন সে মনের সেই শান্ত ভাব পায়,(serenity) তখন অনন্তে অবগাহন করিতে পারে—সকল সীমাবদ্ধ ভাব তাহার চ'লে যায়। উত্তাপ, আসক্তি, পূর্ব্বসংস্কার, ভাবের একদর্শিতা, অল্প জ্ঞানের গণ্ডী পরিত্যাগ না করিলে পারমার্থিক অবস্থা পাওয়া যায় না।

তারপর অন্তরের শুদ্ধতা। ইহা বড় বড় পাপত্যাগ নহে। মনের ভিতর যে গূঢ় আবর্জ্জনা আছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে ছাড়িতে হয়। হৃদয় মন যখন শুদ্ধ হয়, ও শান্ত হয়, তখন ঈশ্বর সেই মহাভাবে মানুষকে নিমগ্ন করেন। tradition (পূর্ব্ব সংস্কার) আবেষ্টনের প্রভাব (bias) যাহার মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে, তাহার সেই শান্ত ভাব ও অনন্তের আভাস লাভ করা বড় কঠিন। হৃদয় মনের এই শান্তভাব, নির্ব্বিকার অবস্থাতে মানুষ নবদৃষ্টি লাভ করে ও ঈশ্বরের অসীম প্রেম দর্শন করে, মহা আনন্দের অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ঈশ্বরের পূর্ণ প্রেমের আভাস মানুষ এখানে থাকিয়াই পায়। এই অবস্থার এক লক্ষণই মহা আনন্দের অবস্থা। পরমার্থের জীবনে পরদুঃখমোচন, পরিবারপালন, দেশের মঙ্গলসাধন, সবই থাকে; কিন্তু সে অবস্থায় আর সীমাবদ্ধ ভাব, গণ্ডী, বিষাদ দুঃখ নাই। সেই অনন্তের প্রেম-ক্রোড়ে স্থিত হইয়া মানুষ সব কার্য্য করে। এই পরমার্থের জীবন ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ যোগ ভিন্ন সম্ভবপর নহে।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্ব সংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।

সেই ব্রহ্মকে দর্শন করিলে হৃদয়গ্রন্থি অর্থাৎ অবিদ্যাজনিত বিষয়-বাসনা ভেদ হয়, সমুদয় সংশয় ছিন্ন হয়, এবং সাধকের কর্ম্মসমূহ (অর্থাৎ মোক্ষ প্রতিরোধক সকাম কর্ম্মসমূহ) ক্ষয় হয়।

পরমার্থের জীবনে এই সব লক্ষণ প্রকাশিত হয়। তাহার জ্ঞানদৃষ্টি নিরেট সত্য হয়, পক্ষপাতিতা, সীমাবদ্ধ ভাব থাকে না, প্রেমদৃষ্টি ও সমদৃষ্টি লাভ হয়। ঈশ্বর করুন পরমার্থের জীবনে স্মৃতি করিয়া জীবন ধন্য করি।

পবিত্রতা

না হ'লে পবিত্র মন অমূল্য ধরম ধন
লভিতে না পারে কেহ ভবে ;
নির্ম্মল হৃদয় যাঁর, তাঁরই শুধু অধিকার
ধর্ম্মরূপ অতুল বৈভবে।
পাপে কলুষিত প্রাণ, নিরাশায় ম্রিয়মাণ,
নিপীড়িত রিপু-অত্যাচারে,
কেমনে সে অভাজনে দেবের বাঞ্ছিত ধনে
ধনী হবে এ পাপ সংসারে ?
সাধনেতে হ'য়ে রত, করি' মন সুসংযত,
পুণ্যব্রত পালো কায়মনে ;
ঘুচিবে পাপের কালী, বিবেক-আগুন জ্বালি'
পু'ড়ে ভস্ম কর রিপুগণে।
পবিত্র হইলে মন, পালাইবে প্রলোভন,
ছিন্ন হবে আসক্তি-বন্ধন ;
উপজিবে শুভ মতি উজ্জ্বল স্বর্গের জ্যোতি
ভাতিবে হৃদয়ে অনুক্ষণ।
স্নাত হ'য়ে পূত জলে, কবে প্রেমানন্দে গ'লে
শুদ্ধ হবো ব্রহ্মরূপ-ধ্যানে ;
ব্রহ্মেতে নির্ভর রাখি', আনন্দে ঝরিবে আঁখি,
গাবো নাম আকুল পরাণে।
দেও দীনে শুভ দিন, হ'য়ে তব প্রেমাধীন
আনন্দে ভুঞ্জিব চিরকাল ;
সুন্দর ফুলের মত জীবন হবে পবিত্র,
কেটে যাবে পাপের জঞ্জাল ॥

শ্রীচন্দ্রনাথ দাস

নূতন সঙ্গীত

১৫

রামকেলি মিশ্র—কাওয়ালি।

জাগো প্রেমে আজি প্রভাত আলোকে।
মোহনিদ্রা ভুলি', দেখরে নয়ন মেলি',
প্রকাশিত জ্যোতি তাঁর ভূলোক দ্যুলোকে!
অরুণ-কিরণ-রঞ্জিত গগন,
বিহঙ্গ-কাকলি-কুঞ্জিত কানন,
মহিমা-মণ্ডিত গিরি প্রস্রবণ,
সব শোভা মাঝে দেখরে তাঁহাকে।
কুসুম-সুগন্ধে, মলয় সুমন্দে,
তটিনী-কল্লোল মধুর সুছন্দে,
ভুঞ্জ তাঁরে, ডুবে প্রেমের আনন্দে,
মগ্ন-চিত্ত যথা ভকত সাধকে!

১৬

লুম খাম্বাজ—যৎ।

প্রাণের আরাম তুমি আমার,
তোমায় ছেড়ে প্রাণ কি বাঁচে ?
যেদিকে চাই, আর কেহ নাই,
দাঁড়াই বল কাহার কাছে ?
সব পেয়েও যে গরীব আমি,
জীবন যেন মরুভূমি,
সকল ধনের সার যে তুমি,
কোন ধনে আর দুঃখ ঘোচে ?
তোমার সমান আর কে আপন,
প্রেম করে কে তোমার মতন,
যারে, দেখ্‌লে ঘোচে হৃদয়-বেদন,
সকল অশ্রু যায় গো মুছে ?
আমার, সকল ব্যথায় তুমি ব্যথী,
সকল পথে তুমিই সাথী,
আমার, হৃদয়-রথে হও গো রথী,
সদা, থাক আমার কাছে কাছে।

ব্রাহ্মসমাজ

মেদিনীপুর জলপ্লাবনে উৎপীড়িতের সাহায্য—প্রবল জলপ্লাবনে মেদিনীপুরের অনেক স্থান ভাসিয়া গিয়াছে, গৃহাদি নষ্ট হইয়াছে, মানুষ আহারাভাবে মহাকষ্টে পতিত হইয়াছে। এই দৈব-দুর্বিপাকে উৎপীড়িত লোকদের সাহায্যার্থে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ অর্থাদি সহ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বলের অধীনে একদল কর্ম্মী প্রেরণ করিয়াছেন। এই কার্য্যে আরও অনেক টাকার প্রয়োজন হইবে। সকলে সম্পাদকের নামে যথাশক্তি অর্থ প্রেরণ করিয়া সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না, এই আশা। কর্ম্মীও আবশ্যক হইবে। নূতন ও পুরাতন বস্ত্রাদিরও যথেষ্ট প্রয়োজন আছে।

ভাদ্রোৎসব—নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে বিগত অষ্টনবতিতম ভাদ্রোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে :—

৪ঠা ভাদ্র, শনিবার—সায়ংকালে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ "ধর্ম্ম ও জাতীয় প্রকৃতি" বিষয়ে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। ৫ই ভাদ্র, রবিবার—প্রাতে উপাসনা ; শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। অপরাহ্নে বালক-বালিকা সম্মিলন—শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু প্রার্থনা করিয়া কার্য্য আরম্ভ করেন। তৎপরে তিনি, শ্রীযুক্ত সুবিনয় রায় চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বল বালক বালিকাদিগকে কিছু বলেন। জল-যোগান্তে কার্য্য শেষ হয়। সায়ংকালে উপাসনা ; শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশ অন্য স্তম্ভে প্রকাশিত হইল। ৬ই ভাদ্র, সোমবার—প্রাতে আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্মুখস্থ কমললোচন বসুর গৃহের (যেখানে প্রথম ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়) নিকট হইতে ঊষাকীর্ত্তন বাহির হয়। রায় প্রসন্ন-কুমার সেনগুপ্ত বাহাদুর একটি প্রার্থনা করিলে কীর্ত্তন আরম্ভ হয় এবং চিৎপুর রোড, বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট, বলরাম দে ষ্ট্রীট, সেণ্ট্রাল এভিনিউ, মাণিকতলা স্পার, জেলে টোলা রোড, বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট, সিমলা ষ্ট্রীট ও কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট হইয়া কীর্ত্তনের দল মন্দিরে উপস্থিত হইলে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশ অন্যত্র প্রকাশিত হইল। সায়ংকালে উপাসনা ; শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম পরে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে :—

বিগত ১২ই আগষ্ট কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত উমাপদ রায়ের

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বাবু শ্যামাপদ রায় পরলোক গমন করিয়াছেন। এবং বিগত ১৮ই আগষ্ট তাঁহার একটি পৌত্র (শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র) দীর্ঘকাল প্লুরেসী রোগে ভুগিয়া দুই বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন।

বিগত ১৮ই আগষ্ট কলিকাতা নগরীতে স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বাবু রাজেন্দ্রনাথ শীল হঠাৎ হৃদ্‌রোগে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি নিয়মিতরূপে ব্রহ্মমন্দিরের দৈনিক উপাসনায় ও আলোচনাতে যোগ দান করিতেন।

বিগত ১৯শে আগষ্ট কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাসের পত্নী হেমাঙ্গিনী দাস ৬৬ বৎসর বয়সে বেরী-বেরী রোগে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি একজন পরোপকাররতা সহৃদয়া মহিলা ছিলেন।

বিগত ১৯শে আগষ্ট বাগনান গ্রামে প্রাচীন ব্রাহ্ম বাবু শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি দীর্ঘকাল নানারূপে ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়াছেন।

বিগত ১৯শে আগষ্ট কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত হরকুমার গুহের জামাতা পরলোকগত সতীশচন্দ্র সরকারের আদ্য-শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন ও শ্রীযুক্ত হরকুমার গুহ সংক্ষেপে জীবনী বিবৃত করিয়া প্রার্থনা করেন।

গত ২২শে আগষ্ট ভাগলপুর নগরীতে পরলোকগত বাবু বামাচরণ ঘোষের পত্নী হেমাঙ্গিনী ঘোষ দীর্ঘকাল জ্বরে ভুগিয়া ৭০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চির শান্তিতে রাখুন ও আত্মীয় স্বজনদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

নামকরণ—বিগত ২২শে আগষ্ট কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার দত্তের প্রথমা কন্যার নামকরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। শিশুকে 'বাণী' ও 'মৃদুলা' নাম প্রদত্ত হইয়াছে: এই উপলক্ষে প্রচার বিভাগে ১০৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

বিগত ১৩ই আগষ্ট শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন দাসের প্রথম পুত্রের নামকরণ-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। শিশুকে 'দীলিপরঞ্জন' নাম প্রদত্ত হইয়াছে। এই উপলক্ষে প্রচার বিভাগে ৫৲, সাধনাশ্রমে ২৲, উপাসকমণ্ডলীতে ২৲ ও দাতব্য বিভাগে ১৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

মঙ্গলময় পিতা শিশুদিগকে চির কল্যাণের পথে বর্দ্ধিত করুন।

উৎসব—ব্রাহ্মণবাড়ীয়া উপাসনা-সমাজের বড়বিংশতিতম বার্ষিক ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় এবং কুমিল্লা হইতে শ্রীযুক্ত রজনীনাথ নন্দী ও শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত তথায় গমন করেন। ৪ঠা ভাদ্র সায়ংকালে শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় মন্দিরে আচার্য্যের কার্য্য করেন। ৫ই ভাদ্র প্রাতঃকালে মন্দিরে শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় আচার্য্যের কার্য্য করেন; সায়ংকালে হরিদাসের সাধনা এবং চৈতন্যদেবের জীবনলীলা সম্বন্ধে কথকতা করেন। ৬ই ভাদ্র উৎসবের বিশেষ দিন—প্রাতঃকালে মন্দিরে শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় আচার্য্যের কার্য্য করেন; বিকালে সাধারণ সভা হয়; শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় সভাপতি হন। আগামী বৎসরের জন্য শ্রীযুক্ত মেঘনাথ চৌধুরী সেক্রেটারী ও শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্রলাল দত্ত এঃ সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। অপরাহ্ণ ৬৷০টায় উপাসনা ও সংকীর্ত্তন হয়। পরদিন ৭ই ভাদ্র প্রাতঃকালে সমাজের উপাসকগণ নদীবক্ষে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্মশানঘাটে উপস্থিত হন। সেখানে শ্রীযুক্ত রায় প্রসন্নকুমার দাস গুপ্ত বাহাদুরের মাতৃদেবীর শ্মশান-মন্দিরে উপস্থিত হইয়া উপাসনা এবং প্রার্থনা হয়। তৎপর জলযোগান্তে উৎসবের কার্য্য শেষ হয়।

কৃতী ছাত্র—শ্রীমান অমলকুমার সিদ্ধান্ত মিডভিল থিয়োলজিকেল স্কুল ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তত্ত্ববিদ্যা পাঠ করিয়া বিশেষ কৃতিত্বের সহিত বি, ডি, ও এস্, টি, এম্ (মাষ্টার অব সায়েণ্টিফিক থিয়োলজি) উপাধি প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইলাম। আশা করি তাঁহার দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারের বিশেষ সাহায্য হইবে।

ধুবড়ী ব্রাহ্মসমাজ—গত ১৬ই আগষ্ট পরলোকগত বাবু দ্বারকানাথ সেনের বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার চক্রবর্ত্তী উপাসনা এবং তিনি নানা পরীক্ষা ও সংগ্রামের মধ্যে আপনার জীবনে কিরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন তাহা উল্লেখ করিয়া, শ্রীযুক্ত রায় সাহেব শরৎচন্দ্র দাস ও শ্রীযুক্তা বসন্তকুমারী মুখোপাধ্যায় প্রার্থনা করেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী এই উপলক্ষে ধুবড়ী ব্রাহ্মসমাজে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

ধুবড়ী ব্রাহ্মসমাজে গত ৫ই ও ৬ই ভাদ্র ভাদ্রোৎসব যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে রায়সাহেব শরৎচন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত যোগজীবন পাল আচার্য্যের কার্য্য করেন।

দান—শ্রীমতী নলিনীবালা সিংহ ও কুমারী গিরিবালা ঘোষ পিতা পরলোকগত বাবু কালীমোহন ঘোষের বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে প্রচার বিভাগে ২৲, সাধনাশ্রমে ১৲, উপাসক-মণ্ডলীতে ১৲ ও দাতব্য বিভাগে ১৲ দান করিয়াছেন। শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দত্ত মাতা পরলোকগতা কামিনীসুন্দরী দাঁর প্রথম বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে দাতব্য বিভাগে ১০৲ টাকা দান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সুধাংশুমোহন বসু পিতা পরলোকগত মিঃ আনন্দমোহন বসুর বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে এ, এম্ বসু ফণ্ডে আরও ১০০৲ টাকার একখানা কোম্পানীর কাগজ প্রদান করিয়াছেন। এ-সকল দান সার্থক হউক এবং পরলোকগত আত্মাগণ চিরশান্তি লাভ করুন।

আন্দুল ব্রাহ্মসমাজ—গত ১১ই শ্রাবণ প্রাতে শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী, শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মল্লিকের মাতার অষ্টাদশ বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা এবং সন্ধ্যার পর ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক অধিবেশনে আচার্য্যের কার্য্য করেন। "উপাসনা ভাল লাগে না কেন এবং ব্রহ্মকে সহজে লাভ করিবার উপায় কি?" এই সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন। শ্রীযুক্ত ললিত-মোহন রায় প্রভৃতি সংকীর্ত্তন করেন।

পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসম্মিলনী—আগামী ২৬শে, ২৭শে, ও ২৮শে আশ্বিন (১৩ই, ১৪ই ও ১৫ই অক্টোবর) ময়মনসিংহ নগরীতে পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসম্মিলনীর অধিবেশন হইবে। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত শ্রীনাথচন্দ্র ও শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সেন সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন।

ভুল সংশোধন—বিগত সংখ্যার ১০৬ পৃষ্ঠায় নূতন কীর্ত্তনের ৯ম ছত্রে "ধরেছিলাম" স্থলে "ধরেছি নাম" হইবে।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় দ্বারা ১৭ই ভাদ্র মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—বরদাকান্ত বসু, বি-এ।

Registered N0 65

অসতো মা সদগময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৬ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৪৯ম ভাগ। ১১শ সংখ্যা। | ১লা আশ্বিন, শনিবার, ১৩৩৩, ১৮৪৮ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯৭ | 18th September, 1926. | প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০ | অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

নিত্য সুপ্রভাত

দুখের দুয়ার খুলে যে-দিন এলে আমার ঘরে
সে-দিন হ'তে বন্দী আমি তোমার অ-ই করে।
সারা পথে ছড়াইয়া নিবিড় অন্ধকার,
আমারে দেখা'লে পথ বড় চমৎকার।
মিলাইলে জীবনে এক আঁধারের মেলা,
ব্যথার করুণ সানাই বাজে, সন্ধ্যা সকাল বেলা।
বেহাগ তানে বিষাদগীতি কতই কথা বলে,
মর্ম্ম-বাঁধন ছিঁড়ে যায় তার তপ্ত অশ্রুজলে।
জন্ম-অন্ধ করে নাই ত সূর্য্য দরশন।
আঁধারে আলোক তার কি এক নূতন!
আমারেও করেছ তাই, নাই যে দুঃখ আর,
জ্বালিয়া মঙ্গল-দীপ ঘুচাও আঁধার।
সন্ধ্যা উষা দিবা নিশা—আঁধারে আমার—
বেলায়, বেতাল কভু তাহার হয় নি একটী বার।
দুখের গানে আসন পাতা, পূজা উপাসনা!
পরা পূজার ঘরে সারা দুঃখেরি সাধনা!
নিঠুর করুণ দেবতা গো, করি প্রণিপাত,
রচিবে কি আরো নূতন দুখের সুপ্রভাত?

শ্রীমনোমোহন চক্রবর্ত্তী

হে মঙ্গলময় বিশ্ববিধাতা, তোমার এই বিচিত্র বিশ্ববিধানে আমাদের কল্যাণের জন্য কত প্রকার ব্যবস্থাই করিয়াছ! তুমি যেমন আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে থাকিয়া আমাদিগকে সতত গড়িয়া তুলিতেছ, তোমার শুভ পথ দেখাইয়া দিতেছ, অশুভ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতেছ, তেমনি বাহিরেও পরস্পরকে পরস্পরের সহায়তায় নিযুক্ত রাখিয়াছ। তাহা ছাড়া আবার বিশেষভাবে তোমার সাধু সন্তানদিগকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া আমাদের পরম উপকার সাধন কর। তাঁহাদের দৃষ্টান্ত ও কার্য্য উজ্জ্বলভাবে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া, আমরা সহজে পথ চিনিয়া লইতে পারি এবং বিশেষ আশা উৎসাহ ও বল পাইয়া থাকি। তোমার যে দুই সন্তান আমাদের জন্য উক্ত কার্য্য সাধন করিয়া এই সময়ে পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন, স্বভাবতঃই তাঁহাদের কথা আমাদের মনে উদয় হইতেছে। আমরা তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত স্মরণ করিয়া থাকি। কিন্তু তাহা কতটা সত্য ও গভীর হইয়া থাকে, সে কথা, হে হৃদয়দর্শী দেবতা, তুমিই জান। আমরা যে তাঁহাদের উপযুক্ত শিষ্য হইতে পারিতেছি না, সমগ্র হৃদয় মনের সহিত তাঁহাদের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিতে সমর্থ হইতেছি না, তাহাও তুমি দেখিতেছ। আমরা বাহিরের এক দিনের ভালবাসা শ্রদ্ধাভক্তি অর্পণ করিয়াই আমাদের কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইল মনে করিতেছি কি না, তুমিই জান। হে করুণাময় পিতা, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে গভীরতর শ্রদ্ধাভক্তি প্রদান কর, যাহাতে আমরা অধিকতর নিষ্ঠা ও উৎসাহের সহিত তাঁহাদিগের পথ অনুসরণ করিয়া তোমার পবিত্র ধর্ম্মকে জীবনে গৌরবান্বিত করিতে পারি। আমাদের সকল মৃত ভাব দূর করিয়া তুমি আমাদিগকে জীবন্ত কর, তোমার উপযুক্ত সন্তান কর। আমরা ধন্য ও কৃতার্থ হই। তোমার শুভ ইচ্ছাই আমাদের জীবনে ও সমাজে জয়যুক্ত হউক। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

নিবেদন।

তখন শোন নাই—আজ তোমরা বিপদে প'ড়ে দশ জনকে ডাক্‌ছো; এত দিন যাদের উপেক্ষা করেছ, হীন ক'রে রেখেছ, উৎপীড়ন করেছ, অস্পৃশ্য ক'রে রেখেছ, আজ তাদের ডাক্‌তে এসেছ। তখন তাদের ক্রন্দন তোমাদের কর্ণে পৌঁছায় নাই, তখন তাঁরাও যে মানুষ, ব্রহ্মের সন্তান, ব্রহ্ম তাদের প্রাণে বিরাজিত, এ কথা তোমরা স্বীকার কর নাই। ব্রাহ্মসমাজ তখন ডেকে বলেছিলেন,

নর নারী সাধারণের সমান অধিকার,
যার আছে ভক্তি, পাবে মুক্তি, নাহি জাতবিচার।

তখন তাঁদের কথা ভাল লাগে নাই—তাঁদের ত নির্য্যাতনই করেছ। আজ বিপদে পড়েছ; আজ তাঁরা সঙ্গে না এলে তোমাদের চলে না; আজ বুঝেছ, তাদের ডাক্‌তে হবে, তাদের মানুষ ব'লে স্বীকার কর্‌তে হবে। তবুও সকলে বোঝে নাই; তবুও সকলে তাদের কাছে আসিতে চায় না, তাদের সংশ্রবে আস্‌তে চায় না, তাদের নানা অধিকার দিতে চায় না। যুগ যুগান্ত ধ'রে যে অপরাধ করেছ, তার প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হয়েছে। এখনও পথে এস; এখনও অনুতপ্ত হও; এখনও তাদের আলিঙ্গন কর, এখনও তাদের ডেকে এনে কাছে বসাও; এখনও তাদের উন্নত স্থান দাও; তাদের নানা অধিকার প্রদান কর। তখন শোন নাই, জ্ঞানীর কথা এখন অন্ততঃ শোন; এখনও যদি চক্ষু না ফোটে, জ্ঞান না খোলে, প্রাণ না উদার হয়, তবে অধঃপাতে যাবে।

আমারই মাথা খারাপ—তোমরা যে ভাবে চল, আমি সে ভাবে চল্‌তে পারি না; তোমরা যা বল, আমি তা স্বীকার করি না—তোমরা বল আমার মাথা খারাপ হয়েছে। তা হ'তে পারে। তোমরা দশ জনে মিলে, শত জনে মিলে যা ঠিক কর, তাহাই ঠিক কথা! তোমরা বল, সংসারে চল্‌তে গেলে দুই একবার সত্য হ'তে ভ্রষ্ট হ'তে হয়, তাতে দোষ কি? আমার প্রাণ থেকে কে যেন বলে, প্রাণ গেলেও সত্য হ'তে বিচ্যুত হওয়া যায় না। তোমরা বল, সর্ব্বাগ্রে নিজের সুখ সুবিধা দেখ্‌তে হবে, তবে পরের কথা; আমার প্রাণ থেকে কে যেন বলে, তা নয়, নিজের সুখ সুবিধা অগ্রাহ্য ক'রে, পরের সুখ সুবিধা দেখ্‌তে হবে। তোমরা বল, যেখানে প্রেম পাও, সেখানে প্রেম দিবে; যেখানে প্রেমের অনাদর, সেখানে যেও না, সেখানে অপ্রেম দিয়ে প্রতিবিধান্ কর। আমার প্রাণ থেকে কে যেন বলে, যেখানে প্রেম সেখানে প্রেম ত সকলেই দেয়; যেখানে অপ্রেম, যেখানে হিংসা, যেখানে অনাদর, সেখানেও প্রেম দিতে হবে। তোমরা বল অগ্র পশ্চাৎ ভেবে কাজ কর্‌বে, বিপদে ঝাঁপ দিয়ে পড়ো না; আমার প্রাণ থেকে কে যেন বলে, যাহা সত্য বুঝ্‌বে, যা'তে মঙ্গল, যা ঈশ্বরের আদেশ, তাহাই কর্‌বে; তা'তে সুবিধা অসুবিধা ভাব্‌বে না, তার জন্য বিপদসঙ্কুল সমুদ্রেও ঝাঁপ দিয়ে পড়্‌বে। এখানেই তোমাদের সঙ্গে আমার মিল হয় না; তোমরা বল আমার মাথা খারাপ হয়েছে, তা হয়ত হবে। কিন্তু আমার প্রাণ যে তোমাদের কথায় সায় দেয় না!

আমার বোঝা তুমি বও—যে দিন হ'তে তোমার চরণে এ জীবনের ভার দিয়েছি, সে দিন হ'তে তুমিইত আমার সব বোঝা বহন করেছ। জীবনের প্রতি পদে তোমার দয়া, তোমার প্রেমের পরিচয় পেয়ে আনন্দ পেয়েছি। এক এক বার মনে হয়েছে, আর বুঝি রক্ষা নাই, এ বোঝার ভার আর বুঝি বইতে পার্‌ব না; আহা! দেখে অবাক হয়েছি, কোথা হ'তে কোন্ সূত্রে তুমি এসে যে বোঝা মাথায় পেতে নিয়েছ; আমার ভার লঘু হয়েছে। আজ যে চারিদিকে বিপদ্‌জাল এসে ঘেরেছে, বোঝার পর বোঝা এসে চেপে বসেছে, অযাচিত ভাবে যে দায়িত্বভার আস্‌ছে, যে বেদনা ও অপমান ঘিরে ফেল্‌ছে, তাতেও আমি বিচলিত হব না, ভয় কর্‌ব না—তুমিত আমার সঙ্গে আছ, সবই দেখ্‌ছ; তুমি আমার বোঝা বইবার জন্য রয়েছ; তাই তুমি আমাকে উদ্বিগ্ন হ'তে দাও নি; তাই তুমি আমাকে ব্যস্ত হ'তে দাও নি। আমি সকল হারিয়েও আনন্দে আছি; সকল দুঃখ ও বোঝার মধ্যেও নিশ্চিন্ত রয়েছি। তোমার এত দয়া, এত প্রেম, যে আমার সব বোঝা তুমি বইবে। এ প্রেমের তুলনা নাই।

সম্পাদকীয়

রাজর্ষি রামমোহন ও পণ্ডিত শিবনাথ—স্বভাবতঃই, অন্য সময়ে না হইলেও, সেপ্টেম্বর মাসের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে রাজর্ষি রামমোহন রায় ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়দের কথা বিশেষভাবে আমাদের মনে উদয় হয়। এই মাসের ২৭শে ও ৩০শে তারিখে তাঁহারা, তাঁহাদের জীবনের মহাকার্য্য সম্পন্ন করিয়া, অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন। আমরা উক্ত দুই দিবস বিশেষভাবে তাঁহাদিগের স্মরণ, তাঁহাদিগের চরিত্র ও কার্য্যাবলী অনুধ্যান, এবং তাঁহাদিগের চরণে শ্রদ্ধাভক্তির অঞ্জলি অর্পণ, করিবার আয়োজন করিয়া থাকি। এই সামান্য কর্ত্তব্যও সকলে সম্যক্ প্রকারে পালন করি কি না বলিতে পারি না; তাহা এক বার আমাদের প্রত্যেকের পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত হইবে। কিন্তু আমরা তাঁহাদিগের নিকট যে অপরিশোধনীয় ঋণে আবদ্ধ, তাহা হইতে আমরা নিশ্চয়ই শুধু ইঁহার দ্বারা মুক্ত হইতে পারি না। যে মহা কার্য্যের জন্য তাঁহারা শরীর মনের সমস্ত শক্তি, হৃদয়ের সকল আকাঙ্ক্ষা উৎসাহ ও বল, অর্থ বিত্ত, যাহা কিছু সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াও, যথেষ্ট করিতে সমর্থ হইলেন না বলিয়া গভীর ক্ষোভ ও দুঃখ বেদনা লইয়া, অসম্পন্ন অবস্থায় ফেলিয়া, এই সংসার হইতে চলিয়া গিয়াছেন, তাহা যে পরিমাণে আমাদের দ্বারা সাধিত হইবে, সেই পরিমাণেই আমরা তাঁহাদের ঋণশোধে কথঞ্চিৎ সমর্থ হইব।

তাঁহারা যে আমাদের জন্য কত গভীর ভাবে ভাবিতেন, আমাদের দুর্গতিতে, তাঁহাদের প্রিয় জন্মভূমির শোচনীয় দুর্দ্দশাতে, কিরূপ মর্ম্মন্তুদ বেদনা অনুভব করিতেন, আজ সর্ব্বাগ্রে সেই কথাই মনে উদয় হইতেছে।

রামমোহন, স্বদেশে কি বিদেশে, সজনে কি নির্জ্জনে, ভজনালয়ে কি আমোদ প্রমোদের স্থলে, যখন যে অবস্থায় যেথানে থাকিতেন, সেই গভীর বেদনা হৃদয়ের অন্তস্তলে বহন করিতেন, তাহা তাঁহার বদনমণ্ডল ঘন বিষাদকালিমায় লিপ্ত করিয়া রাখিত এবং অনেক সময় প্রবল অশ্রুধারারূপে প্রবাহিত হইয়া দুই গণ্ডস্থল প্লাবিত করিত। তাঁহার প্রিয় দেশবাসিগণ, জীবন্ত ঈশ্বরের সত্য পূজা পরিত্যাগ করিয়া, কি রূপ মহামৃত্যুর গভীর আবর্ত্তে নিমজ্জিত হইয়াছে, তাহা এত তীব্রভাবে অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়াই, সত্য ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার জন্য এমন নিঃশেষে আপনাকে অর্পণ করিতে পারিয়াছিলেন। এই যে অপরের দুঃখ দুর্গতিতে তাহাদের নিজের অপেক্ষাও তীব্রতর বেদনা অনুভব এবং তাহা দূর করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা, ইহাই মহৎ হৃদয়ের বিশেষ লক্ষণ, মহাপুরুষের অপরিহার্য্য চিহ্ন। সাধারণ লোকের মধ্যে যখন সত্য জীবন সঞ্চারিত হয়, তখন তাহাদেরও অনুভবশক্তি অনেকটা প্রবল হইয়া উঠে, তাহারা আর পূর্ব্বের ন্যায় আপনাদের বিপন্ন অবস্থা ভুলিয়া আত্মতৃপ্ত থাকিতে পারে না, নিজেদের দুর্গতিতে বিশেষ বেদনা বোধ করিয়া তন্নিবারণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা যত্ন আরম্ভ করে। কিন্তু তাহারা আপনাকে লইয়াই বিব্রত থাকে, অন্যের জন্য কিছুমাত্র ভাবে না, তাহাদের কোনও রূপ সাহায্য করিতে অগ্রসর হয় না। ইহাদের মধ্যে সাধনশীল ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিও থাকিতে পারে। তাঁহারা আপনার উন্নতিসাধনের জন্য গভীর সাধনাদিতে নিযুক্ত হইতে, ও অনেক প্রকার ত্যাগ-স্বীকারও করিতে পারেন। তাঁহারা লোকের যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তিও আকর্ষণ করিতে পারেন। তথাপি তাঁহারা মহাপুরুষ-বাচ্য হইতে পারেন না, তাঁহাদের হৃদয়ের কোন মাহাত্ম্য সূচিত হয় না। রামমোহন কিশোর বয়সে যে সত্যের আলোক পাইয়াছিলেন, সকল বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যে তাহাব নিকট চির জীবন বিশ্বস্ত থাকিয়া যে শুধু আপনার উন্নতিসাধনেই নিযুক্ত ছিলেন, তাহা নহে; কেবল ব্যক্তিগত ভাবে আপনার অন্তরের অন্তরে, নির্দ্দিষ্ট সময় ব্যতীতও, পথে ঘাটে, কাজে কর্ম্মে, স্নানাহার-কালে প্রিয়তম দেবতার উপাসনাতে গভীর ভাবে ডুবিয়া ক্ষান্ত ছিলেন না; অপরকেও সেই সত্যের আলোকে আলোকিত করিবার জন্য, জীবনপ্রদ উপাসনার মধুর আস্বাদে পরিতৃপ্ত করিবার জন্য, এরূপ আকুলতা অনুভব করিয়াছিলেন যে, তদুদ্দেশ্যসাধনে কোনও প্রকার ত্যাগকেই ত্যাগ বলিয়া মনে করেন নাই। তাঁহার সে অতুলনীয় ত্যাগের কথা আমরা জানি, এবং অনেক সময় বলিয়াও থাকি, তাঁহার সে মহৎ কার্য্যের জন্য কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করিয়া থাকি। যদিও তাঁহার সে-ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার অসম্পূর্ণ কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য অগ্রসর না হইলে, সামান্য ত্যাগস্বীকারেও প্রস্তুত না হইলে, সে-বলার বা কৃতজ্ঞতাপ্রকাশের বিশেষ কোনও মূল্য নাই, তথাপি উহাও আমাদের একটা অবশ্যপালনীয় কর্ত্তব্য,—নিষ্ঠার সহিত তাহা করিতে যত্নশীল হইলে ক্রমে সে চেষ্টা ফলপ্রসূ হইবে এবং আমরা ক্ষুদ্র স্বার্থের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া মহত্বের পথে একটু একটু করিয়া অগ্রসর হইতে সমর্থ হইব। সংসারের স্বার্থপর মানুষ যেমন মনে করে, যাবতীয় সাংসারিক ভোগ সুখের সামগ্রী একাকী উপভোগ করিলেই আনন্দ ও তৃপ্তি, অন্যকে তাহার অংশভাগী করিলে যে তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ও গভীরতর সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা কল্পনাও করিতে পারে না, তেমনি প্রিয়তম পরম দেবতাকে শুধু একাকী উপভোগ করা অপেক্ষা অপর সকলকে সে আনন্দের অংশী করিলে যে অনেক বেশী আনন্দ ও কল্যাণ লাভ করা যায়, অনেক ধর্ম্মসাধকও সে কথা জানেন না। তাই তাঁদের ধর্ম্ম-জীবন অপূর্ণ থাকিয়া যায়, প্রেমস্বরূপের পূজা করিয়াও তাঁহাদের হৃদয় বিকশিত হয় না, সংকীর্ণ থাকিয়া যায়। মহাপুরুষদের চরিত্র আলোচনা করিলে আমরা এই ভ্রম হইতে মুক্ত হইতে পারি। সকল দেশীয় ও সকল কালের মহা-পুরুষদের জীবন হইতেই আমরা এই শিক্ষা লাভ করিয়া থাকি, সন্দেহ নাই। কিন্তু সে বিস্তারিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার এখন কোন প্রয়োজন নাই। যাঁহাদের কথা বিশেষ ভাবে এই সময়ে আমাদের মনে উপস্থিত হইতেছে, তাঁহাদের জীবনের এই সর্ব্বপ্রধান শিক্ষা গ্রহণ করিলেই আমাদের বর্ত্তমান কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন হইবে। তাহার পর, রাজর্ষি রামমোহন পূর্ণ মানবত্বের কি উচ্চ আদর্শ লইয়া আমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান, তাহা বিশেষ ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া তদনুসরণে একান্ত যত্নশীল হইতে হইবে—তাঁহার সে উচ্চতালাভ আমাদের পক্ষে সম্ভবপর না হইলেও, সেই পথেই যে আমাদিগকে চলিতে হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যে যতটুকু অগ্রসর হইতে পারি ততটুকুই প্রকৃত কল্যাণ ও কৃতার্থতা। তিনি যে শুধু কোনও একটা বিষয়েই আদর্শস্থানীয় ছিলেন, তাহা নহে—শরীর মন আত্মা সকল দিক সমভাবে বিকশিত করিয়া তিনি সামঞ্জস্যীভূত সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির আদর্শস্বরূপই ছিলেন। তাঁহার ন্যায় সুস্থ সবল উন্নত বপু, আজানুলম্বিত ভুজ, প্রশস্ত বক্ষ, প্রকাণ্ড মস্তক, সুদৃঢ় পেশী আর কয় জনের আছে? তাঁহার পাগড়ী ব্যবহার করিবার উপযুক্ত মাথা একটিও দেখা যায় না। তাঁহার ন্যায় আহার করিবার শক্তিও আর কাহার বড় একটা দৃষ্ট হয় না। অথচ তিনি যে শরীর নিয়াই ব্যস্ত ছিলেন, শুধু তাহার সেবাতেই নিযুক্ত ছিলেন, এরূপ নহে। মানসিক উন্নতিতেও তাঁহার তুল্য আর কাহাকেও দেখা যায় না। তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার কথা ছাড়িয়া দিলেও, তাঁহার ন্যায় নানা শাস্ত্রে ও বিবিধ ভাষায় এরূপ গভীর পাণ্ডিত্য, এরূপ সত্যানুসন্ধান এবং তৎপ্রতিষ্ঠায় যত্ন ও নিষ্ঠা, আমরা আর কোথায় পাইব? কোনও অনধীত গ্রন্থ সম্বন্ধে বিচার উপস্থিত হইলে এক রাত্রিতেই উহা পাঠ করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হইলেন এবং তাঁহাকে পরাজিত করিলেন। খৃষ্টীয় পাদরীদিগের সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হইলে, সত্যনির্দ্ধারণের জন্য হিব্রু ও গ্রীক ভাষায় মূল গ্রন্থ অধ্যয়ন না করিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না।

তিনি যে যুক্তি বিচারে সর্ব্বত্র অপরাজেয় ছিলেন, তাহার মূল এখানে। তিনি যে সাংসারিক জ্ঞানবিরহিত পণ্ডিতমূর্খ বা গ্রন্থকীট মাত্র ছিলেন তাহা নহে। বিষয়ী ব্যক্তিগণও সর্ব্বদা তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিয়াই নানা জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করিত। তাঁহার জ্ঞান সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। তাই তিনি সর্ব্ববিষয়িণী উদার শিক্ষা বিস্তারের জন্য নানা প্রকার চেষ্টা করিয়াছেন, দেশপ্রচলিত একদেশদর্শী সংকীর্ণ শিক্ষার এত বিরোধী ছিলেন। তিনি আবার তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন শুষ্ক পণ্ডিত মাত্র ছিলেন না। তাঁহার ন্যায় বিশাল হৃদয়ও আর দেখা যায় না। তাঁহার প্রেম কোনও ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আবদ্ধ ছিল না, তাহাতে দেশ কাল অবস্থার কোন বিচার ছিল না। তাঁহার মহৎ হৃদয়ের প্রেম উচ্চ নীচ ধনী নির্ধনী পুরুষ নারী, বালক বৃদ্ধ, স্বদেশী বিদেশী সকলকে সমভাবে আলিঙ্গন করিত। তিনি রাস্তার মুটে মজুরের সঙ্গে মিশিতে, তাহাদের সুখে দুঃখে সহানুভূতি করিতে, তাহাদিগের মোট-উত্তোলনে সাহায্য পর্য্যন্ত করিতে, ঘৃণা বা লজ্জা বোধ করিতেন না। এ দেশের দুঃখিনী নারীদের জন্য তাঁহার হৃদয় কিরূপ ক্রন্দন করিত, সুদূর বিদেশে যাহারা নানা প্রকার দুঃখ দৈন্যে অত্যাচারে প্রপীড়িত বা স্বাধীনতার সংগ্রামে পরাজিত, তাহাদের জন্যও তাঁহার হৃদয় কেমন সমভাবে ব্যথিত, তাহা আমরা সকলেই অবগত আছি। তাঁহার বন্ধুপ্রীতিরও তুলনা নাই। তিনি আপনার সকল মহত্ত্ব ও পাণ্ডিত্য ভুলিয়া সরল শিশুর ন্যায় বালকদের খেলাধূলার অংশী হইতে, তাহাদের সঙ্গে গাছে দোল-খাইতেও, কুণ্ঠিত হইতেন না। কিন্তু এ সকলই বাহিরের, ইহা সহজেই লোকের দৃষ্টিপথে পতিত হয়। প্রকৃত মনুষ্যত্ব এখানে নয়, অন্তরস্থিত আত্মায়—তাহাই সকলের মূল প্রস্রবণ। সেই আত্মাতে তিনি কত বড় ছিলেন, অনেকেই তাহা লক্ষ্য করে না। অথচ ব্রহ্মসংস্পর্শে সে আত্মা যদি সঞ্জীবিত ও উন্নত না হইত, তবে এ সকল সম্ভবপরই হইত না, ইহাদের বিশেষ কোনও মূল্যই থাকিত না। তাঁহার গভীর নিষ্ঠা ও ভক্তির কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি হৃদয়-দেবতাকে সাক্ষাৎ ভাবে অন্তরে সত্য এ ভাবে পূজা করিতেন বলিয়াই এরূপ হইয়াছিল। তাঁহার মধ্যে মিথ্যা কল্পনা ও ভাবুকতা ছিল না বলিয়াই, তাঁহার ভক্তি, উজ্জ্বল পাপবোধ ও পবিত্রতার আকাঙ্ক্ষা এবং জনসমাজের সেবার দ্বারা শুভ সঙ্কল্প সাধন ও জীবনদেবতার ইচ্ছাপালন, প্রিয়তমের হস্তে আপনাকে সর্ব্বতো ভাবে সমর্পণ, উৎপাদন করিয়াছিল। এই জন্য সূক্ষ্মতম পাপ-চিন্তাকেও তিনি বিন্দু পরিমাণে প্রশ্রয় দিতেন না,—পথে ঘাটে চলিতে ফিরিতেও চিত্তের শুদ্ধতার জন্য অবিশ্রান্ত প্রার্থনা করিতেন, এবং শিশুর ন্যায় সরল ও বিনয়ী ছিলেন। এই হেতুই মানবজীবনের এমন কোনও বিভাগই দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহার সংস্কার ও উন্নতির জন্য তিনি আপনার কর্ম্মপ্রচেষ্টাকে নিয়োগ করেন নাই। শিক্ষা, সমাজ, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, কোনও দিকই উপেক্ষা করেন নাই—সকল সমস্যার সমাধানেই আপনার চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন, সকল বিষয়েই পথ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার তীক্ষ্ণ দূর দৃষ্টি যাহা স্পষ্ট দেখিয়াছিল, শতবর্ষ পরেও কেহ তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কিছু এখন পর্য্যন্ত আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইল না। চারিদিকে স্বাধীনতার কথা অনেকেই শুনিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাঁহার ন্যায় সর্ব্ব প্রকারে পূর্ণ স্বাধীনতার উপাসক আর দ্বিতীয় কাহাকেও দেখা যায় না, তল্লাভের অধিকতর ফলপ্রদ উপায়ও কেহ বাহির করিতে পারে নাই। অনেকের মুখে বীরত্বের কথাও যথেষ্ট শুনা যায় সত্য, কিন্তু সে রূপ নির্ভীক পুরুষ একটিও দেখা যায় না। সত্যই তিনি যুগপ্রবর্ত্তক ঋষি রূপে সকল বিষয়েই ভারতে নব যুগের সূচনা করিয়া গিয়াছেন। সে যুগের পরিসমাপ্তি এখনও বহু দূরে।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁহার উপযুক্ত শিষ্যই ছিলেন। তাঁহার হৃদয়ও দেশের ও ব্রাহ্মসমাজের দুর্গতি দেখিয়া কি প্রকার মর্ম্মবেদনায় প্রপীড়িত হইত এবং তাহা দূর করিবার জন্য আপনাকে নিঃশেষে ব্যয় করিয়াও যথেষ্ট করিতে পারিলেন না বলিয়া তিনি আপনাকে কত দোষী করিতেন, কত গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করিতেন, তাহা আমরা অনেকেই দেখিয়াছি। তাঁহার অসাধারণ ত্যাগ ও নিষ্ঠা কাহারও অবিদিত নাই। আপনার ধর্ম্মবিশ্বাস ও সত্যনিষ্ঠা রক্ষার জন্য তাঁহাকে কি কঠোর সংগ্রামই না করিতে হইয়াছে, কত উৎপীড়ন অত্যাচারই না সহ্য করিতে হইয়াছে! কি কঠোর সাধনা ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবলে আপনাকে তিনি গড়িয়া তুলিয়াছেন, কি ভাবে "মনের কাণ মলিয়াছেন," কি আকুল প্রার্থনায় দিন যামিনী কর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা আমরা অনেকেই শুনিয়াছি। পাঠে তাঁহার কি গভীর অভিনিবেশই ছিল! স্বাভাবিক প্রতিভাও তাঁহার সামান্য ছিল না। ধন মান যশের পথ তাঁহার নিকট বেশ উন্মুক্তই ছিল। কিন্তু কোনও সাংসারিক সুখলালসা, কোনও প্রকার প্রলোভন তাঁহাকে আকৃষ্ট করিতে পারিল না—যখন প্রিয়তম হৃদয়-দেবতার ডাক অন্তরে শুনিতে পাইলেন, এক মুহূর্ত্তে সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাঁহার পশ্চাতে ছুটিলেন, এক দিনের জন্যও অপেক্ষা করিতে পারিলেন না,—কি খাইবেন, কি পরিবেন, পরিবার পরিজনের কি হইবে তাহাও ভাবিতে পারিলেন না, সম্পূর্ণ রূপেই আপনাকে প্রভুর চরণে সমর্পণ করিলেন। এই ভাবে আপনাকে জীবন-দেবতার হাতে দিয়াছিলেন বলিয়াই, সকল বাধা বিঘ্নের মধ্যে তিনি বীর পুরুষের ন্যায় নির্ভীক ভাবে সংসারে বিচরণ করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয় কিরূপ প্রশস্ত ছিল, কত দুঃখী তাপী, অত্যাচারিত উৎপীড়িত, তাঁহার আশ্রয়লাভ করিয়াছিল, অন্যের বেদনায় তিনি কিরূপ অভিভূত হইতেন এবং তন্নিবারণে কত যত্নশীল হইতেন, সে কথা না বলিলেও চলিবে। এ ক্ষেত্রে আপনার সামর্থ্যাসামর্থ্যের বিষয়ও চিন্তা করিতেন না, আপনার খাবার আছে কি না ভাবিতেন না। পাপীর প্রতি কি গভীর সহানুভূতিই তাঁহার ছিল! আশা উৎসাহ দিয়া সকলকে তুলিয়া ধরিবার জন্য তিনি কতই না যত্নশীল ছিলেন! তাঁহার ন্যায় এত অগ্নিময় আশা ও উৎসাহের বাণী আর কেহ যে বলিয়াছেন তাহা ত জানি না। তাঁহার গানে কবিতায়, কথাবার্ত্তায়, চরিত্রের স্পর্শে, তিনি কি তাড়িৎসঞ্চারই করিয়া গিয়াছেন! তিনিও রাজর্ষি রামমোহনের ন্যায় মানব-জীবনের সকল বিভাগেই কার্য্য করিয়া গিয়াছেন—শিক্ষা,

সমাজ, রাজনীতি, পারমার্থিক জীবন, কিছুই তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্রের বাহিরে ছিল না। তিনি কোনও সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন না। তিনি যে আদর্শের কথা সর্ব্বদা বলিতেন—জ্ঞানে গভীরতা, প্রেমে বিশালতা, কর্ত্তব্যে দৃঢ়তা, চরিত্রে সংযম, ঈশ্বরে ভক্তি, মানবে প্রেম ইত্যাদি—তাহা অনুসরণ করিয়া চলিতেই সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেন। সে সকল আর বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। বিশেষতঃ তাঁহার জীবনের অনেক কথা এখনও আমরা ভুলি নাই, বেশ উজ্জ্বল ভাবেই আমাদের স্মরণে আছে। কিন্তু ইতিহাসের ন্যায় সে সকল কথা স্মরণ করিলে অথবা তাহার পুনরালোচনা করিলে কি লাভ হইবে, যদি তাহা আপনাদের জীবনে আয়ত্ত করিতে, তদনুসারে আপনাদিগকে গড়িয়া তুলিতে, চেষ্টা যত্ন না করি? সুতরাং এই দুই মহাপুরুষ আমাদিগকে যে পথ দেখাইয়া গিয়াছেন, আমাদের জন্য যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার অনুসরণই যে আমাদের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য, তাহাই যে তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পন্থা, তাহা আর অধিক করিয়া বলিতে হইবে না। এ দিকে আমাদের সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হউক। আমরা তাঁহাদের প্রদর্শিত পথে চলিয়া নিজেরা ধন্য ও কৃতার্থ হই, এবং অপরের উন্নতিলাভে সহায়তা করিয়া মানবজীবনের সার্থকতা সম্পাদন করি। আমাদের জীবনে ও কার্য্যে প্রিয় ব্রাহ্মধর্ম্মের গৌরব বর্দ্ধিত হউক। আমাদের সমাজে ও প্রতি জীবনে মঙ্গলময় বিধাতার ইচ্ছাই জয়যুক্ত হউক।

ব্রাহ্মসমাজ, ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মধর্ম্ম এই তিনটি নাম।

ব্রাহ্মসমাজ, না ব্রহ্মসমাজ, না ব্রহ্মসভা?

১৮২৮ সালের ২০শে আগষ্ট, ৬ই ভাদ্র, রামমোহন রায় "ব্রাহ্মসমাজ" প্রতিষ্ঠিত করেন। এই নামটি রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলীর ভিতরে কোথাও পাওয়া যায় না; তাহার কারণ এই যে তিনি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার পরে যে কয় বৎসর জীবিত ছিলেন, তাহার মধ্যে তাঁহার রচিত কোনও পুস্তকে এই নাম ব্যবহার করিবার প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার সাড়ে নয় মাস পরে (১৮২৯ সালের ৬ই জুন) মন্দির-নির্ম্মাণের জন্য চিৎপুর রোডে জমী ক্রয় করা হয়; তাহার কবালা-পত্রে "ব্রহ্মসমাজের নিমিত্তে" এরূপ কথা আছে।

কবালা-পত্রের "ব্রহ্মসমাজ" শব্দটি "ব্রাহ্মসমাজের" স্থানে লিপিকরের ভ্রমবশতঃ লিখিত হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। ঐ কবালা-পত্র বর্ণাশুদ্ধিতে একেবারে পরিপূর্ণ বলিলেই হয়। সাধারণ লোকে তখন জানিতই না যে 'ব্রাহ্ম' বলিয়া একটা শব্দ আছে; তাহারা 'ব্রহ্ম' কথাটাই জানিত। তাই লিপিকর "ব্রহ্মসমাজ" লিখিয়া থাকিবে।

ব্রাহ্মসমাজের শতাব্দীপূর্ত্তি উপলক্ষে মহর্ষির আত্মজীবনীর যে নূতন সংস্করণ প্রস্তুত হইতেছে, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক লিখিত তাহার পরিশিষ্টের পাণ্ডুলিপি হইতে গৃহীত।

সমাজ বলিতে Community অর্থাৎ এক-লক্ষণবিশিষ্ট কতকগুলি মানুষের সমষ্টি বুঝায়; যথা, বিদ্বজ্জন-সমাজ, ভক্তসমাজ, সুধীসমাজ, ব্রাহ্মণসমাজ, বৈদ্যসমাজ ইত্যাদি। যাহারা এক ধর্ম্মমতে বিশ্বাস করে এবং একরূপ সামাজিক শাসনের দ্বারা শাসিত হয়, এইরূপ মানুষের সমষ্টি অর্থেই বর্ত্তমান কালে "সমাজ" শব্দটি অধিক প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, যথা ব্রাহ্মসমাজ, হিন্দু সমাজ, ইত্যাদি। কিন্তু সমাজ-শব্দটির অর্থের এই সঙ্কোচ, অতি আধুনিক কালে, এবং সম্ভবতঃ "ব্রাহ্মসমাজ" নামটি প্রচলিত হওয়ার ফলেই, ঘটিয়াছে। এই সঙ্কুচিত অর্থটিকে আমরা আমাদের জীবন কালের মধ্যে বাংলা ভাষা হইতে হিন্দী ও মরাঠী ভাষায় সংক্রান্ত হইতে দেখিয়াছি। সমাজ এবং সভা এই দুইটি শব্দের মধ্যে 'সমাজ' শব্দটি স্থায়ী জনমণ্ডলী বুঝায়, 'সভা' শব্দটি অস্থায়ী জনসমষ্টি বুঝায়। 'সমাজ' বুঝায় স্থিতি, 'সভা' বুঝায় উপস্থিতি। এজন্য 'ব্রহ্ম বিষয়ক আলোচনা উপাসনা ইত্যাদির জন্য সভা' এই অর্থে 'ব্রহ্মসভা', এবং 'ব্রাহ্মদিগের সমাজ' এই অর্থে 'ব্রাহ্মসমাজ', এই দুইটি নামের অর্থ করা সম্ভব; কিন্তু 'ব্রহ্ম সমাজ' কথার কোন অর্থই হয় না। এরূপ একটি অর্থহীন নাম রামমোহন রায় সৃষ্টি করিয়াছিলেন, ইহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না।

'ব্রহ্মসভা' নামটি তদ্রূপ অর্থহীন না হইলেও রামমোহন রায়ের প্রদত্ত নহে। রামমোহন রায় যে-দুইটি নাম ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা 'আত্মীয় সভা' ও 'ব্রাহ্মসমাজ'। ১৮১৫ সাল হইতে (অর্থাৎ কলিকাতায় আসিয়া বসিবার পর হইতে) তিনি যখন নিজ বাটীতে বা বন্ধুদিগের বাটীতে বন্ধুগণ সহ একত্রে ব্রহ্মোপাসনা করিতেন, তখন তিনি সেই অনুষ্ঠানটির নাম দিয়াছিলেন 'আত্মীয় সভা'। ১৮২৮ সালে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত উপাসনামণ্ডলীটির নাম হইল 'ব্রাহ্মসমাজ'। এ উভয় নামের পার্থক্য প্রণিধানযোগ্য। এই তেরো বৎসরের মধ্যে রামমোহনের জীবনের অনেক ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। খ্রীষ্টীয় বন্ধুদিগের সংস্পর্শে আসিয়া তিনি সাপ্তাহিক সমবেত ঈশ্বরোপাসনা ও ধর্ম্মমণ্ডলী এই উভয়ের মর্ম্ম বুঝিয়াছেন। যাহারা শুধু উপাসনার দিনে একত্র হইবে না, কিন্তু ধর্ম্ম-ভ্রাতা ও ধর্ম্ম-ভগিনী হইয়া একটি স্থায়ী 'সমাজ'রূপে পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ হইবে, এমন একটি দলের মূল্য তিনি অনুভব করিতে শিখিয়াছেন। এই জন্যই তাঁহার পরিণত অভিজ্ঞতা-প্রসূত নূতন নামটি হইল 'ব্রাহ্মসমাজ'। যাঁহারা বলেন, রামমোহন রায় কেবল উপাসনা-সভাই প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন, 'সমাজ' চাহেন নাই, তাঁহারা এই দুই নামের পার্থক্যের প্রতি মনোনিবেশ করিলেই নিজ ভ্রম বুঝিতে পারিবেন। দেবেন্দ্র-নাথের ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের দিনে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশও বলিয়াছিলেন, "রামমোহন রায়ের এইরূপ উদ্দেশ্য ছিল; কিন্তু তিনি তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। এত দিন পরে তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইল।" (আত্মজীবনী ৩৬, ৩৭ পৃষ্ঠা)।

১৮৩০ সালে যখন রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজের নবনির্ম্মিত মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকার্য্য করিতে যাইতেছেন, তাহার ছয় দিন পূর্ব্বে (৫ই মাঘ) তাড়াতাড়ি 'ধর্ম্মসভার' সৃষ্টি করা হয়, ও তখন হইতে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের কলহ বিবাদের ভিতরে

লোকের মুখে মুখে 'ধর্ম্মসভার' অনুরূপ 'ব্রহ্মসভা' নামটি রচিত হয়। এই কলহ বিবাদের পূর্ব্বে 'ব্রহ্মসভা' নামের অস্তিত্ব ছিল না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সে সময়ে লোকে 'ব্রহ্ম' কথাটি জানিত, 'ব্রাহ্ম' কথাটি জানিত না; ব্রাহ্মসমাজের প্রতিশব্দরূপে 'ব্রহ্মসভা' নাম সৃষ্ট হইবার ইহাও একটি কারণ।

রামমোহন রায় অথবা তাঁহার পরবর্ত্তী ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তৃপক্ষগণ কেহই কোথাও বলেন নাই যে ১৮২৮ সালে 'ব্রহ্মসভা' নামে সমাজ সংস্থাপন করা হইয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ সর্ব্বত্র 'ব্রাহ্মসমাজ' নাম ব্যবহার করিয়াছেন। রামমোহন রায়ের বিলাত গমনের পর হইতে দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাড়ীর সঙ্গেই ব্রাহ্মসমাজের যোগ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল। সুতরাং দেবেন্দ্রনাথের ব্যবহৃত 'ব্রাহ্মসমাজ' নামটিই ঠিক নাম বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট হেতু আছে।

আত্মজীবনীর ১৮ পৃষ্ঠায় দেখা যায় যে শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য 'ঈশাবাস্যং' শ্লোক সম্বন্ধে বলিতেছেন, "এ তো সব্ ব্রহ্মসভার কথা।" শ্যামাচরণ তখনও ব্রাহ্মসমাজের বাহিরের লোক ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের বহিঃস্থ অন্যান্য লোকের ন্যায় তিনিও এ স্থলে সাধারণের মধ্যে প্রচলিত নামটি বলিলেন মাত্র। এবং ঠিক এই কারণেই, দলাদলির উল্লেখ করিতে গিয়া দেবেন্দ্রনাথ ৫২ পৃষ্ঠায় দলাদলির জন্য সৃষ্ট নামটি (কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে) ব্যবহার করিয়া বলিতেছেন, "ধর্ম্মসভা ও ব্রাহ্মসভার দলাদলি।"

দুঃখের বিষয়, এখনও কেহ কেহ এই ভ্রান্ত ধারণা মন হইতে দূর করিতে পারিতেছেন না যে, রামমোহন রায় ১৮২৮ সালে ব্রাহ্মসমাজের নামকরণ করিয়াছিলেন "ব্রহ্মসভা"। সত্য কথা এই যে, 'ব্রহ্মসভা' এই নামটি ইহাকে কোনও দিন কেহই দান করেন নাই; উহা মানুষের মুখে-মুখে রচিত, ও সাধারণতঃ অবজ্ঞায় ব্যবহৃত, একটি নাম মাত্র। স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া এই বিষয়ে ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন; তাঁহার পুস্তক হইতে সেই ভ্রম ক্রমশঃ বহুদূর পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ঐতিহাসিক তথ্য নির্দ্ধারণের পক্ষে বাংলাদেশে প্রচলিত মজলিসী গল্পগুলি যে কি-পর্য্যন্ত নির্ভরের অযোগ্য, রামমোহন রায়ের ও দেবেন্দ্রনাথের জীবন আলোচনা করিতে গিয়া আমরা পদে পদে তাহার পরিচয় পাইতেছি। দীর্ঘকালের ব্যবধানে রচিত ক্রমশঃ মুখে-মুখে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও অনধিকারী লোকের দ্বারা প্রচারিত এই সকল জনশ্রুতি অপেক্ষা, সাড়ে নয় মাস পরের কবালা-পত্রের উল্লেখটি অনেক অধিক নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য। রামমোহন ১৮২৮ সালে 'ব্রাহ্মসমাজ' নামই দিয়াছিলেন, ইহাতে সন্দেহ নাই।

এই সূত্রে ইহাও বলা আবশ্যক যে, যত দিন রামমোহন রায় (এ দেশে কিংবা বিলাতে) জীবিত ছিলেন, তত দিন বরাবর ৬ই ভাদ্র তারিখেই ব্রাহ্মসমাজের সাংবৎসরিক হইয়া আসিতেছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর ইহা বন্ধ হইয়া যায়। ১১ই মাঘকে রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজের সাংবৎসরিক মনে করিতেন না; এখনও মনে করা ঠিক নহে। মাঘোৎসব ও ভাদ্রোৎসব, এই দুইয়ের মধ্যে ভাদ্রোৎসবই প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মসমাজের সাংবৎসরিক; তাহাই রামমোহন রায় কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত, ও প্রাচীনতর উৎসব। মাঘ মাসে 'সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ' করা দেবেন্দ্রনাথ ১৮৪৩ সাল হইতে আরম্ভ করেন; (আত্মজীবনী ২৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

'ব্রাহ্ম' নামটি কবে হইল?

অনেকের ধারণা যে 'ব্রাহ্ম' শব্দটি রামমোহন রায়ের সৃষ্ট। কিন্তু তাহা নহে। সংস্কৃতে এ শব্দটি অতি পুরাতন, এবং ধর্ম্মশাস্ত্রসকলে বহুল ভাবে ব্যবহৃত। রামমোহন রায়ের সময়ে এ শব্দটি সাধারণ লোকে না জানিলেও শাস্ত্রজ্ঞ লোকেরা জানিতেন। শাস্ত্রসকলে ইহার অর্থ, ব্রহ্ম সম্বন্ধীয়, বা (দেবতা) ব্রহ্মার সম্বন্ধীয়। কিন্তু সংস্কৃতে ইহা মানুষের ধর্ম্মমতের বা ধর্ম্মসাধনপ্রণালীর পরিচায়ক বিশেষণ রূপে (অপেক্ষাকৃত আধুনিক তন্ত্রশাস্ত্রে ভিন্ন) কোথাও ব্যবহৃত হয় নাই। রামমোহন রায় বাংলাভাষায় 'একমাত্র ব্রহ্মের উপাসক' এই অর্থে মানুষের বিশেষণ রূপে এ শব্দটিকে প্রথম ব্যবহার করেন। তাঁহার গ্রন্থাবলীতে তাঁহার উক্তিতে তিন স্থানে **এই অর্থে** 'ব্রাহ্ম' কথাটি আছে যথা:—"প্রতিমাদিতে পরমেশ্বরের উপাসনা ব্রাহ্মেরা করিবেন না" (মাণ্ডুক্যোপনিষদের ভূমিকা); "সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি তাবৎকালে ব্রাহ্মদের এইরূপ অনুষ্ঠান ছিল," (কবিতাকারের সহিত বিচার); "সর্ব্বকালে মৌন ও নির্জ্জনে থাকা, ইহা ব্রাহ্মের নিত্য ধর্ম্ম নহে" (ঐ)।

'ব্রাহ্ম' শব্দটির রামমোহন রায়-কৃত এই নূতন ব্যবহার দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়, তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ যে ব্রহ্মোপাসক হইয়া এবং প্রতিমাদির পূজা হইতে বিরত হইয়া 'ব্রাহ্ম' এই বিশেষ নামে চিহ্নিত হইবেন, ইহা রামমোহন রায়ের কল্পনার অন্তর্গত ছিল। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসমাজে যোগদানের সময় পর্য্যন্ত ইহা কার্য্যতঃ হইয়া উঠে নাই। তখনও ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা এই ছিল যে, সাপ্তাহিক উপাসনাতে আসিয়া যাঁহারা বসিতেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক কেবল সেখানে সেই একবার মাত্র নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করিতেন; তাঁহারা অন্যত্র প্রতিমা পূজা হইতে বিরত থাকিতেন না। তাঁহাদের মধ্যে কেহ ঐ বিশেষ অর্থে 'ব্রাহ্ম' বলিয়া চিহ্নিত হইবার যোগ্যও ছিলেন না, এবং সম্ভবতঃ ঐ বিশেষ অর্থটিও জানিতেন না। 'ব্রাহ্ম' নামে মানুষকে চিহ্নিত করা হইবে, রামমোহন রায়ের এই কল্পনাকে দেবেন্দ্রনাথই (ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণের প্রতিজ্ঞা-পত্র রচনা ও ব্রত প্রবর্ত্তন করিয়া) কার্য্যে পরিণত করিলেন। তাই দেবেন্দ্রনাথ আত্মজীবনীতে (৩৫পৃঃ) বলিতেছেন, "যখন ব্রাহ্মসমাজ আছে, তখন তাহার প্রত্যেক সভ্যের ব্রাহ্ম হওয়া চাই। অনেকে হঠাৎ মনে করিতে পারেন যে ব্রাহ্মদল হইতে ব্রাহ্মসমাজ হইয়াছে; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। ব্রাহ্মসমাজ হইতে ব্রাহ্ম নাম স্থির হয়।" অর্থাৎ প্রকৃত ঘটনা এরূপ নয় যে, আগে কতকগুলি লোক 'ব্রাহ্ম' বলিয়া চিহ্নিত হওয়ার পরে তাঁহাদের দলের নামটি 'ব্রাহ্ম সমাজ' হইল; প্রকৃত ঘটনা এই যে, যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজে আসিতেন, তাঁহাদের মধ্য হইতে বাছা বাছা কয়েক জন লোক পরে 'ব্রাহ্ম' নামে বিশেষ ভাবে চিহ্নিত হইলেন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম।

'ব্রাহ্মধর্ম্ম' নামটি রামমোহন রায়ের সময়ে সৃষ্ট হয় নাই।

তাঁহার সময়ে তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম 'বেদান্তপ্রতিপাদ্য ধর্ম্ম' নামে অভিহিত হইত। সম্ভবতঃ দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসমাজে যোগদানের পরে, যে সময়ে 'ব্রাহ্ম' কথাটি প্রবল হইয়া উঠিল, তখন হইতে 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' এই নামটিও ঐ ধর্ম্মের সংক্ষিপ্ত নামরূপে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইল। ইহাও অসম্ভব নহে যে 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' নামটি দেবেন্দ্রনাথেরই সৃষ্ট।

যাহা হউক, দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীতে যে (নবম) পরিচ্ছেদে 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' নামটি, প্রথম ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার সর্ব্বত্র, এই নামটির অর্থ, 'ব্রাহ্মের অবশ্য প্রতিপালনীয় ব্রত-সমষ্টি'; 'ব্রাহ্মের অবশ্যবিশ্বসনীয় মতসমষ্টি' নহে। দেবেন্দ্রনাথ 'ধর্ম্ম' বলিতে বুঝিয়াছেন, সারা জীবনের জন্য আপনাকে কতকগুলি সংকল্পের দ্বারা বাঁধা; 'ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ' বলিতে বুঝিয়াছেন, বিধিপূর্ব্বক আচার্য্যের নিকটে গিয়া ঐরূপ সংকল্প গ্রহণ।

এখানে ইহাও বলা উচিত যে, ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণের জন্য দেবেন্দ্রনাথের রচিত প্রতিজ্ঞাপত্র বহুবার সংশোধিত হইয়া তাহার বর্ত্তমান আকার (যাহা 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' গ্রন্থের পুরোভাগে দেখিতে পাওয়া যায়) ধারণ করিয়াছে; কিন্তু এই প্রতিজ্ঞা-পত্রের সকল আকার পরিবর্ত্তনের ভিতরে, দেবেন্দ্রনাথ চির-কাল মত-স্বীকার অপেক্ষা জীবনে পালনীয় সংকল্প-স্বীকারকে অধিক প্রাধান্য দিয়া আসিয়াছেন।

সারা জীবনের জন্য কতকগুলি বিধি ও নিষেধাত্মক সংকল্পের দ্বারা আপনাকে বাঁধা,—এই অর্থে দেবেন্দ্রনাথ 'ধর্ম্ম' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়াই তিনি আত্মজীবনীতে (৩৭ পৃষ্ঠা) লিখিতেছেন, "পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজ ছিল, এখন ব্রাহ্মধর্ম্ম হইল। ব্রহ্ম ব্যতীত ধর্ম্ম থাকিতে পারে না। এবং ধর্ম্ম ব্যতীতও ব্রহ্মলাভ হয় না। ধর্ম্মেতে ব্রহ্মেতে নিত্য সংযোগ।" অর্থাৎ, যাঁহারা পূর্ব্বেই ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা এখন বুঝিলেন, তাঁহাদের ধর্ম্ম কি, এবং ঈশ্বরের জন্য তাঁহাদিগকে কিরূপ ধর্ম্মনিয়মে আপনাদিগকে বাঁধিতে হইবে। এবং ঈশ্বরকে লইয়াই ধর্ম্ম, ("ব্রহ্ম ব্যতীত ধর্ম্ম থাকিতে পারে না") ইহা সত্য বটে; কিন্তু ধর্ম্ম দিয়া অর্থাৎ সংকল্পের বাঁধন দিয়া আপনাকে না বাঁধিলে কেহ ঈশ্বরকে পায় না, ("ধর্ম্ম ব্যতীতও ব্রহ্মলাভ হয় না")।

দেবেন্দ্রনাথের সময়েও কিছুকাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের কাগজপত্রে 'বেদান্ত-প্রতিপাদ্য সত্য ধর্ম্ম' এই দীর্ঘ নামটিই চলিয়া আসিতেছিল। ১৮৪৭ সালের ২৮শে মে (১৭৬৯ শকের ১৫ জ্যৈষ্ঠ) তত্ত্ববোধিনী সভার অধিবেশনে, "অতঃপর ঐ নামের পরিবর্ত্তে "ব্রাহ্মধর্ম্ম" নাম অবলম্বন করা হইবে" এরূপ নির্দ্ধারিত হয়।

মেদিনীপুর-জলপ্লাবনে আমাদের কর্ত্তব্য।

ক্ষুধিতের অন্নদান সেবা
তোমরা লইবে বল কে বা?

শ্রাবস্তীনগর দুর্ভিক্ষের কবলে প্রপীড়িত; লোকের মুখে অন্ন নাই; বড় বড় শেঠ্‌গণের ভাণ্ডারও আজ শূন্য; দেশে অজন্মা, চারিদিকে হাহাকার উঠিয়াছে। পুরুষশ্রেষ্ঠ দয়ার অবতার শাক্যসিংহের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল; যিনি জরা মরণ ও ব্যাধি-জনিত মানবের দুঃখ দেখিয়া প্রাণে মর্ম্মন্তুদ বেদনা অনুভব করিয়াছিলেন, এবং সেই দুঃখ নিবারণের কোনও পন্থা আছে কি না তাহা জানিবার জন্য, অতুল রাজ্যৈশ্বর্য্য, স্নেহময় পিতা, প্রাণের প্রতিমা ভার্য্যা, প্রাণপ্রতিম নবজাত পুত্র পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর প্রাণ কি এই দৃশ্য দেখে না কাঁদিয়া পারে? তিনি তাঁর শিষ্যবর্গকে আহ্বান করিলেন; ধনী নির্ধন, জ্ঞানী মান্য, সকলেই এসে শ্রীবুদ্ধদেবের আহ্বানে উপস্থিত। বুদ্ধদেব করুণ দৃষ্টিতে চাহিলেন; তাঁর দৃষ্টিতে প্রেম—তাঁর চাহনিতে বেদনা, লোকের হাহাকারে তাঁর প্রাণ কাতর। তিনি ডাকিয়া বলিলেন—

ক্ষুধিতের অন্নদান সেবা
তোমরা লইবে বল কে বা?

বার বার তিনি এই কথা বলেন, আর কাতর নয়নে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করেন—আজ ত কেহ সাড়া দেয় না! ধনিগণ, শ্রেষ্ঠিগণ, সকলেই ত উপস্থিত; জয় সেন প্রভৃতি শ্রেষ্টিগণ নীরবে অধোবদনে রহিলেন। বুদ্ধদেবের বার বার আহ্বানে উঠিয়া একে একে বলিলেন, "প্রভু, আজ ত আমাদের ভাণ্ডার শস্য-শূন্য, এই নগরের অন্ন দিবার ভার, ক্ষুধিতের ক্ষুধানিবারণের ভার, আমরা ত লইতে পারি না।" একে একে শ্রেষ্টিগণ যখন নীরব হইলেন; কেহ আর কথা বলে না,—করুণার অবতার বুদ্ধদেব করুণ নেত্রে তাকাইতেছেন—

বুদ্ধের করুণ আঁখি দুটি
সন্ধ্যা তারা সম উঠে ফুটি।
তখন উঠিল ধীরে ধীরে,
রক্ত-ভাল লাজ-নম্র শিরে,
অনাথপিণ্ড-সুতা, বেদনায় অশ্রুপ্লুতা;
বুদ্ধের চরণ-রেণু ল'য়ে,
মধু-কণ্ঠে কহিল বিনয়ে,
ভিক্ষুণীর অধম সুপ্রিয়া
তব আজ্ঞা লইল বহিয়া,
কাঁদে যারা খাদ্যহারা, আমার সন্তান তারা,
নগরীরে অন্ন বিলাবার
আমি আজ লইলাম ভার।

ভিক্ষুণী সুপ্রিয়া বলিলেন নগরের ক্ষুধানিবারণের ভার আমিই

বিগত ২৯শে আগষ্ট সায়ংকালীন উপাসনান্তে শ্রীযুক্ত ললিত-মোহন দাস কর্ত্তৃক বিবৃত।

গ্রহণ করিব। সকলে ত অবাক্—তুমি যে ভিক্ষুকন্যা, ভিক্ষুণী! যে কাজের ভার এই শ্রেষ্ঠিগণ গ্রহণ করিতে অসমর্থ, সে ভার তুমি বহন করিবে কি রূপে? তোমার যে কিছুই নাই।

বিস্ময় মানিল সবে শুনি'
ভিক্ষু-কন্যা তুমি যে ভিক্ষুণী,
কোন অহঙ্কারে মাতি', লইলে মস্তক পাতি',
এ হেন কঠিন গুরু কাজ?
কি আছে তোমার কহ আজ?

সুপ্রিয়া বলিলেন, আমার এই ভিক্ষা-পাত্র ছাড়া আর কিছুই নাই, আমার যাহা কিছু তোমাদের ঘরে, আমি এই ভিক্ষাপাত্র ল'য়ে দ্বারে দ্বারে যাব—তোমরাই এই ভিক্ষা-পাত্র পূর্ণ ক'রে দিবে—তাহাতে নগরের ক্ষুধা নিবারণ করিব।

কহিল সে নমি' সবা কাছে,
শুধু এই ভিক্ষা-পাত্র আছে।
আমি দীন হীন মেয়ে, অক্ষম সবার চেয়ে,
তাই তোমাদের পাব দয়া
প্রভু আজ্ঞা লইব বিজয়া।
আমার ভাণ্ডার আছে ভ'রে, তোমা সবাকার ঘরে ঘরে,
তোমরা চাহিলে সবে
এ পাত্র অক্ষয় হবে;
ভিক্ষা-অন্নে বাঁচাব বসুধা, মিটাইব দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা।

আজও মেদিনীপুর হইতে ক্রন্দনের রোল উঠেছে; প্রায় ৬০০ শত বর্গ মাইল পরিমিত স্থান জলপ্লাবনে প্লাবিত, ৫ লক্ষ লোক, গরু বাছুর, গৃহশূন্য, অন্নবস্ত্রহীন; আজ তারা বাঁধের উপর, আকাশতলে দিন রাত কাটাতেছে, ছেলেদের দুধ দিতে পারিতেছে না। আজ তাদের ক্রন্দনধ্বনি আমাদের কর্ণে এসে পৌঁছিয়াছে, আজ যেন ভগবান আমাদিগকে ডেকে বল্‌ছেন—ওগো

ক্ষুধিতের অন্নদান সেবা
তোমরা লইবে বল কে বা?

আমাদের ভিতরে কি ভিক্ষুণী সুপ্রিয়া কেহ নাই যে বলিতে পারে—

কাঁদে যারা খাদ্যহারা আমার সন্তান তারা
নগরীরে অন্ন বিলাবার
আমি আজ লইলাম ভার।

আমরা কি বলিতে পারি না, গরীব দুঃখী আমরা, আমরা এই ভিক্ষা-পাত্র ল'য়ে মেদিনীপুরের নিরন্ন, নিরাশ্রয়, বস্ত্রহীন লোকের দুঃখবিমোচনের ভার গ্রহণ করিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা-পাত্রহস্তে গমন ক'রে, ভিক্ষালব্ধ অর্থ, তণ্ডুল, বস্ত্র দ্বারা তাহাদের কষ্ট লাঘব করিব?

আমরা বলি ধন-ধান্য-ভরা, মলয়জ-শীতলা, শস্য-শ্যামলা এই বঙ্গদেশ। কিন্তু বর্ত্তমানে এই বঙ্গদেশে উপদ্রবের অন্ত নাই। দুঃখ দারিদ্র্য ত লাগিয়াই আছে। ম্যালেরিয়া, কালা-জ্বর, বসন্ত, কলেরাতে মানুষ ত দিন দিন ক্ষীণ হ'য়ে পড়িতেছে। গৃহে অন্ন নাই, পানীয় জল নাই। তার উপর প্রায় প্রতি বৎসরই এক স্থানে না এক স্থানে দৈব দুর্ব্বিপাক ঘটিয়া থাকে,—কোথাও অতিবৃষ্টি, কোথাও অনাবৃষ্টি, কোথাও ঝড় ঝঞ্ঝাবাত, কোথাও দুর্ভিক্ষ, কোথাও জলপ্লাবন, কোথাও ভূমিকম্প—এই কয়েক বৎসরের মধ্যে কত বিপদ্‌পাত দেশের উপর দিয়ে গেল! ১৮৯৭ সালে ভীষণ ভূমিকম্পে উত্তর বঙ্গ, ময়মনসিংহ ও আসামের কি দুর্দ্দশাই হইল! ১৯০৬ সালে বরিশালে ও ফরিদপুরে কি ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল! তার পর বর্দ্ধমানের প্রবল জলপ্লাবন, পূর্ব্ববঙ্গের ভীষণ বাত্যা, কুমিল্লা অঞ্চলে জলপ্লাবন, উত্তরবঙ্গে ভীষণ জলপ্লাবন, বাঁকুড়া অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ। এক বিপদ্‌পাতের ধাক্কা সামলাইতে না সামলাইতে আর এক বিপদ্ এসে উপস্থিত! মানুষ একেই তো অন্নাভাবে জীর্ণ, চিন্তাজ্বরে শীর্ণ, রোগে মহামারীতে কাতর, তার উপর এই দৈব দুর্ব্বিপাকের মধ্যে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে। সুখের বিষয় এই, বর্ত্তমান সময়ে দেশবাসীর প্রাণে দেশাত্মবোধ জাগ্রত হইয়াছে। অতি পূর্ব্বে, ১২৮৩ সালে, বরিশাল জেলার দৌলত খাঁ অঞ্চলে যখন এক রাত্রিতে হঠাৎ বান ডাকিয়া ১৪ হস্ত জল গ্রামে গ্রামে ছাইয়া পড়িল এবং মানুষ গরু, ঘর দরজা, সব ভাসাইয়া লইয়া গেল, তখন দেশবাসীর প্রাণে দেশাত্মবোধ জাগে নাই। তখন গবর্ণমেণ্টই অগ্রসর হইয়া যথাসম্ভব সাহায্য করিতেন। এ বিষয়ে দেশবাসীর যে কোনও কর্ত্তব্য আছে, সে ধারণাই লোকের মনে জন্মে নাই। ক্রমে আমাদেরও যে কর্ত্তব্য আছে, আমরাও যে অনেক পরিমাণে সাহায্য করিতে পারি, এ ধারণা জন্মিল। ব্রাহ্মসমাজই প্রথমে এই ভাবে দেশসেবায় অগ্রসর হইলেন। একবার উড়িষ্যা অঞ্চলে প্রবল দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, ব্রাহ্মসমাজ হইতে সেখানে সাহায্যের ব্যবস্থা করা হইল। সুদূর মধ্যপ্রদেশে দুর্ভিক্ষ হয়, আমরা অনেকে ব্রাহ্মসমাজ হইতে সেখানে যাইয়া সাহায্য-কেন্দ্র খুলি। রাজপুতনা অঞ্চলে, যুক্তপ্রদেশে, দুর্ভিক্ষে ব্রাহ্মসমাজ সাহায্যের বন্দোবস্ত করিয়াছেন। কুমিল্লা-ব্রাহ্মণ-বাড়িয়া-জলপ্লাবনে, বরিশাল-ফরিদপুর-দুর্ভিক্ষে, খুলনা দুর্ভিক্ষে, উত্তরবঙ্গ জলপ্লাবনে ব্রাহ্মসমাজ হইতে যথাসম্ভব সাহায্য করা হইয়াছে। বর্দ্ধমান জলপ্লাবনেও কাঁথি অঞ্চল জলে ভাসিয়া যায়। তখন ব্রাহ্মসমাজ হইতে স্বতন্ত্র ভাবে সাহায্যের ব্যবস্থা না হইলেও, ব্রাহ্মগণই অগ্রণী হইয়া Central organisation এর নামে নানা স্থানে কার্য্য করিয়াছিলেন। এখন সুখের বিষয় দেশে বিপৎপাতের সময় সকলেই সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। রামকৃষ্ণ-মিশন ত সেবাকার্য্যকে বিশেষ ভাবে আপনার কাজ বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। খুলনা দুর্ভিক্ষে, উত্তরবঙ্গ জলপ্লাবনে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের নায়কত্বে অর্থ-সংগ্রহ হইয়াছে—কত স্থানে সাহায্য-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। দেশের লোক যে দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট বন্যাপীড়িত দেশবাসীর সাহায্যের জন্য মুক্তহস্ত হইতেছেন, যুবকগণ যে সেবাকার্য্যে ব্রতী হইয়া অশেষ ক্লেশ সহ্য করিতে প্রস্তুত হইতেছেন, দেশবাসিগণ যে একযোগে কার্য্য করিতে পারিতেছেন, ইহা খুব আনন্দের কথা। এই সকল সেবার কাজ দেখিলে, এই দুঃখের ভিতরেও, অশ্রু-জলের ভিতরেও, প্রাণে আনন্দের ও আশার সঞ্চার হয়।

এই উত্তর বঙ্গে প্লাবনজনিত দুঃখ কষ্টের অবসান হইতে

না হইতেই আজ আবার মেদিনীপুর হ'তে করুণ ক্রন্দন-ধ্বনি শোনা যাইতেছে। মেদিনীপুরের ৫টি মহকুমার মধ্যে ৪টি মহকুমাই বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ঐ সব অঞ্চলে বড় বড় বাঁধ আছে; সেই সকল বাঁধ ভাঙ্গিয়া জল রাশি দেশ জনপদ ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। এই জল নিঃসারিত হইয়া যাইবার সুবিধা পাইতেছে না। মানুষ কি দুরবস্থায় আছে, তাহা বর্ণনা করা যায় না। সেদিন ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট হলে যে মেদিনীপুরের সাহায্যার্থে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে সভা হয়, তাহাতে যে টেলিগ্রাম পড়া হয় তার মর্ম্ম এই:—

"কাঁথি কংগ্রেস কমিটির সভাপতি জানাইতেছেন, কাঁথি মহকুমার ৪০০ বর্গ মাইল পরিমিত স্থান ৭ফুট জলের নীচে, রাস্তা ঘাট নাই, ৫০ হাজারের অধিক গৃহ পড়িয়া গিয়াছে; আড়াই লক্ষ লোক দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে। গবাদি পশুর ঘাস নাই, চরিবার স্থান নাই। বাহির হইতে নৌকা যোগে খাদ্য ও ঘাস সরবরাহের প্রয়োজন; নতুবা অনেক জীবন নষ্ট হইবার আশঙ্কা আছে। ১৯১৩ সালের জলপ্লাবনে যতটা জল উঠেছিল তাহা অপেক্ষা ৪ ফুট জল বেশী হইয়াছে। দয়া ক'রে লোক ও খাদ্য লইয়া এস।"

সাহায্য কমিটির সভাপতি, ব্যবস্থাপক সভার সভ্য শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মাইতি তার করিয়াছেন—আপনাদের দয়াপূর্ণ মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। তমলুক বিশেষতঃ নন্দীগ্রামের দুর্দ্দশার কথা কাগজে দেখিবেন। অধিকাংশ গৃহই ভূমিসাৎ হইয়াছে, অনেক জীবন নষ্ট হইয়াছে; দুর্দ্দশাগ্রস্ত লোকদিগকে আশ্রয় দেওয়া অসম্ভব হইয়াছে। সাহায্যের জন্য লোক ও অর্থ এখনই প্রয়োজন।

২৬এ আগষ্ট তারিখের 'দৈনিক নায়ক' পত্রিকায় মেদিনীপুর জেলার জলপ্লাবনের অবস্থা বর্ণনা করিয়া ঐ পত্রিকার নিজস্ব প্রতিনিধি যে বিবরণ দিয়াছেন তাহার কতকাংশ পাঠ করিতেছি। ইহা হইতেই অবস্থা বুঝিতে পারিবেন। প্রায় ৬০০ বর্গ মাইল স্থানে প্রায় ৫ লক্ষ লোক কষ্টে পড়িয়াছে। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ শাসমল বলিয়াছেন এই সকল লোককে ১৬মাস অল্পাধিক পরিমাণে সাহায্য করিতে হইবে; কারণ, এবারকার শস্য নষ্ট হইয়াছে। আগামী আষাঢ় মাসে যে শস্য বপন করা হইবে, তাহা কাটা হইবে পৌষ মাসে। সুতরাং এই ষোল মাস এদের সাহায্য করা প্রয়োজন হইবে। তাহাতে লক্ষাধিক টাকার প্রয়োজন হইবে। দৈনিক নায়কের নিজস্ব প্রতিনিধি লিখিয়াছেন:—

"মেদিনীপুর জেলায় মোট পাঁচটী মহকুমা। তন্মধ্যে কাঁথি, তমলুক, ঘাটাল ও সদর, এই চাঁরটী মহকুমা সর্ব্বগ্রাসী বন্যার কবলে নিপতিত হইয়া এখন যেরূপ ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল।

কাঁথি মহকুমা—আমগাছিয়া বাঙ্গলার কাছে কেলেঘাই নদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া ভগবানপুর থানার ও পটাশপুর থানার মোট প্রায় চারি শত গ্রাম বন্যার জলে ডুবিয়া গিয়াছে। এই সকল স্থানের জল ক্রমশঃই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, কমিতেছে না। ছোটনাগপুরে বারিপাতের দরুণই উক্ত নদীর জল ফাঁপিয়া উঠিতেছে ও তৎফলে এই স্থানে জলের চাপ বাড়িতেছে। এই বন্যার ফলে এগরা থানার ধাটুয়া প্রভৃতি ৩০টী গ্রাম জলমগ্ন হইয়াছে। এই বন্যার জল কাঁথির দিকে প্রবাহিত হইয়া কাঁথির সংরক্তলি পর্য্যন্ত গিয়া পৌছিয়াছে। খেজুরী থানার প্রায় অর্দ্ধেক গ্রামও জলমগ্ন হইয়াছে। হিসাবে দেখা যায় কাঁথি মহকুমার প্রায় চারি পঞ্চমাংশ স্থান জলমগ্ন। এই সকল স্থানের দুরবস্থা অবর্ণনীয়। প্রায় অধিকাংশ গ্রামের শতকরা ২৫ খানি গৃহ ইতিমধ্যে জলশায়ী হইয়াছে। বাকী গুলি এরূপ অবস্থায় আসিয়াছে যে অতি শীঘ্রই সেগুলি জলশায়ী হইবে। ভগবানপুর ও পটাশপুরে গৃহের পতনে অনেকগুলি লোক মারা গিয়াছে। পটাশপুর থানার উত্তরাড়িগ্রামে দুইটী মাত্র গৃহের পতনে ২২ জন লোক মারা গিয়াছে। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, গরু ছাগল প্রভৃতি গৃহপালিত পশুগুলির অধিকাংশই মারা গিয়াছে। যেগুলি উচ্চস্থানে সরাইয়া ফেলিতে পারা গিয়াছে, সেইগুলি না খাইয়া কোনরূপে প্রাণ ধারণ করিতেছে। গ্রামের শতকরা ৪০।৫০ ঘরে ধান ছিল না। আর যাহাদের ধান ছিল, তাহাদের ধান হয় ভাসিয়া গিয়াছে, নয় জলে পড়িয়া পচিয়াছে। যাহাদের মরাই উচ্চে বা যাহারা অতি কষ্টে ধান্য রক্ষা করিয়াছে, তাহারা ঢেকী ও স্থানের অভাবে ধান ভানিতে পারিতেছে না। দুই জন স্ত্রীলোক কেনেল পাড়ে প্রকাশ্য স্থানে সন্তান প্রসব করিতে বাধ্য হইয়াছে। কালী নগরের কেনেলের গেট খোলা সত্ত্বেও জলের চাপ বিশেষ কমিতেছে না।

তমলুক মহকুমার মধ্যে নন্দিগ্রাম থানার প্রায় ১০০ গ্রাম সর্ব্বাপেক্ষা বিপদগ্রস্ত। এই সকল গ্রামের লোক ঘরের মায়া ত্যাগ করিয়া ঘর ছাড়িয়া যাইতেছে না—ঘরে বসিয়া সর্ব্বদাই মৃত্যুর আশঙ্কায় শঙ্কিত হইয়া দিন কাটাইতেছে। এই সকল স্থানেও ঘরচাপা হইয়া লোক মারা যাইতেছে। তেরাপেন্যা নদীতে দুইটী মহিলার শবদেহ ভাসিয়া যাইতে দেখা গিয়াছে—একজনের হাতে একটী বৃক্ষের ডাল আবদ্ধ ও অন্য জনের শরীরে অলঙ্কার আছে। গরু বাছুর ভাসিয়া যাইতেছে। পিঙ্গলার দক্ষিণ পূর্ব্বদিকের ২২ খানি গ্রাম ডুবিয়া গিয়াছে; এই সকল স্থানে ৭ ফিট হইতে ১১ ফিট পর্য্যন্ত জল হইয়াছে। প্রায় ৭০ খানি গ্রামে অতি সত্বর নৌকার সাহায্য ও খাদ্য দ্রব্য ও ঔষধের সাহায্য প্রয়োজন। বন্যার জল খাইয়া ও যথেচ্ছা মাছ শাক খাইয়া, লোক জ্বর পেটের ব্যারাম প্রভৃতি নানা রোগে কষ্ট পাইতে আরম্ভ করিয়াছে। ঘাটাল হইতে জল আসিয়া পাঁশকুড়া থানার কতকাংশ ভাসাইয়া দিয়াছে।

ধাগুলী চক মন্দিরের নিকট হলদী নদীর ভেড়ী বাঁধ এত খারাপ অবস্থায় আছে যে দেশের অধিবাসিগণ সশঙ্কিত ভাবে গাছ পাথর টিন লইয়া কোনরূপে বাঁধ রক্ষা করিতেছে।

এই মহকুমার মধ্যে তমলুক থানা, মহিষাদল থানা ও নন্দীগ্রাম থানার অবশিষ্ট অংশে অতি বৃষ্টির জন্য অধিকাংশ জমি পতিত পড়িয়াছে। কেবল মাত্র উচ্চ জমি অতি সামান্যই আবাদ হইয়াছে। এই সকল স্থানে যে সকল লোকের ঘর, নিম্ন ভূমিতে তাহাদের দুরবস্থার অন্ত নাই। যাহাদের ঘরে অন্ন নাই, তাহারা প্রতিবেশীর নিকট কোন প্রকারের সাহায্য পাইতেছে না।

ঘাটাল মহকুমা—তাঁসাই নদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া এই মহকুমায়

বন্যা হইয়াছিল। কিন্তু বন্যার জল গোপনে বাঁধ কাটাইয়া পাঁশকুড়া থানায় ও রূপনারায়ণ নদীতে চালাইয়া দেওয়ায় এই স্থানে বন্যার প্রকোপ কমিয়া আসিয়াছে। তাহা হইলেও এই সকল স্থানে সাহায্য আবশ্যক।

সদর মহকুমার মধ্যে সবঙ্গ থানাই অধিক বিপদ্গ্রস্ত। এই থানার প্রায় এক তৃতীয়াংশ গ্রাম বন্যার কবলে নিপতিত। ৭০ খানি গ্রাম বন্যার জলে বিশেষ বিপদ্গ্রস্ত হইয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে জল একটু কমিয়া যাওয়ায় কিছুটা সুবিধা হইলেও, সাহায্য যে বিশেষ আবশ্যক তাহাতে সন্দেহ নাই।"

এই ত দেশের অবস্থা। কিন্তু সুখের বিষয় এই, জলপ্লাবনে দুঃস্থ লোকের করুণ ক্রন্দন এবং ভগবানের আহ্বানধ্বনি দেশবাসীর কর্ণে পৌঁছিয়েছে। সর্ব্বাগ্রে রামকৃষ্ণ মিশন কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছেন। মেদিনীপুরের ডিঃ বোর্ড ও গবর্ণমেণ্ট সাহায্য করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। কংগ্রেস কমিটিসমূহও কার্য্যক্ষেত্রে লোক প্রেরণ করিয়াছেন। সেদিন আচার্য্য প্রফুল্ল-চন্দ্রের নেতৃত্বেও এক কমিটি গঠিত হইয়াছে; তাহারাও সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। উত্তর বঙ্গ জলপ্লাবনে প্রায় ৪।৫ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল; তাহা প্রায় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। তখনও এরূপ বৃহৎ আয়োজন সত্ত্বেও রামকৃষ্ণ মিশন এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে সেবাকার্য্যে ব্রতী হওয়ার প্রয়োজন হইয়াছিল। আজও মেদিনীপুরের করুণ ক্রন্দনধ্বনি এবং ভগবানের আহ্বান আমাদের কর্ণেও পৌঁছিয়াছে। তাই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতেও দুঃস্থ লোকের সাহায্য করিবার ব্যবস্থা হয়েছে। অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ বল এম্ এ কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক সঙ্গে লইয়া টাকা ও খাবার জিনিষ সহ কর্ম্মস্থলে গমন করিয়াছেন। অন্যান্য সেবকদলের সঙ্গে পরামর্শ করিয়াই কর্ম্মক্ষেত্র স্থির হইবে। এই পবিত্র সেবাকার্য্যে সকলেরই কাজ করিবার স্থান আছে। ঈশ্বর যখন আহ্বান করেন, কাতরের করুণ ক্রন্দন যখন কর্ণে পৌঁছায়, তখন কেহইত তাহাতে বধির থাকতে পারে না। পূর্ব্বে ত ব্রাহ্মসমাজই সকল সেবাকার্য্যে অগ্রণী হ'য়ে ব্যবস্থা করিতেন; অন্যলোক এসে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিত। এখন দেশবাসিগণের মধ্যে সেবার ভাব জাগ্রত হয়েছে। ভারতের এক প্রান্তে কোনও দুর্ভিক্ষ জলপ্লাবন, ভূমিকম্প হ'লে অন্য প্রান্তে তার প্রতিধ্বনি উঠে; দলে দলে যুবকগণ সেবার জন্য অগ্রসর হয়, লোক স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া অর্থ প্রদান করে, অর্থ সংগ্রহ করে। দেশে নব জাগরণ দেখা দিয়েছে। ইহা খুবই আনন্দের কথা। কিন্তু ব্রাহ্ম-সমাজকেও সেবাকার্য্য করিতে হইবে। সেবা যে আমাদের উপাসনার অঙ্গ।

তস্মিন্ প্রীতি স্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব—

ঈশ্বরে প্রীতি ও সেই প্রীতিপ্রেরণায় তাঁর প্রিয়কার্য্যসাধন —নর নারীর সেবা—ইহাই উপাসনা। ধ্যান ধারণা নাম কীর্ত্তন, প্রসঙ্গ, তাঁহাতে প্রীতি, প্রেম যোগ ভক্তি যেমন উপাসনার এক অঙ্গ, সেই প্রীতিপ্রেরণায় মানবসেবা, দুঃখ দৈন্য যেখানে সেখানে ক্লেশবিমোচনের চেষ্টাও যে উপাসনার অপরিহার্য্য অঙ্গ। ভগবান, ব্রহ্ম, যে সকলের মধ্যে বিদ্যমান্; ঐ দুঃখীর বেশে, শোকার্ত্তের বেশে, দুঃস্থের বেশে, উৎপীড়িতের বেশে ভগবানই যে এসে সেবা চাহেন! যীশু বলিয়াছেন, যাঁরা ঐ সামান্য দুঃস্থ লোককে ক্ষুধায় অন্ন, পিপাসায় জল, বিপদে আশ্রয় দেয়, তাহারা তাহাদ্বারা আমাকে সেবা করে। আর যারা দুঃস্থ লোককে সাহায্য করে না, তাহারা আমাকেই ক্ষুধায় অন্ন দেয় না, তৃষ্ণায় জল দেয় না, নিরাশ্রয় অবস্থায় সাহায্য করে না। ঐ যে মেদিনীপুরের বন্যাপীড়িত লোকের আকুল ক্রন্দন তাঁর ভিতরে কি ভগবানের বাণী শোন না? তার ভিতরে কি দেখ্‌তে পাও না, তিনি নিজে ভিখারীর বেশে তোমার আমার নিকট সেবা চাহিতেছেন? তাই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজও সেই ধ্বনি শু'নে সামান্য ভাবে সেবাব্রতে ব্রতী হইতে চাহিতেছেন। সেবাকার্য্য, যত সামান্য ভাবেই হউক, সকলেরই করিবার অধিকার আছে, কর্ত্তব্য আছে। তাই আজ মেদিনীপুরের আকুল আহ্বান তোমরা শোন; তার ভিতরে ঈশ্বর যে তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন, তাহা শোন। এই সেবাকার্য্যে লোকের প্রয়োজন; যাঁরা গিয়াছেন কর্ম্মক্ষেত্রে, তাঁদের হয়ত আরও লোকের প্রয়োজন হবে; তাঁরা ক্লান্ত হ'য়ে যখন পড়্‌বেন, তখন তাঁদের স্থানে অপর লোক প্রেরণ কর্‌তে হবে। এখানেও দ্বারে দ্বারে যেয়ে অর্থ বস্ত্র তণ্ডুল ভিক্ষা করিতে লোকের প্রয়োজন; লেখা পড়ার কাজের জন্যও লোকের প্রয়োজন। এই শুভকর্ম্মে অনেক অর্থের প্রয়োজন হবে। সকলকেই মুক্তহস্ত হ'তে হবে। আপনার বৃথা ব্যয় হ্রাস ক'রে অর্থ দিতে হইবে। কেবল ধনীরাই যে অর্থ দিবেন, তাহা নয়। তুমি আমি গরীব যারা, আমরাও ত কিছু দিতে পারি; অন্ততঃ অর্থ সংগ্রহ ক'রে দিতে পারি। আমরা যে গরীব, আমাদেরও বাজে খরচ কত! মনে রাখিও দিন ১টি পয়সা খরচ কমালে বৎসরে ৫ টাকা বাঁচান যায়; এবং তাহাতে একজন দুঃস্থ লোকের ১॥ মাস কোনও রকমে চলে।

ভাই বোন সকল, আমরা কি বাজে খরচ করি না? আমাদের মধ্যে কেহ কি এই সব রেষ্টুরেণ্টে যেয়ে অনর্থক অর্থ ব্যয় করে না? এই যে থিয়েটার বায়স্কোপ রজনীর পর রজনী পূর্ণ হয়, কে সেখানে যায়? আমাদের আহারে বিহারে, পোষাক পরিচ্ছদে কি একান্ত প্রয়োজনীয় যাহা তাহা অপেক্ষা বেশী ব্যয় করি না? প্রত্যেক মুহূর্ত্তে দুঃস্থ ভাই বোনদের স্মরণ কর, এক গ্রাস অন্ন যখন গ্রহণ করিবে, মনে করিও কত লোক এই এক গ্রাস অন্ন কতদিন পায় নাই। যখন রাত্রিতে শয়ন করিবে, মনে করিও কত ভাই ভগিনীর ঘর ভেসে গিয়াছে, বাঁধের উপর আকাশতলে অবিশ্রান্ত জলধারার মধ্যে বিনিদ্র রজনী এই বর্ষাকালে কাটাইতেছে। জননী যখন সন্তানকে স্তন্য পান করাবেন, তখন মনে রাখিবেন, কত জননী সন্তানকে দুগ্ধ হইতে বঞ্চিত রাখ্‌তে বাধ্য হইতেছেন। আর যখন কোথাও বিলাস সামগ্রী, অনাবশ্যক জিনিষ ক্রয় করিবে, যখন কোনও আমোদের জন্য অর্থ ব্যয় করিবে, যখন রেষ্টুরেণ্টে যেয়ে চপ কাটলেট আহারে প্রবৃত্ত হইবে, মনে করিও, তোমারই স্বদেশবাসী কত ভাই ভগিনী অনাহারে, অর্দ্ধাহারে আছে, এই

যে অনর্থক ব্যয় কর, ইহা দ্বারা তাহাদের অকাল মৃত্যু বন্ধ হ'তে পারিত। আজ শোন, দুঃস্থ নর নারীর করুণ ক্রন্দনের ভিতরে ঈশ্বরের আহ্বান শোন। তোমাকে আমাকে প্রত্যেককে সেবা-ব্রতে অগ্রসর হইবার তিনি অবসর দিতেছেন; তিনি আহ্বান করিতেছেন। তোমরা সে আহ্বানে বধির থাকিও না। শোন, কাণ পেতে শোন, তাঁর আহ্বান শু'নে কর্ম্মে অগ্রসর হও। একটা পয়সা হইলেও তাহা দ্বারা ভগবানেরই সেবা হইল। একটু অশ্রুপাত করিলে, তাদের জন্য ব্যাকুল প্রার্থনা করিলেও তাহা-দ্বারা তাহাদের একটু সেবা হইল। সেবাব্রত গ্রহণ যারা কর্‌বেন, তাদেরও বলি, তারা যেন ঈশ্বরে মন রেখে, তাঁর চরণে প্রার্থনা ক'রে, সেবাকার্য্যে ব্রতী হন। হায় রে, সেবা-কার্য্যে যেয়েও লোক আপনাকে বড় কর্‌তে চায়, আপনার দলকে বাড়াইয়া তুল্‌তে চায়, একে অন্যের নামে দোষারোপ করে! তারা সেবার নামে আত্মপ্রতিষ্ঠা অথবা স্বদলের প্রতিষ্ঠা চায়। এরূপ ভাব ল'য়ে সেবা কর্‌তে গেলে অপরাধ হয়। সেবাকার্য্যে জাতিভেদ নাই, ধর্ম্মভেদ নাই, সম্প্রদায়ভেদ নাই, দলভেদ নাই। সকল সেবাই ঈশ্বরের সেবা। ঈশ্বরের নামে তোমরা মিলিত হবে, ঈশ্বরের নামে অর্থ দিবে, অর্থ সংগ্রহ কর্‌বে, ঈশ্বরের নামে সেবাকার্য্যে অগ্রসর হবে। সকল কার্য্যে প্রার্থনা তোমাদের সম্বল। তাই আজ বলি, এই যে ডাক এসেছে, এই যে দুঃখ দুর্দ্দিনের ভিতর দিয়াও ভগবান্ আমাদিগকে সেবার সুযোগ দিতেছেন, আমাদিগকে ফুটিয়ে তুল্‌তে চাহিতেছেন, আমাদিগকে স্বার্থ ও জড়তা হ'তে জাগ্রত কর্‌তে চাহিতেছেন, আমাদিগকে নূতন দৃষ্টি, নূতন প্রাণ দিতে চাহিতেছেন, তাহা যেন ভুলে না যাই। যার যাহা সাধ্য তাহা প্রদান করুন; যে যে ভাবে পারেন, সেবাকার্য্যে ব্রতী হউন। আজ—

ক্ষুধিতের অন্নদান সেবা
তোমরা লইবে বল কে বা?

এই যে ভগবানের আহ্বান—ইহা শুনিয়া ব্রহ্মের নামে আমরা জাগ্রত হ'য়ে উঠি, তাঁর প্রেমে আমরা অনুপ্রাণিত হ'য়ে উঠি, আমরা ভিক্ষুকন্যা ভিক্ষুণী সুপ্রিয়ার ভাষাতে বলি;

ভিক্ষুণীর অধম সুপ্রিয়া
তব আজ্ঞা লইল বহিয়া,
কাঁদে যারা খাদ্যহারা, আমার সন্তান তারা,
নগরীরে অন্ন বিলাবার
আমি আজি লইলাম ভার।
আমার ভাণ্ডার আছে ভ'রে
তোমা সবাকার ঘরে ঘরে,
তোমরা চাহিলে সবে, এ পাত্র অক্ষয় হবে,
ভিক্ষা-অন্নে বাঁচাব বসুধা,
মিটাইব দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা।

আজ গাহিতে ইচ্ছা হয়—

যায় যাবে প্রাণ কি ভয় তাহাতে
জগতের সেবা কর রে।
প্রাণ দিলে প্রাণ পাবে রে।
কত নর নারী আছে অসহায়, রোগে শোকে অনাহারে প্রাণ যায়,
চোখের জল তাদের মিটাতে হায়,
মুখ তুলে কে বা চাহে রে।
বুকে আশা ল'য়ে, ব্রহ্মনাম গেয়ে
মার কাজে তোরা আয় রে আয়।

ব্রাহ্মসমাজ

মেদিনীপুর বন্যা-পীড়িতদের সাহায্য—কালীনগর লক গেইট হইতে এক মাইল দূরে এরিঞ্চি গ্রামে ব্রাহ্মসমাজের সাহায্য-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। জুখিয়া ও দেবীচক গ্রামে দুইটি উপকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। ইহাদের একটি খেজুরী, ও অপরটি ভগবানপুর থানার অধীন। ইহার মধ্যে মোট ২৫টী গ্রামে ১২,০০০ লোকের বাস। ২৮শে আগষ্ট প্রথম দল কার্য্য-ক্ষেত্রে পৌঁছিয়া প্রথম সপ্তাহে ২৪০০ লোককে সাহায্য প্রদান করেন। দ্বিতীয় দল ৫ই ও তৃতীয় দল ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে পৌঁছিয়াছে। এখন হইতে নিয়মিত সাহায্যের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থানীয় ভদ্রলোকেরাও কাজে সাহায্য করিতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত আশুতোষ মাইতি, শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ মাইতি ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনারায়ণ ভুঁঞার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখনও যথেষ্ট জল রহিয়াছে—রাস্তাসকল ব্যবহারোপযোগী হয় নাই। শস্য সমস্তই নষ্ট হইয়াছে। ভিক্ষুকগণ ভিক্ষা পায় না। মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকগণ অল্প মূল্যে জমি বিক্রয় বা দায়ে আবদ্ধ করিতেছেন। শতকরা ৫০ খানি ঘর একেবারে নষ্ট হইয়াছে। অবশিষ্ট ঘরেরও অধিকাংশ বিশেষ ভাবে মেরামত করিতে হইবে। ব্রাহ্মসমাজের কেন্দ্রে প্রতি সপ্তাহে ৪০০০ লোক সাহায্য পাইতেছে। ইহার জন্য প্রত্যেক সপ্তাহে ১৫০ মণ চাউল আবশ্যক। অন্ততঃ আরও দুই মাস এই ভাবে সাহায্য করিতে হইবে। চতুর্থ দল সেচ্ছাসেবক লইয়া ১০ই সেপ্টেম্বর শ্রীযুক্ত হরকুমার গুহ তথায় গিয়াছেন। কাঁথির শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রকুমার মাইতি তাঁহার সঙ্গে কাজ করিবেন। পূর্ব্ব সপ্তাহে ১৭ জন স্বেচ্ছাসেবক কার্য্য করিতেছিলেন। এ পর্য্যন্ত ২৩৯ মণ চাউল প্রেরিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী শাসমল কর্ম্মীদের ব্যবহারের জন্য একখানা নৌকা দিয়াছেন।

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে:—

গত ১৮ই জ্যৈষ্ঠ কাওড়াদির অন্তর্গত প্রসাদপুরগ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত হৃদয়চন্দ্র আচার্য্যের পুত্র শ্রীমান রমেশচন্দ্রের দুই বৎসর বয়সের একমাত্র শিশু পুত্রটী জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছে।

বিগত ৩রা সেপ্টেম্বর কলিকাতা নগরীতে শ্রীমান অমিয়কুমার চক্রবর্ত্তীর মাতা নীরদবালা দেবী বেরীবেরী রোগে হঠাৎ পরলোক গমন করিয়াছেন। বিগত ১৩ই সেপ্টেম্বর তাঁহার আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ৭ই সেপ্টেম্বর গিরিধি নগরীতে পরলোকগত কালী-প্রসন্ন দাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র কিরণ কুমার দীর্ঘকাল ক্ষয় রোগে ভুগিয়া ৩৬ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন।

বিগত ৯ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা নগরীতে ল্যাফটেনেন্ট কর্ণেল ধর্ম্মদাস বসু ৭৫ বৎসর বয়সে হৃদ্‌রোগে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি অতি ধর্ম্মপ্রাণ, সকলের শ্রদ্ধেয় লোক ছিলেন এবং নানা প্রকারে ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থাদিও অনেকের ধর্ম্মজীবন গঠনে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। তাঁহার পরলোকগমনে ব্রাহ্মসমাজ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

বিগত ২রা সেপ্টেম্বর কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত সুন্দরী মোহন দাসের পত্নীর আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ১লা সেপ্টেম্বর, ভাগলপুরে পরলোকগতা হেমাঙ্গিনী ঘোষের আদ্যশ্রাদ্ধ, তাঁহার পৌত্র শ্রীমান প্রদোষচন্দ্র ও দৌহিত্রগণ কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রেমসুন্দর বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন। কাঙ্গালীদের পয়সা দেওয়া হইয়াছিল এবং মেদিনীপুর বন্যা রিলিফ্ ফণ্ডে ৫৲ দান করা হইয়াছে।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চির শান্তিতে রাখুন ও আত্মীয় স্বজনদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

দান—শ্রীমতী শোভনা গুপ্ত মাতার বার্ষিক শ্রাদ্ধে প্রচার বিভাগে ১০৲ টাকা দান করিয়াছেন। মিসেস্ কে, মিত্র আত্মীয় স্বজনদের বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে জলপ্লাবন ফণ্ডে ১০৲ দান করিয়াছেন। এ দান সার্থক হউক এবং পরলোকগত আত্মাসকল চিরশান্তি লাভ করুন।

প্রচার—শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় কলিকাতা হইতে ৩০শে মে সিরাজগঞ্জ উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা সঙ্গীতাদি ও দুইটী ব্রাহ্ম পরিবারে পারিবারিক উপাসনা করেন। টাঙ্গাইল ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে গমন করিয়া দুই দিন মন্দিরে উপাসনা ও দুই দিন পাঠ ব্যাখ্যা করেন এবং একদিন বালক বালিকা উৎসবে উপদেশ দেন। বাথীল গ্রামে গমন করিয়া কয়েক দিন ব্রহ্মোপাসনা, একদিন কথকতা, একদিন বক্তৃতা, একদিন বালিকাদের পারিতোষিক-বিতরণ সভাতে বক্তৃতা ও সঙ্গীতাদি করিয়াছেন। দান্যাগ্রামে গমন করিয়া একদিন বক্তৃতা করেন। ঢাকা গমন করিয়া প্রায় তিন সপ্তাহ অবস্থিতি করিয়া পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে প্রাত্যহিক উপাসনায় ও সায়ংকালীন মন্দিরের উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য ও সঙ্গীত এবং পরিবারে পারিবারিক উপাসনা ও সঙ্গীতাদি করিয়াছেন। নারায়নগঞ্জ ব্রাহ্মসমাজে এক দিন গমন করিয়া আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। চট্টগ্রাম গমন করিয়া প্রায় এক মাস অবস্থিতি করিয়া প্রতি সপ্তাহে মন্দিরে আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। তিন দিন কথকতা দুই দিন বালক বালিকাদিগকে নীতিবিদ্যালয়ে উপদেশ দান করেন; মধ্যে মধ্যে, আলোচনা-সভাতে উপাসনা সঙ্গীত ও আলোচনা, করিয়াছেন। বাড়ীতে বাড়ীতে উপাসনা করিয়াছেন। পাহাড়তলী গমন করিয়া তথাকার রেলওয়ে ক্লাবে একদিন কথকতা করিয়াছেন। এবং মন্মথনাথ দাসের মাতার আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান উপলক্ষে আচার্য্যের কার্য্য করেন। আর একদিন পরলোকগত পূর্ণচন্দ্র সেনের শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান উপলক্ষে উপাসনা করেন। বালক বালিকাদের উৎসবে এক দিন উপদেশ দেন। পরিবারে পরিবারে গমন করিয়া উপাসনা ও সঙ্গীতাদি করেন। ব্রাহ্মণ বেড়িয়া উপাসনা-সমাজের উৎসবে গমন করিয়া দুই দিন মন্দিরে আচার্য্যের কার্য্য করেন। এক দিন কথকতা করেন, একদিন নৌকায় যাত্রা করিয়া নদীবক্ষে বন্ধু-বান্ধবদের সহিত মিলিত হইয়া ব্রহ্মোপাসনা সঙ্গীতাদি করেন রায় প্রসন্নকুমার দাস গুপ্ত বাহাদুরের মাতৃ দেবীর সমাধিস্থানে উপস্থিত হইয়া সঙ্গীত ও প্রার্থনা করেন। চাঁদপুর গমন করিয়া তথাকার মুন্সেফ শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রকুমার বিশ্বাসের বাড়ী অবস্থিতি করিয়া তিন দিন পারিবারিক উপাসনা ও দুই দিন কথকতা করেন। বরিশাল গমন করিয়া এক দিন প্রাতঃকালে মন্দিরে আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন।

বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ—শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী পূর্ব্ব হইতে একটু সুস্থ হইলেও এখনো হাটিতে চলিতে এবং বিশেষ কিছু করিতে সমর্থ নহেন। প্রাণের আগ্রহে অতি সাবধানতার সঙ্গে সাধারণ সাধারণ কার্য্য করিতেছেন—যদিও ইহা অনেক পরিমাণে নিষিদ্ধ। কবে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে পারিবেন বলা যায় না।

বিগত ১৩ই শ্রাবণ সায়ংকালে ব্রহ্মমন্দিরে ছাত্রসমাজের পক্ষ হইতে স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুদিনে এক সাধারণ সভা হয়। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী সভাপতির কার্য্য করেন। প্রথমে শ্রীমান কল্যাণকুমার চক্রবর্ত্তী একটী প্রবন্ধ পাঠ করিলে, একে একে শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস, বাবু শরৎ-কুমার সেন, মৌলবী মফিজুদ্দিন আহাম্মদ এবং শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন দাস বক্তৃতা করেন।

বিগত ২০শে আগষ্ট সায়ংকালে স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু মহোদয়ের স্মৃতিসভার অধিবেশনে মনোমোহন বাবু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বাবু শরৎকুমার সেন, অধ্যক্ষ সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং বাবু সুরেন্দ্রনাথ সেন বক্তৃতা করেন।

বিগত ২৩শে শ্রাবণ ছাত্রসমাজের এক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাসের সভাপতিত্বে শ্রীমান সুশীলকুমার বসু 'হিন্দুসংগঠন এবং ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ' বিষয়ে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন।

নিম্নলিখিত ভাবে বরিশাল ব্রাহ্মসমাজে ভাদ্রোৎসব সম্পন্ন হয়:—৪ঠা ভাদ্র সায়ংকালে একটি প্রসঙ্গ-সভা হয়। মনোমোহন বাবু সভাপতির কার্য্য করেন। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন দাস সামাজিক উপাসনা বিষয়ে একটি ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ উপস্থিত করেন। তৎপরে বাবু শ্রীচরণ সেন এবং অধ্যক্ষ সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই বিষয়ে কিছু কিছু বলেন। সভাপতির মন্তব্যান্তে কার্য্য শেষ হয়। ৫ই ভাদ্র প্রাতে এবং সায়ংকালে উপাসনা সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তনাদি হয়। প্রাতে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন দাস এবং সায়ংকালে সতীশ বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন। ৬ই ভাদ্র—উৎসবের বিশেষ দিন। প্রাতে অদ্য কল্যাণ কুটিরে (মনোমোহন বাবুর গৃহে) সঙ্কীর্ত্তন সঙ্গীত ও উপাসনাদি হয়। মনোমোহন বাবু উপাসনা, সতীশ বাবু আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা এবং বাবু তরণীকান্ত সেন ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান হইতে উপদেশ পাঠ করেন। অনেক নর নারী যোগদান করিয়া-ছিলেন। সামান্য মিষ্ট বিতরণে উৎসব শেষ হয়। সায়ংকালে মন্দিরে উপাসনা এবং সঙ্গীতাদি হয়। সতীশ বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ৭ই ভাদ্র সায়ংকালে অধ্যক্ষ সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে তাঁহার নব পুত্রবধূর সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষে সমাজস্থ বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়গণকে লইয়া একটী প্রীতিসম্মিলন হয়। মনোমোহন বাবু উপাসনা করেন। প্রীতিজলযোগে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

প্রায় ১৫ বৎসর যাবৎ কল্যাণকুটীরে প্রতি মঙ্গলবার প্রাতে নর নারীগণের সম্মিলনে উপাসনা, পাঠ ও সঙ্গীতাদি চলিয়া আসিতেছে। মনোমোহন বাবুর স্থানান্তর গমনে বৎসর কাল এই উপাসনা বন্ধ ছিল। প্রায় দুই মাস যাবৎ পুনরায় উপাসনার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। বন্ধুগণ বিভিন্ন দিনে উপাসনা করিয়া থাকেন।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় দ্বারা ১লা আশ্বিন মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—বরদাকান্ত বসু, বি-এ।

অসতো মা সদগময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৬ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৪৯ম ভাগ। ১২শ সংখ্যা। | ১৬ই আশ্বিন, রবিবার, ১৩৩৩, ১৮৪৮ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯৭ 3rd October, 1926. | প্রতি সংখ্যার মূল্য ৶০ অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

ব'লে দেও মোরে!

দিতে গিয়ে যে দিন ঘরে রিক্ত হ'য়ে আসি,
সে দিনও যে আমিই আমারে ভালবাসি!
সঞ্চয় কিছুই যার রহিছে না ঘরে,
বিলাইতে এ কি নেশা! দৈন্যের ভিতরে!
দৈন্যেরে বরিয়া বড় হারাইয়া যাওয়া,
হে অনন্ত! সে কি হয় তোমারেই পাওয়া?
আপনারে না মানিলে, না বাঁচা'লে হায়!
তোমার আসন আমি রচিব কোথায়?
তোমার সঙ্গে জীবন ভ'রে চলেছে কি খেলা!
বুঝিতেই হার মেনে যাই—কেটে যায় বেলা!
প্রাণাধার শক্তিমান্ তুমি জ্ঞানগুরু,
তোমাতে ভরসা আশা প্রেম-কল্পতরু!
তোমার আসন কোথায় হবে আমার ভিতরে,
কি রাখিব, বিলাইব, ব'লে দেও মোরে।

শ্রী মনোমোহন চক্রবর্ত্তী

হে চিরকল্যাণের প্রস্রবণ জীবনবিধাতা, তুমিই সকল বিশ্বের অদ্বিতীয় প্রভু ও কর্ত্তা হইয়া আমাদিগকে অনন্ত জীবনের পথে লইয়া যাইতেছ এবং যখন যে রূপ আবশ্যক ব্যবস্থা করিতেছ। জীবনের সুখ দুঃখ, জয় পরাজয়, উন্নতি অবনতি, সকলই তোমার এক মঙ্গলবিধানেরই অন্তর্গত। এক তোমাতেই জীবন ও উন্নতি, কল্যাণ ও সুখ, আর তোমা হইতে বিচ্যুতিতেই মৃত্যু ও অবনতি, অকল্যাণ ও দুঃখ। তাই দুঃখ দুর্গতির মধ্য দিয়া আমাদিগকে তোমারই পথে ফিরাইয়া লও, তোমারই দিকে আকর্ষণ কর, আমাদিগকে মোহনিদ্রায় অভিভূত হইয়া থাকিতে দেও না। যেমন ব্যক্তিগত জীবনে, তেমনি জাতীয় জীবনে, সর্ব্বত্র তোমার একই বিধি কার্য্য করিতেছে। তোমাকে ভুলিয়াই, অসার মিথ্যার মধ্যে মজিয়াই, আমাদের এই প্রিয় দেশ দীর্ঘকাল নানা প্রকার দুঃখ দুর্গতিতে নিমজ্জিত রহিয়াছে; ইহাদের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার জন্য বিবিধ চেষ্টা করিয়াও, মিথ্যার মোহ পরিত্যাগ করিতে না পারাতে, কোনও প্রকারেই উদ্ধার পাইতেছে না। এত দিন নানা অসার যুক্তি বিচার দ্বারা মিথ্যা কল্পনাকেই সত্য বলিয়া আঁকড়িয়া ধরিতে চেষ্টা করিতেছে, অথচ তোমার পথে চলিতেছে না, তোমাকে আশ্রয় করিতেছে না। এই জন্যই কিছুতে ইহার চৈতন্যোদয় হইতেছে না—দুঃখ দুর্গতিও দূর হইতেছে না। তুমি কৃপা করিয়া এ দেশের উদ্ধারের জন্য তোমার যে সত্য পথ প্রকাশিত করিলে, তাহা লোকে দেখিয়াও দেখিল না। যে পথ অনুসরণ করিয়া এ দেশ এক দিন উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল, তাহা কেহ ভাবিয়া দেখিল না! কেন যে আর উঠিতে পারিতেছে না তাহা কেহ বুঝিল না। মোহান্ধ বশতঃ আপনাদের পথে চলিয়া দুর্গতি হইতে দুর্গতিতেই যাইয়া উপস্থিত হইতেছে। হে করুণাময় পিতা, তুমি কৃপা করিয়া এই মোহ দূর না করিলে আর উপায় নাই। আমাদিগের উপর তুমি যে ভার অর্পণ করিয়াছিলে, তাহাও যে আমরা দুর্ব্বলতাবশতঃ উপযুক্ত রূপে বহন করিতে পারিতেছি না! হে দুর্ব্বলের বল, তুমি আমাদিগকে বল দেও, আমরা উৎসাহের সহিত তোমাকে অনুসরণ করি, তোমার সত্য-রাজ্য এ দেশে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, সকলকে তোমার দিকে টানিয়া, আমাদের জীবন সার্থক করি, সকলে কল্যাণ লাভ করি। তোমার মঙ্গল ইচ্ছাই সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হউক। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

নিবেদন।

"আছি সব স'য়ে তোমারি লাগিয়ে"—সংসারে অনেক অভিজ্ঞতা হলো—মিলন সম্ভোগ কর্‌লাম, অনেক সুখ পেলাম, আনন্দ পেলাম; আবার অনেক দুঃখ, অনেক বেদনা, অনেক উপেক্ষা সইলাম—সকল অবস্থাতেই তোমার দিকে তাকিয়ে আছি। এক এক সময় মন ভেঙ্গে পড়্‌ছে—মানুষ কত সময় কত নির্ম্মম হয়, একটু সহানুভূতির কথা বলিয়া, একটা মিষ্টি কথা দ্বারা তুষ্ট কর্‌তে চায় না! মানুষ কেবল ভালবাসা পেতেই চায়, দিতে জানে না। কত সময় ভাল বাস্‌তে যেয়ে, স্নেহ দিতে যেয়েও উপেক্ষা সহ্য কর্‌তে হয়! কত সময় মানুষের কল্যাণ কর্‌তে যেয়ে অপমান পেতে হয়! মানুষ বোঝার উপর বোঝা চাপায়—আমার আত্মকৃত বোঝা নয়, অপরে যে বোঝা বইবে, তাহাও চাপায়। যখন আর বইতে পারি না, তখনও একটু সাহায্য করে না, একটা সহানুভূতির কথা বলে না—বইতে পারি না ব'লে কত বিদ্রূপ করে! প্রভু আমার, প্রিয় আমার, সকলই তোমার পানে চেয়ে স'য়ে আছি। আনন্দ সম্ভোগ করেছি, দুঃখ বইতে পার্‌ব না? জানি আর কয় দিন পরে তোমার আনন্দসম্মিলনে সকল দুঃখের অবসান হবে, সকল অপমান, উপেক্ষা, অনাদরের শাস্তি হবে। তুমি যার সঙ্গে আছ, তার আর ভয় কি? তোমার জন্য সবই সইতে পারি, সবই বইতে পারি। তুমি আমার জীবনসর্ব্বস্ব।

রোগে—রোগে মানুষ অসমর্থ হয়—রোগের কত যন্ত্রণা! রোগে মানুষ চল্‌তে পারে না,—কাজ কর্ম্ম বন্ধ হ'য়ে যায়। কিন্তু এই রোগের মধ্যেই মানুষের আত্মদৃষ্টি খোলে—বাধ্য হ'য়ে মানুষ আপনার কথা ভাব্‌তে শেখে, ঈশ্বরের দিকে তাকাতে শেখে। রোগের মধ্যে কে বান্ধব, তা চেনা যায়; রোগে আপনার অসহায়তার মধ্যে বেদনা সইবার ক্ষমতা জন্মে। রোগের মধ্যে মানুষ অনন্যগতি হ'য়ে ভগবানকেই আশ্রয় করে। আর আশ্রয় নাই ব'লে তাঁর কাছেই প্রার্থনা জানায়, তাঁর বিষয় চিন্তা করে। রোগ মানুষকে দিব্যধামে ল'য়ে যায়, রোগ মানুষকে ছুটাছুটি হ'তে বিশ্রাম দেয়; রোগ মানুষকে একাকিত্বের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য বুঝিয়ে দেয়। রোগ মানুষকে নির্জ্জনতার ভিতরে সজনতা দেখিয়ে দেয়; বন্ধুহীনতার মধ্যে পরম বন্ধুকে চিনিয়ে দেয়; বেদনা ও যন্ত্রণার মধ্যে আনন্দের আভাস এনে দেয়। রোগ মানুষকে ইহলোকের বিচ্ছেদ ও উপেক্ষার মধ্যে পরলোকের মিলন ও আনন্দের উৎস খুলে দেয়। রোগ তাপ কল্যাণের হেতু, আনন্দময়ের সঙ্গে যোগের পথ।

আনন্দের গান—কোথা হ'তে থেকে থেকে যেন, একটা আনন্দের গানের সুর কাণে এসে পৌঁছায়। কোথা হ'তে আসে, কে গায়, কেন গায়, তা ত জানি না। ঝড়, ঝঞ্ঝাবাত, জলপ্লাবন, ভূমিকম্প, তার ভিতর হ'তে যেন কি এক মনভোলান সুর শুন্‌তে পাই। সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ, উত্তুঙ্গ পর্ব্বতমালা, নিবিড় মেঘাবলী, ঘন বনরাজী, তার ভিতরে কি এক অপূর্ব্ব সঙ্গীতলহরী যেন ভেসে আসে! দুঃখ দৈন্য, অপমান নির্য্যাতন, রোগ শোক, অনাদর উপেক্ষা—প্রাণ ভেঙ্গে পড়ে, মন দমে যায়। কত ক্রন্দন, কত হাহাকার—আর সইতে পারি না, অশ্রুজলে বক্ষ প্লাবিত হয়। তার মধ্যেও কোথা হ'তে, কোন্ অজানা লোক হ'তে যেন একটা মনোমোহন সুরের তান কাণে এসে পৌঁছায়। বল দেখি কোথা হ'তে এ সুর আসে? কে এ আনন্দ-গান গায়? কে এই ভাবে জগৎ মাতিয়ে তোলে! ঐ গান শুনেইত হাসিমুখে সংসারে চল্‌ছি; ঐ গান শুনেই নিরাশায় আশা, দুঃখে শান্তি, শোকে সান্ত্বনা পাচ্ছি, ঐ গান শুনেইত সকল বেদনা ভুলে যাচ্ছি। ঐ গান একটু তবে কাণ পেতে শুনি; ঐ গানের স্রোতে ভেসে যাই—তোমরা আমাকে ধ'রে রেখো না। আমি গানের দেশে যাব, গানের মধ্যে বাস কর্‌ব—ঐ আনন্দের গান আমার জীবনের উৎস।

সম্পাদকীয়

অধঃপতনের মূল কারণ—নানা দুঃখ দুর্গতিতে প্রপীড়িত আমাদের এই প্রিয় দেশকে অধঃপতনের চরম সীমায় উপনীত দেখিয়া অনেকেই বেদনার তপ্ত অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ জাতীয় উত্থানের বিবিধ কর্ম্ম-প্রচেষ্টা নব জাগরণের সূচনা করিতেছে ভাবিয়া, আশায় উৎফুল্ল হইয়াও উঠিতেছেন,—অচিরেই সকল দুঃখ দুর্গতি হইতে মুক্ত হইয়া দেশ দ্রুত উন্নতির উচ্চ সোপানে অধিরোহণ করিবে মনে করিতেছেন। অধিকাংশই স্ব স্ব ভাবের স্রোতেই ভাসিয়া বেড়ান—অল্প সংখ্যক তদনুযায়ী কর্ম্মচেষ্টায়ও নিযুক্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু এই জাতীয় অধঃপতনের মূল কারণ ও তন্নিবারণের প্রকৃষ্ট পন্থা, নব জীবন সঞ্চারদ্বারা দেশকে উন্নতির পথে লইয়া যাইবার অব্যর্থ উপায় সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করিয়া থাকেন, এরূপ বলা অত্যন্ত কঠিন। এরূপ অন্তরভেদীদৃষ্টিসম্পন্ন গভীরচিন্তানিরত লোক যে একান্ত বিরল, তাহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। দেশে যে চিন্তাশীল লোক নাই, কেহ যে দেশের অবস্থা ও তাহার উন্নতিসাধনের উপায় সম্বন্ধে মোটেই চিন্তা করে না, আমরা নিশ্চয়ই এরূপ কথা বলিতেছি না। চিন্তা হয়ত অনেকেই করেন। কিন্তু সে চিন্তা যে রোগের সাময়িক দুই একটা বাহিরের লক্ষণ ও তাহা দূরীকরণের উপায়নির্দ্ধারণ অতিক্রম করিয়া, রোগের বীজ সমূলে উৎপাটন করিতে যত্নপরায়ণ হয়, তাহার কোনই প্রমাণ নাই। দেশের যাঁহারা জননায়ক, দেশ-সেবায় যাঁহারা নিযুক্ত, যাঁহাদের নেতৃত্বাধীনে বহু লোক দেশের নানা কার্য্যে আপনাদিগকে উৎসর্গ করিতেছেন, তাঁহাদের কর্ম্ম-পদ্ধতি একটু সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ দ্বারা বিচার করিয়া দেখিলেই এই কথার সত্যতা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। প্রথম

দৃষ্টিতেই দেখা যায় ইহাদের কার্য্য প্রধানতঃ—একমাত্র বলিলেও বোধ হয় অন্যায় হইবে না—রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই আবদ্ধ। যদিও সামাজিক ও শিক্ষাবিষয়ক উন্নতিসাধন সম্বন্ধে নানা আয়োজনের কথা মাঝে মাঝে ইহাদের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, দুই একটি কার্য্যের সামান্য চেষ্টাও দৃষ্ট হইয়া থাকে, তথাপি তাহা যে নিতান্তই বাহিরের—অধিকাংশ স্থলে জগতের সম্মুখে কোনও প্রকারে নিজেদের মান বাঁচাইবারই জন্য, অথবা নিতান্ত দায়ে ঠেকিয়াই, করা হয়—মোটেই আন্তরিক নয়, সে কথা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। ইহারা অনেক সময় স্পষ্ট করিয়া বলিয়াও থাকেন যে, রাজনৈতিক পরাধীনতাই সামাজিক নৈতিক ও অন্য সকল প্রকার দুর্গতির মূল, রাজনৈতিক পরাধীনতা দূর হইলেই অপর সমস্ত দোষ ত্রুটি দুর্ব্বলতা আপনা হইতে দূর হইবে। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে এই রাজনৈতিক পরাধীনতা দূর করিবার জন্যই সমস্ত যত্ন চেষ্টা নিয়োগ করিতে হইবে—সাধু অসাধু যে কোনও উপায়ে তাহা লাভ করিতে হইবে। স্বাধীনতার অবশ্য-ম্ভাবী ফলরূপে যাহা সহজে আপনা হইতেই আসিবে তাহার জন্য এখন ব্যর্থ চেষ্টায় নিযুক্ত হইবার বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই। রাজনৈতিক পরাধীনতার আনুষঙ্গিক ফলরূপে যে জাতীয় চরিত্রে সহজেই অনেকগুলি দোষ ত্রুটি জন্মে এবং স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে অনেক সদ্‌গুণ ফুটিয়া উঠে, তাহাতে সন্দেহ করিবার বিশেষ কোনও কারণ নাই,—অনায়াসেই সে কথা স্বীকার করিয়া লওয়া যায়। সুতরাং সে বিচারে প্রবৃত্ত হইবার কোনই প্রয়োজন নাই। আর বর্ত্তমান পরাধীনতা বিদূরিত হইলেই স্বাধীনতা যথার্থতঃ লব্ধ হবে কি না, সে বিচারে প্রবৃত্ত হওয়াও অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া অনাবশ্যকই মনে করি। আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে তাহার বিশেষ কোনও সম্পর্ক নাই। যদিও সকল স্থলে তাহা ঘটে না, ঘটিবার কোনও অনতিক্রমণীয় হেতুও নাই, তথাপি তাহা এক্ষেত্রে ঘটিবে ধরিয়া লইলে, অথবা ঘটিবে না মনে করিলে বিশেষ কিছু আসে যায় না—মূল কথা, পরাধীনতা ও স্বাধীনতার ফল সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে সত্য থাকিলেও উহা সমগ্র সত্য নহে। একমাত্র পরাধীনতাই সকল দোষ দুর্ব্বলতার কারণ নহে, আর শুধু স্বাধীনতার ফলেই সকল সদ্‌গুণ, সকল প্রকার উন্নতি আপনা হইতে আসিয়া উপস্থিত হয় না। যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে কোনও স্বাধীন জাতি কখনও আর পরাধীন হইত না, অবনতিও প্রাপ্ত হইত না। আমাদের বর্ত্তমান দুর্গতি ও জাতীয় চরিত্রের দোষ ত্রুটির জন্য বহু শতাব্দীর পরাধীনতাকে যতই দায়ী করি না কেন, ভারতের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আমরা কিছুতেই বলিতে পারি না যে, ভারত চিরকালই পরাধীন ছিল, কখনও স্বাধীন ছিল না, অথবা জাতীয় চরিত্র আদি কাল হইতে এরূপই ছিল, কখনও উন্নত ছিল না, ইহার কোনও প্রকার অবনতি ঘটে নাই। বরং ইতিহাস ইহার বিপরীত কথাই বলে। আমরাও সেই কথা বলিয়াই গৌরব করিয়া থাকি। তাহা হইলেই প্রশ্ন উপস্থিত হয়, এরূপ হইল কেন? পরাধীনতা ও অধঃপতন ঘটিল কেন? সামান্য অনুসন্ধান করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, পরাধীনতা ও অধঃপতন কতক পরিমাণে পরস্পর পরস্পরের সহায়তা করিলেও, প্রধানতঃ পরাধীনতাকে অধঃপতনের কারণ না বলিয়া ফলই বলিতে হয়—জাতীয় চরিত্রের অবনতি হইতেই অবশ্যম্ভাবীরূপে পরাধীনতা আসিয়াছে। বাস্তবিক শুধু এই দেশের নয়, সকল দেশের ইতিহাসই এই সাক্ষ্য প্রদান করে—যখন জাতীয় চরিত্র হীন হইয়াছে, কোনও জাতি নানা দোষ দুর্ব্বলতাতে লিপ্ত হইয়াছে, তখনই ক্রমে ক্রমে পরাধীনতা আসিয়াছে, স্বাধীনতা হারাইতে হইয়াছে। আর যেখানেই চরিত্র উন্নত হইয়াছে, জাতীয় জীবনে প্রকৃত মনুষ্যত্ব দেখা দিয়াছে, সেখানেই অচিরে স্বাধীনতা আসিয়াছে—মহৎগুণ-সম্পন্ন জাতিকে কেহ কোন দিন দীর্ঘকাল পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখিতে পারে নাই। সুতরাং যাঁহারা মনে করেন লোকের জীবন ও চরিত্র যেরূপই হউক না কেন, কোনও ঐন্দ্রজালিক মন্ত্রবলে তাঁহারা শুধু রাজনৈতিক প্রচেষ্টার দ্বারা দেশকে স্বাধীন করিয়া তুলিবেন, তাঁহারা যে নিতান্তই ভ্রান্ত ও চিন্তাবিহীন, তাঁহাদের সে ব্যর্থ চেষ্টার ফল যে কোনও ক্রমেই কল্যাণকর নহে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। যাহা হউক, এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার কোনও প্রয়োজন নাই। তাহা আমাদের বর্ত্তমান উদ্দেশ্যের অন্তর্গত নহে। তাহার পর, ইহাদের অধিকাংশ তাঁহাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে পন্থা অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ইহাদের চিন্তাহীনতা আরও স্পষ্ট হইয়া উঠে। ইহারা সত্য ও নীতিকে পদদলিত করিয়া যে কোনও উপায়ে কার্য্যসিদ্ধি করিতে বিন্দুপরিমাণেও কুণ্ঠিত নহেন, একটা কল্পিত সোজা পথে গম্যস্থানে পৌছিতে ব্যস্ত, অসার বাগাড়ম্বর ও মিথ্যা চাতুরীজাল বিস্তার করিয়া জগতের চক্ষে ধূলী নিক্ষেপ করিয়া অনায়াসে জয়লাভ করিতে চেষ্টিত। ইহারা একবার ভাবিয়া দেখেন না এই উপায়ে লোককে প্রতারিত করা সম্ভবপর হইলেও—তাহাও নিশ্চয়ই অধিক দিন চলে না—বিশ্ববিধাতার অলঙ্ঘনীয় নিয়মকে কিছুতেই ঠকান যায় না। এই পথে যে কল্যাণ নাই, মহা অকল্যাণই রহিয়াছে, ইহা যে জাতিকে মিথ্যা প্রবঞ্চনা ও নীতিহীনতার পথে চালিত করিয়া অধিকতর দুর্গতি ও অধঃপতনের দিকে দ্রুত প্রধাবিত করিবে, তাহা কষ্ট কল্পনা করিয়া বুঝিতে হয় না—সামান্য একটু চিন্তা ও বিচার থাকিলেই পরিষ্কার রূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। কোন্ মোহে যে মানুষ এরূপ ভাবে মৃত্যু ও অকল্যাণকে স্বেচ্ছায় ডাকিয়া আনে তাহা বলা কঠিন—আর এ ক্ষেত্রে সে আলোচনার কোনও প্রয়োজনই নাই। রাজনৈতিক প্রশ্নের আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। যাহারা চাণক্যের পথকেই রাজনীতি-ক্ষেত্রে অবলম্বনীয় বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদিগকে তাঁহাদের ভ্রম দেখাইয়া দেওয়া আমাদের অদ্যকার আলোচনার উদ্দেশ্য নহে। আমরা জাতীয় অধঃপতনের মূল কারণ কোথায় তাহারই আলোচনা করিতে চাই। আমাদের

জাতীয় ইতিহাসের আলোচনা করিলে আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইব, ভারত যে দিন সত্য ন্যায় ও কল্যাণ হইতে, প্রকৃত ধর্ম্ম হইতে, বিচ্যুত হইয়াছে—সেই দিন হইতেই ইহার দুর্গতি আরম্ভ হইয়াছে, এবং এই গৌরবান্বিত জাতি ধীরে ধীরে মনুষ্যত্ব-বর্জ্জিত হইয়া স্বাধীনতা হারাইয়াছে, পরপদদলিত হইয়া নানা প্রকারে লাঞ্ছিত হইয়াছে। আরও একটু সূক্ষ্মভাবে অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, যে সত্যান্বেষণ ও সত্যনিষ্ঠাবলে একদিন ভারত উন্নতির গৌরবমণ্ডিত উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল সেই সত্যের পথ পরিত্যাগ করাতেই, এই মিথ্যা ও অসত্য, অসরলতা ও প্রবঞ্চনা, নানা দুর্নীতি ও কদাচার যখন ধর্ম্মজীবনে প্রবেশ করিয়া ধর্ম্মপ্রাণ ভারতের ধর্ম্মকেই কলুষিত ও বিষাক্ত করিয়া দিয়াছে, তখনই উহা দ্রুত বিনাশের পথে ধাবিত হইয়াছে—উহার মৃত্যু ঘটিয়াছে। ধর্ম্মই জীবনের মূল প্রস্রবণ, সকল শক্তি ও কার্য্যের উৎস। যদি অন্তরের অন্তরে প্রাণ ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত থাকে, মূল চরিত্রে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাধান্য থাকে, তাহা হইলে অপর কার্য্যক্ষেত্রে সাময়িক ভাবে সে পথ হইতে বিচলিত হইলেও তত অনিষ্ট হয় না, সহজেই আবার চৈতন্যোদয় হয়, ধর্ম্ম ও নীতির পথে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারা যায়। এই জন্যই দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা মূলে সত্য ও ন্যায়ে প্রতিষ্ঠিত তাহারা,' মোহবশতঃ কোনও কোনও বিষয়ে অন্যায় করিলেও, একেবারে বিনাশপ্রাপ্ত হয় না, তাহা সত্ত্বেও অনেক বিষয়ে সফলতা লাভ করিতে পারে। কিন্তু যেখানে ধর্ম্ম নাই অথবা ধর্ম্মের মূল কলুষিত, সেখানে আর কল্যাণ নাই। আমাদের মূল প্রস্রবণই বিষাক্ত হইয়াছে, তাই উহার ফলে জীবনের সকল অঙ্গে বিষ ছড়াইয়া পড়িয়াছে, সকলই মৃত্যুর কবলে কবলিত হইয়াছে; অথবা আমরা সমূলে পরিশুষ্ক হইয়াছি। সুতরাং আর জীবনের আশা কোথায়? অতি পুরাতন কালেই ঋষিগণও যে জানিয়া শুনিয়া বুঝিয়া মিথ্যার সঙ্গে সন্ধি করিয়া চলিতে কুণ্ঠিত হন নাই, জনসাধারণকে মিথ্যা ও কল্পনার হাতে অর্পণ করিয়া কেবল আপনারা সত্যের উচ্চ রাজ্যে বিচরণ করতঃ সন্তুষ্ট ছিলেন, তাহারই ফলে কালে মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার বীজ ক্রমে ক্রমে মহা মহীরূহে পরিণত হইয়া এ দেশের ধর্ম্মসৌধকে আচ্ছাদিত করিয়া একেবারে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিয়াছে। এখন আর সেই উন্নত মন্দিরের সামান্য কোনও অংশও অক্ষতভাবে দণ্ডায়মান নাই, সম্পূর্ণ রূপেই চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাহার সঙ্গে উহা নানা দুর্নীতিরূপ অসংখ্য হিংস্র জন্তুর আবাসস্থলে পরিণত হইয়াছে। সেই পুরাতন ধর্ম্মসৌধকে পুনর্নির্ম্মিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে তাহা কিছুতেই মানববাসের যোগ্য হইবে না। রাজর্ষি রামমোহন দিব্যদৃষ্টিতে ইহা স্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই তৎসাধনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং দেশের অবস্থা ভাবিয়া গভীর মর্ম্মবেদনায় সর্ব্বদা প্রপীড়িত ছিলেন,—কিছুতেই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন নাই। কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয় এখনও এ দেশের চৈতন্যোদয় হইল না। তাহারা প্রকৃত ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে ধর্ম্মের মিথ্যা খোসা লইয়া যে শুধু তৃপ্ত আছে তাহা নহে, তাহাকেই মনোহর বেশে সাজাইয়া আপনাকে ও অপরকে প্রবঞ্চিত করিতেও কুণ্ঠিত হইতেছে না। বর্ত্তমানে দেশে ধর্ম্ম নামে যাহা প্রচলিত, তাহাকে মিথ্যা ব্যাখ্যা ও যুক্তি তর্কের বলে একটু মনোহর বেশে লোকসমাজে উপস্থিত করিতেই অনেকে চেষ্টিত, সত্যের দৃঢ়ভূমির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে মোটেই যত্নশীল নহে। দেশে যে সকল ধর্ম্মান্দোলন দেখা যায়, তাহার দিকে একটু দৃষ্টিপাত করিলে ইহাই পরিষ্কার রূপে বুঝিতে পারা যায়। সকলে সত্যকে একই ভাবে দেখিবে তাহা আশা করা যায় না। মানুষ যে অনেক সময় ঠিক ভাবে সত্যকে বুঝিতে না পারিয়া ভ্রমে পতিত হইতে পারে, তাহাতেও সন্দেহ নাই। সুতরাং সকলেই একই মত ও পথ অনুসরণ করিবে তাহা মনে করা সঙ্গত হইবে না। আমরাও এরূপ কথা বলি না। যেখানে এক মাত্র সত্য ও কল্যাণই লক্ষ্য, প্রকৃত ধর্ম্ম ও নীতিই অন্বেষণীয় সেখানেও পার্থক্য থাকিতে পারে। সে পার্থক্যের কারণ যদি এক পক্ষের ভ্রমও হয়, তথাপি তাহাতে গুরুতর অকল্যাণ হয় না। আর অনেক সময় একই সত্যের বিভিন্ন দিক দেখিবার জন্যও পার্থক্য ঘটে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে যে উদার ভাবে বিরুদ্ধ জ্ঞান ও মতকে বা অনুষ্ঠানকে সম্মান করিতে হইবে, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ উদার ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মধ্যে সংকীর্ণতার স্থান নাই। আমরা এরূপ মত কখনও পোষণ করি না যে, আমাদের সঙ্গে অমিল হইলেই বুঝিতে হইবে, সেখানে সত্য লক্ষ্যস্থানে নাই। কিন্তু নিরপেক্ষভাবে একটু বিচার করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, অধিকাংশ ধর্ম্মান্দোলনের মূলে যথার্থই সরল সত্যানুসন্ধান ও সত্যপ্রতিষ্ঠা লক্ষ্যস্থানীয় নহে। সাংসারিক স্বার্থ-সিদ্ধিই ইহাদের প্রধান লক্ষ্য, তাহার জন্য সত্য ন্যায় ও কল্যাণকে পদদলিত করিতে ইহারা একটুকুও কুণ্ঠিত নহে। ইহার ফল যে কি প্রকার বিষময় হইতে পারে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়, বিস্তারিত করিয়া বলিবার কোনও প্রয়োজন নাই। ইহাই দেশের সকল প্রকার দুর্গতি ও অধঃপতনের মূল কারণ। মানুষ একবারও ভাবিয়া দেখে না যে, ধর্ম্মই যদি কলুষিত হইয়া যায় তবে তাহার আর উদ্ধারের কোনই সম্ভাবনা থাকে না। জীবনের মূল প্রস্রবণ যদি পবিত্র ও প্রাণপদ থাকে, তবে ক্রমে তাহার প্রভাব সর্ব্বাঙ্গে পরিব্যাপ্ত হইয়া অচিরে স্বাস্থ্য আনয়ন করিতে পারে, তাহাকে সতেজ ও সবল করিতে পারে। আর মূল বিষাক্ত হইলে, সে বিষের ক্রিয়া রুদ্ধ করা যায় না, তাহা নিশ্চয়ই মৃত্যু আনয়ন করিবে! এই সময় দেশে একটা ধর্ম্মের সাড়া পড়ে মনে করিয়া কেহ কেহ তৃপ্তি অনুভব করিতে পারেন; কিন্তু তাহার প্রকৃতি ও গতি লক্ষ্য করিলে আনন্দের পরিবর্ত্তে গভীর বিষাদেই প্রাণ অভিভূত হইবার কথা। পরিতাপের বিষয় আমরাও সেই অনুভূতি হারাইয়াছি, আমাদের হৃদয় আর সেরূপ বেদনায় প্রপীড়িত হয় না। যদি হইত তাহা হইলে এই প্রিয় দেশকে সেই মহা দুর্গতি ও অধঃপতন হইতে রক্ষা করিবার জন্য নিয়তই আমরা

অধিকতর চেষ্টা যত্ন করিতাম, আপনাদিগকে তন্নিবারণে নিযুক্ত করিতাম। সত্য ন্যায় ও পবিত্রতার রাজ্যকে নিজেদের জীবনেও অধিকতর সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আগ্রহান্বিত ও যত্নশীল হইতাম—কিছুতেই উদাসীন ও শিথিলপ্রযত্ন হইয়া জীবনকর্ত্তন করিতে পারিতাম না। এই সময়ে বিশেষ ভাবে আমাদের গুরুতর দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যের কথা আমরা স্মরণ করি এবং তৎপালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হই। করুণাময় পিতা আমাদিগকে সে শক্তি ও সংকল্প প্রদান করুন। তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছাই আমাদের জীবনে ও সমাজে, এই দুর্ভাগ্য দেশে, সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হউক। তাঁহার সত্য পবিত্র রাজ্য এখানে প্রতিষ্ঠিত হউক। তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

ঈশ্বরের আলোক

প্লেটোর রিপাব্লিক নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে একটি সুন্দর উপমা আছে। মঙ্গলের অস্তিত্ব ব্যতীত বিশ্বের কিছুই ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে না, এই কথা বুঝাইতে গিয়া সক্রেটিসের মুখে তিনি নিম্নোক্ত উপমাটি প্রকাশ করিয়াছেন। মানবের চক্ষু আছে এবং দর্শনীয় পদার্থসকলও রহিয়াছে, কিন্তু এই দুইটির সংযোগে কেহ দেখিতে পায় না। একটি তৃতীয় বিষয় আছে, যাহার অস্তিত্ব ব্যতীত দর্শনকার্য্য সম্পন্ন হয় না। সে বিষয়টি, আকাশে সূর্য্য উদিত হইয়া বিশ্বকে আলোকিত করিলে সকল বস্তু দৃষ্ট হয়। সেইরূপ আমাদের জানিবার শক্তি আছে, এবং জানিবার বিষয়ও অগণ্য রহিয়াছে; কিন্তু মঙ্গলের আলোকে সকল আলোকিত না দেখিলে, আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না। যাহাকে প্লেটো মঙ্গল বলিয়াছেন, আমরা তাঁহাকে মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বর বলিয়া থাকি।

বিষয়টি আমরা একটু ভিন্নভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিব। জীবনে এক একটি অবস্থা এমন আসে, যখন স্বচ্ছন্দ গতিতে আশা-পূর্ণ-হৃদয়ে যাহারা সংসারপথে চলিতেছিল, তাহাদের জীবন একেবারে তোলপাড় হইয়া যায়। স্বামী-স্ত্রী-পুত্র-কন্যা লইয়া সংসার রচিত। মানুষ মনে করিয়া থাকে এ অবস্থার আর পরিবর্ত্তন হইবে না। কিন্তু হঠাৎ স্বামী পরলোকে চলিয়া গেলেন, স্ত্রী আপনার জীবনকে শূন্য দেখিতে লাগিলেন; স্ত্রী চলিয়া গেলেন, স্বামীর সংসার ভাঙ্গিয়া গেল; সন্তান পর-লোকে গেল, পিতামাতা অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। কেহ সুস্থ শরীরে কর্ম্মক্ষম থাকিয়া সংসারের কর্ত্তব্যসকল সুচারু-রূপে নির্ব্বাহ করিবেন মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু হঠাৎ চিররুগ্ন হইয়া পড়াতে তাঁহার সকল আশা ভাঙ্গিয়া গেল। কেহ বা ব্যর্থতায় মুহ্যমান হইয়া পড়েন। এরূপ ঘটনা জগতে প্রতিনিয়ত দেখিতেছি। যে ধর্ম্ম শোকার্ত্ত আশাহত মানবকে আশার বাণী শুনাইয়া সঞ্জীবিত করিতে পারে এবং সকল শোক দুঃখ ও ব্যর্থতার রূপ পরিবর্ত্তন করিয়া জীবনের কল্যাণ সাধনের উপায় করিয়া দিতে পারে, তাহাই প্রকৃত ধর্ম্ম।

জগতে সান্ত্বনার অনেক উপদেশ রহিয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ উপদেশের মূল সূত্র দুইটি। জগতে দুঃখ শোক অবশ্যম্ভাবী, অতএব তাহা সহ্য কর; এবং জগৎ অর্থাৎ সুখ দুঃখ মোহ বা মিথ্যা, অতএব এই মিথ্যা জ্ঞান হইতে আপনাকে মুক্ত কর। কেহ বলেন জন্মান্তরের কর্ম্মফল অবশ্যম্ভাবী—তোমাকে তাহা ভোগ করিতেই হইবে। কিন্তু কোথায় সে অতীত কর্ম্ম, যাহার স্মৃতিমাত্রও অবশিষ্ট নাই? যদি পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম স্মরণে থাকিত, তাহা হইলে মনকে প্রবোধ দিতে পারিতাম, যেমন কর্ম্ম করিয়াছি তাহার উপযুক্ত ফল পাইলাম, এবং আমার ইহা পাওয়াই উচিত। হত্যাকারী আপন কৃতকর্ম্মে অনুতপ্ত হইয়া অম্লানচিত্তে ফাঁসিকাষ্ঠে আরোহণ করিতে পারে। কিন্তু জন্মান্তর-বাদে সে সান্ত্বনাও নাই। অপরে বলেন, সুখে দুঃখে সমান থাকিয়া দুঃখকে জয় কর; কারণ, সুখ দুঃখ, লাভ ক্ষতি আত্মার ধর্ম্ম নহে; তুমি কাজ করিতে আসিয়াছ, কাজ করিয়া যাও, আর কোন দিকে দেখিও না। মানব কেবল কর্ম্মক্ষেত্রের সম্বন্ধ ছাড়া সংসারের সহিত অপর সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে পারে; কিন্তু তাহাতে ভাবসম্পদচ্যুত হইয়া জীবন অসাড় হইয়া পড়ে। এ যেন মৃত্যুর দ্বারা সকল যন্ত্রণার অবসান। মহৎ বিষয়ে অন্তরে প্রীতি না থাকিলে, কর্ম্মও সুসাধিত হয় না। আর এক শ্রেণীর লোক সংসারের সহিত কর্ম্মবন্ধনও রাখেন নাই। তাঁহারা মনে করেন, সাংসারিক যতকিছু বস্তু আছে তাহা আত্মা হইতে এত ভিন্ন যে সুখ দুঃখ লাভ ক্ষতি একেবারেই আত্মসংস্পৃ নহে; কেবল মোহহেতু মানব এ সকল আত্মসংস্পৃষ্ট মনে করিয়া থাকে। এই মোহবিমুক্তিই দুঃখবিমুক্তি। এ কথার মূলেই ভ্রান্তি এবং কার্য্যকালে এরূপ সাধনশীল মানব সংসারবিরাগী অর্দ্ধ-মানবে পরিণত হন এবং বিশ্বসংসারে ঈশ্বরের লীলার বিষয়ে অন্ধতাবশতঃ ঈশ্বরের প্রকৃত জ্ঞানও লাভ করিতে পারেন না। এদিকে বৌদ্ধগণ দুঃখের কারণ বুঝিয়াছিলেন বাসনা এবং বাসনা-মুক্তিই দুঃখমুক্তির উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু পরিবার পরিজনের প্রতিপালনের জন্য যে বাসনা, তাহা ত দোষের নহে; সন্তানকে প্রতিপালন করিবার জন্য অন্তরে ঈশ্বর যে স্বতঃই স্নেহ দিয়াছেন, তাহাদ্বারা প্রণোদিত হইয়া মানব সন্তানকে বয়স্ক, কর্ম্মশীল, সচ্চরিত্র ও ধার্ম্মিক দেখিতে চাহে—এ বাসনা মানবের পক্ষে কিছু দোষের নহে। এ সকল বাসনা পরিত্যাগ করিলে মানবসমাজই থাকে না—পশু সমাজ থাকিতে পারে। কারণ, তাহারা অজ্ঞান স্বাভাবিক বৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া জীবনের সকল কাজ নির্ব্বাহ করিতেছে; কিন্তু মানব বুদ্ধিদ্বারা স্বাভাবিক বৃত্তিকে রোধ করিতে পারে। ঈশ্বরকে বাদ দিয়া এইরূপে বহু ধর্ম্ম ও জ্ঞানী সম্প্রদায় দুঃখ-মুক্তির উপায় নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। বিভিন্ন পথের সাধক যে সাধনাদ্বারা দুঃখ হইতে মুক্ত হন নাই, এ কথা বলা যাইতে পারে না। কিন্তু উক্ত সাধনাদ্বারা মানুষ দুঃখকে সুখে পরিণত করিতে পারে নাই এবং পূর্ণাঙ্গ হইয়া সকল কর্ত্তব্যের উপযোগী হইতে পারে নাই।

এ প্রশ্নের প্রকৃত মীমাংসা ব্রাহ্মধর্ম্ম দান করিয়াছেন। ঈশ্বর, তাঁহার প্রেম, সমগ্র মানবজীবনে তাঁহার লীলা, আধ্যাত্মিক

রাজ্যের সত্যতা এবং ঈশ্বরের সহিত জীবনের যোগ দর্শন করিলেই, দুঃখমুক্তির প্রকৃত উপায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঈশ্বরের আলোকে জীবনের সকল অন্ধকার দূর হইয়া যায়।

ঈশ্বর পরিপূর্ণ প্রেমস্বরূপ। তিনি তাঁহার প্রেমের আকার দান করিবার জন্য মানব সৃষ্টি করিয়াছেন। মানব তাঁহার অতিশয় প্রেমের বস্তু। এই জন্য জীবনে যাহা কিছু আছে বা পাইয়াছি, তাহার সকলই তাঁহার প্রেম হইতে প্রবাহিত। বস্ত্রাবরণে মুখ ঢাকিয়া যেমন জননী কখন কখন সন্তানের নিকট আসেন, মেঘের পশ্চাতে যেমন সূর্য্য প্রকাশিত থাকে, তেমনি অন্ধকার, বিপদ, রোগ, শোক, সকলেরই অন্তরালে তিনিই রহিয়াছেন। আমরা যে ভাবে এসকল সচরাচর দেখিয়া থাকি, সেই ভাবেই বর্ণনা করিলাম। কিন্তু সমগ্র জীবন, এই বিশ্ব, বিশ্ব-মানবের সহিত সম্বন্ধ—তাঁহার প্রেমের ভাষা। তাঁহার চরণে বসিয়া ইহা বুঝিতে পারা যায়।

এই ভাষা কি প্রকাশ করিতেছে? একটি বিষয় এই—তিনি তাঁহার অনন্ত সৃষ্টিরহস্য আমাদিগকে দেখাইতে চাহেন এবং তাঁহার জ্ঞান ও ইচ্ছার প্রকাশময় বিশ্বের মধ্য দিয়া তিনি যে আছেন তাহা মুহূর্তে মুহূর্তে আমাদের নিকট প্রকাশ করিতে চাহেন। এই বিশ্বভাষার দ্বিতীয় প্রকাশ এই যে, তিনি আমাদিগকে ভাল বাসেন। তিনি সর্ব্বব্যাপী এবং মানবের জন্য তাঁহার প্রেম নিত্য। অতএব তাঁহার সকল বিষয়ের মধ্য দিয়া আমার আত্মার প্রতি তাঁহার প্রেম চিরজাগ্রত রহিয়াছে। তৃতীয়তঃ তাঁহার অপর একটি বাণীও আমাদিগকে অন্তরে ও বাহিরে সকল অবস্থার মধ্য দিয়া জানাইতেছেন। প্রেম প্রেমাস্পদের কল্যাণ চাহে, ঈশ্বরের প্রেমও আমাদের মঙ্গলই নিরন্তর চাহিতেছে। সে মঙ্গল কি? সংসারের সম্পদ, সৌভাগ্য নহে—কিন্তু আধ্যাত্মিক কল্যাণ, যাহা অনন্ত-কাল স্থায়ী। অন্য কথায় প্রকাশ করিলে বলিতে হয়, এ কল্যাণ ঈশ্বরত্ব, ঈশ্বরের সমধর্ম্ম। তিনি তাঁহার মত বড় করিতে ও তাঁহার অনন্ত আধ্যাত্মিক সম্পদ্ আমাদিগকে দান করিতে চাহিতেছেন। অথবা বলা যায়, তিনি আপনাকে আমাদের মধ্যে দিতে চাহেন, আমাদের মধ্যে তাঁহার আত্ম প্রকাশ করিতে চাহেন বা আমাদের আত্মদর্পণে তিনি তাঁহার মুখ দেখিতে চাহেন। ভক্তির ভাষায় বলা যাইতে পারে, তিনি আমাদের চিরদিন দাস করিয়া রাখিতে চাহেন না, তিনি তাঁহার সখিত্ব আমাদিগকে দান করিতে চাহেন। এই হেতু সকল অবস্থায় তাঁহার বাণী "ভাল হও," "ভাল হও"।

স্ত্রীর নিকট হ'তে স্বামীকে তিনি ছাড়াইয়া লইলেন, জননীর নিকট হইতে সন্তানকে লইয়া গেলেন, সবল সুস্থ মানবের শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল কেন? তিনি ঐ স্ত্রী, জননী ও ভগ্নশরীর মানবকে চাহিতেছেন, অনিত্য সম্পদের পরিবর্ত্তে নিত্য সম্পদ্ দান করিতে চাহিতেছেন, তাঁহার বক্ষে আরও নিবিড় করিয়া ধরিতে চাহিতেছেন। আমরা ভুলিয়া যাই যে অনিত্য বিষয় দিয়া চির বাসের গৃহ আমরা নির্ম্মাণ করিতে পারিব না। সে যাহা হউক, তিনি আমাদের সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যে তাঁহার উদার প্রেম দিয়া আমাদিগকে আশ্রয় দিয়া রহিয়াছেন।

ঈশ্বরের প্রেমের কথা আমরা অনেক শুনি ও বলি, কিন্তু এ প্রেম যে কি গভীর তাহা আমরা তলাইয়া দেখি না। তাঁহার সকল চিন্তার মধ্যে আমরা প্রত্যেকে রহিয়াছি, তাঁহার সকল কার্য্যের একটা দিক আমাদের অভিমুখে, আমাদের দীনতা ও অপরাধ তাঁহার প্রেম বিমুখ করিতে পারে না, তিনি আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। প্রেমের আদর্শ যদি ঈশ্বরের প্রেমে না থাকে, তবে তাহা কোথায় পাইব? তিনি কি আমাদের অমঙ্গল করিতে পারেন, জীবনতরী ভাসাইয়া উদাসীন থাকিতে পারেন? তাঁহার প্রেম বুঝিতে না পারিয়া মানুষ অন্ধকার দেখে।

এ সংসার বিধাতার এক মাত্র লীলা নহে। এসংসার এবং সংসারের অতীত অনন্ত রাজ্য তিনি তাঁহার সন্তানদের জন্য রচনা করিয়াছেন। স্থূল চক্ষে যাহা দেখি, আধ্যাত্মিক চক্ষুতে তাহা অপেক্ষা অনন্ত বিষয় দেখিতে দিয়াছেন। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দর্শনের সুযোগ দিয়া দর্শনের অভাব পূর্ণ করিবার অধিকার দিয়াছেন। আর শরীর যদি ভাঙ্গিয়া যায়, প্রেমস্বরূপ কি আমাদের কর্ত্তব্যসকলের ব্যবস্থা করিবেন না? শরীর ভাঙ্গিলেও অমর জীবনের সম্পদ্ হইতে তিনি আমা-দিগকে চ্যুত করেন নাই।

যাঁহারা শোকার্ত্ত তাঁহারা বুঝিয়া দেখুন, শিশু যেমন কীট পতঙ্গ লইয়া খেলা করে, ঈশ্বর সেই রূপ খেলা করিবার জন্য মানবকে সৃষ্টি করেন নাই। প্রত্যেকেই তাঁহার গভীর প্রেমের বস্তু; অনন্তকাল ধরিয়া তিনি প্রতিজনের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিবেন, এই জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন। মৃত্যুর পরে মানবাত্মার সকলই থাকে, কিছুই যায় না—তাঁহার অনন্ত সম্বন্ধের বস্তু তিনি বিনষ্ট করেন না। যে সম্বন্ধ প্রিয়জনের সহিত ছিল, তাহাও যায় না; কিন্তু আধ্যাত্মিক সম্বন্ধে পরিণত হইয়া তাহা আরও মিষ্ট হইবার সুযোগ পায়। কারণ, ইহা দেখা যাইতেছে সাংসারিক সম্বন্ধ যত মিষ্ট, আধ্যাত্মিক প্রীতির সম্বন্ধ তাহা অপেক্ষা আরও মিষ্ট। বাস্তবিক আধ্যাত্মিক জীবনের আলোকপাত না হইলে সাংসারিক জীবন স্থূল ও কঠোর হইয়া পড়ে। আমরা স্থূলকে আঁকড়াইয়া রাখিতে চাই বলিয়া মৃত্যু আমাদিগের নিকট কঠোর বলিয়া মনে হয়। কিন্তু জ্ঞানদৃষ্টিতে আধ্যাত্মিক রাজ্য দেখিলে, মৃত্যু নূতন গৃহে নূতন জীবনের দ্বার বলিয়া মনে হইবে; ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের শিক্ষা এবং ব্রাহ্ম সাধকের জীবনে ইহা দেখা গিয়াছে। কিন্তু, হে শোকার্ত্ত, এ জীবনে যদি তুমি তোমার প্রিয়জনদিগের দ্বারা ঈশ্বরকে আড়াল করিয়া থাক, পরলোকের দ্বারে আসিয়া তাহা করিও না। সকল প্রীতিবন্ধনের উপরে যিনি নীরবে ও অজ্ঞাতে তোমাকে প্রীতি করিয়াছেন, তাঁহাকে দেখ ও প্রীতি কর। তাঁহার প্রীতি দেখিলে তোমার দুঃখ ও ক্ষোভ থাকিবে না। কোন কোন সুফী বলেন, দুঃখ প্রিয়তম ঈশ্বরের আঘাত। প্রিয়তমের আঘাত কি ভক্তের নিকট দুঃখের কারণ হইতে পারে? বরং ইহা আনন্দের বস্তু। এই জন্য তাঁহারা দুঃখকে বরণ করিয়া লইতেন। কিন্তু দুঃখ প্রিয়তমের আঘাত নহে, তাঁহার প্রেম

ও মঙ্গল ইচ্ছা বলিয়া তাহাকে আমাদের বরণ করিয়া লইতে হইবে।

অতএব ঈশ্বরের আলোকে মানুষ জীবনের দুঃখ শোক অন্ধকার বিবাদের মধ্য হইতে আপনাকে উদ্ধার করিতে পারে, সকলের রূপ পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিতে পারে, এবং সকল অবস্থার মধ্যদিয়া আপনাকে নূতন জীবনে লইয়া যাইতে পারে। ঈশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধে জীবনের সান্ত্বনা ও আরাম। বিধাতার মঙ্গল ইচ্ছায় কাহার কোন্ অবস্থা কখন আসিবে, তাহা কেহই বলিতে পারে না। যাঁহারা ঈশ্বরকে জীবনে অবলম্বন করিলেন না, তাঁহার প্রেম দেখিলেন না, ঈশ্বরের সহিত জীবনে সম্বন্ধস্থাপন করিলেন না, তাঁহারা শোক দুঃখ ব্যর্থতায় একান্ত আর্ত্ত হইয়া পড়িবেন। ঈশ্বরই আলোক, যে আলোক সমগ্র জীবনকে আলোকিত করে।

ঈশ্বরের আলোকে বিশ্বকেও আমরা নূতন বেশে দেখিতে পাই। বিশ্বের ইহাই প্রকৃত দৃশ্য; কারণ, অন্ধকারে যেমন আমরা প্রায় কিছুই দেখিতে পাই না এবং প্রাণিহীন স্থানকেও শ্বাপদসঙ্কুল মনে হয়, সেইরূপ আমরা ঈশ্বর হইতে বিযুক্ত করিয়া মানবসমাজ সম্বন্ধে অতি হীন ধারণা পোষণ করিয়া থাকি। জনসমাজকে লোকে স্বার্থপরতা, হিংসা, দ্বেষ, অপ্রেম ও অধর্ম্মের রাজ্য বলিয়া মনে করিয়া থাকে। অপরে ইহাকে অনাহার, অত্যাচার ও দুঃখময় মনে করেন। কিন্তু ঈশ্বর ও তাঁহার বিধাতৃত্ব দেখিলে এ ধারণা পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। ঈশ্বর জগৎকে পাপের উপাদানে সৃষ্টি করেন নাই, বরং আপনার স্বরূপ দ্বারা মানবকে সৃষ্টি করিয়া তাহাকে স্বাধীনতা দান করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার বিধাতৃত্বের অবসান হয় নাই। তিনি ত আত্মায় অন্তর্যামী হইয়া সকল সত্য, ধর্ম্ম পুণ্য ও প্রেম তাহার অন্তরে সঞ্চার করিতেছেন। যে রাজ্যে তিনি এখন নাই, সে রাজ্য তিনি অধিকার করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন এবং পরিণামে তিনিই অধিকার করিবেন; কারণ, তিনি মানব অপেক্ষা শক্তিশালী। বিষয়টি অন্যদিক দিয়া দেখিলে সন্দেহের কারণ থাকে না। ঈশ্বর আপন ইচ্ছায় আপনার সত্তাদ্বারা স্বতন্ত্র স্বাধীন মানবাত্মা সৃষ্টি করিয়া কি তিনি আপনাকে বিভাগ করিয়াছেন? স্থূল দৃষ্টিতে মনে হয় তিনি আপনাকে বিভাগ করিলেন, যেমন জড় হইতে জড় ভিন্ন হয়। মানবাত্মা ঈশ্বর হইতে ভিন্ন, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এ ভিন্নতা তিনি স্বেচ্ছায় তাহাকে দান করিয়াছেন—তাঁহার প্রেমের বশবর্ত্তী হইয়া। কিন্তু এ ভিন্নতা আশ্চর্য্য প্রকারের। মানবের যাহা কিছু অস্তিত্ব—সকলই ঈশ্বরের অস্তিত্ব দ্বারা সৃষ্ট, মানব ঈশ্বরময়; কিন্তু তিনি আপনাকে সংবরণ করিয়া তাহাকে স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য দান করিয়াছেন। স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের স্থলেও তাঁহার স্বরূপের কোন ক্ষুণ্নতা হয় নাই। যেমন তিনি তাহাকে স্বাধীনতা দিয়াছেন, তেমনি তিনি তাহার সঙ্গী হইয়া, তাহার চারিদিক ঘিরিয়া, তাহার গুরু, রক্ষক ও প্রতিপালক হইয়া তাহাকে আবৃত করিয়া রহিয়াছেন। এবং তাঁহার অন্তরে থাকিয়া তাহার স্বাধীন জীবনে আপন স্বরূপ প্রকাশিত করিতে চাহিতেছেন। তৃতীয়তঃ তিনি মানবের আদর্শ ও পরিণাম হইয়া মানবের ভবিষ্যৎও তিনি আপনার মধ্যে রাখিয়াছেন। ইহাতে যদি কিছু ভিন্নতা অবশিষ্ট থাকে, তবে তাহা মানবের আত্মসমর্পণে, প্রেমের মিলনে ও আদর্শে বাস-হেতু দূর হয়। ইহাই মানবের গতি; এই আধ্যাত্মিক একত্বের জন্য ঈশ্বর অপেক্ষা করিতেছেন।

অতএব ঈশ্বর যখন মানবের এত নিকটে, তখন মানবজীবন, মানবসমাজ, মানবীয় সকল প্রতিষ্ঠান কেবল স্বার্থপরতা, অপ্রেম, অধর্ম্মের তাণ্ডবলীলা হইবে, ইহা কি কখনও সম্ভবপর? আমরা ঈশ্বরের আলোকে সকল দেখি না, তাই এ অন্ধকার। ঈশ্বরের আলোকে যখন দেখি, তখন দেখিতে পাই "স সেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানামসম্ভেদায়"—লোকভঙ্গনিবারণ হেতু তিনি সেতুস্বরূপ হইয়া রহিয়াছেন। জড় প্রকৃতিকে যেমন তিনি সৌন্দর্য্যের কিরণে উদ্ভাসিত করিতেছেন, তেমনি তিনি মানবসমাজকে ধর্ম্মের আলোকে উদ্ভাসিত করিতেছেন। পৃথিবীতে পাপ, অসত্য, অবিচার, অত্যাচার, অধর্ম্ম, অপ্রেম আছে; কিন্তু পুণ্যস্বরূপ ও প্রেমস্বরূপ এ বিশ্বের অধিপতি, তিনি তাঁহার পুণ্য ও প্রেম মানবপ্রাণে সঞ্চার করিতেছেন। পুণ্য ও প্রেম জয়-যুক্ত হইতেছে ও জয়যুক্ত হইবে। মানব নিরবচ্ছিন্ন হিংস্র স্বার্থপর প্রাণী নহে; কারণ, ঈশ্বর তাহার অন্তরে কাজ করিতেছেন। এ বিশ্বে স্বর্গের সম্পদ্ অনেক রহিয়াছে—মানবের প্রাণেও লুক্কায়িত আছে; ঈশ্বরের আলোকে দেখিলে তাহা চক্ষে পড়ে। তখনই দেখা যায় যে জগতে ধর্ম্ম আছে, কোন অদৃশ্য রাজ্য হইতে মানব প্রাণে ধর্ম্মের সত্য সকল আঘাত করিতেছে। তখন সাংসারিক বিচার ভুলিয়া মানব আপন প্রাণ হইতে বলিয়া উঠে "ঠিক, ঠিক"। জগতে অনাহার দারিদ্র্য আছে, কিন্তু কত যে সুখের উপাদান ও আয়োজন বিধাতা করিয়া দিয়াছেন, মানুষ আপন ক্ষীণ আলোকে তাহা দেখিতে পায় না। জগতে অসত্য, অন্যায়, পাপ আছে, দুঃখ দারিদ্র্যও আছে—কিন্তু, হে মানব, বিধাতা তাহা তোমার দূর করিবার জন্য রাখিয়াছেন; কারণ, তুমি ইহা দ্বারা প্রেমে ও কল্যাণ আকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া সকলের সঙ্গে যুক্ত হইবে। কিন্তু এই দিকে দেখিতে গিয়া যদি তুমি জগতে ধর্ম্মের ও ঈশ্বরের করুণার প্রসার না দেখ, তবে তুমি ঈশ্বরের আলোকে জগৎকে দেখ নাই।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী।

সত্য হওয়া *

বিশ্বচরাচরকে যিনি সত্য করিয়া বিরাজ করিতেছেন তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে সহজেই জানিব, এই আকাঙ্ক্ষা মানবের আত্মার মধ্যে গোচরে ও অগোচরে কার্য্য করিতেছে। কিন্তু এই প্রশ্ন মনে উদিত হয়—যিনি সকল অপেক্ষা সত্য, যাঁহার মধ্যে

* শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের শান্তি নিকেতন গ্রন্থের চতুর্দ্দশ খণ্ডের অন্যতম উপদেশ অবলম্বনে লিখিত।

আমরা বাস করিতেছি, তাঁহাকে জানিবার জন্য এত সাধনা কেন? যাঁহার মধ্যে আছি তাঁহার মধ্যেই সহজ হইয়া উঠিবার জন্য যে কঠিন সাধনার প্রয়োজন হয়, তাহারই একটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। মাতার গর্ভে ভ্রূণ অচেতন অবস্থায় থাকে। মাতার দেহ হইতে সে রস গ্রহণ করিয়া থাকে। মাতার স্বাস্থ্যেই তাহার স্বাস্থ্য; মাতার পোষণেই তাহার পোষণ, মাতার প্রাণেই তাহার প্রাণ। সে ভূমিষ্ঠ হইয়া নিশ্চেষ্টতার মধ্য হইতে সচেষ্টতার ক্ষেত্রে আসিয়া পড়ে। সকল বন্ধন মুক্ত হইয়া সে আলোকের রাজ্যে উন্মুক্ত আকাশের তলে আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু তাহা হইলেও এই মুক্তির মধ্যে স্ফুরণের সহজ অধিকার সে একেবারে লাভ করিতে পারে না। অনেকদিন পর্য্যন্ত সে চলিতেও পারে না, বলিতেও পারে না। তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে, তাহার হৃদয়ের ও মনের মধ্যে, যে শক্তি নিহিত আছে সেই শক্তিকে অক্লান্তভাবে চালনা করিয়াই অনেকদিন পরে সে মানুষ হইয়া উঠে। ভূমিষ্ঠ শিশু গর্ভবাস হইতে মুক্ত হইলেও অনেক-দিন পর্য্যন্ত তাহার গর্ভের সংস্কার যায় না। সে চক্ষু মুদিয়া নিশ্চল হইয়া পড়িয়া থাকে; নিদ্রিত অবস্থাতেই তাহার অধিকাংশ সময় কাটিয়া যায়। জড়ত্বের এই সমস্ত লক্ষণ দেখিয়াও আমরা বুঝিতে পারি যে, সে চেতনার ক্ষেত্রে বাস করিতেছে তাহার এই নিশ্চেষ্টতা, নিশ্চলতা চিরকালের নয় এবং সত্যও নয়। যদিও সে চক্ষু মুদিয়া কাটায়, তথাপি সে যে আলোকের রাজ্যে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে এ কথাই সত্য, এবং এই সত্যই ক্রমশঃ তাহার দৃষ্টিশক্তিকে পূর্ণতররূপে অধিকার করিতে থাকে। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে তাহাকে অল্প চেষ্টা করিতে হয় না। সে বারংবার পড়িয়া যায়, বারংবার তাহার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তাহার এই অক্ষমতা দেখিয়া আমরা কখনও বলি না যে, উহার আর কাজ করিবার আবশ্যকতা নাই, সে তাহার মাতার ক্রোড়েই চিরকাল থাকুক। পরন্তু আমরাই তাহাকে ধরিয়া বারংবার তাহার চেষ্টাতেই প্রবৃত্ত করি; কেন না আমরা নিশ্চয়ই জানি এই যে, যদিও উহার শক্তি আমরা দেখিতে পাইতেছি না, তথাপি সেইটাই তাহার পক্ষে সত্য। উহার অক্ষমতা আমাদের চক্ষের সম্মুখে থাকিলেও আমরা বুঝিতে পারি যে ইহা তাহার পক্ষে সত্য নয়। এই বিশ্বাসে নির্ভর করিয়াই আমরা শিশুকে তাহার অভ্যাসে প্রবৃত্ত রাখি। এবং তাহার দ্বারায় অবশেষে একদিন তাহার পক্ষে চলা, কথা বলা, ইত্যাদি এমনই সহজ হইয়া যায় যে তাহার জন্য আর তাহাকে চেষ্টাই করিতে হয় না।

মানব আত্মার পক্ষেও এই কথাই খাটে। মানবের আত্মা প্রকৃতির এই গর্ভ হইতে অধ্যাত্মলোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সে প্রকৃতির সঙ্গে জড়িত হইয়া, প্রকৃতির ভিতর হইতে কেবল অন্ধ ভাবে প্রবৃত্তির তাড়নায় কার্য্য করিবে, তাহা হইতেই পারে না। এখন সে কর্ত্তা হইয়া নিজের হস্তে সমস্ত সৃষ্টি করিবে ও আপনাকে দান করিবে।

মানবাত্মা মুক্তি-ক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এই কথা সত্য হইলেও আমরা যেন তাহার সম্পূর্ণ প্রমাণ প্রাপ্ত হইতেছি না। প্রকৃতির গর্ভবাসের যে সংস্কার, এই মুক্ত লোকে আসিয়াও মানবাত্মা তাহার ঊর্দ্ধে উঠিতে পারিতেছে না। আত্মশক্তির সাধনার দ্বারাই সচেষ্টভাবে সে যে আপনাকে এবং জগৎকে অধিকার করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে, এ কথা তাহাকে দেখিয়া স্পষ্ট অনুভব করা যায় না। সে কেবল জড়-ভাবেই আপনাকে পুষ্ট করিতে থাকিবে, এমনিই তাহার ভাব। তাহার আপনার মধ্যে তাহার নিজস্ব যে একটী সত্য আশ্রয় আছে, এখনও তাহার উপর তাহার নির্ভর দৃঢ় হয় নাই। এই জন্যই সে প্রকৃতিকেই প্রাণপণে অবলম্বন করিয়াই আছে। এই জন্যই সে শিশুর মত ব্যবহার করিতেছে। সে জানে না যে জ্ঞানের দ্বারা সকল জিনিষকে নির্লিপ্তভাবে অথচ পূর্ণতরভাবে গ্রহণ করিবার দিন তাহার আসিয়াছে। এখনও সে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না যে, শক্তিকে মুক্ত করিয়া দেওয়ার দ্বারাই সে আপনাকে প্রাপ্ত হইবে। আপনাকে ত্যাগ করার দ্বারাই, আপনাকে দান করার দ্বারাই সে আপনাকে পূর্ণ ভাবে সপ্রমাণ করিবে—সত্যের মধ্যেই তাহার যথার্থ স্থিতি, সংসার ও বিষয়ের মধ্যে নয়। সেই সত্যের মধ্যে তাহার ক্ষয় নাই, ভয় নাই। এই অমর সত্যকে প্রকাশ করিবার পরম সুযোগই এই মানব জন্ম, এই কথাটী এখনও সে নিঃসংশয়ে গ্রহণ করিতে পরিতেছে না।

মানুষের মধ্যে এই দুর্ব্বলতা দেখিয়াই একদল দীনচিত্ত ব্যক্তি মানুষের মাহাত্ম্যকে অবিশ্বাস করিয়া মানুষের আত্মাকে দেখিতে পায় না। তাহারা ক্ষুধাতৃষ্ণাতুর অহংকেই প্রধান বলিয়া মানিয়া অন্যটীকে কল্পনা বলিয়া স্থির করে।

শিশুকে মাতৃ-ক্রোড়ে নিদ্রিতাবস্থায় অচেতন-প্রায় দেখিলেই মনে হয় সে একান্ত ভাবে পরাশ্রিত। তবু এ কথা যেমন সম্পূর্ণ সত্য নহে—তেমনি মানুষের আত্মার সম্বন্ধে আমরা আপাতত যতই বিরুদ্ধ প্রমাণ পাই না কেন, তবু একথাই নিশ্চিত সত্য যে, বিষয়রাজ্যের সে দীন প্রজা নহে, পরমাত্মার মধ্যেই তাহার সত্য প্রতিষ্ঠা। সে অন্য যে কোন জিনিসকেই মুখে প্রার্থনা করুক না কেন, অন্য যে কোন জিনিসের জন্যই শোক করুক না কেন, তাহার সকল প্রার্থনার মধ্যে পরমাত্মার ভিতরে একান্ত সহজ হইয়া উঠিবার প্রার্থনাই সত্য এবং তাঁহার মধ্যে প্রবুদ্ধ না হওয়ার শোকই তাহার একমাত্র গভীরতম সত্যতম শোক।

আমরা মানবশিশুকে যে এত অক্ষম দেখি তাহার কারণ এই যে সে নিতান্ত অক্ষম নয়। তাহার মধ্যে সত্য ক্ষমতা ভবিষ্যৎকে আশ্রয় করিয়া আছে বলিয়াই তাহার তুলনায় তাহার বর্ত্তমান অক্ষমতাকে এত বড় করিয়া দেখি। এই অক্ষমতা যদি সত্য হইত, তাহা হইলে এসম্বন্ধে আমাদের মনে কোন চিন্তারই উদয় হইত না।

মানুষের আত্মাই তাহার সত্য বস্তু বলিয়া তাহার অহংকারের চাঞ্চল্য এত বেশী প্রবলভাবে আমাদের আঘাত করে। এই অন্তরতম সত্যের মধ্যে পূর্ণ সত্য হইয়া উঠিবার সাধনাই আমাদের মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ সাধনা। এই সত্যের মধ্যে সত্য হইয়া উঠিতে হইলে বদ্ধ-ভাবে জড়-ভাবে হওয়া যায় না। সকল বাধা অতিক্রম করিয়া তাহাকে লাভ না করিলে লাভ করাই যায় না। এই বাধার দ্বারাই প্রমাণ হয় অসত্য পাশ হইতে মুক্ত হওয়াই মানবাত্মার সত্য পরিণাম।

শিশু চলিতে আরম্ভ করিলে পড়িয়া যায়, অথচ তাহার বারংবার পতন সত্ত্বেও তাহাকে চলার অভ্যাস করিতে দেওয়া হইয়া থাকে; কারণ সকলেই জানে পতনই তাহার চরম নয়। সেই রূপ প্রত্যহ সত্য-লোকে, ব্রহ্ম-লোকে, চলার অভ্যাস প্রত্যেক মানুষকে করিতে হইবে। কোন আলস্যে অথবা কোন ক্লেশে নিরস্ত হইলে চলিবে না।

প্রত্যহ তাঁহার কাছে যাওয়া, তাঁহাকে চিন্তা করা, স্মরণ করাই প্রকৃত পন্থা। সংসারে যতই আবদ্ধ থাকি না কেন, তথাপি সমস্ত খণ্ডতার, সমস্ত অনিত্যের মধ্যে এই অনন্ত সত্যকে স্বীকার করার দ্বারা মানুষ আপনার আত্মাকে সম্মান করে।

বিষয়ের দাসত্ব যতই করি না কেন, তথাপি তাহা পরম সত্য নহে, এই বাক্য প্রতি দিন কোন না কোন এক সময়ে স্বীকার করিতেই হইবে। "সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম" এই বাক্যই সত্য, এবং এই সত্যের দ্বারাই আমিও সত্য; ধন জন মানের দ্বারা আমি সত্য নহি। আমার প্রতি দিনের ব্যবহারে আমি এ কথার সম্পূর্ণ সমর্থন এখনও করিতে না পারিলেও, একদিন না একদিন একদিকে আকাশে মস্তক উত্তোলন করিয়া এবং একদিকে ভূমিতে মস্তক নত করিয়া বলিতেই হইবে যে, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই কথাই সত্য। ইহাই পরম সত্য। প্রতিদিন ইহার অভ্যাস আবশ্যক। বিমুখ মনকে ও ক্ষীণ কণ্ঠকে ইহাই উচ্চারণ করাইতে হইবে। এইরূপে নিয়ত বলিতে বলিতে এই সত্য বোধটী আমাদের নিকট সহজ হইয়া আসিবে। তখন বাহিরের সমস্ত বস্তুকেই আমার আত্মা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করিব না এবং প্রবৃত্তির প্রবল উত্তেজনাকেই প্রকৃত আত্ম-পরিচয় বলিয়াও মনে করিব না। ব্রহ্মকে সহজ ভাবে জানিবার শক্তিই আমাদের সত্য শক্তি; সেই শক্তিকে চিনিতে পারিতেছি না বলিয়া কখনও সে শক্তিকে অস্বীকার করিব না। বারংবার তাঁহাকে ডাকিব, বারংবার তাঁহাকে বলিব, এই তুমি, এই তুমি, এই তুমি! এই তুমি আমার সম্মুখে, এই তুমি আমার অন্তরে। এই তুমি আমার প্রতি মুহূর্তে, এই তুমি আমার অনন্ত কালে। এই ভাবে তাঁহার নামে আমার সমস্ত শরীর প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিবে। আমার অন্তর বাহির পূর্ণ হইয়া উঠিবে, আমার সংসার সেই নামে বাজিয়া উঠিবে। তখন আমার চিত্ত বলিবে সত্যম্, বিশ্বচরাচর বলিবে সত্যম, ক্রমে আমার প্রতি দিনের কর্ম্ম বলিয়া উঠিবে সত্যম্। বেহালা যন্ত্র যেমন যতই পুরাতন হয়, ততই তাহার মূল্য অধিক হয় এবং তাহার কাষ্ঠের পরমাণু-গুলি সুরের ছন্দে ছন্দে সুবিন্যস্ত হইয়া উঠে, সেইরূপ আমরা যতই প্রতিদিন তাঁহাকে ডাকিতে থাকিব, ততই আমাদের সত্য শরীর ও মনের অণু পরমাণুগুলিও তাঁর সত্য নামে এমনই হইয়া উঠিবে যে সে নামে বাজিতে আর ক্ষণমাত্রও বিলম্ব হইবে না। এই সত্য নাম মানুষের সমস্ত শরীরে মনে, মানুষের সমস্ত সংসারে, সমস্ত কর্ম্মে, একতান আশ্চর্য্য স্বরসম্মিলনে বিচিত্র ভাবে বাজিয়া উঠিবে বলিয়া বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড একাগ্র ভাবে অপেক্ষা করিতেছে। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সেই আশা পূর্ণ করিবার জন্যই মানুষ। নিজের উদর পূরণ এবং স্বার্থ সাধনের জন্য নয়। ইহাই প্রত্যহ স্মরণে রাখিয়া নিখিল জগতের সাধনাকে আমরা আপনার সাধনা করিয়া লইব। আমরা সত্যকে প্রত্যক্ষ ভাবে দেখিব, জানিব, সত্যে সঞ্চরণ করিব এবং অসঙ্কোচে ঘোষণা করিব তুমিই সত্য।

শ্রীঅপর্ণাচরণ ভট্টাচার্য্য।

পুণ্য-স্মৃতি

ভারত-বরেণ্য ঋষি-অগ্রগণ্য
আদিগুরু সমাজের,
রাজা রামমোহন; তাঁহার মতন
কে হিতৈষী আমাদের?
পুণ্যস্মৃতি-দিনে শুভ অনুষ্ঠানে
স্মরি তাঁর পুণ্য কাজ;
মিলেছি সকলে ভক্তিরসে গ'লে
শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে আজ।
কত নর নারী পতিতে উদ্ধারি'
দেখালেন মুক্তি-পথ;
পেয়ে সত্য ধর্ম্ম বুঝি তার মর্ম্ম,
সবে পূর্ণ মনোরথ।
ঘুচিল দুর্দ্দশা, গভীর নিরাশা,
নিভিল বাসনানল;
কত শত প্রাণ পাপে ম্রিয়মাণ
পেলো প্রাণে নব বল।
ব্রহ্মতরুতলে বসিয়ে সকলে
জুড়ালো জনমের মত,
নূতন জীবন লভি' কত জন
পালিছে ধরম ব্রত।
কৃতজ্ঞ হৃদয়ে এক প্রাণ হ'য়ে
দেও অর্ঘ্য ও চরণে;
জয় ব্রহ্ম রবে উড়াও ভবে
ধর্ম্মধ্বজা হৃষ্ট মনে!
এ স্মৃতি-তর্পণ করি উদ্‌যাপন
ধন্য আজ বঙ্গবাসী;
দিয়ে ধর্ম্মধন অমূল্য রতন
ধন্য তুমি হে রাজর্ষি॥

শ্রী চন্দ্রনাথ দাস।

নূতন সঙ্গীত

ঝিঁঝিট—মধ্যমান্

সুর—(ওহে ধর্ম্মরাজ বিচারপতি তোমার বিধি কে লঙ্ঘিতে পারে)

(দয়াল) একবার আমায় দেও হে দেখা,
আর আমি চাইব না।
আমি তোমার দ্বারের চির ভিখারী,
আমায় আর বিমুখ করো না।

কত জ্বালায় জ্বলি আমি, জান সবই অন্তর্যামী,
একবার দেখা দিলে সখা,
ভবের জ্বালা আর রবে না।
পড়িলে অমৃত সরে, মক্ষিকা কি যায় উড়ে,
ডুবে যায় সে চির তরে,
আর গুন্ গুন্ করে না।
শ্রী শ্রীনাথ চন্দ

---

(১৬) খাম্বাজমিশ্র—লক্ষ্ণৌ ঠুংরি।

জয় বিশ্বপতি, সর্ব্বজন-গতি,
কোটি কণ্ঠে গাহে তব যশোগীতি।
মহাকাশ-মাঝে, কোটি ভানু রাজে,
কোটি চন্দ্রতারা ক্ষরে তব জ্যোতি।
নদ, নদী, বন গিরি, প্রস্রবণ,
তব মহিমা-বিমণ্ডিত বনস্পতি।
ভূতলে গগনে সর্ব্ব কালে স্থানে,
জয় জয় রব উঠে দিবারাতি।
কোটি নারী নরে, ভক্তিনত শিরে
করে যুক্তকরে চরণে প্রণতি।
ভক্ত বাক্যহারা, প্রেমে মাতোয়ারা,
চরণে অঞ্জলি ঢালিছে ভকতি।
দীন হীন জনে, নিজ কৃপাগুণে,
দাও হে পদাশ্রয়, দাও মুকতি।

---

(১৭) ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান্

প্রেমবাঁধনে বাঁধ মা সবে, জগদ্বাসী জনে।
তোমার নামে দেশবিদেশে, মিশে যাক্ সব প্রাণে প্রাণে।
অমৃতের সন্তান যারা, কেন গো কাঁদিবে তারা,
পাপেতাপে হবে সারা, চিনিবে না তোমাধনে।
ধর্ম্মের নামে জগৎময়, ভা'য়ে ভা'য়ে বিরোধ হয়,
সবাই ধর্ম্মের কথা কয়, না চেয়ে তোমার পানে।
তুমি তো জননী সবার, সবে মা সন্তান তোমার,
ভেদাভেদ অনিবার, তবে কেন সর্ব্বস্থানে?
মা তোমার সম্পর্ক ধরে', সকলকে আপনার করে',
রাখুক সবে ঘরে ঘরে, তোমায় ধর্ম্মের মাঝখানে।

ব্রাহ্মসমাজ

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে:—

বিগত ১৯শে সেপ্টেম্বর কলিকাতা নগরীতে শ্রীমান অমিয় কুমার দত্তের মাতা নলিনীমালা দত্ত হঠাৎ হৃদ্‌রোগে পরলোকগমন করিয়াছেন। বিশেষ পরিতাপের বিষয় বৃদ্ধা মাতার সম্মুখে এক একে একটী সন্তান ব্যতীত আর সকলেই চলিয়া গেলেন।

বিগত ১৯শে সেপ্টেম্বর পরলোকগত বাবু রাজেন্দ্রনাথ শীলের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ আচার্য্যের কার্য্য, শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র সোম জীবনী বর্ণন ও প্রার্থনা এবং পুত্র শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ও বন্ধু শ্রীযুক্ত মথুরানাথ গাঙ্গুলী প্রার্থনা করেন। দানাদির বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চির শান্তিতে রাখুন ও আত্মীয় স্বজনদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

নামকরণ—বিগত ১৯শে সেপ্টেম্বর কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত ফকিরচন্দ্র সাধুখাঁর পৌত্রের (শ্রীমান চারুচন্দ্র সাধুখাঁর প্রথম সন্তানের) নামকরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য আচার্য্যের কার্য্য করেন। শিশুকে আশা-প্রদীপ নাম প্রদত্ত হইয়াছে। এই উপলক্ষে প্রচার বিভাগে ২৲ ও দাতব্য বিভাগে ২৲ দান করা হইয়াছে। মঙ্গলময় বিধাতা শিশুকে কল্যাণের পথে বর্দ্ধিত করুন।

রামমোহনস্মৃতি—রাজর্ষি রামমোহন রায়ের পরলোকগমনের ত্রিনবতিতম সাম্বৎসরিক উপলক্ষে বিগত ২৭শে সেপ্টেম্বর প্রাতে মন্দিরে ব্রহ্মোপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র আচার্য্যের কার্য্য করেন। পূর্ব্বদিনের সামাজিক উপাসনাতেও উভয় বেলায়ই আচার্য্যগণ রাজর্ষির জীবন অবলম্বন করিয়া উপদেশ দেন। অপরাহ্নে এলবার্ট হলে, রামমোহন লাইব্রেরীতে ও ভবানীপুর সম্মিলন ব্রাহ্মসমাজে তিনটী স্মৃতিসভা হয়। প্রথমটীতে স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এবং তিনি অনিবার্য্যকারণে সভাভঙ্গের পূর্ব্বে চলিয়া গেলে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, দ্বিতীয়টীতে স্যার নীলরতন সরকার ও তৃতীয়টীতে শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য সভাপতির কার্য্য করেন। তিন স্থানেই হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, ব্রাহ্ম সকল সমাজের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিগণ বক্তৃতা করেন। মফঃস্বলেও নানাস্থানে স্মৃতিসভাদি হইয়াছে। তাহার বিবরণ এখনও আমাদের হস্তগত হয় নাই।

গিরিডি—গত ২৭ শে সেপ্টেম্বর গিরিডি ব্রহ্মমন্দিরে ছাত্র সমাজের উদ্যোগে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু দিন উপলক্ষে, একটি সভা হয়। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বিশ্বাস সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রথমে একটি সঙ্গীত জনৈক মহিলা কর্ত্তৃক গীত হইলে, সভাপতি মহাশয় সংক্ষেপে প্রার্থনা করেন। তৎপর শ্রীযুক্ত চন্দ্র নাথ দাস স্বরচিত একটী কবিতা পাঠ করেন। শ্রীযুক্তা মৃণালিনী ভৌমিকের লিখিত প্রবন্ধ তাঁহার পুত্র কর্ত্তৃক পঠিত হয় এবং কুমারী মলিনা নিউগী তাঁর নিজের লিখিত একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। মিঃ ডি এন মুখার্জ্জি রাজার কার্য্য-কলাপ ও ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করিলে, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র নাগ ও ডাঃ ডি রায় বক্তৃতা করেন। অবশেষে সভাপতি মহাশয় তাঁহার মন্তব্য প্রকাশ করিয়া সভার কার্য্য শেষ করেন। তিনি বলেন রাজা আমাদিগকে যে অমূল্য ধর্ম্মরত্ন দান করিয়া গিয়াছেন তার তুলনা নাই। সে সম্পদ্ আমরা লাভ করিয়া

রাজার কাছে চিরঋণে আবদ্ধ আছি; আজ তাহা স্মরণ করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা তাঁহার চরণে অর্পণ করিতেছি। রাজার পথ অনুসরণ করিয়া আমরা যদি জীবনপথে অগ্রসর হইতে পারি, তবেই আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি ও ভক্তি-অর্ঘ্য এবং স্মৃতি-তর্পণ সার্থক হইবে। সভায় বহুতর নর নারী ও বালক বালিকা উপস্থিত ছিলেন।

গিরিডি ব্রাহ্মসমাজ—গত ১২ই ভাদ্র বাবু সত্য-শরণ দাসের প্রথমা কন্যা সত্ত্ব মিত্রার বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে এবং দ্বিতীয়া কন্যা সুভদ্রার আদ্য শ্রাদ্ধ উপলক্ষে তাঁহার প্রবাসভবনে বিশেষ ব্রহ্মোপাসনা হয়। সুভদ্রা গত ৩০শে শ্রাবণ রক্তামশায় রোগে পরলোকগমন করিয়াছেন। প্রথম দিন কন্যার পিতা, দ্বিতীয় দিন শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র নাগ উপাসনার কার্য্য করেন। এতদুপলক্ষে কন্যার পিতা মাতা গিরিডি ব্রাহ্মসমাজে ৫৲ গিরিডি নব বিধান ব্রাহ্মসমাজে ১৲ কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত মেদিনীপুর জলপ্লাবন তহবিলে ৫৲ কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দাতব্য বিভাগে ২৲টাকা অনাথ আশ্রমে ২৲ দরিদ্রদিগের ভগ্নী সম্প্রদায়ে ২৲ মোট ১৭৲ টাকা দান করিয়াছেন। বিধাতা পরলোকগত আত্মার কল্যাণ বিধান করুন।

পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্ম সম্মিলনী—আগামী ২৬এ ২৭এ, ও ২৮এ আশ্বিন (১৩ই, ১৪ই ও ১৫ই অক্টোবর) বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসম্মিলনীর ষট্‌ত্রিংশত্তম বার্ষিক অধিবেশন **ময়মনসিংহ** ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে সম্পন্ন হইবে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। সম্মিলনীর বার্ষিক অধিবেশন ব্রাহ্মব্রাহ্মিকাদিগের এবং ব্রাহ্মসমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী ও সহানুভূতিকারিদিগের ব্রহ্মোৎসব সম্ভোগ করিবার সম্মিলনক্ষেত্র। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক সবান্ধবে এই উৎসবে যোগদান করিয়া আমাদিগকে সুখী করিবেন।

যাঁহারা বিদেশ হইতে আসিবেন তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক ২১এ আশ্বিন (৮ই অক্টোবর) মধ্যে, ময়মনসিংহ অভ্যর্থনা-কমিটির অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী সেন মহাশয়কে পত্র লিখিয়া জানাইবেন।

বিদেশ হইতে যাঁহারা আসিবেন তাঁহাদের আহার ও বাসস্থানের বন্দোবস্ত ময়মনসিংহ অভ্যর্থনা-কমিটির পক্ষ হইতে করা হইবে। অনুগ্রহপূর্ব্বক সকলে বিছানা ও মশারী সঙ্গে আনিবেন।

সম্মিলনীর অধিবেশনের সময় মহিলাদিগের ও যুবকদিগের স্বতন্ত্র সম্মিলন হইবে।

আলোচ্য বিষয়—(১) ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন। (২) ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার। (৩) নীতি বিদ্যালয় ও ছাত্রসমাজ পরিচালনের সুব্যবস্থা। (৪) ব্রাহ্ম বিবাহ। (৫) অনাথ ব্রাহ্মপরিবার-সংস্থান ধনভাণ্ডার। (৬) বিবিধ :—(১) অনাথ ধনভাণ্ডারের ট্রাষ্ট মনোনয়ন। (২) সম্মিলনীর অধিবেশনের সময় পরিবর্ত্তন। (৩) সম্মিলনীর নাম পরিবর্ত্তন। (৪) Brahmo Census. (৫) অন্যান্য।

শ্রীমথুরানাথ গুহ, সম্পাদক, পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসম্মিলনী।
শ্রী কৃষ্ণকুমার মিত্র, সভাপতি, অভ্যর্থনাকমিটি।

আন্দুল ব্রাহ্মসমাজ—গত ২৪শে ভাদ্র সাধারণ সভার অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয় স্থির হইয়াছে :—

কার্য্যকারক সভ্য শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্থানান্তরে থাকা প্রযুক্ত শ্রীযুক্ত পুলিন বিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার স্থানে নিযুক্ত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ মিত্রকে পত্র লিখিয়া কোন সম্মতি-সূচক উত্তর না পাওয়ায় ও শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ট্রাষ্টী থাকিতে অনভিমত প্রকাশ করায়, তাঁহাদের পরিবর্ত্তে শ্রীযুক্ত যুটবিহারী চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত পুলিন বিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় ট্রাষ্টী নিযুক্ত হইয়াছেন।

গত ২৫শে ভাদ্র সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার আন্দুল কাটা পুষ্করিণীর পশ্চিম দিকস্থ খরিদা জমির মধ্যে ৵২৷৷ কাঠা জমি দান করিয়া সমাজের ট্রাষ্টী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র বি এ, শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য এম এ, এম বি, শ্রীযুক্ত বরদা কান্ত বসু বি, এ, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মল্লিক, শ্রীযুক্ত যুটবিহারী চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত পুলিন বিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়গণের নামে ট্রাষ্ট ডিড পত্র লিখিয়া রেজেষ্টি করিয়া দিয়াছেন।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

Krinshna and the Puranas—বৈষ্ণব ধর্ম্মের উৎপত্তি ও বিকাশ বিষয়ে প্রবন্ধাবলী—পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ প্রণীত। মূল্য ১৷৷০। ইহাতে আদি কাল হইতে বৈষ্ণব ধর্ম্মের উৎপত্তি ও বিকাশের একটি সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে। বেদে, উপনিষদে, পুরাণে ও পরবর্ত্তীকালে উহা যেরূপ ভাবে ফুটিয়াছে, তাহা বিশদ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে; এবং তাহার দার্শনিক তত্ত্বও সমালোচিত হইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণাদি পূর্ব্ব ধর্ম্মকে বিকৃত করিয়া উহাকে কিরূপ কলুষিত করিয়াছে তাহাও স্পষ্ট রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ পুস্তক পাঠ করিয়া যেমন অল্পের মধ্যে অনেক জ্ঞান লাভ করিতে পারা যাইবে, তেমনি ভক্তিপথের প্রতিবন্ধকাদি ও প্রকৃত ভক্তির ভিত্তি সম্বন্ধেও জ্ঞান জন্মিবার বিশেষ সাহায্য পাওয়া যাইবে। নীতিকে বর্জ্জন করিয়া ভাবের স্রোতে আপনাকে ঢালিয়া দিলে যে ধর্ম্ম দাঁড়াইতে পারে না, তাহা এই ভাবপ্রধান জাতির পক্ষে বিশেষ ভাবেই হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক। তাই এই পুস্তক পাঠে অনেকে বিশেষ উপকৃত হইবেন বলিয়াই মনে হয়। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

জীবনপ্রসঙ্গ ও প্রার্থনা—শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী প্রণীত। মূল্য কাগজে বাঁধান ৸০ ও কাপড়ে বাঁধান ১৲। ইহাতে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও ভক্ত নবদ্বীপ চন্দ্র দাস, এই তিনটি জীবনপ্রসঙ্গ, কয়েকটি উপদেশ ও অনেকগুলি প্রার্থনা আছে। কর্ম্মময় জীবনের বিবরণ প্রদর্শন করা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য নয়, ধর্ম্মজীবনের গূঢ় ভাব প্রকাশ করিতেই চেষ্টা করিয়াছেন, নিবেদনে তিনি এই কথা জানাইয়াছেন। আমাদের মনে হয় এ বিষয়েও আরও একটু বিস্তারিত আলোচনা করিলে লোকের অধিকতর উপকার সাধিত হইত। অনুষ্ঠানের উপদেশে সংক্ষেপে যাহা বলা হয়, তাহার অতিরিক্ত কিছু বলেন নাই। উপদেশগুলি কি উপলক্ষে প্রদত্ত হইয়াছে তাহার উল্লেখ থাকিলে বুঝিবার পক্ষে অধিকতর সাহায্য হইত। প্রার্থনাগুলিতে তাঁহার প্রাণের গভীর আকুলতা প্রকাশ পাইয়াছে। ইহা পাঠে অনেকের প্রাণে সে ভাব জাগিবার বিশেষ সাহায্য হইবে। দুই একটি প্রার্থনা প্রকাশ না করিলেই ভাল হইত মনে হয়। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। ইহা ধর্ম্মভাব পরিপোষণে সাহায্য করিবে।

ব্রহ্মোপাসনা বিধি—ঢাকা ব্রহ্মবিদ্যা সমিতি হইতে শ্রীযুক্ত মথুরানাথ গুহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৵০, অসমর্থ পক্ষে বিনা মূল্যেও প্রদত্ত হইবে। ইহাতে রাজর্ষি রামমোহন রায়ের ১। অনুষ্ঠান (উপাসনা তত্ত্ব), ঐ শাস্ত্রীয় প্রমাণ, ২। Religious Instructions, ৩। ব্রহ্মোপাসনা, ৪। গায়ত্র্যা ব্রহ্মোপাসনা, ৫। গায়ত্রীর অর্থ, এই পাঁচ খানা পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য ইহা পাঠ করিলে সকলেই বিশেষ উপকৃত হইবেন। ব্রহ্মবিদ্যা সমিতি ইহা প্রকাশিত করিয়া খুব ভাল কাজ করিয়াছেন। তাঁহারা এতদ্ব্যতীত (১) বেদান্ত গ্রন্থ (ব্রহ্মসূত্র) (২) বেদান্ত সার, (৩) আত্মানাত্ম বিবেক ও (৪) ঈশোপনিষদের ভূমিকা, প্রকাশিত করিয়াছেন।

পণ্ডিত শিবনাথ স্মৃতি—বিগত ৩০ শে সেপ্টেম্বর পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের পরলোকগমনের সপ্তম সাম্বৎসরিক উপলক্ষে প্রাতে মন্দিরে বিশেষ উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। সায়ংকালে মন্দিরে স্মৃতিসভার অধিবেশন হয়। তাহাতে শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় সভাপতির কার্য্য করেন এবং শ্রীমতী কুমুদিনী বসু, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী ও শ্রীযুক্ত নলিনী কুমার দত্ত প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা করেন। ভবানীপুর সম্মিলন ব্রাহ্মসমাজেও উক্ত সময়ে স্মৃতি-সভা হয়। তাহাতে স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় সভাপতির কার্য্য করেন এবং শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত বিপিন চন্দ্র পাল প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। মফঃস্বলেরও অনেক স্থানে উপাসনাদি হইয়াছে। তাহার বিবরণ এখন পর্য্যন্ত আমাদের হস্তগত হয় নাই। গিরিডি ব্রাহ্মসমাজে প্রাতে উপাসনা হইয়াছিল। তাহাতে শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বিশ্বাস আচার্য্যের কার্য্য করেন।

প্রাপ্তি স্বীকার—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক, বর্ত্তমান বর্ষের ১লা এপ্রিল হইতে ৩১শে মে পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত দানপ্রাপ্তি কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছেন :—

শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ মল্লিক মাতার আদ্য শ্রাদ্ধে সাধারণ ফণ্ডে ৫৲; মিঃ ও মিসেস্ এইচ মৈত্রেয়—নবদ্বীপ স্মৃতিফণ্ডে ৩০৲; শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার এল্লেপী সমাজের জন্য ৫৲; রায় সাহেব প্রমদারঞ্জন রায় ঐ বাবত ১৫।০; শ্রীযুক্ত শ্রীপতি নাথ দত্ত দ্বিতীয় পুত্রের নামকরণে দাতব্যবিভাগে ২৲ ও প্রচারে ২৲; মিসেস্ পুণ্যপ্রভা ঘোষ পিতার আদ্যশ্রাদ্ধে সাধারণ ফণ্ডে ৪৲, প্রচারে ৪৲ ও দাতব্য বিভাগে ৪৲; মিস্ এ ঘোষ সাধারণ ফণ্ডে ১০০৲ ও সাধনাশ্রমে ১০০৲; মিঃ কে, কে, চাটার্জ্জী মাতার বার্ষিক শ্রাদ্ধে প্রচারে ১০০৲; শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ পত্নীর বার্ষিক শ্রাদ্ধে প্রচারে ২৲, দাতব্য বিভাগে ।।৵৲, কলিকাতা উপাসকমণ্ডলীতে ১৲ ও সাধনাশ্রমে ১৲; রায় সাহেব প্যারীমোহন দাস প্রচারে ২॥০; শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র সিংহ ও তাঁহার ভ্রাতা কর্ত্তৃক তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বার্ষিক শ্রাদ্ধে প্রচারে ২৲; পরলোকগত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের আত্মীয়গণ কর্ত্তৃক তাঁহার শ্রাদ্ধে সাধারণ ফণ্ডে ২০৲ ও প্রচারে ২০৲; শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ ঘটক পুত্রের নামকরণে প্রচারে ২৲ শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রকুমার বিশ্বাস ইন্দুপ্রভা চট্টোপাধ্যায় ফণ্ডের মূলধন বৃদ্ধি ৫০৲; মিস্ হেমলতা মজুমদার অবিনাশচন্দ্র মজুমদার ফণ্ডের মূলধন ৫০০৲; শ্রীযুক্ত জীবনপ্রদীপ মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ পিতার আদ্যশ্রাদ্ধে প্রচারে ৫৲ ও দরিদ্র ব্রাহ্ম পরিবার ফণ্ডে ১০৲; নারায়ণগঞ্জ ব্রাহ্ম সমাজ এল্লেপী সমাজের জন্য ৫৲; শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু সাধারণ ফণ্ডে ২৲; মিসেস্ সুকুমারী সেনগুপ্ত পিতৃব্যের আদ্য শ্রাদ্ধে সাধারণ ফণ্ডে ৫৲ ও নবদ্বীপ স্মৃতিফণ্ডে ১০৲; শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল সরকার পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধে প্রচারে ৫৲, সাধনাশ্রমে ২৲ ও দাতব্য বিভাগে ৩৲; মিসেস্ কৈলাসবাসিনী গুহ পতির আদ্য শ্রাদ্ধে স্থায়ী প্রচার ফণ্ডে ২৫৲, নবদ্বীপ স্মৃতি ফণ্ডে ৫৲, শিবনাথ স্মৃতিফণ্ডে ৫৲, সাধনাশ্রমে ৫৲ ও দাতব্যবিভাগে ৫৲; মিঃ এস্, এন্, সেন ও তদীয় ভ্রাতৃগণ পিতৃশ্রাদ্ধে সাধারণ ফণ্ডে ১০০৲; শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী বসু মাতার বার্ষিক শ্রাদ্ধে প্রচারে ৩৲; ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার জ্যেষ্ঠা কন্যার আদ্যশ্রাদ্ধে প্রচারে ১০৲; মিঃ জে এন্, দাস শিবনাথ স্মৃতিফণ্ডে ১০৲।

বিজ্ঞাপন

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার সভ্যমনোনয়নার্থ নিয়মাবলীর ২য় ধারা অনুসারে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণকে জ্ঞাপন করা যাইতেছে, যাঁহারা আগামী বর্ষের অর্থাৎ ইং ১৯২৭ সালের অধ্যক্ষ সভার সভ্য হইয়া সমাজের কার্য্যের সহায়তা করিতে ইচ্ছুক আছেন, তাঁহারা যেন আগামী ১৫ই নভেম্বরের মধ্যে স্ব স্ব নাম, ঠিকানা ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিবরণ সম্পাদকের নামে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্যালয়ে পত্র দ্বারা জানাইয়া বাধিত করেন। সভ্যপদপ্রার্থীর বয়স অন্যূন ২৫ বৎসর হওয়া, তিন বৎসর কাল সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সভ্য থাকা এবং আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম হওয়া আবশ্যক।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয় ২১১নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১লা অক্টোবর, ১৯২৬	শ্রীব্রজসুন্দর রায়। সম্পাদক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

আগামী ৩০শে অক্টোবর, ১৯২৬ সাল, শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকার সময় ২১১নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা মন্দিরে সমাজের অধ্যক্ষ সভার তৃতীয় ত্রৈমাসিক সভার অধিবেশন হইবে। সভ্যগণের উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়।

আলোচ্য বিষয়—

১। তৃতীয় ত্রৈমাসিক কার্য্যবিবরণী ও হিসাব।

২। শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর রায়ের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক পদে নিয়োগ হেতু তৎস্থলে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার একজন সভ্য নিয়োগ।

৩। শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার সেন নিম্নলিখিত প্রস্তাবদ্বয় উপস্থিত করিবেন :—

(ক) "Resolved that the Executive Committee be requested to take necessary steps, for re-organsing, wherever such reorganisation is necessary, the various institutions affilitated to the S. B. Samaj."

(খ) Resolved that the Executive Committee be requested to make special efforts for extending social service activities in an organised way."

৪। বিবিধ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয় কলিকাতা, ২৬।৯।২৬	শ্রীব্রজসুন্দর রায় সম্পাদক, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় দ্বারা ২২শে আশ্বিন মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—বরদাকান্ত বসু, বি-এ

Registered NO 65

অসতো মা সদগময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮[illegible] জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৬ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৪৯ম ভাগ।	১লা কার্ত্তিক, সোমবার, ১৩৩৩, ১৮৪৮ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯৭	প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০
১৩শ সংখ্যা।	18th October, 1926.	অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

হে ধর্ম্মাবহ চিরকল্যাণদাতা পিতা, তুমি সকল পুণ্য ও কল্যাণের এক মাত্র প্রস্রবণ হইয়া, আমাদের জন্য অতি সরল পথই নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছ—আমরা যদি একমাত্র তোমাকেই লক্ষ্যস্থানে রাখিয়া, তোমার নির্দ্দেশ অনুসরণ করিয়া চলি, তাহা হইলে আমরা কখনও পুণ্য ও মঙ্গল হইতে বিচ্যুত হই না, অধর্ম্মে ও অকল্যাণে পতিত হই না। আমরা তোমাকে লক্ষ্যস্থানে না রাখিয়া, আপনার ভাবে আপনার পথে চলিতে যাইয়াই বিভ্রান্ত ও দুর্গতিগ্রস্ত হই, অবনতির পথে দ্রুত ধাবিত হই। তোমার পথ সূক্ষ্ম হইলেও কষ্টকর নহে, দুর্ব্বোধ্যও নয়—সামান্য চেষ্টা যত্ন থাকিলে সকলেই তাহা সহজে বুঝিতে ও অনুসরণ করিতে পারে—তাহাতে আনন্দ এবং আরামও যথেষ্টই রহিয়াছে। তবুও যে কেন আমরা বৃথা সুখের আশায় বিপথে ছুটিয়া বেড়াই, বুঝি না। সাময়িক সুখের পশ্চাতে যে মহা দুঃখ বেদনা ও অকল্যাণ রহিয়াছে, বারংবার তাহার পরিচয় পাইয়াও আমাদের মোহ ভাঙ্গে না। কিন্তু তাই বলিয়া, হে করুণাময় পিতা, তুমি আমাদিগকে আপনার পথে চলিতে ছাড়িয়া দেও না—তোমার জীবন্ত মঙ্গলবিধাতৃত্ব আমাদিগকে তোমার পথে আনিবার জন্য সর্ব্বদাই নিযুক্ত রহিয়াছে, নিয়তই আমাদের প্রাণে নানা সাধু সংকল্প জাগাইতেছে, আমাদের স্বেচ্ছাচারিতাকে তিরস্কার করিতেছে। তোমার অসীম প্রেম আমাদিগকে এই ভাবে বেষ্টন করিয়া না রাখিলে, আমরা যে কোথায় যাইয়া পড়িতাম জানি না। হে পবিত্রস্বরূপ পুণ্যময় দেবতা, তোমার পুণ্য পবিত্রতাতে আমাদিগকে তুমি মণ্ডিত কর; আমরা যেন আর কোনও প্রকারেই তোমার পথ পরিত্যাগ করিয়া বিপথে না যাই, তুমি আমাদিগকে সে বুদ্ধি ও শক্তি প্রদান কর। তোমার পবিত্র ইচ্ছাই আমাদের সকলের জীবনে জয়যুক্ত হউক। তোমার পুণ্যরাজ্য সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হউক। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

নিবেদন।

সত্যের তাপ—কৃষ্ণ যখন অর্জ্জুনকে তাঁর বিশ্বরূপ দর্শন করা'লেন, তখন অর্জ্জুন [illegible] তাপ সহ্য করতে না পেরে ব'লে উঠলেন, "সম্বর, সম্বর, তোমার ঐ বিশ্বরূপ সম্বরণ কর; মানুষরূপে দেখা দাও।" অনেকে নিখুঁত সত্য, খাঁটি সত্যের তাপ সহ্য করতে পারে না; তারা সত্যের সঙ্গে একটু মিথ্যা, একটু রং না মিশা'লে সইতে পারে না। সোজা খাঁটি সত্য পথে তাঁরা চলতে পারে না! অনেকে পবিত্র হ'তে চায়, কিন্তু মনকে সব কলুষ হ'তে নির্ম্মুক্ত করতে সাহস করে না; কলুষের যে সুখ, তাহা হইতে একেবারে বঞ্চিত হ'তে কষ্ট বোধ করে। অনেকে সরল হ'তে চায়, কিন্তু যখন স্বচ্ছ সরলতা স্বার্থের হানি করে, তখন তারা ভয় পায়। অনেকে খাঁটি পথে চলতে চায়, কিন্তু যখন অভিসন্ধিবর্জ্জিত হ'য়ে চলতে হয়, তখনই তাদের আশঙ্কা হয়। তাই দেখা যায়, অর্জ্জুনের মত বিশ্বরূপের উজ্জ্বল তেজোময় বিরাট মূর্ত্তি সকলে দেখতে পারে না—চোখ ঝল্‌সিয়ে যায়। নিখুঁত সত্য, অবিমিশ্র প্রেম, নিষ্কলঙ্ক শুদ্ধতা, অভিসন্ধিবিহীন সরলতা সকলের সয় না। অথচ ঐ পথই এক মাত্র অবলম্বনীয়।

তুমিই শিখাও—আমি ত কোথাও কিছু বুঝ্‌তে না পেরে তোমারই কাছে এসে বসেছি। কত গ্রন্থ পড়্‌লাম, কত

ব্যাখ্যা শুনলাম, আমার ত অর্থবোধ হলো না! লোকে কত তত্ত্ব লাভ করে, কত তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে, বই প'ড়ে প'ড়ে জীবন গঠন করে, আদর্শ রচনা করে! আমার সে তত্ত্ব, সে ব্যাখ্যা বুঝ্‌বার শক্তি কোনও দিনই হলো না—বই প'ড়ে যাই, মনে তার দাগ থাকে না। তাই পড়া ছেড়ে দিয়েছি। জগৎরহস্য পাঠ করতে পারি না; লোকে আকাশের দিকে তাকায়, কত সৌন্দর্য্য দেখে! পাহাড়ে, সমুদ্রে, বৃক্ষের পত্রে পুষ্পে, লতায় পাতায় কত সৌন্দর্য্য দেখে! জ্যোৎস্নালোকে কত মাধুর্য্য দেখে' মুগ্ধ হয়! আমার সে দৃষ্টি নাই; আমার প্রাণত মুগ্ধ হয় না, হৃদয় খোলে না—কোনও তত্ত্বের সন্ধান পাই না। সাধুদর্শনে যেতে আমার ইচ্ছা হয় না; তাঁদের কথা শুনি—কত লোক তাঁদের নিকট যেয়ে জীবনে নূতন আলোক পায়। আমি তাঁদের কথা শুনি, কিন্তু মন যেতে চায় না। আমি তাই সব ছেড়ে তোমার দ্বারেই আসি। তুমি যদি প্রাণে কথা বল, তুমি যদি তত্ত্ব ব্যাখ্যা কর, তুমি যদি পথ ব'লে দেও, তবেই আমি বেঁচে যাব। নতুবা আমার মৃত্যু। তোমার চরণে ব'সে আছি, তোমারই আসার আশায় চেয়ে আছি। তুমি শিখাবে, তবেই শিখ্‌ব; নতুবা আমার আর পথ নাই।

একলাই কি থাক্‌বো?—সব কাজ হ'তে বিরত হ'য়ে, সকলের সঙ্গ হ'তে বিচ্যুত হ'য়ে, আমাকে কি একলাই থাকতে হবে? যত দিন যায়, ততই দেখি, বন্ধু বান্ধব যারা সব দূরে স'রে যাচ্ছে। যে আদর্শ নিয়ে বাহির হ'য়েছিলাম তা কোথায় যেন চ'লে গেল! কেহই তা ধ'রে রাখ্‌ল না। চারিদিক হ'তে কি নূতন স্রোত এসেছে, সব ভাসিয়ে নিয়ে গেল! এ কি সভ্যতা! এ কি নূতন ভাব! সত্য মিথ্যার ব্যবধান নাই; নীতি দুর্নীতির ভেদ নাই; সংযম ও বিলাসে তফাৎ নাই! কেবল আমোদ, কেবল কলহ, কেবল অপ্রেম! আমরা কত বই পড়েছি, কত তত্ত্ব জেনেছি, কত ভাষা শিখেছি! ভাষার আবরণে, যুক্তি তর্কের পরদার আড়ালে, কি যে ভাব লুকিয়ে রেখেছি! কি প্রবল স্রোত এসেছে! এ যে দামোদরের বন্যা, এ যে দৌলৎখাঁর চৌদ্দ হস্ত জল, এ যে কালীবাই নদীর বাঁধভাঙ্গা স্রোত! সব ভেসে গেল! যারা সঙ্গে ছিল, আদর্শের নিসান ধ'রে ছিল, উচ্চ ভূমিতে দাঁড়িয়ে ছিল, তারাও স্রোতে ভেসে গেল! কা'কে দুঃখের কথা বলি! প্রাণ ভেঙ্গে পড়ে, অশ্রুতে বক্ষ প্লাবিত হয়। তা হ'লে কি সব ছেড়ে দিয়ে একলাই থাক্‌বো! আপনার ভিতরেই আপনি লুকিয়ে থাক্‌বো!

সম্পাদকীয়

পুণ্যার্জ্জনের 'সহজ পন্থা'—স্বভাবতঃই মানব-হৃদয় নানা মহৎ ভাবে পূর্ণ! বিবিধ দুষ্ক্রিয়াতে নিমজ্জিত ঘোর পাপীর হৃদয়েও অনেক সময়ই সাধু আকাঙ্ক্ষা জাগে—সে কিছুতেই পাপ মলিনতার মধ্যে চির তৃপ্ত হইয়া থাকিতে পারে না, আপনা হইতেই তাহার অন্তরের অন্তরে একটা উন্নততর ও পবিত্রতর জীবনের জন্য আগ্রহ উপস্থিত হয়। তাহার ধর্ম্ম ও পুণ্যের আদর্শের সঙ্গে অনেক ভুল ভ্রান্তি জড়িত থাকিতে পারে, অন্যের বিচারে তাহা তত উচ্চ ও বিশুদ্ধ না হইতে পারে; তথাপি সে মহত্তর কিছু চায়, তাহার জন্য যথাশক্তি চেষ্টা যত্নও করে। তবে যে সে সফলতা লাভ করিতে পারে না, তাহার কারণ ইচ্ছা ও আগ্রহের অভাব নয়, তজ্জন্য যতটা শ্রম ও কষ্টসহিষ্ণুতা আবশ্যক তাহাতে আলস্য ও অবহেলা। অধিকাংশ মানুষই, বিনা আয়াসে, বিনা ব্যয়ে, একটা সহজ উপায়ে উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য লালায়িত, তদুপযোগী মূল্য প্রদান করিতে বা ক্লেশকে বরণ করিয়া লইতে মোটেই প্রস্তুত নয়। এই হেতুই দস্যু তস্করও, পাপলব্ধ অর্থের অংশ দেবসেবায় ব্যয় বা ধর্ম্মার্থে দান করিয়া সহজে পুণ্য সঞ্চয় করিবার জন্য সর্ব্বদা যত্নশীল হইয়া থাকে।

মানুষের এই দুর্ব্বলতা দেখিয়াই এক শ্রেণীর স্বার্থপর লোক জানিয়া শুনিয়াই অপরকে বিভ্রান্ত করিয়াছে, কোনও প্রকারেই বুঝিতে দেয় নাই যে ইহাতে ধর্ম্মও নাই, পুণ্যও নাই—চিরকাল তাহাদিগকে অজ্ঞতার মধ্যে ডুবাইয়া রাখিতেই বিবিধ প্রকারে চেষ্টা করিয়াছে। সে যাহা হউক, তাহাদের বিষয়ে আর কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। অজ্ঞতাহেতু নহে, পরিষ্কার জানিয়া বুঝিয়াও যে অনেকে এই পন্থা অবলম্বন করে, এই দুর্ব্বলতার হস্ত হইতে আপনাদিগকে মুক্ত করিতে পারে না, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা পরিতাপের বিষয়। মঙ্গলময় বিধাতা ধর্ম্ম ও পুণ্যকে মানবের পক্ষে একদিকে যত সহজ ও স্বাভাবিকই করুন না কেন, অপরদিকে তাহাকে একেবারে অনায়াসলভ্য করেন নাই—তাহাকে যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া অর্জ্জন করিতে হইবে, তাহার জন্য একটা মূল্য প্রদান করিতে হইবে, এরূপ ব্যবস্থাই করিয়াছেন। একটি গ্রীক আখ্যায়িকা আছে যে, হারকিউলিশ যখন যৌবনে পদার্পণ করিয়া এক দিবস নির্জ্জনে চিন্তা করিতেছিলেন জীবনে কোন্ পথ অনুসরণ করিবেন, তখন সহসা তাঁহার নিকট দুইটি মহিলা উপস্থিত হইলেন। উহাদের একটি সরল স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে ও মহিমাতে মণ্ডিত, অপরটি কৃত্রিম সাজ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া অপরকে আপনার দিকে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টায় নিয়ত ব্যস্ত। হারকিউলিশের নিকটবর্ত্তী হইলে দ্বিতীয়া পশ্চাৎ হইতে দৌড়িয়া তাড়াতাড়ি সম্মুখে যাইয়া বলিলেন "হারকিউলিশ, তুমি আমার পথ অনুসরণ কর, আরামে ও সুখে তোমার দিন কাটিবে, তোমাকে কোনও পরিশ্রম করিতে হইবে না, একটুকুও কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে না, কোন প্রকার গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসার জন্য মাথা ঘামাইতে হইবে না, বিবিধ ইন্দ্রিয়ের উপভোগ্য বস্তুদ্বারা তাহাদের তৃপ্তিসাধনই তোমার একমাত্র কাজ হইবে—সুদৃশ্য, সুশ্রাব্য, সুপেয়, সুগন্ধ ও কোমল স্পর্শযুক্ত যাহা কিছু চাও, সমস্তই অনায়াসে প্রাপ্ত হইবে।" হারকিউলিশ তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর করিলেন "আমার শত্রুগণ আমাকে (ইন্দ্রিয়) সুখের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া থাকেন, কিন্তু আমার সেবকগণ জানেন আমি কল্যাণময়ী আনন্দদাত্রী দেবী"। ইতিমধ্যে প্রথমা ধীরপাদক্ষেপে

আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি হার্কিউলিশকে বলিলেন "তুমি যেরূপ সদ্বংশজাত ও যে প্রকার শিক্ষাদি প্রাপ্ত হইয়াছ, তাহাতে আমার বিশ্বাস তুমি আমার অনুসরণ করিয়া নিজের ও আমার জন্য অক্ষয় গৌরব অর্জ্জন করিবে। আমি তোমাকে মিথ্যা স্তোকবাক্যদ্বারা ভুলাইতে চাহি না। প্রকৃত আনন্দ কল্যাণ ও গৌরব লাভ করিতে হইলে বীরের ন্যায় অনেক পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে। বিনা কষ্টে ও শ্রমে কোনও মহৎ কার্য্য সাধিত হয় না। দেবতাগণ প্রত্যেক মহৎ ও আনন্দকর বিষয়ের একটা মূল্য নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, বিনামূল্যে কেহ কোন দিন প্রকৃত সুখ ও কল্যাণ লাভ করিতে পারে নাই। তুমি নিশ্চয়ই প্রকৃত বীর পুরুষের ন্যায় সংগ্রামে নিযুক্ত হইয়া, সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া জয়মাল্য লাভ করিতে কুণ্ঠিত হইবে না।" তখন দ্বিতীয়া বলিলেন "দেখ্‌লে, ইহার নিজের কথায়ই প্রকাশ পাইতেছে, ইহার পথ কত কঠিন! আর আমার পথ কেমন সহজ!—বিনা আয়াসেই যাহা কিছু লোভনীয় ও লভনীয় সমস্ত পাইবে।" প্রথমা ঘৃণাভরে উত্তর করিলেন "তুমি যে কি প্রকার সুখ প্রদান করিবে তাহা ত স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে—নানা কৃত্রিম উপায়ে প্রবৃত্তির উত্তেজনা ও তৃপ্তিসাধনের চেষ্টাই তোমার একমাত্র কাজ। তোমার প্রকৃত স্বরূপ ও কীর্ত্তি কখনও কেহ তোমার সম্মুখে প্রকাশ করে নাই—তোমার সেবকগণ মিথ্যা কাল্পনিক সুখের বৃথা অন্বেষণে যৌবনকাল নষ্ট করে, আর বার্দ্ধক্যের জন্য জরা ব্যাধি, দুঃখ তাপ, অনুশোচনা সঞ্চয় করে। আর শিল্পী কর্ম্মী, প্রভু ভৃত্য, উচ্চ নীচ, সকল শ্রেণীর কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ব্যক্তিগণই আমার অনুচর। তাহাদের চির জীবনই আনন্দ ও কল্যাণে কাটিয়া যায়, কখনও তাহাদিগকে লাঞ্ছিত হইতে হয় না, অনুশোচনাও করিতে হয় না।" হার্কিউলিশ কাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনই সে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। আমাদের দেশের শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ের দ্বন্দ্বও এই শিক্ষাই প্রদান করে। সকল মহৎ জীবনই এই একই তত্ত্ব প্রচার করিতেছে। সকলেই জানে শ্রম সংগ্রাম ও কষ্ট স্বীকার ব্যতীত প্রকৃত কল্যাণ ও আনন্দ লাভের, ধর্ম্ম ও পুণ্য অর্জ্জনের, কোনও সহজ পন্থা নাই—রাজবর্ত্ম নাই। তথাপি অধিকাংশ মানুষ কার্য্যতঃ ইহার বিপরীত পন্থাই অবলম্বন করিতেছে। শুধু যদি তাহা করিয়াই ক্ষান্ত হইত, সরলভাবে কষ্টসাধ্য শ্রেয়ঃ বা কর্ত্তব্যের পথ পরিত্যাগ করিয়া সহজসাধ্য প্রেয় বা ইন্দ্রিয়-সুখজনিত আমোদ প্রমোদের পথই অনুসরণ করিত, তাহা হইলেও তত অনিষ্টের কারণ ঘটিত না—লোকে অল্পকালের মধ্যে আপনাদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া সে পথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইত, তদতিরিক্ত একটা নূতন পাপেও লিপ্ত হইত না। কিন্তু মানুষ যে অনেক সময় অন্তরস্থিত নীরব বিবেকবাণীকে শান্ত করিবার জন্যই হউক, অথবা একটা কাল্পনিক আত্মগৌরব অনুভব করিবার উদ্দেশ্যেই হউক, সেই পথকেই মিথ্যা মহত্ত্বে মণ্ডিত করিয়া শ্রেয়ঃ বা কর্ত্তব্যের পথ বলিয়া আপনার ও জগতের নিকট প্রতীয়মান করিতে ব্যগ্রভাবে সচেষ্ট হয়, ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর অনিষ্ট ও পরিতাপের কথা। ইহাতে যে শুধু ভ্রমনিরসন ও সংশোধন সুদূর-পরাহত হয় তাহা নহে, কপটতা ও মিথ্যা গর্ব্ব আত্মাকে নূতন পাপে লিপ্ত করিয়া অধিকতর অধঃপতনের দিকেও লইয়া যায়। সর্ব্বাপেক্ষা চিন্তার বিষয় এই যে, এই দোষটা অশিক্ষিত সভ্যতা-বর্জ্জিত সরল লোকদের মধ্যে যত না দেখিতে পাওয়া যায়, শিক্ষাভিমানী কৃত্রিমতায় পূর্ণ সভ্য শ্রেণীর মধ্যেই তদপেক্ষা অনেক বেশী দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাকে সভ্যতার একটা আনুষঙ্গিক অঙ্গ বলিলে বোধ হয় গুরুতর সত্যের অপলাপ হইবে না। এই বাহ্যিক সভ্যতার যুগে মানুষ বাহির ও প্রদর্শন লইয়া যেরূপ ব্যস্ত, অন্তর ও খাঁটি হওয়ার চেষ্টা লইয়া বোধ হয় ততটা নয়। বিশেষতঃ মিথ্যা যুক্তিতর্কের আবরণে প্রকৃত স্বরূপটিকে আচ্ছাদিত করিতে আর কেহই ইহাদের সমান পটু নহে। অনেক বিষয়েই ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাই বলিয়া বর্ত্তমান সভ্যতা হইতে যে অনেক সুফল প্রসূত হয় নাই, নানা উন্নতি ও কল্যাণ সাধিত হয় নাই, আমরা কখনও এমন কথা বলিতেছি না। ইহা যে মানবমণ্ডলীর বিচ্ছিন্ন দূরবর্ত্তী অংশগুলিকে অধিকতর নিকটবর্ত্তী করিয়া পরস্পরের বহুবিধ কল্যাণ সাধন করিয়াছে, মানব হৃদয়কে উদার ও প্রশস্ত করিয়া অপরের জন্য অধিকতর ভাবিতে ও খাটিতে সমর্থ করিয়াছে, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। এই প্রেমের প্রসার যে সেবার ভাবকে ও তাহার ক্ষেত্রকে অনেক বর্দ্ধিত করিয়াছে, তাহা সকলকে স্বীকার করিতেই হইবে; কিন্তু তৎ সঙ্গে ইহার মধ্যেও যে বহু লোকের হৃদয়ে প্রদর্শন ও বাহ্যিক আড়ম্বরের ভাবটাও প্রবলতর হয় নাই তাহা বলা যায় না। বর্ত্তমানে দুর্ভিক্ষ ঝটিকাবর্ত্ত জলপ্লাবন প্রভৃতি দৈব দুর্ব্বিপাকে আর্ত্তের সেবার জন্য দূরবর্ত্তী লোকদের মধ্যেও যে অধিকতর আগ্রহ ও সংঘবদ্ধ চেষ্টা দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা বিশেষ সুখের বিষয়। সংঘবদ্ধ আয়োজন ব্যতীত শুধু ব্যক্তিগত চেষ্টার দ্বারা এসকল কার্য্য যে সুসম্পন্ন হইতে পারে না তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। আর সকলেই যে সাক্ষাৎ কায়িক সেবার সুযোগ প্রাপ্ত হইবে এরূপও বলা যায় না। সেবা নানা প্রকারেই করা যায়—যাহার যেরূপ সামর্থ্য ও সুযোগ আছে, সে সেই ভাবেই সেবা করিবে। যথাশক্তি অর্থাদি প্রদান করিয়া বা অপরের নিকট হইতে তাহা সংগ্রহ করিয়াও সেবা করা সম্ভবপর। কিন্তু যাহাই করা হউক না কেন, তাহার মূলে খাঁটি সাত্ত্বিক সেবার ভাবটি থাকা চাই, রাজসিক বা তামসিক ভাব থাকিলে তাহাতে ধর্ম্মও নাই কল্যাণও নাই। উদার প্রেমপ্রসূত পরদুঃখকাতরতাই যে সেবার প্রাণ ও মূল প্রস্রবণ, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। প্রাণের টানেই, আপনার তৃপ্তি ও বিকাশের জন্যই, সেবা করিতে হয়। তাহাতে অপরেরও উপকার সাধিত হয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু সেবা ও পরোপকারকে একার্থবোধক বা সমপর্য্যায়ভুক্ত করিলে, অথবা পরোপকারকে সেবার প্রধান লক্ষ্য মনে করিলে, গুরুতর ভ্রমে পতিত হইতে হইবে। সেবার সঙ্গে পরোপকারের ভাবকে মিশ্রিত করিতে গেলেই উহার বিশুদ্ধতাকে নষ্ট করা হইবে, উহাকে পঙ্কিল করা হইবে। পরোপকারসাধনের সঙ্গে অহঙ্কার ও কৃপা-প্রদর্শনের ভাব জড়িত রহিয়াছে। সাত্ত্বিক সেবার মধ্যে

তদ্দ্বারা আপনার কল্যাণ সাধনের ভাব, সেবা করিয়া আপনি কৃতার্থ হইবার ভাবই, প্রধান ভাবে কার্য্য করে, উহাই লক্ষ্য স্থানে থাকে। তাহা না থাকিলে আত্মার কল্যাণের পরিবর্ত্তে অকল্যাণই, অধোগতিই, সংসাধিত হয়। হয়ত এই দ্বিতীয় শ্রেণীর সেবা বা পরোপকার দ্বারাও অপরের কিছু বাহ্যিক উপকার সাধিত হয়, কিন্তু তাহার পক্ষেও উহা উপকার অপেক্ষা অধিকতর অকল্যাণই উৎপন্ন করে। কেন না, উহাতে তাহাকে আপনার নিকটেও ছোট করিয়া দেওয়া হয়, সরল সহজ ভাবে হৃষ্টচিত্তে মাথা হেঁট না করিয়া ভাইয়ের নিকট হইতে প্রেমের দান গ্রহণ করতে দেয় না—কৃপার দান হৃদয়কে কেবল সঙ্কুচিত ও ব্যথিতই করে। এই জন্যই যে কোনও ভাব হইতে প্রসূত সেবা বা দানের কোনও একটা অলৌকিক মাহাত্ম্য বা পুণ্যফল আছে মনে করা নিতান্তই অযৌক্তিক ও ভ্রমপূর্ণ। পরন্তু তাহা অনিষ্টকরও; তাহা না হইলে, আমাদের এ বিষয়ে আলোচনা করিবার বিশেষ কোন প্রয়োজন ছিল না। একটি আধুনিক ঘটনাই আমাদের নিকট এই চিন্তাটা উপস্থিত করিয়াছে। মেদিনীপুর জলপ্লাবনে পীড়িত লোকদের সেবার্থে যে সকল আয়োজন হইয়াছে, তাহাতে আমরা একদিকে আনন্দিত হইলেও অপর দিকে কোন কোন বিষয়ে অল্প ব্যথিত হই নাই। দেশের বিবিধ প্রতিষ্ঠান যে আর্ত্তের সেবায় আপনাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছেন, ইহা বিশেষ আনন্দের বিষয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অর্থ ও সেবক যে পরিমাণ সংগৃহীত হওয়া উচিত ছিল, তাহা হয় নাই—পূর্ব্বের তুলনায় অনেক কমই হইয়াছে। বিশেষতঃ এই উপলক্ষ করিয়া এবার যেরূপ আমোদ প্রমোদের আয়োজন হইয়াছিল সেরূপ আর কখনও হয় নাই। নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদের আমরা বিরোধী নহি—বরং নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে উহার একটা প্রয়োজনীয়তাও আছে স্বীকার করি। কিন্তু উহাকে একটা মিথ্যা মহত্বের আবরণে আচ্ছাদিত করিয়া এরূপ আত্মপ্রবঞ্চনা উৎপন্ন করা আমরা সমাজের পক্ষে মহা অনিষ্টকরই মনে করি। উদ্যোগিগণ হয়ত এরূপ ভাবে সংগৃহীত অর্থ সাধু কার্য্যে দানদ্বারা পুণ্যার্জ্জনের 'সহজ পন্থা' আবিষ্কার করিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা যদি গভীর ভাবে আত্ম পরীক্ষা করিয়া দেখেন, তাঁহাদের অন্তরের অন্তরে আর্ত্তের জন্য প্রকৃত বেদনা, দুঃস্থের দুঃখমোচনস্পৃহা, কতটা কার্য্য করিয়াছে, আর আমোদস্পৃহা এবং প্রদর্শনেচ্ছাই বা কতটা তাহাদিগকে চালিত করিয়াছে, তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই পরিষ্কার রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন নিজেরা কতটা প্রবঞ্চিত হইয়াছেন। তাহার পর যদি তাঁহারা ধীর চিত্তে ভাবিয়া দেখেন, এই আয়োজনে তাঁহাদের যে সময় ও শক্তি ব্যয়িতয় হইয়াছে, তাহা বিশুদ্ধ সেবা বা ন্যায়সঙ্গত ভাবে অর্থসংগ্রহচেষ্টায় নিযুক্ত করিলে, তাঁহারা কত অধিক উপকৃত হইতেন, আর এই পথে তাঁহাদের কতটা ক্ষতি হইয়াছে, তাহা হইলে তাঁহারা তাঁহাদের বাস্তব ভুলটা আরও উজ্জ্বলরূপে বুঝিতে সমর্থ হইবেন। তৃতীয়তঃ অপরকে মোহগ্রস্ত বা প্রলুব্ধ করিয়া তাহাদের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করা যে প্রবঞ্চনারই নামান্তর মাত্র, সুতরাং স্বীয় আত্মার পক্ষে নিতান্ত অনিষ্টকর, তাহাও অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কোনও কল্যাণার্থী ব্যক্তিরই এরূপ দুষ্কর্মে অগ্রসর হওয়া উচিত নয়। ইহা যে কোনও প্রকারেই সমর্থনযোগ্য নহে, তাহা আর অধিক করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। অন্য দিকে অপর লোকের পক্ষেও স্বেচ্ছা-প্রদত্ত দান যেরূপ কল্যাণকর, উক্ত প্রকার প্রলোভনের বশবর্ত্তী হইয়া অর্থ ব্যয় করা সেরূপই অনিষ্টকর। ইহাদ্বারা যে তাহাদের দয়া-বৃত্তি অপেক্ষা অসার আমোদ প্রমোদের প্রবৃত্তিটাই অধিকতর জাগ্রত হইয়া উঠে এবং তাহার ফলে যে অনেক সময় সাধ্যাতীত বা অন্যায় অর্থব্যয়ও সংঘটিত হয়, সে কথা বেশী করিয়া না বলিলেও চলিবে। এই সকল দর্শকদের অধিকাংশ কোন্ শ্রেণীর লোক, তাহাদের মধ্যে কয় জন উপার্জ্জনশীল, এবং স্বোপার্জ্জিত উদ্বৃত্ত অর্থ এই ভাবে ব্যয় করিয়াছেন, কেহ অযথা অর্থব্যয় করিবার পরে অনুশোচনা করিয়াছেন কি না, তাহার একটু অনুসন্ধান করিলে ইহার অনিষ্টকারিতাটা আরও উজ্জ্বল রূপে প্রতিভাত হইয়া উঠিবে। যে দিক হইতেই বিচার করা যাউক না কেন, পুণ্যার্জ্জনের এরূপ "সহজ পন্থা" যে কাহারও পক্ষেই কল্যাণকর নহে, বরং সকলের পক্ষেই সকল অবস্থায় মহা অনিষ্টকর, তাহা সহজেই প্রতীয়মান হইবে। এরূপ 'সহজ পন্থা' অবলম্বনের স্পৃহাটা যে দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে এবং এই সংক্রামক ব্যাধি যে আমাদিগকেও আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইতেছে, ইহা গুরুতর আশঙ্কার কথা। এ বিষয়ে আমাদের নিশ্চিন্ত থাকা আর শোভা পায় না। অজ্ঞতাবশতঃ উহার অগ্রসর গতি যদি আমরা লক্ষ্য না করি, তবে পরে তাহার গতিরোধ করা আর কিছুতেই সম্ভবপর হইবে না। বিশেষতঃ ধর্ম্ম ও কল্যাণের পথ যেরূপ তীক্ষ্ণ ক্ষুরধারের ন্যায় সূক্ষ্ম, সামান্য একটু বিচলিত হইলেই যেরূপ পাপ ও অকল্যাণের গভীর আবর্ত্তের মধ্যে পতিত হইতে হয়, তাহাতে প্রকৃত লক্ষ্য হইতে ক্ষণকালের জন্য দৃষ্টিকে অপসারিত করিলেই, তীক্ষ্ণ সজাগ দৃষ্টি, অবিরাম ঐকান্তিক চেষ্টা যত্ন ও নিষ্ঠা, পরিত্যাগ করিয়া উদাসীনতা অবহেলা অবলম্বন করিলেই, পদস্খলন ঘটিবে, আর অবিচলিত ভাবে সে পথে চলা বা স্থির থাকা সম্ভবপর হইবে না। লক্ষ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া দৃঢ় পদে চলিতে গেলে পথভ্রষ্ট বা বিভ্রান্ত হইবার কোনই আশঙ্কা নাই; কেন না সে পথে কোন বক্রতা নাই, নানা দিকেও উহার গতি নাই, এক সরল পথ সোজা গম্য স্থানে যাইয়া পৌঁছিয়াছে,—সে পথ সকলেই চিনিতে পারে, সরল আগ্রহ ও যত্ন থাকিলেই হইল। লক্ষ্য হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া আপনার ভাবে সহজ পথ খুঁজিতে গেলেই বিপদ, আপাতমনোরম আরাম ও সুখ অন্বেষণ করিলেই দুঃখ বেদনা ও মৃত্যু। অথচ প্রেমময় মঙ্গল-বিধাতার সরল স্বাভাবিক পথে প্রকৃত আনন্দ ও আরাম প্রচুর পরিমাণেই রহিয়াছে—প্রতি পদক্ষেপেই তাহাতে অফুরন্ত আনন্দ ও কল্যাণ। ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগকে এক দিকে যেমন ধর্ম্ম ও পুণ্যের সরল স্বাভাবিক আনন্দদায়ক পথ প্রদর্শন করিয়াছে, অপরদিকে তাহার আদর্শকেও সেরূপ উচ্চ ও মহৎ, অতি সূক্ষ্ম ও দুরধিগম্য করিয়াছে। তাহার মধ্যে বিন্দুপরিমাণ মিথ্যা

প্রদর্শন বা বাহ্যাড়ম্বরের স্থান নাই। আমরা ইহা স্মরণে রাখিয়া মোহ বশতঃ পুণ্যার্জ্জনের 'সহজ পন্থা' যেন খুঁজিতে না যাই, যথোপযুক্ত অধ্যবসায়ের সহিত সরল স্বাভাবিক পথই অনুসরণ করিয়া চলি, কষ্টকর মনে করিয়া সে পথের শ্রম পরিহার করিতে, অথবা বিনা মূল্যপ্রদানে, "বিনা ত্যাগে," "অমৃতত্ব" লাভ করিতে কখনও যেন ইচ্ছুক না হই। মঙ্গলবিধাতা আমাদিগকে শুভবুদ্ধি প্রদান করুন এবং দুর্ব্বল হৃদয়ে বল দিউন। আমরা সকল বিষয়ে তাঁহার অনুসরণ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হই। তাঁহার ইচ্ছাই সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হউক।

দ্বারকানাথ ঠাকুর ও ব্রাহ্মসমাজ।

[১৮৩৭ শকের কার্ত্তিক সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত একটি প্রবন্ধ হইতে সঙ্কলিত। সঙ্কলয়িতা শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।]

ব্রাহ্মসমাজের সহযোগী প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া তিন জনের নাম উল্লিখিত হইতে পারে,—দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, এবং বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

ব্রাহ্মসমাজ ও সেকালের দলাদলি।

কলিকাতাবাসী অনেক ধনী ব্যক্তি রামমোহন রায়ের নিকটে বৈষয়িক পরামর্শ গ্রহণ করিতে আসিতেন। বলিতে গেলে, সেই বৈষয়িক পরামর্শেরই বিনিময়ে তাঁহারা হয় নামে মাত্র ব্রাহ্মসমাজের সাহায্য করিতেন, অথবা ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধাচরণ করিতে ক্ষান্ত থাকিতেন।

এতদ্ব্যতীত, দলাদলির ফলেও ব্রাহ্মসমাজ কতকগুলি ধনী লোকের সাহায্য লাভ করিয়াছিল। সেকালে কলিকাতায় দলাদলির কিছু বেশী প্রাবল্য ছিল বলিয়া শোনা যায়। দলাদলি সেকালের ধনীদিগের সময় অতিবাহিত করিবার অন্যতর উপায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।...

ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন কালেও আমরা এই প্রকার দুইটি বিরোধী দলের অস্তিত্ব দেখিতে পাই,—এক দলের নেতা যোড়াসাঁকোস্থ ধনী সম্প্রদায়, দ্বিতীয় দলের নেতা সভাবাজারের ধনী সম্প্রদায়। এই দলাদলির মূল সূত্রপাত কোথা হইতে কি কারণে হইল তাহা আমরা অবগত নহি। কিন্তু এই দলাদলির ফলে আমরা দেখি যে যোড়াসাঁকোস্থ ধনী সম্প্রদায়ের অনেকে ব্রাহ্মসমাজের দিকে হেলিয়া পড়িয়াছিলেন, এবং সভাবাজারস্থ ধনী সম্প্রদায়ের অনেকে ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মসভার পরিপোষক হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। একটা ধর্ম্মসমাজের প্রতিষ্ঠায় বৈষয়িক পরামর্শ বা দলাদলি যে বেশী দিন অধিকার রাখিতে পারে না, তাহা বলা বাহুল্য। রামমোহন রায়ের বিলাত গমনের সঙ্গে সঙ্গে যখন ব্রাহ্মসমাজ-সংস্থাপনের প্রথম উৎসাহ কমিয়া গেল, তখন এক দিকে যেমন দলাদলির উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মসভাও বিলুপ্তপ্রায় হইয়া গেল, তেমনি রামমোহন রায়েরও 'খাতিরের' বন্ধুগণের উৎসাহ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইতে লাগিল। এই সময়ে দ্বারকানাথ ঠাকুর কর্ণধারস্বরূপে ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা না করিলে কিছুতেই তাহা রক্ষা পাইত না।...

দ্বারকানাথেরই পরামর্শে ব্রাহ্মসমাজের জন্য সংগৃহীত অর্থের উদ্বৃত্ত অংশ ৬০৮০ ছয় হাজার আশি টাকা তদানীন্তন সুপ্রসিদ্ধ ম্যাকিণ্টস্ কোম্পানীর ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখা হইয়াছিল।...

রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর ব্রাহ্মসমাজ।

রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পরে প্রথমেই ব্রাহ্মসমাজের ভার প্রধানত তাঁহার নামে-মাত্র ট্রষ্টীদ্বয় রমানাথ ঠাকুর ও প্রসন্নকুমার ঠাকুরের উপর পড়িল। ইঁহারা ঘোর বৈষয়িক লোক ছিলেন; ইঁহাদের নিকটে ব্রাহ্মসমাজ বিশেষ কোন সাহায্য লাভ করে নাই। যে তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ও চন্দ্রশেখর দেবের ইঙ্গিতে রামমোহন রায়ের মনে ব্রাহ্মসমাজ-সংস্থাপনের কল্পনা আসিয়াছিল, তাঁহারাও তাঁহার বিলাত গমনের সঙ্গে সঙ্গেই ব্রাহ্মসমাজের সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া বর্দ্ধমানরাজের অধীনে কর্ম্ম স্বীকার করিলেন। এই অবস্থায় ব্রাহ্মসমাজের অন্যতর ট্রষ্টী ও রামমোহন রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদ রায় তাহার ভার গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। রাজার বিলাত গমন অবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বের ন্যায় বজায় রাখিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিতেন। পিতার মৃত্যুর পর তাঁহাকে দিল্লীর বাদসাহের নিকট পিতার প্রাপ্য বুঝিয়া লইবার জন্য দিল্লী যাত্রা করিতে হইয়াছিল। সেখানে অনেক দিন আবদ্ধ থাকায় তাঁহাকে অনেক অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছিল। দেশে যখন তিনি প্রত্যাগমন করেন, তখন তাঁহার বিশেষ অর্থাভাব ঘটিয়াছিল, এবং সেই কারণে তিনি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে পূর্ব্ববৎ উৎসাহের সহিত যোগ দিতে পারেন নাই।

ব্রাহ্মসমাজে দ্বারকানাথ ঠাকুরের সাহায্য।

ব্রাহ্মসমাজের অদৃষ্টচক্র এইরূপে ঘুরিতে ঘুরিতে পরিণামে দ্বারকানাথ ঠাকুরের হস্তে আসিয়া পড়িল। যত দিন অন্যের দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছিল, তত দিন তিনি তাহাতে প্রত্যক্ষভাবে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিতে অগ্রসর হয়েন নাই। কিন্তু ক্রমে যখন ব্রাহ্মসমাজকে একে একে সকলে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন, তখন তিনি জনহিতৈষণা ও বন্ধুতার আকর্ষণে অভিন্নহৃদয় রাজা রামমোহন রায়ের কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তিনি তাঁহার দেওয়ান রামচন্দ্র গাঙ্গুলীর উপর সমাজ পরিরক্ষণের ভার ন্যস্ত করিলেন। গাঙ্গুলী মহাশয় কয়েক বৎসর দ্বারকানাথ ঠাকুরের অর্থসাহায্যে সমাজের কার্য্য সুপরিচালিত করিতে লাগিলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর রামমোহন রায়ের বিলাত গমন অবধি সমাজে মাসিক ৬০৲ ষাট টাকা সাহায্য করিয়া আসিতেছিলেন। ক্রমে তাহা বাড়াইয়া দিয়া ৮০৲ আশী টাকা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে ব্রাহ্মসমাজের জন্য সংগৃহীত অর্থের উদ্বৃত্ত অংশ ৬০৮০৲ টাকা দ্বারকানাথ ঠাকুরেরই পরামর্শে ম্যাকিণ্টস্ কোম্পানীর ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখা হইয়াছিল। রামমোহন রায়ের বিলাত গমনের পর এই কোম্পানী দেউলিয়া

হইবার সম্ভাবনা হইল। দ্বারকানাথ ঠাকুর তাহা পূর্ব্ব হইতেই বুঝিতে পারিয়া উক্ত ব্যাঙ্ক হইতে সেই টাকা উঠাইয়া লইয়া নিজের বাটীতে রাখিলেন।

মাসিক ৮০৲ টাকা ব্যতীত দ্বারকানাথ ঠাকুর অন্যান্য নানা উপায়ে ব্রাহ্মসমাজকে সাহায্য করিতেন। পূর্ব্বে দলাদলির কথা বলিয়া আসিয়াছি। যে সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ব্রহ্মসভার দলের কাহারও অনুষ্ঠিত ক্রিয়াকর্ম্মে দান গ্রহণ করিতেন, অথবা দুর্গোৎসবের বার্ষিক গ্রহণ করিতেন, ধর্ম্মসভাভুক্ত ব্যক্তিদিগের ক্রিয়াকর্ম্মে তাঁহাদিগের নিমন্ত্রণ ও 'বিদায়' প্রাপ্তি রহিত হইয়া যাইত; ধর্ম্মসভার সভ্যগণ তাঁহাদিগকে একঘরে করিবার ব্যবস্থা করিতেন। এই নিমিত্ত ব্রহ্মসভার দলপতিগণ স্বপক্ষীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের পোষণের নিমিত্ত অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। ১১ই মাঘ দিবসে ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে যে সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সভাস্থ হইতেন, তাঁহাদিগকে উক্ত দলপতিগণ অর্থদান করিয়া বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিতেন। রামমোহন রায়ের বন্ধুগণ ব্রাহ্মসমাজকে পরিত্যাগ করিবার পর একমাত্র দ্বারকানাথ ঠাকুরই তাঁহার শেষবারের বিলাত গমন পর্য্যন্ত সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে অর্থদান প্রভৃতি উপায়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের সম্বর্দ্ধনাপ্রথা রক্ষা করিয়াছিলেন।

দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রকৃতি।

দ্বারকানাথ ঠাকুরের পরিবার বহুকাল যাবৎ নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। আমরা পরিবারস্থ বর্ষীয়সী মহিলাদিগের নিকটে শুনিয়াছি যে তাঁহার বাটিতে মাংস দূরে থাক, পেঁয়াজ পর্য্যন্ত আসিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত ছিল। সুতরাং সেই পরিবারের শীর্ষস্থানীয় দ্বারকানাথ ঠাকুরেরও প্রকৃতি যে অনেকাংশে সত্ত্বগুণান্বিত হইবে তাহা আর আশ্চর্য্য কি?......

ব্রাহ্মসমাজসংক্রান্ত আর একটি বিশেষ ঘটনায় আমরা দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রকৃতি ও সহজাত দেশীয় ভাবের সুন্দর পরিচয় প্রাপ্ত হই। রামমোহন রায় মুসলমানী ধরণের দরবারী পোষাক পরিয়া সমাজে উপস্থিত হইতেন। 'রাজার এই এক মনের ভাব ছিল যে পরমেশ্বর মানুষের রাজা ও প্রভু। তাঁহার দরবারে যাইবার সময়ে উপযুক্ত ভাবে পোষাক পরিয়া যাওয়া উচিত। রাজরাজেশ্বরের দরবারে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইলে উপযুক্ত ভাবে উপস্থিত হওয়া কর্ত্তব্য। রাজা এই ভাবটি মুসলমানদিগের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। রাজার সকল বন্ধুগণ তাঁহার ন্যায় পোষাক পরিয়া সমাজে যাইতেন।' রামমোহন রায়ের রজঃপ্রধান প্রকৃতি হইতে এই ভাবটি উঠিয়াছিল। দ্বারকানাথের হৃদয় বিভিন্ন ভাবে পরিপুষ্ট হইয়াছিল, তাই রামমোহন রায়ের বন্ধুগণের মধ্যে একমাত্র তিনি কিছুতেই এইরূপ পোষাক পরিয়া সমাজে আসিতে সম্মত হয়েন নাই। তিনি বলিতেন যে 'পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে আসিলে অতি সামান্য পরিচ্ছদেই আসা উচিত।' দ্বারকানাথ ঠাকুর ধুতি চাদর পরিয়াই সমাজে উপস্থিত হইতেন। আমাদের সৌভাগ্য যে তিনি এ বিষয়ে পথপ্রদর্শক হইয়াছিলেন, কারণ রামমোহন রায়ের দৃষ্টান্তপ্রভাব অতিক্রম করিতে সক্ষম দ্বিতীয় ব্যক্তি আর কেহ তখন ছিলেন কি না সন্দেহ। ব্রাহ্মসমাজে আচার্য্য অবধি শ্রোতৃবর্গ পর্য্যন্ত সকলেই দরবারী পোষাকে আসিতেছেন, এরূপ দৃশ্য এখন কল্পনা করিতেও কিরূপ হাস্যকর ও বিসদৃশ বোধ হয়। অধিকন্তু এই দরবারী পোষাক প্রচলিত থাকিলে ব্রাহ্মসমাজ অতি শীঘ্রই হিন্দুসমাজ হইতে সর্ব্বতোভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িত। এই ঘটনা হইতে দ্বারকানাথ ঠাকুরের স্বাধীনতা-প্রিয়তারও বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। বয়োবৃদ্ধ ও প্রতাপ-শালী রামমোহন রায়ের নিকট সম্মানলাভের প্রত্যাশা এবং রামমোহন রায়ের মতবিরুদ্ধে কার্য্য করিলে তাঁহার বন্ধুগণের নিকটে উপহাস প্রাপ্তি প্রভৃতির ভয় থাকিলেও, দ্বারকানাথ ঠাকুর নিজের জ্ঞান-বুদ্ধির স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিতে সক্ষম হয়েন নাই।

রামমোহন রায় আসিলে জপ ছাড়িয়া উঠা।

মহর্ষিদেব এক স্থলে তাঁহার পিতার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 'পূজার অপেক্ষাও রাজার প্রতি তাঁহার ভক্তি অধিক হইয়াছিল। কখনও কখনও এমন হইত যে তিনি পূজায় বসিয়াছেন, এমন সময় রাজা তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিতেন। রাজা আমাদের গলিতে প্রবেশ করিবামাত্র আমার পিতার নিকটে সংবাদ যাইত যে তিনি আসিতেছেন। আমার পিতা তৎক্ষণাৎ পূজা হইতে উঠিয়া রাজাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিতেন।' রামমোহন রায়ের প্রতি দ্বারকানাথ ঠাকুরের ভক্তি যদি দেবপূজা অপেক্ষাও অধিক হইত, তাহা হইলে তিনি সমাজে দরবারী পোষাক পরিয়া আসা সম্বন্ধে রামমোহন রায়ের অনুজ্ঞা নিশ্চয়ই অবহেলা করিতে পারিতেন না। আমাদের অনুমান হয় যে, মহর্ষিদেব সেই সময়ে অল্পবয়স্ক বালক ছিলেন বলিয়া, (রামমোহন রায়ের বিলাত যাত্রা কালে তাঁহার বয়স বারো বৎসর মাত্র হইয়াছিল) তাঁহার পিতার কার্য্যটি সম্পূর্ণ রূপে বুঝিতে পারেন নাই। দ্বারকানাথ প্রকৃতপক্ষে পূজা করিতেছেন, অথবা নাম জপ প্রভৃতি পূজার অবান্তর অঙ্গসকল শেষ করিতেছেন, এরূপ বিচার করিবার বুদ্ধি দ্বাদশ বৎসরেরও ন্যূন বয়স্ক বালক দেবেন্দ্রনাথের হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। আমাদের বিশ্বাস যে, দ্বারকানাথ ঠাকুর পূজা সাঙ্গ করিয়া যখন নাম জপে বসিতেন, সেই সময় রামমোহন রায় উপস্থিত হওয়াতে, তিনি সেকালের প্রচলিত প্রথামত নামজপ ক্ষণকালের জন্য স্থগিত রাখিয়া রামমোহন রায়ের অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হইতেন, এবং পরে সেই অবশিষ্ট নামজপ সম্পূর্ণ করিতেন। সেকালে 'সন্ধ্যা' করিবার নির্দ্দিষ্ট সময়ে ব্রাহ্মণ মাত্রেই সন্ধ্যাকার্য্যে উপবিষ্ট হইতেন, এবং ঠিক সেই পূজার সময়ে রামমোহন রায়ের দ্বারকানাথ ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। পূজার পর নাম জপের সময়ে উপস্থিত হওয়াই একমাত্র সম্ভব অনুমিত হয়।

পূর্ব্ব বাঙ্গলা ব্রাহ্ম সম্মিলনী।

ময়মনসিংহ অধিবেশন।

প্রতি বৎসরই শারদীয় অবকাশের সময় পূর্ব্ব বঙ্গ ও আসামের ব্রাহ্মগণের সম্মিলন হইয়া থাকে। প্রায় বৎসরই ঢাকাতে এই সম্মিলনীর অধিবেশন হয়; তবে কোন কোনও বৎসর বরিশাল, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট, কুমিল্লা, বেগুড়া, ধুবড়ী প্রভৃতি স্থানেও হইয়াছে। এবৎসর ময়মনসিংহ নগরে সম্মিলনীর অধিবেশন হইয়াছিল। প্রাচীন ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ চন্দ মহাশয়ের আগ্রহেই এ বৎসর ময়মনসিংহে সম্মিলনীর এই তৃতীয় বার অধিবেশন হয়। তিনি এখন একরূপ চলৎ-শক্তি হীন। কোথাও যাইবার শক্তি নাই। এই সম্মিলনীর উৎসবে চারি দিক হইতে ব্যাকুলচিত্ত নরনারী আসিবেন, তাঁহাদের সঙ্গে দেখা ও একত্রে ব্রহ্মোপাসনা করার তাঁহার একান্ত ইচ্ছা হইল। অন্যান্য ব্রাহ্মগণও তাঁহার ইচ্ছায় অনুপ্রাণিত হ'য়ে আহ্বান করিলেন। শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি, শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ চন্দ ও শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সেন সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। অভ্যর্থনাকমিটির চেষ্টা ও উদ্যোগে এবং সর্ব্বোপরি নিষ্ঠা ও একপ্রাণতায় সম্মিলনীর কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে। যদিও এই সম্মিলনী পূর্ব্ব বঙ্গ ও আসামের ব্রাহ্মগণের জন্য, এবং এই প্রদেশের কোনও স্থানেই হয়; তবুও পশ্চিম বঙ্গ ও বিহার হইতেও অনেক ব্রাহ্ম সম্মিলনীতে আসিয়া যোগ দেন। এবার কলিকাতা, পাটনা, কাকিনা, ধুবড়ী, বরিশাল, ঢাকা, কাওরাদি, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, ফরিদপুর, কিশোরগঞ্জ, টাঙ্গাইল, কুমিল্লা প্রভৃতি নানা স্থান হইতে প্রায় দেড় শত ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা উপস্থিত হইয়াছিলেন। স্থানীয় ব্রাহ্ম ও হিন্দু অনেকেই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। সম্মিলনী উৎসব-ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। ইহাতে যে সকল উপাসনা, উপদেশ বক্তৃতা, আলোচনা হইয়াছিল, তাহাতে সকলেই আনন্দ লাভ করিয়াছেন, উপকৃত হইয়াছেন। ১৩ই, ১৪ই ও ১৫ই অক্টোবর সম্মিলনীর দিন ধার্য্য ছিল; কিন্তু তৎ পূর্ব্ব ও পর দিনও কিছু কিছু কার্য্য হইয়াছে। বিদেশাগত যাত্রিগণের আহার ও বাসস্থানের জন্য সিটিস্কুলভবন নির্দ্দিষ্ট ছিল। স্বেচ্ছা-সেবকগণ অতি যত্নের সহিত তাঁহাদের পরিচর্য্যা করিয়াছেন। যখন যাঁহার যে প্রয়োজন হইয়াছে, তাহাই বিনা বাক্যব্যয়ে তাহারা পূর্ণ করেছেন। অভ্যর্থনাকমিটির সভ্যগণও সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিয়াছেন। মহিলাগণ আহারাদির বন্দোবস্ত করিয়াছেন। সর্ব্বপ্রকার সুব্যবস্থায় সকলেই সন্তোষ লাভ করিয়াছেন এবং কর্ম্মীদিগের প্রশংসার কথা সকলের মুখে শুনা গিয়াছে। প্রায় সকল যাত্রীই ১২ই তারিখ আসিয়া উপস্থিত হন। কেহ কেহ বন্ধুবান্ধবদের বাড়ীতেও ছিলেন; কিন্তু অধিকাংশই যাত্রীনিবাসে বাস করিয়াছেন।

১২ই তারিখ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় উদ্বোধন-সূচক উপাসনা হয়; শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী উপাসনা করেন ও আধ্যাত্মিক যোগের সম্বন্ধে উপদেশ দেন। ১৩ই তারিখ বুধবার প্রাতে শ্রীযুক্ত অমৃতকুমার দত্ত প্রমুখ গায়কগণ উষা-কীর্ত্তন করিতে করিতে ব্রাহ্ম পল্লী পর্য্যন্ত গমন করেন। অপর এক দিবস ও নগরের পথে তাঁহারা উষা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। কীর্ত্তনান্তে উপাসনা হয়; শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং নিজের জীবনে ময়মনসিংহের ধর্ম্মবন্ধুগণের প্রভাব ও ভগবৎ কৃপার সাক্ষ্যের উল্লেখ করেন। উপাসনার পূর্ব্বে শ্রীনাথ বাবু স্বরচিত একটি সঙ্গীত করিয়া উপাসকগণকে উদ্বুদ্ধ করিয়া-ছিলেন। উপাসনান্তে পরস্পরের সহিত আলাপ পরিচয় হয়। ঐ দিন অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় মন্দিরেই সম্মিলনীর প্রথম অধিবেশন হয়। অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র একটি সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে ও অনেকের অনুমোদনে শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় সভাপতির পদে বৃত হন। তখন তিনি একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। সভাপতিদ্বয়ের বক্তৃতা অনেকের প্রাণকেই বিশেষ ভাবে স্পর্শ করিয়াছিল। সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকার সময় মন্দিরে, "বর্ত্তমান সমস্যা ও তাহার সমাধান" বিষয়ে বক্তৃতা হয়। মন্দির লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র সভাপতির আসন গ্রহণ করেন; শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী ও সভাপতি মহাশয়, বিষয়টির নানা দিক হইতে বক্তৃতা করেন। ১৪ই অক্টোবর প্রাতঃকালে উপাসনা হয়, শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং "ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন ও ব্রহ্ম আমাদের একমাত্র সম্বল" এই সম্বন্ধে উপদেশ দেন। তৎপরে প্রায় ১০ টার সময় সম্মিলনীর দ্বিতীয় অধিবেশন আরম্ভ হয় ও ১২টাতে শেষ হয়। প্রথমে সম্মিলনীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত মথুরানাথ গুহ গত বৎসরের রিপোর্ট পাঠ করেন। কয়েক জন নূতন সভ্য মনোনীত হন। রিপোর্ট গৃহীত হইলে পর "ধর্ম্ম সাধন" বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আলোচনা উপস্থিত করেন। শ্রীযুক্ত হরকুমার গুহ, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন দাস প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজের আভ্যন্তরীন্ অবস্থা সম্বন্ধে কিছু কিছু বলেন। তৎপর সভা স্থগিত হয়। অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় সম্মিলনীর তৃতীয় অধিবেশন হয়; তখনও "সাধন" সম্বন্ধেই আলোচনা হয়। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী, শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বসু, রায় সাহেব শরৎচন্দ্র দাস প্রভৃতি এ বিষয়ে কিছু কিছু বলেন। ৪॥০ টায় যুবক সম্মিলনীর অধিবেশন হইবে বলিয়া সভা স্থগিত হয়। সন্ধ্যা ৬॥০ ঘটিকার সময় টাউন হলে শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় "Faith and Culture" বিষয়ে ইংরেজীতে বক্তৃতা করেন। বহু লোক সভাতে উপস্থিত ছিলেন। ১৫ই তারিখ প্রাতঃকালে উপাসনা হয়; শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং ধর্ম্মসাধন সম্বন্ধে নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার উল্লেখ করিয়া উপদেশ দেন। ৯॥০ ঘটিকার সময় সম্মিলনীর চতুর্থ অধিবেশন হয়। 'প্রচার' বিষয়ে আলোচনা হয়।

শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী আলোচনা উপস্থিত করেন। শ্রীযুক্ত ললিত-মোহন দাস ও আরও কেহ কেহ কিছু বলিলে পর, ললিত বাবু প্রস্তাব করেন যে এখন বক্তৃতা বন্ধ করিয়া যাহাতে একটি মিশন ফণ্ড সংগৃহীত হয়, তার ব্যবস্থা করা হউক; এবং তিনি নিজেও কিছু অর্থ প্রদান করিলেন। তখন সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে অনেকে অর্থ প্রদান করিলেন। একশত টাকার কিঞ্চিদধিক সংগৃহীত ও প্রতিশ্রুত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্রের আহ্বানে কেহ কেহ বৎসরের মধ্যে কিছু সময় প্রচারকার্য্যে নিয়োগ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তিনি নিজে তিন মাস প্রচার করিবেন। রায় সাহেব শরৎচন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কাকিনার শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র সেন, ও রায় সাহেব সতীশচন্দ্র ঘোষ প্রচার কার্য্যে কতক সময় নিয়োগ করিবেন, প্রতিশ্রুত হইলেন। তখন বেলা ১১টা। ব্রাহ্ম বিবাহ আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিবার জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা অনুমোদন করা হইল। এই অধিবেশনেই অনাথ-ধনভাণ্ডারের জন্য শ্রীযুক্ত চণ্ডীকিশোর কুশারী সম্পাদক পদে পুনঃ নিযুক্ত হইলেন। এই দিন মধ্যাহ্নে সহরবাসী ব্রাহ্মগণও এসে বিদেশাগত যাত্রীগণের সঙ্গে প্রীতি-ভোজে যোগ দান করিলেন। অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় সম্মিলনীর পঞ্চম অধিবেশন হয়। অনাথ-ধনভাণ্ডারের ট্রাষ্টীগণ ৭ বৎসর অন্তর পুনর্নিযুক্ত হন। যে সকল ট্রাষ্টী ছিলেন তাঁদের মধ্যে ৩ জন পরলোক গমন করিয়াছেন; তাঁহাদের স্থানে নূতন লোক নিযুক্ত হইলেন। অপর ৪ জন ট্রাষ্টী পুনর্নিযুক্ত হইলেন। ব্রাহ্মজনসংখ্যাগণনার যে প্রস্তাব ছিল, তদনুসারে কার্য্য এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই, আগামী বৎসরে সম্পূর্ণ করিবার ব্যবস্থা হইল। কেহ কেহ সম্মিলনীর নাম ও সময় পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব সম্পাদক মহাশয়কে জানাইয়াছিলেন। তদনুসারে ঐ সব প্রশ্ন কার্য্য-তালিকাভুক্ত করা হইয়াছিল। কিন্তু সময় পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব কেহই উত্থাপন করিলেন না। নাম পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব এক জন উত্থাপন করিয়াছিলেন; কিন্তু কেহই তাহা অনুমোদন করিল না। নানা স্থানে ছাত্র সমাজ ও নীতি বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য গত বৎসর যে প্রস্তাব ধার্য্য হইয়াছিল তাহাই পুনঃ গৃহীত হইল এবং সকল ব্রাহ্মসমাজে এই সকল প্রস্তাব প্রেরিত হইবে স্থির হইল। আগামী বৎসরের জন্য শ্রীযুক্ত মথুরানাথ গুহ সম্পাদক পুনঃ নির্ব্বাচিত হইলেন; শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত সুললিত সরকার, শ্রীযুক্ত নীহারচন্দ্র রায় সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। নূতন কমিটি গঠিত হইল। সভাপতির অনুমতি অনুসারে শ্রীযুক্ত হরকুমার গুহ মেদিনীপুর জলপ্লাবনে ব্রাহ্ম-সমাজের কার্য্যের উল্লেখ করিয়া সকল ব্রাহ্মকে এই জন্য অর্থ-সংগ্রহে ব্রতী হইতে বলিলেন এবং সেবাকার্য্যের ভিতর দিয়া যে প্রকৃষ্ট প্রচার হয়, তদ্বিষয়ে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিলেন। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাসও এই বিষয়ে কিছু বলিলেন এবং চট্টগ্রাম বালিকা স্কুলের বোর্ডিং এর ছাত্রীগণ যে এক মাস চিনি না খেয়ে অর্থ দান করিয়াছে, তাহা উল্লেখ করিয়া সকলকে কিছু ত্যাগ স্বীকার করিয়াও বন্যা-ক্লিষ্ট লোকের জন্য অর্থ দিতে অনুরোধ করিলেন। সভাপতি মহাশয় তখন এই সেবা সম্বন্ধে বলিতে আরম্ভ করিয়া ব্রাহ্ম-সমাজের আদর্শ ও কার্য্য সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করিলে অতঃপর অভ্যর্থনা-কমিটি, স্বেচ্ছাসেবক ও সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

১৪ই তারিখ অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় সিটিস্কুলপ্রাঙ্গণে যুবক সম্মিলন হয়। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। গত বৎসরের রিপোর্ট বিবৃত হইলে, শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বসু, ডাঃ নবজীবন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত তিনটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তখন হেরম্ব বাবুর বক্তৃতার সময় হওয়াতে সভা স্থগিত হয়। বক্তৃতার পর আবার সিটিস্কুলের প্রাঙ্গণেই সভার অধিবেশন হয়। আগামী বৎসরের জন্য মিঃ আর কে দাস সভাপতি, ডাঃ নেপালচন্দ্র রায় সহকারী সভাপতি, শ্রীযুক্ত সুললিত সরকার সম্পাদক নিযুক্ত হন ও একটি কমিটি গঠিত হয়। সভাপতি মহাশয় তখন তরুণ ও তরুণীদিগকে লক্ষ্য করিয়া একটি বক্তৃতা করেন। এই যুবক সম্মিলনীতে বহু প্রবীণ ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাও উপস্থিত ছিলেন।

১৫ই তারিখ অপরাহ্ণে মহিলা সম্মিলন হয়। শ্রীযুক্তা অন্নদা সুন্দরী বিশ্বাস প্রার্থনা করেন এবং শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র সভাপতির আসন গ্রহণ ও উপদেশ প্রদান করেন। সন্ধ্যা ৬।। ঘটিকায় মন্দিরে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। পরদিনও (১৬ই তারিখ) সকালে মন্দিরে উপাসনা হয়; শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন।

এই প্রসঙ্গে আরও দুইটি বিষয়ের উল্লেখ করা আবশ্যক। শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ চন্দ মহাশয়, বার্দ্ধক্যে ও রুগ্ন শরীরে জীবনে শেষবার ব্রাহ্মদিগের সম্মিলন দেখিবেন, এই আগ্রহ ও উৎসাহে এবার ময়মনসিংহে পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসম্মিলনী আহ্বান করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার জীবন বর্ণনা করিয়া নিম্নে প্রকাশিত "জীবনকথা" নামক কবিতাটি এই উপলক্ষে লিখিয়াছিলেন। সম্মিলনীর অধিবেশনে ইহা পঠিত ও বিতরিত হইয়াছিল।

হে পথিক, একবার দাঁড়াও দাঁড়াও,
কর্ম্মহীন স্থবিরের কথা শুনে যাও।
কোথা হ'তে এলে তুমি, কোথা যাবে ভাই,
কেন এত তাড়াতাড়ি, বেলা বুঝি নাই?
হে পথিক, একদিন আমিও এমনি
চলিতাম ক্ষিপ্র-পদে, কাঁপিত ধরণী!
এখন দাঁড়াতে পদ কাঁপে থর থর,
দুটী কথা বলিতেও বাঁধে কণ্ঠস্বর!
আমারও সময় নাই, বেলা ব'য়ে যায়,
জীবনের দুটী কথা বলিব তোমায়—
শৈশবে—মায়ের কোলে, চল আগে যাই,
হাসি কান্না, ভালবাসা, আর মনে নাই!
তার পরে খুলে গেল আনন্দ-বাজার,
আত্মপর ভেদ নাই, সকলি আমার!

কত বন্ধু কতরূপে, এল কত কাছে,
কত ভাল বেসেছিল, আজও মনে আছে!
হে পথিক, কেহ এল গুরু-রূপ ধ'রে,
কত শিক্ষা, কত দীক্ষা দিল যত্ন ক'রে;
কেহ দিল জ্ঞানবুদ্ধি, কেহ দিল নাম;
সকলেই গুরু মোর, প্রণাম, প্রণাম!
সে বিদ্যা-মন্দিরে—কি বা অপূর্ব্ব মিলন!
শিষ্যের হইল লাভ, গুরুর আসন!
বহিল জ্ঞানের স্রোত, নূতন ধারায়,
কে বা গুরু, কে বা শিষ্য বুঝে উঠা দায়!
সেই তরুণ জীবনে—(আহা) কি মাহেন্দ্র-ক্ষণে—
পাইলাম স্থান এই শান্তি নিকেতনে।
নব ধর্ম্ম, নব রাজ্য, নব সমাচার,—
"যার আছে ভক্তি, পাবে মুক্তি, নাহি জাত বিচার।"
সেই রাজ্যে, হে পথিক, এল এক জন,
উ'ড়ে এসে জু'ড়ে বসে, পাখীটী যেমন!
বাঁধিয়া রাখিল মোরে মায়ার শৃঙ্খলে,
"আন্দামানে" বন্দী যেন "দায়মাল" হ'লে!
সে বন্দিশালায় আমি পাইলাম সব—
সুরেন্দ্র-আলয়ে যেন নিত্য নবোৎসব!
শান্তি পুণ্য ভক্তি—আহা, লাবণ্যের খনি—
চারুহারে শোভা করে যেন মধ্যমণি!
নিত্য নব মায়া-পাশে বাঁধিল আমায়,
তরু যথা চারিদিকে শিকড় ছড়ায়!
"আসল হ'তে সুদ বড়" প্রাণে লাগে টান;
তথাপি ছাড়িতে হবে বিধির বিধান!
ব'সিল যে প্রেম-বিন্দু, ক্ষুদ্র পরিবারে,
ছড়াইল ধীরে ধীরে প্রতি ঘরে ঘরে;
ধরিল সে বিন্দু এবে সিন্ধুর আকার,
খুলে গেল বিশ্বময় প্রেম-পরিবার!
সাধিয়া জীবন-ব্রত, যাঁহার কৃপায়,
কত শান্তি, কত তৃপ্তি পেয়েছি ধরায়,
অন্তে যেন তাঁর পদে চির শান্তি পাই,
সকলের কাছে আমি এই ভিক্ষা চাই!
"ব্রহ্মকৃপাহিকেবলম্ সবে বল ভাই।"

দ্বিতীয়তঃ শ্রদ্ধেয় প্রচারক শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী অত্যন্ত রুগ্ন হইয়া পড়াতে সম্মিলনীতে আসিতে পারেন নাই। তিনি সে জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন, এবং তাহাতে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, প্রচার বিষয়ে আলোচনা হইবার পূর্ব্বে যেন সভাপতি মহাশয় তাঁহার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন। তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করা হইয়াছিল।

ময়মনসিংহের ব্রাহ্মসম্মিলনীতে যাহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সকলের সঙ্গে মিলিত হইয়া উপাসনা ও আলোচনাদি করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিয়াছেন ও অত্যন্ত উপকৃত হইয়াছেন। পরস্পরের মধ্যে প্রীতি ও সদ্ভাববর্দ্ধনের পক্ষেও বিশেষ সহায়তা হইয়াছে। আত্মীয় স্বজনদিগকে বিদায় দিতে যেমন লোকের মনে কষ্ট হয়, পরস্পরকে ছাড়িতে যেন তেমনি কষ্টের অনুভূতি দেখা গিয়াছে এবং বৎসরান্তে পুনর্মিলনের আকাঙ্ক্ষা লইয়া সকলে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। ভগবান করুন, যে নব আকাঙ্ক্ষা প্রাণে জাগ্রত হইয়াছে, তাহা যেন স্থায়ী হয়।

অধ্যাত্ম জীবন—বিবিধ প্রসঙ্গ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সত্য কথা, পাশ্চাত্য ধর্ম্মবিধান হইতে আমাদের তিনটী জিনিস শিখিবার আছে। প্রথমতঃ এই যে, ঐহিক উন্নতি—মানুষের অন্ন বস্ত্র, আবাসগৃহ সকলের বৈচিত্র্য ও বিকাশ, শিল্প বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যরক্ষার উপায়, মানসিক চিন্তার ফলে বর্ত্তমান জগতে সভ্যতার যেরূপ অভিব্যক্তি হইয়াছে,—এই সকলের মধ্যে কিরূপে ভগবানের প্রকাশ দেখিতে হয়। এই বাণিজ্য ব্যবসায়, কল কারখানা, গাড়ী ঘোড়া, জাহাজ ব্যোমযান, কিছুইত তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছার বাহিরে নয়। শ্রম-গৌরব কর্ম্মই ধর্ম্ম, এই সকল ভাবত আমাদের দেশে নাই। "মানুষ কেবল রুটী দ্বারা বাঁচে না" এ কথা যে মহাপুরুষ বলিয়াছিলেন তাঁহারই প্রার্থনায়ই ত আছে—"আজ আমাদের রুটী দাও" (Give us this day our daily bread)। এই সকল শারীরিক সুখ সুবিধা, বৈজ্ঞানিক ও শিল্প বিষয়ক উদ্ভাবনাকে আত্মার কল্যাণের অধীন রাখা যে সম্ভবপর, ইহাই পাশ্চাত্য ধর্ম্মপিপাসুগণ জীবনের দ্বারা দেখাইতেছেন। দ্বিতীয়তঃ প্রকৃতির মধ্যে কিরূপে প্রাণ রূপে সেই পরম দেবতা প্রকাশিত হইতেছেন, সুন্দর জিনিস যে চির আনন্দোৎসব, এ কথা পাশ্চাত্য কবিগণ—Wordsworth, Shelley, Keats—প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট ত সংসার মায়া নয়, প্রকৃতি ত আবরণ নয়, যাহা পরম পিতার মুখ ঢাকিয়া রাখে। তাঁহারা আমাদের মত বলেন না—"রূপ রস গন্ধ মোরে অন্ধ ক'রে রাখে।" এই প্রকৃতির মধ্যে বিশ্বপতির সৌন্দর্য্য ও আনন্দের অভিব্যক্তি দেখিতে হইবে—যেমন ফলে পুষ্পে, তরু লতায়, পর্ব্বতে সমুদ্রে, তেমনি যাহা কৃত্রিম, যাহা মনুষ্যরচিত তাহাও সেই বিশ্বশিল্পীরই জ্ঞান ও প্রেম প্রকাশ করে। তৃতীয়তঃ আমাদের ধর্ম্মসাধন কেবল ব্যক্তিগত। তিন সন্ধ্যা ঠাকুরঘরে গিয়া উপাসনা করিয়া আসিলাম, পরমাত্মার মধ্যে আমার আত্মাকে ডুবাইয়া রাখিলাম, বা মিশাইয়া দিলাম, তবেই আমার মুক্তি হইল—আমার প্রতিবেশী, আমার সমাজ, যে আমার কাছে কিছু দাবী করিতে পারে, সে চিন্তা আমাদের নাই। Church বা ধর্ম্মমণ্ডলী আমাদের দেশে ভাল রূপে বিকাশ পায় নাই। এই সামাজিক জীবনের প্রসারতা, বিশ্বমৈত্রী, জীবে দয়া, মানবের ভ্রাতৃত্ব ও ধর্ম্মমণ্ডলীর ভাব আমাদিগকে খৃষ্ট ধর্ম্ম হইতে গ্রহণ করিতে হইবে।

আনন্দের বিষয় আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম হইতেই এই তিনটী উৎকৃষ্ট ভাব নিজের মধ্যে মিলাইয়া লইয়াছেন—ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাব ও সাধনাকে সমন্বয় করিয়াছেন। এই জন্যই ব্রাহ্মধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব, এ জন্যই ব্রাহ্মধর্ম্ম ভারতের—জগতের—ভবিষ্যৎ মহাধর্ম্ম হইবার জন্য বিধাতা কর্ত্তৃক কৃত ও প্রেরিত হইয়াছেন। আমরা যেন এই ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়া, জীবনে সাধন করিয়া, দৃষ্টান্ত ও উপদেশের সাহায্যে সর্ব্বত্র প্রচার করিতে ব্রতী হই। ভগবান আমাদের সহায়—তিনি কৃপা করিয়া এমন অমূল্য সম্পত্তির অধিকারী করিয়াছেন, আমাদের প্রতি সদয় হইয়া এই পতাকার তলে ডাকিয়াছেন, এজন্য ভক্তি বিশ্বাস, আশা ও বিনয়ের সহিত তাঁহার চরণে কৃতজ্ঞচিত্তে প্রণত হই।

ভক্ত যখন ভগবানের কোলে ফিরিয়া আসেন, তখন তাঁহার মনে কি অনাময় শান্তি, কি নির্ম্মল আনন্দ! কি বিমল জ্যোতি তাঁহার প্রাণে প্রকাশিত হয়, চৈতন্যের আলোকে তাহার নবদ্বারপুরীটি কি সুন্দর আলোকিত হয়! তিনি বিশ্বভুবনে কি সুমধুর সঙ্গীত শুনিতে পান,—সকল গ্রহ নক্ষত্র, পর্ব্বত সমুদ্র, বৃক্ষ লতা, পত্র পুষ্প, তাঁহার নিকট পরমেশ্বরের মহিমার সঙ্গীতে মুখরিত হয়; আকাশের তারা, বনের পাখী, অবিরল মহিমাময়ের যশোগীত গান করে ও আনন্দে অধীর হইয়া নাচিতে থাকে। মানবসমাজও তাঁহার কাছে প্রেমময়ের লীলা-ক্ষেত্রে পরিণত হয়—সকলের মধ্যে তিনি পরমাত্মার স্বর্গীয় প্রকাশ দেখিতে পান, সকলের সহিত তাঁহার ঐক্য ও সদ্ভাব সহজেই প্রতিষ্ঠিত হয়, তাঁহার মুখশ্রীতে এমন স্বাভাবিক সরলতা, পবিত্রতা ও প্রেমিকতা ফুটিয়া বাহির হয়, যে তাঁহাকে দেখিবা মাত্র মানুষ মুগ্ধ হয়, আকৃষ্ট হয়, তাঁহার সহিত এক বার কথা বলিতে প্রাণ জুড়ায়,—"এক দিন তাঁর সঙ্গে করিলে যাপন, দশ দিন ভুলে থাকে দুর্ব্বিনীত মন।" পৃথিবীর ধুলা মাটিতে, সংসারের দুঃখ মৃত্যু পূর্ণ অরণ্যে, মানুষের মত এমন পাপ কুটিলতাময় জীবের মধ্যে মাঝে মাঝে এমন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন, ইহা ত আমাদের আশার কথা, গৌরবের কথা। তাঁহাদের জীবনের সংগ্রাম, অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা হইতে আমরা সম্পদ্‌শালী হই, মহত্বের পথ অনুসরণ করিতে শিখি। ভক্তের জীবনে ভগবান্ যে সান্ত্বনার অমৃত বর্ষণ করেন, তাহার এক কণা পাইলেও যে মর্ত্ত্যলোকের শত শত পাপী তাপী, দুঃখী শোকী উদ্ধার পাইত। ভক্তগণ বাহিরের সমস্ত আকর্ষণ হইতে মন ফিরাইয়া, মনের লক্ষ বাসনা হইতে আত্মার মুখ ফিরাইয়া, এমন এক গভীর দেশে ডুবেন, যেখানে শান্তির হাওয়া অনন্তকাল প্রবাহিত হইতেছে। বিষয়ভোগের বাহ্যিক আবরণ ভেদ করিয়া, ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনাময় জীবন-সাগরের ঢেউ খেলা ছাড়াইয়া, তাঁহারা গভীর জল হইতে আধ্যাত্মিক মুক্তাসকল তুলেন ও মানবসমাজের দরিদ্র ভ্রাতৃগণকে বিতরণ করেন। আমরা কেবল জগতের অসার মিথ্যা খোসা নিয়াই কাড়াকাড়ি করিতেছি, সংসারে গো মেষের মত, অথবা বৃক্ষ লতার মত, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ও খাদ্য গ্রহণের জীবন চালাইতেছি, মানুষের মহত্ব—আত্মার সম্পদ্—এখনও আমাদের নিকট অপরিচিত। (শেষ)

শ্রী সতীশচন্দ্র রায়।

নূতন সঙ্গীত

ভৈরবী—আড়া

(তোমারি করুণায় নাথ—সুর)

পাপীরে পবিত্র কর, পিতা গো ডাকি তোমারে;
তোমার মত পাপীর বন্ধু কে আছে আর এ সংসারে?
আমি পাপী নরাধম, তুমি হৃদয়স্বামী মম,
দাস ক'রে ও-চরণে চিরদিন রাখো আমারে।
অপার করুণাসিন্ধু, তুমি নাকি দীনবন্ধু,
নিবারো পাপের জ্বালা, ভারাক্রান্ত পাপভারে;
যাচি নাথ কৃপাবল, নিবাও দারুণ পাপানল,
ঢালি দেও শান্তিজল; তুমি বিনা কে বা তারে?

শ্রী চন্দ্রনাথ দাস

জয়জয়ন্তী—চৌতাল

(১৮)

সকল জ্যোতির জ্যোতিঃ তুমি, সকল আলোর আলো।
চন্দ্রমা তপন, তারা অগণন, তোমার কিরণে উজ্জ্বল।
তোমার হাসিতে ফুটে উঠে ফুল, ঊষা হাসে ফুল্লমনে,
তোমার গানেতে মগ্ন সিন্ধু নদী, বিহঙ্গম গায় বনে।
তোমার আনন্দে ভাসে চরাচর, শিশু মাতৃকোলে নাচে,
আনন্দবারতা ঘোষিছে পবন, নেচে নেচে বিশ্ব-মাঝে;—
তব প্রেম দেখে, সবে প্রেম শিখে, পিতামাতা বাসে ভাল,
এ সংসার-মাঝে যত প্রেম দেখি, তব প্রেমচ্ছায়া সকলো।

শ্রী নীলমণি চক্রবর্ত্তী

ব্রাহ্মসমাজ

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ৩রা অক্টোবর দেওঘর নগরীতে প্রবীণ ব্রাহ্ম ভুবন-মোহন সেন মহাশয় ৭৮ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি গভীর ধর্ম্মনিষ্ঠা ও চরিত্রমাধুরীতে সকলের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন এবং নানা প্রকারে দীর্ঘকাল ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়াছেন। তাঁহার পরলোকগমনে ব্রাহ্মসমাজ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

বিগত ৮ই অক্টোবর কলিকাতা নগরীতে ডাক্তার ডি এন রায় হঠাৎ হৃদ্‌রোগে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকরূপে বহুলোকের অনেক উপকার সাধন করিতেছিলেন।

বিগত ১৭ই অক্টোবর কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকারের ৬ বৎসর বয়সের কন্যা স্নেহলতা বিসূচিকা রোগে পরলোক গমন করিয়াছেন।

বিগত ১৬ই অক্টোবর আসাম গৌরীপুর নগরীতে বাবু যাদবচন্দ্র পাল পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি একজন বিশ্বাসী ব্রাহ্ম ছিলেন এবং নানা প্রকারে ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়াছেন।

বিগত ৩রা অক্টোবর কলিকাতা নগরীতে পরলোকগতা নলিনীমালা দত্তের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য ও পুত্র শ্রীমান অমিয়কুমার দত্ত প্রার্থনা করেন।

বিগত ১০ই অক্টোবর কলিকাতা নগরীতে পরলোকগত ল্যাফ্‌টেনাণ্ট কর্ণেল ধর্ম্মদাস বসুর আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান কন্যা শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা রায় কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় আচার্য্যের কার্য্য, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী শাস্ত্র পাঠ ও জামাতা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদয়াল রায় কন্যালিখিত জীবনী পাঠ ও প্রার্থনা করেন।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চির শান্তিতে রাখুন ও আত্মীয় স্বজনদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

শুভবিবাহ—বিগত ৭ই অক্টোবর কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত কালীমোহন বসুর জ্যেষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া নিভাননী ও শালকিয়া নিবাসী পরলোকগত প্রকাশচন্দ্র বিশ্বাসের পুত্র শ্রীমান প্রভাতচন্দ্রের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে কন্যার পিতা ভবানীপুর সম্মিলন ব্রাহ্মসমাজে ২৲ সাধনাশ্রমে ১৲ নববিধান প্রচারফণ্ডে ১৲ ও বাণীবন ব্রাহ্মসমাজে ১৲ দান করিয়াছেন।

বিগত ১১ই অক্টোবর কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মল্লিকের দ্বিতীয়া কন্যা কল্যাণীয়া কুমারী পূর্ণিমা ও বরিশাল নিবাসী পরলোকগত প্রসন্নকুমার দাসের পুত্র শ্রীমান দেবেন্দ্রনাথের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন।

গত ১১ই অক্টোবর ধুবড়ী নগরে পরলোকগত রায় বাহাদুর মতিলাল হালদারের ষষ্ঠ পুত্র শ্রীমান নিলয়রঞ্জনের সহিত শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার চক্রবর্ত্তীর কনিষ্ঠা কন্যা কুমারী কৃপাকণার শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। এই উপলক্ষে কন্যার পিতা সাঃ ব্রাঃ সমাজের প্রচার ফণ্ডে ১৲ ও ধুবড়ী ব্রাহ্মসমাজে ১৲ টাকা দান করিয়াছেন।

প্রেমময় পিতা নবদম্পতিদিগকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

গিরিডি ব্রাহ্মসমাজ—নিম্ন লিখিত প্রণালী-ক্রমে গিরিডি ব্রাহ্মসমাজের গৃহ-প্রবেশ উপলক্ষে শারদীয় উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে—

১২ই অক্টোবর প্রাতে উৎসবের উদ্বোধন—আচার্য্য ডাঃ বি রায়। সন্ধ্যায় মিঃ ডি এন মুখার্জ্জি "দৃষ্ট এবং অদৃষ্ট" এই বিষয়ে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। ১৩ই অক্টোবর প্রাতে উপাসনা; শ্রীযুক্ত রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। সন্ধ্যায় উপাসনা—শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র নাগ উপাসনার কার্য্য করেন। ১৪ই অক্টোবর প্রাতে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বিশ্বাস। সন্ধ্যায় উপাসনা ও শান্তি বচন; আচার্য্য শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মিত্র।

আন্দুল ব্রাহ্মসমাজ—বিগত ৬ই ভাদ্র আন্দুল ব্রাহ্ম সমাজে ভাদ্রোৎসব উপলক্ষে বিশেষ প্রার্থনা হয়। স্থানীয় যুবকবৃন্দ কীর্ত্তন করেন। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মল্লিক আচার্য্যের কার্য্য করেন।

গত ২৭শে সেপ্টেম্বর রাজা রামমোহন রায়ের বার্ষিক স্মৃতি-বাসরে শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মল্লিক বিশেষ প্রার্থনা করেন ও তাঁহার জীবনী পঠিত হয়। বিগত ৩০শে সেপ্টেম্বর পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতি-বাসরে শ্রীযুক্ত নুটবিহারী চট্টোপাধ্যায় বিশেষ প্রার্থনা করেন ও তাঁহার জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনার আলোচনা করেন।

উৎসব—বিগত ১৩ই হইতে ১৬ই অক্টোবর শিয়ালকোট ব্রাহ্মসমাজের উৎসব নিম্নলিখিত ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে :—

লাহোর, পেশোয়ার, জামু, গুজরাট, টাণ্ডা, রাউলপিণ্ডি, মিয়ানী, প্রভৃতি স্থান হইতে অধ্যাপক রুচিরাম সাহনী, অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ বল, লালা রঘুনাথ সহায়, ডাঃ বালমুকুন্দ, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রশশী গুপ্ত, মিঃ গোবিন্দরাম, ভাই রামকিশন, ভাই প্রকাশ লাল প্রমুখ বহু বন্ধু এই উৎসবে উপস্থিত হইয়াছিলেন। দিল্লি, কর্ণাল, পাতিয়ালা, লাহোর, মিয়ানী, মুলতান, ভাওয়ালপুর, মিছ কসওয়াল, ডেরাবুন্দল, জামু, মিয়ানওয়ালী, রাউলপিণ্ডি, পেশোয়ার প্রভৃতি স্থান হইতে ছয় শতাধিক টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। সমাজ-প্রাঙ্গণে সুপ্রশস্ত সামিয়ানার নীচে উৎসবের কার্য্যাদি সম্পন্ন হয়। ১১ই তারিখ হইতে প্রতি দিন প্রাতে কীর্ত্তন ও সন্ধ্যায় উপাসনা প্রসঙ্গাদি হয়। ১৩ই তারিখ প্রাতে বাজারে ঊষাকীর্ত্তন হয়; সন্ধ্যায় ভাই সীতারাম উৎসবের উদ্বোধন সূচক উপাসনা করেন এবং ডাক্তার বালমুকুন্দ "মানব জীবনের লক্ষ্য" বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। ১৪ই প্রাতে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রশশী গুপ্ত উপাসনা করেন ও ধর্ম্মসাধনে একাগ্রতা ও তন্ময়তার আবশ্যকতা বিষয়ে উপদেশ দেন। তৎপরে শ্রীমতী কেশর দেবী "বৈরাগ্যলহর" নামক গুরুমুখী গ্রন্থ হইতে কিছু পাঠ করেন এবং ভাই রামকিশন "মানবের জীবনে বিধাতার লীলা" বিষয়ে কিছু বলেন। অপরাহ্নে ভাই প্রকাশলাল "ব্রাহ্ম ধর্ম্মের বিশেষ লক্ষণ" বিষয়ে এবং অধ্যাপক রুচিরাম "হিন্দু মুসলমান সমস্যা ও তাহার নিদান" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। রাত্রিতে "প্রত্যাদেশ" বিষয়ে একটী আলোচনা সভা হয়। তাহাতে অধ্যাপক রুচিরাম সভাপতির আসন গ্রহণ করেন

এবং মুসলমান সমাজ, আহ্‌মদিয়াসম্প্রদায়, আর্য্য সমাজ, খ্রীষ্টীয় সমাজ প্রভৃতি বিবিধ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ যোগদান করেন। প্রায় আট শত লোক উপস্থিত ছিল। ১৫ই প্রাতে ভাই সীতারাম উপাসনা করেন এবং "আত্মসমর্পণ" বিষয়ে উপদেশ দেন। উদ্বোধনের সময় তিনি সকল সাধু মহাজনদিগকে বিশেষ ভাবে স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞতা অর্পণ করেন। শ্রীমতী কেশর দেবী "গোবিন্দলহর" নামক গুরুমুখী গ্রন্থ হইতে কিছু পাঠ করেন এবং মিঃ এম্ এস্ ফিলিপ্‌স্ "সত্য উপাসনা" বিষয়ে উপদেশ দেন। অপরাহ্নে লালা রঘুনাথ সহায় "ব্রাহ্মসমাজ ভারতের জন্য কি করিয়াছেন" এই বিষয়ে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার পরে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বল "ব্রাহ্মধর্ম্মই বর্ত্তমান ভারতের প্রধান প্রয়োজন" বিষয়ে ইংরাজীতে বক্তৃতা দেন। ব্যারিষ্টার শেখ আবদুল কাদের "কোরাণ' বিষয়ে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। রাত্রিতে এক আলোচনা সভা হয়। তাহাতে আগা মহম্মদ সাফদার খাঁ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রায় ১০০০ হাজার লোক উপস্থিত ছিল। "ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মানবের ভ্রাতৃত্ব" আলোচ্য বিষয় ছিল। অনারেবল সর্দ্দার শিবদেব সিংহ, উবিরয়, রেভাঃ আবদুল হক, অধ্যাপক প্রীতম সিংহ প্রভৃতি শিখ ধর্ম্ম, খৃষ্ট ধর্ম্ম ও বাহাই ধর্ম্মের প্রতিনিধিবর্গ ও অপর অনেকে তাহাতে যোগদান করেন। সভাপতির প্রাণস্পর্শী বক্তৃতার পর রাত্রি ১১টার সময় সভা ভঙ্গ হয়। ১৬ই তারিখ উৎসবের শেষ দিন ভাই সীতারাম উপাসনা করেন ও উৎসব সুসম্পন্ন হওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা অর্পণ করেন। তিনি "আত্মোন্নতি" বিষয়ে উপদেশ দেন।

মহিলাদিগের নবদ্বীপ স্মৃতি ভাণ্ডার—মহিলাদিগের নবদ্বীপ স্মৃতিভাণ্ডারের জন্য প্রাপ্ত নিম্নলিখিত দান কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকৃত হইতেছে :—(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীমতী হৈমবতী সেন ১০৲, শ্রীমতী সুবালা আচার্য্য ২০৲ শ্রীমতী কুসুমকুমারী মৈত্রেয় ৪৲, শ্রীযুক্ত ভগবানচন্দ্র গুহ ৫৲, শ্রীমতী সারদাসুন্দরী বসু ১৩৲, শ্রীমতী হেমন্তকুমারী চৌধুরী ১০৲, পরলোকগতা সরোজবাসিনী রায় ৫৲ শ্রীমতী সুশীলা সরকার ৬৲, শ্রীমতী ক্ষীরদা দাস ৭৲; মোট ৮০৲, পূর্ব্ব স্বীকৃত ৩,৯৩৮৶০; সর্ব্ব শুদ্ধ মোট ৪,০১৮৶০।

প্রাপ্তিস্বীকার—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ১লা জুন হইতে ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত বিভিন্ন বিভাগে প্রদত্ত নিম্নলিখিত দানপ্রাপ্তি কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছেন—

মিঃ বিপিনবিহারী বসু স্ত্রীর বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে প্রচারে ২৲ ও দাতব্য বিভাগে ১৲; মিঃ ও মিসেস্ হৈরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় নবদ্বীপ স্মৃতি ভাণ্ডারে ৩০৲; মিঃ অনাথকৃষ্ণ শীল পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে প্রচারে ১৲ সাধনাশ্রমে ১৲ ও দাতব্য বিভাগে ১৲; ডাঃ পি দেব পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে সাধারণ বিভাগে ৫৲; মিঃ আশুতোষ পাল পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে প্রচারে ২৲; মিসেস হৈমবতী সেন ও ডাক্তার আত্মজ্যোতি সেন প্রচারে ৪৲, মেসেঞ্জার ফণ্ডে ২৲, সাধনাশ্রমে ২৲ ও দুঃস্থ ব্রাহ্মপরিবার ফণ্ডে ২৲; মিঃ শান্তিপ্রিয় দেব পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে প্রচারে ৩৲ ও সাধনাশ্রমে ৪৲; মিঃ সুরেন্দ্রনারায়ণ রায় মাতার বার্ষিক শ্রাদ্ধে একটী দুঃস্থ বালিকার জন্য ৫৲; মিঃ অশ্রুমুকুল দাস পুত্রের নামকরণ উপলক্ষে প্রচারে ২৲; মিঃ হৃদয়কৃষ্ণ দে পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে দাতব্য বিভাগে ১৲; মিঃ জে এন দাস শিবনাথ স্মৃতি ভাণ্ডারে ২০৲; রেভাঃ ডাঃ সেমুয়েল এ ইলিয়াট মেসেঞ্জার ফণ্ডে ১৩১৷৹, মিঃ সুরেন্দ্রনাথ রায় কন্যার বার্ষিক শ্রাদ্ধে সাধারণ বিভাগে ৪৲; মিসেস্ রামচন্দ্র দাস স্বামীর আদ্য শ্রাদ্ধোপলক্ষে প্রচারে ২৲; মিঃ পি কে নাগার দীক্ষা উপলক্ষে প্রচারে ৬৲; মিঃ হরদত্ত সিংহ প্রচারে ১৲; মিঃ এইচ বড়পুজারী প্রচারে ৫৲; মিঃ সুনীলকুমার বসু কন্যার জন্মদিন উপলক্ষে প্রচারে ২৲ মিঃ এইচ্ এম গুপ্ত পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে প্রচারে ১০৲; মিঃ শিতীকণ্ঠ মল্লিক এলেপ্পি ব্রাহ্মসমাজের বাবদে ৫৲; মিঃ আশুতোষ বসু কন্যার নামকরণ উপলক্ষে প্রচারে ৫৲, মিসেস্ তারাসুন্দরী হালদার কন্যার বিবাহোপলক্ষে স্থায়ী প্রচার ভাণ্ডারে ১০৲ ও দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডারে ১০৲; মিঃ বীরেন্দ্র কুমার বিশ্বাস পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধে প্রচারে ৭৲, সাধনাশ্রমে ৩৲, দুঃস্থ ব্রাহ্মপরিবার ফণ্ডে ৩৲ ও দাতব্য বিভাগে ২৲; মিঃ রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় পত্নীর বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে প্রচারে ৪৲, ও সাধনাশ্রমে ২৲; ডাঃ এস্ কে নাগ কন্যার জন্মদিন উপলক্ষে প্রচারে ৫৲; মিঃ বীরেন্দ্রমোহন গুহ পত্নীর বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে প্রচারে ৩৲, ও সাধনাশ্রমে ২৲।

বিজ্ঞাপন

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত বাঙ্গালা নিয়মাবলী বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত হইয়াছে। মূল্য ৵০ ডাকমাশুল ৴১০।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার সভ্যমনোনয়নার্থ নিয়মাবলীর ২য় ধারা অনুসারে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণকে জ্ঞাপন করা যাইতেছে, যাঁহারা আগামী বর্ষের অর্থাৎ ইং ১৯২৭ সালের অধ্যক্ষ সভার সভ্য হইয়া সমাজের কার্য্যের সহায়তা করিতে ইচ্ছুক আছেন, তাঁহারা যেন আগামী ১৫ই নভেম্বরের মধ্যে স্ব স্ব নাম, ঠিকানা ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিবরণ সম্পাদকের নামে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয়ে পত্র দ্বারা জানাইয়া বাধিত করেন। সভ্যপদপ্রার্থীর বয়স অন্যূন ২৫ বৎসর হওয়া, তিন বৎসর কাল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য থাকা এবং আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম হওয়া আবশ্যক।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়
২১১নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রিট, কলিকাতা
১লা অক্টোবর, ১৯২৬

শ্রীব্রজসুন্দর রায়।
সম্পাদক
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

ব্রহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় দ্বারা ১৭ই কার্ত্তিক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—বরদাকান্ত বসু, বি-এ

Registered NO 65

অসতো মা সদগময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময়॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৬ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৪৯ম ভাগ। ১৪শ সংখ্যা।

১৬ই কার্ত্তিক, মঙ্গলবার, ১৩৩৩, ১৮৪৮ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯৭

2nd November, 1926.

প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০

অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

হে জীবন ও শক্তির অনন্ত প্রস্রবণ, তুমিই আমাদের যাহা কিছু সকলের একমাত্র মূল—তোমা হইতে বিচ্যুত হইলে আমাদের জীবন ও বল কিছুই থাকে না, আমরা সর্ব্বপ্রকারে দুর্ব্বল ও মৃতবৎ হইয়া পড়ি। আমরা যখন জ্ঞাতসারে তোমার সঙ্গে যুক্ত না থাকি, তখনও সম্পূর্ণরূপে তোমা হইতে বিচ্যুত হই না, তখনও তুমি আমাদের প্রাণের প্রাণ হইয়া তোমার অসীম প্রেমে আমাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া থাক, আমাদিগকে রক্ষণ ও পোষণ কর। তাই আমরা বাঁচিয়া আছি, একেবারে মরিয়া যাই না। কিন্তু তোমার সহিত সাক্ষাৎ যোগ অনুভব করিতে না পারিলে, আমরা তোমাকে পূর্ণ রূপে পাইতে পারি না, তোমা হইতে পূর্ণ বল ও শক্তি লাভ করিতে সমর্থ হই না। এই জন্যই আমরা অধিকাংশ সময় অতি দুর্ব্বলই থাকিয়া যাই, কোনও কার্য্যই ভাল করিয়া সম্পন্ন করিতে পারি না। তুমি আমাদিগকে সুস্থ ও সবল করিবার জন্য কত আয়োজনই নিয়ত করিতেছ! আমাদের উন্নতি ও কল্যাণের জন্য কত কর্ত্তব্যভার প্রদান করিয়াছ! কিন্তু আমরা তোমার সকল ব্যবস্থা মানিয়া, তোমার সকল দান গ্রহণ করিয়া, উন্নত ও সুন্দর হইয়া উঠিতে পারিতেছি না, সকল কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া জীবনকে সার্থক করিতে সমর্থ হইতেছি না—সকল বিষয়েই দুর্ব্বল ও শক্তিহীন থাকিয়া যাইতেছি। আমরা অনেক সময় আপনার শক্তির উপর নির্ভর করিয়া নানা কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে যাই; মনে করি, তাহাতেই আমরা সফলতা লাভ করিব, বলশালীও হইব। তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যে আমরা কিছুই করিতে পারি না, তাহা একেবারে ভুলিয়াই থাকি। তখন, হে মঙ্গলবিধাতা, আমাদের দুর্ব্বলতা ও ব্যর্থতার মধ্য দিয়া তুমি বুঝাইয়া দেও, তোমাকে ছাড়িয়া আমরা কিছুই করিতে পারি না। তাই নানা অভাব ও বিফলতার মধ্যে, হে করুণাময় পিতা, আমরা তোমারই শরণাপন্ন হইতেছি। তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগ স্থাপন করিতে সমর্থ কর; আমাদের প্রাণে সে প্রার্থনা ও সংকল্প জাগাও। আমরা সম্পূর্ণরূপে তোমার হইয়া, তোমাকে জীবন্ত ভাবে প্রাণে লাভ করিয়া, তোমার পথে চলি, তোমার কার্য্য সম্পাদন করি। তোমার শুভ ইচ্ছাই আমাদের জীবনে জয়যুক্ত হউক—আমরা নূতন জীবন ও শক্তি লাভ করি।

নিবেদন।

কত আঘাত!—এত আঘাত আমাকে দিচ্ছ, আমি যে আর সইতে পারি না! এত ভাবনার বোঝা চাপাচ্ছ, এত দায়িত্বের ভার চাপাচ্ছ, আমি যে আর বইতে পারি না! যেখানে মাথা রেখে বিশ্রাম লাভ করব আশা করি, সেখান থেকেও আঘাত লাগে! যার কাছে শান্তির আশায়, সহানুভূতির আশায় যাই, সে-ও মুখ ফিরিয়ে চ'লে যায়! যাকে আপনার ব'লে ধরি, সে-ও পর ব'লে দূর ক'রে দেয়! আপনার জন যারা, যাদের ভালবাসি, তারা কোথায় চ'লে যায়, কোন্ পথে চলে! যাদের সঙ্গে একত্রে নৌকা বেয়ে কোন্ আলোক দেখে চলেছিলাম, তারা কোথায় চ'লে গেল,—লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'য়ে গেল! যাদের উপর কত আশা, কত নির্ভর, তারা সংসারের সুখে যেয়ে ডুব্‌ল, সংগ্রামে বিমুখ হলো! আঘাতের পর আঘাত, বেদনার পর বেদনা—প্রাণ ভেঙ্গে পড়ে। তাই আর কোনও দিকে তাকাই না, কোনও কথাতে থাকি না; না জানাতেই বুঝি সুখ ও শান্তি। তাই আঘাতের ভয়ে কাণ বন্ধ ক'রে ব'সে

আছি। ওগো আমার ঠাকুর, জীবন-দেবতা, আর যে আমি পারি না! তুমি শান্তি দাও।

প্রাণ কাঁদে কেন?—আমার মুখ কত প্রসন্ন ছিল! আজ সে মুখ মলিন হইল কেন? আমার মুখের হাসি শুকিয়ে গেল কেন? আমার প্রাণ হ'তে ক্রন্দনের রোল উঠে কেন? আমার নিজের দুঃখ বিপদ অনেক—কত উপেক্ষা, কত বেদনা! তার জন্য ত কাঁদি না—তা ত তাঁর চরণে স'পে দিয়েছি। দেশের দুঃখ, মানবের দুঃখ, আর যে দেখ্‌তে পারি না। এই দুর্ভিক্ষ, এই মহামারী, এই জলপ্লাবন; এই অত্যাচার, এই অবিচার! আর ত সহ্য হয় না। কিন্তু তাতেও প্রাণে তত আঘাত লাগে না, যত আঘাত পাই, মানুষের,—আপনার লোকের, দেশের লোকের—দুর্দ্দশা দেখে। আমার প্রিয়গণ, আমার দেশবাসিগণ,—দেশের আশা যারা—তাঁরা কোথায় যাচ্ছে, কোন্ পথে ঘুরছে! ঐ যে তারা চ'লে গেল; ঐ যে আদর্শ থেকে স'রে পড়ল, ঐ যে নব সভ্যতার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিল! ঐ যে আমোদ প্রমোদে মেতে গেল! ঐ যে বিলাসিতাতে ম'জে গেল! ঐ যে পবিত্রতার আদর্শ ক্ষুণ্ণ করলো! কে দেশকে জাগাবে? কে ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী হ'য়ে দেশের জন্য আত্মদান করবে? কার বক্ষ অশ্রুপ্লাবিত হবে? কে ঈশ্বরচরণে আকুল প্রার্থনা জানাবে? তাই আমার প্রাণ কেঁদে উঠে; নয়নে অশ্রু ব'য়ে যায়। হৃদয় ভেঙ্গে পড়ে। মুখ বিষাদে বিবর্ণ হয়।

আদর্শ ধ'রে থাক—কল্যাণের যে আদর্শ পেয়েছ, সুখের ভিতরে কিম্বা দুঃখের ভিতরে, নিন্দা কিম্বা প্রশংসার ভিতরে, অপমান বা নির্য্যাতনের ভিতরে, তাহা ধ'রে থাক। তোমার সঙ্গে কেহ আসে না? যারা সাথী ছিল, তারাও একে একে চ'লে গেল? তুমি একলা আদর্শ ধ'রে থাক। জান না তিনি তোমার সঙ্গে আছেন? জান না তিনি তোমার সংগ্রাম দেখছেন? পদে পদে ব্যর্থতা? পদে পদে নির্ম্মম ব্যবহার? পদে পদে নিন্দা ও গ্লানি? ভয় ক'রো না; ব্যর্থতা আসুক; তুমি কৃতকার্য্য না হ'তে পার; তবুও কল্যাণ যাতে, মঙ্গল যাতে, শুদ্ধতা যাতে, তা ধ'রে থাক। অপমান আসুক, নির্য্যাতন আসুক, গ্লানি ও কলঙ্ক রটুক, ভয় ক'রো না; তাঁর মুখের দিকে তাকাও। তিনি ত সায় দিচ্ছেন? তবে নির্ভয়ে চ'লে যাও। মরণও আস্‌তে পারে, তাতেও ভয় ক'রো না। তাঁর কাছে যে কল্যাণের আদর্শ পেয়েছ, তাই ধ'রে চ'লে যাও।

সম্পাদকীয়

অভাব ও তাহার মৌলিক প্রতীকার—আমরা মাঝে মাঝে আমাদের নানা অভাব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া থাকি এবং আপন আপন বুদ্ধি বিবেচনা অনুসারে বিবিধ উপায়ের কথাও বলি; তদনুসারে কিছু চেষ্টা যত্নও যে না করি, এরূপও বলা যায় না। তথাপি আমাদিগকে সর্ব্বদাই দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হয় যে, কোনও একটি বিষয়েও আমরা এমন কিছু সাফল্যলাভ করিতে পারি নাই, যাহা সুস্পষ্টরূপে লক্ষিত হইতে পারে, যাহার সম্বন্ধে কাহারও কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না, যাহা দেখিয়া আমরা নিজেরাও অন্ততঃ কথঞ্চিৎ তৃপ্তি ও সন্তোষ অনুভব করিতে সমর্থ হই। আমাদের সকল চেষ্টা আয়োজন যেন ব্যর্থই হইয়া যায়, সমস্ত অভাবগুলি যেন পূর্ব্ববৎই থাকিয়া যায়। সকল অভাব যে এক সঙ্গেই সমান ভাবে চলিয়া যাইবে, অথবা একটিও সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইবে, এরূপ আশা করা কখনও যুক্তিসঙ্গত হইবে না—তাহা ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ মানবের সাধ্যাতীত, বিশেষতঃ উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অভাববোধটাও তীব্রতর হইয়া উঠে। কিন্তু তাহাদের কোনটাই যদি কিছু পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত না হয়, যে রূপ সে রূপই থাকিয়া যায়, অথবা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তবে নিশ্চয়ই চিন্তার কারণ উপস্থিত হয়—তাহাকে কোনও মতেই স্বাভাবিক মনে করা যায় না। তখন বিশেষ আলোচনা ও পরীক্ষার দ্বারা তাহার মূল কারণ নির্ণয় ও প্রতীকারের উপযুক্ত পন্থানির্দ্ধারণ একান্ত কর্ত্তব্য হইয়া পড়ে। বৎসরের প্রথমে আমরা যে নূতন আশা উৎসাহ লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবৃত্ত হই, বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত তাহা সমভাবে থাকিবার সম্ভাবনা খুব কম বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। যদিও তাহা কিছুমাত্র অসম্ভব নয়, বরং স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে উন্নতিশীল সুস্থ জীবনে তাহা আরও বর্দ্ধিত হইবারই কথা, তথাপি আমাদের বর্ত্তমান অবস্থাতে অন্য কোনও সম্ভাবনা মনে স্থান দেওয়া কঠিন—তাহা মোটেই সমীচীন হইবে না। কিন্তু সে উৎসাহ উদ্যম সমভাবে না থাকিলেও, একেবারে নির্ব্বাপিত হইবার, সম্পূর্ণ আশাহত হইবার, কোনও কারণ নাই—অন্ততঃ কিছু মন্দীভূত বেগেও চলা, ক্ষীণতর আশাও পোষণ করা, সম্ভবপর। প্রকৃত অবস্থা এই যে, একদিকে যেমন আমাদের কাজ সন্তোষজনক না হইলেও হতাশ হইবার কোনও কারণ নাই, অপরদিকে তেমন আশানুরূপ হইতেছে মনে করিয়া কাল্পনিক তৃপ্তি অনুভব করিবার, যেরূপ চলিতেছে তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিবারও, বিশেষ কিছু হেতু নাই। নানা বিষয়েই যে আমাদের যথেষ্ট অভাব রহিয়াছে, আরও অনেক করিবার আছে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই; এ সম্বন্ধে কিছু মাত্র মতভেদ নাই। অবস্থা যত অধিক অসন্তোষকর হইবে, অভাব যত বেশী হইবে, আমাদিগকে তত প্রবলতর উৎসাহ উদ্যমের সহিত তাহা দূর করিবার জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে, গভীরতর আশা হৃদয়ে পোষণ করিতে হইবে—অবসন্ন ভাবে বসিয়া থাকিলে চলিবে না।

আমাদের অভাবের বিষয় চিন্তা করিতে গেলে প্রথমেই অর্থাভাবের কথা মনে উদয় হয়। অনেক বিভাগেই বৎসরের পর বৎসর আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হইতেছে। পূর্ব্বে যে সকল বিভাগে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা ছিল—ব্যয় অপেক্ষা আয়ই অধিক ছিল—তাহারও অনেকের এই দশা ঘটিয়াছে। ঋণগ্রস্ত হইয়া যে দীর্ঘ কাল কোনও প্রতিষ্ঠান বাঁচিয়া থাকিতে পারে না, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। অপর বিভাগের সহায়তায় কোন

প্রকারে ঋণের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া, মোটের উপরে আয় ব্যয়ের সমতা রক্ষা করিতে পারিলেও, এরূপ অবস্থায় যে উহার কার্য্য সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত হইতে পারে না, তাহা অনুমান করা কিছুই কঠিন নহে। তাহার উপর কার্য্যের সম্প্রসারণ বা উন্নতিসাধন যে একেবারে অসম্ভব তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। উপযুক্ত অর্থের অভাবে আমাদের সকল কার্য্যই যে পঙ্গু হইয়া পড়িতেছে, কোন দিকে কোনও রূপে সম্প্রসারিত হইতে পারিতেছে না, তাহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। অর্থের কত প্রয়োজন তাহা কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। কিন্তু এ অর্থাভাব ঘটিবার কারণ কি তাহা একটু বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে। অনেক বিষয়েই যে ব্যয় পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে যে সকল কার্য্য বিনা ব্যয়ে বা অল্প ব্যয়ে স্বেচ্ছাসেবকগণদ্বারা সম্পাদিত হইত, তাহার জন্য বর্ত্তমানে অনেক বেশী ব্যয় করিতে হয়। এতদ্ব্যতীত সাধারণ ভাবে সকল বিষয়েই সমপরিমাণ কাজের জন্য আজ কাল অধিকতর অর্থ আবশ্যক। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অর্থাগমের পথও প্রশস্ততর হইয়াছে—সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং ব্রাহ্মগণের সমষ্টিগত আয়ও বহু গুণ বাড়িয়াছে। এই অবস্থায় সমাজের আয় যে অনুপাতে বৃদ্ধি পাইবার কথা, তাহা অপেক্ষা তুলনায় ব্যয় যে অনেক বেশী বাড়িয়াছে, তাহা বলা যায় না। পূর্ব্বে অনেকেরই পারিবারিক ব্যয় অপেক্ষাকৃত কম ছিল, সন্দেহ নাই। সুতরাং আয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ব্যয় বাড়িয়াছে, স্বীকার করিতেই হইবে। সে সকল গণনার মধ্যে ধরিয়াও কি ইহাই দেখিতে পাওয়া যাইবে না যে, ব্যক্তিগত আয়ের সমান অনুপাতে সমাজের আয় বাড়ে নাই! সামান্য একটু অনুসন্ধান করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, অধিকাংশ স্থলেই, আবশ্যকীয় ব্যয়ের কথা ছাড়িয়া দিলেও, যে পরিমাণে অনাবশ্যকীয় বিলাস ব্যসনাদির ব্যয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে সেই পরিমাণে ব্রাহ্ম-সমাজের কাজের জন্য দান বাড়ে নাই। পূর্ব্বে ঘোর অর্থ-কৃচ্ছ্রতার মধ্যেও বিশেষ ত্যাগ ও ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক ব্রাহ্মগণ সমাজের কাজে যে পরিমাণ অর্থ দান করিতেন, এখন স্বচ্ছলতার মধ্যে, কোনও রূপ ক্লেশ স্বীকার না করিয়া, অনায়াসে দিবার শক্তি থাকিতেও, অনেকেই সেই পরিমাণে বা অনুপাতে দিতেছেন না—বিলাস ব্যসনাদির ব্যয় বন্ধ করা দূরে থাকুক, একটু খর্ব্ব করিলেও তাঁহারা যাহা দিতে পারেন, এস্থলে আমরা তাহাও গণনার মধ্যে ধরিলাম না। এতদ্ব্যতীত অনেকের প্রতিশ্রুত চাঁদা দীর্ঘকাল অদেয় রহিয়াছে। তাহার কারণ অধিকাংশ স্থলেই—দারিদ্র্য বা অসামর্থ্য নহে—উদাসীনতা বা অবহেলা। ইহার জন্য অনেক সময়ই সমাজের কর্ম্মচারীদিগকে বিশেষ ভাবে দায়ী করা হইয়া থাকে। অনেকে এই ওজর দেখাইয়া আপনাদের দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইতে প্রয়াস পান। কিন্তু কর্ম্মচারীবর্গ যদি বাস্তবিকই তাঁহাদের কর্ত্তব্য পালন না করেন, তাহা হইলেও ইঁহারা আপনাদের দায়িত্ব হইতে কিছুতেই মুক্ত হইতে পারেন না। আপনাদের প্রতিশ্রুত দেয় যথাসময়ে প্রদান করা, আপনা হইতে সমাজের কাজে যথাসাধ্য সাহায্য করা, প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য, সে জন্য প্রত্যেকেই দায়ী। অপরে কিয়ৎ পরিমাণে সে কার্য্যভার বহন করিতে অগ্রসর হইয়াছে বলিয়া, কাহারও নিজের দায়িত্ব যায় না। আর প্রকৃত পক্ষে এ বিষয়ে কর্ম্মচারীদিগকে বেশী দায়ীও করা যায় না। তাঁহাদের কোনও ত্রুটিই ঘটে না, তাঁহাদের কার্য্যের আর কোনও প্রকার উন্নতিই সম্ভবপর নয়, এরূপ কথা না বলিয়াও, দৃঢ়তার সহিত বলা যায় যে, বর্ত্তমান অবস্থায় তাঁহাদের পক্ষে যতটা সম্ভবপর তাঁহারা তাহা করিয়া থাকেন—চাঁদা আদায় সম্বন্ধে তাঁহারা কখনও উদাসীন নহেন। সভ্যগণের এরূপ উদাসীনতার কারণ কি, তাহা বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান করিয়া দেখা আবশ্যক। একটা কথা অনেক সময় শুনিতে পাওয়া যায় যে, লোকের হৃদয় আকর্ষণ করিবার মত কাজ কর্ম্ম কিছু হয় না, যেরূপ মৃতভাবে সামান্য কিছু কাজ হইয়া থাকে তাহার জন্য অর্থ প্রদান করিতে উৎসাহ হয় না; কাহারও কাহারও আবার হয়ত এ সকল কাজ তত পছন্দ হয় না; তাহারা অন্যপ্রকার কাজ দেখিতে চায়। ঐ সকল কথার মধ্যে কিছু সত্য থাকিতে পারে। কিন্তু ইহাই যথেষ্ট কারণ নহে। কাজ ভালরূপে না চলিবার একটা কারণ যে অর্থাভাব, উপযুক্ত অর্থ হইলে যে এ সকল কাজ আরও সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়া লোকের হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারে, সে কথা ভুলিলে চলিবে না। দ্বিতীয়তঃ, কাজ নানা প্রকারেরই আছে; যিনি যাহা পছন্দ করেন তিনি তাহাকেই সফল করিয়া তুলিতে পারেন, অথবা নূতন কোনও কার্য্য আরম্ভ করা আবশ্যক বোধ করিলে, তাহাতে আপনার শক্তি সামর্থ্য নিয়োগ করিয়া তাহাকে গড়িয়া তুলিতে পারেন। জীব-দেহের যেমন বিবিধ অঙ্গের বিবিধ কার্য্য রহিয়াছে, তেমনি সমাজ-দেহের অঙ্গরূপেও নানা শ্রেণীর যে লোক আছে, তাহাদের দ্বারা বিভিন্ন প্রকার কার্য্য সাধিত হইবে, ইহাই স্বাভাবিক। সমাজের কল্যাণসাধনই যেখানে সকলের সাধারণ লক্ষ্য, সেখানে ইহাতে পরস্পরের নিকট হইতে বাধা পাইবার কোনই আশঙ্কা নাই—সহানুভূতি ও সাহায্য লাভ করিবারই কথা। এ ক্ষেত্রে বিরোধিতার কোনও স্থান নাই—যে স্থলে সমগ্রের কল্যাণের পরিবর্ত্তে কোনও ব্যক্তিগত খেয়াল বা স্বার্থ লক্ষ্যরূপে থাকিয়া অকল্যাণ উৎপাদন করে, বা সেরূপ আশঙ্কার যথেষ্ট কারণ দেখিতে পাওয়া যায়, সে স্থলেই বিরোধ উপস্থিত হয়। সুতরাং প্রকৃত কারণ বাহিরে না খুঁজিয়া, প্রথমে আপনার মধ্যেই দেখিতে হইবে। সমাজের ও নিজের প্রকৃত কল্যাণের জন্য যাহার আকাঙ্ক্ষা উৎসাহ আছে, সে কখনও কোনরূপ ওজর আপত্তি করিয়া আপনার কর্ত্তব্য হইতে বিরত হয় না—আপনার যতটা শক্তি আছে তাহা সেই উদ্দেশ্যসাধনে নিযুক্ত না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে না। একটু গভীর ভাবে পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে, আপনার মৃতভাব, জীবনহীনতা, সকল মহৎ ভাব ও সাধু কার্য্যের একমাত্র উৎস যিনি তাঁহার সহিত যোগের অভাব, জীবনের জীবন যিনি তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্নতাই, ইহার একমাত্র মূল কারণ। প্রকৃত জীবন থাকিলে, সাধু কার্য্যে উৎসাহ আকাঙ্ক্ষার এবং তদুদ্দেশ্যে অর্থদানপ্রবৃত্তির অভাব হয় না, ক্লেশ ও ত্যাগ স্বীকার করিয়াও সমাজের কাজে অর্থ প্রদান করা সহজ হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী ব্রাহ্মগণের জীবনের সঙ্গে আপনাদের বর্ত্তমান জীবন তুলনা করিলেই, ইহা সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে সমর্থ হইব।

দ্বিতীয় অভাবের কথা ভাবিতে গেলেই ভিতরের বাহিরের সকল লোকের সম্মুখে উজ্জ্বল হইয়া উপস্থিত হয় আমাদের প্রচার ও অন্যান্য কার্য্যোদ্যমের অপ্রচুরতা ও শিথিলতা, অল্পতা ও মৃদুতা—মৃত ভাব। বিস্তীর্ণ কার্য্যক্ষেত্রের তুলনায় ইহা যে শুধু নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর তাহা নহে, একান্ত উৎসাহহীন ও প্রাণহীন বলিলেও বিশেষ অন্যায় হইবে না। কোনও প্রকারে কিছু কাজ চলিতেছে বটে, কিন্তু তাহাতে বিশেষ জীবনের সাড়া নাই, তাহার প্রভাব সমাজের মধ্যে বা বাহিরে বড় একটা অনুভূত হয় না—দেশ ব্রাহ্মসমাজের অস্তিত্বের যথেষ্ট প্রমাণ না পাইয়া, ইহাকে একপ্রকার মৃত বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছে। অথচ ব্রাহ্মসমাজ যে এক সময় সমগ্র দেশটাকে প্রবলভাবে ধাক্কা দিয়া, নিদ্রাভিভূতকে জাগাইয়া, মৃতপ্রায় দেহে নবজীবন সঞ্চার করিয়া, আপনার জীবন্ত সত্তাটা অতি স্পষ্টরূপেই সপ্রমাণ করিয়াছিলেন, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তখন ব্রাহ্মসমাজ সকল প্রকার জনহিতকর কার্য্যেরই জনক, চালক ও পরিপোষক ছিলেন। যথেষ্ট সংখ্যক প্রচারকের ও উপযুক্ত অর্থবলের অভাবই বর্ত্তমান অবস্থার কারণ বলিয়া সহজে অনুমিত হইতে পারে। কিন্তু তখন যে প্রচারকসংখ্যা বর্ত্তমানের তুলনায় গণনায় বেশী ছিল, অথবা সমাজের অর্থবল অধিকতর ছিল, তাহা নহে। তথাপি তাঁহারা শুধু বঙ্গদেশকে নয়, ভারতের সকল প্রদেশকেই তুমুলভাবে আন্দোলিত করিয়াছিলেন। তাঁহারা তখন অধিক বয়স্কও ছিলেন না, যুবকই ছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের যে বিশেষ কোনও বাহ্যিক সুবিধা ছিল, তাহা বলা যায় না। তবে বর্ত্তমান অবস্থা অন্যরূপ কেন? তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া, সেই শ্রেণীর উৎসাহী ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, ত্যাগী ও কষ্টসহিষ্ণু, যথেষ্ট সংখ্যক জীবন্ত লোকের, অনুপ্রাণিত কর্ম্মীর, অভাব স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইবে। অর্থাভাবেরও যে প্রধান কারণ এরূপ লোকের অভাব, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে। ইহার বিরুদ্ধে একটা কথা সহজেই উপস্থিত হইতে পারে যে, আমাদের মধ্যে এখন যে সকল প্রচারক ও কর্ম্মী রহিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই বার্দ্ধক্যপীড়িত, রুগ্ন ও ভগ্নস্বাস্থ্য। এ কথা সত্য হইলেও, ইহাকে যথেষ্ট কারণ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। তাঁহাদিগকে গণনার বাহিরে রাখিয়া, সর্ব্বাগ্রে কি এই প্রশ্নই উদয় হয় না যে, তাঁহাদের স্থান গ্রহণ করিবার জন্য উপযুক্ত প্রচারক ও কর্ম্মীপ্রবাহ কেন আমাদের মধ্যে সৃষ্ট হয় নাই? তাহার পর, অপর যাঁহারা কর্ম্মক্ষম রহিয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যাই কি একেবারে উপেক্ষণীয়,—কিছুমাত্র গণনার যোগ্য নহে? একটু অনুসন্ধান করিলেই দেখিতে পাইব, সে সংখ্যাও তুলনায় নিতান্ত নগণ্য নহে। আর সে সংখ্যা নিতান্ত অল্প হইলেও, তাহার দ্বারা যতটা কাজ হওয়া সম্ভবপর ততটা হইতেছে কি না, স্বভাবতঃই এরূপ প্রশ্নও এই প্রসঙ্গে মনে উদয় হয় এবং দেখিতে পাওয়া যায় প্রকৃতপক্ষে তাহা হইতেছে না। কেহ কেহ মনে করেন অর্থাভাবই প্রচারকপ্রবাহ রক্ষিত না হইবার প্রধান কারণ। প্রচারকদিগকেও খাইয়া পরিয়া বাঁচিতে হইবে। লোকে যদি দেখে, এ পথে আসিয়া পরিবার পরিজন লইয়া অনাহারে বা অর্দ্ধাহারে, অর্থাভাবজনিত সর্ব্বপ্রকার দুঃখ ক্লেশে, জীবন কাটাইতে হইবে, তবে এ পথে আসিবে কেন? প্রচারকদেরও যে অর্থের প্রয়োজন আছে, যত দরিদ্র ভাবেই হউক না কেন, তাঁহাদিগকেও যে আপনার পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্যগুলি করিতে হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আর আমরা আমাদের প্রচারকদের জন্য যে ব্যবস্থা করি, তাহাতে উক্ত প্রকার ভয়ের যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে, তাহাও—সে কথা সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক—স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত আছি। আমাদের ব্যবস্থা যে খুব সন্তোষজনক, এরূপ কথা কেহই বলিবে না। তথাপি তাহাকে আমরা যথেষ্ট কারণ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। পূর্ব্বে এতটাও ছিল না। আর একটি কারণও কাহারও কাহারও মুখে শুনিতে পাওয়া যায়—প্রচারকগণ উপযুক্ত সম্মান ও সমাদরের পরিবর্ত্তে অনেকের নিকট হইতে তীব্র সমালোচনা ও নিন্দাই প্রাপ্ত হন দেখিয়া, লোকে এ পথে পদার্পণ করিতে চাহে না। উক্ত প্রকার এক শ্রেণীর শ্রদ্ধাহীন কঠোর সমালোচক আমাদের মধ্যে আছে স্বীকার করিয়া লইলেও, তাহাকে একটা গণনীয় কারণ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না; কেননা আমরা দেখিতে পাই, এ সকল প্রতিবন্ধকতা পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হইয়া হ্রাসই পাইয়াছে—পূর্ব্বে ইহা অপেক্ষা বহুগুণে কঠোরতর অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়াই প্রচারকগণকে আসিতে হইয়াছে। তাঁহাদিগকে যেরূপ দারিদ্র্যক্লেশ ও নানা লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছে, তাহা আমরা এখন কল্পনাও করিতে পারি না। বাস্তবিক যাহাদের প্রাণে প্রচারব্রত গ্রহণ করিবার সত্য আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে, তাহাদিগকে কোন দিন এ সকল ক্ষুদ্র চিন্তা বাধা দিতে পারে নাই, ভবিষ্যতেও কখন পারিবে না। সুতরাং এরূপ লোকের অভাব ঘটিবার কারণ অন্যত্র অনুসন্ধান করিতে হইবে। বর্ত্তমানে এই শ্রেণীর লোক পাইবার সম্ভাবনা চিরতরে চলিয়া গিয়াছে মনে করিয়া, যাঁহারা বলিতে চাহেন যে, অপরাপর কার্য্য চালাইবার জন্য যে প্রকারে যথোচিত বেতন প্রদান করিয়া উপযুক্ত লোক বাছিয়া লইতে হয়, প্রচারকার্য্যের জন্যও সেই ভাবে লোক সংগ্রহ করিতে হইবে, তাঁহাদিগের প্রস্তাবের যুক্তিযুক্ততা ও কার্য্যকারিতার বিচার অন্য সময়ের জন্য রাখিয়া, আজ শুধু এই টুকুই বলিব যে, এই উপায়ে লোকাভাব দূর করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে অর্থাভাব মোচন করিতে হইবে, প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে। সেরূপ অর্থ সংগৃহীত হইলে, উক্ত পন্থা কতটা কার্য্যকারী হইবে সে বিচার করিয়া দেখিবার সময় হইবে। কিন্তু যে পর্য্যন্ত তদনুরূপ অর্থ সংগৃহীত না হইবে, সে পর্য্যন্ত আমাদিগকে পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর লোকের উপরই নির্ভর করিতে হইবে। সুতরাং সেরূপ লোকের অভাব ঘটিবার মূল কারণ নির্ণয় করিয়া, তাহা দূরীকরণের উপযুক্ত উপায় বাহির না করিলে চলিবে না। এখন, উক্ত প্রকার লোকের উদ্ভব যে প্রধান ভাবে ব্যক্তিগত জীবনের স্বাভাবিক প্রকৃতি ও সাধন, ঈশ্বরভক্তি ও মানব-প্রীতির উপর নির্ভর করে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু আবেষ্টনের উপরও উহা অল্প নির্ভর করে না—উহার বর্দ্ধন ও পরিপোষণের পক্ষে সামাজিক জীবন অনুকূল হওয়া একান্ত আবশ্যক। সামাজিক জীবন প্রতিকূল হইলে উহা অল্পেই শুকাইয়া যায়। কাজেই কোনও সমাজের

মধ্যে যদি এরূপ লোকের অভাব ঘটে, তবে নিঃসন্দিগ্ধরূপে বুঝিতে হইবে তাহার জন্য সেই সমাজই বহু পরিমাণে দায়ী—সেখানে অধিকাংশের জীবন মূল প্রস্রবণ হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়াতেই সমূলে পরিশুষ্ক হইয়াছে। প্রচারক্ষেত্রে লোকাভাবের মূল কারণ সম্বন্ধে অন্য কোনও সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়ার কিছুমাত্র যুক্তিসঙ্গত হেতু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আর যাঁহারা এই কার্য্যে নিযুক্ত আছেন তাঁহাদেরও অনেকের মধ্যে যদি যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্যমের, ত্যাগশীলতা ও কষ্টসহিষ্ণুতার অভাব দৃষ্ট হয়, তাহার মূল কারণ অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেও আমরা ঐ একই স্থানে উপস্থিত হইব। অনুপ্রাণনের অভাবই সকল অভাবের মূল। জনহিতকর ও অন্য সকল প্রকার কার্য্যেই যে শিথিলতা ও উৎসাহহীনতা দেখিতে পাওয়া যায়, আমাদের বিস্তীর্ণ কার্য্যক্ষেত্রকে যে আমরা নিতান্তই সঙ্কুচিত করিয়া ফেলিয়াছি, এবং সময় সময় একটা ক্ষণিক মহৎ ভাবের দ্বারা চালিত হইয়া নানা কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে যাইয়াও যে আমরা কেবল ব্যর্থতাই অর্জ্জন করিয়া থাকি, তাহারও মূল কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া অমরা অপর কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিব না—তাহা একেবারেই অসম্ভব দেখিতে পাইব। সে সকল বিষয়ের পৃথক বিস্তারিত আলোচনার আর কোনও প্রয়োজন নাই। সেখানেও জীবন্ত লোকের, অনুপ্রাণিত কর্ম্মীর, অভাবই প্রধান অভাব এবং তাহার কারণও সেই জীবন-দেবতা হইতে বিচ্ছিন্নতা। সর্ব্বত্রই, জীবন্ত অনুপ্রাণিত লোকের দ্বারা যে সকল কার্য্য যে ভাবে সুসম্পন্ন হইতে পারে, অপরের দ্বারা তাহা কখনও হইতে পারে না।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, প্রতীকারের উপায় কি? আমরা নানা উপায়ের কথাই বলিয়া থাকি এবং সে সকল অবলম্বন করিয়া কিছু না কিছু ফলও পাইয়া থাকি। রোগের চিকিৎসা বিষয়ে যেমন বিশেষ বিশেষ উপসর্গগুলিকে উপশম করিবার চেষ্টার দ্বারা তাহাদিগকে সাময়িক ভাবে দমন রাখা সম্ভবপর হইলেও, রোগীকে রোগমুক্ত করিয়া স্থায়ী ভাবে ও প্রকৃত রূপে সুস্থ ও সবল রাখা যায় না, এ ক্ষেত্রেও এ সকল উপায়দ্বারা অধিকতর সাফল্য লাভের কোনই সম্ভাবনা নাই। রোগের বীজকে সমূলে উৎপাটন না করিলে, কিছুতেই রোগমুক্ত হওয়া যায় না। তাই সুচিকিৎসকগণ মৌলিক প্রতীকার সাধনের জন্যই বিশেষ যত্নশীল হন। তাঁহারা যে কখনও বিশেষ কোন উপসর্গকে সাময়িক ভাবে দমন করিতে চেষ্টা করেন না, তাহা নহে। সময় সময় তাহা করা আবশ্যক হয়; আবার কোন কোনও সময়ে যে তাহা অনিষ্টকরও না হয়, এমনও বলা যায় না। সে যাহা হউক, তাহা সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য না হইলেও, নিশ্চয়ই প্রধান বা একমাত্র ভাবে অবলম্বনীয় নহে। জোড়াতালি দিয়া কিছু দিন কাজ চালান যায় বটে, তাহা বেশী দিন টিকে না। দীর্ঘকাল স্থায়ী করিতে হইলে আমূল পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হয়। তেমনি আমরা আমাদের বুদ্ধি বিবেচনা অনুসারে অভাব দূর করিবার নানা উপায় অবলম্বন করিতে পারি, যাহা হইতে যত টুকু উপকার পাওয়া সম্ভবপর তাহার জন্যই সচেষ্ট হইতে পারি; কিন্তু তাহার উপর যেন অধিক আশা স্থাপন না করি। তাহার উপর নির্ভর করিয়া যেন মৌলিক প্রতীকার সাধনে উদাসীন না হই। আমরা আর যত প্রকার উপায়ই অবলম্বন করি না কেন, মৌলিক প্রতীকার সাধন ব্যতীত কিছুতেই কিছু হইবে না, বিশেষ কোনও স্থায়ী ও কার্য্যকারী ফল লাভ করিতে সমর্থ হইব না। সে মৌলিক প্রতীকার কি, তাহা আর অধিক বিস্তারিত করিয়া বলিতে হইবে না। আমরা সকল অভাবের যে মূল কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছি, তাহাতেই তাহা সুস্পষ্ট হইয়াছে। সকল অভাবের মূলেই একমাত্র অনুপ্রাণিত কর্ম্মীর অভাব—প্রকৃত জীবনের অভাবই—দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহারও একমাত্র কারণ জীবনদেবতা হইতে বিচ্ছিন্নতা। সুতরাং সর্ব্বপ্রযত্নে সেই জীবনদেবতার সহিত যোগ রক্ষা করিলেই অফুরন্ত জীবন রক্ষিত হইবে, অনুপ্রাণন লব্ধ হইবে, সকল প্রকার ত্রুটি দুর্ব্বলতা বিদূরিত হইবে, কোনও অভাবই থাকিবে না—জীবন আশা উৎসাহ উদ্যমে, অক্ষয় বলে ও শক্তিতে, সকল প্রকার ত্যাগে ও মহত্বে, মণ্ডিত হইয়া সর্ব্বত্র সকল বিষয়ে জয় ও সাফল্য লাভ করিবে—কোনও শ্রমে বা ক্লেশেই কাতর হইবে না, কোনও প্রকার ত্যাগেই কুণ্ঠিত হইবে না, কোনও বাধা বিঘ্নেই ভীত ও সন্ত্রস্ত হইবে না, পরাজিত হইবে না। মঙ্গলময় জীবনবিধাতা আমাদিগকে সে শুভ সঙ্কল্প ও শক্তি দিউন, যাহাতে আমরা সকলে এরূপ জীবন লাভ করিতে এবং সমাজকে তাহার অনুকূল করিয়া গড়িতে, আমাদের সমগ্র হৃদয় মনের আগ্রহ ও চেষ্টা নিয়োগ করিতে পারি। তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছাই সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হউক।' আমাদের সকল অভাব দূর হউক।

দেবেন্দ্রনাথের পিতা মাতা।

[ব্রাহ্মসমাজের শতাব্দীপূর্ত্তি উপলক্ষে মহর্ষির আত্মজীবনীর যে নূতন সংস্করণ প্রস্তুত হইতেছে, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক লিখিত তাহার পরিশিষ্টের পাণ্ডুলিপি হইতে গৃহীত।]

জননী দিগম্বরী দেবী।

দেবেন্দ্রনাথের জননী দিগম্বরী দেবী যশোহর জেলার নরেন্দ্রপুরের রামতনু রায় চৌধুরীর কন্যা ছিলেন। "দেবেন্দ্র-জননী যেমন নিষ্ঠাবতী রমণী ছিলেন, সেইরূপ তিনি একজন তেজস্বিনী মহিলাও ছিলেন। ধর্ম্মের জন্য, প্রাণত্যাগ অপেক্ষা কষ্টকর ব্রত অবলম্বনেও তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। দ্বারকানাথ ঠাকুর যখন তাঁহার নিষেধ না মানিয়া সাহেবদিগের সঙ্গে আহার-বিহারে অবিরত থাকিলেন, তখন দেবেন্দ্র-জননী স্বীয় ধর্ম্মহানির আশঙ্কায় স্বামীর সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে জীবন নির্ব্বাহের ব্রত ধারণ করিয়া, মৃত্যুর দ্বারা তাহা উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন।" (শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৮৩৮ শকের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা; ২৮ পৃঃ)।

আত্মজীবনীতে দেবেন্দ্রনাথ নিজের পিতা মাতার কথা অধিক লিখেন নাই। মাতার বিষয়ে একবার মাত্র উল্লেখ আছে. (৬৬ পৃষ্ঠা); যখন দেবেন্দ্রনাথ পিতৃশ্রাদ্ধের পূর্ব্বে মানসিক সংগ্রামে পতিত, তখন তিনি একদিন স্বর্গগতা জননীকে স্বপ্নে

দেখিয়াছিলেন। সেই স্থানটী পড়িয়া আপাততঃ এরূপ ধারণা হওয়া সম্ভব যে, দেবেন্দ্রনাথ অতি অল্প বয়সে মাতৃহীন হইয়া থাকিবেন। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। মাতার মৃত্যুকালে (আনুমানিক ১৮৩৯ সাল) দেবেন্দ্রনাথ ধর্ম্মচর্চ্চা-রত যুবক; তাই তিনি বিশ্বাসবলে অনুভব করিতেছিলেন যে মৃত্যুর পরেও নিশ্চয়ই মাতা জীবিতা আছেন।

দেবেন্দ্রনাথের হৃদয়ে তাঁহার জননীর জন্য গভীর শ্রদ্ধায় মণ্ডিত একটি স্থান ছিল। তিনি কথাপ্রসঙ্গে একদিন বলিয়াছিলেন (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ঐ সংখ্যা, ঐ পৃষ্ঠা), "তাঁহার ন্যায় ভক্তিশালী মনুষ্য অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।" ইহা অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার যে দেবেন্দ্রনাথ ধর্ম্মসংগ্রামে পতিত হইয়া স্বপ্নে দেখিলেন যে তাঁহার এই তেজস্বিনী ও হিন্দুধর্ম্মে দৃঢ়-নিষ্ঠাবতী জননী তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিতেছেন, "তুই নাকি ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়াছিস্? কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা।" এমন মাতার এই স্বপ্নলব্ধ আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইয়া দেবেন্দ্রনাথের চিত্ত যে সে সময়ে অতিশয় আশ্বস্ত হইয়াছিল, ইহাতে সন্দেহ নাই।

বৃহৎ পরিবারে শিশুরা একটু বড় হইলে প্রায়ই অপেক্ষাকৃত অবসরসম্পন্না পিতামহীর নিকটে প্রতিপালিত হয়। দেবেন্দ্রনাথের বেলাতেও তাহাই হইয়াছিল। তাই আত্মজীবনীতে পিতামহীর উল্লেখ অধিক, জননীর উল্লেখ অত্যল্প। তাঁহার জননীর বিষয়ে আমাদের কৌতূহল অপরিতৃপ্তই থাকিয়া যাইবে।

পিতা দ্বারকানাথ

দেবেন্দ্রনাথের পিতার সহিত সম্বন্ধ বিষয়ে তাঁহার এক জন চরিতাখ্যায়ক লিখিতেছেন, "শুনিয়াছি যে দেবেন্দ্রনাথ কোন দিন তাঁহার পিতার সম্বন্ধে বিশেষ কোন প্রসঙ্গের উত্থাপন করিতেন না। একদিন শুধু বলিয়াছিলেন যে, পিতা ইংলণ্ডে থাকিতে তাঁহার হাতখরচের জন্য মাসিক লাখ টাকা করিয়া তাঁহাকে পাঠাইতে হইত। সুতরাং লোকে যে তাঁহাকে 'প্রিন্স' বলিয়া ডাকিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি!" (অজিতকুমার, ১২ পৃঃ)। "ছেলেবেলায় দেবেন্দ্রনাথ যে তাঁহার পিতার সঙ্গ খুব বেশী পাইতেন, তাহা মনে হয় না। তাঁহার সাতাত্তর বছর বয়সে তিনি স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়কে একদিন গল্প করিয়াছিলেন যে, ছেলেবেলায় ইস্কুল হইতে আসিয়া বাবার বৈঠকখানার চারদিকে তিনি ঘুরিয়া বেড়াইতেন। বৈঠকখানায় ঢুকিতে ইচ্ছা হয়, অথচ সাহস হয় না! একদিন তাঁহার পিতা বলিলেন, 'তুই ছুটে ছুটে বেড়াস্ কেন, বৈঠকখানার ভিতরে বস্‌তে পারিস্ না?' তবু তাঁহার ভরসা হয় না। তার পরে এক সময় হঠাৎ গিয়া দেখেন যে ভিতরে বেশ ফুলের তোড়া, বৈঠকখানাটি নানা সুন্দর জিনিষ দিয়া সাজানো। তখন হইতে বৈঠকখানায় বসিবার অধিকার হইল। সেইখানে বসিয়া অভিধান দেখিয়া তিনি পড়া শিখিতে লাগিলেন। এই গল্প করিয়া তিনি উমেশ বাবুকে বলিলেন, এখন সে বাবা নাই, আদত বাবা ছুটাছুটি ছাড়িয়া তাঁর ঘরে বসিতে বলিয়াছেন। বেশ লাগিতেছে'। (অজিতকুমার, ২৮ পৃঃ)।

উপরে উদ্ধৃত উক্তি হইতে পাঠকের মনে দ্বারকানাথ সম্বন্ধে অত্যন্ত ভুল ধারণা জন্মিতে পারে। পিতার বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথ আত্মজীবনীতে যাহা লিখিয়াছেন, এবং তিনি ধর্ম্মবন্ধুদের কাছে পিতার বিষয়ে যে দু একটি কথা বলিয়াছেন, তাহা পিতার সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতার পরিচায়ক নহে বটে। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের বাল্যজীবনে তাঁহার পিতার সঙ্গে সম্বন্ধ কিরূপ ছিল, তাহা তাঁহার আত্মজীবনী হইতে অথবা পরিণত বয়সের ধর্ম্মপ্রসঙ্গের উক্তি হইতে বুঝিতে পারিবার সম্ভাবনা নাই। তাহার জন্য দ্বারকানাথের জীবনচরিত আলোচনা করা আবশ্যক। ইহা সত্য বটে যে সেকালে পিতায় পুত্রে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হওয়া সাধারণ রীতি ছিল না। কিন্তু সেকালের সাধারণ রীতির তুলনায় দ্বারকানাথ অতিশয় পুত্রবৎসল পিতা ছিলেন। দ্বারকানাথকে নিজ বিষয়সম্পত্তির প্রসারণে ও পরিচালনে, তৎকালীন কলিকাতার অধিকাংশ লোকহিতকর অনুষ্ঠানে, এবং দেশীয় (বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী) এবং ইংরাজ ভদ্রলোকদিগের সহিত নানাবিধ সামাজিকতায়, অতিশয় ব্যস্ত থাকিতে হইত। তিনি যখন (১৮২৩) গভর্ণমেণ্টের বিশ্বাসভাজন হইয়া ভাবী অতুল সম্পদের ভিত্তি স্থাপনের নানা চেষ্টায় আকণ্ঠ নিমগ্ন, দেবেন্দ্রনাথের বয়স তখন ৬ বৎসর মাত্র। কিন্তু তথাপি এরূপ কার্য্যবাহুল্য সত্ত্বেও দ্বারকানাথ, দেবেন্দ্রনাথের বাল্যকালে তাঁহার জন্য অতুল যত্ন ও স্নেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন; দেবেন্দ্রনাথের বিদ্যাচর্চ্চা, এবং শরীরের স্বাস্থ্য ও আরামের জন্য তাঁহার ব্যবস্থার সীমা ছিল না। নিজেই তিনি সর্ব্বদা এ সকলের তত্ত্বাবধান করিতেন।

ইহার পরে দ্বারকানাথের বিষয়-বাণিজ্যের সফলতা যখন (১৮৩৪) এত অধিক হইতে লাগিল যে তিনি গভর্ণমেণ্টের অতি উচ্চ কর্ম্মটিও ত্যাগ করাই লাভজনক মনে করিলেন, তখন দেবেন্দ্রনাথের বয়স ১৭ বৎসর। তখনও দেবেন্দ্রনাথ কলেজের ছাত্র, অথবা সবে-মাত্র কলেজ ত্যাগ করিয়াছেন। দ্বারকানাথের ইচ্ছা ছিল, জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার বিষয়সম্পদ্ প্রসারণে প্রধান সহায় হন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ দুই ভাবে পিতার সে আশা ভগ্ন করিলেন। সেই সময়ে পিতার ঐশ্বর্য্যের আস্বাদ পাইয়া দেবেন্দ্রনাথ এক বার হঠাৎ "বিলাসের আমোদে" অত্যধিক পরিমাণে নিমগ্ন হইয়া পড়িলেন, এবং সেজন্য তাঁহার নীতিমান পিতার অসন্তোষ ও ভৎর্সনাভাজন হইলেন। তৎপরে, বিধাতার অপূর্ব্ব বিধানে ১৮৩৫ সালে দেবেন্দ্রনাথের চিত্তের গতি একেবারে বিপরীত মুখে প্রবল বেগে চালিত হইয়া গেল; পিতামহীর মৃত্যুর পরে বৈরাগ্য এবং ধর্ম্মপিপাসা দেবেন্দ্রনাথের চিত্তকে একেবারে গ্রাস করিল। এই পরিবর্ত্তিত জীবনের এত প্রবল ধর্ম্মাবেগও আবার দ্বারকানাথের মনঃপূত হইল না। সত্য বটে, ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করা, ব্রাহ্মসমাজ পক্ষীয় পণ্ডিত ও ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য প্রভৃতিকে অর্থসাহায্য করা, ইত্যাদি কার্য্যে দ্বারকানাথই দেবেন্দ্রনাথের পথপ্রদর্শক ছিলেন। কিন্তু তিনি দেবেন্দ্রনাথের ন্যায় কখনও ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্য মত্ত হইয়া উঠেন নাই।

দ্বারকানাথের প্রকৃতিটি অন্যরূপ ছিল। তিনি ধর্ম্মপ্রাণ ও সাত্বিকপ্রকৃতিসম্পন্ন মানুষ হইয়াও, সংসারী মানুষ ছিলেন। তিনি মান সম্ভ্রম ভালবাসিতেন, নিজপদোচিত জাঁকজমক করিয়া বাস করিতে ভালবাসিতেন, এবং তৎকালীন ধনীদিগের

রীতি অনুসারে বিলাস ও প্রমোদের আয়োজনও করিতেন। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও মনে রাখিতে হইবে যে তিনি চিরজীবন নীতিমান্ মানুষ ছিলেন। তাঁহার প্রদত্ত ভোজে মদ্যের স্রোত বহিয়া যাইত, কিন্তু তিনি কি স্বদেশে কি বিলাতে কোথাও মদ্য স্পর্শ করেন নাই[১]। তিনি নিজ পূজা অর্চনায় অতিশয় নিষ্ঠাবান্ ছিলেন; এমন কি, ইংলণ্ডে যখন তাঁহার ভবনে তাঁহার সাক্ষাতের জন্য কোনও Duchess আসিয়া অপেক্ষা করিতেন, তখনও তিনি নিজের জপ সম্পূর্ণ না করিয়া উঠিতেন না।

যখন দ্বারকানাথের সম্পদ্‌সূর্য্য মধ্যাহ্নগগন উদ্ভাসিত করিয়া প্রখর কিরণে জ্বলিতেছে (১৮৪০), যখন কলিকাতার সমুদয় দেশীয় ও য়ুরোপীয় সমাজ দ্বারকানাথের ঐশ্বর্য্যে ও বদান্যতায় তাঁহার স্তুতিগানে মুখরিত ও তাঁহার অনুগ্রহকণা লাভের জন্য লালায়িত, যখন দ্বারকানাথ কলিকাতার সর্ব্বপ্রধান দাতা, সর্ব্বপ্রধান পরামর্শদাতা, ও প্রায় একচ্ছত্র সামাজিক সম্রাট্, সেই সময়ে দেবেন্দ্রনাথের ক্ষুধিত ও তৃষিত চিত্ত একমাত্র ধর্ম্মকেই অন্বেষণ করিতেছিল, এবং পিতার ঐশ্বর্য্যে, পিতার ভবনের ও পিতার উদ্যানের বিলাসের আয়োজনে ও লোকসমারোহে, অস্থির হইয়া উঠিতেছিল। এই সময়ে দ্বারকানাথ দেবেন্দ্রনাথের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু সে অসন্তোষের কারণ দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম্মভাব বা বিলাসবিমুখতা নহে; বিষয় পরিদর্শনে অমনোযোগ। এই সময়ে পিতায় পুত্রে কিয়ৎ পরিমাণে মনের বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল সন্দেহ নাই। আত্মজীবনীতে প্রধানভাবে এই সময়ের ছবিটিই পড়িয়াছে। কিন্তু ইহা হইতে কেহ যেন এইরূপ অনুমান না করেন যে বাল্যকালে দ্বারকানাথ দেবেন্দ্রনাথকে আপনা হইতে সুদূরে রাখিতেন।

দেবেন্দ্রনাথের হৃদয়ে ও চরিত্রে পিতার ছাপ নাই, এরূপ মনে করিলে অত্যন্ত ভুল করা হইবে। বরং ইহার বিপরীত কথাই সত্য। আত্মজীবনীতে দেবেন্দ্রনাথ স্বীয় ধর্ম্মচিন্তার ও ধর্ম্মতত্ত্ব উপলব্ধির ইতিহাসকেই প্রাধান্য দিয়াছেন; তাই ইহাতে পিতার সদ্‌গুণ ও সদনুষ্ঠানসকলের উল্লেখ করেন নাই, এবং পিতার চরিত্রের প্রভাবেরও উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু শোণিত-সূত্রে, ও বাল্যজীবনে পিতার দৃষ্টান্তের প্রভাবসূত্রে, দেবেন্দ্রনাথ দ্বারকানাথের চরিত্র হইতেই স্বকীয় অধিকাংশ মহত্ত্ব ও সদ্‌গুণ আহরণ করিয়াছিলেন। দ্বারকানাথের কর্ত্তব্যপরায়ণতা, তাঁহার একান্ত সাধুতা ও সদাশয়তা, তাঁহার উদারতা ও দানে মুক্তহস্ততা, তাঁহার ক্ষুদ্রচিত্ততায় ও ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া জীবনযাপনে একান্ত অনাস্থা, তাঁহার মনস্বিতা, তেজস্বিতা ও স্বজাতির গৌরবে গর্ব্ব, তাঁহার ভারতীয় আদর্শসকলের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, তাঁহার সূক্ষ্ম বিষয়ে দৃষ্টি, সৌন্দর্য্যবোধ ও শৃঙ্খলাপ্রিয়তা, এবং সর্ব্বোপরি ধর্ম্মকর্ম্মে তাঁহার দৃঢ় নিষ্ঠা, আমরা দেবেন্দ্রনাথের চরিত্রেও দেখিতে পাই। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ বয়স্ক হইবার পর হইতে, পিতার ও পুত্রের জীবনের লক্ষ্যের ভিন্নতা অতিশয় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। দ্বারকানাথের আকাঙ্ক্ষা ছিল যে সংসারে প্রতিপত্তিশালী ও যশস্বী হইব, এবং প্রাণ খুলিয়া পরোপকার ও দেশের উপকার করিব। দেবেন্দ্রনাথ সংসারে নিঃস্পৃহ এবং যশ হইতে সঙ্কুচিত ছিলেন; তাঁহার মনের কথা ছিল,—"তোমা বিহনে আমার জীবনে কি কাজ?" (আত্মজীবনী ৩৩ পৃষ্ঠা)। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ছিল যে কিসে ব্রহ্মের পূজা দেশ মধ্যে ব্যাপ্ত হয়। দ্বারকানাথ দশের মানুষ ছিলেন, মানবপ্রেমিক ছিলেন, সর্ব্বশ্রেণীর মানুষদের লইয়া থাকিতে ভাল বাসিতেন। দেবেন্দ্রনাথ ধর্ম্মের মানুষ ছিলেন, ঈশ্বরপ্রেমিক ছিলেন, ঈশ্বরপ্রেমিকদের লইয়াই থাকিতে ভালবাসিতেন। বিষয়-পরিচালনে দ্বারকানাথের বুদ্ধি এবং অনুরাগ উভয়ই প্রকাশ পাইত; দেবেন্দ্রনাথ বিষয়-পরিচালনে যথাসাধ্য নিজ বুদ্ধি প্রয়োগ করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার অনুরাগ পড়িয়া থাকিত ঈশ্বরে। দ্বারকানাথ মানুষকে স্বদলে ও স্বমতে আনিবার এবং বিষয় সম্পদ্ নানা দিক দিয়া প্রসারিত করিবার কৌশলটি বিশেষরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ সে-সকল পথ দিয়া যান নাই, সে-সকল কৌশল শিখিতে পারেন নাই। অপর দিকে, ধর্ম্মের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া অবধি, দেবেন্দ্রনাথ আহারে বিহারে, আমোদে প্রমোদে, ধনের ব্যবহারে এবং বন্ধু ও সহচর নির্ব্বাচনে, যে কঠোর সংযমের ও শুচিতার নিয়মে আপনাকে বাঁধিয়াছিলেন, দ্বারকানাথে তাহা ছিল না। কিন্তু এই পার্থক্য সত্ত্বেও, দেবেন্দ্রনাথের প্রকৃতির, গতিবিধির, ও আচরণের অধিকাংশ লক্ষণ তাঁহাকে দ্বারকানাথের পুত্র বলিয়াই পরিচিত করিয়া দেয়।

স্বদেশের সেবায় ও বিবিধ সদনুষ্ঠানে দ্বারকানাথের জীবন অতিশয় সমুজ্জ্বল। রামমোহন রায়ের ন্যায় তিনিও স্বীয় যুগের ইতিহাসে নিজের সুস্পষ্ট ছাপ রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জীবনচরিত প্রকাশিত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

(১) শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আমাকে এই কথা বলিয়াছেন; এবং ইহাও বলিয়াছেন যে তাঁহার নিকটে তাঁহার এই উক্তির বিশিষ্ট প্রমাণ আছে।

পরলোকগত ধর্ম্মদাস বসু

(কন্যা শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা রায় কর্ত্তৃক লিখিত এবং জামাতা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদয়াল রায় কর্ত্তৃক শ্রাদ্ধবাসরে পঠিত)

১৮৫১ খৃষ্টাব্দে, ২৬ শে নভেম্বর বৃটিশ চন্দননগরে পরম পূজ্যপাদ পিতা আমার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মকালে আমার পিতামহ পরলোকগত পার্ব্বতীচরণ বসু তমলুকে পোষ্টমাষ্টার ছিলেন। পিতামহকে আত্মীয় কুটুম্বসমন্বিত একটী বৃহৎ পরিবারের ভরণপোষণ করিতে হইত। তিনি যে বেতন পাইতেন তাহাতে সংসারের ব্যয় নির্ব্বাহ হইত না বলিয়া, তিনি লোক রাখিয়া কয়েকখানি মাল বোঝাইয়ের নৌকা চালাইয়া ব্যবসায় করিতেন।

পিতার বাল্যকাল তমলুকেই অতিবাহিত হয়। তিনি তমলুক বাংলা বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। ৮ বৎসর বয়সে তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর ও জ্যেষ্ঠা সহোদরায়

বিসূচিকা রোগে মৃত্যু হইলে, পিতামহ চন্দননগরে সপরিবারে ফিরিয়া আসেন ও অল্পদিন পরেই পুত্র কন্যার শোকে উনপঞ্চাশ বৎসর বয়সে, ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে, ফেব্রুয়ারী মাসে, ইহলোক ত্যাগ করেন। দুইটী বালক ও দুইটী শিশু কন্যার লালন পালনের জন্য রহিলেন কেবল আমার পিতামহী। পিতার বয়স তখন মাত্র ৯ বৎসর ও তাঁহার অগ্রজ শ্রীযুক্ত বামাচরণ বসু মহাশয়ের বয়স তখন মাত্র ১১ বৎসর। আমার পিতামহী বুদ্ধিমতী ছিলেন; স্বামীর নৌকার ব্যবসায় লোকের দ্বারা চালাইয়া, সেই আয় হইতে তিনি সন্তানগণের গ্রাসাচ্ছাদনের ও পুত্রদ্বয়ের বিদ্যাশিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

চন্দননগরে আসিয়া পিতা কিছুদিন ফ্রী চার্চ্চ স্কুলে অধ্যয়ন করিয়া, পরে চন্দন নগরের গড়বাটী স্কুল হইতে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে মধ্য ইংরাজী পরিক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, বৃত্তিস্বরূপ হুগলি কলিজিয়েট্ স্কুলে দুই বৎসর বিনা বেতনে অধ্যয়ন করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন। হুগলি কলিজিয়েট স্কুল হইতেই তিনি ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক ১০৲ দশ টাকা বৃত্তি লাভ করেন।

বাল্যকালে পিতার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। এই সময়ে পুনরায় তিনি অসুস্থ হন। তাঁহাদের সাংসারিক অবস্থাও এই সময়ে শোচনীয় হইয়া উঠিল। বিশ্বাসী তত্ত্বাবধায়কের অভাবে তাঁহাদের নৌকার ব্যবসায়ে ক্ষতি হওয়াতে, এই সময়ে উহা বন্ধ করিতে হয়। তাঁহার এক পিতৃব্যপুত্র কিছুদিন এই দুরবস্থার সময়ে তাঁহাদিগকে স্বপরিবারভুক্ত করিয়া লন। পিতামহ পার্ব্বতীচরণ উক্ত ভ্রাতৃপুত্রকে শৈশবকাল হইতেই পুত্র নির্ব্বিশেষে পালন করিয়াছিলেন। অকৃতজ্ঞ ভ্রাতুষ্পুত্র কিন্তু অল্পদিন পরেই পিতৃব্যপত্নীকে পুত্র কন্যা লইয়া পৃথক হইতে বলিলেন। বিধবা পিতামহী অকূল পাথারে পড়িলেন। দেবরপুত্র কর্ত্তৃক তদীয় গৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়া, তাঁহাকে পুত্র কন্যা সহ গোময় ও গোমূত্রপূর্ণ গোশালায় তিন দিন অতিবাহিত করিতে হয়। স্বামীর পরিত্যক্ত গৃহে ফিরিয়া আসিয়া, যেদিন তাঁহাকে পুত্রকন্যাগুলির সহিত ছিন্ন মলিন শয্যায় শয়ন করিয়া বিনিদ্র নয়নে রাত্রি কাটাইতে হয়, সেই বিষাদময়ী রজনীর স্মৃতি আমার পিতার কোমল হৃদয়ে দুরপনেয় মসীতে মুদ্রিত হইয়া যায়। যাহা হউক, তাঁহাদিগকে এই দুরবস্থা অধিক দিন ভোগ করিতে হয় নাই।

পিতার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না বলিয়া তাঁহার আত্মীয় বন্ধুগণ তাঁহাকে স্থান পরিবর্ত্তনের জন্য কলিকাতায় আসিয়া মেডিক্যাল কলেজে পাঠ করিতে পরামর্শ দিলেন। তাঁহার নিজের কিন্তু তৎকালে General education এর দিকেই আগ্রহ ছিল। তিনি মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হইলেন এবং কিছুদিন সেই সঙ্গে General Assembly's Institution এ First Artsও পড়িতে লাগিলেন। কিন্তু দুই দিকে মনোযোগ দেওয়ায় তাঁহার স্বাস্থ্যের ত উন্নতি হইলই না, উপরন্তু তিনি ডাক্তারী পরীক্ষায় প্রথম বর্ষে বৃত্তি পাইলেন না। সুতরাং তাঁহাকে First Arts পড়া বন্ধ করিয়া ডাক্তারী শিক্ষাতেই মনোনিবেশ করিতে হয়। পরে মধ্যে মধ্যে ম্যালেরিয়া রোগে পীড়িত হইয়াও তিনি মেডিক্যাল কলেজের বার্ষিক পরীক্ষাসমূহে প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে L. M. S. পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

ডাক্তারীর শেষ পরীক্ষার ফল বাহির হইবার কিছু দিন পরেই, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ১০ই মে, তিনি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ফার্ষ্ট সার্জ্জনের অধীনে হাউস্ সার্জ্জনের কর্ম্ম প্রাপ্ত হন। কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ও অধ্যাপকগণ উৎকৃষ্ট ও কর্ম্মকুশল ছাত্র বলিয়া পিতাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন; কিন্তু তাঁহার উপরিতন কর্ম্মচারী ফার্ষ্ট সার্জ্জন ম্যাকোনেল সাহেব তাঁহার সহিত অসদ্ব্যবহার করিতে লাগিলেন। এই ম্যাকোনেল সাহেব নিজের কার্য্যের ত্রুটী ও অক্ষমতার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া, ডাক্তার বসুই সেই সকল ত্রুটী কর্ত্তৃপক্ষের গোচর করিবার মূল কারণ এই ধারণায়, তাঁহার উপর জাতক্রোধ হইলেন। এই সার্জ্জনের অভদ্র ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া, পিতার তৎকালীন কর্ম্মের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মে, এবং বিলাতে যাইয়া উচ্চতর কর্ম্মে যোগ্য হইয়া, অধীনতার ক্লেশ হইতে মুক্ত হইবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার প্রাণে জাগে। কিন্তু সে আকাঙ্ক্ষা সফল হইবার তৎকালে কোনই সম্ভাবনা ছিল না।

এই ঘটনার ৫ বৎসর পূর্ব্বে, ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে, ব্যারাকপুরের নিকটবর্ত্তী মণিরামপুর গ্রামে তাঁহার বিবাহ হয়। নবম বর্ষীয়া বালিকাকে তিনি নিজেই সহধর্ম্মিণীরূপে নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন। হাউস্ সার্জ্জনের কর্ম্মে বিতৃষ্ণা জন্মিবার সময়ে তাঁহার একটি পুত্র সন্তান জন্মিয়াছিল। এই কারণে, এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কর্ম্মচ্যুতি হওয়া প্রভৃতি নানা কারণে, এই সময়ে তাঁহাদের সাংসারিক অবস্থা মন্দ হয়। কিছু দিন পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা একটী ১০০৲ টাকা বেতনের কর্ম্ম পাইলেন তাহাতে তাঁহাদের সাংসারিক ক্লেশই নিবারণ হইল মাত্র। এই অসচ্ছল অবস্থার মধ্যে তাঁহার অগ্রজ বা জননী কেহই তাঁহার বিলাত যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা সমর্থন করা সম্ভব মনে করিলেন না। পিতা কিন্তু তাহাতে নিরুৎসাহ হইলেন না। আত্মোন্নতির অদম্য কামনা তখন তাঁহার হৃদয়ে বলবতী, তিনি অভীষ্ট সিদ্ধির উপায় উদ্ভাবনে নিযুক্ত হইলেন।

পিতা প্রথমে কুলী-জাহাজে ডাক্তার হইয়া বিলাত যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তৎকালে কুলী-জাহাজের ডাক্তার হইয়া Demerara, Trinidad প্রভৃতি উপনিবেশে গেলে প্রতি কুলীতে ৫৲ টাকা পাওয়া যাইত। প্রতি জাহাজে পাঁচ শতের অধিক কুলী যাইত, এবং একবার কুলী-জাহাজ লইয়া গেলে ন্যূনাধিক আড়াই হাজার টাকা পাইবার সম্ভাবনা ছিল। পিতা মনে করিয়াছিলেন সেই টাকা পাইলে তিনি বিলাতে গিয়া I. M. S. পরীক্ষা দিয়া আসিবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কুলী-জাহাজের কর্ম্ম সে সময়ে পাওয়া গেল না, তিনি নিতান্ত হতাশ হইয়া পড়িলেন। সেই সময়ে এক দিন কলেজ হইতে বাসায় ফিরিয়া, পোষাক ছাড়িতে ছাড়িতে হঠাৎ তাঁহার মনে হইল "চন্দননগরের প্রাণকৃষ্ণ চৌধুরী মহাশয় শুনিয়াছি দাতা লোক, তাঁহার কাছে গিয়া একবার চেষ্টা করিয়া দেখিলে হয় না?' তাঁহাকে কে যেন ভিতর হইতে বলিল "গিয়াই

দেখ না।" তিনি তৎক্ষণাৎ প্রাণকৃষ্ণ বাবুর কলিকাতার বাটীতে গিয়া তাঁহাকে কার্ড পাঠাইতে, তিনি পিতাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। পিতা তাঁহাকে তাঁহার সাংসারিক অবস্থা ও বিলাতে গিয়া চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার আগ্রহ জানাইলে, প্রাণকৃষ্ণ বাবু বলিলেন, "আমিও এই রকম একটী ছেলের কথাই ভাবছিলুম; আমি তোমাকে সাহায্য করবো, কিন্তু তোমার সব খরচ দিতে পারবো না; কারণ আমি তত ধনী নই; কিন্তু সাধ্যমত সাহায্য করবো।" প্রথম সাক্ষাতেই এই আশ্বাস পাইয়া পিতা আজীবন এই ঘটনাকে একটী ঈশ্বরের বিধান বলিয়া মনে করিতেন।

বদান্য প্রাণকৃষ্ণ চৌধুরী মহাশয় তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন এবং পিতাকে অঙ্গীকার করাইয়া লয়েন যে, তিনি যেমন তাঁহাকে বিলাতে শিক্ষার জন্য পাঠাইতেছেন, বিলাত হইতে কৃতী হইয়া আসিলে, পিতাও যেন আবার দুই জন যোগ্য অথচ অবস্থাহীন ছাত্রকে বিলাতে শিক্ষার জন্য তুল্যরূপ সাহায্য করেন। বলা বাহুল্য ধর্ম্মাত্মা পিতা আমার নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া, সেই রূপ সর্ত্তে দুই জন ভারতীয় ছাত্রকে বিলাতে শিক্ষার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে এক জন, Mr.' Albion Banerji, I. C. S. তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার প্রেরিত এক জন ছাত্র ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছেন। অপর ব্যক্তি তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে পারেন নাই।

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে পিতা আমার বিলাতযাত্রা করেন এবং ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ শে মার্চ্চ I. M. S. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভারতীয় কভেন্যান্টেড মেডিক্যাল সার্ভিস বিভাগে কর্ম্ম প্রাপ্ত হন।

স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া পিতা ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে প্রথমে প্রেসিডেন্সি জেনারেল হস্‌পিটালে সার্জ্জেন নিযুক্ত হন ও ছয় মাস পরে মেডিকেল কলেজে, প্রথমে রেসিডেন্ট সার্জ্জন ও ফিজিওলজির অধ্যাপক এবং পরে রেসিডেন্ট ফিজিসিয়ান ও প্যাথলজির অধ্যাপক, নিযুক্ত হন। এই রূপে ৫ বৎসর পূর্ব্বে যে কলেজের সার্জ্জন কর্ত্তৃক তিনি নিম্নতর কর্ম্মচারী মাত্র বলিয়া অবজ্ঞাত হইয়াছিলেন, সেই কলেজেই রেসিডেন্ট সার্জ্জনের পদে বৃত হইয়া আসিলেন।

মেডিক্যাল কলেজে অধ্যাপনার সময়ে তিনি ছাত্রগণের আন্তরিক শ্রদ্ধাভাজন হন। তাঁহার তৎকালীন ছাত্রগণের মধ্যে পরলোকগত প্রতিভাবান ডাক্তার ভগবানচন্দ্র রুদ্র, খ্যাতনামা ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রাণধন বসু ও হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার পরলোকগত অক্ষয় কুমার দত্ত মহাশয়গণের নাম উল্লেখযোগ্য।

মেডিক্যাল কলেজে কর্ম্মকালে এক বার তাঁহাকে দ্বীপান্তরবাসী কয়েদীদিগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইয়া আণ্ডামান দ্বীপে যাইতে হয়। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রাঁচী বিভাগের টীকা দিবার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সিভিল সার্জ্জন নিযুক্ত হইয়া হাজারীবাগে বদলী হয়েন। তৎপরে ক্রমান্বয়ে মানভূম, ফরিদপুর, বীরভূম, ময়মনসিংহ, বর্দ্ধমান, ২৪ পরগণা, পূর্ণিয়া, যশোহর, রঙ্গপুর, প্রভৃতি জেলায় ২৫ বৎসর কাল সিভিল সার্জ্জনের কর্ম্মে প্রভূত যশ অর্জ্জন করিয়া ১৯০২ সালের জুলাই মাসে কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। মধ্যে দুই বার তাঁহাকে সামরিক বিভাগে কর্ম্ম করিতে হয়। প্রথমবার ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ডফরিনের অনুষ্ঠিত কানপুরের সামরিক শিক্ষা শিবিরে (Camp of Exercise) যাইয়া, সেখান হইতে সৈন্যদিগের সহিত মার্চ্চ (march) করিয়া দিল্লী, গুরগাঁও প্রভৃতি স্থানে যাইতে হয়। দ্বিতীয়বার ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রথমে দানাপুরে, পরে কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়মে, একটী সৈন্যদলের সার্জ্জন নিযুক্ত হন। তৎপূর্ব্বে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দুই বৎসরের অবকাশ লইয়া দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রা করেন এবং কিছুদিন লণ্ডনে জীবাণুবিদ্যা (Bactereology) ও শরীর যন্ত্রের সূক্ষ্মাংশ বিদ্যা (Histology) অধ্যয়ন করিয়া য়ুরোপের নানা স্থানে পর্য্যটন করিয়া আসেন। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সার্জ্জন মেজর এবং ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে লেফটন্যাণ্ট কর্ণেল পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। বিলাতে অবস্থানকালে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি British Medical Association সভার সভ্যশ্রেণী ভুক্ত হয়েন এবং ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লণ্ডনের Royal Institute of Public Health সমিতির Fellow নির্ব্বাচিত হয়েন।

মৈমনসিংহে কর্ম্মকালে পিতা বাঙ্গলা ভাষায় স্বাস্থ্যরক্ষা ও সাধারণ স্বাস্থ্যতত্ত্ব (Hygiene and Public Health) সম্বন্ধে একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থ তাঁহার বহু দিনের পরিশ্রম, গবেষণা ও অভিজ্ঞতার ফল। বাঙ্গলা ভাষায় স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্বন্ধে এরূপ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আর নাই, ইহা অভিজ্ঞ সমালোচকদিগের অভিমত।

চিকিৎসাকার্য্যে অনন্যসাধারণ পারদর্শিতার জন্য পিতা প্রভূত যশ লাভ করেন। তিনি যেখানে সিভিল সার্জ্জন হইয়া গিয়াছেন, সেই খানেই সুচিকিৎসক বলিয়া খ্যাতি ও সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট তাঁহার এই সুনামের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য তাঁহাকে ৫ বৎসর কাল মৈমনসিংহের সিভিল সার্জ্জন পদে অধিষ্ঠিত রাখেন। তাঁহার পূর্ব্বে আর কোনও ভারতীয় ডাক্তার মৈমনসিংহের মত সুবৃহৎ ও অর্থকরী জেলার সিভিল সার্জ্জন নিযুক্ত হন নাই। মৈমনসিংহে থাকিতে তিনি মাসিক ২।৩ সহস্র টাকা উপার্জ্জন করিতেন। এক জন জমিদারকে তিনি সুচিকিৎসার গুণে আসন্ন মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিলে, জমিদার মহাশয় পিতাকে বিশ হাজার টাকা পারিতোষিক দেন। এখনকার দিনে এরূপ দর্শনী পাওয়ায় অসাধারণত্ব কিছুই নাই; কিন্তু তৎকালে ডাক্তারদের ফী অসম্ভব হারে বৃদ্ধি পায় নাই। পিতা কলিকাতায় স্বাধীন ভাবে চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বন করিলে, নিঃসন্দেহ চিকিৎসকগণের শীর্ষস্থান অধিকার করিতেন। তিনি যখন কানপুরে সামরিক বিভাগে বদলি হয়েন, তখন একবার সেই ইচ্ছা তাঁহার মনে উদিত হইয়াছিল। তাঁহার স্নেহভাজন ছাত্র ও আত্মীয় প্রতিভাবান ডাক্তার ভগবানচন্দ্র রুদ্র তাঁহাকে এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে পরামর্শও দিয়াছিলেন। পুনরায় যখন ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রাজকর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন, তখনও তাঁহার আত্মীয় বন্ধুগণ তাঁহাকে কলিকাতায় চিকিৎসাবৃত্তি

অবলম্বন করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু পিতার মনে অর্থলালসা কখনই প্রবল ছিল না। তিনি নিশ্চিন্ত মনে ধর্ম্মালোচনা, অধ্যয়ন ও পারিবারিক শান্তিতে জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিবার উদ্দেশ্যেই অবসর লইয়াছিলেন। পরন্তু ধূমাকীর্ণ বায়ুর অপেক্ষা শস্যশ্যামলা বঙ্গজননীর পল্লী-সুলভ মুক্ত বাতাসের উপর তাঁহার চির দিনই ঐকান্তিক অনুরাগ ছিল। কলিকাতার ভিষক্‌সমাজে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবার সমূহ সম্ভাবনাও তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে পারে নাই। তিনি মাত্র ৭৫০৲ টাকা পেন্সনে সন্তুষ্ট হইয়া বীরভূমে অজ্ঞাতবাস করিতে গেলেন। বীরভূমে বাসকালেও স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন করিলে তিনি যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিতেন; কিন্তু স্থানীয় ডাক্তারগণ তাঁহাকে বলেন যে, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে—তিনি তাঁহাদের দ্বারা পরামর্শের জন্য আহূত না হইলে যেন স্বতন্ত্র ভাবে কোনও রোগীর চিকিৎসার ভার গ্রহণ না করেন। পিতা নিজ ক্ষতি স্বীকার করিয়াও তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করেন।

কেবল সুপণ্ডিত ও যশস্বী চিকিৎসক বলিয়া নহে, স্বভাব-সিদ্ধ সৌজন্য ও সদয় ব্যবহারের জন্য পিতা স্বতঃই জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিতেন। তিনি যখন পুরুলিয়া হইতে ফরিদপুরে বদলী হয়েন, তখন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত গঙ্গানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ পুরুলিয়াবাসী জনবৃন্দ তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিবার আদেশ রহিত করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করেন। যশোহর হইতে স্থানান্তরিত হইবার সময়ে যশোহরবাসিগণ সাশ্রু নয়নে তাঁহাকে বিদায় দেন এবং উচ্চতম চিকিৎসা-প্রতিভার সহিত তাঁহার চরিত্রে দয়া দাক্ষিণ্যাদি দুর্ল্লভ সদ্‌গুণের যেরূপ একাধারে সমাবেশ ছিল, সেরূপ এ সংসারে সহজে দেখা যায় না, এ কথাটী একটী বিদায়-সঙ্গীত রচনা করিয়া, তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে কীর্ত্তন করেন। তাঁহার স্বভাব-গুণে তিনি যেখানে গিয়াছেন সেই খানেই আদর ও ভক্তি পাইয়াছেন। বাস্তবিকই যে কেহ তাঁহার সংস্রবে আসিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে ও প্রিয়ভাষিতায় মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারেন নাই।

তিনি কখনও রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করেন নাই। সুতরাং গভর্ণমেণ্টের কোন কার্য্যের সমর্থন বা স্তুতিবাদ করিয়া উপাধি লাভের, অথবা তাহার প্রতিবাদ করিয়া লোকখ্যাতি লাভ করিবার, আকাঙ্ক্ষা তাঁহার মনে উদিত হয় নাই। পক্ষান্তরে তাঁহার মত উদার ও শান্তিপ্রিয় ব্যক্তির গভর্ণমেণ্টের বা জনসাধারণের বিরাগভাজন হইবারও কোনও সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু তথাচ কর্ত্তব্যের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি কখনও কখনও সম্প্রদায়বিশেষের অসন্তুষ্টি অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তিনি সত্য ও ন্যায়ের একান্ত উপাসক ছিলেন। যাহা অসত্য বা অশ্রেয়ঃ বলিয়া তাঁহার ধারণা হইত, তাহার অনুমোদন করা বা ক্ষমতা থাকিলে তাহার প্রতিকার না করা, তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল।

"Charity begins at home"—"পরের ভাল করিতে চাহ ত ঘরের মঙ্গল আগে কর"—এই নীতি-বাক্যের সার্থকতা পিতার জীবনে প্রতিভাত ছিল। অবস্থাপন্ন হইলে অনেকেই গরীব আত্মীয়দের সাহায্য করা দূরে থাকুক, তাহাদের সহিত আত্মীয়তা স্বীকার করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন; তিনি কিন্তু উচ্চপদস্থ হইয়া তাঁহার দুরবস্থাপন্ন আত্মীয় কুটুম্ব প্রতিবেশী বন্ধু বান্ধব সকলেরই সহিত ঘনিষ্ঠতা রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। মাঝিপাড়া ও চন্দননগরের জ্ঞাতিবর্গ, মণিরামপুরের আত্মীয়গণ ও প্রতিবেশী বন্ধু বান্ধব যে কেহ তাঁহার নিকট অভাব জ্ঞাপন করিয়াছে, তাহাকেই তিনি সাধ্যমত সাহায্য করিয়াছেন। এমন কি, যাঁহারা তাঁহার দুরবস্থার সময় তাঁহার অনিষ্টচেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহা-দিগকেও তিনি মাসিক সাহায্য করিয়াছেন। হিন্দু সমাজভুক্ত না হইয়াও, তিনি মাতা ভ্রাতা ভগ্নী প্রভৃতি স্বজনদিগের সহিত পরম স্নেহময় ঘনিষ্ঠতা রক্ষা করিয়া, তাঁহাদের প্রতি কর্ত্তব্য এরূপ উদার ভাবে পালন করিয়া আসিয়াছেন যে, এই স্বার্থপরতা-ময় জীবনসংগ্রামের দিনে, শুধু বিলাত প্রত্যাগতদিগের মধ্যে নহে, একান্নবর্ত্তী পরিবারভুক্ত হিন্দুসমাজেও, সেরূপ দৃষ্টান্ত অতীব বিরল। দুঃস্থ আত্মীয় স্বজনগণকে মাতৃপিতৃদায়, কন্যাদায়, পুত্রের শিক্ষা প্রভৃতি ব্যয়সাপেক্ষ সকল বিষয়েই তিনি সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন। সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিয়াও, তিনি কুলগুরুপুত্রের শিক্ষার জন্য বহুবর্ষব্যাপী মাসিক দান ও সামাজিক সকল দায়িত্বই রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। বাল্য জীবনের স্মৃতিসংশ্লিষ্ট সকল বিষয়েই তাঁহার বিশেষ মমতা ছিল। তমলুকের স্কুলে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন; উত্তর কালে তিনি সেই তমলুক হ্যামিল্টন স্কুলে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শ্রেষ্ঠ ছাত্রের প্রাপ্য একটী মাসিক ৮৲ টাকা মূল্যের বৃত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে পরলোকগত প্রাণকৃষ্ণ চৌধুরীর নিকট প্রতিশ্রুতিপালনার্থ তিনি দুইটি শিক্ষার্থীকে নিজ ব্যয়ে বিলাতে প্রেরণ করেন। তাঁহার মত কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ব্যক্তি সচরাচর দেখা যায় না। তিনি যাহা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিতেন, তাহা পালন না করিয়া নিশ্চিন্ত হইতেন না। বিলাতে অর্থকরী শিক্ষার উপকারিতা নিজ জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি পুত্রগণকে বিলাতে শিক্ষাদান করা কর্ত্তব্য মনে করেন। বিলাতপ্রবাসীর চরিত্রে সে সকল ত্রুটি সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহার দেবতুল্য চরিত্রে যে সকল দোষের ছায়ামাত্রও স্পর্শ করে নাই বলিয়া, বিলাতে শিক্ষার শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে তাঁহার অকপট বিশ্বাস ছিল। সেই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি দুইটী পুত্রকে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা দান করিয়াছেন। আর একটী পুত্রকেও বিলাতে শিক্ষা দিয়াছেন এবং একটী জামাতার বিলাতে ডাক্তারী শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন। বিলাত হইতে আসিয়া প্রথম কয়েক বৎসর তাঁহার উচ্চ বেতন ও চিকিৎসা-ব্যবসায় হইতে তিনি যাহা উপার্জ্জন করিতেন, সমস্তই আত্মীয়স্বজন-প্রতিপালনে ও কর্ত্তব্যসম্পাদনে এবং বদান্যতায় ব্যয় হইয়া যাইত। যদিও তৎকালে তাঁহার মাসিক আয় সহস্র মুদ্রার ন্যূন ছিল না, তত্রাচ এক সহস্র মুদ্রা মাত্র সংস্থান করিতে, শুনিয়াছি, তাঁহার দশ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল। আয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পরহিতসাধনায় আকাঙ্ক্ষাও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। দেশের ও সমাজের মঙ্গলের জন্য অনুষ্ঠিত বহু সৎকর্ম্মে তিনি

যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছেন। কিন্তু তিনি কখনও নামের জন্য দান করেন নাই। কর্ত্তব্যমাত্র পালন করিতেছেন, এই ভাবেই তিনি দান করিয়া আসিয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি রাজকর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া পিতা স্বাস্থ্য ভাল থাকিবার আশায় বীরভূম যাইয়া বাস করেন। তিনি সপরিবারে বসবাস করিবার জন্য সিউড়ি সহরের প্রান্তসীমায়, উন্মুক্ত ক্ষেত্রের মধ্যে, একটি সুপরিসর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন। সেই বাটির চতুর্দ্দিকের ভূমিতে নানা জাতীয় উৎকৃষ্ট ফল পুষ্পাদির তরুলতা রোপণ ও পুষ্করিণী খনন করিয়া সেই বাটীকে একটী নয়নাভিরাম উদ্যান-বাটিকায় পরিণত করেন। সেই বাসভবনের পশ্চাতে বিস্তীর্ণ ধান্যক্ষেত্র, অনতি দূরে একটি উচ্চ পাড়ে বেষ্টিত প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা, ও একটি বিসর্পিত তটিনী প্রবাহমানা এবং দূরে দিগন্তসীমায় শালতরু-সমাচ্ছন্ন সাঁওতাল পরগণার শৈলশ্রেণীর সুগম্ভীর দৃশ্য। সেই রমণীয় হিল ভিউ (Hill-view) বাসভবনে তিনি ন্যূনাধিক আট বৎসর কাল সপরিবারে সুখ শান্তিতে বাস করেন। তৎকালে উদ্যানপরিচর্য্যা, ধর্ম্মালোচনা, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাতেই তাঁহার অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত। এক দিকে তাঁহার দৈনিক জীবনের প্রত্যেক কার্য্য যেরূপ সুনিয়ন্ত্রিত ছিল, অপর দিকে তাঁহার সহধর্ম্মিণীর আদর্শ গৃহিণীপনায় সেই সুপরিচ্ছন্ন বাসভবনের সর্ব্বত্রই সুশৃঙ্খলা ও পারিপাট্য দর্শকমাত্রেরই প্রশংসমান দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। পিতার জীবনের সেই পারিবারিক সুখ কিন্তু ৮ বৎসরের মধ্যেই অন্তর্হিত হইল। তিনি ও তাঁহার পত্নী উভয়েই হৃদ্‌রোগে পীড়িত হইলেন, এবং তাঁহাদের বিংশ বর্ষ বয়স্ক স্বাস্থ্যবান কনিষ্ঠ পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ টাইফয়েড জ্বরে ইহলোক ত্যাগ করিলেন। সত্যেন্দ্রনাথের অধ্যাপনাই তৎকালে পিতার জীবনের একটি প্রধান ও প্রিয় কার্য্য ছিল। নয়নপুত্তলি সত্যেন্দ্রনাথের বিহনে সেই শত সুখ-স্মৃতিবিজড়িত সুরম্য উদ্যান-বাটিকা তাঁহার সহধর্ম্মিণীর চক্ষে বিষময় বোধ হইতে লাগিল। শোকার্ত্তা পত্নীর মনস্তুষ্টির জন্য পিতাকে সেই সাধের বাসভবন চিরতরে ত্যাগ করিতে হইল। তিনি চন্দননগরে আসিয়া গঙ্গাতীরে সস্ত্রীক বাস করিতে লাগিলেন। দুর্ভাগ্য কিন্তু তাঁহার সঙ্গের সাথী হইয়াছিল। চন্দননগরে আসিবার কয়েক মাস পরেই, ইং ১৯১০ সালের ৮ই অক্টোবর, আমার জননী অকস্মাৎ সতী স্ত্রীর পুণ্য-লোকে গমন করিয়া পুত্রশোকের যাতনা হইতে শান্তি লাভ করিলেন। বৃদ্ধ বয়সে প্রিয়তমাপত্নী বিয়োগের দারুণ শোকাঘাত প্রশমিত হইতে না হইতেই, পিতা তাঁহার জ্যেষ্ঠ জামাতা জ্ঞানেন্দ্রনাথের মৃত্যু সংবাদ পাইলেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথকেই তিনি বিলাতে ডাক্তারী শিক্ষাদান করিয়াছিলেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথ মৃত্যুকালে উড়িষ্যায় কিওঞ্জর রাজ্যের প্রধান চিকিৎসকের পদে কর্ম্ম করিতেছিলেন। তাহার পর, পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র ললিতমোহনও যৌবনান্ত হইতে না হইতেই তাঁহার বিধবা পত্নী ও পুত্র কন্যাদিগকে রাখিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হন, ও কয়েক বৎসর পরেই পিতার তৃতীয়া কন্যা (জ্ঞানেন্দ্রনাথের বিধবা পত্নী) চারুবালাও তাঁহার পুত্র কন্যাগণকে রাখিয়া ইহলোক হইতে বিদায় লয়েন। পিতার প্রথমা কন্যার অতি শিশুকালে মৃত্যু হয়। তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যা শৈলবালার বালিকা বয়সে লোকান্তর ঘটে। উপর্য্যুপরি এত গুলি প্রিয়জনবিয়োগজনিত শোক তাপেও কিন্তু পিতার মনে ভগবানের সর্ব্বমঙ্গলময়তা ও অপার করুণার উপর বিশ্বাস বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় নাই। পরমপিতার প্রদত্ত নিদারুণ শোকের গুরু ভার তিনি নীরবে ও নত মস্তকে বহন করিয়া আসিয়াছিলেন। শেষ জীবনে তিনি চুঁচুড়ায় একখানি সুপরিসর উদ্যানসমন্বিত স্বনির্ম্মিত বাটিকায় অধিকাংশ কাল যাপন করিতেন। নিকটেই তাঁহার অগ্রজ শ্রীযুক্ত বামাচরণ বসু মহাশয়ও একখানি বাটি নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছিলেন। উভয় ভ্রাতা কার্য্যব্যপদেশে কৈশোরে নিকটস্থ চন্দন নগরের বাসভবন ত্যাগ করিয়া, বহুকাল দূর দূরান্তরে বিচ্ছিন্ন ভাবে কালাতিপাত করিয়াছিলেন। সংসারচক্রের আবর্ত্তনে উভয়েই নিজ নিজ শোকভার লইয়া, জীবন-সায়াহ্নে পুনরায় যেন সান্ত্বনার আশায় জননীস্বরূপিনী জন্মভূমির ক্রোড়ে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

চুঁচুড়ার বাটী নির্ম্মাণ করিবার পরে, পিতাকে তাঁহার মাতৃ-পিতৃহীন দৌহিত্র দৌহিত্রী ও পিতৃহীন পৌত্র পৌত্রীদিগের শিক্ষা, বিবাহ ও তত্ত্বাবধানের জন্য কয়েক বৎসর ভবানীপুরে বসবাস করিতে হয়। সে সময়েও মধ্যে মধ্যে তিনি চুঁচুড়ার বাটিতে গিয়া নিভৃতবাসে ব্রহ্মচিন্তায় দিন যাপন করিতেন। কখন কখনও স্বাস্থ্যের জন্য তাহার দ্বিতীয় বা তৃতীয় পুত্রের নিকটে রাঁচিতে অথবা সাহোরে গিয়া কিছু দিন থাকিয়া আসিতেন।

(ক্রমশঃ)

ব্রাহ্মসমাজ

মেদিনীপুর বন্যাপীড়িতদের সেবা—

কালীঘাই ও কাঁসাই নদীর জলপ্লাবনে মেদিনীপুর জেলার নানা স্থানের লোকেদের ভীষণ ক্লেশের সংবাদ পাইয়াই, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সভা যে বন্যাক্লিষ্টদিগকে সাহায্য প্রদান করিবার আয়োজন করেন, সে কথা আমরা যথাসময়ে প্রকাশ করিয়াছি। এই কার্য্য পরিচালনের জন্য প্রথমে শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস সম্পাদক ও শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার রায় সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। ললিত বাবু উৎসাহের সহিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে নানা স্থানে তিন শতাধিক পত্র লেখেন। প্রকাশ্য পত্রেও আবেদন প্রকাশ করা হয়। অল্প দিন পরেই চক্ষুপীড়া ও পারিবারিক দুর্ঘটনার জন্য তিনি সম্পাদকের পদ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তখন শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য সম্পাদক নিযুক্ত হন। সিটি কলেজও এই সাধু কার্য্যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সহায়তা করিতে অগ্রসর হন। প্রাণকৃষ্ণ বাবু ও কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয় ছাত্র ও অধ্যাপকদিগের এক সভা আহ্বান করেন। সকলেই উৎসাহের সহিত এই কার্য্যে যোগ দেন। বহু ছাত্র স্বেচ্ছা-সেবকরূপে বন্যাপীড়িত স্থানে সেবা করিতে গমন করেন। অধ্যাপক ও ছাত্রদের অনেকে দলবদ্ধ হইয়া নগরের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হন। তাঁহাদের নিজেদের মধ্য হইতেও যথাসম্ভব দান সংগৃহীত হয়। ছাত্র সমাজের সভ্যগণও দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া, রাস্তায় কীর্ত্তন করিয়া, অর্থ সংগ্রহ করেন। তাহাদের অনেকে স্বেচ্ছাসেবকরূপেও কার্য্যক্ষেত্রে গমন করেন। কলিকাতা হইতে যে সকল ব্রাহ্ম কর্ম্মীদিগকে পাঠান হইয়াছিল, তাহা ব্যতীত কাঁথি ব্রাহ্মসমাজের কেহ কেহ কার্য্যক্ষেত্রে গমন করেন। এ সকল সংবাদ ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। সিটি কলেজের ছাত্রগণ নিজেদের মধ্য হইতে ১৩৪ টাকা প্রদান করিয়াছেন এবং প্রায় ২৩০৲ টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। অধ্যাপকগণ প্রায় ৪০৲ টাকা দিয়াছেন। ছাত্রসমাজ ৭০০৲ টাকার অধিক সংগ্রহ করিয়াছেন। আবেদনের উত্তরে যথাযোগ্য দান পাওয়া গিয়াছে। মঙ্গলময়ের কৃপায় ও সকলের দয়ায় এই কার্য্যে টাকার অভাব হয় নাই। হিন্দুস্থান ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী ১০০ মণ চাউল প্রদান করিয়াছেন। জনৈক বন্ধু শ্রীযুক্ত হিমাংশুমোহন বসুর হস্তে ৮০০৲ টাকা প্রদান করিয়াছেন। স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় যে টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা হইতে আমাদের হস্তে ১০০০৲ এক সহস্র টাকা, ২৫০ পুরাতন বস্ত্র ও ৪০ যোড়া নূতন কাপড় প্রদান করিয়াছেন। আমরা এ পর্য্যন্ত ৮০০/০ আট শত মণ চাউল ও ৫০০ শত পুরাতন বস্ত্র বিতরণ করিয়াছি। বিভিন্ন দলে পালা ক্রমে প্রায় ৪০ জন স্বেচ্ছাসেবক এই কার্য্যে আমাদের সাহায্য করিয়াছেন। তাহা ব্যতীত চন্দননগর প্রবর্ত্তক-সংঘের সভ্যগণ আমাদের কার্য্যে সহযোগিতা

করিয়াছেন। স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকও অনেকে যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। আমাদের কর্ম্মিগণ ২৯শে আগষ্ট কার্য্যস্থানে উপস্থিত হন। গবর্ণমেণ্ট আমাদের হস্তে ২৫টি গ্রামের ভার অর্পণ করেন। এরিঞ্চি আমাদের কার্য্যক্ষেত্রের কেন্দ্ররূপে নির্দ্দিষ্ট হয়। জুথিয়া ও দেবীচকে দুইটি উপকেন্দ্র স্থাপিত হয়। প্রতি সপ্তাহে প্রায় ৪০০০ চারি হাজার লোক সাহায্য প্রাপ্ত হয়। বয়স্কদিগকে ২॥০ সের ও বালক-বালিকাদিগকে ১॥০ সের করিয়া চাউল প্রদান করা হয়। আমাদের সাপ্তাহিক ব্যয় প্রায় ১০০০৲ এক হাজার টাকা। রুগ্ন ব্যক্তিদিগকে ঔষধ এবং ঘনীভূত দুগ্ধ প্রদান করা হয়। এই মাসের শেষে সাহায্যপ্রদান কার্য্য বন্ধ করা যাইবে। কিন্তু গৃহাদি নির্ম্মাণে সাহায্য করিবারও বিশেষ প্রয়োজন আছে; তাহার অভাবে শীতকালে লোকের বিশেষ কষ্ট হইবে। এই কার্য্যের জন্য অন্যূন ১,০০০৲ দশ হাজার টাকা আবশ্যক হইবে। আমরা উক্ত ভার বহন করিতে পারিব কি না জানি না। উপযুক্ত অর্থ সংগৃহীত না হইলে এই ভার গ্রহণ করা যায় না।

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ১৮ই অক্টোবর মধুপুর নগরীতে শ্রীমান প্রিয়ব্রত ঘোষের পত্নী সুহাসিনী ঘোষ (শ্রীযুক্ত হরিদাস বসাকের দ্বিতীয়া কন্যা) দুইটি শিশু সন্তানকে অসহায় অবস্থায় রাখিয়া, ২৬ বৎসর বয়সে, পরলোক গমন করিয়াছেন। বিগত ২৪শে অক্টোবর মধুপুরে তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য আচার্য্যের কার্য্য, শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র সোম শাস্ত্রপাঠ এবং শ্রীমান ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ জীবনী পাঠ করেন। ২৬শে তারিখে কলিকাতা নগরীতে পিতৃগৃহেও শ্রাদ্ধানুষ্ঠান হয়। তাহাতে শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য আচার্য্যের কার্য্য ও পিতা প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে হরিদাস বাবু ও তাঁহার অপর দুই কন্যা, শ্রীমতী সরোজিনী বসাক ও শ্রীমতী কনকনলিনী নন্দন, প্রত্যেকে দুঃস্থ ব্রাহ্ম পরিবার ভাণ্ডারে ২৲ টাকা করিয়া ৬৲ টাকা দান করিয়াছেন।

বিগত ১৯শে অক্টোবর দেওঘর নগরীতে পরলোকগত বাবু ভুবনমোহন সেনের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় আচার্য্যের কার্য্য, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র শাস্ত্রব্যাখ্যা ও দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত ইন্দ্রভূষণ সেন জীবনী পাঠ করেন।

বিগত ২০শে অক্টোবর পাটনা নগরীতে পরলোকগত বাবু অমরচন্দ্র দত্তের দ্বিতীয় পুত্র সুপ্রভাত টাইফয়েড রোগে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।

বিগত ২২শে অক্টোবর ধুলিয়ান গ্রামে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মল্লিকের মাতা পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

বিগত ২৬ অক্টোবর রাঁচি নগরীতে শ্রীযুক্ত ননীভূষণ গুপ্তের মাতা পরলোক গমন করিয়াছেন।

বিগত ২৭শে অক্টোবর পাটনা নগরীতে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুপ্রকাশ ১৪ বৎসর ২ মাস বয়সে টাইফয়েড রোগে পরম জননীর কোলে আশ্রয় লইয়াছেন।

বিগত ৩১শে অক্টোবর ধুবড়ী নগরীতে পরলোকগত বাবু যাদবচন্দ্র পালের আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র নাগ আচার্য্যের কার্য্য ও জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান সত্যজীবন জীবনী পাঠ ও প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ২৲ টাকা ও ধুবড়ী ব্রাহ্মসমাজে ২৲ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চির শান্তিতে রাখুন ও আত্মীয় স্বজনদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

সান্ত্বনা প্রদান—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের জ্যেষ্ঠ পুত্রের পরলোকগমনের সংবাদ পাইয়াই শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী পাটনা যাইয়া শোকার্ত্ত পরিবারের সঙ্গে কয়েক দিন উপাসনা প্রার্থনাদি করাতে, তাঁহারা বিশেষ উপকৃত ও সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

কার্য্যনির্ব্বাহক সভা—শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর রায় সম্পাদক নিযুক্ত হওয়াতে, অধ্যক্ষ সভার তৃতীয় ত্রৈমাসিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেন তাঁহার স্থলে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন।

শুভ বিবাহ—বিগত ১৮ই অক্টোবর কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেনের কনিষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া কিরণবালা ও পরলোকগত হারাণচন্দ্র সিংহ রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান সুধাংশুভূষণের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন।

বিগত ২১ সে অক্টোবর কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহের কন্যা কল্যাণীয়া স্বর্ণকুমারী ও পরলোকগত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরীর পুত্র শ্রীমান প্রদোষচন্দ্রের শুভ পরিণয় সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ৮ই অক্টোবর পাটনা নগরীতে পরলোকগত স্যার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্তের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান শৈলেন্দ্রনাথ ও শ্রীযুক্ত হরিদাস চাটার্জ্জির কন্যা নিত্যলীলার শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন নিয়োগী আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ২৫ সে অক্টোবর কলিকাতা নগরীতে মিঃ এস্ কে ঘোষের তৃতীয়া কন্যা কল্যাণীয়া নীলিমা ও পরলোকগত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরীর পুত্র শ্রীমান প্রমোদচন্দ্রের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন।

প্রেমময় পিতা নব দম্পতিদিগকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুণ।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় দ্বারা ৩০শে কার্ত্তিক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—বরদাকান্ত বসু, বি-এ

Registered NO 65

অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৬ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৪৯ম ভাগ। ১৫শ সংখ্যা।

১লা অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৩৩৩, ১৮৪৮ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯৭
17th November, 1926.

প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০
অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

হে প্রেমময় বিশ্ববিধাতা, তুমি তোমার সকল বিশ্ব সংসারকে একই প্রেমসূত্রে গ্রথিত করিয়াছ, অমাদের প্রত্যেকের উন্নতি ও কল্যাণ অপর সকলের সেবা ও মঙ্গলসাধনচেষ্টার সঙ্গে অনস্যুত করিয়া দিয়াছ। আমরা অনেক সময় মনে করি, অপরকে পরিত্যাগ করিয়া, অপরের মঙ্গলামঙ্গলের দিকে না চাহিয়া, এমন কি কোন কোনও বিষয়ে অন্যের স্বার্থকে কিছু খর্ব্ব করিয়াও, সর্ব্বাগ্রে আমাদের নিজের স্বার্থসাধনের দিকে দৃষ্টি না রাখিলে, তাহার জন্য সচেষ্ট না হইলে, আমাদিগকে এই সংগ্রামময় সংসারক্ষেত্রে পরাজিত ও ক্ষতিগ্রস্তই হইতে হয়, আমাদের পক্ষে উন্নতি লাভ করা বা বাঁচিয়া থাকা সম্ভবপর হয় না। তুমি যে বিশ্বসংসারকে পরস্পরবিরোধী স্বার্থের সংগ্রামক্ষেত্র করিয়া গড় নাই, আমাদের উন্নতি লাভ ও কল্যাণের জন্য অপর কাহারও বিন্দু পরিমাণ ক্ষতি করিবার ব্যবস্থা কর নাই, বরং অপরের উন্নতি ও কল্যাণসাধনেই আমাদেরও মঙ্গল এবং জীবনের সার্থকতা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছ, তাহা আমরা অনেক সময়ই ভাবিয়া দেখি না। আপনার ক্ষুদ্র স্বার্থের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া আমরা যতই অপরের জন্য ভাবিতে শিখি, ততই যে আমাদের প্রেম বিকশিত হয়, আমরা মহত্ত্বে মণ্ডিত হইয়া উঠি, তাহা অনেক সময় ভুলিয়া যাই। তাই আমরা আমাদের ক্ষুদ্র স্বার্থ লইয়া বিব্রত থাকিয়া, আপনাদিগকে ছোট ও নীচ করিয়া ফেলি—উন্নতি ও কল্যাণ হইতে বঞ্চিত হই, মনুষ্য নামেরই অযোগ্য হইয়া পড়ি। হে প্রেমময় পিতা, তোমার প্রেম হইতে চ্যুত হইয়াই আমরা মহা ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছি এবং সংসারকে বিষময় করিয়া তুলিতেছি। তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে শুভ বুদ্ধি প্রদান কর, আমাদের হৃদয়কে তোমার প্রেমে পূর্ণ কর। আমরা যেন আর শুধু আপনাকে লইয়া ব্যস্ত না থাকি, সকলের জন্য ভাবিতে শিখি, অপরের জন্য আপনার ক্ষুদ্র স্বার্থকে ছাড়িতে সমর্থ হই। আমাদের মধ্যে তোমার প্রেমের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হউক। সকল জীবনে তোমার প্রেমেরই জয় হউক। আমরা তোমার প্রেমের পথে চলিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হই। তোমার ইচ্ছাই আমাদের প্রতি জীবনে জয়যুক্ত হউক। তোমার মঙ্গল ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

নিবেদন।

পতনের পথ—পতনের পথ বড় পিচ্ছিল; একবার পা পিছ্‌লে কোথায় যেয়ে যে পড়্‌বে, কে জানে? পাপ যখন নিজ বেশে আসে, তখন সাবধান হওয়া সহজ; কিন্তু সে যখন মোহন রূপে আসে, কল্যাণের বেশ ধ'রে আসে, তখন ভুলিয়ে মৃত্যুর পথে নিয়ে যায়। তুমি বেশ আদর্শ ধ'রে চল্‌ছিলে, তোমার লক্ষ্য মহৎ, তোমার পথ পুণ্যময়; লোকে কত নিন্দা কর্‌ত, ঠাট্টা কর্‌ত, অপমান কর্‌ত, তুমি অকুতোভয়ে ঈশ্বরের আলো দেখে চ'লে যেতে। হঠাৎ কি হলো! নিন্দার স্থানে প্রশংসা এল, লোক এসে তোমার কাজের, তোমার চরিত্রের, তোমার মহত্ত্বের, তোমার ত্যাগের, প্রশংসা কর্‌তে লাগ্‌লো; তোমার মনে আস্তে আস্তে বিষ প্রবেশ কর্‌লো—তোমাকে এ কাজে যেতে হবে, ও কল্যাণ কাজের জন্য ঐ স্থানে উপস্থিত থাক্‌তে হবে, এত বড় তোমার কাজ, তোমার প্রাণ ত সঙ্কীর্ণ হ'লে চল্‌বে না—স্তোকবাক্যে তোমার মন ভুলিয়ে দিল, তোমাকে পিচ্ছিল পথে নিয়ে এল, তোমার পতন আরম্ভ হলো। এখন কোথায় যেয়ে পড়্‌বে, কে জানে? সাবধান নিন্দা ভাল, অপমান ভাল; প্রশংসাতেই ত ভয়। বিভীষণের বেশে যখন মহীরাবণ আসে, তখন ত হনুমান পথ ছেড়ে দেয়।

পুণ্য কার্য্যের সহায় হবে ব'লে, যখন লোক এসে কাণে প্রশংসা-ধ্বনি করতে থাকে, তখন বিপদ যে আসন্ন হয়। ড্যালিলার মোহিনী শক্তি স্যামসন্‌কেও মরণের পথে নিয়ে গেল। সাবধান মোহে প'ড়ে, প্রশংসায় ভু'লে, পতনের পথে যেও না।

মিলনের ভূমি—আমাদের মিলনের ভূমি কোথায়? ভিন্ন ভিন্ন মত, ভিন্ন ভিন্ন পথ, ভিন্ন ভিন্ন কাজ, ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি। আমি এ দিকে চলি, তুমি ওদিকে যাও; আমার এ কাজ, তোমার কাজ! আমরা কেমন ক'রে মিল্‌ব? কোন্ সূত্রে আমরা একত্রে বাঁধা পড়্‌ব? তবে কি মিলন হবে না? তবে কি একই ব্রহ্মের সন্তান আমরা, চিরদিনই পরস্পরকে দূরে রাখ্‌ব? মিলনের পথ কোথায়, সূত্র কোথায়, ভিত্তিভূমি কোথায়? ব্রহ্মে বিশ্বাস ও তাঁর উপাসনাই আমাদের মিলনের সূত্র। এই উপাসনাতে, বিশুদ্ধ সাক্ষাৎ ও আধ্যাত্মিক উপাসনাতে, আমরা মিলিত হব; উহাই আমাদের ঐক্যস্থল। ব্রহ্মসন্তানগণ, তোমরা যে ব্রহ্মসন্তান তা ভু'লো না; তোমরা যে ব্রহ্মধামের যাত্রী তা ভু'লো না; তোমরা যে দেবত্ব ল'য়ে জন্মেছ তা ভু'লো না। ব্রহ্মে স্থিত হও; ব্রহ্মোপাসনাকে জীবনের সম্বল কর। তবেই দেখ্‌বে, সব মলিনতা, সব অপ্রেম, সব বিদ্বেষ চ'লে যাবে। সব আমিত্ব অহঙ্কার চূর্ণ হবে; সব দূরত্ব ঘু'চে যাবে; তোমরা সব এক হবে। ঐ ব্রহ্মের চরণেই মিলনের ভূমি, প্রভুর বন্দনাই মিলনের মন্ত্র, ব্রহ্মনামই মিলনের সূত্র।

কর্ত্তব্যজ্ঞান—কোনও কাজই ক্ষুদ্র নয়; যে কাজ হাতে নিবে, সেটিই মন প্রাণ দিয়ে সাধন কর্‌বে। জীবন মহৎ, জীবন প্রকৃত; কিন্তু জীবন গ'ড়ে উঠে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ত্তব্যের সমষ্টিতে। একটি কর্ত্তব্য অবহেলা কর্‌লে, জীবনের সূত্র ছিন্ন হ'য়ে যায়। যে কথাটি বল্‌বে, তাহাই কর্‌বে; যে কাজটি হাতে নিবে, তাহাই সম্পন্ন কর্‌বে। সূর্য্য রোজ উঠে, রোজ অস্ত যায়; বায়ু প্রবাহিত হয়, মেঘ বারি বর্ষণ করে; বৃক্ষসকল যথাকালে পত্র পুষ্প ফলে সুশোভিত হয়, যে যার কাজ ক'রে যাচ্ছে। তুমি মানুষ, তুমি কি তোমার কাজ কর্‌বে না? ঐ দেখো, ভোরে উঠে ঝাড়ুদার ঝাঁট দিয়ে যাচ্ছে, মেথর ময়লা পরিষ্কার কচ্ছে—যে যার কাজ ক'রে যাচ্ছে। তুমি তোমার কাজ কর্‌বে না! ভগবান তোমাকে বুদ্ধি দিয়েছেন, কর্ত্তব্যজ্ঞান দিয়েছেন, বিবেক ও ধর্ম্মবুদ্ধি দিয়েছেন। সত্যে প্রতিষ্ঠিত হও; সত্য সাধন কর; আপনার কর্ত্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে সাধন ক'রে যাও। কর্ত্তব্য অবহেলা কর্‌লে জীবন বিনষ্ট হবে, ভগবানের নিকট অপরাধ হবে। প্রাণ যদি যায়ও, তবুও সত্য রক্ষা কর্‌বে, কর্ত্তব্য পালন কর্‌বে।

সম্পাদকীয়

স্বার্থ ও পরার্থ—সাংসারিক জ্ঞানে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মুখে সর্ব্বদাই স্বার্থের ও পরার্থের দ্বন্দ্বের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা বলেন,—স্বার্থ ও পরার্থ পরস্পরবিরোধী, আপনার স্বার্থ রক্ষা করিতে হইলে পরার্থের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে চলিবে না, পরার্থ দেখিতে গেলে আপনার স্বার্থ পূর্ণ মাত্রায় কিছুতেই রক্ষিত হইবে না। সকল সময় পরার্থকে পদদলিত করিয়া আপনার স্বার্থ ত্যাগ করা আবশ্যক না হইতে পারে। সময়ে সময়ে অপরের বিশেষ ক্ষতি না করিয়াও আপনার স্বার্থ রক্ষা করা যাইতে পারে; কিন্তু অনেক সময় তাহারও প্রয়োজন আছে—তাহা না করিলে কিছুতেই আপনার স্বার্থ রক্ষা হয় না। আপনার স্বার্থটাই যখন সর্ব্বদা সর্ব্বাগ্রে দেখিবার বিষয়, তাহা না দেখিলে যখন আমরা কোনও প্রকার উন্নতিই লাভ করিতে পারি না, বাঁচিয়াই থাকিতে পারি না, তখন প্রয়োজন হইলে নিশ্চয়ই স্বার্থের নিকট পরার্থকে বলি দিতে হইবে। অপর দিকে আবার পরার্থসাধন করিতে গেলে যদিও অনেক সময়ই আপনার স্বার্থ নষ্ট হইয়া থাকে, তথাপি সময় সময় আপনার স্বার্থের হানি না করিয়াও পরার্থসাধন সম্ভবপর হয়। এরূপ স্থলে পরার্থসাধন ভালই—নিজের ক্ষতি না করিয়া যদি পরোপকার সাধন করা যায়, তবে তাহা আর মন্দ কি? বরং যাহাতে সহজে সুনাম অর্জ্জন করা যায়, তাহা ত বাঞ্ছনীয়ই। কিন্তু যাহারা আপনার স্বার্থ নষ্ট করিয়া পরের স্বার্থ দেখিতে যায় তাহারা নিতান্তই মূর্খ, বাতুলেরও অধম। আপনার ভাল পাগলেও বুঝে; ইহারা যখন তাহা বুঝিতে পারে না, তখন বলিতে হইবে পাগলেরও ইহা অপেক্ষা বেশী বুদ্ধি আছে। ইহারা যে আপনাদিগকে খুবই বুদ্ধিমান ও সংসার বিষয়ে অভিজ্ঞ মনে করে, তাহা আর বলিতে হইবে না। ইহাদের উপরে আবার এক শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত আছেন। তাঁহারা বলেন, এই বিশ্বসংসারটা একটা মহা সংগ্রামক্ষেত্র—এখানে ক্ষুদ্রতম কীটাণুকীট হইতে উচ্চতম মানবমণ্ডলী পর্য্যন্ত সকল প্রকার জীবকেই মহাসংগ্রাম করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হয়। তাই প্রত্যেক প্রকৃতির মধ্যে এই সংগ্রামস্পৃহা নিহিত রহিয়াছে। এই সংগ্রামে অবশ্য যোগ্যতমেরই জয় হয়। কিন্তু জয় হউক কি পরাজয় হউক, প্রত্যেককে সংগ্রাম করিতেই হইবে। সুতরাং প্রত্যেককে আপনাকে লইয়াই ব্যস্ত থাকিতে হয়, একমাত্র আপনার স্বার্থই দেখিতে হয়, অপরের স্বার্থ দেখিবার আর অবসর নাই, তাহা দেখিতে গেলে আর চলে না। আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য এই নির্ম্মম সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা এবং বাঁচিয়া থাকিবার স্বাভাবিক স্পৃহা হইতে এই স্বার্থ প্রচেষ্টা অনিবার্য্য—এই স্বার্থের ও পরার্থের সংঘর্ষ প্রাকৃতিক বিধির অন্তর্গত। এই ভাবে আমরা দেখিতে পাই, উভয় শ্রেণী একই সিদ্ধান্তে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। প্রথম শ্রেণীর সিদ্ধান্ত ও উপদেশ—"আপনাকে সতত রক্ষা করিবে, ধনের দ্বারাই হউক, আর দারার দ্বারাই হউক", "আপনি বাঁচিলে বাপের নাম" অর্থাৎ

শুধু ধন দিয়া নয়, স্ত্রী, পুত্র, পরিজন প্রভৃতি যাহা কিছু সমস্তের বিনিময়েও আপনাকে বাঁচাইতে হইবে, আপনার স্বার্থের জন্য সকল প্রকার পরার্থ বিসর্জ্জন দিতে হইবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষা ও নীতি তদনুরূপই—"আত্মরক্ষাই প্রকৃতির নিয়ম", "এক সংখ্যকের অথবা প্রথম পুরুষের যত্ন লও" অর্থাৎ যে কোনও উপায়ে হউক সর্ব্বাগ্রে আপনার স্বার্থই দেখিতে হইবে, তাহার জন্য অকুণ্ঠিত চিত্তে পরার্থকে বলি দিতে হইবে। জগতের সকল লোকেই যে এই কথাই বলে, তাহা নহে। ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত কথাও আমরা যথেষ্ট শুনিতে পাই। সাধু মহাজনগণ চিরদিন পরার্থের জন্য স্বার্থকে ত্যাগ করিবার কথাই বলিয়াছেন,—আত্মবিসর্জ্জনেই জীবন প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা ব্যতীত অমর জীবন লাভ করা যায় না, সে শিক্ষাই দিয়া আসিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের কথা আলোচনা করিবার পূর্ব্বে, স্মরণে রাখিতে হইবে যে তাঁহারা অন্য প্রকার জীবনের কথাই বলিয়াছেন—তাঁহারা আমাদের এই শারীরিক জীবনের কথা বলেন নাই। ইঁহারা কিন্তু সে জীবন সম্বন্ধে কিছুই বলেন না, একেবারেই নির্ব্বাক। অনেকে আবার সে জীবনের অস্তিত্বই স্বীকার করেন না। ইঁহারা শুধু শারীরিক জীবনের কথাই বলেন—তদতিরিক্ত কিছু ইঁহারা জানেনই না। সুতরাং ইঁহাদের কথা সত্য কি না, তাহার বিচার করিতে যাইয়া ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষদের উক্তির উপর নির্ভর করিতে গেলে, ইঁহাদের উক্তি সম্বন্ধে প্রকৃত সত্য নির্ণয় করা সম্ভবপর হইবে না, দুইটা পৃথক বিষয়কে এক করিয়া ভ্রান্তি উৎপাদন করা হইবে কাজেই তাঁহাদের সাক্ষ্য এখন আলোচনার বাহিরে রাখিয়াই, ইঁহাদের কথা একটু বিচার করিয়া দেখা উচিত হইবে অর্থাৎ আমাদের দৈহিক ও সাংসারিক জীবন সম্বন্ধেই ইঁহাদের কথা কতটা সত্য একটু পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই সঙ্গত হইবে, আমরা প্রকৃত মীমাংসায় উপনীত হইতে পারিব। মানবমণ্ডলীর অভিজ্ঞতাই হউক, আর বৈজ্ঞানিকগণের গবেষণাই হউক, ইহার কোনও সাক্ষ্যই যে উপেক্ষণীয় নহে, সত্যনির্ণয়ের জন্য আমাদিগকে তাহাদের উপরই যে প্রধান ভাবে নির্ভর করিতে হইবে, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। সুতরাং প্রথমে এই উভয় প্রকার সাক্ষ্যই একটু বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিরা দেখিতে হইবে—বিনা বিচারে গ্রহণ করা কখনও সঙ্গত হইবে না।

অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে যাইয়া আমরা দেখিতে পাই, দেহরক্ষার জন্যই হউক, আর, সাংসারিক সুখ সুবিধা পদ মান প্রতিষ্ঠার জন্যই হউক—প্রকৃত সুখ শান্তি কল্যাণ সুনাম প্রভৃতির কথা গণনার মধ্যে না আনিয়াই—পরার্থের দিকে কিছুমাত্র দৃষ্টি না রাখিয়া শুধু স্বার্থের জন্য চেষ্টা করিলে, কখনও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। অন্যনিরপেক্ষ হইয়া শুধু আপনার শক্তিতে ও চেষ্টায় ইহার কিছুই লব্ধ হয় না—প্রত্যেক বিষয়েই অপরাপরের সাহায্যগ্রহণ অপরিহার্য্যরূপে আবশ্যক। অপরের সাহায্য পাইতে হইলেই, তাহাদেরও জন্য কিছু করিতে হইবে—পাইতে হইলেই কিছু দিতেও হইবে। তাহা না হইলে অপরে সাহায্য করিতে আসিবে কেন? দিতে হইলেই আপনার কিছু ছাড়িতে হইবে। সুতরাং স্বার্থের জন্যই স্বার্থত্যাগ ও পরার্থপরতা একান্ত অপরিহার্য্য—তাহা যত অল্প পরিমাণেই হউক না কেন। অন্তত কোনও কোনও বিষয়ে যে স্বার্থে ও পরার্থে কিছুমাত্র বিরোধ নাই, বরং পরস্পরের সহায়রূপে একই সূত্রে গ্রথিত—শুধু তাহাই নয়, এক ও অভিন্ন—তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। বাস্তবিক মানবমণ্ডলীর চিরন্তন অভিজ্ঞতা এই সাক্ষ্যই দিতেছে যে, পরার্থ নষ্ট করিয়া প্রকৃত স্বার্থ কোথাও কোনও বিষয়ে রক্ষিত হয় না,—প্রত্যেকে যদি পরার্থের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া শুধু স্বার্থের জন্য চেষ্টিত হয়, তবে শুধু যে পরার্থই বিনষ্ট হয় তাহা নহে, নিজের স্বার্থও সমূলে নষ্ট হয়। অন্যের মুখের গ্রাস কাড়িয়া আহার সংগ্রহের চেষ্টা করিতে গেলে পরিণামে নিজেরই আহার হইতে বঞ্চিত হইতে হয়, আর নিজের মুখের গ্রাস অপরের মুখে তুলিয়া ধরিলে কখনও অভাবে পড়িবে না—পরস্বাপহারীর অভাব কোনও দিন ঘোচে না, দাতাকে কখনও অভাব ভোগ করিতে হয় না। একটু অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, সকল বিষয় একটু বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে আরম্ভ করিলে, দেখিতে পাওয়া যাইবে আমরা আপাত দৃষ্টিতে স্বার্থ ও পরার্থের মিলন ক্ষেত্রকে যত সঙ্কীর্ণ মনে করি, বাস্তবিক উহা তত ক্ষুদ্র নহে; বরং যতই অগ্রসর হওয়া যায়, ততই উহা প্রশস্ততর ও বিস্তীর্ণতর প্রমাণিত হয় এবং প্রকৃত সূক্ষ্ম ও ব্যাপক দৃষ্টি, যথার্থ স্বার্থ ও কল্যাণ সম্বন্ধে ভ্রমবিবর্জ্জিত সুস্পষ্ট ধারণা থাকিলে, স্বার্থ ও পরার্থ নিঃসন্দিগ্ধরূপে এক ও অভিন্ন বলিয়া মীমাংসিত হইয়া যায়—কোথাও কোন বিরোধই নাই, স্বার্থ ও পরার্থের মধ্যে কোনও সীমারেখাই নাই, কোনও প্রভেদ নাই। মানুষ প্রকৃত স্বার্থ না বুঝিয়া, ভ্রান্ত স্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়াই পরার্থ নষ্ট করিয়া স্বার্থসাধন করিতে যাইয়া, আপনার স্বার্থকেই নষ্ট করে, এবং তাহা হইতেই যত বিরোধ ও সংগ্রাম উৎপন্ন হয়। পরার্থের দিকে যত অধিক দৃষ্টি থাকে, তাহার জন্য যত বেশী চেষ্টা যত্ন করা হয়, প্রকৃত স্বার্থও ততই প্রচুর পরিমাণে সুরক্ষিত হয়। পূর্ণ পরার্থসাধনেই পূর্ণ স্বার্থ অব্যাহত থাকে। ইহাই সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন মানবের অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য। অন্ধ চিন্তাবিহীন মানুষই অন্যরূপ দেখে ও বলে। অজ্ঞ বিচারহীন লোকের সাক্ষ্য নিশ্চয়ই কখনও কোনও বিষয়ে গ্রাহ্য হইতে পারে না।

বৈজ্ঞানিক গবেষণার সাহায্যে প্রাকৃতিক নিয়মনির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হইলে দেখিতে পাই, বহুসংখ্যক বৈজ্ঞানিকের সূক্ষ্মানুসন্ধানে অনেক বিষয়েই দিন দিন পূর্ব্ব ধারণা পরিবর্ত্তিত হইতেছে, বিবিধপ্রকারেই ভ্রান্তি বিদূরিত হইতেছে। এই সম্বন্ধে যে একদেশদর্শী অপূর্ণ জ্ঞান ছিল, সূক্ষ্মতর গবেষণা তাহাকে পূর্ণতর করিয়াছে। পূর্ব্বে জীবজগতে তাঁহারা যে আত্মরক্ষার জন্য শুধু সংগ্রামই দেখিয়াছিলেন, পরপীড়নই দর্শন করিয়াছিলেন, সেখানে তাঁহারা এখন পরের জন্য আত্মত্যাগও সমভাবে কার্য্য করিতেছে দেখিতে পাইতেছেন। ইহা যে শুধু উচ্চ স্তরের মধ্যেই কার্য্য করিতেছে, তাহা নহে। জীবজগতের নিম্নতম স্তর হইতে উচ্চতম পর্য্যন্ত—আদিম উদ্ভিজ্জাণু হইতে শ্রেষ্ঠতম মানুষ পর্য্যন্ত—সকলের মধ্যেই ইহা দৃষ্ট হইয়া থাকে। এখানে দেখিতে পাওয়া যায়, আত্মরক্ষার জন্যই, আপনার উন্নতি ও বিকাশের জন্যই, আত্মত্যাগও আবশ্যক। পরার্থকে সম্পূর্ণ রূপে বর্জ্জন

করিয়া কেহই স্বার্থকে রক্ষা করিতে পারে না। বলা বাহুল্য যে সে সকল স্তরে এই স্বার্থ ও পরার্থবোধ নাই—মানুষের ন্যায় জ্ঞান ও অনুভূতি নাই। আর সকলের জগতও সমান বিস্তৃত নয়। নিম্নতম স্তরের জগত সংকীর্ণতম এবং উন্নততর স্তরের সঙ্গে সঙ্গে উহা বিস্তৃততর হইয়া উন্নততম মানবের পক্ষে উহা বিস্তৃতম এই সুবিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দাঁড়াইয়াছে। সর্ব্বত্রই জগতের প্রথম বিন্দু পরিবার। কিন্তু এই পরিবার সর্ব্বত্র এক নহে। প্রথমে বা নিম্নতম স্তরে পরিবার আপনি ও আত্মজ সন্তান লইয়া, তাহার মধ্যে স্ত্রীরও স্থান নাই। তৎপরে স্ত্রী পুত্র কন্যা, ভ্রাতা ভগিনী, আত্মীয় স্বজন, জ্ঞাতি কুটুম্ব, মণ্ডলী সমাজ জাতি, সমস্তই পরিবারের অন্তর্গত হইয়া পড়ে। এমন কি, প্রকৃত দৃষ্টিতে চাহিলে দেখিতে পাওয়া যায়, মানবের পক্ষে পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ, বৃক্ষ লতা, চেতন অচেতন, যাহা কিছু সমস্তই উহার অন্তর্গত। কেননা, একদিকে যেমন উহাদের সকলেরই একটা প্রয়োজন আছে, কাহাকেই না হইলে চলে না, তেমনি অপরদিকে উহাদের সকলের জন্যই কিছু করিতে হয়, কিছু ছাড়িতে হয়, তাহা না করিলে জীবন রক্ষিত ও বর্দ্ধিত হয় না। আরও সুক্ষ্ম দৃষ্টির দ্বারা দেখা যায়, এই সম্বন্ধ যে শুধু পার্থিব পদার্থের সঙ্গেই সীমাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে তাহা নহে। তাপগ্রহণ ও বিকীরণ, নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে বায়ু গ্রহণ ও বর্জ্জন দ্বারা আমরা আরও বিস্তৃততর জগতের সঙ্গে, গগনস্থিত দূরতম পদার্থ নিচয়ের সঙ্গেও, যুক্ত; সেখানে আদান প্রদান উভয়ই আবশ্যক— শুধু গ্রহণ করিলেই চলে না, জীবন রক্ষিত হয় না। আপনার স্বার্থের জন্যই অপরের জন্যও কিছু করিতে হয়, পরার্থসাধন করিতে হয়। এ সমস্তের অধিকাংশই আমরা জানিয়া বুঝিয়া ইচ্ছা করিয়া করি না,—প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে বাধ্য হইয়াই করিতে হয়। কোনও কোনও কাজ অবশ্য আমাদের জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছা করিয়াও করি।

এই পর্য্যন্ত যাহা কিছু আলোচিত হইল, সমস্তই শারীরিক জীবন লইয়া। কিন্তু মানুষ শুধু শরীর নয়—তাহার মন এবং আত্মাও আছে। তাহার মানসিক জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও সেই একই সত্যে উপনীত হই। আমাদের জ্ঞানের উন্নতি ও বিকাশের জন্য অপর সকলের সাহায্য কত প্রয়োজনীয়, তাহা সহজেই দেখিতে পাওয়া যায়। কিছু প্রদান না করিয়া শুধু গ্রহণ করিলেই, অপরের নিকট হইতে যত অধিক সম্ভব জ্ঞান সংগ্রহ করিয়া আপনার মধ্যে লুক্কায়িত রাখিলেই, জ্ঞানের উন্নতি ও বিকাশ সাধিত হয় না। তাহার জন্য স্বলব্ধ জ্ঞান বিতরণ করাও একান্ত আবশ্যক। তাহা না করিলে জ্ঞান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না; সংকীর্ণ ও অবিকশিত থাকিয়া যায়। বাল্যকালে যে কবিতা পাঠ করা গিয়াছিল— "এ ধন কেহ নাহি নিতে পারে কেড়ে, যতই করিবে দান ততই যাবে বেড়ে"—তাহা একটা কবিকল্পনা নহে, একবারে অকাট্য বৈজ্ঞানিক সত্য, দর্শনশাস্ত্রেরও নিশ্চিত সিদ্ধান্ত। এ বিদ্যাদানের অর্থ যে শুধু অধ্যাপনা আলোচনা গ্রন্থপ্রণয়ন নহে, তাহা বলা বাহুল্য। তাহাদ্বারা যে জ্ঞান বিকশিত ও সুমার্জ্জিত হয়, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু এ সমস্ত করিয়াও ব্যক্তিগত, সম্প্রদায়গত ও জাতিগত স্বার্থ রক্ষার জন্য জ্ঞানকে ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া, অপরকে তাহা হইতে বঞ্চিত রাখিবার চেষ্টা জগতে যথেষ্টই হইয়াছে। তাহার ফলে শুধু অপরেরই অনিষ্ট সাধিত না হইয়া, অপরেরই অজ্ঞতা ও মূর্খতা বর্দ্ধিত না হইয়া, নিজেদেরও যে ঘোরতর অপকার হইয়াছে, উন্নতির ব্যাঘাত ঘটিয়াছে, অবনতির বিশেষ সহায়তা হইয়াছে, তাহা ইতিহাস অতি উজ্জ্বল ভাবেই প্রমাণ করিতেছে। অপরের জ্ঞানোন্নতির পরিপন্থী হইলে, অথবা সে বিষয়ে উদাসীন থাকিলে, নিজেরই অধিকতর ক্ষতি হয়, বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়; আর সে জন্য চেষ্টা যত্ন করিলে, অপরকে জ্ঞানের পথে অগ্রসর করিতে গেলে, নিজের পথই সুগম ও প্রশস্ততর হয়, নিজের উন্নতিই সহজসাধ্য হইয়া উঠে। এখানেও স্বার্থে ও পরার্থে কোনও সংঘর্ষ নাই, বরং স্বার্থের জন্যই পরার্থ সাধন একান্ত আবশ্যক। স্বার্থের ও পরার্থের সম্পূর্ণ একত্বই দেখিতে পাওয়া যায়।

জ্ঞানরাজ্য ছাড়িয়া যদি আমরা হৃদয়রাজ্যে প্রবেশ করি, তবে সেখানে এই সত্য আরও উজ্জ্বলরূপে দেখিতে পাইব। যদিও জীবনকে, মানবাত্মাকে, খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাগ করা যায় না, তথাপি কার্য্যের পার্থক্য হেতু তাহাকে আমরা বিভক্ত করিয়া চিন্তা করিতে পারি এবং সেই ভাবে বিচার করিয়া, আমরা মন বা জ্ঞান অপেক্ষা হৃদয়কে উচ্চাসনও প্রদান করিয়া থাকি। সকল কার্য্যের প্রেরক ও চালক ভাব, আর ভাব-সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ও মহত্তম হইতেছে প্রেম। সেই ভাবজগৎ লইয়াই হৃদয়ের রাজ্য। বৈজ্ঞানিকগণও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, জীবজগতের শ্রেষ্ঠতম প্রতিনিধি মানবের মধ্যে মাতৃত্বের অভি-ব্যক্তিই ক্রমোন্নতির চরম বিকাশ, এবং প্রেমই সেই মাতৃত্বের প্রাণ। নিম্নতর স্তরেও মাতৃত্ব বা প্রেম ফুটিয়াছে, কিন্তু মানবের মধ্যেই উহার পূর্ণতম বিকাশ। সর্ব্বত্রই এই প্রেমের প্রকৃতি যে, আপনার নিজের সুখ সুবিধার দিকে না চাহিয়া, ভালবাসার জনের আরাম আনন্দ কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখা, তাহাতেই তৃপ্তি ও কৃতার্থতা অনুভব করা, স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়াও পরার্থসাধন করা, অথবা পরার্থকেই শ্রেষ্ঠ স্বার্থ বলিয়া গ্রহণ করা, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। আর এই প্রেম যে স্বভাবতঃই অনন্ত উন্নতিশীল, কখনও ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারে না. নিয়তই সম্প্রসারিত হইয়া বৃহৎ হইতে বৃহত্তর বৃত্ত আবেষ্টন করিতে করিতে অনন্তে যাইয়া নিমজ্জিত হয়, সে কথাও আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। সকল দেশে ও সকল কালে এই প্রেমের দ্বারাই মানব হৃদয়ের প্রকৃত মনুষ্যত্ব ও গৌরব, মহত্ত্ব ও দেবত্ব নির্ণীত হইয়াছে, এবং ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য পরার্থের বিসর্জ্জন প্রেমপথের পরিপন্থী বলিয়া নিতান্ত ঘৃণিত ও মানুষের অযোগ্য বিবেচিত হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃত পক্ষে স্বার্থের জন্য পরার্থের বিসর্জ্জন, শুধু মানুষের নয়, পশুরও অযোগ্য। সেখানেও পরার্থের জন্য স্বার্থের বিসর্জ্জনই প্রেমের প্রকৃতি— সেখানেও স্বার্থে ও পরার্থে কোনও বিরোধ নাই, পরার্থই প্রকৃত স্বার্থ, যদিও তাহাদের পরার্থ অতি ক্ষুদ্র গণ্ডীতেই আবদ্ধ।

কিন্তু প্রেমের রাজ্যে স্বার্থে ও পরার্থে বিরোধ না

থাকিলেও, পরার্থে পরার্থে বিরোধ ঘটিতে পারে—প্রেম যেখানে ক্ষুদ্র সীমায় আবদ্ধ, সেখানে ভালবাসার জনের স্বার্থে ও অপরের স্বার্থে সংঘর্ষ উপস্থিত হইতে পারে এবং সেরূপ স্থলে প্রেম প্রথমোক্তের স্বার্থের নিকট শেষোক্তের স্বার্থকে বলি দিতে প্ররোচিত করে। ইহা কিন্তু বিশুদ্ধ প্রেমের প্রকৃতি নহে, উহার বিকৃতিই। শুধু মন ও হৃদয়, জ্ঞান ও প্রেমই মানব জীবনের সব নয়, এই দুই উপাদানেই মানবাত্মা গঠিত নহে। ইহা ছাড়া তাহার মধ্যে বিবেক বা কর্ত্তব্যবুদ্ধি রহিয়াছে, যাহার দ্বারা আর সমস্ত নিয়ন্ত্রিত। বিবেক বা কর্ত্তব্যবুদ্ধিই সকল কার্য্যের পথ ও সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দেয়, তাহাই সকল বিষয়ে জীবনবিধাতার ইচ্ছা ও আদেশ, তাহাকে জানাইয়া দেয় এবং তাহা মানিয়া চলিতেই যে সে বাধ্য, তাহার বাহিরে গেলে যে কল্যাণ ও উন্নতি নাই, তাহা পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দেয়। ভাব কার্য্যের চালক ও প্রেরক হইলেও, উহা কিন্তু কর্ত্তা নহে; কর্ত্তা হইতেছে ইচ্ছা এবং এই ইচ্ছার নিয়ামক হইতেছে বিবেকে প্রকাশিত বিধাতার বিধি বা নীতি। ইচ্ছাই মানবাত্মার বিশেষত্ব ও ব্যক্তিত্বের মূল—ইহাকে ছাড়িয়া ব্যক্তিগত আত্মার কোনও অস্তিত্বই নাই। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আত্মা এক অখণ্ড বস্তু, জ্ঞান প্রেম ইচ্ছা বলিয়া যে উহার মধ্যে তিনটি বিভিন্ন অংশ আছে এরূপ নহে—আমরা উহার বিভিন্ন প্রকার কার্য্য পরিষ্কাররূপে বুঝিবার জন্যই উক্ত প্রকার ভাগ কল্পনা করিয়া থাকি। এখন, এই ইচ্ছাকে সুপরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য, উন্নতি ও কল্যাণ-সাধনোপযোগী রাখিবার জন্য, যে বিধি বা নীতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার মূল বা প্রাণ যে 'ন্যায়' সে কথা সকলকেই স্বীকার, করিতে হইবে। এই ন্যায়ই যে প্রত্যেকের অধিকার ও সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দেয়, এবং পূর্ণ ন্যায়ের নিকট প্রত্যেকের স্বার্থ যে ঠিক সমান ভাবেই রক্ষিত হয়, কাহারও প্রকৃত স্বার্থ যে এক চুলও বিসর্জ্জিত হইতে পারে না, তাহা বিস্তারিত করিয়া বলিবার কোনও প্রয়োজন নাই—সে বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না। পূর্ণ ন্যায়বানের রাজ্যে ন্যায় কিছুতেই ক্ষুন্ন হইতে পারে না, একের স্বার্থের জন্য অপরের স্বার্থ ব্যাহত হইতে পারে না—তাঁহার নিকটে সকলেই সমান। কাজেই এরূপ স্থলে স্বার্থে ও পরার্থে কোনই বিরোধ থাকিতে পারে না—প্রত্যেকের পক্ষেই স্বার্থ ও পরার্থ এক এবং অভিন্ন। কেন না, সকলেই পরস্পরের সঙ্গে এমনই ভাবে এক সূত্রে গ্রথিত যে, কেহই অপরকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, উন্নতিলাভও করিতে পারে না। আমাদের অন্ধতা ও অজ্ঞতা বশতঃই আমরা স্বার্থ ও পরার্থের মধ্যে বিরোধ কল্পনা করি এবং বিকৃত ভাবের দ্বারা চালিত হইয়া বিধাতানির্দ্দিষ্ট ন্যায়ের পথ পরিত্যাগ করিয়া, বিপথে বিচরণ করি বলিয়াই যত দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এবং এই সংঘর্ষ হইতেই সংসারে যত বিবাদ বিসম্বাদ, যুদ্ধ বিগ্রহ, মারামারি কাটাকাটি, হিংসা বিদ্বেষ, দুঃখ তাপ অশান্তি উৎপন্ন হয়। পরার্থকে পরিত্যাগ করিয়া স্বার্থ খুঁজিতে যাইয়া যে আমরা শুধু পরার্থেরই ধ্বংস করি তাহা নহে, আমাদের স্বার্থও সেই সঙ্গে বিনষ্ট হয়, আমরা এ-কূল ও-কূল দুই কূলই হারাই। আর যদি স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া পরার্থ খুঁজিতে যাই, তবে দেখিতে পাইব পরার্থের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের স্বার্থও পূর্ণরূপেই রক্ষিত হইয়াছে, এক চুলও বিনষ্ট হয় নাই, বরং অধিকতর পরিমাণে এবং সুন্দরতর রূপেই সাধিত হইয়াছে—এক কূল ছাড়িতে যাইয়াই আমরা দুই কূলকে নিবিড়তর, গভীরতর ও পূর্ণতররূপে প্রাপ্ত হইয়াছি। আমরা যদি এই ভাবে চলিতে চেষ্টা করি তবে অচিরেই দেখিতে পাইব, এই সংসারের চেহারা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, এখানেই প্রেমময় পবিত্রস্বরূপ ন্যায়বান মঙ্গলবিধাতার প্রেমপরিবার গঠিত হইয়াছে, স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধে যে স্বার্থে ও পরার্থে কোনও বিবাদ নাই, বরং পরার্থের জন্য স্বার্থবিসর্জ্জনেই ধর্ম্মজীবনের পূর্ণতা, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। অপরের ধর্ম্মজীবন যতই উন্নত হউক না কেন, অপরে যত গভীর ভাবে জীবন-দেবতার সঙ্গে যুক্ত হউক না কেন, যত অধিক পরিমাণে তাঁহাকে স্বীয় আত্মাতে লাভ করুন না কেন, তাহাতে আমার স্বার্থের বা ধর্ম্মজীবনলাভের বিন্দুমাত্র হানি হয় না, আমার অংশ একটুও হ্রাস প্রাপ্ত হয় না; বরং তাহাতে আমার উপকারই হয়, তাহা লাভ করিবার সহায়তাই হয়। আর কোন বিষয়ে পরার্থ নষ্ট করিবার ইচ্ছা বা চেষ্টা থাকিলে নিজের স্বার্থই নষ্ট হয়, ধর্ম্মজীবনই বিনষ্ট হয়। আপনার স্বার্থ বিসর্জ্জন করিয়াও পরার্থসাধনই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, তাহাও বোধ হয় না বলিলে চলিবে। সুতরাং এখানে স্বার্থ ও পরার্থে পূর্ণ মিল। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি, এমন কোনও ক্ষেত্রই নাই, যেখানে পরার্থে ও প্রকৃত স্বার্থে কোন প্রকার বিরোধ আছে, সর্ব্বত্রই উভয়ের মধ্যে পূর্ণ মিলই রহিয়াছে—এক মাত্র পরার্থসাধনদ্বারাই প্রত্যেকের স্বার্থ পূর্ণমাত্রায় রক্ষিত হইতে পারে। কবে আমাদের ভ্রম বিদূরিত হইবে, শুভবুদ্ধি জাগিবে জানি না। কিন্তু তাহা না হওয়া পর্য্যন্ত কাহারও কল্যাণ নাই, এবং আমাদের জীবনে ও সমাজে যে প্রকৃত ধর্ম্মও দাঁড়াইবে না, তাহা সুনিশ্চিত। সুতরাং এ বিষয়ে আমাদিগকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হইবে। প্রেমময় পিতা আমাদিগকে শুভবুদ্ধি প্রদান করুন। আমরা যেন পরার্থের জন্য স্বার্থ বিসর্জ্জন করিয়া জীবনের সার্থকতা সাধন করিতে শিক্ষা করি। মঙ্গলময়ের পবিত্র ইচ্ছাই সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হউক।

ব্রাহ্মসমাজে দীক্ষা প্রবর্ত্তন।

[১৮৩৭ শকের পৌষ সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত একটি প্রবন্ধ হইতে সঙ্কলিত। সঙ্কলয়িতা শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।]

তিনি [দেবেন্দ্র নাথ] প্রথম যে প্রতিজ্ঞাপত্র রচনা করিয়াছিলেন, শুনিয়াছি যে তাহাতে প্রতিদিন গায়ত্রীমন্ত্র দ্বারা অভুক্ত অবস্থায় ব্রহ্মোপাসনা করিবার বিধি ছিল। আমরা কিন্তু যে মুদ্রিত প্রতিজ্ঞাপত্র প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতে অভুক্ত অবস্থায় উপাসনা

করিবার কথা উল্লিখিত দেখি না[১]। সেই প্রতিজ্ঞা-পত্র নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত হইল।

ওঁ তৎসৎ।

অদ্য সপ্তদশশত,—শকে,—দিবসে,—বাসরে, ব্রাহ্মের সম্মুখে, ঈশ্বরকে হৃদয়ে সাক্ষাৎ জানিয়া একান্তচিত্তে প্রতিজ্ঞা করিতেছি :—

১। বেদান্ত-প্রতিপাদ্য সত্য ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

২। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা সর্ব্বব্যাপী আনন্দস্বরূপ পরমেশ্বর-রূপে প্রতিমাদি কোন ইন্দ্রিয়গোচর বস্তুর আরাধনা করিব না।

৩। প্রণব-ব্যাহৃতি-গায়ত্রীর অবলম্বন দ্বারা, এবং তত্ত্বজ্ঞানের আবৃত্তি দ্বারা, পরব্রহ্মের উপাসনাতে নিযুক্ত থাকিব।

৪। রোগ বা বিপদের দিবস ভিন্ন, প্রতি দিবস সূর্য্যোদয় পরে, মধ্যাহ্ন কালের মধ্যে, কোন বর্ণের চিহ্ন বিধিপূর্ব্বক ধারণ না করিয়া, পবিত্র মনে পরব্রহ্মের স্বরূপ ভাবনা পূর্ব্বক, ন্যূন সংখ্যা দশবার প্রণব-ব্যাহৃতি সহিত গায়ত্রী জপ করিব।

৫। প্রতি বুধবারে, প্রতি মাসের প্রথম রবিবারে, এবং প্রতি বৎসরের ১১ মাঘ দিবসে, দৈনিক উপাসনান্তে সূর্য্যাস্ত পরে অর্দ্ধরাত্রি মধ্যে, রোগ বা বিপদগ্রস্ত না হইলে, কোন বর্ণের চিহ্ন বিধিপূর্ব্বক ধারণ না করিয়া, একাকী বা বহুজন সঙ্গে তত্ত্বজ্ঞানের আবৃত্তি দ্বারা পরব্রহ্মের উপাসনা করিব।

৬। সত্য কথা কহিব, এবং সত্য ব্যবহার করিব।

৭। লোকের অপকার যাহাতে হয়, এমত সকল কর্ম্ম করিব না।

৮। কুকর্ম্মসকল হইতে নিরস্ত থাকিব।

৯। যদি মোহদ্বারা কোন কুকর্ম্ম দৈবাৎ করি, তবে একান্তে তাহা হইতে মুক্তি ইচ্ছা করিয়া, পুনর্ব্বার সে কর্ম্ম করিব না।

১০। কোন ব্রাহ্ম বিপদগ্রস্ত হইলে যথাসাধ্য তাঁহাকে সাহায্য করিব।

১১। আমার বংশে এই সনাতন ধর্ম্মের উপদেশ করিব।

১২। আমার সাংসারিক তাবৎ শুভ কর্ম্মে ব্রাহ্মসমাজে দান করিব।

হে পরমেশ্বর, এই সকল প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিবার ক্ষমতা আমার প্রতি অর্পণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

সাক্ষী শ্রী—

ব্রাহ্ম শ্রী—"

উপরোক্ত প্রতিজ্ঞাপত্র হইতে আমরা তদানীন্তন ব্রাহ্মসমাজ সংক্রান্ত কয়েকটি তথ্য অবগত হইতে পারি। প্রথম প্রতিজ্ঞা হইতে বুঝিতেছি যে ১৭৬৫ শকে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মের নাম 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' হয় নাই, 'বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্য ধর্ম্ম' ছিল।...

তৃতীয় ও চতুর্থ প্রতিজ্ঞাতে দেখি যে, ... গায়ত্রী দ্বারা ব্রহ্মোপাসনার প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করা, এবং পারমার্থিক উন্নতিকল্পে তাহারই শ্রেষ্ঠতা ঘোষণা করা, ব্রাহ্মণ রামমোহন রায়, ব্রাহ্মণ দেবেন্দ্রনাথ, এবং সেই সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের অন্যান্য ব্রাহ্মণ সভ্যদিগের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক হইয়াছিল।... কিন্তু আমরা দেখি যে, কয়েক বৎসরের মধ্যেই উপরোক্ত প্রতিজ্ঞাদ্বয়ের পরিবর্ত্তে এক সহজসাধ্য, সাম্প্রদায়িক ভাব বিরহিত, উদারতম ভাবাপন্ন এবং সাধারণের গ্রহণীয় এই একটী প্রতিজ্ঞা স্থাপিত হইয়াছিল যে, 'রোগ বা বিপদের দ্বারা অক্ষম না হইলে প্রতিদিবস শ্রদ্ধা ও প্রীতি পূর্ব্বক পরব্রহ্মে আত্মা সমাধান করিব।'

চতুর্থ ও পঞ্চম প্রতিজ্ঞা হইতে দেখা যায় যে ব্রাহ্মদিগের ভিতরে জাতিভেদ উঠাইবার সূত্রপাত স্বরূপে, অন্তত উপসনার সময়ে 'কোন বর্ণের চিহ্ন বিধিপূর্ব্বক ধারণ না করিবার' বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।...

অনেক ব্রাহ্ম ব্রাহ্মধর্ম্ম-ব্রত গ্রহণ করিবার পর, নূতন উৎসাহের বশবর্ত্তী হইয়া মুদ্রিত প্রতিজ্ঞাপত্রের পার্শ্বে নিজ নিজ মনোমত অনেক অতিরিক্ত প্রতিজ্ঞা হস্তাক্ষরে লিখিয়া রাখিতেন।... একটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করিব। ভক্তিভাজন রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের পিতা নন্দকিশোর বসু তাঁহার ১৭৬৬ শকের ১২ই চৈত্র দিবসে স্বাক্ষরিত প্রতিজ্ঞাপত্রে চতুর্থ প্রতিজ্ঞার শেষে লিখিয়া রাখিয়াছেন,'কোন দিবস নিয়মিত সময় মধ্যে কোন ব্যাঘাত প্রযুক্ত যদি দশবার জপ না করিতে পারি, তবে তদ্দিবসে, অন্য সময়ে কিংবা তৎপর দিবসে চিত্ত একাগ্র হইলে, জপ যে বক্রী থাকিবেক, তাহা সম্পূর্ণ করিব।' আবার দশম প্রতিজ্ঞার পার্শ্বে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, 'এবং ব্রাহ্ম ভিন্ন অন্য ব্যক্তিদিগেরও যথাসাধ্য উপকার করিব।'

দেবেন্দ্রনাথের পিতৃশ্রাদ্ধানুষ্ঠান।*

(ব্রাহ্মসমাজের শতাব্দীপূর্ত্তি উপলক্ষে মহর্ষির আত্মজীবনীর যে নূতন সংস্করণ প্রস্তুত হইতেছে, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক লিখিত তাহার পরিশিষ্টের পাণ্ডুলিপি হইতে গৃহীত।

আত্মীয়গণের বিরাগ ও ঠাকুর পরিবারে দলাদলি।

ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের সময়ে দেবেন্দ্রনাথ যে পৌত্তলিকতা পরিহার করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন, পিতৃশ্রাদ্ধের সময়ে তাহার প্রথম পরীক্ষা উপস্থিত হইল। আত্মীয়গণকে অসন্তুষ্ট করিয়াও তিনি স্বীয় ধর্ম্মকে রক্ষা করিলেন।

তাঁহার ভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথ প্রচলিত রীতি অনুসারে শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়াও সমাজকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলেন না। "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" প্রণেতা লিখিতেছেন, "দ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যুর পর তাঁহার শ্রাদ্ধ লইয়া এক গোলযোগ ঘটে। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্রনাথ আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ দ্বারা নিজ বিশ্বাসমত কয়েকটিমাত্র বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিয়া স্ব-রচিত ব্রাহ্ম অনুষ্ঠানপদ্ধতি-ক্রমে এক গৃহে শ্রাদ্ধ করিলেন। সে স্থলে গঙ্গাজল, তুলসী, কুশ বা ৺নারায়ণ শিলা ছিল না। আর মধ্যম পুত্র গিরীন্দ্রনাথ সভায় বসিয়া সামাজিক রীতিনীতি অনুসারে জাতি কুটুম্ব লইয়া দেবতা-ব্রাহ্মণের সমক্ষে হিন্দুশাস্ত্রানুসারে শ্রাদ্ধ ও দানাদি উৎসর্গ

---

(১) এই মুদ্রিত প্রতিজ্ঞাপত্র, ও দেবেন্দ্রনাথের নিজের দীক্ষাকালে ব্যবহৃত প্রতিজ্ঞাপত্র, অভিন্ন নয় বলিয়া বোধ হয়। দেবেন্দ্রনাথের দীক্ষায় ব্যবহৃত প্রতিজ্ঞাপত্র মুদ্রিত না হইয়াও থাকিতে পারে।—সঃ চঃ।

করিলেন। দেবেন্দ্রনাথ নিজ খুল্লতাত রমানাথ ঠাকুর ও জ্ঞাতি পিতৃব্য প্রসন্নকুমার ঠাকুর" কাহারই অনুরোধে বৃষোৎসর্গের যূপকাষ্ঠ স্পর্শ করিতে সম্মত হইলেন না। এই সূত্রে পিরালী-সমাজে দলাদলির সৃষ্টি হইল।...

দ্বারকানাথের দেহ বিলাতে সমাহিত থাকায় গিরীন্দ্রনাথ এখানে কুশপুত্তলদাহ করিয়া শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করেন। প্রসন্নকুমার ও রমানাথ-প্রমুখ সমস্ত পিরালী সমাজ এই ব্যবস্থা গ্রাহ্য করিয়া লইলেন; কেবল পাথুরিয়াঘাটার হিন্দুশাস্ত্রদর্শী হরকুমার ঠাকুর [প্রসন্নকুমার ঠাকুরের অগ্রজ] বলিলেন যে, যে স্থলে দেহের অপ্রাপ্তি ঘটে সেই স্থলেই কুশপুত্তলদাহের বিধি শাস্ত্র সঙ্গত। কিন্তু এ স্থলে দেহ বর্ত্তমান; এ ক্ষেত্রে বিলাত হইতে দেহ যখন আনাইয়া লওয়া যাইতে পারে, তখন কুশপুত্তলদাহ হইতে পারে না। অতএব, দেবেন্দ্রনাথের কৃত শ্রাদ্ধও যেমন অসামাজিক ও অশাস্ত্রীয়, গিরীন্দ্রনাথের কৃত শ্রাদ্ধও তদ্রূপ। অতএব, এই অশাস্ত্রীয় শ্রাদ্ধাচারী এবং এই শ্রাদ্ধে লিপ্ত কোন ব্যক্তির সহিত আত্মীয়তা রাখিব না।" (ব্রাহ্মণ কাণ্ডের ষষ্ঠ খণ্ডের ৩৫২, ৩৫৩ পৃষ্ঠা, ও সংশোধন পত্র দ্রষ্টব্য)। এইরূপে দেবেন্দ্রনাথের পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে ঠাকুরবংশীয়দিগের মধ্যে দলাদলি হইয়া গেল। দর্পনারায়ণ ঠাকুরের বংশীয়গণের মধ্যে এক প্রসন্নকুমার ভিন্ন আর সকলে দেবেন্দ্রনাথকে ত্যাগ করিলেন।

খ্রীষ্টধর্ম্মের পক্ষ হইতে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের আক্রমণ।

এই শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের জন্য দেবেন্দ্রনাথকে একদিকে হিন্দু আত্মীয়গণের বিরাগভাজন হইতে হইল, অপর দিকে আবার তাঁহার জ্ঞাতি ভ্রাতা জ্ঞানেন্দ্রমোহনের সমালোচনাভাজন হইতে হইল। জ্ঞানেন্দ্রমোহন প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পুত্র; কিন্তু তিনি খ্রীষ্টধর্ম্মে অনুরক্ত ও হিন্দু সমাজের সহিত একান্ত বিচ্ছেদের পক্ষপাতী ছিলেন। উত্তরকালে তিনি খ্রীষ্টিয়ান হইয়া কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। এই জ্ঞানেন্দ্রমোহন "Justicia" এই ছদ্মনাম, অবলম্বন করিয়া *Englishman* পত্রিকার ২২শে অক্টোবর ১৮৪৬ তারিখের সংখ্যায় দেবেন্দ্রনাথকে "President of the Tuttobodhenee Sobha" বলিয়া সম্বোধন করিয়া এক দীর্ঘ পত্র প্রকাশ করেন। তাহাতে তিনি বলেন, শ্রাদ্ধ একটি পৌত্তলিক অনুষ্ঠান; এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়া, ইহাতে লোক নিমন্ত্রণ করিয়া, 'idolatrous feast' হইতে দিয়া, গিরীন্দ্রনাথকে পৌত্তলিক মতে শ্রাদ্ধ করিতে অনুমতি দিয়া, ও ব্রাহ্মণদিগকে অর্থ দান করিয়া, দেবেন্দ্রনাথ স্বতঃ এবং পরতঃ পৌত্তলিকতায় যোগ দিবার অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন। রামমোহন রায় তো মাতার শ্রাদ্ধ করিতে সম্মত হন নাই; দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার অনুসরণ করিলেন না কেন?

২৮ শে অক্টোবরের *Englishman* পত্রিকায় দেবেন্দ্রনাথের উত্তর প্রকাশিত হইল। সেই সংখ্যায় সম্পাদক মহাশয় স্বীয় মন্তব্যে জ্ঞানেন্দ্রমোহনের পক্ষ লইয়া এই কথাগুলি লিখিলেন,—"Our former correspondent [অর্থাৎ "Justicia"] considers the Shradh as one of those observances which cannot by any purification be disconnected from idolatrous rites and degrading notions of the Divine Being". "Justicia" আবার ৫ই নভেম্বর ১৮৪৬ তারিখের সংখ্যায় দেবেন্দ্রনাথের উত্তরের প্রত্যুত্তর দেন।

"Justicia" র দীর্ঘ পত্রখানিতে সার কথা অত্যল্প। রামমোহন রায় মাতৃশ্রাদ্ধ করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন, ইহার ঠিক তথ্য জানাও এখন কঠিন। দেবেন্দ্রনাথকে এই সকল বাদানুবাদের ভিতরে এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইল যে, ব্রাহ্মদের জন্য শ্রাদ্ধ বলিয়া একটি অনুষ্ঠান থাকিবে কি না। পিণ্ডদান ও মূর্ত্তিপূজা প্রভৃতি আপত্তিজনক অংশ বর্জ্জন করিয়া পিতৃপুরুষের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনাত্মক এই অনুষ্ঠানটিকে রক্ষা করাই দেবেন্দ্রনাথ শ্রেয় বলিয়া অনুভব করিলেন। ব্রাহ্মসমাজ যে হিন্দু জাতির এই বিশেষ অনুষ্ঠানটিকে কখনও পরিত্যাগ করেন নাই, ও ইহাকে স্বীয় সংস্কারাবলীর মধ্যে সসম্মানে স্থান দিয়াছেন, দেবেন্দ্রনাথের এই পিতৃশ্রাদ্ধানুষ্ঠান হইতেই ব্রাহ্মসমাজে এই ধারাটি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

দ্বারকানাথের শ্রাদ্ধের তারিখ।

পিতার মৃত্যুসংবাদ যখন কলিকাতায় আসিল, দেবেন্দ্রনাথ তখন নৌকায় গঙ্গাবক্ষে ছিলেন। আত্মজীবনীতে এই নৌকা-ভ্রমণের, দ্বারকানাথের কুশপুত্তলদাহের ও দ্বারকানাথের পুত্রগণ কর্ত্তৃক অশৌচ ধারণের যে বিবরণ আছে, তাহাতে সময়ঘটিত অনেক ভুল রহিয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ আত্মজীবনী লিখাইবার সময় কিছু কিছু ঘটনা ভুলিয়া গিয়াছিলেন, এবং সম্ভবতঃ তাঁহার মাতার শ্রাদ্ধসংক্রান্ত কোন কোন ঘটনা পিতৃশ্রাদ্ধের স্মৃতির সহিত মিশিয়া গিয়াছিল। এই সকল ঘটনার তারিখ সম্বন্ধে আমরা সমসাময়িক সংবাদপত্রে যে উল্লেখ পাইতেছি, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

দ্বারকানাথ ঠাকুর ১লা আগষ্ট ১৮৪৬ তারিখে লণ্ডন নগরে দেহত্যাগ করেন। যে বিলাতী ডাকে তাঁহার মৃত্যুসংবাদ আসে, তাহা ১৮ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার বিকাল ৩টার সময় কলিকাতায় পৌছে। তখন সাগরপথের টেলিগ্রাফ ছিল না, এবং বিলাত হইতে দেড় মাসে ডাক আসিত। ঐ তারিখের *Calcutta Star Extra-ordinary*তে দ্বারকানাথের মৃত্যুর সংবাদের মধ্যে এই কথাও ছিল,—"The heart was taken from the body to be conveyed to India."

আত্মজীবনীতে নৌকাভ্রমণের সময় প্রথমতঃ শ্রাবণ মাস (৫৫,৫৬ পৃষ্ঠা) ও পরে ভাদ্র মাস (৫৯ পৃষ্ঠা) বলিয়া উল্লিখিত আছে। ১৮ই সেপ্টেম্বর বিকালে কলিকাতায় দ্বারকানাথের মৃত্যুসংবাদ পৌছে, এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার বাড়ীর স্বরূপ খানসামা দ্রুতগামী নৌকায় রওনা হইয়া পাটুলিতে গিয়া দেবেন্দ্রনাথকে এই সংবাদ দেয়; ইহাতে দেবেন্দ্রনাথের এই সংবাদ প্রাপ্তি ২০শে সেপ্টেম্বরের (৫ই আশ্বিনের) পূর্ব্বে হইতে পারে না। সুতরাং দেবেন্দ্রনাথের নৌকাভ্রমণ শ্রাবণ মাসে নয়, ভাদ্র মাসের শেষ ভাগে আরম্ভ হইয়াছিল।

আত্মজীবনীতে লিখিত কৃষ্ণাচতুর্দশীতে কুশপুত্তলদাহের ও দশ দিন অশৌচ ধারণের বিবরণও ভুল। আত্মজীবনীতে প্রদত্ত তিথি প্রভৃতিতে সংশয় হওয়ায়, সে সকলের উল্লেখ করিয়া আমি শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ শাস্ত্রী সাংখ্যতীর্থ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি যে এরূপ স্থলে শাস্ত্রে কিরূপ বিধি আছে, এবং এই

দিনগুলি ঠিক মনে হয় কি না। তিনি অনুগ্রহ করিয়া তদুত্তরে আমাকে লিখেন, "আপনার লিখিত দিন গুলিতে যে সমস্ত কার্য্য উল্লেখ আছে, তাহা ঠিক হিসাব মত হয় না।... কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী একাদশী বা অমাবস্যায় কুশপুত্তলদাহ করিতে হয়; [শাস্ত্রে] চতুর্দ্দশীর কোন উল্লেখ নাই। কুশপুত্তলদাহের পর চতুর্থ দিনে শ্রাদ্ধ ও দানাদি করিতে হয়।" সমসাময়িক সংবাদপত্রে যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা সাংখ্যতীর্থ মহাশয়ের উক্তিরই সমর্থন করে।

১৬ই অক্টোবর ১৮৪৬ তারিখের *Englishman* পত্রিকার তৃতীয় পৃষ্ঠায় এই সংবাদটি আছে:—"From the *Bhaskur*. CREMATION OF DWARKANATH'S EFFIGY.—On Sunday last, a straw effigy of the late lamented Dwarkanath was burned at the last place of Hindu cremation. His sons have put on mourning, and there is no longer any doubt of their performing his shrad." এই Sunday last = ১১ই অক্টোবর, ২৬শে আশ্বিন, কৃষ্ণাষ্টমী তিথি। কুশপুত্তলদাহ গঙ্গার পশ্চিম তীরে গিয়া করা হয়, কারণ পশ্চিম তীর অধিক পবিত্র ও কাশী-সমতুল বলিয়া গণ্য। এই সংবাদের শেষাংশটি পড়িয়া মনে হয়, দেবেন্দ্রনাথের ভাব দেখিয়া প্রথম প্রথম এরূপ একটি কথা রাষ্ট্র হইয়াছিল যে তিনি হয়তো শ্রাদ্ধই করিবেন না।

১৭ই অক্টোবরের *Englishman*এ "Local Items" শীর্ষে এই সংবাদ রহিয়াছে,—"SHRAD OF THE LATE BABOO DWARKANAUTH TAGORE.—On Thursday last at the Shrad of the late Baboo Dwarkanauth Tagore, several gold and silver articles, together with some valuable Cashmere shawls, were offered, which will be distributed to the Brahmins according to their ranks and talents, besides presents of money from fifty to a hundred rupees each."

এই Thursday last = ১৫ই অক্টোবর, ৩০শে আশ্বিন। "কুশপুত্তলদাহের পর চতুর্থ দিনে শ্রাদ্ধ" করিবার নিয়মের সহিত ইহা মিলিতেছে।

উত্তরকালে দেবেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক ব্রাহ্মপদ্ধতি রচনা।

উত্তরকালে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মদিগের সামাজিক অনুষ্ঠান-সকলের জন্য নূতন পদ্ধতি রচনা করিয়া দিয়া ব্রাহ্মসমাজকে বৈশিষ্ট্য প্রদান করেন। এই নূতন পদ্ধতি রচনা সেই সময়েই সম্ভব হইল, যখন কয়েকটি পরিবার পুরাতন পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া নূতন পদ্ধতি অনুসারে বিবাহাদি দিতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের পিতৃশ্রাদ্ধানুষ্ঠান যে ভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল বলিয়া যেন কেহ মনে না করেন; তখনও সে সময় আসে নাই। পিতৃশ্রাদ্ধে দেবেন্দ্রনাথ কেবল অপৌত্তলিক মন্ত্রদ্বারা দানোৎসর্গ (দেবেন্দ্রনাথের ভাষায় "পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া শ্রাদ্ধানুষ্ঠান,") করিয়াছিলেন মাত্র। ইহার বহু বৎসর পরে (দ্বিজেন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথ ও সৌদামিনীর বিবাহের পরে), দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত নূতন অনুষ্ঠানপদ্ধতি রচনা করিতে আরম্ভ করেন। এই তিনটি সন্তানের বিবাহ তাঁহাকে প্রচলিত হিন্দু পদ্ধতি অনুসারেই দিতে হইয়াছিল। তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যা সুকুমারীর বিবাহই (২৬শে জুলাই ১৮৬১) তাঁহার রচিত ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত পদ্ধতির প্রথম অনুষ্ঠান।

সুকুমারীর বিবাহের পরেই প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও রমানাথ ঠাকুর পর্য্যন্ত দেবেন্দ্রনাথকে ত্যাগ করেন। পিতৃশ্রাদ্ধের সময়ে অন্যান্য আত্মীয়গণ ত্যাগ করিলেও এই দুই জন দেবেন্দ্রনাথকে ত্যাগ করেন নাই। কিন্তু, শ্রাদ্ধের সময়ে যে বৃষকাষ্ঠ দেবেন্দ্রনাথের স্কন্ধে লইবার কথা, তাহা একবার স্পর্শমাত্র করিতে প্রসন্নকুমার ঠাকুর দেবেন্দ্রনাথকে বার বার অনুরোধ করেন; দেবেন্দ্রনাথ কিছুতেই তাহা করিলেন না। গুরুজনের অনুরোধ দেবেন্দ্রনাথ এইরূপে অগ্রাহ্য করাতেই কুটুম্বগণ ক্ষুণ্ণ হইয়া জ্ঞাতিভোজনের দিনে আসিতে বিরত হন; এবং এই কারণেই প্রসন্নকুমার ঠাকুর বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, "যদি দেবেন্দ্র পুনরায় এরূপ না করেন, তবে আমরা সকলে তাঁহার নিমন্ত্রণে যাইব।"

পরলোকগত ধর্ম্মদাস বসু

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পিতা তাঁহার মনে ধর্ম্মভাবের উন্মেষ ও বিকাশ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা এ স্থলে লিপিবদ্ধ করিলাম। তিনি ছাত্র বয়সে যখন চন্দননগরের গড়বাটি স্কুলে পড়িতেন, তখন তাঁহাদের বাটিতে মধ্যে মধ্যে প্রতিমা-পূজা ও শাস্ত্রাচার-পালন সম্বন্ধে বাদানুবাদ হইত। তিনি সেই সকল তর্ক বিতর্ক মন দিয়া শুনিতেন এবং পূজা পার্ব্বণে তাঁহার ভক্তি ছিল। বাল্যকালে তাঁহার ধারণা ছিল যে, ঈশ্বর যেন একটি গাছের গুড়ি ও দেব দেবীরা যেন তাঁহার শাখা প্রশাখা। কলিকাতার মেডিকেল কলেজে পাঠের সময় তিনি মধ্যে মধ্যে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্মসমাজে যাইতেন। সে সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের উপর তাঁহার আস্থা জন্মিতেছিল, কিন্তু তাহা তেমন দৃঢ় হয় নাই। বিলাতে থাকিতে তিনি জনৈক খৃষ্টীয় ধর্ম্মাচার্য্যের সহিত ধর্ম্ম বিষয়ে আলোচনা করিতেন এবং "টম্‌সন", নামক এক জন ধর্ম্মাচার্য্যের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান হন। সেই সময়ে তিনি সমগ্র বাইবেল গ্রন্থখানি অভিনিবেশের সহিত পাঠ করেন। এবং একখানি গ্রন্থে এত মূল্যবান উপদেশের সমাবেশ দেখিয়া, উহা ঈশ্বরবাণী স্থির করিয়া, খৃষ্ট ধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হন। এমন সময়ে ডাক্তার পি কে রায়ের সহিত তাঁহার ঐ বিষয়ে কথা বার্ত্তা হয়। উক্ত প্রসন্নকুমার রায় মহাশয় তখন বিলাতে দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছিলেন। তিনি বলেন যে বাইবেলের সকল কথার সত্যতা সম্বন্ধে অনেকে সন্দেহ করেন এবং ঐ বিষয়ে বহু বাদানুবাদ আছে। উহা চিন্তা ও আলোচনা করিয়া মন হইতে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের অভ্রান্ততা সম্বন্ধে বিশ্বাস দূর হয়

দেশে ফিরিয়া পিতা প্রথমে কোনও কোনও বিলাত-ফেরতের মত 'না হিন্দু, না খ্রীষ্টান্', 'না ব্রাহ্ম' ভাবেই ছিলেন। তিনি যখন ফরিদপুরে সিবিল্ সার্জ্জনের কর্ম্ম করিতেন সেই সময়ে তাঁহাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রদিগকে পরীক্ষা করিতে যাইতে হইত। এক বার তিনি যখন সেই সূত্রে ঢাকায় অবস্থান করিতে-ছিলেন, সেই সময়ে পরলোকগত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় ঢাকা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে গমন করেন। এক দিন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের বক্তৃতা শুনিয়া আসিয়া পিতার মনে হইল যে, কোনও ধর্ম্মসমাজে যোগ না দিয়া থাকা ভাল নয়। তিনি পরলোকগত দুর্গামোহন দাস মহাশয়কে সেই কথা বলিলে, দাস মহাশয় বলেন যে, যদি ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে দাস মহাশয় তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারেন। পিতা সম্মতি জ্ঞাপন করিলে, দুর্গামোহন বাবু পিতাকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যশ্রেণীভুক্ত করিয়া লয়েন। তৎকালে দুর্গামোহন দাস মহাশয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ছিলেন।

পিতা যখন মৈমনসিংহের সিবিল সার্জ্জন ছিলেন, তখন তিনি সাধারণ উপাসনা-স্থানের অভাব দেখিয়া ঐ স্থানে একটি ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাণে উদ্যোগী হয়েন এবং তাঁহারই চেষ্টায় স্থানীয় হিন্দু বন্ধুগণের নিকট হইতে চাঁদা তুলিয়া মৈমনসিংহে ব্রাহ্মসমাজের মন্দির নির্ম্মাণ করেন। পরে যশোহরে কর্ম্মকালে সেখানেও তিনি ব্রাহ্মসমাজের মন্দির প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েন এবং যশোহর ব্রাহ্মসমাজের বাৎসরিক মাঘোৎসব উপলক্ষে তিনি মানবজীবন সম্বন্ধে একটি চিন্তাশীল ও উপাদেয় প্রবন্ধ রচনা করিয়া পাঠ করেন। কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া তিনি যখন বীরভূমে তাঁহার Hill-view নামক স্বনির্ম্মিত ভবনে বাস করিতেছিলেন, সেই সময় তিনি বীরভূমের ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার কোনও গুণগ্রাহী বন্ধু ও জমিদার তাঁহার অনুরোধে কয়েক কাঠা জমি দান করেন। সে জমিতে তৎকালীন স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয়ের সাহায্যে সাড়ে তিন হাজার টাকা চাঁদা তুলিয়া সিউড়ি ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাণ করেন। পরে মিঃ কে এন্ রায় মহাশয় এই স্থানে জজ হইয়া আসিলে, ঐ মন্দির নির্ম্মাণ ও প্রতিষ্ঠাকার্য্যে পিতার সহায় হয়েন। পিতা মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের উন্নতিকামী এক জন একনিষ্ঠ ব্রাহ্ম ছিলেন।

পঁচিশ বর্ষ কাল বঙ্গদেশের নানাস্থানে সিবিল সার্জ্জনের কর্ম্মে, সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের সমুচ্চ খ্যাতি ও দুর্লভতর সুনাম সর্ব্বত্র অর্জ্জন করিয়া তিনি কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তৎকালে যদি কলিকাতায় স্বাধীন ভাবে চিকিৎসকের ব্যবসার গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে তিনি চিকিৎসক সমাজে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া হয়ত ধনকুবের হইতে পারিতেন। ঐশ্বর্য্য ও খ্যাতি অপেক্ষা ধর্ম্মচিন্তা ও আত্মোন্নতিই প্রার্থনীয় বলিয়া তিনি বরণ করিয়া লইয়া আজ ২৭ বৎসর কাল সেই নিভৃত জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি স্ত্রী, পুত্রাদি, প্রিয়জনবিয়োগজনিত বহু শোক তাপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ও তাঁহার স্বাস্থ্যও ভগ্ন হইয়াছিল। কিন্তু এ সকল সাংসারিক কঠোর পরীক্ষা তাঁহার ধর্ম্মজীবনের গতিরোধ করিতে পারে নাই। তিনি অধ্যয়ন ও ধর্ম্মচিন্তায় সংসারের মধ্যে যতদূর সম্ভব নির্লিপ্ত ভাবে শান্তিময় জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই সময়ের আধ্যাত্মিক জীবনের অনুভূতি তিনি কিয়ৎ পরিমাণে তাঁহার "ধর্ম্মজীবন" নামক গ্রন্থে (১৩২৩ সালে প্রকাশিত) লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার "ধর্ম্মজীবনের" মত গ্রন্থ বঙ্গভাষায় অধিক নাই। স্বর্গীয় অশ্বিনী কুমার দত্ত মহাশয়ের "ভক্তিযোগ" ও স্বর্গীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "জ্ঞান ও কর্ম্ম" প্রভৃতি বঙ্গসন্তানের জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত করিবার সহায়ক যে কয়খানি পুস্তক বঙ্গভাষায় আছে, আমার জনকের "ধর্ম্মজীবন" ও সেই শ্রেণীর গ্রন্থ। কিন্তু কিছু প্রভেদ আছে। গ্রন্থকার এই গ্রন্থে মানব জীবনের শ্রেষ্ঠতা, অধিকার, কর্ত্তব্য ও আশা সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে কেবল আর্য্য শাস্ত্রের উপদেশবাণী উদ্ধৃত করিয়া এবং নিজের মনীষা ও মনস্বীতার পরীক্ষা দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; তিনি সেই সকল বিষয়ে জগতের বিভিন্ন ধর্ম্মের উপদেশ-বচন ও পাশ্চাত্য দেশীয় মনীষী মহাত্মাগণের অভিমত সঙ্কলন করিয়া স্বকীয় সিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়াছেন। ইহাই এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য। প্রত্যুত আত্মা, মৃত্যু, পরলোকাদি মানবজীবনের চিরন্তন প্রহেলিকা উদ্ঘাটনের সহায়ক স্বদেশীয় ও বিদেশীয় ঋষি মনীষিগণের উক্তির এরূপ সুনির্ব্বাচিত সঙ্কলন আর কোনও পুস্তকে এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। সে হিসাবে "ধর্ম্ম জীবনে" বঙ্গ সাহিত্যে এক খানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। চিন্তাশীল গ্রন্থকারের আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে স্বর্গীয় আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় গ্রন্থকারকে লিখিয়াছিলেন "ইহাতে আপনার আধ্যাত্মিক দৃষ্টির যে পরিচয় পাইতেছি তাহা অতীব স্পৃহনীয়; অধিক কি, পাঠ করিয়া আমি নিজে আপনাকে বিশেষ উপকৃত মনে করিতেছি। অনেক স্থলে আমার ধর্ম্মভাবকে জাগাইয়াছে। অধিক আর কি বলিব? আমার প্রীতি ও শ্রদ্ধা জানিবেন।"

পিতার চরিত্রগৌরব অসাধারণ ছিল। তাঁহার মত মিষ্টভাষী, অমায়িক, সদয়, স্নেহশীল অথচ কর্ত্তব্যে অটল, উন্নতচরিত্রের আদর্শ পুরুষ বিলাত-ফেরৎ সমাজে আর কে আছেন জানি না। তাঁহার স্বভাব ও চরিত্র বিষয়ে নূতন কিছু না বলিয়া একাদশ বর্ষ পূর্ব্বে "দর্শক" পত্রে "তর্পণ" ও "বন্দনা" নামে বঙ্গদেশের বরেণ্য মহাত্মাগণের উদ্দেশে ধারাবাহিক ভাবে যে এক একটী চতুর্দ্দশপদী কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা হইতে Lieutenant Colonel Dharmadas Basu" শীর্ষক সনেটটী এ স্থানে উদ্ধৃত করিলাম।

তোমার জীবন কথা শিক্ষার বিষয়;
অনাথ, বিপন্ন, দুস্থ গৃহস্থসন্তান,
শত বাধা লঙ্ঘি', স্বীয় উন্নতি সোপান
নিজে গাঁথি 'তুমি আজ পূজ্য দেশময়;
ব্রহ্মে মতি, লক্ষ্য স্থির, কর্ত্তব্যে নির্ভয়,
ফলাফল নাহি ভাবি' হ'য়ে আগুয়ান,
জীবনের ব্রত তুমি করি' সমাধান,
শিক্ষার্থীরে দেখায়েছ আদর্শ অক্ষয়।

বিনয়ী, চরিত্রবান, ধীর, ধর্ম্মপ্রাণ,
স্নেহে সুকোমল, দৃঢ় কর্ত্তব্যের কাজে,
সহিষ্ণু, নির্লোভ, সুধী, সত্যে নিষ্ঠাবান,
বিলাতে শিক্ষিত কৃতী বাঙ্গালীর মাঝে
শাল-তরুসম তুমি উচ্চ, সারবান,
জ্ঞানে, মানে, গুণে পূজ্য ভিষক্-সমাজে।

পিতা তাঁহার "ধর্ম্ম জীবন" গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন—"ধর্ম্ম যে কি তাহা আপনার মনে চিন্তা করিতে যাইয়া দেখি বিষয়টি অতিশয় গুরুতর ও উহাতে অনেক মতভেদ আছে। ভিন্ন ভিন্ন যুগের মত দেখিয়া বিস্মিত হই। এই সময়ে মহাত্মা মেন্‌জিসের (Mengis) "History of Religion," মোক্ষ মুলারের "Natural Religion" জ্যাষ্ট্রের ("Jastrow's") "Study of Religion" মার্টিনোর Martin eau's "Study of Religion" কার্পেণ্টারের (Carpenter's) "Permanent Elements of Religion" Caird এর "Philosophy of Religion" ইত্যাদি পুস্তক পাঠ করিয়া বিশেষ উপকার লাভ করি। ক্রমে ধর্ম্মে বিশ্বাস ও এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করিবার হেতু, এই দুইটি বিষয় সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। মহাত্মা জ্যাষ্ট্রোর "Study of Religion," মহামতি মার্টিনোর "Study of Religion" আপটনের "Basis of Religious Belief" Balfour এর "Foundations of Belief" ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠ করিয়া বিশেষ উপকৃত হইলাম। বলা বাহুল্য যে সকল সময়েই উপনিষদ্, ব্রাহ্মধর্ম্ম ও গীতা সম্মুখে উপস্থিত ছিল। * * *

"পরিশেষে মানবের পার্থিব জীবনের শেষ হইলে মৃত্যুর সময় ও তৎপরে কি হয়, সেই বিষয়টী জানিতে উৎসুক হই। এই বিষয় আলোচনা করিবার সময় কঠোপনিষদ্, ব্রাহ্মধর্ম্ম, মহর্ষির ব্যাখ্যান, বাইবেল গ্রন্থ, কোরাণের ইংরাজী অনুবাদ Guather's "Endless Life", James' "Human Immortality", Osler's "Science of Immortality," Upton's "Basis of Religous Belief", পার্কারের উপদেশাবলী, Martineau's "Endevours after Christian Life" ও তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের Philosophy of Brahmoism" ইত্যাদি অনেক পুস্তক পাঠে বিশেষ উপকার লাভ করিয়াছি ও সেই সমুদায় মহাত্মাগণকে কৃতজ্ঞতার সহিত ধন্যবাদ প্রদান করি। মৃত্যু, পরলোক ও পরজীবন ইত্যাদি বিষয়টি লিখিবার সময় পারিবারিক যে সমুদায় ঘটনা ঘটে ও শোকসন্তাপের কারণ হয়, তাহা হইতেও কতক পরিমাণে অভিজ্ঞতা লাভ করি। মৃত্যুর দ্বারা প্রিয় আত্মীয়গণের সহিত চির দিনের মত বিচ্ছিন্ন হইব না, ইহলোক ও পরলোকে একই জীবন চলিতে থাকিবে, উন্নত হইতে উন্নততর জীবন লাভ হইবে, ইহাই বুঝিয়াছি। যাঁহারা উপদেশ দিয়াছেন যে, পবিত্র প্রেমের বিনাশ নাই, তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা ও প্রীতির সহিত স্মরণ করি। * * *

"আমার মত লোকে রুগ্ন শরীর ও ভগ্ন হৃদয় লইয়া যে ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধে লিখিয়া উঠিবে অনেক সময় সে বিষয়ে সংশয় জন্মিয়াছিল। ভগবানের প্রসাদে এখনও জীবন ধারণ করিতেছি, তাই সেই ভগবানেরই নাম প্রচার করিতে চেষ্টান্বিত থাকিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট এই পুস্তক প্রকাশ করিতেছি। অনেক দিন অবধিই এই দুইটী মত অবলম্বন করিয়াই জীবন যাপন করিয়া আসিতেছি।

"Let us then be up and doing
With a heart for any fate,
Still achieving still pursiung
Learn to labour and to wait."
"Let us in life and death
Boldly Thy truth declare,
And publish with our latest breath
Thy love and guardian care."

এক্ষণে এ জীবনের দিনগুলিও প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছে। নৈতিক জীবন সম্বন্ধে একখানি পুস্তক প্রণয়নের ইচ্ছা ছিল। তাহা আর হইয়া উঠিল না। সর্ব্বমঙ্গলময় বিধাতার প্রসাদে যে এই কার্য্য সম্পন্ন হইল সে জন্য তাঁহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ প্রদান করি। তিনি আশীর্ব্বাদ করুন, এই পুস্তক যে উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হইল যেন সে উদ্দেশ্য সাধন করে, ধর্ম্মোৎসাহী বন্ধুগণের ধর্ম্মজীবনের সহায়তা করে। ইহা যদি কাহারও হৃদয়ের সন্দেহ ও অবিশ্বাস দূর করিতে সক্ষম হয়, যদি কাহারও বিশ্বাস বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলেই কৃতার্থ হইব।"

তিনি আর একখানা ধর্ম্ম-গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। শেষ রোগশয্যায় শায়িত থাকিয়াও তাহার প্রকাশের বন্দোবস্ত করিবার জন্য কোনও বন্ধুকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তিনি সুস্থ হইয়া উঠিলে উক্ত বিষয়ে সাহায্য করিতে, আর যদি ইহলোক পরিত্যাগই করিতে হয়, তাহা হইলেও উহা দেখিয়া প্রকাশ করিতে বন্ধুকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। তাহার জন্য কিছু টাকাও থাকিবে বলেন।

বলা বাহুল্য আমার জনক জীবনের শেষ নিমেষপাত পর্য্যন্ত একান্ত ধর্ম্মপ্রাণ ব্রাহ্ম ছিলেন এবং ধর্ম্মপরায়ণের উচ্চাদর্শ তিনি অটল নিষ্ঠার সহিত পালন করিয়াছিলেন। তিনি জীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল ঘটনার মধ্যে জীবনদেবতার বাণী শুনিয়া চলিতে যত্নশীল ছিলেন ; এমন কি চিকিৎসাদি ব্যাপারেও, সঙ্কটজনক অবস্থায় কোন্ ঔষধ ব্যবস্থা করিবেন, প্রার্থনাপূর্ণ অন্তরে, তাঁহার আলোকে, তাহা নির্দ্ধারণ করিতেন।

মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে তাঁহার শরীর অসুস্থ হয়। সেই হেতু বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য তিনি চুঁচুড়া ত্যাগ করিয়া কিছুদিন তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র অর্থাৎ আমার মেজ দাদার নিকট রাঁচিতে থাকিবার উদ্দেশ্যে কলিকাতায় ভবানীপুরস্থ আমার বাটীতে আমার নিকট আসিয়াছিলেন। এই খানেই অকস্মাৎ হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন স্থগিত হইয়া তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

মৃত্যুকালে তিনি, তিন পুত্র, এক কন্যা, এক বিধবা পুত্রবধূ ও অনেকগুলি পৌত্র, পৌত্রী, দৌহিত্রী ও দৌহিত্রাদি রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র হেমন্ত কুমার B. A. L L. B. (Cantalb) ব্যারিষ্টার : তৃতীয় পুত্র শিশির কুমার M. A. (Cantab) বিহারে Deputy Director of Agriculture, চতুর্থ পুত্র শিরীষ কুমার ইংলণ্ডে শিক্ষাপ্রাপ্ত Mechanical and Electrical Engineer.

পিতা ধর্ম্মপ্রাণ ও কর্ম্মীর আদর্শ-জীবন যাপন করিয়া

ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়াছেন। নিশ্চয়ই তাঁহার দীর্ঘ জীবনের মহাসাধনা সিদ্ধ হইয়াছে ও তিনি ব্রহ্মচরণে আশ্রয় লাভ করিয়াছেন। তিনি পরলোক ও পরজীবন সম্বন্ধে যে বিশ্বাস হৃদয়ে পোষণ করিয়া মহাপ্রস্থান করিয়াছেন, তাঁহার সেই চির পোষিত আশা সফল হইয়াছে।

প্রাপ্ত

শোক-গাথা।

কালের বিচিত্র লীলা বুঝিবে যে সাধ্য কার,
অকালেতে কেড়ে নিল, অঞ্চলের নিধি মার?
বিধির অলঙ্ঘ্য বিধি লঙ্ঘিতে না পারে কেহ,
মানে না সে কালাকাল, জননীর পুত্র-স্নেহ।
সময় হইলে আর বিলম্ব না করে পল,
উপেক্ষিয়া চ'লে যায় আত্মীয়ের অশ্রুজল।
এত স্নেহ ভালবাসা, আদর যতন কত,
মুহূর্ত্তে মুছিয়া যায় চির জনমের মত।
স্বর্গের সুন্দর ফুল ফুটিয়া গৃহ-উদ্যানে,
আমোদিত করি' সবে বিমল সৌরভ দানে;
গিয়াছে অমর ধামে প্রস্ফুটিত 'সুপ্রকাশ'
অসার অনিত্য ফেলে বিশ্ব জননীর পাশ;
স্বর্গধামে আরামেতে ভুঞ্জ চির শান্তি সুখ,
ম'জে থাকো নিত্যোৎসবে নিরখি' মায়ের মুখ।

শ্রীচন্দ্র নাথ দাস

ব্রাহ্মসমাজ

দীক্ষা—বিগত ৭ই নবেম্বর ব্রহ্মমন্দিরে সায়ংকালীন উপাসনার পর বরিশাল-জলাবাড়ী নিবাসী শ্রীমান সুবোধচন্দ্র বিশ্বাস পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। বিগত ৫ই নবেম্বর শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন হাজরার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান গৌরহরি হাজরা কলিকাতার বাসায় পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেন আচার্য্যের কার্য্য করেন। আমরা নবদীক্ষিতদিগকে সাদরে গ্রহণ করিতেছি। করুণাময় পিতা ইঁহাদিগকে দিন দিন তাঁহার পবিত্র ধর্ম্মের পথে অগ্রসর করুন।

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ৯ই নবেম্বর কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্তা কামিনী রায়ের পুত্র মিহিরনাথ দীর্ঘকাল টাইফয়েড রোগে ভুগিয়া ২৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। মিহিরনাথ ছুটীর সময় মাতার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য বিলাত হইতে দেশে আসিয়াছিলেন।

বিগত ১০ই নবেম্বর কলিকাতা নগরীতে বাবু নরেন্দ্রনাথ চৌধুরী পুত্রদিগকে অসহায় অবস্থায় রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন।

বিগত ১৩ই নবেম্বর কলিকাতা নগরীতে পরলোকগত রায় হরকিশোর বিশ্বাস বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র বীরেন্দ্রকুমার ৩০ বৎসর বয়সে ভ্রাতাভগিনীদিগকে অসহায় অবস্থায় রাখিয়া, মস্তকে রক্তাধিক্য বশতঃ, হঠাৎ পরলোক গমন করিয়াছেন।

বিগত ১৪ই নবেম্বর লক্ষ্ণৌ নগরীতে শ্রীযুক্ত নীলমণি ধরের দ্বিতীয় পুত্র ডাক্তার নিশিকান্ত ধর বৃদ্ধ পিতা, বিধবা পত্নী ও ৪টী কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন।

গত ৪ঠা নবেম্বর পাটনা নগরীতে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রকুমার সেন গুপ্তের পরলোকগত পুত্র সুপ্রকাশের আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য, জ্যেষ্ঠা ভগিনী জীবনী পাঠ এবং শোকসন্তপ্ত পিতা প্রার্থনা করেন। পিতা এই উপলক্ষে পরলোকগত আত্মার কল্যাণার্থে নিম্নলিখিত দান করিয়াছেন:—কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, প্রচার ফণ্ড ৫০৲ সাধনাশ্রম ৫০৲, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ, প্রচার ফণ্ড ৫০৲, ঢাকা অনাথ ব্রাহ্ম পরিবার সংস্থান ধনভাণ্ডার ৩০৲, বাঁকিপুর নববিধান সমাজ ১০৲, বাঁকিপুর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ১০৲, বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ ১০৲। এতদ্ব্যতীত বাঁকিপুর রামমোহন রায় সেমিনারীর দ্বিতীয় শ্রেণীর দুটী গরীব ছাত্রের পুস্তকের সাহায্যের জন্য বার্ষিক ১০৲ টাকা আয়ের একটী স্থায়ী ফণ্ড করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

বিগত ২রা নবেম্বর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মল্লিকের মাতা মহেন্দ্রমোহিনী মল্লিকের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান ধুলিয়ান গ্রামে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী আচার্য্যের কার্য্য এবং প্রমথবাবু সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করিয়া প্রার্থনা করেন। সায়ংকালে তাঁহার কন্যা সরলা দেবীর বাটিতে নব নির্ম্মিত সমাধিস্থানে তাঁহার চিতাভস্ম স্থাপিত হয়। তাহাতেও অবিনাশবাবু আচার্য্যের কার্য্য এবং পুত্র প্রার্থনা করেন।

বিগত ৬ই নবেম্বর কলিকাতা নগরীতে পরলোকগত ডাক্তার দ্বারকানাথ রায়ের আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য ও জ্যেষ্ঠ পুত্র জীবনী পাঠ করেন। এই উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ২৫০৲ ভবানীপুর সম্মিলন ব্রাহ্মসমাজে ২৫০৲ সাধনাশ্রমে ২৫০ প্রদত্ত হইয়াছে

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চিরশান্তিতে রাখুন ও আত্মীয়স্বজনদেরশোকসন্তপ্ত হৃদয়ে শান্তনা বিধান করুন

শুভ বিবাহ—বিগত ৬ই নবেম্বর কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রকুমার ঘোষের কন্যা ও রায় শশিভূষণ মজুমদার বাহাদুরের কন্যারূপে বর্দ্ধিতা কল্যাণীয়া সুজাতা ও শ্রীযুক্ত প্রিয় নাথ ভট্টাচার্য্যের পুত্র শ্রীমান অমরনাথের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন।

প্রেমময় পিতা নবদম্পতিকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

দান—শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ কন্যার বিবাহোপলক্ষে নিম্নলিখিত দান করিয়াছেন—সিটি কলেজ দরিদ্র ভাণ্ডার ২৫৲, উপাসক মণ্ডলীর পাখা মেরামত ২০৲, সাধারণ বিভাগে ১০৲, প্রচার বিভাগে ১০৲, সাধনাশ্রমে ৫৲ ও মেদিনীপুর বন্যাপ্লাবন ফণ্ডে ৫৲ মোট ৭৫৲।

বর্ম্মাবাসী শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ দাস কন্যার জন্মোৎসব উপলক্ষে দরিদ্র ভাণ্ডারে ৫৲ দান করিয়াছেন।

পরলোকগত বাবু হরনাথ দাসের বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে পুত্র শান্তিপ্রিয় দাস একটী রোগীকে ১০৲ ও তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী সুপ্রভা দাস সাধনাশ্রমে ১৲ দান করিয়াছেন।

শ্রীমান শচীন্দ্রনাথ মল্লিক পিতা পরলোকগত বাবু বেচারাম মল্লিকের বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে পিতার নামীয় স্থায়ী ভাণ্ডারে ১০০৲ টাকার একখানা কাগজ, প্রচার বিভাগে ২৲ নবদ্বীপ স্মৃতি ভাণ্ডারে ২৲ বন্যাপীড়িতদের সাহায্যের জন্য ২৲ ও বারীবন ব্রাহ্মসমাজে ২৲ দান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র লাল সরকার কন্যার বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে সাধানাশ্রমে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

এ সকল দান সার্থক হউক।

প্রচার—শ্রীযুক্ত বরদা প্রসন্ন রায় ডাক্তার আর সি নাগের বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে মধুপুর যাইয়া আচার্য্যের কার্য্য করেন। এবং তথায় মিসেস্ নাগের গৃহে কয়েক দিন বাস করিয়া উপাসনা ও সঙ্গীতাদি করেন; একদিন কথকতা করেন। মধুপুর হইতে গিরিডি যাইয়া তিনি ডাক্তার ভি রায়ের ভবনে এক দিন উপাসনা করেন ও এক দিন মন্দিরে "বুদ্ধের সাধনা" সম্বন্ধে কথকতা করেন। গিরিডি হইতে ভাগলপুর যাইয়া তথাকার ব্রহ্মমন্দিরে এক দিন আচার্য্যের কার্য্য করেন। তৎপরদিন ২৭ শে সেপ্টেম্বর মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ ও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার জন্য শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ভবনে সভা হয়। শ্রীযুক্ত বরদা প্রসন্ন রায় উপাসনা করেন; তৎপরে তিনি সভাপতির কার্য্য করেন। শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সান্যাল ও সভাপতি বক্তৃতা করেন। ভাগলপুর হইতে রামপুরহাট গমন করেন। সেখানে একটী বিরোধ মিমাংসা করিবার জন্য একদিন চেষ্টা করেন এবং একটি ব্রহ্মোপাসনা করেন। রামপুরহাট হইতে বীরভূম গমন করেন। শ্রীযুক্ত কালিদাস সরকারের বাটিতে অবস্থিতি করিয়া দুই দিন পারিবারিক উপাসনা করেন। বীরভূম ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য একটি কার্য্যনির্ব্বাহক সভা স্থাপন করেন। বালিকা স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী মিসেস সুজাতা দাস সম্পাদিকা নিযুক্ত হন। কলিকাতায় আসিয়া বিক্রমপুর বেজগাঁও ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে গমন করেন; তথায় সঙ্গীত উপাসনা কথকতা প্রভৃতি করিয়া, কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া, পুনরায় ভাগলপুর গমন করেন। ভাগলপুর জেলায় রামচন্দ্রপুর প্রায় ৮. দিন থাকিয়া পারিবারিক সঙ্গীতাদি করেন। ভাগলপুর একটী আলোচনা সভায় সমবেত উপাসনা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। বীরভূম ব্রাহ্ম সমাজের পার্শ্বস্থ একটী খাদ গভীর হওয়ায় মন্দিরের একটী কোণ ভাঙ্গিয়া পড়িবার সম্ভাবনা হয়। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ কুমার মিত্র শ্রীযুক্ত বরদা প্রসন্ন রায়ের নিকট তাহা মেরামতের জন্য ৬৲ টাকা শ্রীযুক্ত বরদা প্রসন্ন রায়ের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। এই টাকায় উক্ত স্থান মেরামত হইবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

প্রেমিকবন্ধু নবদ্বীপচন্দ্র দাসের জীবন-বৃত্তান্ত—শ্রীযুক্ত বঙ্কবিহারী কর প্রণীত; মূল্য ১৲। ইহাতে গ্রন্থকার লিখিত জীবন বৃত্তান্ত ব্যতীত শ্রীযুক্ত শশি ভূষণ দত্ত, শ্রীযুক্তা সুবালা আচার্য্য, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ, শ্রীযুক্ত অমৃত লাল গুপ্ত, শ্রীযুক্ত ললিত মোহন দাস, শ্রীযুক্ত উমেশ চন্দ্র নাগ, শ্রীযুক্ত সরোজেন্দ্র নাথ রায়, শ্রীযুক্ত সুবিমল রায়, শ্রীযুক্ত সুখময় দাস গুপ্ত, শ্রীযুক্তা সুখদা নাগ, জনৈক অনুগত শিষ্য, শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ কুমার মিত্র, শ্রী যুক্ত চন্দ্র নাথ দাস ও শ্রীযুক্ত অমর চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, লিখিত শ্রদ্ধাঞ্জলি, কতিপয় উপদেশ হইতে সংক্ষিপ্ত সংগ্রহ ও সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সভাপতি রূপে প্রদত্ত অভিভাষণ প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থকার নিবেদনে বলিয়াছেন—"ইহাকে সম্পূর্ণ জীবন চরিত না বলিয়া স্বর্গীয় মহাত্মার সেবার বিবরণের একটি অধ্যায় বলিলেই ঠিক হয়। ভবিষ্যতে যদি কোন যোগ্য ব্যক্তি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জীবনী প্রণয়ন করেন, ইহাদ্বারা তাঁহার কিঞ্চিৎ সহায়তা হইবে।" কথাগুলি সত্য। তাঁহার একখানা পূর্ণতর ও বিস্তৃততর জীবনী প্রকাশিত হইলেই তাঁহার প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন হইত এবং তাহা পাঠে সকলে অধিকতর উপকৃত হইত। কিন্তু বন্ধুবান্ধবদের সকলের চেষ্টা যত্ন ব্যতীত সেরূপ জীবনীর উপাদান সংগৃহীত হইতে পারে না। বাহ্যিক আড়ম্বর হেতু সংবাদপত্র-স্তম্ভে স্থান লাভ করে, জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এরূপ ঘটনার বিশেষ অভাবই তাঁহার জীবনে দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং জীবনী-লেখকের পক্ষে তাঁহার কার্য্যাবলী সংগ্রহ করা সহজ নয়। কিন্তু তাঁহার জীবনে যে চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ ঘটনাবলীর অভাব আছে, এরূপ বলা যায় না। তাঁহার সুদীর্ঘ নীরব সেবা ও নানাস্থানব্যাপী বিবিধ প্রতিকূলতায় পূর্ণ সুবিস্তীর্ণ প্রচারযাত্রা এত ঘটনাবাহুল্যে পূর্ণ যে উহা সংগৃহীত হইলে একখানা বৃহৎ সুপাঠ্য ও শিক্ষাপ্রদ গ্রন্থ সহজেই রচিত হইতে পারে। কিন্তু সে সকল ঘটনা ও আখ্যায়িকা নানাস্থানের বন্ধু বান্ধবগণ পৃথক পৃথক ভাবে লিখিয়া না পাঠাইলে, কোনও প্রকারেই সংগৃহীত হইতে পারে না। দুঃখের বিষয়, ইহা যে বন্ধু বান্ধবদের তাঁহার প্রতি শেষ কর্ত্তব্য-সম্পাদনের একটা প্রধান অঙ্গ, কাহারও প্রাণে সে ভাব জাগে নাই। সে ভাব জাগিলে অনেকেই নানা ঘটনা পত্রিকাদিতেও প্রকাশ করিতে পারিতেন। সে যাহা হউক, বঙ্ক বাবু এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া শুধু তাঁহার ব্যক্তিগত ঋণ শোধ করিতেই সচেষ্ট হন নাই, ব্রাহ্মসমাজকেও তাহার ঋণশোধে সহায়তা করিয়াছেন। এ জন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। পুস্তকখানা পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ সুখী হইয়াছি। আশা করি সকলেই ইহা পাঠে উপকৃত বোধ ও আনন্দ লাভ করিবেন। বন্ধু বান্ধবগণ সকলেই পুস্তক খানা সাদরে নিজেদের নিকট রাখিতে ও অপরের নিকট প্রচার করিতে আগ্রহান্বিত হইবেন বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। ইহা পাঠ করিয়া যদি তাঁহারা তাঁহাদের জ্ঞাত ঘটনাবলী লিখিয়া পাঠাইতে অগ্রসর হন, তবে অচিরেই একখানা বিস্তৃত জীবনী প্রকাশও সম্ভবপর হইবে। আমরা ইহা সকল গৃহে দেখিতে ইচ্ছা করি।

ব্রহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় দ্বারা ১১ই অগ্রহায়ণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—বরদাকান্ত বসু, বি-এ

Registered NO 56

অসতো মা সদগময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৬ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৪৯ম ভাগ।	১৬ই অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৩৩, ১৮৪৮ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯৭	প্রতি সংখ্যার মূল্য ⁄০
১৬শ সংখ্যা।	2nd December, 1926.	অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

হে জীবনের অদ্বিতীয় প্রভু মঙ্গলময় বিধাতা, তুমিই আমাদিগকে এ জীবন দিয়াছ, সকলকে এখানে রক্ষা ও পালন করিতেছ, এবং যথাসময়ে ইহ সংসার হইতে লইয়া যাইতেছ। কাহার দ্বারা তোমার কি কার্য্য সাধন করিবে, কাহাকে কত দিন এখানে রাখিবে, আমরা কিছুই জানি না। কাহার পক্ষে কখন কোন্ লোকে থাকা কল্যাণকর, বুঝি না। তাই অনেক সময়ই আমরা তোমার কার্য্যের মর্ম্ম না বুঝিয়া তোমার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ করি, তোমার মঙ্গল ভাবে স্থির বিশ্বাস রাখিতে পারি না। আমাদের জ্ঞান যে কত ক্ষুদ্র ও অপূর্ণ, আমাদের মঙ্গল কোথায় তাহা বুঝিতে না পারিয়া যে আমরা অনেক সময়ই অমঙ্গলকে মঙ্গল বলিয়া বরণ করি, সে কথা আমাদের স্মরণে থাকে না। একমাত্র তুমিই তোমার অসীম জ্ঞানে জান কোথায় আমাদের প্রকৃত কল্যাণ। এক মাত্র তুমিই তোমার অসীম প্রেমে সকল সময়ে ও সকল অবস্থায় আমাদেরই মঙ্গল চাও। আমরা ত মোহে মুগ্ধ হইয়া আপাত সুখের জন্য কত সময় কল্যাণের পরিবর্ত্তে অকল্যাণের পশ্চাতেই ছুটিয়া বেড়াই, তাহার জন্যই ব্যাকুল হই। তোমার অসীম প্রেম ও মঙ্গল ভাবের এবং অনন্ত জ্ঞানের কথা ভুলিয়া, তোমার ব্যবস্থার বিচার করিতে যাইয়াই আমরা ভ্রমে পতিত হই, আমাদের মনোমত ব্যবস্থা না হইলেই—বিশেষতঃ আমাদের আত্মীয় স্বজনকে, স্নেহের জনদিগকে আমাদিগের নিকট হইতে পরলোকে হইয়া গেলে—আমরা বিদ্রোহী হইয়া উঠি। ইহলোক ও পরলোক উভয়ই যে তোমার মধ্যে, কিছুতেই যে প্রেমের যোগ ছিন্ন হয় না, আমরা পরস্পরকে হারাই না, তাহা তুমি যখন কৃপা করিয়া অনুভব করিতে দেও, তখন আর প্রিয়জনের মৃত্যু আমাদিগকে অভিভূত করিতে পারে না, মৃত্যু যে অমৃতেরই সোপান, তোমার প্রেমেরই ব্যবস্থা, সে তত্ত্ব সহজে বুঝিতে পারি। হে করুণাময় পিতা, এই মৃত্যুময় সংসারের মধ্যে তুমিই যে আমাদের চির সহায় ও আশ্রয়, চির সুহৃদ্ ও বন্ধু হইয়া রহিয়াছ, নিয়ত সকলের মঙ্গল সাধন করিতেছ, তাহা আমাদিগকে বুঝিতে দেও। সকল শোকতাপের মধ্যে তোমার মঙ্গল রূপ দেখিতে সমর্থ কর, তোমার সকল ব্যবস্থাকে অবনত মস্তকে বহন করিয়া লইবার শক্তি দেও! তোমার ইচ্ছাই আমাদের জীবনে জয়যুক্ত হউক।

নিবেদন।

অপরাধে—অপরাধ যদি ক'রে থাক, তোমার কাজ তা স্বীকার করা, তার জন্য অনুতপ্ত হওয়া, ক্রন্দন করা, ঈশ্বরের চরণে প্রার্থনা করা। কোন্ অপরাধে কতটা শাস্তি হবে, কিরূপ বিধান হবে, তা বল্‌বার তোমার কাজ নয়। গুরু দণ্ড কি লঘু দণ্ড, তাহা তিনি বুঝবেন। কোন্ পথে কোন্ ভাবে, তোমাকে শুদ্ধ ক'রে নিবেন, তাহা তিনি জানেন। তোমার কাজ সম্পূর্ণ রূপে আত্মসমর্পণ করা, অকপটে সমস্ত দোষ ক্রটি স্বীকার করা। একজন অন্তর্য্যামি আছেন, তিনি অন্তরে থেকে সব দেখেন। লোকের রাজদ্বারে যে দণ্ড হয় তার বিচার করে; অপরাধের সঙ্গে দণ্ডের তুলনা করে; তাদের কথা শুনো না। তুমি এসেছ বিশ্বপতির নিকট; তুমি এসেছ শুদ্ধ হ'তে; তুমি এসেছ তোমার সমস্ত মলিনতা ধৌত কর্‌তে। তুমি বুক চিরিয়া সব বে'র ক'রে দাও; একটি কথা গোপন ক'রো না। কত দণ্ড হওয়া উচিত, কিরূপ বিচার হওয়া

উচিত, তার ব্যবস্থা তুমি ক'রো না। তিনি সব জানেন। তাঁর উপর নির্ভর কর্‌তে পার না? তাঁর চরণে ক্রন্দন কর্‌তে পার না? তিনি যে দণ্ড বিধান করেন, যে ব্যবস্থা করেন, তা বিনা আপত্তিতে গ্রহণ কর্‌তে পার না? তাঁর প্রেমে নির্ভর কর্‌তে পার না?

কে সাক্ষ্য দিবে?—আজ দেখ্‌ছি, সকলেই চ'লে গেল! তোমার প্রেমের সাক্ষ্য দিতে, করুণার মহিমা বল্‌তে কেহ রইল না! যাঁদের তুমি ডেকেছিলে, পঙ্ক হ'তে উদ্ধার ক'রেছিলে, যাঁরা তোমার নামের নিশান ল'য়ে দাঁড়িয়েছিল, নিরাশ্রয়ে আশ্রয় পেয়ে, নিরাশায় আশা পেয়ে, জেগে উঠেছিল, আজ তাঁরা ধন জন পদ পেয়ে, নিশান রেখে চ'লে গেল, তোমার আশ্রয় ছেড়ে ধন জনের উপর নির্ভর কর্‌লো! তোমার নামের মহিমা কীর্ত্তন কর্‌লো না, তোমার প্রেমের সাক্ষ্য দিল না। যাঁরা অজ্ঞানান্ধকারে প'ড়ে ছিল, সংসারে কত হীন হ'য়ে ছিল—শিক্ষা ছিল না, স্বাধীনতা ছিল না, মুখ ফুটে কথা বল্‌বার অধিকার ছিল না—তুমি তাদের চোখ ফুটালে, অন্ধকারে আলোক দিলে, শত শৃঙ্খল ভেঙ্গে দিলে! আজ তারাও যে তোমাকে ভু'লে গেল! আজ তারাও যে তোমার সাক্ষ্য দিতে রইল না! আজ তারাও যে সংসারের কোলাহলে যেয়ে ডুব্‌লো। তবে আয় তোরা গরীব, তোরা মূর্খ, লোকে যাদের পায়ে ঠেলে দিয়েছে, তোরা আয়, তোরা এসে তাঁর প্রেমের সাক্ষ্য দে; তাঁর চরণে আশ্রয় নে, তাঁর প্রেমের গান গা; তাঁর নাম কীর্ত্তন কর্; তাঁর নিশান ধর্। আজ তোরাই তাঁর প্রেমের সাক্ষ্য দিবি।

তাঁতে সব—তাঁর সন্ধান কর, তাঁর নাম কর; তাঁকে পেলে সবই পাবে। তুমি ত পাপে ও তাপে ক্লেশ পেতেছ! তুমি ত সুখ, শান্তি ও আনন্দ চাও! তুমি ত পথ খুঁজে পাও না! তুমি ত সুখ শান্তি ও আনন্দের আশায় কত দিকে ছুটাছুটি কচ্ছো! কত ডাল ধর, তা ভেঙ্গে যায়; কত আকাশ-কুসুম রচনা কর, তা শূন্যে মিলিয়ে যায়। একবার তাঁকে ধর দেখি! তিনি যে সুখস্বরূপ, তৃপ্তিহেতু; তাঁতে যে সবই আছে। তোমার প্রিয়জনসকল যাঁরা ওপারে চ'লে গেছেন, কত ক্রন্দন কচ্ছো তাদের জন্য! তোমার আপনার লোকসকল, যারা তোমার প্রেম, স্নেহ বুঝ্‌ল না, দূরে চ'লে গেল, কোথায় গেল খুঁজে পাও না? কত বেদনা ল'য়ে আছ? তাঁকে ধর; প্রাণে তাঁকে বরণ ক'রে লও। দেখ্‌বে তাঁর ভিতরে সব রয়েছে; একটিও হারায় নাই। ইহলোকেই থাকুক, পরলোকেই থাকুক, কোথায় যাবে তারা? ঐ প্রভুর মধ্যেই সবাইকে ফিরিয়ে পাবে। তোমার অর্থ নাই, সম্পদ্ নাই, মান প্রতিপত্তি নাই? তোমার কষ্ট ও ক্লেশ? ভয় কি? অতুল সম্পদ্ তাঁরই চরণে। তিনি যে পরম ধন। তাঁকে পেলে অন্য ধনের আকাঙ্ক্ষা থাকে না; তাঁকে পেলে পদ মান খ্যাতির সুখ তুচ্ছ হ'য়ে যায়। তাঁকে ধর; হৃদয়ে তাঁকে বসাও; তাঁর নাম গান কর। তাঁকে পেলে সবই পাওয়া হবে। এ আনন্দের তুলনা নাই।

সম্পাদকীয়

মৃত্যুর অন্ধকার—জন্ম ও মৃত্যু উভয়ই প্রহেলিকাময়। কোথা হইতে কেন মানবাত্মা এ সংসারে আসে এবং কোথায় কেনই বা আবার চলিয়া যায়, এ প্রশ্ন চিরদিন মানুষের মনকে আন্দোলিত করিতেছে। ইহার একটা সুনিশ্চিত মীমাংসা যে কেহ কোন দিন করিতে পারিয়াছে বা ভবিষ্যতে পারিবে, তাহা বলা যায় না। সকল দেশের ও সকল কালের মানুষই আপনার বুদ্ধি বিচারমতে একটা মীমাংসা করিয়া মনকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে সকল সংশয় যে চিরদিনের তরে নিরাকৃত হইয়াছে, অথবা ভবিষ্যতে যে তাহার কোনও সম্ভাবনা আছে, এরূপ কোনও প্রমাণ নাই, বরং তদ্বিরুদ্ধ প্রমাণই যথেষ্ট প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার মধ্যে জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুর রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্যই মানুষ অধিকতর ব্যস্ত। জন্ম অজ্ঞাত রাজ্য হইতে আসিলেও আমাদেরই মধ্যে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আপনার বর্ত্তমানতাতেই আমাদিগকে মুগ্ধ করে, আনন্দ প্রদান করে, নানা প্রকার সেবার দাবী করিয়া আমাদিগকে বিবিধ কর্ম্মে নিযুক্ত রাখে, অতীতের চিন্তা করিবার আর অধিক অবসর রাখে না। যাহা পাইয়াছি তাহা লইয়াই আমরা বেশ তৃপ্ত থাকি, কোথা হইতে কি প্রকারে কেন পাইলাম, তাহার বৃথা চিন্তায় বিব্রত হইবার বিশেষ কোনও কারণ দেখি না। কিন্তু যাহা কাছে ছিল, অতি প্রিয় ছিল, মৃত্যু যখন তাহাকে চিরদিনের জন্য আমাদের নিকট হইতে দূরে অদৃশ্য লোকে লইয়া যায়, তখন চারিদিক যে অন্ধকারময় দেখিব, হৃদয় যে হাহাকার করিয়া উঠিবে, প্রিয়জন কোথায় গেল, তাহার কি হইল, সে প্রশ্ন যে অতি তীব্রভাবেই মনকে আলোড়িত করিবে, এ কথা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এখানে আর বর্ত্তমান লইয়া ভুলিয়া থাকিবার যখন কিছুই থাকে না, তখন মন স্বভাবতঃই ভবিষ্যতে অন্ধকারের মধ্যে হাতড়াইতে অগ্রসর হয়, এবং যে কোনওরূপ একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া হৃদয়কে যথাসাধ্য শান্ত করে, সান্ত্বনা দেয়। কিন্তু প্রেম ভালবাসার জনকে নিকটে পাইবার যে আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে জাগায়, তাহার পরিতৃপ্তির জন্য নানা সিদ্ধান্ত ও কল্পনা করিয়াও যখন মানুষ একটা স্থায়ী নিশ্চিত ভূমি পায় না, তখন তাহারা তাহাকে একেবারে নির্ব্বাপিত করিবার জন্য উহাকে ভুলিতেই চেষ্টা করে এবং তাহার একান্ত বিলোপ ব্যতীত সে সম্ভাবনা নাই দেখিয়া উক্ত প্রকার সিদ্ধান্তেও উপস্থিত হয়। যে যেরূপ ভাবেই মনকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করুক না কেন, সকলের নিকটই সকল অবস্থায় মৃত্যু ভীষণ দুঃখ ও ভয়ের কারণ রূপেই উপস্থিত হইয়া আসিয়াছে। জন্মের ন্যায় তাহা কখনও সাধারণতঃ বরণীয় বলিয়া গৃহীত হয় নাই। অবশ্য অবস্থাবিশেষে কখন কোন কোন ব্যক্তির নিকট জীবন অপেক্ষা মৃত্যু বরণীয় হইয়াছে, ধর্ম্মবীরগণ

সত্য ও ধর্ম্মের জন্য, আপনাদের বিশ্বাস রক্ষার জন্য, অথবা উন্নত প্রেমের দ্বারা চালিত হইয়া অপরের উদ্ধারের জন্য, অম্লান চিত্তে,—কতকটা আনন্দের সহিতও—মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছেন সত্য; কিন্তু কখনও সাধারণ ভাবে মৃত্যু একটা বাঞ্ছনীয় ও আনন্দজনক অবস্থা বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। নানা দুঃখ বিপদে, জীবন যখন নিতান্ত ভারবহ বোধ হয়, তখন সাময়িক আবেগে মৃত্যু প্রার্থনীয় মনে হইতে পারে; কিন্তু সত্যই যখন মৃত্যু নিকটে উপস্থিত হয়, তখন আর কেহ তাহাকে আদরে বরণ করিয়া লইতে চাহে না, তাহা হইতে দূরে পলায়ন করিতেই চেষ্টা করে। "মৃত্যু ও বৃদ্ধ মানুষ" সম্বন্ধীয় ঈশপের গল্পের মূলে একটা সত্য লুক্কায়িত রহিয়াছে—উহাতে মানব প্রকৃতি সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান সূচিত হইতেছে, মানবের চিরন্তন অভিজ্ঞতার উপর উহা প্রতিষ্ঠিত। মৃত্যু অনিবার্য্য জানিয়াও উহাকে পরিহার করিবার জন্যই মানুষ সর্ব্বদা চেষ্টা করে। এখানকার নিত্য অভ্যস্ত ও সুনিশ্চিত সুখ সুবিধা ছাড়িয়া, অজ্ঞাত অনিশ্চিতের পশ্চাতে ছুটিবার কোনও আকর্ষণ না থাকা, ইহার একটা কারণ হইতে পারে। কিন্তু ভয়ই যে প্রধান কারণ তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এই দেশে দার্শনিক চিন্তাটা বেশী বিকাশ প্রাপ্ত হওয়াতে, মানুষ যখন দেখিল জন্মিলেই মরিতে হয়, মৃত্যুর হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার কোন উপায় নাই, তখন এই সংসারে জন্মটাই তদানুষঙ্গিক জরা ব্যাধি মৃত্যুর মূল কারণ মনে করিয়া, যাহাতে এখানে আর জন্মিতে না হয়, তাহার জন্যই তাহারা আকাঙ্ক্ষিত ও চেষ্টিত হইল। আর এ সকল দুঃখকে পাপেরই অবশ্যম্ভাবী ফল বা শাস্তি ভাবিয়া, এই সংসারটাকে কর্ম্মফল ভোগের ক্ষেত্র বা কারাগার বলিয়াই তাহারা নির্দ্ধারণ করিল এবং যাহাতে এখানে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে না হয়, তাহাই তাহাদের চরম লক্ষ্য হইল। কিন্তু যদিও ইহাতে এই জীবনটা আর আকর্ষণের বস্তু রহিল না, ইহা হইতে মুক্তিটাই আকাঙ্ক্ষণীয় হইল, তথাপি ইহাতে মৃত্যুর বিভীষিকা কিছুমাত্র হ্রাস প্রাপ্ত হইল না। মৃত্যুটা কোনও প্রকারে বাঞ্ছনীয় হইয়া উঠিল না—কেন না মৃত্যু ঘটিলেই যে পুনর্জন্ম হইতে এবং তদানুষঙ্গিক সকল দুঃখতাপ হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে, তাহার কোনই নিশ্চয়তা নাই; বরং আরও হীনতর এবং অধিকতর দুঃখজনক জন্ম প্রাপ্ত হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে। জীবন ও সংসার সম্বন্ধে এই ভ্রান্ত ধারণা মানবের প্রাণে সাধু-জীবন যাপনের ও ধর্ম্মসাধনের চেষ্টা যত্ন আকাঙ্ক্ষাকে কিয়ৎ পরিমাণে প্রবল করিলেও, মৃত্যু সম্বন্ধীয় দৃষ্টিকে কিছুই পরিবর্ত্তিত করিতে পারে না। ইহা ধর্ম্মসাধনকেও যে অনেকটা বিকৃত করিয়া ফেলে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু উহা আমাদের অদ্যকার আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্গত নহে। তবে জীবন এবং এই সংসার ও পরকাল সম্বন্ধীয় ধারণার দ্বারা যে মৃত্যু বিষয়ক দৃষ্টি বিশেষ প্রকারে প্রভাবান্বিত হয় এবং তাহার উপর যে ধর্ম্ম-সাধন প্রধান ভাবে নির্ভর করে, তাহা স্মরণে রাখিতে হইবে। বিদেশীয় কোনও কোনও দার্শনিক পুনর্জন্মে বিশ্বাস স্থাপন করিলেও, ইউরোপ খণ্ডে বা খৃষ্টীয় ও মুসলমান জগতে উহা স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। শেষ বিচার-দিনে সকলে বিচারিত হইয়া দণ্ড ও পুরস্কার পাইবে এবং মৃত্যুর পর হইতে শেষ বিচার-দিনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অনিশ্চিত অবস্থায় অবস্থিতি করিবে, তাঁহাদের এই প্রকার বিশ্বাসও মৃত্যুর বিভীষিকাকে কিছুমাত্র হ্রাস করে নাই। তাহারা এই জীবন ও সংসার সম্বন্ধে সূক্ষ্ম বিচারে প্রবৃত্ত না হইয়া, সাধারণ দৃষ্টিতে যেরূপ দেখা যায় সেই ভাবেই দেখিয়াছেন ও ব্যবহার করিয়াছেন, এবং তৎসঙ্গে মৃত্যুকেও একই সাধারণ দৃষ্টি ছাড়া অন্য কোনও ভাবে দেখেন নাই। বর্ত্তমানে চিন্তা ও জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সংসার ও জীবন সম্বন্ধে পূর্ব্ব ধারণা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং তাহার আলোকে মৃত্যুকেও আমরা ভিন্ন চক্ষুতে দেখিতে শিখিয়াছি।

বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক গবেষণা নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণ করিয়াছে, সমস্ত জগতের মূলে একটা উন্নতি ও বিকাশের বিধিই কার্য্য করিতেছে, এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় ব্যবস্থা, তাহারই অনুকূল,—সমস্তই উন্নতি ও কল্যাণের পথেই ধাবিত হইতেছে, সকলের মধ্যেই মঙ্গল ও আনন্দ নিহিত রহিয়াছে, আপাত দুঃখ যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও ভবিষ্যৎ আনন্দ ও কল্যাণেরই জনক, একমাত্র উক্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই উহার ব্যবস্থা ও প্রয়োজনীয়তা। পূর্ব্বে যেখানে মহাদুঃখ ক্লেশ ও নিষ্ঠুরতা কল্পনা করা হইত, এখন সেখানে আর তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহার মধ্যেও দুঃখ ক্লেশ লাঘবেরই ব্যবস্থা রহিয়াছে। স্বাভাবিক মৃত্যুটাকে পূর্ব্বে যেমন ক্লেশকর বলিয়া মনে করা হইত, এখন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে বাস্তবিক উহা সেরূপ ক্লেশকর নয়, বরং উহা কিছু-মাত্রই কষ্টদায়ক নয়—সে সময় স্বাভাবিক নিয়মেই কোনও যন্ত্রণা থাকে না। এমন কি হিংস্র জন্তুর আক্রমণটা দূর হইতে যেরূপ ভীষণ ক্লেশের কারণ বলিয়া অনুমিত হয়, প্রকৃত পক্ষে উহা সেরূপ নহে। এ সম্বন্ধে সিংহের দংষ্ট্রাঘাতের অনুভূতি বিষয়ক ডাক্তার লিভিংষ্টোনের সাক্ষ্যের কথা অনেকেই জানেন। বহু প্রকার পরীক্ষা দ্বারাও এই সত্যই প্রমাণিত হইয়াছে। সে যাহা হউক, জীব জগতে ক্রমবিকাশের ইতিহাস খুঁজিতে গেলে যে সর্ব্বত্রই উন্নতির স্তরে পৌঁছিবার জন্য মৃত্যুর মধ্য দিয়া যাইবার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই প্রধান লক্ষ্য করিবার বিষয়; তাহাতে কিছু দুঃখ ক্লেশ থাকিলেও বিশেষ কিছু ক্ষতি নাই, কল্যাণের তুলনায় তাহা গণনীয়ই নয়। প্রত্যেক স্তরের জীব সম্বন্ধেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, উন্নততর স্তরে যাইতে হইলেই পূর্ব্ব দেহ পরিত্যাগ করিতে হয়—অথবা উহা উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এরূপ অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হয়, যখন তাহার পূর্ব্ব দেহ আর উন্নতির সহায়তা না করিয়া ব্যাঘাতই উপস্থিত করে, তাহার পক্ষে পূর্ব্ব দেহের ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকা সম্ভবপর হয় না। তখন তাহাকে নূতন উন্নত অবস্থার উপযোগী এমন দেহই গ্রহণ করিতে হয়, যাহাতে তাহার উন্নতি অব্যাহত ভাবে চলিতে পারে। নিম্নতম স্তরে দেহ একেবারেই জটিলতাশূন্য, নিতান্তই সরল, আর উচ্চতম স্তরে তাহা কত জটিল!

এই জাতিগত বিকাশের ইতিহাস পরিত্যাগ করিয়া, যদি আমরা প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবনের কথা আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হই, তবে সেখানেও দেখিতে পাইব দেহ তাহার যতই

প্রয়োজনসাধক হউক না কেন, তাহার জীবনে এরূপ অবস্থা উপস্থিত হয়, যখন তাহার দ্বারা আর প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না, অথবা যখন তাহা তাহার কার্য্যে সহায়তা না করিয়া ব্যাঘাতই উৎপন্ন করে। দীর্ঘকাল ব্যবহারের জন্যই হউক, অথবা ঠিক ভাবে ব্যবহার না করিবার হেতুই হউক, দেহযন্ত্র যখন বিকল হইয়া যায়, তখন উহার বৃথা ভার বহন করিয়া যে কোনই লাভ নাই, বরং যথেষ্ট ক্ষতিই আছে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এই বিকলতা বার্দ্ধক্য বা রোগবশতঃ ঘটিতে পারে, কোন আকস্মিক ঘটনা হইতেও উৎপন্ন হইতে পারে। যে কারণেই ঘটুক না কেন, এরূপ অবস্থা যে ঘটে তাহা আমরা সর্ব্বদাই চারিদিকে দেখিতে পাই। তখন দুঃখ যন্ত্রণার দিক দিয়া দেখিলেও দেখিতে পাওয়া যায় মৃত্যুই শ্রেয়ঃ, দেহপরিত্যাগই সকল ক্লেশ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবার একমাত্র উপায়। বালক বৃদ্ধ যুবা সকলের পক্ষেই এরূপ অবস্থা উপস্থিত হইতে পারে। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে কাহারও মৃত্যুকেই আমরা অসাময়িক বলিতে পারি না। অকাল মৃত্যু কাহারও পক্ষেই ঘটে না। কিন্তু সকল ক্ষেত্রে যে আমরা মৃত্যুর এরূপ অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয়তা দেখিতে পাই, তাহা নহে। বরং অনেক স্থানে ইহার বিপরীত অবস্থাও দেখিতে পাই। কত সময় দেখা যায় যে, অতি রুগ্ন ভগ্নদেহ লইয়াও কেহ বাঁচিয়া আছে, অশেষ প্রকার কষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, অপরদিকে অন্য কেহ, আমাদের বিবেচনা অনুসারে, সুস্থ সবল কর্ম্মক্ষম দেহ থাকিতেই সামান্য অসুখে, বিশেষ কোনও যন্ত্রণা না থাকা সত্বেও, হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে—একজন মৃত্যুর দ্বার হইতে আশ্চর্য্যভাবে ফিরিয়া আসিতেছে, আর একজন বহুদূর হইতেই যেন অকস্মাৎ মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতেছে। ইহার রহস্য ভেদ করা কঠিন। তবে আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, দেহ, যন্ত্র সম্বন্ধে আমাদের এরূপ পূর্ণ জ্ঞান নাই যাহাতে আমরা নিশ্চিত রূপে বলিতে পারি কি হইলে উহা বিকল ও অচল হয়, আর কি হইলে হয় না। এবিষয়ে আমাদের জ্ঞানের যথেষ্ট অভাবই রহিয়াছে; সাধারণ লোকের কথা দূরে থাকুক, শারীর বিদ্যায় বিশেষ অভিজ্ঞ পণ্ডিতগণেরও যথেষ্ট অজ্ঞতা আছে দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং এরূপ স্থলে আমাদের অপূর্ণ জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া কোনও বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তে উপনীত না হইয়া, নিশ্চয়ই উহার মূলে কোনও প্রকৃষ্ট কারণ রহিয়াছে এরূপ মীমাংসা করাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত হইবে। কাজেই যেরূপ সময়ে যেরূপ অবস্থায়ই মৃত্যু আসুক না কেন, উহা যে আবশ্যক এবং কল্যাণকর বলিয়াই আসে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

তাহার পর, বিষয়টাকে যদি শুধু নিরীশ্বর বৈজ্ঞানিকের চক্ষে না দেখিয়া ঈশ্বরবিশ্বাসী দার্শনিকের চক্ষে দেখি, তবে উহা আরও সুস্পষ্ট হয়। এ বিশ্বটা এবং তদন্তর্গত ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল ঘটনা প্রেমময় মঙ্গলালয় বিশ্ববিধাতার কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত, তাহা যখন আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি, তখন জীবনের সকল ঘটনাই যে তাহার প্রেম ও মঙ্গল ভাব হইতেই আসে, এমন কিছু যে ঘটিতে পারে না যাহাতে আমাদের অকল্যাণ হইতে পারে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। তখন ইহাও পরিষ্কার রূপে বুঝিতে পারা যায় যে এই সংসারটা কর্ম্মফল-ভোগের ক্ষেত্র নয়, আরাম ও সুখভোগের স্থানও নয়; ইহা মূলতঃ আমাদের শিক্ষাক্ষেত্র ভিন্ন আর কিছুই নহে, আর এই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য অনন্ত উন্নতি ও বিকাশ। এই সংসারে দেহ আমাদের উন্নতিপথের বিশেষ সহায় হইলেও, এরূপ কিছু বলা যায় না যে, দেহ ব্যতীত আত্মার উন্নতি কিছুতেই সম্ভবপর নয়। এখানে থাকিতে আমাদের জ্ঞান প্রেম পুণ্য প্রভৃতির বিকাশের জন্য দেহের সাহায্য আবশ্যক বলিয়া যে তাহা ব্যতীত অন্য কোনও উপায়ে উহাদের বিকাশ সাধিত হইতে পারে না, এরূপ মনে করিবার কোনও হেতু নাই। বরং তদ্বিপরীতে দেখিতে পাওয়া যায়, সংসারের যোগে ইহাদের কতকটা বিকাশ সাধিত হইলেও, তাহা হইতে পূর্ণ উন্নতি লাভের কোনও সম্ভাবনা নাই। অনন্ত জ্ঞান প্রেম পুণ্যের যিনি আধার ও মূল প্রস্রবণ, একমাত্র তাঁহার সহিত যোগস্থাপনের দ্বারাই পূর্ণ উন্নতি, অনন্ত বিকাশ লাভ করা সম্ভবপর। বলা বাহুল্য তাহার জন্য দেহ একান্ত আবশ্যক নহে, এই সংসারে বাস করাও অপরিহার্য্য নহে। বরং এই সংসারের সীমাবদ্ধ জীবনে তাহা একেবারে অসম্ভব। তাহার জন্য অনন্ত কাল ও সকল প্রকার বন্ধন হইতে মুক্তি অপরিহার্য্যরূপে প্রয়োজনীয়, সকল প্রকার সীমাবদ্ধ ভাবই সে-পথের প্রতিবন্ধক। সুতরাং সে পথে মৃত্যুই পরম সহায়। এই জন্যই ভক্ত কবি গাহিয়াছেন "মৃত্যু সে অমৃত-সোপান।" মৃত্যুই অমৃতের দ্বার। সে স্তরে উঠিতে হইলে, সে রাজ্যে জন্মগ্রহণ করিতে হইলে, এখানকার এই দেহ পরিত্যাগ করিতেই হইবে। কাজেই মৃত্যু যে সকলের পক্ষে পরম মঙ্গল তাহাতে সংশয় করিবার কোনও কারণ নাই। পরলোকে যখন এখানকার প্রতিবন্ধক সকল তিরোহিত হয়, তখন সে রাজ্যে যত শীঘ্র যাওয়া যায়, ততই ভাল; কেননা ততই উন্নতির পথ সুগম হয়, বিকাশসাধন দ্রুত হয়। ইহার অর্থ অবশ্য এরূপ নহে যে মৃত্যু হওয়া মাত্রই সকলে হঠাৎ উন্নতির চরম সীমায় যাইয়া উপনীত হয়। যে যেরূপ অবস্থায় এই লোক হইতে গমন করে, সে সেই অবস্থা হইতেই চলিতে আরম্ভ করে, তাহার উন্নতি সেখান হইতেই আরম্ভ হয়, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। মৃত্যু কখনও পুণ্যাত্মা ও পাপাত্মার পার্থক্য ঘুচাইয়া দেয় না; প্রত্যেকে আপনার কর্ম্মানুযায়ী গতিই প্রাপ্ত হয়। কিন্তু তাই বলিয়া একজন উন্নতির পথে আর অপর জন অবনতির পথে ধাবিত হয়, এরূপ মনে করা কখনও সঙ্গত হইবে না, সেরূপ সিদ্ধান্ত নিতান্ত ভ্রমপূর্ণ হইবে। সকলের পক্ষেই অনন্ত উন্নতি তাঁহার ব্যবস্থা। পাপ সে উন্নতির গতিকে মন্দীভূত করিতে পারে বটে, কিন্তু একেবারে রুদ্ধ করিতে পারে না, বিপরীত পথে অবনতির দিকে চালাইতে পারে না। সুতরাং নিম্নতর স্তরে যাইয়া জন্ম-গ্রহণ করিবার আশঙ্কা একেবারেই ভিত্তিহীন। যে দিক দিয়াই বিচার করা যায় না কেন, কোনও দিক হইতেই মৃত্যুকে অমঙ্গলজনক মনে করিবার কিছুমাত্র যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখিতে

পাওয়া যায় না—সকল দিক হইতেই উহাকে মঙ্গলজনক বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিতে হয়। সুতরাং মৃত্যুকে প্রেমময় পিতার মঙ্গল ব্যবস্থা, কল্যাণকর দান, জানিয়া, সকল অবস্থায় সকলের পক্ষেই সাদরে বরণ করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান যুগের জ্ঞান বিজ্ঞান এই তত্ত্ব লাভে সহায়তা করিলেও, ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রসাদেই আমরা এই মহা সত্য লাভে সমর্থ হইয়াছি। আর কোনও ধর্ম্ম বা সম্প্রদায়ই মৃত্যুকে এই ভাবে দেখিতে শিক্ষা দেয় না। আমাদের এই ক্ষুদ্র সমাজকে চারিদিক হইতে মৃত্যুর আঁধারে যেরূপ ঘিরিয়াছে, তাহাতে আমাদের পক্ষে উহাকে এই আলোকে দেখা একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। আমরা জানি, আমাদের মধ্যে অনেকে এই আলোক পাইয়া মৃত্যুর মধ্যে প্রেমময় মঙ্গল-বিধাতার কল্যাণ ব্যবস্থা দেখিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং অবিচলিত চিত্তে শোকভার বহন করিতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় সকলের সম্বন্ধে সে কথা বলা যায় না। বহু লোক সে দৃষ্টি হইতে বঞ্চিত হইয়া সকল দিক শূন্য ও অন্ধকারময় দেখিতেছেন, শোকে তাপে অভিভূত হইয়া পড়িতেছেন। এই বিষয়ে মণ্ডলীস্থিত ধর্ম্মবন্ধুদিগের যে গুরুতর দায়িত্ব রহিয়াছে তাহা আর অধিক করিয়া বলিতে হইবে না। এ জন্য আমাদের সকলকেই বিশেষ চেষ্টা যত্ন করিতে হইবে, যাহাতে আমাদের মধ্যে এই জ্ঞানটা উজ্জ্বল হয়, সকল মিথ্যা ভয়, অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হয়, এবং আমরা পরস্পরকে এ বিষয়ে যথাশক্তি সাহায্য করিতে পারি। করুণাময় পিতা কৃপা করিয়া আমাদের হৃদয়ে তাঁহার মহান্ ধর্ম্মের প্রাণপ্রদ তত্ত্বসকল প্রকাশিত করুন ও তাহাতে প্রতিষ্ঠিত রাখুন। আমরা তাঁহাকে জীবনের সকল ঘটনার মূলে দেখিয়া, নিশ্চিন্তপ্রাণে মৃত্যুর অন্ধকারের মধ্য দিয়াই জীবনপথে চলি। তাঁহার ইচ্ছাই আমাদের সকলের জীবনে পূর্ণ হউক।

তত্ত্ববোধিনী সভার প্রথম যুগ,

(১৮৪০—১৮৪৩)

[ব্রাহ্মসমাজের শতাব্দীপূর্ত্তি উপলক্ষে মহর্ষির আত্মজীবনীর যে নূতন সংস্করণ প্রস্তুত হইতেছে, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক লিখিত তাহার পরিশিষ্টের পাণ্ডুলিপি হইতে গৃহীত]।

আত্মজীবনীতে দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী সভার প্রথম কয়েক বৎসরের (১৮৪০—১৮৪৩ সালের) যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে ঐ সময়ের সকল ঘটনা বর্ণিত হয় নাই। বিশেষতঃ তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার উল্লেখ একেবারেই নাই। এখানে ঐ কয়েক বৎসরের ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত লিখিত হইতেছে।

১৮৩৮ সাল হইতেই দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদ্ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। এই অধ্যয়নের ফলে তাঁহার চিত্তে যে অমৃত সঞ্চিত হইতে লাগিল, তাহা অপরকে দান করিবার জন্য তিনি অতিশয় ব্যাকুল হইলেন। তখনও ব্রাহ্মসমাজের সহিত তাঁহার যোগ হয় নাই। ব্রাহ্মসমাজ তখন নামে-মাত্র জীবিত; ব্রাহ্মসমাজ বলিয়া একটি বস্তু যে আছে, ইহা তখন রামমোহন রায়ের কতিপয় বন্ধু ব্যতীত আর কেহই জানিত না, অথবা মনে রাখিত না। দ্বারকানাথ ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজের জন্য অর্থ ব্যয় করিতেন ও তাহার তত্ত্বাবধান করিতেন, নতুবা দেবেন্দ্রনাথও কোন দিন ব্রাহ্মসমাজের নাম শুনিতে পাইতেন কি না সন্দেহ। ১৮৩৯ সালে যখন উপনিষদ্-বেদ্য ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিবার প্রবল আগ্রহ দেবেন্দ্রনাথের চিত্তকে অধিকার করিল, তখনও তিনি ব্রাহ্মসমাজের সহিত পরিচিত হন নাই; এই কারণে, তখন তিনি নিজ অভিপ্রায়ের উপযোগী নূতন একটী সভা প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইলেন। তাহাই তত্ত্ববোধিনী সভা।

১৮৩৯ সালের ৬ই অক্টোবর রবিবার তত্ত্ববোধিনী সভার জন্ম হয়। আত্মজীবনীতে বর্ণিত আছে যে প্রথমে দেবেন্দ্রনাথ স্বীয় আত্মীয় বন্ধু বান্ধব এবং ভ্রাতৃগণকে লইয়া নিভৃত ভাবে ইহার প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম দিনে ইহার সভ্য দশ জন মাত্র ছিল। দ্বিতীয় বৎসরে ১০৫ জন সভ্য হন।

আত্মজীবনীতে দেবেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন যে প্রথম দুই বৎসরে সভার খ্যাতি বিস্তার হইতেছিল না বলিয়া তিনি অতিশয় দুঃখিত হইতেছিলেন। এই খ্যাতিহীন প্রথম যুগের মধ্যেই (১৮৪০ সালে) অক্ষয়কুমার দত্তের সহিত দেবেন্দ্রনাথের যোগ স্থাপিত হয়। ইহা একটি স্মরণীয় ঘটনা। ইহা হইতে ভবিষ্যতে অনেক গুরুতর ফল প্রসূত হইয়াছিল।

ক্রমে বর্দ্ধমান-রাজ মহ্‌তাব চন্দ্ বাহাদুর, নবদ্বীপরাজ শ্রীশচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রামগোপাল ঘোষ, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শম্ভুনাথ পণ্ডিত প্রভৃতি দেশের অনেক গণ্য মান্য ব্যক্তি ইহার সভ্য হইলেন।

ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারের জন্য দেবেন্দ্রনাথ দ্বিতীয় যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন, তাহা তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপন। রামমোহনের ন্যায় দ্বারকানাথও হিন্দুকলেজের ধর্ম্মহীন শিক্ষায় অসন্তুষ্ট ছিলেন। উহাতে প্রদত্ত বৈষয়িক শিক্ষার সহিত সংস্কৃতের ও ধর্ম্মশাস্ত্রের গভীরতর অধ্যয়ন যুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে ১৮৪০ সালে প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের চেষ্টায়, ঐ কলেজের অধীনে "কলেজ পাঠশালা" নামে একটি পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। ঠাকুর মহাশয়দিগের পরম বিশ্বাসভাজন, ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য, পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ইহার শিক্ষক নিযুক্ত হন। ঐ সালের ২০শে জানুয়ারী তারিখের *Calcutta Courier* পত্রিকায় দেখা যায় যে পাঠশালা প্রতিষ্ঠার দিনে (১৮ই জানুয়ারী) প্রসন্নকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, এবং রাধাপ্রসাদ রায় ব্যতীত Chief Justice Sir Edward Ryan, Doctors Grant, O'Shaughnessy, Wise, Mr. Hare, Capt. Richardson প্রভৃতি অনেক সম্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। ইহার নাম "পাঠশালা" হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা একটী উচ্চাঙ্গের চতুষ্পাঠী হইল। প্রতিষ্ঠার দিনে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ যে বক্তৃতা করেন, তাহার ইংরাজী অনুবাদ *Calcutta Courier* পত্রিকার ২রা এপ্রিলের সংখ্যায় মুদ্রিত আছে।

প্রসন্নকুমার ও দ্বারকানাথের এই আয়োজনকে রামমোহন রায় কর্ত্তৃক ১৮২৫ সালে স্থাপিত "বেদান্ত কলেজের" পুনঃ প্রতিষ্ঠা বলিতে পারা যায়। বেদান্ত কলেজের উদ্দেশ্যও ইহার অনুরূপ ছিল। কিন্তু তাঁহার জন্য তখনও রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের মত একজন অনুরাগী সেবক প্রস্তুত হন নাই বলিয়া,

এবং শুধু ধর্ম্মজ্ঞান চর্চ্চার জন্য একটী বিদ্যালয় কলিকাতার ন্যায় বিষয়বাণিজ্য-প্রধান স্থানে চালানো কঠিন বলিয়া, তাহা অধিক দিন জীবিত থাকে নাই।

দেবেন্দ্রনাথের মনে হইল "কলেজ পাঠশালা" কলেজের ছাত্রগণের মধ্যে যে কার্য্য করিবে, স্কুলের বালকগণের মধ্যেও তদনুরূপ কার্য্য করিবার জন্য একটি আয়োজন করা আবশ্যক। কিন্তু তিনি অপরের প্রতিষ্ঠিত কোনও সাধারণ স্কুলের আনুষঙ্গিকরূপে একটী পাঠশালা স্থাপন করিতে ইচ্ছুক হইলেন না। নূতন প্রণালীতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি স্কুল খুলিয়া তাহাকে তত্ত্ববোধিনী সভার পরিচালনাধীন রাখিবেন, এইরূপ সঙ্কল্প করিলেন।

৩রা জুন ১৮৪০ তারিখের *Calcutta Courier* পত্রিকার ২য় পৃষ্ঠায় "Indian News" শীর্ষে এই সংবাদ দেখিতে পাওয়া যায়:—"A NEW SCHOOL.—We have been given to understand that a new School, having for its object the education of the rising youths in the vernacular languages of the country is about to be established in Calcutta under the auspices of some enlightened native Baboos. It is to be conducted on the same principles as the new College Patsala. The boys will further receive religious education, which is a new feature in the system of native instruction. It is said that new books suited to the capacities of youth, are now in course of preparation in the vernacular languages by Baboo Debendernauth Tagore, the son of Baboo Dwarkeynauth Tagore".

এই নূতন স্কুলই দেবেন্দ্রনাথের "তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা"। ইহা উক্ত "কলেজ পাঠশালার" মত একটি উচ্চাঙ্গের চতুষ্পাঠী হইল না বটে, কিন্তু ইহাতেও উপনিষদ্ পড়ান হইতে লাগিল, এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হইতে লাগিল। ঐ পত্রিকার উল্লেখ হইতে জানিতে পারিতেছি যে, তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা প্রতিষ্ঠার কাল, ১৮৪০ সালের জুন মাসের প্রথম সপ্তাহ। এবং, এখন যে "native" শব্দটি ভদ্রতার অভিধান হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছে, তখন তাহা কিরূপ অজস্র ভাবে ব্যবহৃত হইত, তাহাও ঐ উদ্ধৃত সংবাদটুকুর ভাষায় দেখিতে পাওয়া যায়।

তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপনের উদ্দেশ্য তৎকালে যে ভাবে বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে এই সকল কথা প্রাপ্ত হওয়া যায়,—"ইংরাজী ভাষাকে মাতৃভাষা এবং খৃষ্টীয় ধর্ম্মকে পৈতৃক ধর্ম্মরূপে গ্রহণ,—এই সকল সাংঘাতিক ঘটনা নিবারণ করা, বঙ্গভাষায় বিজ্ঞানশাস্ত্র এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশ করিয়া, বিনা বেতনে ছাত্রগণকে পরমার্থ ও বৈষয়িক উভয় প্রকার শিক্ষা প্রদান করা," প্রভৃতি। এই পাঠশালায় প্রাতঃকালে ৬টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত পড়ান হইত। অক্ষয়কুমার দত্ত ইহাতে ভূগোল ও পদার্থবিদ্যার শিক্ষক নিযুক্ত হন। তিনি ইহাতে পড়াইবার জন্য এই দুই বিষয়ে পুস্তক রচনা করেন; তাহা তত্ত্ববোধিনী সভা কর্ত্তৃক ১৮৪১ সালে মুদ্রিত হয়। ইহার পূর্ব্বে বাংলা ভাষায় যে কয়েকখানি বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তক ছিল, তাহার অধিকাংশ সাহেবদিগের রচিত ছিল, এবং সে সকলের ভাষা অতি কদর্য্য ছিল।

এই সময়ে দ্বারকানাথ ঠাকুরের 'কার-ঠাকুর কোম্পানী' নামক কারবার এবং তাঁহার জমিদারী, উভয়ই সতেজে ও দ্রুতবেগে বর্দ্ধিত হইয়া চলিয়াছিল। তাঁহার সম্পত্তিও বাড়িতেছিল, এবং আর্থিক দায়িত্বও বাড়িতেছিল; সুতরাং বাণিজ্যের চঞ্চলতায় যাহাতে স্থাবর সম্পত্তি নষ্ট হইতে না পারে, সেজন্য তিনি ব্যস্ত হইতেছিলেন। তাই তিনি এই সময়ে (১৮৪০ সালের ২০শে আগষ্ট) একটী Deed of Settlement সম্পাদন করিয়া ভূসম্পত্তি রক্ষার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু তাঁহার এই বিপুল বিষয় সম্পত্তি পরিচালনের কঠিন কার্য্যে তিনি দেবেন্দ্রনাথের সহায়তা কিংবা মনোযোগ কিছুই পাইতেছিলেন না।

কার ঠাকুর কোম্পানীর ব্যবসায়ের সহায়তার জন্য দ্বারকানাথকে এই সময়ে অনেক উচ্চপদস্থ সাহেবদের সঙ্গে মিশিতে ও তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিতে হইত। তৎকালীন *Bengal Hurkaru* ও *Calcutta Courier* পত্রিকায় দেখিতে পাই যে, ১৮৪০ ও ১৮৪১ সালে দ্বারকানাথ অনেকবার নিজের বেলগাছিয়ার বাগানে সাহেব ও বিবিদের জন্য নাচ ও ভোজের আয়োজন করেন। ১৮৪১ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি তারিখের ভোজে লাট-ভগিনী মিস্ ইডেন্ পর্য্যন্ত উপস্থিত ছিলেন। ইহার কয়েকদিন পরে (সম্ভবতঃ ১৪ই মার্চ্চ রবিবার) দ্বারকানাথ ঐ বাগানে দেশীয়দিগকে লইয়া আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করেন। এই দিনে দেবেন্দ্রনাথের উপরে অভ্যাগতদের পরিচর্য্যার ভার ছিল। দেবেন্দ্রনাথ এই কার্য্যেও মন দিতে পারিলেন না। ইহাতে তিনি পিতার বিরাগভাজন হন।

এদিকে ১৮৪১ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর দেবেন্দ্রনাথ নিজ বাটীতে ধুম ধাম করিয়া রাত্রি ২টা পর্য্যন্ত তত্ত্ববোধিনী সভার উৎসব করিলেন। ইহাতেও দ্বারকানাথ নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হন নাই। তিনি আর কয়েক মাস পরেই ইংলণ্ডে চলিয়া গেলেন, ও এক বৎসর তথায় থাকিলেন।

দ্বারকানাথ যখন বিলাতে, সেই সময়ে (১৮৪২ সালে) দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার তত্ত্ববোধিনী পাঠশালাটিকে লইয়া ক্রমশঃ বিব্রত হইয়া পড়িতে লাগিলেন। যে কারণে রামমোহন রায়ের বেদান্ত কলেজ কলিকাতায় জীবিত থাকিতে পারে নাই, সেই কারণে দেবেন্দ্রনাথের তত্ত্ববোধিনী পাঠশালাও যায়-যায় হইয়া উঠিল। কলিকাতা বিষয়ী লোকদের স্থান। যাঁহারা দেবেন্দ্রনাথের অনুরোধে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায় ছেলে পাঠাইতেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল যে ছেলেরা প্রধানতঃ অর্থকরী বিদ্যা উপার্জ্জন করুক এবং গৌণতঃ জ্ঞান ধর্ম্ম উপার্জ্জন করুক। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য ছিল অন্যরূপ। তিনি জ্ঞান ও ধর্ম্মকে প্রধান স্থানে রাখিয়াছিলেন, এবং বাংলা ভাষাতেই সকল বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইবে, ইহা তাঁহার দৃঢ় পণ ছিল। এই ভাবে পরিচালিত একটি স্কুলকে কলিকাতায় অধিক দিন জীবিত রাখা বোধ হয়

এ যুগেও সম্ভব নহে, তখনকার তো কথাই নাই। কিছুদিন পর্য্যন্ত তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার ছাত্রেরা দেবেন্দ্রনাথের খাতিরে সকাল ৬টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত পাঠশালায় পড়িয়া, আবার ১০টায় ইংরাজী স্কুলে যাইতে লাগিল। কিন্তু এত কষ্ট স্বীকার আর কত দিন করা সম্ভব? অল্প কালের মধ্যেই তাহারা একে একে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা ছাড়িয়া যাইতে লাগিল, পাঠশালা প্রায় ছাত্রশূন্য হইল।

দেবেন্দ্রনাথ তখন বুঝিলেন, কলিকাতায় এরূপ পাঠশালা টিঁকিবে না। কিন্তু তাঁহারও সঙ্কল্প যে, "সাধারণ ইংরাজী স্কুলের মত আর একটা স্কুল চালাইব না; আমার যে উদ্দেশ্য তদনুরূপ একটি পাঠশালাই করিতে হইবে; যদি তাহা কলিকাতায় না চলে, তবে যেখানে চলে, সেখানেই তাহা করিতে হইবে।" তাই পাঠশালা বাঁশবেড়ে গ্রামে উঠিয়া গেল; অথবা, প্রকৃত কথা এই যে বাঁশবেড়ে গ্রামে নূতন করিয়া আর একটি পাঠশালা স্থাপন করা হইল।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বলিতেছেন, (তত্ত্ববো. ১৮৩৭ শকের চৈত্র সংখ্যা, ২২৫ পৃষ্ঠা), "তত্ত্ববোধিনী সভার এই সময়ে যে আয় দাঁড়াইয়াছিল, অথবা বলিতে গেলে, প্রধানত দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী সভাতে যতটুকু সাহায্য করিতে সক্ষম ছিলেন, তাহাতে সভার নিজের এবং ব্রাহ্মসমাজের ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার পর, অন্যান্য স্কুল কলেজের ন্যায় বিস্তৃত আকারের এক বদ্যালয় সংস্থাপন করা অসম্ভব ছিল। সুতরাং দেবেন্দ্রনাথ স্থির করিলেন যে, পল্লীগ্রামে এরূপ এক বিদ্যালয় খুলিলে অপেক্ষাকৃত স্বল্পব্যয়ে কার্য্যনির্ব্বাহ হইতে পারিবে। ... বংশবাটী ... গ্রাম পণ্ডিতদিগের আবাসভূমি বলিয়া খ্যাত ছিল, এবং এই গ্রামে তত্ত্ববোধিনী সভারও কয়েকজন সভ্যের বাসগৃহ ছিল। ... ১৭৬৫ শকে ১৮ই বৈশাখ রবিবার (১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে[১]) দেবেন্দ্রনাথ নবোৎসাহে বংশবাটী গ্রামে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা খুলিলেন; কলিকাতার পাঠশালা উঠিয়া গেল।

কলিকাতায় এই পাঠশালা সংস্থাপিত হওয়া অবধি অক্ষয় কুমার দত্ত ইহার শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন। কিন্তু তিনি মহানগরীর নানাবিধ সুবিধা পরিত্যাগ করিয়া বংশবাটী গ্রামে যাইতে অস্বীকার করায়, দ্বারকানাথ ঠাকুরের সভাপণ্ডিত বংশবাটী-নিবাসী কমলাকান্ত চূড়ামনির পুত্র শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশ উক্ত পদে নিযুক্ত হয়েন। রামগোপাল ঘোষ পাঠশালার পরিদর্শকের পদ স্বীকার করিলেন।

এই পাঠশালায় বিনা বেতনে বিদ্যাদান করা হইত। এক শতের অধিক ছাত্র ভর্ত্তি করা হইত না, এবং ১৪ বৎসরের অধিক বয়স্ক কোন বালককে প্রথম শ্রেণীভুক্ত করা হইত না। ... ...

এই বংশবাটীর পাঠশালার প্রথম পরীক্ষার পর পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে প্রায় পাঁচ শত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন। ... ...

৩৯ ছাত্রকে পুরস্কার দেওয়া যায়, তন্মধ্যে প্রথম শ্রেণীর প্রধান ছাত্র শ্রীযুক্ত দীননাথ রায় একত্রিংশ মুদ্রা এবং বঙ্গ ও ইংলণ্ডীয় ভাষায় কতকগুলি পুস্তক প্রাপ্ত হয়েন; এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রধান ছাত্র শ্রীযুক্ত বেচারাম মুখোপাধ্যায় দ্বাবিংশতি মুদ্রা ও কতকগুলি পুস্তক প্রাপ্ত হয়েন।"

বহুদিন পরে অতর্কিতভাবে দেবেন্দ্রনাথের সহিত এই দীননাথ রয়ের সাক্ষাৎ হয়। দীননাথ তখন কানপুরের ষ্টেশন মাষ্টার হইয়াছিলেন ও দেবেন্দ্রনাথকে সাহায্য করিয়াছিলেন। (আত্মজীবনী ১২৬ পৃঃ)।

[দ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যু ও তাঁহার ব্যবসায় পতনের পর ১৮৪৭ সালে এই পাঠশালাটি উঠিয়া গেল। বাঁশবেড়ের বাড়ী ও বাগান ডফের মিশন কিনিয়া লইলেন।]

এই পাঠশালাই তত্ত্ববোধিনী সভা কর্ত্তৃক অবলম্বিত প্রথম কার্য্য। কিন্তু অবৈতনিক হওয়া সত্ত্বেও কলিকাতায় প্রথম দুই বৎসরে ইহাতে যে আশানুরূপ ছাত্র হইতেছিল না, ইহাও দেবেন্দ্রনাথের ক্ষোভের কারণ হইয়াছিল।

যে সময়ে কলিকাতার সকল লোকের এই আগ্রহ ছিল যে ছেলেরা যে কোনওরূপে হউক একটু ইংরাজী শিখুক, যে-সময়ে কলিকাতার গলিতে গলিতে, অতি যৎসামান্য ইংরাজী-জানা এবং অন্যান্য সকল বিষয়ে একান্ত মূর্খ বহু বাঙ্গালী ইংরেজ ও ফিরিঙ্গী, শুধু ইংরাজী শব্দের দীর্ঘ তালিকা মুখস্থ করাইবার নানা পাঠশালা ও স্কুল খুলিয়া বসিতেছে ও তাহাতেই যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিতেছে, যে সময়ে ইংরাজী জানাই চাকরী পাইবার পক্ষে একমাত্র আবশ্যকীয় গুণ, সেই যুগে দেবেন্দ্রনাথ যে এরূপ দৃঢ়তার সহিত বাংলা ভাষায় শিক্ষা দান করিবার একটি বিদ্যালয় স্থাপিত ও পরিচালিত করিয়াছিলেন, ইহাতে আমরা তাঁহার অপূর্ব্ব মনস্বিতা ও তেজস্বিতার পরিচয় পাই।

তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা বাঁশবেড়ে গ্রামে স্থানান্তরিত করিবার পূর্ব্বেই (১৮৪২ সালের শেষ ভাগে) দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের সহিত যোগদান করেন। তত্ত্ববোধিনী সভার হাতে সেই সময় হইতে ব্রাহ্মসমাজ পরিচালনের ভার আসিয়া পড়িল। ক্রমশঃ তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত হইতে লাগিল। ১৮৪৩ সালের আগষ্ট (ভাদ্র) মাসে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হইল। এই পত্রিকা যেন এক দিনেই দেশের লোকের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিয়া লইল। এই পত্রিকার দ্বারা তত্ত্ববোধিনী সভার ও তাহার প্রতিষ্ঠাতা দেবেন্দ্রনাথের নাম চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। ইহার পর ঐ সালের ডিসেম্বর মাসে (৭ই পৌষ) দেবেন্দ্রনাথ ও আর কুড়ি জন লোক প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্মব্রত গ্রহণ করিলেন। তাহার পর হইতে প্রতিদিনই অনেক নূতন নূতন লোক প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিতে লাগিলেন। তত্ত্ববোধিনী সভার ও "বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ধর্ম্মের" নাম লোকের মুখে মুখে ঘুরিতে লাগিল।

১৮৪৪ সালে তত্ত্ববোধিনী সভা কলিকাতায় একটী বিখ্যাত সভা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে মৃতকল্প ও বিস্মৃত ব্রাহ্মসমাজকে দেবেন্দ্রনাথ পুনর্জীবিত করিলেন, তাহাকে লোকে এই সময় হইতে কিছুকাল "তত্ত্ববোধিনী সভার দল" অথবা "বেদান্তবাদীদিগের দল" বলিয়া চিনিতে লাগিল।

---

(১) ৩০শে এপ্রিল।—(সঃ চঃ)

ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে বসিতে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্কোচ।

[ব্রাহ্মসমাজের শতাব্দীপূর্ত্তি উপলক্ষে মহর্ষির আত্মজীবনীর যে নূতন সংস্করণ প্রস্তুত হইতেছে, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক লিখিত তাহার পরিশিষ্টের পাণ্ডুলিপি হইতে গৃহীত]।

আত্মজীবনীতে বর্ণিত সময়ের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ কখনও ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে উপবেশন করেন নাই। ১৮৪৯ সালের ১১ই মাঘের উৎসবের দিনে তিনি "বেদীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রহৃষ্ট মনে ভক্তিভরে" ফেনেলন-রচিত স্তোত্রটি পাঠ করিয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের ন্যায় দেবেন্দ্রনাথও অনুভব করিতেন যে, আমরা সংসারী মানুষ, এ জন্য আমাদের পক্ষে ধর্ম্মযাজন (অর্থাৎ আচার্য্যের কাজ করা) এবং ধর্ম্মোপদেশ দান (অর্থাৎ গুরুর কাজ করা) নিষিদ্ধ। উভয়েই ব্রহ্মোপাসনার পদ্ধতি রচনা করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু স্ব-রচিত সেই পদ্ধতি অনুসারে ব্রাহ্মসমাজে উপাসনার কার্য্যটি উভয়েই অন্যের দ্বারা নির্ব্বাহ করাইয়াছেন। উভয়েই যজন-যাজন-নিরত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগকে আচার্য্যের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এবং নিজেরা ব্যয়ভার বহনাদি দ্বারা তাঁহাদিগের সাহায্য করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে উভয়েই প্রাচীন ভারতীয় সংস্কারের দ্বারা চালিত হইয়াছিলেন।

রামমোহন রায় কোনও দিনই ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যের কাজ করেন নাই। ব্রাহ্মসমাজের জন্য তিনি কখনও কখনও ব্যাখ্যান (অর্থাৎ উপদেশ) লিখিয়া দিতেন, কিন্তু তাহাও অন্যে পাঠ করিত; দেবেন্দ্রনাথ নিজে বক্তৃতা পাঠ করিতেন, কিন্তু প্রথম প্রথম বেদীতে বসিতে চাহিতেন না। প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় মহর্ষির আত্মজীবনীর দ্বিতীয় পরিশিষ্টে (৭, ৮ পৃঃ) বলিতেছেন—

"প্রথম প্রথম মহর্ষি উপাসনার দিনে বেদীর সম্মুখে নীচে দাঁড়াইয়া উপদেশ দিতেন। তাঁহার নিজের মুখে শুনিয়াছি—'আমি মনে করিতাম যে, আমি ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে বসিয়া উপদেশ দিবার অধিকারী নহি। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ, প্রভৃতি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগেরই ইহাতে উপযুক্ত অধিকার। আমি ধনবানের পুত্র, অতএব বিষয়ীর ন্যায়, যজমানের ন্যায়, আচার্য্য-পুরোহিতগণের, অধস্তন সোপানে দাঁড়াইয়া কার্য্য করাই আমার পক্ষে যোগ্য।' তাঁহার নিজের জন্য তাঁহার মনের ভাব এইরূপ। কিন্তু এই কঠোর হিন্দুসংস্কার বিপ্লাবিত দেশে, কেশব বাবু বৈদ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিলেও, মহর্ষি যখন তাঁহাতে ধর্ম্মাচার্য্যের যোগ্যতা অনুভব করিলেন, তখন সকলকে অতিক্রম করিয়া তাঁহাকেই আচার্য্য পদে অভিষিক্ত করিবার সংকল্প করিলেন। কেশব বাবুরও পূর্ব্বে ইহা ভাল লাগিত না যে, মহর্ষি নীচে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করেন। তিনি সর্ব্বদা মহর্ষিকে বেদী গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিতেন। তিনি শেষে একদিন জোর করিয়া মহর্ষিকে বেদীতে বসাইয়া দিলেন। মহর্ষি যখন বেদীতে বসিলেন, তখন তাঁহার মনের বিশ্বাস ফিরিল। তিনি আপনার অধিকার আপনি বুঝিতে পারিয়া ভাবিলেন যে, 'এই তো আমার ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট উপযুক্ত আসন; এতদিন কেন আমি ইহাতে উপবেশন করি নাই?' এখন হইতে মহর্ষি প্রত্যেক বুধবারে বেদীতে বসিয়া ব্যাখ্যান দিতে লাগিলেন।

মহর্ষি বলিয়াছেন,—'এই সময়ে প্রতি বুধবারে আমি প্রায় সমস্ত দিনই উপাসনা-মণ্ডপে একাকী বসিয়া থাকিতাম। প্রাতে উঠিয়া আসিয়া বসিতাম, এবং মধ্যে একবার বাড়ী যাইয়া স্নান ও আহার করিয়া ফিরিয়া আসিতাম। যখন সন্ধ্যা হইত তাহার কিঞ্চিৎপূর্ব্বে আর একবার বাড়ী যাইয়া স্নান করিতাম, এবং পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া আসিয়া বেদীতে বসিতাম। উপাসনা হইয়া গেলে শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায় আমার পূর্ব্বসপ্তাহে প্রদত্ত ব্যাখ্যান পাঠ করিতেন। পরে আমি তাহার সঙ্গে যোগ রক্ষা করিয়া নূতন ব্যাখ্যান প্রদান করিতাম। এই সকল ব্যাখ্যান দিবার সময়ে আমার ঘর্ম্মবিন্দু হইতনা। কে এই সকল আমার মনে প্রেরণ করিতেন, কত সহজে আমি এই সকল ব্যাখ্যান দিতে পারিতাম, তাহা আমি কিছুতেই বুঝিতে পারিতাম না। এই বৃদ্ধ বয়সে এখন যখন আমি এই সকল কথা জ্ঞানের সহিত মিলাইয়া লই, তখন আমি নিজেই অবাক্ হই। আমি আশ্চর্য্য হই যে, প্রথম বয়সে আমি কি প্রকারে এই সকল গভীর অধ্যাত্মতত্ত্বসকল প্রকাশ করিয়াছি।"

১৮৬০ সালের ২৫ শে জুলাই (১১ই শ্রাবণ, ১৭৮২ শক) বুধবার দেবেন্দ্রনাথ প্রথম বার বেদীতে উপবেশন করেন ও তাঁহার প্রথম ব্যাখ্যান দান করেন।

পরলোকগত সুপ্রকাশ সেন। *

রোগশয্যায় আমাদের আদরের ভাইটী তার মনের সত্য পরিচয় এমন আশ্চর্য্যভাবে দিয়ে গেছে যে, আজকের দিনে তার ঐ পবিত্র জীবনের দু চারটী কথা আপনাদের কাছে নিবেদন কর্‌ছি।

আজ মনে পড়ে সেই ১৩১৯ সনের, ২৬ শে শ্রাবণ, রবিবার, রাত্রি ৯টার কথা। তখন আমার বয়স সাত, আমার ছোট বোনটীর বয়স সাড়ে তিন। সুন্দর একটী ভাই হয়েছে শুনে ছোটমাসীর ঘর থেকে ছুটে এলাম সেই আঁতুড় ঘরে। ভাইকে জড়িয়ে ধ'রে কত চুমো দিয়েছিলাম, সে কথা আজ বেশী করে' মনে পড়্‌ছে। বরিশালে মামাবাড়ীতে সে দিন কি আনন্দোৎসব! সে দিন, সে মুহূর্ত্ত, সে স্মৃতি আমার মনে জলন্তভাবে জেগে রয়েছে। ছেলেবেলার সে মিষ্টি মুখখানি, সে মিষ্টি হাসি, সে মিষ্টি হাত পা আমার চোখের সাম্‌নে এখনও তেমনি ভাবে ভাস্‌ছে।

---

* জ্যেষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী সুষমা সেন কর্ত্তৃক শ্রাদ্ধ বাসরে পঠিত।

কি নামের উপযুক্ত ছেলে হবে, এই ভেবে বাবা অনেক দিন পর্য্যন্ত ভাইটীর নাম ঠিক করিতে পারেন নি। খোকনের মুখের হাসি দেখে বাবা অনেক সাধ করে ছ'বছর বয়সে স্বর্গীয় পূজনীয় দাদামহাশয় প্রকাশচন্দ্রের নামে নাম মিলিয়ে "সুপ্রকাশ" নাম রাখ্‌লেন। সে দিনটীও আজ মনে পড়ছে, কি আনন্দে পুলকিত হয়েছিল আমার আদরের ভাইটী, ঐ দাদামহাশয়ের নাম-মিলান নাম পেয়ে। বড় হ'য়েও খোকন অনেকবার বলেছে—"দাদামহাশয়ের নামে আমার নাম রাখা হয়েছে, আমি ভাল হবই।" এ নামের সে যে উপযুক্ত ছিল, আর ক্রমশঃ আরো উপযুক্ত হ'য়ে উঠ্‌ছিল, সর্ব্বদা লক্ষ্য কর্‌তাম।

আমার খোকন ভাইটীর মুখে এমন একটী প্রফুল্লতা ছিল যে, লোকে তাকে একটু ভাল না বেসে, একটু আদর না করে', একটু স্নেহ না করে' থাক্‌তে পার্‌তো না। তার সেই মন-মাতান সরলতায় সকলকে মুগ্ধ করেছিল। একদিন, একমুহূর্ত্তের জন্যও তার ভেতরে কুটিলতা বা কপটতার পরিচয় পাইনি। সরল ভাবে যখন সে স্কুলের খবর, খেলার খবর, কে তাকে পথে যেতে একটু আদর করেছে সে খবর, আরো নানা খবর দিত, তখন একবারও তো আমার মনে হতো না যে সে আমার তের চোদ্দ বছরের ভাইটী। চোদ্দ বছরের হ'য়েও সে শিশুর মত সরল ছিল। ভাল, মন্দ, ন্যায় অন্যায় এমন কোন কথাই ছিল না যে সে দিদিকে না বলে' থাক্‌তে পার্‌তো। দিদিকেই সে তার সুখ, দুঃখ, আনন্দ নিরানন্দের সাথী করেছিল। মনে আনন্দ পেলে বা কষ্ট পেলে দিদির কাছেই সে সব প্রথমে ছুটে আস্‌তো। কোন অন্যায় কাজ করলে সরল ভাবে তখনই স্বীকার করেছে, কপট ভাবে লুকিয়ে রাখ্‌তে সে পার্‌তো না।

আজ আরো বেশী করে' মনে পড়ে তার সেই সদানন্দ চির প্রফুল্ল মিষ্টি মুখখানি। একবারও ত তার হাসি-ছাড়া মুখখানি চোখের সাম্‌নে ভাস্‌ছে না! সুমিষ্ট স্বর্গীয় হাসি নিয়ে সে জন্মেছিল, জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত দারুণ রোগ যন্ত্রণার মধ্যেও হাসিমুখই আমাদের দেখিয়ে গেল। পথে ঘাটে সব জায়গায় সবাই তাকে সর্ব্বদা হাসিমুখেই দেখেছেন। মন খুলে যখন সে হাস্‌তো, তখন আমাদেরও মনে কত আনন্দ হয়েছে। খেল্‌তে খুবই ভালবাস্‌তো, খেল্‌তে গিয়ে যেন নিজেকেই খেলার মধ্যে হারিয়ে ফেল্‌তো দেখে কত আহ্লাদ হতো। আবার মনে পড়ে জোরে হাস্‌তো দেখে যখন ভাইটীকে বলেছি "খোকন ভাই, এখন বড় হয়েছিস্‌, সর্ব্বদা অত হা হা করে' হাসিস্ না।" সরল ভাবে বালক জিজ্ঞাসা করতো "হাস্‌তে কি দোষ দিদিভাই?" চম্‌কে যেতাম তার প্রশ্ন শুনে, স্তম্ভিত হ'তাম, চুপ হ'য়ে যেতাম।

অবাধ্যতা কি জিনিষ ভাইটী আমার জান্‌তো না। যখন যে কাজ বলেছি হাসিমুখে করে গেছে সে। অসময়, আলস্য বা ক্লান্তির ছুতো দিয়ে সে কখনও অবাধ্যতার পরিচয় দেয়নি। এক এক সময় দেখে অবাক হয়েছি যে ভাইটী আমার যখন খেল্‌তে খেল্‌তে খেলার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেল্‌তো তখনও যদি কোন কাজের জন্য "খোকন" বলে' একবার ডেকেছি, তীরের মত মুহূর্ত্তের মধ্যে ছুটে এসে সাম্‌নে দাঁড়িয়েছে। "আমি এখন খেল্‌ছি, দিদি, ও কাজ কর্‌তে পার্‌বো না" "আরেকটু খেলে নিই দিদি," এসব কথা ত কোন দিন তার মুখে শুনিনি। আবার দেখেছি একটীবার যে কাজ কর্‌তে বারণ করেছি, তা আর কখনও করেনি।

যাতে ছোট ভাইবোনের মধ্যে বেশ একটা আকর্ষণ হয়, কোন রকম হিংসার ভাব প্রবেশ না করে, সে জন্য ছেলেবেলার থেকেই বাবা আমাদের একটু কিছু ভাল জিনিষ পেলে, একটু কিছু খাবার জিনিষ পেলে, নিজেদের মধ্যে ভাগ করে' নিতে শিখিয়েছিলেন। প্রথমে আমরা দুটী বোন যখন ছিলাম, তখন সর্ব্বদা ও রকম ভাগ করে' খেতাম। যখন চারটী ভাইবোন হ'লাম, খোকন ভাইটী আমার ভাগ কর্‌বার জন্য ব্যস্ত হতো দেখে' তাকেই সর্ব্বদা সব জিনিষ ভাগ কর্‌তে দিতাম। হৃষ্টচিত্তে ভাইটী আমার সবচেয়ে বড় ভাগ আমাদের দিয়ে, সব চেয়ে ছোটভাগটী নিয়ে তুষ্ট হ'তো দেখে' স্তম্ভিত হ'তাম। ভাইটী আমার ছেলেবেলা থেকেই লোককে দিয়েই খুসী হতো। এমন কি যাবার দিন চার পাঁচ আগে হাজারী কাকা (প্রফেসর জি, পি, হাজারী) বম্বে থেকে খোকন একটু ভাল হচ্ছে শুনে কতগুলি ছবি পাঠিয়েছিলেন ও চিঠি লিখেছিলেন। তখন তার কি আনন্দ – বল্লো "দিদিভাই, আমায় সবাই কত ভালবাসেন, না?" ছবি খুলে' যখন সব প্রথমে দেখা গেল চারখানা ছবি, ভাইটী আমার ঐ দারুণ রোগযন্ত্রণা ভুলে' গিয়ে তখনই বল্লো "কি মজা দিদি, চার ভাইবোনের চারখানা।" আর সেই কম্পিত হাত দিয়ে দেখিয়ে দিল কার কোন্‌টী।" একটুপরে যখন ছোট ভাইটী এসে বল্লো—"দাদাভাই, দেখ আরো দুটো ছবি এতে রয়েছে।" তখন খোকন একটু বেশী উৎফুল্ল হয়ে বল্লো "একটা বাবার ও একটা মার।" স্তম্ভিত হ'য়ে গেলাম তার ভাব দেখে—এমনি ক'রে যতদিন সে আমাদের কাছে ছিল সামান্য কিছু একটু পেলেই তখনই ভাগ কর্‌তো, কি আনন্দচিত্তে! এমন কি সময় সময় দাই চাকরেরাও সে ভাগ থেকে বঞ্চিত হতো না।

তার বড় মনের পরিচয় এত পেয়েছি যে, এখানে তা বর্ণনা করা অসম্ভব। নিজের সব চেয়ে প্রিয় জিনিষটী অন্যকে দিয়েই সে বেশী তৃপ্ত হ'তো। কতবার তাকে দেখেছি আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে তার অতি আদরের খেলনা, বই অন্যকে দিয়ে দিতে। আমাদের কারো একটা নূতন কিছু হ'লে খোকনের কি আনন্দ হ'তো। এবার যখন আমার ছোট বোনটী বোর্ডিংএ যায়, বাবা তার জন্য একটী ট্রাঙ্ক তৈরী কর্‌তে দিয়েছিলেন। মনে পড়্‌ছে আজ খোকন ভাইটী আমার ট্রাঙ্কটী দোকান থেকে আন্‌বার জন্য দুপুর বেলা ভাত খাওয়ার পর ১২টার সময় বাবার সঙ্গে ছুটে গিয়েছিল, আর কি স্ফূর্ত্তিতে সে সেই মস্ত ভারি ট্রাঙ্কটীকে বাবার সঙ্গে ধরে' নিয়ে এসেছিল। আনন্দোৎফুল্ল ভাইটীর মুখে তখন ক্লান্তির কোন চিহ্নই দেখ্‌তে পাইনি।

গরীব দুঃখীকে কিছু একটা দিতে ভাইটীর মন সর্ব্বদা নেচে উঠ্‌তো। ভিখারী এলে প্রাণ ভরে' চা'ল দিয়ে তবে খোকন খুসী হ'তো। বাড়ীর চাকর দাইকে কখন চারটী পয়সা দেবে, কখন কি একটু খেতে দেবে, তার জন্য ভারি ব্যস্ত হ'তো। কতদিন দেখেছি দাই চাকরের ছেলে মেয়েকে, আমাদের মেথরাণীর

ছোট মেয়েটীকে, নিজের খাবারের ভাগ থেকে একটু দিয়ে কত সন্তুষ্ট হ'তো! সম্প্রতি তার একটী গরীব বন্ধুকে কি করে' নানা-ভাবে সাহায্য করবে তার জন্য ব্যস্ত হ'তো। তাকে পেন্সিল, কলম, খাতা দিতে দেখে', নিজের বইগুলি পড়তে দিতে দেখে', অবাক হ'তাম। কি সহানুভূতি ঐটুকু প্রাণে ছিল গরীবের জন্য! এবার জন্মদিনে ঐ গরীব বন্ধুটীকে প্রাণ ভরে' খাইয়ে কত খুসী হয়েছে! আমরা দু বোন বিদেশে ছিলাম—কত আনন্দ করে' আমাদের এ খবর দিয়েছে। এই দুরন্ত রোগযন্ত্রণার মধ্যেও চাকরকে ও মালীকে খেতে যথেষ্ট পয়সা দেওয়া হচ্ছে কি না, সে খবর সর্ব্বদা নিত। নিজের অত যন্ত্রণা কষ্ট ভুলে' গিয়ে, প্রত্যেকের জন্য এত করে' ভাবতে দেখে অবাক হয়েছি, স্তম্ভিত হয়েছি।

বাড়ীতে কেউ এলে খোকনের কি আনন্দ! তাঁকে খেতে দেবার জন্য সে সব চাইতে বেশী ব্যস্ত হ'তো। নিজের হাতে ষ্টোভ জেলে কত দিন তাকে কত লোককে চা খাওয়াতে দেখেছি। সময় অসময়ের দিকে ভ্রূক্ষেপ রাখতো না। যতক্ষণ না পর্য্যন্ত নিজের হাতে আগন্তুককে খাবারটী না দিতে পেরেছে, ততক্ষণ ভাইটীর আমার কি ব্যস্ততা দেখেছি—ছুটোছুটি লাফালাফি করে' সে অস্থির হয়েছে। কোন অতিথি এলে কি ভাবে তাকে একটু আরাম দেবে, কি একটু তার সাহায্য করবে, এ সব খোকনই সব চাইতে বেশী ভাবতো। যিনি এক বেলার অতিথি হয়েও রয়েছেন আমাদের বাড়ীতে, তিনিও বুঝেছেন বালক সেবার জন্য কি ব্যগ্র ছিল। আমাদের সেবা করতে তাকে কোন দিনই বলতে হ'তো না।

কোন কাজে তার কোন দিন আলস্য দেখিনি। চাকর না এলে আলো পরিস্কার করতে, ঝাঁট দিতে, বিছানা করতে, তার কোন দিন ভুল হ'তো না। এমন কি মা'র হাত থেকে বাসন কেড়ে নিয়ে মাজতেও তাকে অনেক দিন দেখেছি।

এই ক্ষুদ্র জীবনে ধর্ম্মভাব ও ভাল হবার জন্য বেশ একটা আকাঙ্ক্ষা তার মনে ফুটে উঠছিল, তারও আভাস আমরা পেয়েছি। ছেলেবেলার থেকেই সে গান করতে বড় ভাল বাসতো; আর বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গাইতে শিখেছিল। গত তিন চার বছর থেকে গান করবার বেশ একটা ইচ্ছেও হয়েছিল। এ বয়সেই সে অনেক গান শিখেছিল ও প্রায়ই বলতো "আমি বড় হ'য়ে প্রেমদাদার (শ্রীযুক্ত প্রেমরঙ্গবিহারী লাল) মত মন খুলে' ভাব দিয়ে উপাসনার সময় গান গাইব।" কখন, কোন সময়ে, কার কাছে, কি ভাবে, গাইতে হবে, তা সে এ বয়সেই বেশ বেছে নিয়ে গাইতে শিখেছিল। কোন কারণে আমাদের মনে কষ্ট হ'লে, কতদিন দেখেছি খোকন আমাদের বড়দাদা হ'য়ে দুঃখের ভাবের গানগুলি পাশে বসে' গায়ে হাত বুলিয়ে গাইতো। সে স্বর, সে হাতের স্পর্শ যেন এখনও শুনতে পাচ্ছি, অনুভব করতে পাচ্ছি। সম্প্রতি আমাদের মামাবাবু (শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন পোদ্দার) একটী শোক পেয়ে যখন অধীর হ'য়ে চুপ করে' তার ঘরে শু'য়ে ছিলেন, খোকন ভাইটী আমার ব্রহ্মসঙ্গীতখানা খুলে' প্রাণ খুলে' এ পাশের বারান্দায় বসে' দুঃখের গান গাইল। বেশ ভাব দিয়ে সে এ বয়সেই গাইতে শিখেছিল।

এ গৃহের উপযুক্ত ছেলে হবে বলে' তার ভাল হবার দিকে বেশ একটা দৃষ্টি ছিল। একবার একটী সামান্য দোষ করে' বড় অনুতপ্ত হ'য়ে ভাইটী আমার আমায় একখানা চিঠি লিখেছিল। তার কয়েকটী পংক্তি এখানে উল্লেখ করছি। "বাবার মনে যে খুব কষ্ট হয়েছে তা বুঝতে পারছি! এ কাজটা আমারি করা অন্যায় হয়েছে। বাবা, মা, আমাদের জন্য এত করেন, তবুও যদি আমরা ভাল না হ'তে পারি, তবে তো বাবার মনে কষ্ট নিশ্চয়ই হবে। দিদি, আজ যদি তুমি এখানে থাকতে তবে আমাদের কত বুঝিয়ে বলতে। কিন্তু আজ আর কে তোমার মতন বুঝিয়ে বলবে? দিদি, তোমাদের কথা এত মনে হচ্ছে যে আর যেন কিছুই করতে পারছি না। কাল মণ্টু ও আমি কিছুই খাই নি। মণ্টু কাল থেকে শুধু কাঁদছে। দিদি, আমি আর তোমার ভাই হ'তে পারলাম না, বাবার মা'র ছেলেও না। আমি আর এ বাড়ীতে থাকিবার উপযুক্ত নই।"

সত্যি সত্যিই তার স্বভাবের নানা রকম পরিচয় পেয়েছি। এই চৌদ্দ বছরের বালকের মধ্যে এমন ধর্ম্মভাব, ভাল হবার বিশেষ আকাঙ্ক্ষা, প্রফুল্লতা, বাধ্যতা, উদারতা দেখে স্তম্ভিত হয়েছি, অবাক হয়েছি। আজ তার অভাবে এই সদ্গুণগুলি আরো বেশী করে' অনুভব করছি। ছোট ভাইটী হ'য়ে আজ সে আমার "বড় দাদা" হ'য়ে গেছে।

আর আজ বেশী করে' মনে হচ্ছে খোকনের এই রোগশয্যায় অসীম সহিষ্ণুতা এবং ধৈর্য্যের কথা।

২৯ শে সেপ্টেম্বর ৭ দিনের দিন আমরা দুই বোন বাবার phone পেয়ে যখন রাত ১০ টায় এসে উপস্থিত হ'লাম, ভাইটীকে অজ্ঞান অবস্থায় দেখে কেঁদে ফেল্লাম। পরদিন মনকে শক্ত করে' প্রাণপণে সেবা আরম্ভ করলাম। ১৪ দিন অজ্ঞান অবস্থায় কাটলো—আশা নিরাশার মধ্যে দিনগুলি কেটে যেতে লাগলো, ২১ দিনের দিন সারারাত সারাদিন ঘুমিয়ে ২২ দিনের দিন ভাইটীর আমার পূর্ণজ্ঞান ফিরে এলো। কত করুণস্বরে সে কত কথা বলে' গেছে আমাদের। ২২ শে সেপ্টেম্বর রাত্রি ১২ টায় আমি খোকনের বিষয় একটী দুঃস্বপ্ন দেখে মাকে লিখেছিলাম এবং খোকন কেমন আছে জানতে চেয়েছিলাম। জ্ঞান হবার তৃতীয় দিনের দিন ভাইটী আমায় জিজ্ঞাসা করলো "দিদিভাই, কি খারাপ স্বপ্ন দেখেছিলে আমার বিষয়, বল না।" আমি বললাম "সেরে উঠলে বলবো।" খোকন তখন কি মিষ্টি স্বরে বলেছিল, "দিদিভাই, তুমি আমায় খুব ভালবাস কিনা, তাই ওরকম টেলিপ্যাথি হয়েছিল।"

মিষ্টি সে ছোট বেলার থেকেই ছিল, কিন্তু চলে' যাবে বলে'ই বোধ হয় এ রোগে সে যেন আরও মিষ্টি হয়েছিল। "বাবা গো" ছাড়া "বাবা" বলতে তাকে এ অসুখে শুনি নি। এত যন্ত্রণা কষ্টের মধ্যেও যাঁরা তাকে সেবা করতে আসতেন, তাঁদের প্রতি কি সহানুভূতি, কি সমবেদনা, প্রকাশ করতে দেখেছি। কি আবেগের সঙ্গে করুণ কণ্ঠে তাকে বলতে শুনেছি "আপনাদের কত কষ্ট হচ্ছে," "দিদি তোমাদের কত কষ্ট হচ্ছে।" বাবার শরীর অসুস্থ বলে' বাবাকে বিশ্রাম করতে যেতে বার বার বলতো। প্রতিদিন দুপুরে ব্যস্ত হ'য়ে বলতো, "বাবা গো, তুমি শুতে যাও।" বাবা বলতেন আচ্ছা বাবা তুমি ঘুমুলেই আমি যাব।" অমনি ভাইটী আমার চোখ বুজতো। আবার যদি চোখ

খুলে' বাবাকে দেখ্‌তে পেতো, অস্থির হ'য়ে বল্‌তো, "বাবা গো, তুমি তো শু'তে গেলে না, শুধু যে এ ঘর ও ঘর করছো বাবা গো। যাও শু'তে, তোমার শরীর খারাপ হয়েছে। আমার কাছে শুধু দিদি থাক্‌বে।" কাকামণি (শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন নিয়োগী) একদিন দুপুরে সেবা করতে এসেছিলেন; তাঁকে নিজের পাশে শুইয়ে তবে ভাইটী আমার নিশ্চিন্ত হ'লো। "শ্রীশ কাকা গো ("শ্রী যুক্ত শ্রীশ চক্রবর্ত্তী), তুমি খেয়েছো, বাড়ী যাবে না" ইত্যাদি ঐ রুগ্ন কণ্ঠে যখন বল্‌তো, আর sponge করবার সময় "শ্রীশ কাকাগো, বাবা গো, আমায় ভাল করে' জড়িয়ে ধরো', তখন কতদিন আমার মনের ভিতরটা ছ্যাৎ ছ্যাৎ ক'রে উঠ্‌তো। তার সেই ব্যথাপূর্ণ প্রার্থনা এখনও আমার কানে তেমনি ভাবে বাজছে।

ভাইটী আমার ভাল ছিল বলে' সবাইকেই ভাল বলে' গেছে। সেদিন যখন প্রশান্ত মেশমহাশয় (মিঃ পি কে সেন) তাকে দেখ্‌তে এসে যাবার সময় বলে' গেলেন "কাল আবার তোমায় দেখ্‌তে আস্‌ব, খোকন", আনন্দে পুলকিত হ'য়ে ভাইটী আমায় বল্‌লে "দিদি, মেশমহাশয় কি ভাল, আবার কালই আমায় দেখ্‌তে আস্‌বেন।" ২৫ শে অক্টোবর সকালে যখন শরদিন্দুদা (ডাঃ শরদিন্দু ঘোষাল) কোলকাতা থেকে ফিরে এসে বল্‌লেন, "কেমন আছ খোকন?" আমায় তখন ভাইটী ডেকে বল্‌লো "দিদি উনি কে ঠিক চিন্‌তে পারলাম না, কিন্তু কি ভাল! আমার নিজের দাদার মত জিজ্ঞাসা করলেন কেমন আছ খোকন।"

ভালবাসা তার ঐ ক্ষুদ্র হৃদয়টি ভরা ছিল; তাই সে সকলের স্নেহ ভালবাসা প্রাণ ভরে' অনুভব করতে পেরেছিল, আর সবাইকে প্রাণ ভরে' ভালবাস্‌তেও পেরেছিল।

কখনও ছোট ভাইটীকে সে চোখের আড়াল করতে চাইতো না। দাদাভাইয়ের এ রকম অবস্থা দেখে ছোটভাইটী কাছে আস্‌তে সাহস পেত না, আর আমরাও তাকে তার কাছে আস্‌তে দিতাম না; তা খোকন বেশ লক্ষ্য করেছিল, আর মনে মনে কষ্টও পেয়েছিল। এক দিন ছোটভাইটী যখন দরজার কাছে এসে পরদার আড়াল থেকে দাদাকে দেখছিল, তখন খোকন বলে' উঠ্‌লো "ঐ যে আমার চোর ভাইটা।" আমি হেসে জিজ্ঞাসা করলাম "সে কি খোকন? চোর ভাই কেন"? সে বল্লো "দেখছো না, জান্‌লা দিয়ে, দরজার আড়াল থেকে ও শুধু আমায় চোরের মত দেখে, কিন্তু কাছে আসে না।" আরেক দিন প্রলাপের মধ্যে ভাইকে হারিয়ে যখন অস্থির হচ্ছিল, আমি তখন ছোটভাইটীকে এনে তাকে বল্লাম "খোকন ভাই, এই তো তোমার মনুভাই, এই দেখ হারায়নি তোমার ভাই।" তখন যেন সে হারাধন পেয়ে বল্‌তে লাগ্‌লো "এই যে আমার প্রাণের ভাইটা, এই যে আমার বুকের ধনটা; কোথায় হারিয়ে গিয়েছিলি ভাইটী আমার? আমায় ছেড়ে আর যাস্ না ভাই। হারিয়ে যাবি তা হ'লে আবার ঐ খেলার ভিড়ে।' কি আবেগের সঙ্গে যে সেদিন এ কথাগুলি ঐ ছোটভাইটীকে জড়িয়ে ধরে' বলেছিল! তারপর আমায় বল্লো, "দিদভাই, দেখোত গুণে' আমরা ঠিক চা'র ভাইবোন আছি কি না।" তারপর নিজেই গুণে' তবে মনে শান্তি পেল। তার সেদিনকার ব্যাকুলতা আজ মনে পড়ে' মনটাকে তোলপাড় করে' দিচ্ছে।

বাবাকে সে খুবই ভালবাস্‌তো, আর খুবই শ্রদ্ধার চোখে দেখ্‌তো। বাবার মত সহিষ্ণু হ'ব, এই তার মনের একটা বিশেষ আকাঙ্ক্ষা ছিল। অনেক বার তাকে বল্‌তে শুনেছি "আমি বাবার ছেলে, বাবার মত যেন সব সইতে পারি।" এই অসুখে বাবার হাতের তৈরী Horlick's milk খেতে সে সব চাইতে ভালবাস্‌তো, আর বেশ একটা পরিতৃপ্তি লাভ করতো ও বল্‌তো "বাবার মত Horlick's Milk করতে তোমরা কেউ জান না।"

মাকে যখন দু'বছরের শিশুর মত জড়িয়ে ধরে' আদর করতো, আবদার করতো, তখন তাকে ছোট সরল শিশুর মত অমন ভাবে আবদার করতে দেখে' কত হেসেছি, আবার কতদিন আনন্দও পেয়েছি! মাকে সে প্রাণ দিয়ে ভালবাস্‌তো—মা'র একটু মাথা ধরলে একটু শরীরে ব্যথা হ'লে খোকনই সব চাইতে ব্যস্ত হ'য়ে মা'র সেবা করতে যেতো। যত আবদার তার মায়ের কাছেই ছিল।

ছোড়্‌দিকে সে নিজের বন্ধুর মত মনে করতো। স্কুল থেকে এসে বিকেলে জলখাবার খেয়ে যখন আমরা চারটী ভাই বোন তেতালার ছাদে যেতাম, দেখ্‌তাম খোকন ছোড়্‌দির সঙ্গে যত রাজ্যের গল্প করতো—স্কুলের গল্প, খেলার গল্প, পথে যেতে আস্‌তে কি দেখেছে সে গল্প, কত গল্পই না করতো। ছোড়্‌দিকে সুন্দর ব্রোচ কিনে দিতে, ভাল খাতা, ভাল পেন্‌সিল কিনে দিতে, কত উৎসাহ দেখেছি। আজ সব কথাই এক এক করে মনে পড়্‌ছে।

দিদিকেও সে ভালবাস্‌তো তার ঐ ক্ষুদ্র প্রাণটি ভরে'। দিদিকে দিদি বলে', সুখ দুঃখ, খেলার সঙ্গী বলে' সে আপনার করে' নিয়েছিল। দিদির সঙ্গে শুতে, দিদির সঙ্গে খেতে, দিদির কাছে নাইতে, দিদির কাছে আবদার করতে সে কত ভাল-বাস্‌তো! "দিদি দিদি" বলে' সর্ব্বদা জড়িয়ে ধরে' ভাইটি আমার কথা বল্‌তো। এই অসুখে দিদিকে পেয়ে সে কত খুসী হয়েছিল। একদিন বলেছিল "দিদি গো, তুমি কাছে থাক্‌লে আমার সব যন্ত্রণা যে দূর হ'য়ে যায়।" হায়, ভাইটি আমার আর তো সে রকম ভাবে কোন দিন বল্‌বে না আমায়! সে এখন সব দুঃখ, সব কষ্ট, সব যন্ত্রণা থেকে মুক্তিলাভ করেছে।

সহ্য সে অনেক করে' গেছে, সহিষ্ণুতারও যথেষ্ট পরিচয় দিয়ে গেছে। অসুখের তৃতীয় দিনেই গেয়েছে—

"আমায় দাও দুঃখ, দাও তাপ, সকলি সহিব আমি।"

তাই আজ মনে হচ্ছে এ রোগের সব যন্ত্রণা, সব কষ্ট ধৈর্য্য ধরে' সহ্য করবার তার কি একটা সচেষ্ট ভাব ছিল। যন্ত্রণা যখন বেশী হতো, আর সহ্য করতে পারতো না, তখন কাতর হ'য়ে বাবাকে ডাক্‌তো। বাবা যখনই বল্‌তেন "দয়াময়কে ডাক, তিনিই তোমার কষ্ট দূর করে' দেবেন।" ভাইটী আমার তখনই সেই কাঁপা কাঁপা স্বরে "দয়াময়, দয়াময়" ও পরে ছোট করে' নিয়ে 'দয়াল, দয়াল" বলে' ডেকে শান্তি পেত। আর দেখেছি বাবা যখনি তার কষ্টের সময়, ভীষণ যন্ত্রণার সময়, "দয়াময়, দয়াময়" বলে' গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়েছেন, তখনি যেন একটু শান্তি পেয়েছে, আরাম পেয়েছে মনে। অধিক জ্বরে যখন গা পুড়ে' যেত, sponge করতে প্রথমে একটু আপত্তি করতো। তার পরই দেখ্‌তাম ভাইটী বুঝতে পারতো যে বোধ হয় আমাদের কষ্ট হচ্ছে. তাই অত্যন্ত ব্যস্ত হ'য়ে তখনি বল্‌তো "আচ্ছা আমায় sponge করো, এখনি করো, শিগ্‌গিরই করো।" কষ্ট হতো, তবুও সে সব ভুলে' গিয়ে যখন বাস্ত হতো sponge করতে, তেতো ওষুধ খেতে, তখন কতদিন আমাদের চোখে জল এসেছে। bed-sore dress করতেও তার ধৈর্য্য দেখে' কেঁদে ফেলেছি। আমাদের চোখে জল দেখে', বাবা মা'র মুখ মলিন দেখে, ভাইটী আমার বলেছে "আমার ঘরে তোমরা হাসিমুখে থাকবে।"

এই দীর্ঘ অসুখে একটী দিনের জন্য সে অসন্তোষ প্রকাশ করে নি বা খিটখিটে হয় নি। বল্‌তো "তেতো ওষুধ খাওয়াবার সময় আগে বলে' দিও দিদি।" চলে' যাবার আগের দিনও অম্লান বদনে তেতো ওষুধ খেয়েছে ভাইটী আমার। শেষ নিশ্বাস ফেলবার পাঁচ মিনিট আগেও ভাইটী সেই ঝাঁঝাল ব্রাণ্ডি কিছু-মাত্র দ্বিধা না করে' খেয়ে গেছে।

তার মিষ্টি ব্যবহার, তার অন্যের জন্য বিশেষ সহানুভূতি ও সমবেদনা দেখে একবারও মনে হতো না যে সে দারুণ রোগে আক্রান্ত রোগী।

সেই চিরশান্তিময় পিতার কোলে আশ্রয় নেবার আগের মুহূর্ত্তে যখন বলে' উঠ্‌লো "বাবা, বড় কষ্ট হচ্ছে, আর যে পারছি না।" তার উত্তরে যখন বাবা বল্লেন "দয়াময়কে ডাক বাবা, এখনই তোমার সব কষ্ট দূর হবে।" তখনই আমাদের ভাইটী এই বলে'ই শেষ নিশ্বাস ফেল্লো,"আমি তো সর্ব্বান্তঃকরণে ডাকছি, বাবা।" তার পরই সব শেষ। মুহূর্ত্তের মধ্যে আদরের ভাইটী আমাদের, বাবা মা'র প্রাণের ধন, সাদা কাচের পুতুলের মত হ'য়ে গেল—চ'লে গেল সে সেই চিরশান্তিময় পিতার কোলে, শান্তি পাবার জন্য। বিদায় নিয়ে গেছে সে সবাইকে ডেকে। মাকে সব প্রথমে ডেকে বলেছে "মাগো, আমি তোমার বড় ছেলে যাই।" বাবাকে, দিদিকে, ছোড়দিকে, মনু ভাইকে, মামাবাবুকে, মামীকে (ক্ষেত্র বাবু ও তাঁর স্ত্রী) শ্রীশ কাকাকে —একে একে সবাইকে সে ডেকে গেছে। আমাদের বুড় মালীর কাছে পর্য্যন্ত যাবার আগে সুন্দর ফুলের তোড়া চেয়ে গেছে। ছোট ভাইটীর গাঁথা মালা ও ঐ মালীর দেওয়া ফুলের তোড়াটী নিয়ে, সে বিদায় নিয়ে গেছে আমাদের সবাইয়ের কাছে। তাই আজ আমাদের শোক, দুঃখ, হাহাকার কর্‌বার কিছুই নেই।

দয়াময়, বুঝি না আমাদের আদরের ভাইটী এখন কোথায়! গুরুজনেরা বলেন, সে তোমারি কোলে আছে। তোমায় ত আমি চিন্‌তে শিখিনি, তাই আজ এই প্রার্থনা করি, আমাদের এই পবিত্র ভাইটীর স্মৃতি চিরদিন হৃদয়ে জাগিয়ে রাখ। আর ভাইটী যেমন শেষ সময়ে তোমায় সর্ব্বান্তঃকরণে ডেকেছিল, তেমনি করে' আমিও তোমায় যেন প্রাণপণে ডাক্‌তে শিখি।

ব্রাহ্মসমাজ

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ২০ শে নবেম্বর জেমসেদপুর নগরীতে শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তীর দ্বিতীয় পুত্র রণজিতকুমার দুই তিন দিনের ম্যালেঞ্জাইটিস্ রোগে দুইটী শিশু সন্তান, অপ্রাপ্তবয়স্কা বিধবা পত্নী, বৃদ্ধ পিতামাতা প্রভৃতিকে রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন।

বিগত ২১ শে নবেম্বর কলিকাতা নগরীতে পরলোকগত পার্ব্বতীচরণ দাস গুপ্তের পত্নী স্বর্ণময়ী দেবী ৭৬ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। বিগত ২৭ শে নবেম্বর তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে পুত্র কন্যাগণ নিম্নলিখিত-রূপ দান প্রতিশ্রুত হইয়াছেন:—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার বিভাগে ৩০০৲ সাধনাশ্রমে ৩০০৲ নববিধান সমাজের প্রচার বিভাগে ৩০০৲ ভবানীপুর সম্মিলন ব্রাহ্মসমাজে ৩০০৲ অবনত জাতিসমূহের উন্নতিবিধায়িনী সভা ২০০৲ কলিকাতা কালা বোবা স্কুল ১৫০৲ কলিকাতা অনাথাশ্রম ১৫০৲ ঢাকা বিধবা-শ্রম ১৫০৲ ঢাকা অনাথ ব্রাহ্মপরিবার সংস্থান ধনভাণ্ডারে ১৫০৲ মোট ২০০০৲।

বিগত ২৮ শে নবেম্বর পরলোকগত মিহিরনাথ রায়ের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ জীবনী পাঠ করেন।

বিগত ২৮ শে নবেম্বর পরলোকগত বীরেন্দ্রকুমার বিশ্বাসের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ আচার্য্যের কার্য্য ও খুল্লতাত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকিশোর বিশ্বাস প্রার্থনা করেন।

বিগত ২৮ শে নবেম্বর লক্ষ্ণৌনগরীতে পরলোকগত ডাক্তার নিশিকান্ত ধরের আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী আচার্য্যের কার্য্য ও জ্যেষ্ঠা কন্যা কুমারী মীরা ধর সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করেন। মধ্যাহ্নে অনেক দরিদ্রকে ভিক্ষা দেওয়া হয় এবং অপরাহ্নে স্থানীয় অনাথাশ্রমের বাল বালিকাদিগকে খাওয়ান হয়। এই উপলক্ষে তাঁহার পত্নী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ৬০৲, তাঁহার শ্বশ্রূমাতাঠাকুরাণী ২০৲ এবং মিঃ ও মিসেস্ বসন্তলাল প্রত্যেকে ২০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চির শান্তিতে রাখুন ও আত্মীয়স্বজনদিগের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

শুভবিবাহ—বিগত ১৪ই নবেম্বর গিরিডি নগরীতে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দত্তের পঞ্চমকন্যা কল্যাণীয়া কুমারী লাবণ্য ও পরলোকগত অধরচন্দ্র মিত্রের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান অশোকচন্দ্রের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত পরেশ-নাথ সেন আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন।

প্রেমময় পিতা নবদম্পতিকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

দান—শ্রীযুক্ত হরকান্ত বসু পত্নীর বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে সাধারণ বিভাগে ১০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন দাস ও তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত সুরেশরঞ্জন দাস মাতার বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ১০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

এ সকল দান সার্থক হউক ও পরলোকগত আত্মা শান্তিলাভ করুন।

ভুল সংশোধন—বিগত সংখ্যা তত্ত্বকৌমুদীর ১৮০ পৃষ্ঠা ১৫ শ ছত্রে শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মল্লিক কর্ত্তৃক প্রদত্ত বন্যা-পীড়িতদের সাহায্য ভাণ্ডারে দান ২৲ স্থলে ৫৲ টাকা হইবে।

উষাকীর্ত্তন—অন্যান্য বৎসরের ন্যায় আগামী ১লা পৌষ (১৬ই ডিসেম্বর) বৃহস্পতিবার হইতে উষাকীর্ত্তন আরম্ভ হইবে। প্রতিদিন কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া অপর কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থানে শেষ হইবে। তাহার বিবরণ শ্রীযুক্ত অমৃতকুমার দত্ত ও শ্রীযুক্ত রাধাচরণ সেনের নিকটে সকল জানিতে পারিবেন। প্রথম দিবস সিটিস্কুল প্রাঙ্গণ (১৩নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট) হইতে আরম্ভ করিয়া সাধনাশ্রমে যাইয়া শেষ হইবে। সকলকে ইহাতে যোগদান করিবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

পুস্তক বিতরণ

২নং চক্রবেড়ে লেন, এলগিন রোড পোঃ আঃ নিবাসী, শ্রীযুক্ত শিতিকণ্ঠ মল্লিক তাঁহার প্রণীত বহু প্রশংসিত "সৎপ্রসঙ্গ" ও "দু ভাই" বিনামূল্যে সকল ব্রাহ্মসমাজকে ও সাধারণ পুস্তকালয়কে বিতরণ করিবেন। "সৎপ্রসঙ্গ" প্রায় ২০০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত, মূল্য ৷৷০ এবং "দু ভাই" উপন্যাস মূল্য ১৲। ব্রাহ্মসমাজের ও সাধারণ পুস্তকালয়ের সম্পাদক, লেখকের নিকট কেবল মাত্র তিন আনা মূল্যের ডাক টিকিট পাঠাইলেই পুস্তক পাইবেন।

ব্রহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় দ্বারা ২০শে অগ্রহায়ণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—বরদাকান্ত বসু, বি-এ

Registered NO 65

অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৬ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৪৯ম ভাগ।	১লা পৌষ, বৃহস্পতিবার, ১৩৩৩, ১৮৪৮ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯৭	প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০
১৭শ সংখ্যা।	16th December, 1926.	অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

হে প্রেমময় পিতা, তোমার অসীম প্রেমে আমাদিগকে তোমার বল ও শক্তি, আনন্দ ও শান্তি, জীবন ও কল্যাণ, প্রদান করিবার জন্য তুমি নিয়তই আহ্বান করিতেছ। আমরা তাহা না শুনিয়া যখন তোমা হইতে দূরে চলিয়া যাই, আপনার ভাবে আপনার পথে চলিতে যাইয়া পাপতাপে আক্রান্ত হই, নানা সংগ্রামে বিধ্বস্ত, দুঃখ বেদনায় জর্জ্জরিত হই, তখন আবার আরও বিশেষ ভাবে তোমার পথে চলিবার জন্য, তোমার নিকট হইতে নব জীবন লাভ করিয়া নূতন বলে ও উৎসাহে আনন্দ ও কল্যাণের পথে অগ্রসর হইবার জন্য, চারিদিক হইতে তোমার মধুর ডাক আসে—তোমার মঙ্গল নিয়মে নব জাগরণের একটা বিশেষ ব্যবস্থা উপস্থিত হয়। তাই তোমারই কৃপাতে আমাদের জন্য আবার উৎসব আসিতেছে। চির দিনই তোমার উৎসব আমাদের প্রাণে একটা নূতন শক্তি সঞ্চার করিয়া যায়, হৃদয়ে পবিত্র আকাঙ্ক্ষা ও মহৎ সঙ্কল্প জাগাইয়া যায়, জীবনপথে আলোকরেখা বিস্তার করে। তাই আমরা আশার সহিত তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছি। এবার চারিদিকে শোক তাপের আগুন যে ভাবে জ্বলিয়াছে, অন্ধকারে সকল দিক যে ভাবে ঘিরিয়াছে, তাহাতে আমরা নিতান্ত ভারাক্রান্ত ও নিরাশায় মুহমান হইয়া পড়িতেছি। এই সময় তোমার মধুর উৎসবের আহ্বান আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রাণে কিছু আশা সঞ্চার করিতেছে। কিন্তু আমরা তোমার এই আহ্বান বাহিরের কাণ দিয়া যতটা শুনিতেছি, অন্তরের অন্তরে সত্য ভাবে যে ততটা অনুভব করিতেছি, তাহা ত বলিতে পারি না। তোমার সত্য বাণী শুনিলে প্রাণ যেরূপ আকুল হয়, আশা উৎসাহে মাতিয়া উঠে, তাহার কোনও লক্ষণ ত আমাদের মধ্যে দেখা যাইতেছে না। হে হৃদয়দর্শী দেবতা, তুমি ত আমাদের অন্তরের প্রকৃত অবস্থা জানিতেছ। তুমি কৃপা করিয়া তোমার বাণী না শুনাইলে আমরা তাহা প্রকৃতরূপে শুনিতে পারি না। নানা কোলাহলে আমরা কিরূপ মত্ত থাকি, তাহা তুমি দেখিতেছ। তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে তোমার সে আহ্বান শুনিবার জন্য উৎকর্ণ কর। আমরা আশা ও উৎসাহের সহিত তোমার মধুর উৎসবের জন্য প্রতীক্ষা করি। তোমার অসীম প্রেম আমাদের প্রতি জীবনে জয়যুক্ত হউক। তোমার ইচ্ছাই সর্ব্বোপরি পূর্ণ হউক।

নিবেদন।

প্রচার—প্রচার কি কেবল কথা ব'লে হয়? জীবন দিয়ে প্রচার কর। তুমি কি প্রচার করবে? তুমি নিজে কি তা পেয়েছ? তুমি নিজে কি ঈশ্বরের নামে মেতেছ! তাঁর নামের মিষ্টত্ব কি অনুভব করেছ? তাঁতে কি আত্মসমর্পণ করেছ? তাঁর নাম নিয়ে পাপ ও তাপের হাত হ'তে কি মুক্ত হয়েছ? যদি হ'য়ে থাক, তোমার বক্তৃতার প্রয়োজন নাই, কথা বল্‌বার প্রয়োজন নাই; তোমার জীবন শত বক্তৃতার কাজ করবে। একটি চাহনি, একটা কথা, শত শত লোকের প্রাণ উদ্বুদ্ধ করবে। তুমি যেখানে যাবে, মানুষ অবাক হ'য়ে তোমাকে দেখ্‌বে,—তোমার দৃষ্টি কোন্ দিকে, তোমার আকাঙ্ক্ষা কি, তুমি কি সম্পদ্ পেয়েছ, কোন্ রাজ্যে তুমি বাস কচ্ছো, সবই তারা দেখবে; আর তারাও ঐ পরম সম্পদ্ লাভের জন্য আকুল হবে। কেবল কথা দিয়ে নয়, কেবল শাস্ত্রব্যাখ্যাদ্বারা নয়, জীবন দিয়ে, প্রেম দিয়ে, ত্যাগ দিয়ে, সেবা দিয়ে, চিন্তা দিয়ে প্রচার ক'রে যাও। ভগবানে প্রাণ

মন সমর্পণ কর, তাঁতে প্রীতি অর্পণ কর। তাঁর প্রিয় কার্য্য প্রাণ মন দিয়ে সাধন কর। প্রচার আপনি হবে।

অজানার বার্ত্তা—অজানা দেশ হ'তে, দৃশ্য জগতের ভিতর দিয়ে, প্রিয়তমের কত বার্ত্তা আসে, তা কি তোমরা শুনতে পাও না? বনে উপবনে ফুল কি সৌন্দর্য্য ছড়িয়ে ফুটে উঠে, কত সুগন্ধ বিস্তার করে। তার ভিতর দিয়া কত কথা বলে, তা কি শোন না? পাখী গান গেয়ে গেয়ে দেশ ভাসিয়ে দেয়, সে কি কথা ব'লে যায়, কোন্ অজানা দেশ থেকে প্রিয়তমের কি বার্ত্তা নিয়ে আসে, তা কি শোন না? সমীরণ গন্ধ বহন ক'রে কত আনন্দ বিতরণ করে, তপ্ত প্রাণ শীতল করে! সে কার স্পর্শ নিয়ে আসে, কোন্ দেশের সন্দেশ বহন করে, তা কি খবর লও? প্রাতঃকালে চোখ মেলে দেখি, তরুণ ভানু সহস্র রশ্মিজাল বিস্তার ক'রে ধীরে ধীরে উঠ্‌ছে। সে কার আলোক লয়ে, কোথা হ'তে তেজ পেয়ে ধরা উজ্জ্বল করে, তৃপ্ত করে? কি কথা সে বলে? পৌর্ণমাসী রজনীতে চন্দ্রমা কাহার মাধুর্য্য ছড়িয়ে যায়? বনস্পতি মস্তক উন্নত ক'রে কার চরণ নীরবে বন্দনা করে? লতা পাতা ফুল ফল কার সন্দেশ বহন করে? অনন্ত নক্ষত্রখচিত অসীম আকাশ কোন্ খবর তোমার কাণে ঢেলে দেয়? একবার কাণ পেতে শোন; আমার প্রিয়তমের বার্ত্তাই তারা বহন করে। অজানা দেশ হ'তে প্রাণ-মাতান সঙ্গীতলহরী ভেসে আস্‌ছে; তা শুনে বিভোর হ'য়ে থাকি।

জাগ জাগ—রাত প্রভাত হ'তে না হ'তে ভোঁ বেজে উঠে; কর্ম্মীদিগকে বলে, জাগ জাগ, কর্ম্মের সময় হ'য়ে যায়। প্রাতঃ সূর্য্যের আলোক দরজা জানালা দিয়ে গৃহে প্রবেশ ক'রে গৃহস্থকে বলে, জাগ জাগ, দিন এসেছে, কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। মৃদু সমীরণ প্রবাহিত হ'য়ে ঘুমন্ত মানুষকে ডেকে বলে, চেয়ে দেখ, ধরণী কি আলোকে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে, ধরা কি শোভায় উদ্ভাসিত হয়েছে! আমার জীবনেও এক দিন ডাক এসেছিল, জাগ জাগ, আর ঘুমাবার সময় নাই। আমি ত ঘুমিয়ে ছিলাম; সে নিদ্রার যে অবসান হবে, তা ত জান্‌তাম না। সুখস্বপ্নে বিভোর হ'য়ে ছিলাম, কে প্রাণে এসে সাড়া দিল, কোন্ সমীরণের স্পর্শ অনুভব কর্‌লাম, কোন্ আলোক চোখের উপর এসে পড়্‌ল, কোন্ বংশীধ্বনি কর্ণে প্রবেশ কর্‌ল, যেন তারা সকলেই ব'লে উঠ্‌ল, জাগ, জাগ, চেয়ে দেখ,

বিশ্ব ভুবনরঞ্জন, ব্রহ্ম পরম জ্যোতি,
অনাদি দেব জগপতি প্রাণের প্রাণ,

তোমারই দ্বারে এসেছেন; জাগ জাগ, তাঁকে প্রণাম কর, তাঁকে বরণ কর; তাঁর চরণে আত্মনিবেদন কর।

সম্পাদকীয়

উৎসবের আহ্বান।—প্রখর সূর্য্যতাপে উত্তপ্ত হইয়া সমস্ত জগৎ যখন অগ্নিময় হইয়া উঠে, বায়ুমণ্ডল ও ধরণী-পৃষ্ঠ অসহনীয় বোধ করিয়া, তৃণ শস্য নদী তড়াগ জলাশয় সকল শুষ্ক দেখিয়া, জীবকুল ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতে থাকে, তখন অভিজ্ঞ লোকগণ এই বলিয়া সকলকে আশ্বস্ত করেন যে, 'ভয় নাই, প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে অচিরেই প্রচুর বারিবর্ষণ হইয়া মেদিনী সুশীতল ও নব তৃণ শস্যে আচ্ছাদিত হইবে, জীবকুলের আনন্দ ও আরামের কারণ হইবে।' মঙ্গলময়ের এই মঙ্গল ব্যবস্থা যে প্রকৃতির মূলে সর্ব্বদাই কার্য্য করিতেছে, তাহা সকলেই প্রতিনিয়ত দেখিতে পাইতেছে; কিন্তু অল্প লোকেই তাহা বিশেষ-ভাবে লক্ষ করিয়া থাকে, বিশেষতঃ ইহা স্মরণে রাখিয়া শান্ত ভাবে সে তাপ সহ্য করিতে ও আশার সহিত প্রতীক্ষা করিতে সমর্থ হয়। অধিকাংশ লোকই অস্থির হইয়া উঠে, বিধাতার বিরুদ্ধেও অভিযোগ করিতে ক্ষান্ত হয় না। ইহাতে যে তাহাদের যন্ত্রণার কিছুই লাঘব হয় না, বরং উহা আরও বর্দ্ধিত হয়, তাহা দেখিয়াও চৈতন্যোদয় হয় না,—তাহারা শান্ত ভাবে উহা বহন করিতে শিক্ষা করে না। ইহার যে একটা বিশেষ প্রয়োজনীয়তাও আছে, জগতের কল্যাণের জন্যই যে এরূপ ব্যবস্থা, ইহা না হইলে যে তীব্রতর যন্ত্রণা, অধিকতর অকল্যাণই, ভোগ করিতে হয়,—যেখানে অভাব সেখানেই যে তাহা পূরণেরও ব্যবস্থা রহিয়াছে, কেবল তাহা নহে, অভাব যে পরিমাণে বেশী সেই অনুপাতে যে তাহার দ্রুত পরিপূরণের আয়োজনও তত অধিক,—তাহা সাধারণ লোকে দেখিয়াও দেখে না, অধিকাংশ সময়ই একেবারে ভুলিয়া থাকে। তাহাদের সংকীর্ণ দৃষ্টি ও চিন্তা বর্ত্তমানেই আবদ্ধ থাকে বলিয়া, উপস্থিত যন্ত্রণাটাই সর্ব্বাপেক্ষা পীড়াদায়ক হইয়া উঠে। কিন্তু এই যন্ত্রণার তীব্রতাও আবার তাহাদিগকে অপর দিকে চাহিতে বাধ্য করিয়া, অবশেষে এই তত্ত্ব বুঝিতে সমর্থ করে, এবং পরিণামে কল্যাণসাধন বিষয়ে সহায় হয়। ইহাই আবার মঙ্গলময়ের মঙ্গল বিধিতে বিশ্বাস জন্মাইয়া, নিরাশার মধ্যে আশার সঞ্চার করে, এবং তাহার হৃদয়ে প্রেমময় পিতার শরণ লইবার আকাঙ্ক্ষা জাগায়। মানুষ যখন নানা সংগ্রামে বার বার পরাভব হেতু আপনার দুর্ব্বলতায় হতাশ হইয়া পড়ে, তখনও আবার সে স্বভাবতঃই অনন্যগতি হইয়া নূতন বলের জন্য আকুলপ্রাণে জীবনদেবতার শরণাপন্ন হইতে বাধ্য হয়। সেই পরাজয় ও দুর্ব্বলতার মধ্যেই যে নূতন জীবন ও বল পাইবার ব্যবস্থা রহিয়াছে, তাহা একটু প্রণিধান করিলেই দেখিতে পাওয়া যায়। রোগের মধ্যেই তাহার প্রতিকারেরও ব্যবস্থা রহিয়াছে—রোগযাতনাই স্বাস্থ্যসম্পাদনে সহায়তা করে। মৃত্যুর মধ্যেই নবজীবনের আহ্বান আছে। এইরূপে এই জগতের মধ্যে সকল বিষয়েই প্রেমময় পিতার যে মঙ্গল ব্যবস্থা রহিয়াছে, তাহা আমাদিগকে নিয়তই নূতন জীবন ও বল দিবার জন্য, উন্নতিপথে অগ্রসর করিবার জন্য, তাঁহার শরণাপন্ন হইতে আহ্বান করিতেছে। চারিদিকের শোক তাপ ও বিবিধ প্রকার

ব্যর্থতার মধ্যে আমরা এবার যেরূপ দগ্ধ বিদগ্ধ হইতেছি, তাহার ভিতরে নিশ্চয়ই আমাদের জন্য মঙ্গলবিধাতার প্রেমের আহ্বান রহিয়াছে। শীতল করিবার জন্যই তিনি দগ্ধ করেন, নূতন জীবন প্রদান করিবার জন্যই মৃত্যু ঘটান, পরম আনন্দদায়ক জন্ম দিবার জন্যই অসহনীয় প্রসব-বেদনা উপস্থিত করেন। নূতন ফিনিক্স জন্ম দিবার জন্যই বৃদ্ধ ফিনিক্স আপনাকে অগ্নিতে ভস্মসাৎ করে, এই মিশর দেশীয় আখ্যায়িকার মধ্যে গভীর সত্য নিহিত রহিয়াছে। কিন্তু ইহা যতই সত্য হউক না কেন, শুধু সত্য ও নিশ্চিত বলিয়াই যে আমরা সকলেই তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেছি, সে আহ্বান সাক্ষাৎভাবে শুনিতে পাইতেছি, এরূপ বলা যায় না; বরং আমাদের অধিকাংশের পক্ষে ইহার বিপরীত কথাই সত্য—আমরা অনেকেই তাহা দেখিতেছি না, শুনিতেছি না। আমরা বাহির লইয়া এত ব্যস্ত, নানা কোলাহলে এত মত্ত যে, ভিতরে প্রবেশ করিবার, নীরব বাণী শুনিবার, বিশেষ কোনও সম্ভাবনা দেখা যায় না।

এ সময় স্বভাবতঃই উৎসবের কথা আমাদের সকলের মনে জাগে, সন্দেহ নাই—এরূপ কোনও লোক আছে কি না জানি না, যাহার মনে এক বারও উৎসবের কথা জাগিতেছে না. এরূপ কেহ নাই বলিয়াই আমাদের অনুমান হয়। কিন্তু সে কথা মনে জাগিলেই যে আমরা সকলে তাহার মধ্যে সকলকে শান্তি ও নব-জীবন প্রদান করিবার জন্য প্রেমময়ের মঙ্গল ব্যবস্থা দেখিতে পাইতেছি, তাহা কখনও দৃঢ়তার সহিত বলা যায় না। আজ কাল উৎসবকে কয় জনে প্রকৃত দৃষ্টিতে দেখে, তাহা বলা কঠিন। বহু লোক যে ইহাকে একটা বাহ্যিক ব্যাপার, আমোদ আহ্লাদ বা হৈ চৈ করিবার সুযোগ ভিন্ন অপর কিছু মনে করে না, সহজেই এরূপ অনুমিত হয়। উৎসব যে মূলতঃ একটা আধ্যাত্মিক ব্যাপার, নবজীবন লাভের, নূতন আশা বল ও উৎসাহ সংগ্রহের সুযোগ, তাহা কখনও ইহারা ভাবে না, বুঝিতে পারে না। ইহাদের উৎসবের সঙ্গে প্রেমময় পিতার সম্পর্ক অতি অল্পই আছে। সুতরাং ইহারা যে ইহার মধ্যে তাঁহার প্রেমের আহ্বান পায় না. তাহা বলাই বাহুল্য। আর যাহারা যথার্থই উৎসবকে প্রকৃত চক্ষে দেখিয়া থাকে, সত্য ভাবে জীবনে উৎসব-দেবতাকে লাভ করিবার মহা সুযোগ বলিয়া জানে, তাহারাও সকলেই যে সকল সময়ে ঠিক ভাবে সেই আহ্বান শুনিতে পায়, তাহা বলা কঠিন। অনেকে তাহা জানিয়াও সে জন্য তত উৎসুক না হইতে পারে, উদাসীন ভাবেই কাল কাটাইতে পারে, বাহির লইয়াই তৃপ্ত থাকিতে পারে। সত্যই এরূপ বহু লোক যে আমাদের মধ্যে আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহাদের জীবনে অভাব বোধ নাই, অভাবমোচনের কোনও আকাঙ্ক্ষা নাই, উৎসবের জন্য কোন আকুলতা হৃদয়ে আসে নাই, তাহারা সেই আহ্বান শ্রবণ করিবার জন্য যত্নশীল হইবে কেন? আর তাহার জন্য চেষ্টিত না হইলে শুনিবেই বা কি প্রকারে? তাহার পরে, বিচার বিতর্কের দ্বারা, চিন্তা ও আলোচনা দ্বারা, জগতের মূলে বিধাতার মঙ্গল ব্যবস্থা দেখিলেই, আমাদের কল্যাণের জন্য, আমাদিগকে দুঃখ তাপের মধ্যে শান্তি, দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতার ভিতরে বল ও উৎসাহ, নিরাশার মধ্যে আশা, মৃত্যুর ভিতরে জীবন, দিবার জন্যই যে উৎসব আসিতেছে, ইহা বুঝিলেই. এরূপ মীমাংসায় উপস্থিত হইলেই, সে আহ্বান সত্য ভাবে শুনিতে পাওয়া যায়, এ কথাও বলা যায় না। উহা একটা অকাট্য সিদ্ধান্তের ব্যাপার হইতে পারে বটে, কিন্তু সে সিদ্ধান্ত যতই অভ্রান্ত হউক না কেন, উহা হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশকে স্পর্শ নাও করিতে পারে,—অনেকটা পরোক্ষই থাকিয়া যাইতে পারে। অথচ সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ভাবে না শুনিতে পারিলে, উহা প্রকৃতরূপে কার্য্যকারী হইতে পারে না, সত্য উৎসবের জন্য আমাদিগকে যথার্থ ভাবে প্রস্তুত করিতে পারে না। কাজেই আহ্বান যে বাস্তবিকই প্রেমময় পিতার নিকট হইতে সাক্ষাৎ ভাবে আসিতেছে, এবং শুধু সাধারণ ভাবে সকলের জন্য নয়, বিশেষ ভাবে আমার জন্যও আসিতেছে, তাহা অনুভব করিতে না পারিলে কিছুতেই বলা যায় না যে, আমরা সাক্ষাৎ ভাবে তাঁহার উৎসবের আহ্বান শুনিতে পাইয়াছি। উৎসব সকলের জন্য একটা সাধারণ আয়োজন হইলেও, আমার জন্যও যে একটা বিশেষ ব্যবস্থা, তাহা পরিষ্কাররূপে অনুভব করিতে না পারিলে, কোনও প্রকারেই বলা যায় না আমরা উহার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়াছি। প্রকৃত পক্ষে উহা কিন্তু সকলের জন্যই বিশেষ ব্যবস্থা—যেন না বিশেষ সময়ে বিশেষ অবস্থাতেই উহা ঘটে। বিশেষ বলিয়া যে উহা সাধারণের অন্তর্গত নয়, বা সাধারণের বিরোধী তাহা নহে।

ঝটিকাবর্ত্ত ও জলপ্লাবন বিশেষ অবস্থায় বিশেষ ঘটনা। উহা সর্ব্বদা সকল স্থানে ঘটে না—বিশেষ সময়ে, বিশেষ স্থানে, বিশেষ অবস্থায় সংঘটিত হয়। কিন্তু তাহা হইলেও উহার উৎপত্তি ও কার্য্যকারিতা সাধারণ নিয়মেরই অন্তর্গত—সাধারণ বিধির সঙ্গে তাহার কোন প্রকার বিরোধিতা নাই। যে নিয়মে বায়ুপ্রবাহ নিয়ত মন্দগতিতে সঞ্চরমাণ, স্বল্পকায় জলস্রোত ধীর গতিতে প্রবাহ-মান, ঠিক সেই নিয়মেই উহাদেরও উৎপত্তি। শেষোক্তদের দ্বারা সাধারণ কার্য্য সাধিত হইলেও, প্রথমোক্তদেরও বিশেষ প্রয়োজন আছে,—একের দ্বারা অন্যের কার্য্য সাধিত হয় না, হইতে পারে না। উভয়েই একই বিশ্ববিধাতার মঙ্গল ব্যবস্থার অন্তর্গত। একই মৌলিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিভিন্ন অবস্থার উপযোগী বিভিন্ন ব্যবস্থা,—কোথাও তাঁহার কল্যাণভাবের বিন্দু পরিমাণ খর্ব্বতা নাই। আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে প্রেমময়ের মঙ্গল ব্যবস্থার অনুসন্ধান করিতে গেলেও, একই তত্ত্বে উপনীত হইব। তাঁহার অসীম প্রেম ও করুণা আমাদের জীবন বর্দ্ধন ও পরি-পোষণের জন্য নিয়ত প্রবাহমান হইলেও, উৎসবের সময় যে বিশেষ ভাবে প্রচুর পরিমাণে বর্ষিত হয়, ঝটিকাবর্ত্ত বা জলপ্লাবনের ন্যায় আসিয়া সকল সঞ্চিত মলিনতা বিধৌত ও দূরীভূত করিয়া নব-জীবনের সঞ্চার করে, নূতন স্বাস্থ্য সৌন্দর্য্য প্রদান করে, তাহার মধ্যে নিশ্চয়ই একটা বিশেষত্ব আছে। উহা নিশ্চয়ই প্রতি দিনের নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা নহে। কিন্তু তাই বলিয়া উহা যে সাধারণ বিধি ও ব্যবস্থার অন্তর্গত নহে, অথবা তাহার বিরোধী, এরূপ মনে করিবার কোনও হেতু নাই। আর সে সময় তাঁহার প্রেম ও করুণা আমরা যত অধিক পরিমাণেই লাভ করি না কেন, অন্য সময়ে যে তাঁহার মধ্যে তাহার কোনও প্রকার খর্ব্বতা ঘটে, অথবা উক্ত সময়ে বিন্দু পরিমাণেও প্রাচুর্য্য সংঘটিত হয়,

ইহা কল্পনাও করা যায় না। প্রাকৃতিক জগতে যেমন দেখিতে পাওয়া যায়, প্রখর তাপে উত্তপ্ত হইয়া বায়ু ও জলরাশি যখন দ্রুতবেগে উর্দ্ধে উত্থিত হয়, নিম্ন দেশে তাহাদের বিশেষ অভাব ঘটে, তখনই প্রবল ঝটিকাবর্ত্ত ও প্রচুর বারিবর্ষণ বা জলপ্লাবন উৎপন্ন হয়; এখানেও তেমনি নানা দুঃখতাপে দগ্ধ নরনারীর আকুল আকাঙ্ক্ষা প্রার্থনা যখন উর্দ্ধে প্রেমময় জীবন-দেবতার উদ্দেশে উত্থিত হয়, সকল হৃদয়ে গভীর অভাব ও শূন্যতা অনুভূত হয়, তখন স্বাভাবিক নিয়মেই জীবনের উপর দিয়া প্রেমের প্রবল ঝড় বহিয়া যায়, প্রচুর পরিমাণে কৃপাবারি বর্ষিত হইয়া সকল প্লাবিত করিয়া ফেলে। ইহার দ্বারা তাঁহার প্রেমের হ্রাস বৃদ্ধি সূচিত না হইলেও, ইহাকে যদি শুধু একটা প্রাকৃতিক নিয়মের কার্য্য মনে করি, উহা সম্পূর্ণরূপে আমাদেরই উপর নির্ভর করে ভাবি, তবে নিশ্চয়ই আমরা মহা ভ্রমে পতিত হইব। শুধু তীব্র দহন, মহা শূন্যতা, বা অভাব জাগিলেই যে হইল, তাহা নহে। তাহা আমাদিগের প্রাণকে তাঁহার সম্মুখীন না করিয়া বিরুদ্ধে দিকেও লইয়া যাইতে পারে। জগতে এরূপ ঘটিতে যে না দেখা যায়, তাহা নহে। জড় পদার্থের ন্যায় আমাদের গতি যে নির্দ্দিষ্ট পথকে অনুসরণ করিয়া চলিবেই, তাহার কোনও নিশ্চয়তা নাই! আমাদিগকে তিনি যে স্বাধীন গতি প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে আমরা চিরকালের জন্য সম্পূর্ণরূপে তাঁহার বিরুদ্ধ পথে চলিবার পূর্ণ স্বাধীনতা না পাইলেও, কিছু কালের জন্য কিছু দূর পর্য্যন্ত তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিয়া চলিবার অধিকার যে পাইয়াছি, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার ফলে বিভিন্ন লোক বিভিন্ন দিকে ধাবিত হইতে পারে, কেহ হয় ত তাঁহার দিকে যাইবার জন্য, তাঁহাকে পাইবার জন্য ব্যস্ত, অপর কেহ হয় ত তাঁহাকে ভুলিয়া অপর দিকে, বিরুদ্ধ দিকে, যাইতেই নিযুক্ত। কিন্তু তাই বলিয়া যে তিনি এক জনকে দূরে তাড়াইয়া দিতে, অথবা বিনা বাধায় আপনার পথে চলিতে দিতে, তাহাকে কাছে না ডাকিয়া শুধু অপরকে কাছে টানিয়া লইতে ব্যস্ত, এরূপ নহে। তাঁহার প্রেম উভয়ের জন্যই সমান—বরং এক অর্থে বিপথগামীর জন্যই অধিক। তাঁহার ডাক শুনে না বলিয়া যে তিনি ডাকিতে ক্ষান্ত হন তাহা নহে, বরং আরও অধিক করিয়া ডাকেন।

তাঁহার উৎসবের ব্যবস্থা যেমন সকলের জন্য সমবেত ভাবে ও প্রত্যেকের জন্য ব্যক্তিগতভাবে, উভয় প্রকারেই প্রয়োজনীয়, তেমনি তাঁহার আহ্বানও সমগ্রভাবে ও ব্যক্তিগত ভাবে, উভয় আকারেই উপস্থিত হয়। কিন্তু আহ্বান আসিলে কি হয়? না শুনিলে তাহা কোনও কাযেই আসে না, তাহার দ্বারা কোনও উপকারই সাধিত হয় না। সে আহ্বান যখন আমরা সাক্ষাৎ ভাবে স্পষ্টরূপে শুনিতে পাই, তখনই আমরা তাঁহার পশ্চাতে ছুটিবার জন্য আগ্রহান্বিত হই, আশা ও উৎসাহে আমাদের হৃদয় ভরিয়া উঠে, সকল উদাসীনতা অবসন্নতা বিদূরিত হয়। সুতরাং আহ্বান আসিলেই যথেষ্ট হইল না, তাহা শোনাও অপরিহার্য্যরূপে আবশ্যক। কিন্তু তাঁহার আহ্বান শুধু সাধারণ ভাবে নয়, ব্যক্তিগত ভাবেও আমাদের প্রত্যেকের নিকট বারম্বার আসা সত্ত্বেও যদি আমরা তাহা না শুনিতে পাই, তবে নিশ্চয়ই তাহার জন্য একমাত্র আমরা নিজেই যে দায়ী, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। আমরা শুনিবার জন্য কিছুমাত্র আকাঙ্ক্ষিত ও চেষ্টিত নই বলিয়াই শুনিতে পাই না। এ বিষয়ে যে কাহারও কোনও প্রকার স্বাভাবিক বধিরতা আছে, এমন কথা কিছুতেই বলা যায় না। শুধু যে শক্তি তিনি সকলকেই দিয়াছেন তাহা নহে, তাহা কেহ কখনও একেবারে বিনষ্টও করিতে পারে না। এ স্থলে কোনও মৌলিক বিকলতাও নাই। সুতরাং শুনিতে না পাইবার একমাত্র কারণ উদাসীনতা ও অবহেলা। উৎকর্ষতা ও অপকর্ষতার কোনও রূপ তারতম্য যদি লক্ষিত হয়, তবে তাহারও কারণ ঐ একই উদাসীনতা ও অবহেলা। সামান্য একটু আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা যত্ন থাকিলেই শুনিতে পাওয়া যায়। ইচ্ছা ও আগ্রহ থাকিলে চেষ্টা যত্ন আপনা হইতেই আসে। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে আমাদিগকে উদাসীনতা ও অবহেলা পরিত্যাগ করিয়া ইচ্ছা ও আগ্রহ আনিতে হইবে, চেষ্টা যত্নে নিযুক্ত হইতে হইবে। আমরা যদি শুনিবার জন্য আগ্রহের সহিত চেষ্টা যত্ন করি, তবে নিশ্চয়ই শুনিতে পারিব। আমাদের সেরূপ কোনও আগ্রহ নাই বলিয়াই আমরা কিছুমাত্র চেষ্টা যত্ন করি না, তাই শুনিতেও পাই না। এ প্রকার উদাসীনতা ও অবহেলা কোনও মতেই শোভা পায় না।

আমরা যদি নিতান্ত বহির্ম্মুখীনই হইয়া থাকি, বাহির ছাড়িয়া ভিতরের দিকে তাকাইবার প্রবৃত্তি হারাইয়া থাকি, তাহা হইলেও নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। বাহিরেও তাঁহার আহ্বান আছে, তাহা শোনা অপেক্ষাকৃত সহজ। বাহিরের নানা কোলাহলের মধ্যেও তাহা আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিতে এবং আমাদিগকে সহজে অলক্ষিতে বাহির হইতে ভিতরে লইয়া যাইতে পারে। সুতরাং বাহিরকে অগ্রাহ্য করিতে হইবে না, বরং বাহির অবলম্বন করিয়াই ভিতরে প্রবেশ করিতে যত্নশীল হইতে হইবে। এ বিষয়ে ভক্তবাণী পাঠ ও আলোচনা হইতে যে বিশেষ সাহায্য পাইতে পারি তাহা বলা বাহুল্য—সকলেই তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ভক্তবাণীর মধ্য দিয়া তাঁহারই বাণী আমাদের নিকট উপস্থিত হয়, ভক্তদিগের মধ্য দিয়া তিনিই আমাদিগকে আহ্বান করেন; কেন না তিনিই ভক্তদিগকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, তিনিই একের দ্বারা অপরের, সবলের দ্বারা দুর্ব্বলের, ব্যাকুলাত্মাদের দ্বারা উদাসীনের, সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাই তাঁহাদের বাণী ও দৃষ্টান্ত আমাদের উদাসীনতা দূর করিতে বিশেষ সহায়তা করে। সে বাণী যে সকল সময় সাক্ষাৎভাবে আমাদের কর্ণে আসিয়া পৌঁছাই আবশ্যক, তাহাও নহে। যাঁহাদের জড় কণ্ঠ চিরতরে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তাঁহাদের অজড় বাণীও অনেক সময় আমাদের জড়ীয় কর্ণকে স্পর্শ না করিয়া অন্তর রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে। ভক্ত আচার্য্য শিবনাথের আহ্বান বাণী কি এখনও আমাদের কর্ণে ধ্বনিত হয় না? তাঁহার আহ্বানবাণী কি এ সময়ে আমাদের হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত করিয়া আমাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিতে সাহায্য করে না? আজ কি তাঁহার সেই বজ্রনির্ঘোষ—"শুন শুন বাণী। (আজ শ্রবণ পেতে) (আজ বধির আর থেকো না রে) দাঁড়ায়ে হৃদয় দ্বারে, ডাকিছেন বারে বারে (বলে আয় পাপী ত্বরা ক'রে)" ইত্যাদি—আমাদিগকে হৃদয়দেবতার

আহ্বান-বাণী শুনিবার জন্য আকুল করিয়া তুলিবে না? এরূপ আরও কত ভক্তের কত বাণী আমাদের জন্য রহিয়াছে—

"চল সে অমৃত-ধামে শান্তি-হারা নরনারী
শীতল হবে যদি, চল সবে ত্বরা করি,"
"তাঁহার আনন্দ-ধারা জগতে যেতেছে ব'য়ে,
এস সবে নরনারী আপন হৃদয় ল'য়ে"। ইত্যাদি—

এখানে তাহার বিস্তারিত উল্লেখের কোনও প্রয়োজন নাই। আমরা প্রত্যেকে নিজে নিজে তাহা বাছিয়া লইতে পারিব। আসল কথা, আমরা যদি এখন পর্য্যন্ত ভাল করিয়া হৃদয় মধ্যে প্রেমময় দেবতার জীবনপ্রদ উৎসবের মধুর আহ্বান শুনিতে না পাইয়া থাকি, তবে তাহা শুনিবার জন্য আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে আগ্রহান্বিত ও চেষ্টাযুক্ত হইতে হইবে। কারণ, তাহা না হইলে আমরা প্রকৃতরূপে উৎসব সম্ভোগে সমর্থ হইব না, আর উৎসবও তেমন জীবন্ত ও ফলপ্রদ হইবে না। উৎসবের সফলতা ও পূর্ণতা যে আমাদের সকলেরই জন্য একান্ত আবশ্যক, আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায়, একেবারে অপরিহার্য্য, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। আর তাহার জন্য আমাদের প্রত্যেকেরই আহ্বান আসিয়াছে, তাহাও সুনিশ্চিত। আমরা যদি সে আহ্বান শুনিতে না পাইয়া থাকি, তবে তাহাতে আমরা নিজেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইব, এবং সঙ্গে সঙ্গে অপরেরও ক্ষতির কারণ যে না হইব এমন নহে। সুতরাং আর আমাদের এ বিষয়ে উদাসীন থাকিলে চলিবে না। যে কোনও উপায়ে আমরা প্রেমময়ের প্রেমের আহ্বান শুনিতে পারি, সর্ব্বপ্রযত্নে তাহাই করিতে হইবে। করুণাময় পিতা আমাদের সহায় হউন। তিনিই আমাদের সকলকে তাঁহার উৎসবের আহ্বান শুনিতে সমর্থ করুন। তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছাই আমাদের সমাজে ও প্রতি জীবনে জয়যুক্ত হউক।

তত্ত্ববোধিনী সভা ও ব্রাহ্মসমাজ।

১

[ব্রাহ্মসমাজের শতাব্দীপূর্ত্তি উপলক্ষে মহর্ষির আত্মজীবনীর যে নূতন সংস্করণ প্রস্তুত হইতেছে, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক লিখিত তাহার পরিশিষ্টের পাণ্ডুলিপি হইতে গৃহীত।]

রাজা রামমোহন রায়ের বিলাত গমনের পর প্রধানতঃ দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় (কিছুকাল মাসিক ৬০ টাকা ও পরে মাসিক ৮০ টাকা হিসাবে) নিয়মিত অর্থসাহায্য করিয়া ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করিতেছিলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুরের এই অর্থসাহায্য, এবং রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের বেদান্তজ্ঞান ও ব্রাহ্মসমাজের প্রতি অনুরাগ,—এই উভয়ের সমাবেশ না হইলে রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর হইতে দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসমাজে যোগদান পর্য্যন্ত নয় বৎসর কাল (১৮৩৩—১৮৪২) ব্রাহ্মসমাজ জীবিত থাকিতে পারিত না।

দেবেন্দ্রনাথ যখন নিজ ব্যাকুলতার দ্বারা চালিত হইয়া ব্রাহ্মসমাজের সহিত মিলিত হইলেন, তখন ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যতঃ দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাড়ীর একটি অনুষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। এই কথা স্মরণ রাখিলে দেবেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক অবাধে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যভার নিজহস্তে গ্রহণ করিতে পারা, এবং উহার কার্য্য পরিচালনের জন্য উহাকে নিজের প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী সভার অধীন করিয়া দিতে পারা, (আত্মজীবনীর ভাষায় "ব্রাহ্মসমাজ অধিকার" করা) কিছুই আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হইবে না। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজকে "অধিকার" করিলেন না; নিজেই বরং ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা অধিকৃত হইলেন। অল্প কালের মধ্যেই কিসে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার হয়, ইহাই তাঁহার ধ্যান জ্ঞান হইয়া দাঁড়াইল।

দেবেন্দ্রনাথ "ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত" নামক পুস্তকে লিখিতেছেন, "ব্রাহ্মসমাজের সহিত তত্ত্ববোধিনী সভার যোগের অগ্রে ব্রাহ্মসমাজ যেন অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল, স্পন্দহীন হইতেছিল; তাহার যতদূর পর্য্যন্ত দুর্গতি হইতে পারে, তাহা হইয়াছিল। যখন তত্ত্ববোধিনী সভার সহিত তাহার পরিণয় হইল, তখন তাহার প্রাণ-সঞ্চার হইল। ১৭৬৩ শকে তত্ত্ববোধিনী সভার সহিত যোগ না হইলে ব্রাহ্মসমাজের কি পরিণাম হইত, বলা যায় না। হয়তো আমরা ইহার কিছুই দেখিতে পাইতাম না। রামমোহন রায়ের এক ইংরাজি বিদ্যালয় ছিল, আমরা সেখানে অধ্যয়ন করিয়াছি; কিন্তু তাহা এখন কোথায়? হয়তো ব্রাহ্মসমাজের দশা সেই প্রকার হইত। তত্ত্ববোধিনী সভার সহিত সংযোগের সময় এই আন্দোলন হইল যে, ব্রাহ্মসমাজ হইতে তত্ত্ববোধিনী সভার সম্পূর্ণ পৃথক্ থাকা আবশ্যক, কি, ইহা ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইয়া যাইবে? নির্দ্ধারিত হইল যে তত্ত্ববোধিনী সভার উপাসনাকার্য্য ব্রাহ্মসমাজ গ্রহণ করিবে, এবং তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্মসমাজের তত্ত্বাবধান করিবে।" (২২, ২৩ পৃষ্ঠা)।

"ব্রাহ্মসমাজ হইতে যে প্রচার কার্য্য হইতে পারে ইহা ইতঃপূর্ব্বে কাহারও ধারণাতে আসে নাই। রামমোহন রায়ের ট্রষ্টডীডে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজে কেবল উপাসনাকার্য্যেরই কথা লিখিত আছে, সুতরাং সেখানে উপাসনাকার্য্য নিয়মিত রূপে করা হইবে। কিন্তু ট্রষ্ট ডীডে ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যের কোন্ কথাই লিখিত নাই বলিয়া, সমাজ হইতে সে কার্য্য হইতে পারে বলিয়া কাহারও ধারণা ছিল না।...দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি স্থির করিলেন যে, উভয় সভায় মিলন সাধনের পর ব্রাহ্মসমাজে উপাসনাকার্য্য যে ভাবে চলিতেছিল সেই ভাবেই চলিতে থাকিবে; কিন্তু তত্ত্ববোধিনী সভা প্রচারকার্য্যের ভার গ্রহণ করিবে। কেবল মাত্র দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রদত্ত চাঁদার সাহায্যেই ব্রাহ্মসমাজের পরিচালন কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছিল, এবং তত্ত্ববোধিনী সভারও ব্যয় বলিতে গেলে একা দেবেন্দ্রনাথই বহন করিতেন। কাজেই দেবেন্দ্রনাথ যখন উভয় সভার মিলনের প্রস্তাব করিলেন, তখন কোনই আপত্তি উঠে নাই। ১৭৬৩ শকের শেষভাগে (১৮৪২ খৃষ্টাব্দের প্রথমে) এই মিলনপ্রস্তাব গৃহীত হইল, এবং ১৭৬৪ শকের বৈশাখ মাসেই (১৮৪২ খৃষ্টাব্দে) উভয় সভার মিলন সাধিত হইল।" (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮৩৭ শকের আশ্বিন সংখ্যা, ১০৬ পৃষ্ঠা, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় লিখিত প্রবন্ধ)।

লোকে যে পূর্ব্বে রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মসমাজের নাম পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছিল, এবং ১৮৪৪ সালে তত্ত্ববোধিনী সভার খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হইলে লোকে যে ব্রাহ্মসমাজকে "তত্ত্ববোধিনী সভার দল" বলিয়া চিনিতে লাগিল, এ কথা আগেই বলা হইয়াছে।

তত্ত্ববোধিনী সভার এইরূপ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি হওয়া সত্ত্বেও, দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজে যোগদানের পর হইতে এই সভাকে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যের যন্ত্রস্বরূপ মনে করিতে লাগিলেন। কিন্তু তত্ত্ববোধিনী সভার সকল সভ্য ইহাকে সে চক্ষে দেখিতেন না। তাঁহারা এই সভার নামেই আপনাদিগকে গৌরবান্বিত অনুভব করিতেন; তাঁহাদের চক্ষে ব্রাহ্মসমাজ অপেক্ষা ইহার মূল্য অধিক ছিল। ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চ্চার আকর্ষণেই লোকে তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হইত। সভ্যগণ সকলেই যে দেবেন্দ্রনাথের ন্যায় ধর্ম্মপিপাসু হইবেন, ইহা সম্ভবপর ছিল না। এই কারণে মধ্যে মধ্যে তত্ত্ববোধিনী সভার সহিত দেবেন্দ্রনাথের সংঘর্ষণ উপস্থিত হইতে লাগিল। বিশেষতঃ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রবন্ধ নির্ব্বাচন প্রভৃতি কার্য্যের জন্য যে "গ্রন্থাধ্যক্ষ সভা" স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার সহিত সময়ে সময়ে দেবেন্দ্রনাথের মতের বিশেষ অমিল হইতে লাগিল।

দেবেন্দ্রনাথের সহিত সভ্যগণের এই মতভেদ সভার কার্য্যের মধ্য দিয়া যতটুকু প্রকাশ পাইত, অন্যান্য কার্য্যে তদপেক্ষা অধিক প্রকাশিত হইত। খ্রীষ্টিয় প্রচারকগণের সহিত তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া দেবেন্দ্রনাথ দেখিলেন যে, ইহার সভ্যগণের অনেকের সহানুভূতি তাঁহার দিকে নাই; কেহ বা বেদান্তে আস্থাহীন, কেহ বা খ্রীষ্টধর্ম্মেই অনুরাগী। অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি 'আত্মীয় সভাতে' ভোট লইয়া ঈশ্বরের স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিতে লাগিলেন, এবং দেবেন্দ্রনাথ-কর্ত্তৃক সংস্কৃত ভাষায় রচিত উপাসনা-পদ্ধতির বিরুদ্ধে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচার অপেক্ষা বিধবা বিবাহ প্রচারেই অধিক উৎসাহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, এবংতদ্দ্বারা পত্রিকার প্রাচীনপন্থী বন্ধুগণকে পত্রিকার প্রতি বিমুখ করিয়া তুলিলেন। এই সকল দেখিয়া দেবেন্দ্রনাথের মনে এই প্রশ্ন উঠিল যে, তত্ত্ববোধনী সভা যদি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যের সহায় না হয়, তবে ইহাকে জীবিত রাখিয়া ফল কি?

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী সভা উঠাইয়া দেওয়াই শ্রেয়স্কর বোধ করিলেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ১০৩৯ শকের পৌষ সংখ্যায় ২৩৭—২৪০ পৃষ্ঠায় তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

বেদ্য পুরুষকে জান। *

তং বেদ্যং পুরুষং বেদ
যথা মা বো মৃত্যুঃপরিব্যথাঃ।

ঋষি শিষ্যকে আহ্বান করিয়া বলিলেন "সেই জ্ঞাতব্য পুরুষকে জান, যেন মৃত্যু তোমাদিগকে ব্যথা দিতে না পারে।" এই দুঃখ তাপ শোক পরিপূর্ণ সংসারে মৃত্যুর শাসনকে বাধা দিতে পারে এমন শক্তি মানুষের নাই। রাজা, প্রজা, ধনী, দরিদ্র, জ্ঞানী মূর্খ, সাধু অসাধু সকলকেই মৃত্যুর দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইতেছে। মৃত্যুর ন্যায় নিবিড় সত্য জগতে আর কি আছে? যাহা অপরিহার্য্য, যাহা সত্য, যাহার ন্যায় দুঃখের ব্যাপার জগতে আর কিছু নাই, তাহার প্রভাবকে অতিক্রম করিতে যিনি শিক্ষা দিতে পারেন, তাঁহার ন্যায় হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু জগতে আর কে আছে? প্রথম জীবনে মানুষ মৃত্যুকে ভুলিয়া থাকে; যৌবন কালে জীবনের উদ্দাম স্ফূর্ত্তি ও সুখলাভের চেষ্টাতে মানবচিত্ত এমনি উন্মত্ত হইয়া থাকে যে, এই ভীষণ ঘটনা চক্ষুর উপর দিয়া বারংবার চলিয়া যাওয়া সত্ত্বেও মানুষের জ্ঞানচক্ষু প্রস্ফুটিত হয় না। পরে জরা ও বার্দ্ধক্যের আগমনে যখন প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে শরীরের শক্তি হ্রাস হইয়া আসে, ইন্দ্রিয়সকল আজীবন বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া নিস্তেজ হইয়া আসে, যশ মান ও সাংসারিক সুখলাভের প্রবল আকর্ষণ আর চিত্তকে আকৃষ্ট করিতে পারে না, সংসারের অনিত্যতার কৃষ্ণবর্ণ ছায়া প্রত্যেক বস্তুর উপরে অনুভব করে, তখন মানুষের মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া যায় এবং নিত্য, মৃত্যুর অতীত, সেই অতীন্দ্রিয় রাজ্যের প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়ে। মানবজীবনের এই অবশ্যম্ভাবী নিয়তি, গভীর তপস্যালব্ধ জ্ঞানদৃষ্টিতে দর্শন করিয়া অমৃতের আস্বাদনকারী ঋষি বলিলেন, "তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ।"

কোন কোন ব্যক্তি মনে করেন আমাদের দেশে সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধীয় ভাবসমূহ সংগীতে, কবিতাতে, সাহিত্যে, দর্শনশাস্ত্রে এত বহুল পরিমাণে প্রচারিত হইয়াছে যে, তাহাতে হিন্দুজাতি সাংসারিক উন্নতির চেষ্টা হইতে বিরত হইয়া, উৎসাহ উদ্যম, অর্থের উন্নতি, বৈজ্ঞানিক উন্নতি প্রভৃতি বিষয়ে পৃথিবীর সভ্যজাতিসমূহের বহু পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে, এবং তাহারই অবশ্যম্ভাবী ফল আমাদের জাতির দৈন্য, দারিদ্র্য ও নানাপ্রকার সাংসারিক ক্লেশ। তাঁহারা বলেন যে, যদি ক্রমাগতঃ এই চিন্তা করা যায় যে, মানবজীবন পদ্মপত্রস্থিত জলের ন্যায় চঞ্চল, যদি এই ভাবনাতে চিত্ত ডুবিয়া থাকে, "তুমি কার, কে তোমার, কারে বলরে আপন, মোহমায়া নিদ্রা বশে দেখিয়া স্বপন, তাহা হইলে কে আর সাংসারিক উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে পারে? বিশেষভাবে পাশ্চাত্য জড়বাদী সভ্যতার সুতীব্র বৈদ্যুতিক আলোকপ্রাপ্ত যুবকের চিত্তে এই প্রশ্ন উত্থিত হইয়া, তাহাকে ভারতীয় ঋষিদিগের মানবজীবন সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানপ্রসূত চিরস্থায়ী, স্থির ও শান্ত আত্মার আলোক হইতে বহু দূরে লইয়া যাইতেছে। উক্ত প্রশ্নের মধ্যে যে কিছু সত্য নিহিত আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যাইতে পারে, মিস্ প্যাঙ্কহার্ষ্ট, যিনি স্ত্রীলোক-দিগের নির্ব্বাচনাধিকার প্রাপ্ত হইবার জন্য কি অসাধারণ ক্লেশ সহ্য করিয়া জগতকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন, তিনি এখন নিউইয়র্ক সহরে বাইবেল প্রচার করিতেছেন এবং বলিতেছেন

* শ্রীযুক্ত ভবসিন্ধু দত্ত কর্ত্তৃক সাঃ ব্রাঃ সমাজের উপাসনাতে বিবৃত।

All this time I was in a fool's paradise. আমাদের দেশের অরবিন্দ প্রভৃতি এক্ষণে নির্জ্জনে বসিয়া গীতা, বেদ, বেদান্ত পাঠে মনোযোগী হইয়াছেন, এবং মনে হয় আর কখনও ইহলোকে তাঁহারা আপনাদের পূর্ব্বজীবনপথে পদার্পণ করিবেন না। সুতরাং উক্ত প্রশ্ন সম্বন্ধে আমাদের চিন্তা করা কর্ত্তব্য। অতি প্রাচীন কালে হিন্দুজাতি যে কি ছিল, তাহার প্রকৃত জ্ঞান আমাদের ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্রায় এক শতাব্দীর মধ্যে, বিশেষ ভাবে রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে, পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে আমাদের পূর্ব্ব গৌরব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জ্ঞান হইতেছে। ইংরাজী শিক্ষার যত প্রকার সুফল আছে, তাহার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ফল এই যে, এই শিক্ষা আমাদের আত্মবোধ জাগ্রত করিয়াছে। যে জাতির পশ্চাতে গৌরবময় ইতিহাস না থাকে, বা যে জাতি আপনার ভবিষ্যৎ গৌরব সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হয়, সে জাতির পক্ষে জাগ্রত হওয়া এক প্রকার অসম্ভব। আমাদের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, হিন্দুজাতি সাহিত্যে, কাব্যে, দর্শন বিজ্ঞান, স্থপতি ও ভাস্কর বিদ্যাতে, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে, রসায়নে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সমুদ্রগামী তরণী নির্ম্মাণে ও পরিচালনে, তখনকার পক্ষে অভাবনীয় উন্নতি লাভ করিয়াছিল। এখনও রাজগৃহ, সারনাথ প্রভৃতি স্থানের মৃত্তিকা খনন করিয়া যে আশ্চর্য্য কীর্ত্তিসকল উদ্ঘাটিত হইতেছে, তাহা দেখিয়া সভ্য জাতিরা মুগ্ধ হইয়া যাইতেছে। যদি তাহাই হয়, তবে যে জাতি জীবনের অনিত্যতা ও সংসারের অসারতা, সাহিত্যে দর্শনে সংগীতে, অক্লান্তভাবে বহু যুগযুগান্তর ধরিয়া, প্রচার করিয়াছে, সে জাতি পার্থিব জ্ঞান সম্বন্ধে এত উন্নতি কি প্রকারে লাভ করিল? হিন্দু জাতির এই গৌরবপূর্ণ ইতিহাস প্রমাণ করিতেছে যে, সংসারের অনিত্যতা, মানবজীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব, প্রভৃতির চিন্তা মানবের সাংসারিক উন্নতিকে বাধা দেয় না, বরং উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করিয়া দেয়। কারণ, যে মানুষ ভাবে যে মৃত্যু সর্ব্বদা মস্তকের কেশস্পর্শ করিয়া রহিয়াছে, জানি না কোন্ মুহূর্ত্তে ইহ সংসার হইতে লইয়া যাইবে, সে জীবনের কর্ত্তব্যকার্য্যগুলি যত শীঘ্র পারে সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করে। এবং এই সব কর্ত্তব্য কার্য্যের মধ্যে নিজের, সমাজের, দেশের উন্নতিসাধন অন্তর্ভুক্ত হইয়া রহিয়াছে। সমস্ত গীতাশাস্ত্রের এই উদ্দেশ্য মানবকে কর্ম্মে প্রণোদিত করা। তবে অন্যান্য কর্ম্মবাদী শাস্ত্রের সহিত গীতার পার্থক্য এই স্থলে যে, অন্যান্য কর্ম্মবাদী শাস্ত্রসকল কর্ম্মের উপদেশ দেয়, কিন্তু গীতা নিষ্কাম কর্ম্মের উপদেশ দিয়া থাকে, এবং এই জন্যই গীতার মাহাত্ম্য আচার্য্য শঙ্কর,—যিনি 'কা তব কান্তা কস্তে পুত্র,' এই সংসারবিমুখী ভাব প্রচার করিয়াছিলেন—তিনিই আপনার ধর্ম্মমত প্রচারের জন্য কি অসাধারণ ক্লেশ ও ত্যাগ স্বীকার করিয়া সেই প্রাচীন কালে দুর্গম স্থানসকলের মধ্য দিয়া কাশ্মীর হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত পর্য্যটন করিয়াছেন। যদি কেহ কাহারও না হইল, যদি এই সংসার কেবল কতকগুলি সম্বন্ধবিরহিত ও অপরিচিত মানবসমষ্টির বাসভূমি হইল, তবে তিনি কাহার জন্য জীবনে এত ক্লেশ সহ্য করিয়া আপনার ধর্ম্ম প্রচার করিলেন? তাহার উত্তরে যদি বলা হয় যে, শঙ্কর মনে করিতেন, তাঁহার ধর্ম্মমত অতি উৎকৃষ্ট মত, এই মত প্রচার ও গ্রহণ না করিলে মানবের কল্যাণ হইবে না, তাই তিনি আপনার মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইলে তাহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, সংসারে যদি কেহ কাহারও নয়, তবে মানুষ বাঁচিল কি মরিল তাহাতে কাহারও কিছু আসিয়া যায় না। সুতরাং যদিও শঙ্কর সংসার ও সমাজবিমুখী মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তথাপি তাঁহার হৃদয় তাঁহার বুদ্ধির উপরে জয়লাভ করিয়াছে। যাহা হউক এই রূপে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, হিন্দুশাস্ত্র যেমন এক দিকে জীবনের চঞ্চলতা, সংসারের অসারতার বিষয় শিক্ষা দেন, তেমনি অন্য দিকে সমাজ মধ্যে ধর্ম্মকে রক্ষা করিবার জন্য, অক্লান্ত কর্ম্মেরও উপদেশ দিয়া থাকেন। এই জন্যই ভারতবর্ষে বৈরাগ্যের সহিত সাংসারিক উন্নতির সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

যাহা হউক, এক্ষণে পূর্ব্বের আলোচনাতে প্রবৃত্ত হওয়া যাক্। প্রত্যেক জীবনে মৃত্যুজনিত শোক তাপ আসা অনিবার্য্য। ইহা বিধাতার মঙ্গল বিধান। তাঁহার সমস্ত অভিপ্রায়ের মধ্যে প্রবেশ করে, এমন যোগ্যতা তিনি কাহাকেও দেন নাই, কিন্তু মৃত্যুর ব্যথা যাহা জীবনে মহৎ উপকার সাধন করে, চিন্তাশীল সাধকেরা তাহার যে ব্যাখ্যা দিয়া থাকেন, তাহা প্রণিধান-যোগ্য। তাঁহারা বলেন, মৃত্যু না থাকিলে মানুষ সংসারের ক্ষুদ্রতাতে এমন মজিয়া থাকিত যে, জীবনের যে মহৎ লক্ষ্য ও আদর্শ আছে তাহার প্রতি মানবের দৃষ্টি পড়িত না। সুতরাং মানুষ এবং ইতর প্রাণীর মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য লক্ষিত হইত না। আর একটি ব্যাখ্যা এই যে, স্বর্ণকে বিশুদ্ধ করিতে হইলে যেমন তাহাকে অগ্নির সংস্পর্শে আনা আবশ্যক, তেমন মানবজীবনকে পবিত্র করিতে হইলে, অর্থাৎ তাহাকে সংসারাসক্তিজনিত ক্ষুদ্রতা ও নীচতা হইতে মুক্ত করিতে হইলে, মৃত্যুর ব্যথা যেরূপ স্থায়ী ফল প্রসব করে, এমন আর কিছুতেই পারে না। এই দুইটি ব্যাখ্যা যে সমীচীন, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই বুঝিতে পারেন। কিন্তু এ কেবল একটা ব্যাখ্যামাত্র নয়, জীবনের অভিজ্ঞতাতে অনেক ব্যক্তি ইহা অনুভব করিয়াছেন। এই জন্যই দেখিতে পাওয়া যায়, প্রায় সকল দেশে সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে, বিশেষভাবে ভারতে হিন্দুজাতির মধ্যে, দেহের অনিত্যতা ও সংসারের ক্ষণস্থায়িত্ব সম্বন্ধে কত সঙ্গীত সংকীর্ত্তন রচিত হইয়া গীত হইয়া থাকে। এই সমস্ত সঙ্গীতের দ্বারা মানবচিত্ত অসার চিন্তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঈশ্বরের উপাসনার জন্য ব্যাকুল হয়। ঈশ্বরের উপাসনার জন্য ব্যাকুলতার ন্যায় পূজার উপকরণ আর কি হইতে পারে? রাজর্ষি রামমোহন এই জন্যই বৈরাগ্যভাব-উদ্দীপক কত সঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন, এবং পরবর্ত্তী কালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের সময়েও, এইরূপ অনেক সঙ্গীত রচিত হইয়া ব্রহ্মসঙ্গীতের মধ্যে স্থানলাভ করিয়াছে। এই সমস্ত সঙ্গীতের প্রত্যেকটি ব্রহ্মপূজার জন্য সদ্য প্রস্ফুটিত, নির্ম্মল প্রভাতী ফুল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমান সময়ে তাহা আর বড় দেখা যায় না।

ঋষি বলিতেছেন, ব্রহ্মকে জানিলে মৃত্যু আর ব্যথা দিতে পারে না। কিন্তু মানুষ তো অনেক সময়ে মনে করে তাহারা

ব্রহ্মকে জানিয়াছে। তাহা যদি না হইত, তবে ব্রহ্ম সম্বন্ধে উপদেশ, তাঁহার স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা বা প্রচার কেমন করিয়া সম্ভবপর হয়? কখন কখন এমনও দেখা যায়, যাহাদের জীবনে সত্যনিষ্ঠা, সরলতা, ত্যাগশীলতা, বা অন্য প্রকার সাধুতার লক্ষণ, তেমন জীবন্তভাবে দেখা যায় না, তাহারা ধর্ম্ম সম্বন্ধে, ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে এমন চমৎকার ব্যাখ্যা, বক্তৃতাদি করিয়া থাকে যে, তাহা শুনিলে লোকে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যায়; অথচ এই সমস্ত লোককেই দেখা যায়, যখন পরীক্ষা, সঙ্কট, বা বিপদ আসে, তখন প্রবল ঝটিকাহত বন্দর হইতে উৎক্ষিপ্ত পোতসমূহের ন্যায় ভাসিতে ভাসিতে, অবশেষে সংসারসমুদ্রের মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া যাইতেছে। ইহা তো ব্রহ্মজ্ঞের লক্ষণ নয়। এইরূপে আমরা নিজেদের জীবনকে পরীক্ষা করিলে সহজেই দেখিতে পাইব যে, যদিও আমরা ব্রহ্মের কথা বলিয়া থাকি, তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকি, বা তাঁহার নামের গৌরব সরল ভাবেই প্রচার করি, তথাপি ঋষি যে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা বলিতেছেন, সে জ্ঞান হইতে এখনও আমরা বহু দূরে অবস্থান করিতেছি। বিপদে সঙ্কটে পরীক্ষাতে যে ব্রহ্মজ্ঞান আমাদিগকে আমাদের আসনে স্থির রাখিতে না পারে, সে ব্রহ্মজ্ঞান নহে। গৃহে যখন মৃত্যু আসিয়া প্রিয়তম বস্তুর গলদেশে হাস্তার্পণ করে, এবং সকলের কাতর ক্রন্দনকে উপেক্ষা করিয়া ধীরে ধীরে তাহাকে কোন্ অন্ধকারময় অজ্ঞাত দেশে লইয়া চলিয়া যায়, তখন যে-জ্ঞান সংসারসমুদ্রের এ-পারে এবং ও-পারে প্রেমময়ী বিশ্বজননীর প্রেমক্রোড় দেখিতে না পায়, সে জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান নহে। তাই ঋষি বলিতেছেন, আর-সমস্ত জ্ঞান অপরা, কিন্তু যে জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মকে জানিয়া মানুষ মৃত্যুর ব্যথা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে, তাহাই পরা জ্ঞান।

যদিও দেখা যায়, এই পরা জ্ঞান অতি দুর্লভ, তথাপি এই মানবজীবনে ইহা লাভ করা যাইতে পারে, এবং এই জ্ঞানের একটা ইতিহাস আছে। এই ইতিহাসের তিনটি স্তর দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম স্তরে অর্থাৎ মানুষের প্রথম জীবনে সে কতকগুলি সংস্কার লইয়া জন্ম গ্রহণ করে। এই সমস্ত সংস্কার পিতৃপিতামহ বা সমাজ হইতে অতি নিগূঢ় রূপে প্রাপ্ত। মানবশিশু এই সংস্কারসমূহের সম্বল লইয়া জীবনযাত্রা আরম্ভ করে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিধাতার নিকট হইতে কিছু সংস্কার বা জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া থাকে; কিন্তু সে সকল জ্ঞান অতি অস্ফুট ভাবে বীজাকারে জীবনের মধ্যে বর্ত্তমান থাকে। এই সমস্ত মিলিয়া মিশিয়া এক প্রকার বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া থাকে, যাহার উপর নির্ভর করিয়া শিশু জীবনের পথে অগ্রসর হইতে থাকে। ঈশ্বরাস্তিত্বে বিশ্বাস বা নৈতিক জীবনের শ্রেষ্ঠতাতে আস্থাস্থাপন, এই শ্রেণীর বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত। শিশু যত জীবনে অগ্রসর হইতে থাকে, তত তাহার মনের উপর অন্যান্য ব্যক্তিদিগের চিন্তা-সংস্পর্শের প্রভাব আসিয়া পড়ে। এই সমস্ত মিলিয়া তাহার জ্ঞানের ভূমিকে দৃঢ় করিয়া থাকে। কিন্তু ঋষি এ জ্ঞানের কথা বলিতেছেন না। কারণ, সচরাচর যাহাকে আমরা বিশ্বাস বলিয়া থাকি, সেই বিশ্বাস থাকিলেও মানুষ মৃত্যুভয় বা মৃত্যুর ব্যথা অতিক্রম করিতে পারে না। ইহার দৃষ্টান্ত আমরা সর্ব্বদাই সংসারের মধ্যে দেখিতেছি। এই স্তরে থাকিতে থাকিতে যখন কঠোর পরীক্ষা, বিপদ, সঙ্কট, মৃত্যু প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন সাধক দেখেন যে তাঁহার জীবনের শান্তি, আনন্দ, স্ফূর্ত্তি চলিয়া যাইতেছে, জীবন শুষ্ক মরুভূমির ন্যায় হইতেছে, তখন তাঁহার জ্ঞান হয় যে তিনি তখনও ব্রহ্মজ্ঞ হইতে পারেন নাই। সচরাচর আমরা দেখিতে পাই এই স্তরে থাকিয়াই অনেকে সারা জীবন অতিবাহিত করিয়া এ সংসার হইতে চলিয়া যান। তাহার কারণ এই যে গীতা যাহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়াছেন, সেরূপ স্থিতপ্রজ্ঞ হইবার লক্ষ্য বা আদর্শ ইহাদের জীবনে নাই। প্রত্যেক জীবনকে শান্তি অশান্তি, সুখ দুঃখ, উত্থান পতনের মধ্য দিয়া যাইতে হইবে, এই ভাবিয়া যাঁহারা দুঃখ অশান্তি বা পতনের উপরে উঠিতে চেষ্টা না করেন, অথবা চেষ্টা করিবার আবশ্যকতা স্বীকার না করেন, তাঁহারা এই প্রথম স্তরে থাকিয়াই জীবন শেষ করিয়া থাকেন। কিন্তু সকলে এরূপ নয়। যাঁহারা প্রকৃত গতিশীল, তাঁহারা যখন দেখেন মৃত্যু আসিয়া, বিপদ নির্য্যাতন আসিয়া, তাঁহাদিগকে চঞ্চল করিয়া তুলিতেছে, আনন্দের সহিত জীবনপথে অগ্রসর হইবার বিষম বাধা উপস্থিত করিতেছে, তখন তাঁহারা জীবনের দৈন্য ও দারিদ্র্য বুঝিতে পারেন, এবং তাহার প্রতিকারের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়েন। এই অবস্থাতে সাধক গভীর ভাবে দর্শনশাস্ত্র, মনোবিজ্ঞান, সাধুসঙ্গ ইত্যাদির সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। গভীর দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়া যখন দেখেন, ব্রহ্ম একমাত্র সত্য এবং অন্যান্য জীব ও জগত তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া সত্য হইয়াছে, তাঁহার দ্বারা বিধৃত হইয়া স্থিতিলাভ করিতেছে, তাঁহারই মধ্যে থাকিয়া জীব আপনার জীবনলীলা সম্পন্ন করিতেছে, ব্রহ্মের অনন্ত জীবন-ধারা অতি নিগূঢ় উপায়ে প্রত্যেক মানবের মধ্যে বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহার জীবনরূপে প্রকাশিত হইতেছে, তখন সাধক এই ইতিহাসের দ্বিতীয় স্তরে উন্নীত হয়েন। এই স্তরে অবস্থান করিতে করিতে প্রেমময় জগত-পিতার প্রেমরাজ্যের প্রতি সাধকের দৃষ্টি পড়ে। সে ব্রহ্মজ্ঞান জ্ঞানই নয়, যাহা জগত-গ্রন্থের মধ্যে প্রেমহস্তে লিখিত ঘটনা-ছত্রসমূহকে প্রকাশ করে না। অণু পরমাণুর মধ্যে আকর্ষণ, প্রকাণ্ড সৌরজগতের অগণ্য গ্রহ উপগ্রহ এবং তারকারাজির প্রত্যেকের প্রতি প্রত্যেকের আকর্ষণ, মানবসমাজের মধ্যে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের আকর্ষণ, অতীন্দ্রিয় অধ্যাত্মরাজ্যে আত্মাসকলের মধ্যে আকর্ষণজনিত প্রীতির বন্ধন, এ সকলের মধ্যে দ্বিতীয় স্তরে ভ্রমণকারী সাধক প্রেমের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, করযোড়ে বলিয়া উঠেন "ওঁ পিতা নোঽসি।" জ্ঞান ও প্রেমের মিলন হইল। এই দুই মহা সম্পত্তি লইয়া সাধক জীবনপথে নূতন যাত্রা আরম্ভ করিলেন। পথ চলিতে চলিতে নূতন রকমের পরীক্ষা বিপদ সঙ্কট আসিয়া উপস্থিত হইল। কারণ, বিধাতার এই নিয়ম দেখা যায় যে, মানবজীবন ধর্ম্মের পথে যতই অগ্রসর হউক না কেন, সকল অবস্থার মধ্যে তাহার জন্য নূতন রকমের বিপদ পরীক্ষা প্রলোভন সঞ্চিত থাকে। সাধক যে সম্পত্তি লাভ করিয়া মনে করিয়াছিলেন তাঁহার যথেষ্ট হইয়াছে এবং যাহা লাভ করাতে অহঙ্কার আসিয়া অজ্ঞাত ভাবে তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিয়াছিল, (কারণ, আত্মাভিমান

প্রায় সকল মানবের শেষ জীবন পর্য্যন্ত চিত্তকে অধিকার করিয়া থাকে,) তাহার সারবত্তা পরীক্ষার জন্য বিপদ, নির্য্যাতন, মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন সাধক দেখেন যে, এ সম্পত্তিও যথেষ্ট নয়। তাঁহার অভিমান চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া মৃত্যু দেখাইয়া দিল, এখনও হয় নাই। যদিও দর্শনশাস্ত্রের গভীর জ্ঞান এবং যুক্তির সিদ্ধান্তের উপর স্থাপিত প্রেমবোধ একত্রে মিলিত হইয়া তাঁহার জন্য এক দৃঢ়তর প্রতিষ্ঠাভূমি রচনা করিয়াছিল, তথাপি মৃত্যুর আগমনে যখন এই ভূমি কম্পিত হইয়া উঠিল, তখন সাধকের অন্তর আপনা আপনি বলিয়া উঠে "এহ বাহ্য, আগে কহ আর।"

সাধন ভজন চলিতে লাগিল। এখন আর সাধকের নিজের উপর বিশ্বাস নাই; কিন্তু ব্রহ্মকৃপার উপর বিশ্বাসের আলোক ধীরে ধীরে প্রাতঃসূর্য্যের ন্যায় তাঁহার জীবনাকাশে উদিত হইতেছে। সেই আলোক শান্ত ও স্থির ভাবে প্রচার করিল, ব্রহ্মসূর্য্যের উদয় দেখিবার জন্য প্রস্তুত হও। মানুষ যত দিন পর্য্যন্ত আপনার উপর নির্ভর করিয়া অধ্যাত্ম জগতে চলিতে চায়, তত দিন কেবল তাহার পদস্খলন হইয়া থাকে। এই সত্য বুঝিতে অনেক সময় লাগে; এমন কি যাঁহারা বড় বড় পণ্ডিত তাঁহারাও ইহা বুঝিতে পারেন না, এবং এই সত্যটি বুঝিতে বুঝিতে সমস্ত জীবন কাটিয়া যায়। দ্বিতীয় স্তরের সাধক যতই দেখেন যে, তিনি প্রলোভন মৃত্যু প্রভৃতি পরীক্ষাতে চঞ্চল হইয়া উঠিতেছেন, ততই তিনি অস্থির হইয়া উঠেন। মৃত্যুর পরপারে যাইবার জন্য তাঁহার প্রাণ ছটফট করে। শোকের উপকার থাকিতে পারে, মৃত্যু-বিধান জগন্মঙ্গলের বিধানই বটে; কিন্তু তাই বলিয়া মৃত্যু ও শোকের উপরে উঠিতে হইবে না, মৃত্যুঞ্জয় ও শোকাতীত হইতে হইবে না, ইহার কোন অর্থ নাই। মানুষ তখনি মৃত্যুঞ্জয় হইতে পারে, তখনি মৃত্যুর ব্যথা অতিক্রম করিতে পারে, যখন সত্য ভাবে, প্রত্যক্ষ ভাবে, সে ব্রহ্মের সম্মুখীন হয়। ব্রহ্মের সম্মুখীন হইলে তাহার হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন ভিন্ন হয় ও সকল সংশয় বিদূরিত হয়। "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্ব-সংশয়াঃ তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।" এক্ষণে এই অবস্থা-লাভের জন্য যখন সাধক ব্যাকুল হইয়া উঠেন, এবং ব্রহ্মকৃপার প্রতি চাতকের ন্যায় উর্দ্ধনেত্রে চাহিয়া থাকেন, তখন ব্রহ্মজ্যোতি তাঁহার অন্তরাকাশে সমুদ্ভাসিত হইয়া, এমন এক রাজ্যের সংবাদ প্রচার করেন, যেখানে জরা ব্যাধি মৃত্যু নাই, পাপ তাপ শোকের তীব্র জ্বালা নাই, হিংসা দ্বেষ পরশ্রীকাতরতা নাই, কপটতার ছদ্মবেশ নাই। এই তৃতীয় স্তরে উঠিলে সাধক প্রকৃত ভাবে ব্রহ্মজ্ঞ হয়েন। কারণ, ব্রহ্ম তখন অতি সত্য ও সাক্ষাৎ ভাবে তাঁহার নিকট প্রকাশিত হয়েন। এই অবস্থাতে উঠিলে ব্রহ্ম সম্বন্ধে যে বিশ্বাস হয়, তাহাই প্রকৃত বিশ্বাস। কেশবচন্দ্র বলিয়াছেন Faith is direct vision অর্থাৎ সাক্ষাৎ দৃষ্টিই বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের ভূমি লাভ করিয়া সাধক তৃপ্ত হয়েন, তাঁহার সকল সাধনা সফল হয়, তিনি অনন্যকাম হইয়া কেবল তাঁহারই ইচ্ছার জয় ঘোষণা করেন। এই অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই ঋষি বলিলেন, তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ। সেই দিন আমাদের পক্ষে কি সুখের দিন হইবে, যে-দিন আমরা ব্রহ্মকৃপাগুণে তাঁহাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ ভাবে উপলব্ধি করিয়া বলিতে পারিব, তোমাকে জানিয়া ধন্য হইলাম, তোমার চরণতলে আমার দুঃখ তাপ শোক প্রপীড়িত বক্ষ পাতিয়া দিয়া, সকল জ্বালা হইতে মুক্তিলাভ করিলাম। সেই সৌভাগ্যের দিন আমাদের কবে আসিবে, যে দিন সেই প্রেমরবির উদয়ে হৃদয়ের সকল অন্ধকার বিদূরিত হইয়া, এই খণ্ড মানবজীবনকে এক অখণ্ড জীবন-ধারার অংশরূপে প্রকাশ করিয়া, মৃত্যুর ভয় ও ব্যথা হইতে অব্যাহতি প্রদান করিবে, এবং আমরা আনন্দে "ন দিবা ন রাত্রি শিবএব কেবলম্" এই স্বর্গীয় মহাসঙ্গীত গান করিতে করিতে পরলোকের দ্বারে উপস্থিত হইব!

নীরব সাধকের নিভৃত চিন্তা।

(১)

জীবনপথে অনেক প্রকারের সঙ্কটের সহিত সাক্ষাৎ হয়। সাধক জীবনেও হয়, অসাধক জীবনেও হয়। তার মধ্যে একটি প্রধানরূপে মনে কাজ করে। সে হইতেছে প্রদর্শনের ভাব। প্রাণে যদি শুভ মুহূর্ত্তে কোন সাধুভাবের সমাগম হয়—সদ্‌ভাবের উদয় হয়, তখন তাহা বাহিরে ব্যক্ত করিবার স্পৃহা ত হয়ই। বরং অধিক করিয়া প্রকাশ করিবার—বাহিরে ব্যক্ত করিবার—ইচ্ছাই প্রবল হয়। এ স্থলে সাবধান না হইলেই সঙ্কটটা অতি ক্ষতির কারণ হইয়া থাকে। আমি যাহা আছি, আমার অন্তরের অবস্থা যাদৃশ, আমি যেন তাহাই বাহিরেও প্রকাশ পাইতে চেষ্টা করি। তাহা না হইলে প্রদর্শনের স্পৃহায় অন্তরে সমাগত সদ্‌ভাবও বিকৃত হইয়া যায়—বিলুপ্ত হইয়া যায়। এজন্য খুব সাবধানেই চলা উচিত।

(২)

দরিদ্র জনের অতি ক্ষুধায় উদ্বিগ্ন হইতে হয়; কিন্তু ক্ষুধা না থাকা অপেক্ষা থাকাই ভাল। কারণ, ক্ষুধাদ্বারা তাহার স্বাস্থ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। অক্ষুধা একটা রোগেরই মধ্যে পরিগণিত; যদি বা তাহা রোগ বলিয়া বিবেচিত নাও হয়, তাহা হইলেও বুঝিতে হইবে অক্ষুধা একটা ভাবী রোগের পূর্ব্ব লক্ষণ। কোন কঠিন রোগ যে শরীরকে আক্রমণ করিবে, অক্ষুধা সে বার্ত্তাই ঘোষণা করে। এজন্য ক্ষুধা অপেক্ষা অক্ষুধার জন্যই লোকের বেশী উদ্বেগ আসিয়া থাকে। শরীর সম্বন্ধে যে কথা খাটে, আত্মা সম্বন্ধেও সেই কথাই খাটিয়া থাকে। কল্যাণাকাঙ্ক্ষীর যদি ধর্ম্মপিপাসা, বা প্রেম পুণ্য আদি আত্মার পোষণকারী মহা সম্পদের জন্য ক্ষুধা বা ব্যাকুলতা, না থাকে, তবে তাহার রোগ কঠিন বলিয়াই মনে করিতে হইবে। এ দিকে ত ক্ষুধিতের কোনই ভয় নাই। কারণ, ক্ষুধা হরণের আয়োজন উপকরণ সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছে। ক্ষুধাহারী সর্ব্বদাই ক্ষুধা হরণ করিতে প্রস্তুত। আত্মার অক্ষুধাই সাংঘাতিক রোগ। এ রোগের প্রতি কাহারও উদাসীনতা থাকা একেবারেই উচিত নহে। এ উদাসীনতায় কেবল মৃত্যুকেই আনয়ন করে। শরীরের অক্ষুধায় যেমন লোকে শরীর চালনা, ব্যায়াম, করিয়া থাকে; আত্মার অক্ষুধায়ও তেমনি আত্মার চালনা, আধ্যাত্মিক ব্যায়াম, করিতে

হইবে। সৎসঙ্গ, সৎপ্রসঙ্গ, সদ্গ্রন্থ পাঠ ও ঈশ্বরের নাম গ্রহণ প্রভৃতি এ দিকের ব্যায়াম মধ্যে গণ্য।

(৩)

অপরাধ করিলে দণ্ড পাইতে হয়। অপরাধ করিবে আর দণ্ড পাইবে না, এমন হইতে পারে না। কিন্তু অপরাধীর দণ্ডেরও পরিমাণের তারতম্য আছে। সকল প্রকারের অপরাধীর শাস্তি সমান পরিমাণে হয় না। যে অজ্ঞান, অজ্ঞতা হইতে যার অপরাধ হয়, তাহার শাস্তির পরিমাণ অবশ্যই অল্প হইবে। এরূপ অপরাধীকে বিচারক যখন জিজ্ঞাসা করেন, কেন এমন কাজ করিলে? সে সহজেই উত্তর দেয়, মহাশয়, আমি না জেনে ওরূপ কাজ করেছি। ও বিষয়ের নিয়ম আইন আমি জানতাম না। এরূপ স্থলে জ্ঞানকৃত অপরাধীর যে দণ্ড হয়, অজ্ঞানীর সেরূপ দণ্ডের ব্যবস্থা হয় না। ইহা জানা কথা। আমাদের পক্ষে যখন জিজ্ঞাসা আসিবে, কেন ধর্ম্ম সাধনে, ধর্ম্ম উপার্জ্জনে, মন দেও নাই, তখন আমাদিগকে নিরুত্তরই থাকতে হবে। জেনে শুনেই যে আমাদের অনেকে ভুলে আছি। আমাদের কৈফিয়ৎ দিবার কিছু নাই। সুতরাং আমাদের অপরাধ জেনে শুনে জ্ঞানকৃত অপরাধ। তাই দণ্ডটাও আমাদেরই বেশী পাইতে হইবে। হে প্রভু, আমাদের কি উপায় হইবে? জ্ঞানকৃত অপরাধের শাস্তি যে বেশী হয়।

(৪)

পৃথিবী সূর্য্য হইতে উত্তাপ পায়। তাহা তাহার জন্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু যে উত্তাপ সে পায়, আবার তাহাকে সে পরিত্যাগ করিয়া থাকে, এ সুযোগ তাহার আছে। উত্তাপকে যদি সে আপনা হইতে সরাইয়া না দিত বা উত্তাপ যদি নিজ হইতেই সরিয়া গিয়া পৃথিবীকে পুনঃ ঠাণ্ডা হইবার সুযোগ না দেয়, যদি নিরন্তর পৃথিবী উত্তপ্ত হইতেই থাকে, তবে তাহার দশা কিরূপ হয়! তাপ জমিয়া জমিয়া তাহার পরিমাণ এত বাড়িতে পারে যে, তাহার প্রভাবে পৃথিবীর আর বর্ত্তমান অবস্থাতে থাকা সম্ভবপর হয় না। তাহাতে উত্তাপের প্রভাবে বাষ্প হইয়া উড়িয়া যাইতে হয়। এজন্য উত্তাপ তাহাতে জমা হইয়া থাকে না। সে বিকীর্ণ হইয়া গিয়া তাহাকে শীতল হইবার সুযোগ দেয়। আমাদেরও এই অবস্থা—পাপের উত্তাপ আমাদিগকে উত্তপ্ত করে, কিন্তু তাহা আমাদিগের মধ্যে স্থায়ী হইয়া বাস করে না, তাপের ন্যায় আবার বিকীর্ণ হইয়া যায়। তাহাতেই প্রাণ আবার শীতলতা পাইয়া সুস্থ হইতে পারে। তাহা না হইলে একেবারে বিনাশেই গিয়া আমাদিগকে পড়িতে হইত। বিধাতার অপূর্ব্ব বিধানে তাই তপ্তপ্রাণ শীতল হয়। অসুস্থ প্রাণ সুস্থ ও সুন্দর হইয়া ধন্য হয়।

(৫)

নিজের মুখ লোকে অপরের মারফতে দর্শন করে, অর্থাৎ দর্পণ যোগে দর্শন করে। তাই আপনার ছবির ধারণা মনে স্পষ্ট থাকে না। সাক্ষাৎ ভাবে যাহাদের মুখ দেখা যায়, তাহাদের মুখের ছবি মনে অঙ্কিত হইয়া থাকে, তাই সে মুখ স্মরণ করা যায়। মনে ধারণা করা যায়। নিজের মুখের স্মৃতি মানুষ সে ভাবে মনে রাখিতে পারে না। অন্যের মারফতে যে জ্ঞান তাহারও এই দশাই হয়। তাহা আর ছায়ার মতন মনের কোণে লুকাইয়া থাকে, কাজের সময় হাতের কাছে পাওয়া যায় না। তাহার উপর নির্ভরও করা যায় না। সত্যকে নিজেই দেখিতে হয়, জ্ঞানকে নিজ প্রাণেই লাভ করিতে হয়। এ লাভ পরমগুরু পরমেশ্বর হইতেই পাওয়া যায়। তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষা মনে প্রাণে চিরগ্রথিত হইয়া দৃঢ় হইয়া থাকে। পরমগুরুর শিক্ষা-প্রণালীর কথা ভাবিলে অবাক হইতে হয়। তাহা কখন কোন্ সুযোগে যে প্রাণে আসিবে তাহা ত কেহই জানে না। তিনি তাঁহার শিক্ষাকে প্রেরণ করিতেইছেন। আমরা সব সময় তাহা শ্রবণের বা গ্রহণের উপযুক্ত অবস্থায় থাকি না বলিয়াই, যাহা আমাদের জন্য আসে তাহা আমাদের হৃদ্গত হয় না, নিজস্ব হয় না। এই ভাবেই আমাদের গুরুর শিক্ষাকে অগ্রাহ্য করিয়া আমরা অজ্ঞান থাকিতেছি। তাঁহার শিক্ষাকে স্বীকার না করিবার এই ফল যে সর্ব্বত্রই ফলিতেছে। শেষে অধীর হইয়া যাকে সম্মুখে পায় তাহারই শরণ লয় এবং নানা অশিক্ষার অধীন হইয়া ক্লেশ পায়।

ব্রাহ্মসমাজ

সপ্ত নবতিতম মাঘোৎসব—প্রেমময়ের অপার করুণায় পুনরায় আমাদের প্রিয় মাঘোৎসব সমুপস্থিত। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা নিম্নলিখিত প্রণালী-অনুসারে আগামী সপ্ত নবতিতম মাঘোৎসব সম্পন্ন করিবেন স্থির করিয়াছেন। আবশ্যক হইলে ইহার কিছু পরিবর্ত্তনও হইতে পারিবে। ব্যাকুলহৃদয় বিশ্বাসিগণের সম্মিলনের উপর উৎসবের সফলতা বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। তাই কার্য্যনির্ব্বাহক সভা উৎসবে যোগদান করিয়া উহাকে সফল করিবার জন্য, সকলকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিতেছেন। প্রাতে ৭ ও সন্ধ্যা ৬।৷০ ঘটিকায় কার্য্য আরম্ভ হইবে।

১লা মাঘ—(১৫ই জানুয়ারী ১৯২৭) শনিবার—প্রাতে ব্রাহ্ম পরিবারে এবং ছাত্র ও ছাত্রীনিবাসসমূহে ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা। সন্ধ্যায়—উৎসবের উদ্বোধন।

২রা মাঘ—(১৬ই জানুয়ারী) রবিবার প্রাতে—উপাসনা। অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় বরাহনগরস্থ শ্রমজীবিগণের নগর সঙ্কীর্ত্তন। সন্ধ্যায়—বরাহনগরস্থ শ্রমজীবিগণের উৎসব উপলক্ষে উপাসনা।

৩রা মাঘ—(১৭ই জানুয়ারী) সোমবার—প্রাতে উপাসনা; সন্ধ্যায় বক্তৃতা।

৪ঠা মাঘ—(১৮ই জানুয়ারী) মঙ্গলবার প্রাতে—উপাসনা। সন্ধ্যায়—সঙ্গত-সভার উৎসব উপলক্ষে বক্তৃতা।

৫ই মাঘ—(১৯শে জানুয়ারী) বুধবার ছাত্রসমাজের উৎসব উপলক্ষে প্রাতে—উপাসনা। সন্ধ্যায়—বক্তৃতা।

৬ই মাঘ—(২০শে জানুয়ারী) বৃহস্পতিবার প্রাতে—উপাসনা। সন্ধ্যায়—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি সভা।

৭ই মাঘ—(২১শে জানুয়ারী) প্রাতে—উপাসনা। সন্ধ্যায়—তত্ত্ববিদ্যা সভার উৎসব উপলক্ষে বক্তৃতা।

৮ ই মাঘ—(২২ শে জানুয়ারী) শনিবার প্রাতে—মন্দিরে ব্রাহ্ম মহিলাদিগের উৎসব উপলক্ষে উপাসনা। (পুরুষদিগের জন্য সিটিকলেজ-গৃহে পৃথক উপাসনা)। সন্ধ্যায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক সভা। (কেবল সভ্যদের জন্য)।

৯ ই মাঘ—(২৩ শে জানুয়ারী) রবিবার প্রাতে—ব্রাহ্ম যুবকদিগের উৎসব উপলক্ষে কীর্ত্তন ও উপাসনা। অপরাহ্ণ ১½ ঘটিকায় যুবকদিগের আলোচনা। ৪ ঘটিকায়—নগর সংকীর্ত্তন; সন্ধ্যায় উপাসনা।

১০ ই মাঘ (২৪ শে জানুয়ারী) সোমবার প্রাতে—কলিকাতাস্থ উপাসকমণ্ডলীর উৎসব উপলক্ষে উপাসনা। অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় নবদ্বীপচন্দ্র-স্মৃতিসভা। সন্ধ্যায় উপাসনা।

১১ ই মাঘ—(২৫ শে জানুয়ারী) মঙ্গলবার—**সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব**। প্রাতে কীর্ত্তন ও উপাসনা। অপরাহ্ণ ১ ঘটিকায় উপাসনা; ২ ঘটিকায় পাঠ ও ব্যাখ্যা। ৪ ঘটিকায় ইংরাজীতে উপাসনা; সন্ধ্যায় কীর্ত্তন ও উপাসনা।

১২ ই মাঘ (২৬ শে জানুয়ারী) বুধবার প্রাতে—সাধনাশ্রমের উৎসব উপলক্ষে উপাসনা। অপরাহ্ণ ২ ঘটিকায়—আলোচনা। সন্ধ্যায় বক্তৃতা।

১৩ ই মাঘ (২৭ শে জানুয়ারী) বৃহস্পতিবার প্রাতে—উপাসনা। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় মেরীকার্পেণ্টার হলে রবিবাসরিক নীতিবিদ্যালয়ের উৎসব। সন্ধ্যায় ইংরাজীতে উপাসনা।

১৪ ই মাঘ (২৮ শে জানুয়ারী) শুক্রবার প্রাতে—উপাসনা। অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় বালকবালিকা সম্মিলন। সন্ধ্যায় বক্তৃতা।

১৫ ই মাঘ (২৯ শে জানুয়ারী) শনিবার প্রাতে—উপাসনা। অপরাহ্ণে কাঙ্গালী বিদায় সন্ধ্যায় ইংরাজীতে বক্তৃতা।

১৬ ই মাঘ (৩০ শে জানুয়ারী) রবিবার প্রাতে—উপাসনা; মধ্যাহ্নে উদ্যান সম্মিলন। সন্ধ্যায় উপাসনা;

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ২রা ডিসেম্বর রাঁচি নগরীতে বাবু হিমাংশুনাথ চক্রবর্ত্তী মস্তকে রক্তাধিক্য বশতঃ পরলোক গমন করিয়াছেন।

বিগত ১০ই ডিসেম্বর কাঁথি নগরীতে বাবু রাধাকৃষ্ণ মাইতি দীর্ঘকাল রোগশয্যায় শায়িত থাকিয়া পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ব্রাহ্ম সমাজের নানা কার্য্যে দান করিতেন।

বিগত ১৩ই ডিসেম্বর মধুপুর নগরীতে পরলোকগত বাবু দীননাথ দত্তের দ্বিতীয় পুত্র সত্যকুমার দত্ত দীর্ঘকাল রোগে ভুগিয়া বৃদ্ধা মাতা কয়েকটী শিশু সন্তান ও বিধবা পত্নীকে অসহায় অবস্থায় রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন।

বিগত ১২ই ডিসেম্বর কলিকাতা নগরীতে পরলোকগত রনজিৎকুমার চক্রবর্ত্তীর আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য আচার্য্যের কার্য্য, পিতা শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী প্রার্থনা, জ্যেষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী সান্ত্বনা রায় জীবনীপাঠ এবং শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী শাস্ত্রপাঠ ও প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে তাহার ভ্রাতা ভগিনীগণ স্মৃতি রক্ষার জন্য একখানা এক শত টাকার কোম্পানীর কাগজ প্রদান করিবেন।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চির শান্তিতে রাখুন ও আত্মীয় স্বজনদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ—গত ৫ই ডিসেম্বর হইতে ১০ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ঢাকায়, পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের অশীতিতম সম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঢাকায় গমন করিয়াছিলেন। কয়েক দিন তাঁহাদের বক্তৃতা উপদেশ, উপাসনা এবং ধর্ম্ম ব্যাখ্যায় ব্রহ্মমন্দির যথার্থই উৎসব-ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। রাত্রির উপাসনা ও বক্তৃতায় সহরের বিস্তর পুরুষ ও নারী মন্দিরে আগমন করিয়া বিমল আনন্দ ও ঈশ্বরের করুণা উপভোগ করিয়াছেন। ৫ই ডিসেম্বর রাত্রে উৎসবের উদ্বোধন উপলক্ষে উপাসনা হয়, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত উপাসনা করেন। ৬ই এবং ৭ই ডিসেম্বরের প্রাতঃকালের উপাসনা অমৃত বাবুকেই করিতে হইয়াছিল। অধ্যাপক রজনীকান্ত গুহ ৬ই ডিসেম্বর রাত্রে উপাসনা এবং ৭ই ডিসেম্বর রাত্রে "ধর্ম্ম ও জাতীয় প্রকৃতি" বিষয়ে সময়োপযোগী একটি চিন্তাপূর্ণ বক্তৃতা করেন। ৮ই ডিসেম্বর সকালে ও সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এবং ৯ই ডিসেম্বর প্রাতঃকালে রজনী বাবু উপাসনা ও উপদেশের দ্বারা উপাসকদিগের চিত্ত ভাবরসে আর্দ্র করেন। ৯ই ডিসেম্বর রাত্রে কবি রবীন্দ্রনাথের নানা তত্ত্ব ও ভক্তিরসপূর্ণ কয়েকটি সঙ্গীতের ব্যাখ্যা হয়। সতীশ বাবু গানগুলির ব্যাখ্যা এবং শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র নাগ, কুমারী নাগ, শ্রীমতী ইন্দু চৌধুরী গানগুলি গাহিয়া শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে বিমল আধ্যাত্মিক ভাব উচ্ছ্বসিত করিয়া তোলেন। ১০ই ডিসেম্বর প্রাতে সতীশ বাবু সর্ব্বাগ্রে উপাসনা, তাহার পরে স্থানীয় কয়েকটি যুবকের সঙ্গে নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা বলেন।

ঢাকা ব্রহ্মমন্দিরের বয়োবৃদ্ধ উপাসক শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন দাসের মধ্যম পুত্র শৈলেন্দ্রমোহন কলিকাতায় ব্রাহ্মবালক বোর্ডিংয়ে বাস করিয়া অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এক সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্য শৈলেন্দ্রকে দুঃখ কষ্টও সহিতে হইয়াছিল। দুঃখের বিষয় এই যে, অল্প দিন হইল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। বৃদ্ধ পিতা এক মাস পর্য্যন্ত প্রতিদিন প্রচারক ডাকিয়া গৃহে উপাসনা করিয়া ১লা ডিসেম্বর পুত্রের শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে রেবতী বাবু পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজে ১০০৲ একশত টাকা, কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ২৫৲ এবং স্থানীয় নববিধান সমাজে ১০৲ দান করিয়াছেন।

গিরিডি ব্রাহ্মসমাজ—আমরা দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মিত্রের আটটী সন্তানের অবশিষ্ট পুত্র দেবেন্দ্রনাথ মিত্র ৫টী সন্তান, বিধবা পত্নী ও ৭০ বৎসরের বৃদ্ধ পিতাকে রাখিয়া ৪৩ বৎসর বয়সে বিগত ৩০শে নবেম্বর পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনিই পরিবারের এক মাত্র উপার্জ্জনকারী ছিলেন। শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত

আত্মাকে শান্তিতে রাখুন ও আত্মীয় স্বজনদিগের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

কালীঘাট ব্রাহ্মসমাজ—গত ১৭ই অক্টোবর কালীঘাট ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দাশ গুপ্তের একমাত্র কন্যা কুমারী প্রিয়বালা পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার আদ্য শ্রাদ্ধ গত ২রা নবেম্বর কালীঘাট ব্রাহ্মসমাজে সম্পন্ন হইয়াছে। অশ্বিনীবাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দাতব্য বিভাগে ১৲ টাকা দান করিয়াছেন।

দান—শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার লাহিড়ী ভগিনীর বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন। এ দান সার্থক হউক ও পরলোকগত আত্মা শান্তিলাভ করুক।

প্রচার—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাঁথিতে বৈশাখ মাস হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত ভাবে কার্য্য করিয়াছেন:—কাঁথি ব্রাহ্মসমাজে প্রতি মাসের এক রবিবার বাদে এক রবিবার নিয়মিতভাবে উপাসনা ও উপদেশাদির দ্বারা মন্দিরে আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন; এবং ভাদ্রোৎসবেও দুই দিন মন্দিরে আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বনমালী চট্টগ্রামে শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ জানার বাটীতে যাইয়া অনেক সময় সাপ্তাহিক উপাসনায় ও মধ্যে মধ্যে পারিবারিক অনুষ্ঠানে আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন; মধ্যে মধ্যে বালিয়া, চণ্ডীভেটী, ও কুলঙ্করা প্রভৃতি স্থানেও যাইয়া উপাসনা ও ধর্ম্মালোচনাদি করিয়াছেন। মরিসদা গ্রামে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ করণের বাড়ীতে দৈনিক উপাসনা স্থাপন করতঃ অধিকাংশ সময় সেখানে থাকিয়া প্রাতে ও সন্ধ্যায় উপাসনার কার্য্য এবং মধ্যে মধ্যে পারিবারিক অনুষ্ঠানেও আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। কলিকাতায় এক দিন সাধনাশ্রমের উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। ব্রহ্মমন্দিরে দৈনিক আলোচনা সভায় কয়েকদিন যোগ দিয়াছেন এবং দেবালয়ে সাপ্তাহিক উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। ১২ই অগ্রহায়ণ সায়ংকালে কাঁথি ব্রহ্মমন্দিরে আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন; কয়েকদিন মারিশদা গ্রামে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ করণের বাটীতে দৈনিক উপাসনায় আচার্য্যের কাজ করিয়াছেন। ২০ শে অগ্রহায়ণ বনমালী চট্টা গ্রামে যাইয়া শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ জানার বাটীতে পারিবারিক উপাসনায় আচার্য্যের কাজ করিয়াছেন। ২৬শে অগ্রহায়ণ কাঁথি ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে ও সায়ংকালে আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন এবং বাবু রাধাকৃষ্ণ মাইতির পরলোকগমনে তাঁর আত্মার কল্যাণ কামনায় প্রার্থনা করেন।

প্রাপ্তি স্বীকার—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ১লা আগষ্ট হইতে ৩০ শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত সমাজের বিভিন্ন বিভাগে প্রদত্ত নিম্ন লিখিত দানপ্রাপ্তি কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছেন:—

মিঃ ডি, জি, বৈদ্য নবদ্বীপচন্দ্র স্মৃতিভাণ্ডার ২০৲ মিঃ হেমচন্দ্র সরকার এলেপ্পে ব্রাহ্মসমাজের জন্য সংগৃহীত ৩৭৶ মিঃ সরোজেন্দ্রনাথ রায় আলেপ্পে ব্রাহ্মসমাজ ২৲ মিঃ শ্রীপতিনাথ দত্ত পুত্রের জন্মদিন উপলক্ষে প্রচারে ২৲ মিসেস হেমাঙ্গিনী কুলভি পতির বার্ষিক শ্রাদ্ধে প্রচারে ২৲ মিঃ আর কে দাস প্রচারে ৫৲ মিঃ ও মিসেস হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়, নবদ্বীপচন্দ্র স্মৃতি-ভাণ্ডার ৩০৲ মিসেস নলিনীবালা সিংহ ও কুমারী গিরিবালা ঘোষ পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধে প্রচারে ২৲ সাধনাশ্রমে ১৲ উপাসক মণ্ডলী ১৲ দাতব্য বিভাগ ১৲ মিঃ ব্রজসুন্দর রায় শ্বশুরের বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে প্রচারে ১৲, ডাঃ দক্ষিণারঞ্জন দাস পুত্রের নামকরণ উপলক্ষে প্রচারে ৫৲ সাধনাশ্রমে ২৲ উপাসক মণ্ডলী ২৲ দাতব্য বিভাগে ১৲ মিসেস হিরণ্ময়ী দত্ত মাতার বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে দাতব্য বিভাগে ১০৲ মিসেস প্রতিভা রায় মাতার বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে প্রচারে ২৲ মিঃ অশ্বিনী কুমার দাস গুপ্ত পৌত্রের মৃত্যু উপলক্ষে দাতব্য বিভাগে ২৲ মিঃ অশোক কুমার বসু প্রচারে ৫৲ মিসেস আর রায় মন্দির মেরামত ১০৲ মিঃ বিহারীলাল গুপ্ত নবদ্বীপচন্দ্র স্মৃতিভাণ্ডার ৪৲ শিবনাথ স্মৃতি ভাণ্ডার ৪৲ মিঃ শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তী কনিষ্ঠ পুত্রের বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে প্রচারে ২৲ মিসেস বসন্তবালা হোম বিমলচন্দ্র হোম ফণ্ডের মূলধন বৃদ্ধি ১০০৲ মিঃ বরদাকান্ত বসু কর্ত্তৃক সংগৃহীত বাল্যদান ফণ্ড ১৶১০ জনৈক বন্ধু মাঘোৎসব ৫৲ মিঃ জ্যোৎস্না কুমার দত্ত বিবাহপলক্ষে প্রচার ২৲ মেসেঞ্জার ২৲ সাধনাশ্রম ১৲ রায় সুরেশ চন্দ্র সিংহ বাহাদুর পৌত্রের নামকরণ উপলক্ষে প্রচারে ৪৲ নবদ্বীপ স্মৃতিভাণ্ডারে ১০৲ মিঃ চারুচন্দ্র বসু সাধারণ বিভাগে ৩৲ মিসেস জি এন ঘোষ কন্যার বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে দাতব্য বিভাগে ১০৲ মিঃ শৈলেশ্বর চক্রবর্ত্তী পত্নীর আদ্যশ্রাদ্ধোপলক্ষে প্রচার বিভাগে ২৲ দাতব্য বিভাগে ১৲ মিসেস বনলতা বাগচি পিতার শ্রাদ্ধোপলক্ষে দাতব্য বিভাগে ৫৲ মিঃ শিশির কুমার দত্ত কন্যার নামকরণ উপলক্ষে প্রচারে ১০৲ মিঃ সুধীন্দ্র চন্দ্র দাস পুত্রের নামকরণ উপলক্ষে প্রচারে ৫৲ মিসেস শোভনা গুপ্ত মাতার বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে প্রচারে ১০৲ মিঃ হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় আলেপ্পে ব্রাহ্ম সমাজ ১০৲ মিঃ প্রশান্ত রাও শত বার্ষিকী বাবদ ১০৲ মিঃ ব্রজসুন্দর রায় আলেপ্পে ব্রাহ্মসমাজ বাবদে ২৲ মিঃ বিপিন বিহারী বসু ভ্রাতার বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে প্রচারে ২৲ মিঃ সুধীশচন্দ্র বসু ও মিঃ প্রভাতশচন্দ্র বসু মাতার বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে প্রচারে ২৲ সাধনাশ্রমে ১৲ মিঃ হিমাংশুমোহন বসু আলেপ্পে ব্রাহ্ম সমাজ বাবদ ২৫৲ মিঃ উপেন্দ্র নাথ বল পুত্রের নামকরণ উপলক্ষে প্রচারে ২৲ ডাক্তার ফকির চন্দ্র সাধু খাঁ পৌত্রের নামকরণ উপলক্ষে প্রচারে ২৲ দাতব্য বিভাগে ২৲ মিঃ ও মিসেস্ সত্যচরণ দাস কন্যার শ্রাদ্ধোপলক্ষে দাতব্য বিভাগে ২৲ মিঃ সুধাংশুমোহন বসু আনন্দ মোহন বসু ফণ্ডে মূলধন বৃদ্ধি ১০০৲ ও স্বর্ণপ্রভা বসু ফণ্ডে মূলধন বৃদ্ধি ১০০৲ মিঃ জ বেঙ্কটস্বামী নাইডু শত বার্ষিকী বাবদ ৫৲

ব্রহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় দ্বারা ৭ই পৌষ মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—বরদাকান্ত বসু, বি-এ

Registered NO 65

অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৬ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৪৯ম ভাগ। ১৮শ সংখ্যা। | ১৬ই পৌষ, শুক্রবার, ১৩৩৩, ১৮৪৮ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯৭ | 31St December, 1926. | প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০ | অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

হে করুণাময় উৎসব-দেবতা, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে তোমার উৎসবে আহ্বান করিতেছ, তাহার জন্য প্রস্তুত হইতে ডাকিতেছ। কিন্তু আমরা যে তাহা শুনিয়াও শুনিতেছি না; তাহার জন্ত বিশেষ কোনও আয়োজন করিতেছি না, উদাসীনতা ও অবহেলাতেই জীবন কাটাইয়া দিতেছি, তাহাও তুমি দেখিতেছ। তুমি আমাদের উন্নতি ও কল্যাণের জন্য, আনন্দ ও শান্তির জন্য, যেরূপ ব্যস্ত, আমরা যদি তোমার করুণার দান গ্রহণ করিবার জন্য, উৎসবে নূতন জীবন বল ও উৎসাহ পাইবার জন্য, সেরূপ প্রস্তুত হইতাম, তাহা হইলে আমরা কখনও এরূপ উদাসীন ভাবে জীবন কাটাইতে পারিতাম না, তোমার উৎসবের আয়োজনে সমগ্র হৃদয় মন নিয়োগ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতাম না,—আমাদিগকে উপযুক্ত রূপে প্রস্তুত না করিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে কালকর্ত্তন করিতাম না। আমাদের দুঃখ দুর্গতির ত অন্ত নাই, অভাব দুর্ব্বলতারও ত শেষ নাই! তথাপি কেন যে আমাদের নিরুদ্যম নিরুৎসাহ বিদূরিত হইতেছে না, তুমিই জান। অন্তরদর্শী দেবতা তুমি, অন্তরের অবস্থা তুমিই আমাদের অপেক্ষা ভাল জান। তুমি আমাদিগকে প্রস্তুত না করিলে, আমরা কিছুতেই তোমার উৎসব সম্ভোগ করিতে পারিব না, তাহার জন্য উপযুক্ত আয়োজন করিতে সমর্থ হইব না,—আমরা কোলাহলে মত্ত থাকিয়া সার ধনে বঞ্চিত হইব। আমরা এখনও সংসারের ক্ষুদ্রতা মলিনতার মধ্যেই পড়িয়া রহিয়াছি, আপনার ভাবে, আপনার পথেই চলিতেছি—সকল ধূলি ঝাড়িয়া শুভ্র সুন্দর হইবার জন্য, তোমার নির্দ্দেশে তোমার পথে চলিয়া, প্রেমে পুণ্যে, কল্যাণে, মহত্ত্বে, মণ্ডিত হইবার জন্য, চেষ্টিত হইতেছি না। হে পিতঃ, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে প্রস্তুত কর—তোমার জন্য ব্যাকুল কর, সম্পূর্ণ রূপে তোমার অনুগত হইয়া চলিতে সমর্থ কর। আমরা যেন এ সুযোগ আর না হারাই। তোমার মঙ্গল ইচ্ছাই আমাদের প্রত্যেকের জীবনে ও সমগ্র সমাজে জয়যুক্ত হউক। সকল নরনারী তোমার উৎসব সম্ভোগ করিয়া কৃতার্থ হউক। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

নিবেদন।

পরা ও অপরা বিদ্যা—বেদ, পুরাণ, ছন্দ, জ্যোতিষ, এ সকল অপরা বিদ্যা; যাহা দ্বারা অক্ষয় পুরুষকে জানা যায়, তাহাই পরা বিদ্যা। ব্রহ্মলাভই জীবনের লক্ষ্য। ব্রহ্মের স্পর্শ যাঁরা পেয়েছেন, তাঁদের আত্মা মন উন্নত হয়েছে—তাঁদের হৃদয়ে সকলের প্রতি প্রেম জাগ্রত হয়, তাঁদের জীবন শুদ্ধ ও পবিত্র হয়, তাঁদের দৃষ্টি উদার হয়; তাঁদের প্রাণে সেবার ভাব জাগ্রত হয়, তাঁদের পুণ্যে রুচি ও পাপে ঘৃণা জন্মে। তাঁদের প্রাণে সত্যনিষ্ঠা জাগ্রত হয়। পরা বিদ্যাতেই এই সব ভাব ফুটে উঠে। কত পণ্ডিত দেখলাম, কত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন, কত দর্শন বিজ্ঞান পাঠ করেছেন, কত তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে পারেন; প্রাণস্পর্শী ভাষাতে কত উচ্চ তত্ত্ব বুঝিয়ে দিতে পারেন! কিন্তু হায় রে! তাঁদের এই প্রতিভা, এই বিদ্যা, এই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, সঙ্কীর্ণতা হ'তে তাহাদিগকে ঊর্দ্ধে উন্নীত করতে পারে নাই; তাঁদের চিত্তের মলিনতা দূর করতে পারে নাই, তাঁদের হৃদয়ে সকলের প্রতি প্রেমের সঞ্চার করতে পারে নাই। তাঁদের স্বার্থবুদ্ধি নষ্ট করতে পারে নাই। তাঁরা ঘুরিয়ে কথা বলতে পারেন, তাঁরা অপকার্য্যকে ভাষার জালে সুকার্য্য ব'লে প্রতীয়মান করতে পারেন; কিন্তু তাঁদের অন্তরের পরিবর্ত্তন হয় নাই। অন্তর-দেবতার স্পর্শ ব্যতীত মানব মনের উন্নতি

হয় না। তাই বলি, কেবল শাস্ত্রজ্ঞান, দর্শন-বিজ্ঞান-জ্ঞান হইলেই হয় না, পরমেশ্বরের স্পর্শ লাভ কর্‌বার জন্য সাধনা চাই। সেই সাধনা হ'লে, শাস্ত্রাদির জ্ঞানও পরা বিদ্যা হয়; নতুবা এ সব অপরা বিদ্যা, অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা, মৃত্যুর কারণ হবে।

উৎসবের আহ্বান—উৎসবে যাবে, ব্রহ্মের উৎসবে যোগ দিবে—প্রাণে তোমার কত আনন্দ, কত উৎসাহ! কত দিন ধ'রে এই উৎসবের প্রতীক্ষায় ব'সে আছ, কত সুখ দুঃখ ল'য়ে ব'সে আছ; সেখানে কত সঙ্গীত হবে, সঙ্কীর্ত্তন হবে; কত উপাসনা, বক্তৃতা, আলোচনা হবে। কত দূর দূরান্তর হ'তে তীর্থযাত্রিগণ আস্‌বেন! তাঁদের সহিত সম্মিলনে প্রাণে কত আনন্দ পাবে! এ সকল ভাল কথা। কিন্তু একটী কথা জিজ্ঞাসা করি—উৎসবে যে যাবে, তুমি কি তাঁর নিমন্ত্রণ পেয়েছ? উৎসবের বিজ্ঞাপন, সম্পাদকের চিঠি, এ সকলের কথা বল্‌ছি না। যিনি উৎসব-দেবতা, তাঁর কি ডাক এসেছে? তিনি যে সকলকেই ডাকেন।

কার অতি দীন হীন বিরস বদন,
ওগো ধূলায় ধূসর মলিন বসন,
দুঃখী যে বা আছ, শুন গো বারতা,
ডেকেছেন তোমারেও জগতের মাতা।

তুমি দুঃখী, মলিন; তোমা'কেও তিনি ডাকেন। সেই ডাক শুন্‌তে হয়। সংসারের কোলাহলে, সেই ডাক সব সময়ে সকলের কাণে পৌঁছায় না। তাই কাণ পেতে থাক। তাঁর চরণে অনুতপ্ত হৃদয়ে ক্রন্দন কর; তাঁর নিকট প্রাণের সব আকাঙ্ক্ষা নিবেদন কর; সংযত চিত্তে ব্রতধারী হ'য়ে প্রতীক্ষা কর—তাঁর আহ্বান আস্‌বে; তাঁর বাণী শুন্‌বে। তাঁর নিমন্ত্রণ পেয়ে যদি উৎসবে যাত্রা কর্‌তে পার, তবে যে কৃতার্থ হ'য়ে যাবে। তাঁর স্পর্শ পেয়ে, বাণী শু'নে ধন্য হবে।

দৃষ্টি স্থির রাখ—দোকানে কত লোক জিনিষ কিন্‌তে আসে! দোকানদার সকলকেই দ্রব্যসম্ভার সরবরাহ করে। এই ব্যস্ততার ভিতরেও তার দৃষ্টি রয়েছে, যাতে কেহ কোনও দ্রব্য অপহরণ না করে, কেহ পয়সা না দিয়ে চ'লে না যায়। দড়ি-বাজি দেখেছ? সার্কাস দেখেছ? এক এক জন কত জিনিষ মাথায় ক'রে দড়ির উপর দিয়ে চ'লে যায়, কত রকম খেলাও করে। সাইকেলে চ'ড়ে তারের উপর দিয়ে চ'লে যায়। তারা প'ড়ে যায় না কেন? তাদের সমস্ত ক্রীড়ার ভিতরে দৃষ্টি রয়েছে ভার-কেন্দ্রের দিকে। তোমাকে সংসারে কত কাজ কর্‌তে হয়—স্ত্রী পুত্র পরিবার ল'য়ে সংসার চালাতে হয়, দেশের কাজ, দশের কাজ কর্‌তে হয়—মন কত দিকে ধাবিত হয়! কত লোক কর্ম্মের তাড়নাতে দিক্ বিদিক জ্ঞান শূন্য হ'য়ে বিপথে যেয়ে পড়ে। তুমি এই কর্ম্মবাহুল্যের মধ্যে দৃষ্টি স্থির রাখ্‌তে পেরেছ কি? কাজ কর্‌বে, পরিবারের সংস্থানের জন্য কাজ কর্‌বে; দেশের ও দশের সেবার জন্য কাজ কর্‌বে; কিন্তু দৃষ্টি রাখ্‌বে প্রভুর দিকে। দে'খো যেন কর্ম্ম কর্‌তে যেয়ে সত্যস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ, শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং যিনি, তাঁর অবমাননা ক'রো না। সত্যের পথ, প্রেমের পথ, পবিত্রতার পথ হ'তে বিচ্যুত হ'য়ো না। দে'খো যেন তাঁর কাছে আত্মনিবেদন ক'রে, তাঁর প্রেমে প্রেমিক হ'য়ে, তাঁরই আলোকে আলোকিত পথে চল্‌তে পার। কর্ম্মে কৃতকার্য্যতা লক্ষ্য নয়; তাঁর পথে চলাই লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি স্থির রেখো।

সম্পাদকীয়

উৎসবের আয়োজন—শোক-তাপ-ক্লিষ্ট, নিরুৎসাহ নিরুদ্যমে নিমজ্জিত, পাপভারাক্রান্ত নরনারীকে নবজীবনের স্বাস্থ্য সৌন্দর্য্যে, আশা উৎসাহে, আনন্দ শান্তিতে, অপ্রতিহত উন্নতি ও বিকাশে, শুদ্ধতা ও মহত্বে মণ্ডিত করিবার জন্য, প্রেমময় উৎসব-দেবতার উৎসবের আহ্বান যদি আমরা সত্য ভাবে শ্রবণ করিয়া থাকি, তবে নিশ্চয়ই সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার জন্য বিশেষ আয়োজন করিবার একান্ত প্রয়োজনীয়তাও সকলে অনুভব না করিয়া পারিব না। তাঁহার কৃপাবারি প্রচুর পরিমাণে বর্ষিত হইয়া বিশ্বসংসারকে প্লাবিত করিলেই বা কি হইবে, যদি আমি তাহাকে হৃদয় পাতিয়া গ্রহণ না করিতে পারি? অথবা যদি আমি সুদৃঢ় শৃঙ্খলে আপনাকে সংসারের সঙ্গে এমন কঠিন ভাবে বাঁধিয়া রাখি যে, সে স্রোত আমাকে আর প্রেমসমুদ্রের দিকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে না পারে, তবে নিশ্চয়ই আমার পক্ষে উক্ত মহা প্লাবনও বৃথা হইয়া যাইবে। দীর্ঘকালব্যাপী অভ্যাসের শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া মুক্তি লাভ করা সহজ নহে; অথচ বন্ধন মুক্ত না হইলেও উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর নহে। কঠিন পাষাণময় ভূমির অভ্যন্তর দেশে জলরাশি প্রবেশ করিয়া উহাকে সিক্ত না করিলে, উহার অনুর্ব্বরতা দূর হয় না, উহাতে শস্যাদি জন্মিতে পারে না। কর্ষণ দ্বারা উহার কঠোর আবরণকে বিদীর্ণ করিলেই সহজে জলরাশি অভ্যন্তরদেশে প্রবেশ করিয়া উহার উর্ব্বরতা সাধন করিতে পারে, ও উহাকে তৃণশস্যাদিতে সমাচ্ছন্ন করিতে সমর্থ হয়। পূর্ব্ব হইতে উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া না রাখিলে, আমরা কোনও প্রকারেই ইপ্সিত উপকার লাভ করিতে পারি না,—আমাদের পক্ষে উহা বৃথাই যায়। বাস্তবিক সংসারের সকল বিষয়েই আমরা দেখিতে পাই, যে-কোনও উদ্দেশ্যই আমরা সাধন করিতে যাই না কেন, তাহার জন্য কিছু না কিছু আয়োজন করিতেই হয়,—তাহা ব্যতীত কোথাও সিদ্ধি লাভ করা যায় না। এ কথা শুধু জড় পদার্থ সম্বন্ধেই যে সত্য, তাহা নহে। অন্তর-জগতেও তাহাই দেখিতে পাওয়া যায়। জ্ঞান লাভের অসংখ্য প্রকার সুযোগ আমাদের চারিদিকে প্রচুর পরিমাণে থাকিলেও, দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহা গ্রহণ করিবার উপযুক্ত আয়োজন না করিলে, কেহই উহা সম্যক্ প্রকারে লাভ করিতে পারে না—অনেক সময় তাহা হইতে বঞ্চিতই থাকিতে হয়। এক ধর্ম্ম সম্বন্ধেই কি ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইবে? বাস্তবিক আমাদের অভিজ্ঞতা, আমাদিগকে বলিয়া দিবে যে, এখানেও সেই একই বিধি কার্য্য

করিতেছে। আমাদের জীবনের উপর দিয়া কত উৎসব আসিল গেল, জীবনে কত সময় প্রেমময় পিতার কত কৃপার বর্ষণ ও প্লাবন আসিল গেল, তাহার সর্ব্বত্রই দেখিতে পাইয়াছি, উপযুক্ত আয়োজনের অভাবেই তাহা তেমন ফলপ্রদ হয় নাই—অনেক স্থলে একেবারে ব্যর্থই হইয়াছে। এই আয়োজন যে শুধু আমাদিগকে তাঁহার কৃপা গ্রহণ করিতে সমর্থ করিবার জন্যই আবশ্যক, তাহা নহে। যাহাতে প্রচুর পরিমাণে কৃপার বর্ষণ ঘটিতে পারে, প্রেমের মহা প্লাবন আসিতে পারে, তাহার জন্যও ব্যক্তিগত ও সমবেত চেষ্টা একান্ত প্রয়োজনীয়। সে বিষয়ে উপযুক্ত আয়োজন না করিলে, আবশ্যকীয় উপায় অবলম্বন না করিলে, কোনও প্রকারেই আমরা আশানুরূপ ফল দেখিতে পাইব না।

আমরা পূর্ব্ব সংখ্যার আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলাম যে, প্রখর তাপে উত্তপ্ত হইয়া বায়ু ও জলরাশি যখন দ্রুতবেগে ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়, নিম্নদেশে উহাদের বিশেষ অভাব ঘটে, তখনই যেমন প্রবল ঝটিকাবর্ত্ত ও প্রচুর বারিবর্ষণ বা জলপ্লাবন উৎপন্ন হয়, তেমনি নানা দুঃখ তাপে দগ্ধ নরনারীর আকুল আকাঙ্ক্ষা প্রার্থনা যখন প্রেমময় জীবন-দেবতার উদ্দেশে উত্থিত হয়, হৃদয়ে গভীর অভাব ও শূন্যতা অনুভূত হয়, তখনই প্রেমময়ের প্রেমের ঝড় বহিয়া যায়, প্রচুর কৃপাবারি বর্ষিত হইয়া জীবনকে প্লাবিত করিয়া ফেলে। তৎসঙ্গে ইহাও স্মরণে রাখিতে হইবে যে, যত বিস্তৃত স্থান ব্যাপিয়া এবং যত অধিক উত্তপ্ত হইয়া, এই বায়ু ও জলরাশি উর্দ্ধে উত্থিত হয়, তত প্রবলতর বেগে ও প্রচুরতর পরিমাণে যেমন ঝটিকা প্রবাহিত ও বারি বর্ষিত হয়, তেমনি যত বহু সংখ্যক হৃদয় হইতে এবং গভীরতর আকুলতা হইতে ক্রন্দন ও প্রার্থনা করুণাময় পিতার সমীপে উপস্থিত হয়, তাঁহার করুণাধারাও তত অধিক পরিমাণে নরনারীর মস্তকে পতিত হয়, উৎসবও তত সরস ও জীবনপ্রদ হয়। এই তত্ত্বটা শুধু উপমাপ্রসূত একটা অনুমানমূলক যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে—সর্ব্ব দেশে ও কালে পরীক্ষিত অভিজ্ঞতার সুদৃঢ় ভিত্তির উপরই ইহার প্রতিষ্ঠা। এই সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য পুরাকালের কোনও গ্রন্থের শরণাপন্ন হইবারও প্রয়োজন নাই। আমাদের অল্প কালের ইতিহাসের মধ্যে আমরা সাক্ষাৎভাবে ইহার যে প্রমাণ পাইয়াছি, তাহাতে কোনও প্রকার সন্দেহ স্থাপনের আর স্থান নাই। পূর্ব্বে পূর্ব্বে উৎসবে যেরূপ মহাপ্লাবন দৃষ্ট হইত, ইদানিং যে তাহার নিতান্তই অভাব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলেই আমরা ইহার সত্যতা সহজে বুঝিতে সমর্থ হইব। সাধারণতঃ লোকের অতীতের প্রতি যে একটা মোহের আকর্ষণ ও বর্ত্তমানে স্বাভাবিক অসন্তোষ আছে, তাহার অধীন হইয়া আমরা এ স্থলে কিছু বলিতেছি না। একটা সাময়িক উচ্ছ্বাসের দ্বারাও ইহার বিচার করিতে চাহি না। জীবনের সত্য ও দীর্ঘকালস্থায়ী পরিবর্ত্তনের দ্বারাই, বিষয়টা মীমাংসিত হওয়া উচিত মনে করি। সেই মাপকাঠীর দ্বারা বিচার করিলেও আমরা নিঃসন্দিগ্ধরূপে দেখিতে পাইব, বর্ত্তমান কালের উৎসবে ও কয়েক বৎসরের পূর্ব্বের উৎসবে কত পার্থক্য। এই পার্থক্যের কারণ খুঁজিতে গেলে আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইব, তখন যেরূপ বহু সংখ্যক নরনারী গভীর অভাববোধ ও আকুল প্রার্থনা লইয়া উৎসবক্ষেত্রে সমবেত হইতেন, এখন আর সেরূপ হয় না। লোকসংখ্যা হয়ত অনেক স্থলে পূর্ব্বাপেক্ষা বর্ত্তমানে অধিকই দেখিতে পাওয়া যাইবে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে এমন লোক অতি অল্পই পাওয়া যাইবে, যাঁহারা হৃদয়ের গভীর বেদনা ও শূন্যতাবোধ, প্রাণের আকুল ক্রন্দন ও প্রার্থনা, উন্নততর মহত্তর নবজীবন লাভ করিবার জন্য সরল আকাঙ্ক্ষা, সত্যভাবে আপনাকে প্রেমময় জীবনদেবতার হস্তে সম্পূর্ণরূপে অর্পণ করিবার ইচ্ছা ও সংকল্প, লইয়া উপস্থিত হন। অধিকাংশ লোকই নানা বাহিরের ভাব লইয়া বা একটু সাময়িক তৃপ্তি ও উচ্ছ্বাসের জন্য আসিয়া থাকেন। তাই চারিদিকের এই উদাসীনতা ও বহির্ম্মুখীনতার কঠিন আবরণ বা শীতল বায়ুর স্তর ভেদ করিয়া, সকলকে উত্তপ্ত ও প্রভাবান্বিত করিবার উপযুক্ত অগ্নি প্রজ্বলিত করা আর অল্প কয়েকটী লোকের পক্ষে বর্ত্তমানে সম্ভবপর হইতেছে না। কেন্দ্রস্থলবর্ত্তী অল্প সংখ্যক কয়েকটী লোকের হৃদয় হইতে যে ব্যাকুল প্রার্থনা-প্রবাহ উত্থিত হয়, তাহা বিস্তার লাভ করিতে পারে না, তত প্রবলও হইতে পারে না। অথচ আকারে এবং গভীরতা ও প্রাবল্যে উহার বিস্তার লাভ যে উৎসবে প্লাবন আনিবার জন্য একান্ত আবশ্যক, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এই অবস্থায় আমাদের প্রধান আয়োজন কি হইবে সহজেই বুঝিতে পারা যায়। যাহাতে আমরা প্রত্যেকে গভীর অভাববোধ ও আকুল প্রার্থনা লইয়া উৎসবক্ষেত্রে সমবেত হইতে পারি, সকলকেই তাহার জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টিত হইতে হইবে। ব্যক্তিগত ও সমবেত জীবনে জীবন্ত স্থায়ীফলপ্রসূ উৎসব সম্ভোগ করিতে হইলে, এ বিষয়ে আমাদের প্রত্যেকের যে গুরুতর দায়িত্ব রহিয়াছে, তাহা অনুভব করিতে হইবে। এই কর্ত্তব্যসাধনে উদাসীন হইলে বা অবহেলা করিলে, যেমন নিজের ক্ষতি তেমনি অপর সকলেরও ক্ষতি এবং তাহার ফলে আবার নিজের আরও কিছু ক্ষতি। সুতরাং ইহাতে আমাদের নিজের দ্বিগুণ ক্ষতি, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনিষ্ট। তথাপি তৎসঙ্গে ইহাও স্মরণে রাখিতে হইবে, নিজে নিজের অনিষ্ট সাধন করিয়া, আপন কার্য্যের ফল আপনি ভোগ করিবার আমার যতটা অধিকার আছে, অপরের ক্ষতি করিবার ততটা নাই—অপরের ক্ষতি করা, অপরের প্রতি কর্ত্তব্য লঙ্ঘন করা, অধিকতর অপরাধজনক, এবং সেই হেতু নিজের পক্ষেও অনিষ্টকর। সুতরাং সামাজিক কর্ত্তব্য লঙ্ঘন কোনও প্রকারেই উপেক্ষণীয় নহে,—কল্যাণার্থী ব্যক্তির পক্ষে উক্ত কর্ত্তব্য আরও অধিক পালনীয়। এই উদ্দেশ্যে আমাদিগকে কি করিতে হইবে, তাহা যখন আমরা সকলেই অবগত আছি, তখন সে বিষয়ে বেশী কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। গভীর আত্মচিন্তা ও আত্মপরীক্ষা ব্যতীত অপর কোনও উপায়েই প্রকৃত অভাববোধ, আপনার দৈন্য ও ত্রুটি দুর্ব্বলতার জ্ঞান, অন্তরস্থিত লুক্কায়িত পাপ মলিনতার অনুভূতি ও তজ্জনিত বেদনা, প্রাণে জাগে না; তাহা হইতে মুক্ত হইবার জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষা ও ব্যাকুল প্রার্থনাও সত্য ভাবে হৃদয় ভেদ করিয়া উত্থিত হয় না। সাধুসঙ্গ ও সৎ প্রসঙ্গ হইতে যে এ বিষয়ে বিশেষ সহায়তা প্রাপ্ত হওয়া

যায়, তাহাও কাহার অবিদিত নাই। সুতরাং উৎসবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমাদিগকে বিশেষ ভাবে এই সকল সাধন অবলম্বন করিতে হইবে, এবং সেই উদ্দেশ্যে ইহাকে একটি ব্রতরূপে গ্রহণ করিতে হইবে।

কিন্তু অভাববোধ ও আকুল আকাঙ্ক্ষা জাগিলেই যে সকল সময় ব্যাকুল প্রার্থনার উদয় হয়, হৃদয় অনন্যগতি হইয়া ব্রহ্মের শরণাপন্ন হয়, তাহা নহে। অনেক সময় তীব্র বেদনা ও আকুলতা লোককে অন্য পথেও লইয়া যায়, নানা কৃত্রিম উপায় অবলম্বন দ্বারা আশু প্রতিকার লাভেও প্রলুব্ধ করে। এরূপ অবস্থায় অনেক লোক আবার যখন আপনার অবলম্বিত সকল চেষ্টা যত্ন ব্যর্থ হইতে দেখে, তখন সম্মুখে যাহা কিছু পায় বিনা বিচারে তাহারই শরণাপন্ন হইয়া, অথবা গভীর নিরাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত হইয়া, বিনাশের পথেও ধাবিত হয়। শুধু আপনার উপর নির্ভর করিতে গেলে এরূপ হইবারই কথা। মানুষকে আপনার বুদ্ধি বিচার, শক্তি সামর্থ্যের, উপর কতকটা নির্ভর করিয়া চলিতে হয়, সন্দেহ নাই। তাহা ব্যতীত আবার আপনার অক্ষমতা সম্বন্ধে স্পষ্ট অনুভূতিও জন্মে না, এবং সেই অনুভূতি ব্যতীত কেহ অনন্যগতি হইয়া পরম পিতার শরণাপন্ন হইতে পারে না, ইহাও সত্য। কিন্তু শুধু ইহা হইতেই যে প্রেমময় বিধাতার হস্তে আত্মসমর্পণ আসে, এরূপ বলা যায় না। তাহার জন্য আরও কিছু আয়োজন আবশ্যক। এই হেতু একদিকে যেমন আত্মপরীক্ষা ও আত্মচিন্তা দ্বারা আপনার অভাব ও অক্ষমতা সত্য ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে, অপর দিকে তেমনি নিজ জীবনে ও জগতে প্রেমময় মঙ্গলবিধাতার জীবন্ত লীলা, অপার প্রেম ও করুণা, নিত্য বিধাতৃত্ব যতদূর সম্ভব সুস্পষ্টরূপে হৃদয়ে অনুভব করিতে হইবে,—সে জন্য বিশেষ যত্নশীল হইতে হইবে। এইরূপে নিজ ও অপর জীবনের ইতিহাস আলোচনা করিলে আশা বিশ্বাস ও নির্ভর যে স্বাভাবিক ভাবেই অতি সহজে প্রাণে উদয় হয়, তাহা আর অধিক করিয়া বলিতে হইবে না। এ বিষয়েও সাধুসঙ্গ ও সৎপ্রসঙ্গ হইতে, ধর্ম্মবন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা ও ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ প্রভৃতি হইতে, বিশেষ সহায়তা প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং এই সকলকেই যে আমাদের দ্বিতীয় আয়োজনরূপে গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এই আয়োজন ব্যতীত কিছুতেই আমাদের উৎসব সম্যক্ ফলপ্রদ হইবে না, আমরা ব্যক্তিগত ভাবেও উৎসব যথার্থরূপে সম্ভোগ করিতে পারিব না, তাহা হইতে যথোচিত উপকার লাভ করিতে পারিব না।

তাহার পর দেখিতে পাওয়া যায় যে, উৎসবের মধ্যে মহা-প্লাবন আসিলেও আমরা কেহ কেহ ব্যক্তিগত ভাবে তাহা হইতে বঞ্চিত থাকিতে পারি, আমাদের হৃদয় শুষ্ক, জীবন মৃতপ্রায়, থাকিতে পারে। আমরা বাহিরের উচ্ছ্বাস দ্বারা সাময়িক ভাবে চালিত হইয়া আত্মপ্রতারিত হইতে পারি, অন্তরের অন্তরে সত্যরূপে তাঁহার করুণাধারা গ্রহণ না করিতে পারি, তাঁহার সত্য প্রেমস্পর্শ অনুভব না করিতে পারি। তাঁহার করুণা যে কোন্ মুহূর্ত্তে, কোন্ অবস্থার মধ্যে, কোন্ সূত্র অবলম্বন করিয়া, কোন্ আকারে উপস্থিত হয়, তাহা কেহ বলিতে পারে না। কাজেই তাহা গ্রহণ করিবার জন্য সর্ব্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যদি আমরা এ সম্বন্ধে উদাসীন থাকি, অথবা কোনও বিশেষ সময়, অবস্থা, সূত্র বা আকারে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখি, অপর সমস্ত হইতে দৃষ্টি ফিরাই, তাহা হইলে আমাদের বঞ্চিত হইবার খুব বেশী সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এই জন্যই যে আমরা অনেক সময় তাঁহার করুণাধারা গ্রহণে অসমর্থ হইয়া থাকি, আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতা তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিবে। কত শুভ মুহূর্ত্ত, সুবর্ণ সুযোগ, যে আমরা নষ্ট করিয়াছি তাহার হিসাব কে করিবে? আমাদের অনভিপ্রেত আকারে উপস্থিত হওয়াতে কত দান যে আমরা অগ্রাহ্য করিয়াছি, তাহার কি সংখ্যা আছে? আমরা কি অনেক সময়, পরে তাহা বুঝিতে পারিয়া, শেষে অনুতাপানলে দগ্ধ হই নাই? উদাসীনতা অবহেলা ত সকল বিষয়ে আমাদের প্রধান প্রতিবন্ধক আছেই। তাহাকে অতিক্রম করিয়া, সতত সজাগ, নিয়ত উন্মুখীন, অবিশ্রান্ত প্রার্থনা-শীল, চির প্রস্তুত থাকা সহজ নয়। দীর্ঘ অভ্যাসের শৃঙ্খল ছিন্ন করা অতি কঠিনই। কিন্তু তাহা না করিলেও চলিবে না। উৎসব হইতে সত্য ফল লাভ করিতে হইলে, এই ভাবেই আমাদিগকে প্রস্তুত হইতে হইবে, এইরূপ আয়োজনই করিতে হইবে, এই সাধনেই বিশেষ ভাবে নিযুক্ত হইতে হইবে।

তাহার উপর আবার যে ব্যক্তিগত অভিরুচি, বিশেষ আকারেই তাঁহার করুণা পাইবার ইচ্ছা, অন্য আকারে আসিলে তাহাকে গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা, অথবা মোহ বশতঃ ভ্রান্ত ধারণার অধীন হইয়া তাহাকে চিনিতে না পারা, সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর অন্তরায় রূপে কার্য্য করে, সে কথা বিশেষ ভাবে স্মরণে রাখিতে হইবে। তাঁহার দান বাছিয়া লইতে যাইয়া আমরা অধিকাংশ সময়ে গুরুতর ভ্রমে পতিত হই, চিনিতে না পারিয়া মণি ফেলিয়া কাচখণ্ড আঁচলে বাঁধি। আমাদের জ্ঞান কত সীমাবদ্ধ সে কথা ভুলিয়া, আপনাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিতে যাইয়া, অনেক সময় ভ্রমে পতিত হওয়াতে; আবার কোন কোন সময় আমাদের হৃদয়ের ভালবাসা কোনও বিশেষ বস্তুতে আবদ্ধ থাকাতে, অপর সকলকে অগ্রাহ্য করিবার কারণ ঘটে। এই জন্য একদিকে যেমন আপনার অজ্ঞতা অনুভব করিয়া সর্ব্বদা জ্ঞানস্বরূপের অনন্ত জ্ঞানের, উপরই নির্ভর করিতে হয়, অপর দিকে তেমনি প্রেমস্বরূপের অনন্ত প্রেম ও মঙ্গল ভাবের উপর নির্ভর করিয়া, তিনি যাহা দেন তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা কল্যাণকর জানিয়া, হৃদয় পাতিয়া লইতে হয়, প্রিয় বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়,—আমাদের মোহাভিভূত প্রবৃত্তি আপাত সুখের লালসায় অশ্রেয়কেই প্রেয় রূপে উপস্থিত করে বলিয়া, তাহার আকর্ষণকে বিষবৎ পরিত্যাগ করিতে হয়। প্রেয়ের পশ্চাতে ছুটিলে কখনও শ্রেয়ঃ লাভ করা যায় না। হৃদয় বিশুদ্ধ না হইলে, শ্রেয়ঃ প্রেয় হয় না। আর আপনার অপূর্ণ জ্ঞানের অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণ জ্ঞানের উপর নির্ভর না করিলে, কখনও সত্য জ্ঞান লাভ করা যায় না, ভ্রান্ত ধারণার হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যায় না। সুতরাং এ বিষয়ে আমাদের কি আয়োজন করিতে হইবে, কোন্ ভাবে আপনাদিগকে প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহ

সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এ বিষয়ে আর অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই।

শুধু কিছু পাইলে বা লাভ করিলেই যে জীবন সার্থক হইল না, উৎসব সফল হইল না, তাহাও বোধ হয় অধিক করিয়া বলিতে হইবে না। জীবন একটা গতি, অনন্ত উন্নতির পথে গমন। জীবনে যদি সে গতি না আসে, জীবনপথে যদি আমরা অন্ততঃ একটু একটু করিয়া অগ্রসর হইতে না পারি, তবে সবই বৃথা,—সে জীবন মৃত্যুরই নামান্তর মাত্র। সুতরাং উৎসবের মধ্যে জীবন-বিধাতার নিকট হইতে জীবনপথে অগ্রসর হইবার যে আলোক ও ইঙ্গিত প্রাপ্ত হইব, যে আকাঙ্ক্ষা ও উৎসাহ লাভ করিব, তাহা অনুসরণ করিয়া যদি অগ্রসর না হইতে পারি, তবে কিছুই লব্ধ হইল না। আমরা পথ জানিয়া বুঝিয়াও যে অনেক সময় অগ্রসর হইতে পারি না, তাহার কারণ শুধু আমাদের দুর্ব্বলতা নহে। আমাদের দুর্ব্বলতা যথেষ্ট আছে, সন্দেহ নাই। সেই জন্য উৎসবে তাঁহার নিকট হইতে বল ও শক্তি সংগ্রহ করিতে হইবে। কিন্তু আমাদের বলের অভাব কেন অনুভূত হয়; তাহার অনুসন্ধান করিতে গেলে দেখিতে পাইব যে, আমরা বিবিধ প্রকার অভ্যাসের শৃঙ্খলে সংসারের নানা অসার বস্তুতে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছি বলিয়াই, আমরা মুক্ত ভাবে অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। মুক্ত অবস্থায় থাকিলে জীবনপথে চলা কিছুমাত্র কঠিন ব্যাপার নহে, অতি সহজেই স্বাভাবিক ভাবে সে পথে অগ্রসর হওয়া যায়। মঙ্গলময় বিধাতা আমাদের জন্য সে পথ কঠিন করেন নাই, সহজই করিয়াছেন। তাঁহার করুণা-স্রোত আমাদিগকে নিয়তই সে পথে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। কিন্তু আমরা বর্ত্তমানে মুক্ত নই, সুদৃঢ় শৃঙ্খলে আবদ্ধ। সে বন্ধন সহজে ছিন্ন করা যায় না। তাহার জন্য প্রবল শক্তি আবশ্যক হয়। তাহাকে সবলে ছিন্ন করিতে পারিলে, আর কিছুতেই অগ্রগতি রুদ্ধ করিতে পারে না। সহসা এক আঘাতে এই শৃঙ্খল ছিন্ন করা সম্ভবপর নহে। ধীরে ধীরে ক্রমাগত চেষ্টার দ্বারা সে বন্ধন শিথিল করিতে হইবে। সময় সময় প্রবল আঘাতে যে তিনি শৃঙ্খল একেবারে চূর্ণ বিচূর্ণ না করিয়া দেন, এমন নহে। কিন্তু সেই অপেক্ষায় অলস ভাবে বসিয়া থাকিলে চলিবে না। তাহা শিথিল করিবার জন্য আমাদিগকে ক্রমাগত চেষ্টান্বিত থাকিতে হইবে। ইহা আর একটি অত্যাবশ্যকীয় আয়োজন। এ বিষয়ে আর বিস্তারিত আলোচনার কোনও প্রয়োজন নাই।

করুণাময় পিতা আমাদিগকে এই ভাবে উৎসবের আয়োজন করিতে, তাহার জন্য বিশেষ ভাবে প্রস্তুত হইতে, সমর্থ করুন। সকলের জীবনে তাঁহার ইচ্ছাই জয়যুক্ত হউক।

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ও বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

ব্রাহ্মসমাজের প্রথম যুগের এই দুই জন সেবকের কিঞ্চিৎ বিবরণ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ১৮৩৭ শকের অগ্রহায়ণ ও ফাল্গুন সংখ্যায় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত দুইটি প্রবন্ধ হইতে সংগৃহীত হইল। সঙ্কলয়িতা শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ।

গঙ্গাতীরে মালপাড়া গ্রামে ১৭০৭ শকের ২৯ শে মাঘ বুধবার (১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী) রামচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম লক্ষ্মীনারায়ণ তর্কভূষণ। লক্ষ্মীনারায়ণের চারি পুত্র,—নন্দকুমার, রামধন, রামপ্রসাদ, এবং রামচন্দ্র। জ্যেষ্ঠ নন্দকুমার অবধূতাশ্রমে প্রবেশ করিয়া হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী নাম গ্রহণ করেন। তদবধি নানা তীর্থে পর্য্যটন করাই তাঁহার জীবনের প্রধান কার্য্য হইয়াছিল। রামচন্দ্রও দেশে ব্যাকরণ অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া কাশী প্রভৃতি নানা স্থানে ভ্রমণ করেন। তদনন্তর পঁচিশ বৎসর বয়সে তিনি শান্তিপুরের রামমোহন বিদ্যাবাচস্পতির নিকটে স্মৃতিশাস্ত্র পাঠ করেন। ইহার পরে তিনি কলিকাতায় আগমন করেন।

হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী দেশ পর্য্যটন সূত্রে রঙ্গপুরে উপস্থিত হইয়া রামমোহন রায়ের সহিত পরিচিত হন। রামমোহন রায় তাঁহার শাস্ত্রচর্চ্চায় ও উদারতায় মুগ্ধ হন এবং তীর্থস্বামীও রামমোহন রায়ের প্রণয়পাশে আবদ্ধ হইয়া পড়েন। ইহার পর তীর্থস্বামী কাশীবাসী হন।

কিছুকাল পরে রামমোহন রায় কর্ম্মত্যাগ করিয়া কলিকাতায় বাস করিতে আসিলেন। তাঁহার সহিত বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের প্রথম সাক্ষাৎ বিষয়ে একটি কৌতুকজনক গল্প প্রচলিত আছে। বিদ্যাবাগীশ দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাগান হইতে প্রতিদিন পূজার ফুল আহরণ করিতেন। একদিন তিনি দ্বারকানাথকে বাগানে পুষ্পের অল্পতার কথা জানাইলে, দ্বারকানাথ তাঁহাকে রামমোহন রায়ের বাগানে যাইতে বলেন। রামমোহন রায় ধর্ম্মভ্রষ্ট বলিয়া বিদ্যাবাগীশ তাঁহার বাগানে যাইতে প্রথমতঃ একান্ত অসম্মত ছিলেন। পরে দ্বারকানাথ ঠাকুরের বিশেষ অনুরোধে তিনি তথায় গমন করেন। সে বাগানের একটি বিশেষ স্থানের ফুল তোলা নিষিদ্ধ ছিল। বিদ্যাবাগীশ সেই ফুল তুলিতে গিয়া প্রহরী কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হওয়ায় ক্রোধান্ধ হইয়া রামমোহন রায়ের উদ্দেশ্যে কটুবাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। রামমোহন রায় সকলই দেখিতেছিলেন। তিনি বিদ্যাবাগীশের নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কেন, ঠাকুর, এত উষ্ণ হইয়াছেন? আর, বলুন দেখি, কিসে আমি ধর্ম্মভ্রষ্ট হইলাম?' উভয়ের মধ্যে ঘোর তর্ক চলিল। উভয়েই অনাহারে থাকিয়া দিবসের অধিকাংশ সময় তর্কে কাটাইলেন। অবশেষে বিদ্যাবাগীশ মহাশয় তর্কে পরাস্ত হইয়া, ফুলের সাজি ফেলিয়া দিয়া, গুরুসম্বোধনে রামমোহন রায়ের পদতলে পতিত হইলেন। রামমোহন রায় ব্যস্ত সমস্ত হইয়া, মহাসমাদরে বিদ্যাবাগীশের হস্ত ধারণপূর্ব্বক, একত্র ভোজন করিতে গেলেন।

একবার রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের বিষয়-ঘটিত এমন একটি গোলযোগ উপস্থিত হইল, যাহা আদালতের সাহায্যে মীমাংসা করিতে হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর সাক্ষ্যের প্রয়োজন হয়। রামমোহন রায়ের পরামর্শে তীর্থস্বামীকে মোকদ্দমার সাক্ষী করিয়া কলিকাতায় আসিতে বাধ্য করা হইল। রামমোহন রায়ের বহুদিনাবধি ইচ্ছা ছিল যে তিনি পুনরায় কিছুকাল হরিহরানন্দের সহিত একত্রে ধর্ম্মচর্চ্চা করেন। কিন্তু তিনি কলিকাতায় আসিবার জন্য তীর্থস্বামীকে কাশীর ঠিকানায় বার বার পত্র লিখিয়াও কৃতকার্য্য হয়েন নাই। এখন তীর্থস্বামী আদালতের আহ্বানে কলিকাতায় আসিতে বাধ্য হইয়া, রামমোহন রায়ের উপর অতিশয় ক্রোধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রামমোহন রায় বিনীত ভাবে গললগ্নীকৃতবাসে তীর্থস্বামীর পদতলে পতিত হইয়া তাঁহাকে তুষ্ট করিলেন। তীর্থস্বামী রামমোহন রায়ের মাণিকতলাস্থ ভবনেই বাস করিতে লাগিলেন।

তীর্থস্বামীর অনুরোধে রামমোহন রায় রামচন্দ্রকে পরম সমাদরে নিজ আশ্রয়ে গ্রহণ করেন। বিদ্যাবাগীশ তখনও বেদান্ত অধ্যয়ন করেন নাই; তাই রামমোহন রায় নিজের পণ্ডিত শিবপ্রসাদ মিশ্রের নিকট তাঁহার উপনিষদ্ ও বেদান্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। এই শিক্ষা সম্পূর্ণ হইবার পর রামমোহন রায়ের সাহায্যে বিদ্যাবাগীশ মহাশয় হেদুয়ার দক্ষিণদিকে এক চতুষ্পাঠী খুলিয়া কয়েক জন ছাত্রকে বেদান্ত শাস্ত্রের শিক্ষা দিতে লাগিলেন। রামমোহন রায়ের 'আত্মীয়সভা' স্থাপিত হইলে, তিনি সেই সভায় উপনিষদ্ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেন।

বোধ হয় এই সময়েই বিদ্যাবাগীশ সংস্কৃত কলেজের স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। দশ বৎসর কাল নির্ব্বিরোধে এই কাজ করিবার পর, একবার তিনি কলেজের এক য়ুরোপীয় সেক্রেটারী কর্ত্তৃক হিন্দু আইন সম্বন্ধে ভ্রমপূর্ণ ব্যবস্থা দিবার অছিলায় পদচ্যুত হন। রামমোহন রায়ের সহিত বন্ধুতাই নাকি এই পদচ্যুতির প্রকৃত কারণ। রামমোহন রায় এই বিষয়টি স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টর-সভায় এক আবেদনপত্র প্রেরণ করেন; তাহার ফলে বিদ্যাবাগীশ স্বীয় পদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের পাণ্ডিত্য অসাধারণ ছিল। কলিকাতাবাসের প্রথম অবস্থাতেই তিনি বঙ্গভাষায় এক অভিধান এবং জ্যোতিষ বিষয়ক এক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন; তাহার বিক্রয়লব্ধ অর্থে তিনি হেদুয়া পুষ্করিণীর উত্তরে এক বাটী ক্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি সাপ্তাহিক অধিবেশনে রামমোহন রায়ের রচিত অথবা স্ব-রচিত উপনিষদ্-ব্যাখ্যান পাঠ করিতেন। রামমোহন রায়ের বিলাত যাত্রার পূর্ব্বে বিদ্যাবাগীশ মহাশয় ৯৮টি এইরূপ ব্যাখ্যান পাঠ করিয়াছিলেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, ঐ সময়ের দুই বৎসর দুই মাস অবধি, অর্থাৎ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন অবধি, তিনি বেদীর কার্য্য করিতেছিলেন। বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের পঠিত ব্যাখ্যানগুলির মধ্যে ১৭টি মাত্র স্বর্গীয় ঈশানচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে, অবশিষ্টগুলি পাওয়া যায় না।

১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে প্রসন্নকুমার ঠাকুর যখন হিন্দুকলেজের গবর্ণর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তখন তিনি উক্ত কলেজের অধীনে স্বপ্রতিষ্ঠিত এক উচ্চশ্রেণীর পাঠশালায় ছাত্রদিগকে নীতি বিষয়ে উপদেশ দিবার জন্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশকে নিযুক্ত করেন। সেই সকল উপদেশ পরে 'নীতি দর্শন' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল।

ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধীয় কার্য্যে বিদ্যাবাগীশ মহাশয় দেবেন্দ্রনাথকে সর্ব্বদা উৎসাহ প্রদান করিতেন। বিদ্যাবাগীশ মহাশয় ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যের কার্য্য পূর্ব্ব হইতেই করিয়া আসিতেছিলেন বটে, কিন্তু ১৭৬৫ শকের মাঘ মাসে (অর্থাৎ দেবেন্দ্রনাথের দীক্ষার এক মাস পরে,) দেবেন্দ্রনাথের উৎসাহ ও শ্রদ্ধার ফলে, তাঁহার আচার্য্য পদে 'অভিষেক' ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। সম্ভবতঃ এই বৎসর বিদ্যাবাগীশ মহাশয় ব্রাহ্মসমাজের সাংবৎসরিক উৎসব উপলক্ষে কিছু অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন; কারণ, ইহার অল্পকাল পরেই তিনি পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হন। ১৭৬৬ শকের ৯ই ফাল্গুন তিনি কাশী অভিমুখে যাত্রা করেন, ও পথিমধ্যে মুরশিদাবাদে ২০শে ফাল্গুন রবিবার (১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২রা মার্চ্চ) ৫৯ বৎসর ২১ দিন বয়ঃক্রমে দেহত্যাগ করেন।

ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তাঁহার অনুরাগের কথা সর্ব্বজনবিদিত। তাঁহার জীবদ্দশায় দুই পুত্র ও তিন কন্যার মৃত্যু হয়; কিন্তু কোন বাধাবিঘ্নই তাঁহাকে ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক উপাসনার কার্য্য হইতে অনুপস্থিত রাখিতে পারে নাই। তিনি দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইয়াও মৃত্যুকালে ব্রাহ্মসমাজকে পাঁচশত টাকা দান করিয়া যান।

বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বিষ্ণুচন্দ্র ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে রাণাঘাট অঞ্চলের 'আন্দুলে কায়েৎপাড়া' নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী। কালীপ্রসাদের পাঁচ পুত্র। তন্মধ্যে কৃষ্ণপ্রসাদ, দয়ানাথ, ও বিষ্ণুচন্দ্র সঙ্গীত শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন। ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইবার পূর্ব্বেই দয়ানাথ দেহত্যাগ করেন। ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের প্রথম দিবসাবধি কৃষ্ণ ও বিষ্ণু তাহার গায়ক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অল্পকালের মধ্যেই কৃষ্ণপ্রসাদেরও মৃত্যু হইল। তখন হইতে একা বিষ্ণুই আদি ব্রাহ্মসমাজের গায়কের কার্য্য করিতেন।

বিষ্ণুর চরিত্র অতি নির্ম্মল ছিল। তিনি কেবল বেতনের জন্য ব্রাহ্মসমাজে গান করিতেন না। ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ছিল। দ্বারকানাথ ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজে মাসে মাসে যে ৮০৲ টাকা সাহায্য করিতেন, তাহা হইতে বিষ্ণুচন্দ্রকে ৪০৲ টাকা দেওয়া হইত। পরে নানা কারণে সেই বেতন কমিয়া গিয়া ১০৲ টাকায় পরিণত হইয়াছিল। বেতনের এতটা হ্রাস হওয়াতেও বিষ্ণুচন্দ্র সমাজের কাজ পরিত্যাগ করেন নাই। এক সময়ে বিষ্ণুর সঙ্গীতের জন্যই আদিসমাজের নাম চতুর্দ্দিকে ঘোষিত হইয়াছিল। বিষ্ণুচন্দ্র আদি ব্রাহ্মসমাজ-

প্রকাশিত ব্রহ্মসঙ্গীত পুস্তকের ষষ্ঠভাগ পর্য্যন্ত প্রায় সকল গানেরই সুর বসাইয়াছেন।

বিষ্ণুচন্দ্র এগারো বৎসর বয়সে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়া আটাত্তর বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সাতষট্টি বৎসর কাল একাদিক্রমে তাহার গায়কের কাজ করেন। শুনিলে অবাক্ হইতে হয় যে, এই সুদীর্ঘ কার্য্যকালের মধ্যে তিনি **একটি দিনের জন্যও সমাজে অনুপস্থিত হন নাই**। প্রায় বিরাশি বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন।

৭ই পৌষের বিশেষত্ব।

১৭৬৫ শকের ৭ই পৌষ (১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ডিসেম্বর) বৃহস্পতিবার, অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁহার সঙ্গীগণ প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্মব্রত গ্রহণ করেন। দেবেন্দ্রনাথের জীবনে ইহা একটি যুগপরিবর্ত্তনকারী ঘটনা; তাঁহার সমগ্র পরবর্ত্তী জীবন যেন সেই দিনে গৃহীত সঙ্কল্পেরই বিকাশ মাত্র।

তিনি নিজে সারাজীবন এই দিনটিকে অতি পবিত্র চক্ষে দেখিতেন। এই দিনটিকেই আপনার প্রকৃত জন্মদিন বলিয়া মনে করিতেন। দুই বৎসর পরে তিনি এই দিনে গোরিটিতে ব্রাহ্মদের যে মেলার আয়োজন করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মসমাজে তাহাই প্রথম 'উৎসব'।

এই দিনটি শুধু যে দেবেন্দ্রনাথের জীবনেই নব যুগের দিন, তাহা নহে; ইহা এক অর্থে ব্রাহ্মসমাজেরও নবজীবনের দিন। এই দিনের পর হইতেই ব্রাহ্মসমাজ, এক ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগের দ্বারা পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিলিত মানুষের একটি দল হইয়া, প্রকৃত পক্ষে একটি 'সমাজ' হইল; ইহার পূর্ব্বে কেবল উপাসনার সময়ে কতকগুলি লোক একত্র আসিয়া বসিত মাত্র। ইহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ কথা এই যে, এই দিন হইতে ব্রাহ্মসমাজ প্রকৃত পক্ষে 'ধর্ম্মসমাজ' হইল। একরূপ ধর্ম্মমতে বিশ্বাসী ও একরূপ সমাজরীতিতে শাসিত মানুষেরা স্বভাবের টানে ও প্রয়োজনের চাপে ক্রমশঃ আপনা-আপনি পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হইয়া যেরূপ একটি দল গঠন করে, ব্রাহ্মসমাজ শুধু সেরূপ একটি দল নহে, শুধু সেই অর্থে একটি সমাজ নহে। কিন্তু প্রত্যেক ব্রাহ্ম, ব্রাহ্ম হইবার সময়ে, সারাজীবন ঈশ্বরের নিকটে বিশ্বস্ত থাকিবেন বলিয়া ও সকল আচরণে স্বীয় ধর্ম্মের মহান্ আদর্শটি রক্ষা করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞারূঢ় হন, ইহাই ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ লক্ষণ। দেবেন্দ্রনাথের প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্মব্রত গ্রহণ হইতে ব্রাহ্মসমাজে এই লক্ষণটি সংক্রান্ত হইল। তাই দেবেন্দ্রনাথ আত্মজীবনীতে (৩৭ পৃষ্ঠা) বলিয়াছেন, "ব্রহ্মসমাজের এ একটা নূতন ব্যাপার।"

ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের প্রতিজ্ঞাপত্র ও ব্রহ্মোপাসনা প্রণালী প্রবর্ত্তনের ফলে, ব্রাহ্মসমাজে ১৮৪৩ হইতে ১৮৪৭ সাল পর্য্যন্ত উৎসাহের এক মহা তরঙ্গ উঠিল; সেই তরঙ্গের আঘাতে বঙ্গের চতুর্দ্দিকে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের আদর্শে ব্রাহ্মসমাজসকল স্থাপিত হইতে লাগিল। ১৮৫০ সালে প্রতিজ্ঞাপত্র সংশোধিত হইয়া 'বেদান্ত-প্রতিপাদ্য সত্য ধর্ম্মের' স্থলে 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' শব্দ বসিল। তখন হইতে এই উৎসাহতরঙ্গ আরও বর্দ্ধিত হইল; ১৮৫৬ সাল পর্য্যন্ত আরও সতেজে নব নব ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনের কাজ চলিতে লাগিল। যাঁহারা মনে করেন, সংস্কারবিমুখ হইয়া দেশবাসীকে সন্তুষ্ট করিলেই লোক বৃদ্ধি হয়, তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসের এই সকল কথা ভাবিয়া দেখিবেন।

প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক দীক্ষাগ্রহণের দ্বারা দেবেন্দ্রনাথের নব জন্ম লাভ হইয়াছিল। প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক দীক্ষাগ্রহণ প্রবর্ত্তনের দ্বারাই ব্রাহ্মসমাজেও নব জীবনের অভ্যুদয় হইয়াছিল। কোনও ধর্ম্মে প্রতিজ্ঞা দ্বারা আপনাকে বাঁধিবার ভাবটি না থাকিলেও সে-ধর্ম্ম প্রবল ভাবে প্রচারিত হওয়া অসম্ভব নহে; এমন কি সে-ধর্ম্ম একটি বিজয়ী ধর্ম্মরূপেও জগতে দণ্ডায়মান হইতে পারে। কিন্তু তাহা **ধর্ম্মজীবনের** জন্ম দান করিতে পারে না।

এই দীক্ষার দিনে দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, "অদ্য আমাদের প্রতি-হৃদয়ে ব্রাহ্মধর্ম্মবীজ রোপিত হইবে। আশা হইল, এই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া কালে ইহা অক্ষয় বৃক্ষ হইবে, এবং যখন ইহা ফলবান্ হইবে, তখন ইহা হইতে আমরা নিশ্চয় অমৃত লাভ করিব।" বিশ্বাসীর এই আশা, এই ভবিষ্যদ্বাণী, সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের ভক্তগণের, সাধকগণের, ও বীর-হৃদয় সেবকগণের জীবন-ধারা, ব্রাহ্মসমাজের নানা বিভাগে প্রসারিত কর্ম্মক্ষেত্র, আজ তাঁহার ঐ কথার সাক্ষ্য দিতেছে।

এই ৭ই পৌষ দিনটিকে সমগ্র ব্রাহ্মসমাজ একটি স্মরণীয় দিন বলিয়া গণ্য করিলেই ঠিক হয়। দেবেন্দ্রনাথের উত্তরকালের সাধনক্ষেত্র 'শান্তিনিকেতনে' তাঁহার ইচ্ছাক্রমে এই দিনে প্রতি বৎসর একটি উৎসব ও মেলা হইয়া থাকে। তথায় রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে ও বিশ্বভারতীতে এই দিনটি বিশেষ ভাবে সম্মানিত হয়। রবীন্দ্রনাথ মহর্ষির এই দীক্ষার দিনটির বিষয়ে বলিয়াছেন, "শান্তি নিকেতনের সাম্বৎসরিক উৎসবের সফলতার মর্ম্মস্থান যদি উদ্‌ঘাটন ক'রে দেখি, তবে দেখ্‌তে পাব, এর মধ্যে সেই বীজ অমর হ'য়ে আছে, যে বীজ থেকে এই আশ্রম-বনস্পতি জন্মলাভ করেছে; সে হচ্ছে সেই দীক্ষাগ্রহণের বীজ; মহর্ষির সেই জীবনের দীক্ষা এই আশ্রম-বনস্পতিতে আজ আমাদের জন্য ফল্‌চে, এবং আমাদের আগামী কালের উত্তরবংশীয়দের জন্য ফল্‌তেই চল্‌বে।" ...

মহর্ষির জীবনের একটি ৭ই পৌষকে সেই প্রাণস্বরূপ অমৃত পুরুষ একদিন নিঃশব্দে স্পর্শ ক'রে গিয়েছেন; তার উপরে আর মৃত্যুর অধিকার রইল না। সেই দিনটি তাঁর জীবনের সমস্ত দিনকে ব্যাপ্ত ক'রে কি রকম ক'রে প্রকাশ পেয়েছে, তা কারও অগোচর নেই। তার পরে তাঁর দীর্ঘ জীবনের মধ্যেও সেই দিনটির শেষ হয় নি। আজও সে বেঁচে আছে; শুধু বেঁচে নেই, তার প্রাণশক্তির বিকাশ ক্রমশঃই প্রবলতর হ'য়ে উঠ্‌চে।...

মহর্ষির ৭ই পৌষের দীক্ষার উপরে আত্মার দীপ্তি পড়েছিল, তার উপরে ভূত ভবিষ্যতের যিনি ঈশান, তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল, এই জন্যে সেই দীক্ষা ভিতরে থেকে তাঁর জীবনকে

[মহর্ষির আত্মজীবনীর নূতন সংস্করণের শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক লিখিত পাণ্ডুলিপি হইতে গৃহীত।]

ধনীগৃহের প্রস্তর-কঠিন আচ্ছাদন থেকে সর্ব্বদেশ সর্ব্বকালের দিকে উদ্ঘাটিত ক'রে দিয়েছে। এই সেই ৭ই পৌষ এই শান্তিনিকেতন আশ্রমকে সৃষ্টি ক'রেছে, এবং এখনও প্রতিদিন একে সৃষ্টি ক'রে তুলচে।"

নীরব সাধকের নিভৃত চিন্তা।

(ভ্রাতৃত্ব সাধন)

মৈত্রী, করুণা, মুদিতা প্রভৃতি সম্পদে সম্পদ্বান হইয়া, ইহলোকেই লোকে স্বর্গের আরাম আনন্দ পাইয়া ধন্য হইবে, ইহাই হইল মানবের সর্ব্বাপেক্ষা প্রার্থনীয় অবস্থা। কিন্তু সাধারণতঃ লোকে ইহার মর্য্যাদা বুঝে না—পরস্পরের অবিরোধী হইয়া সদ্ভাব ও আত্মীয়তাতে মিলিত হইয়া, সংসারকে স্বর্গে পরিণত করিয়া বাসের যে আনন্দ তা তারা পায় না। তাহারা সহজ বুদ্ধিতে ইহাই সুবিধাজনক মনে করে যে, আঘাতের পরিবর্ত্তে আঘাত দেওয়াতেই মানুষের মনুষ্যত্ব—বীরত্ব। ক্ষমা অনেক স্থলে কাপুরুষতা ও ক্ষতির কারণ বলিয়াই তাহারা সিদ্ধান্ত করে। এবং সেই আঘাতের পরিবর্ত্তে আঘাত দেওয়া রূপ যে অনুদার ও অপ্রেমের কার্য্য, তাহাকেই প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে। এ সম্বন্ধে ধর্ম্মোপদেষ্টাদের মহদুক্তিকে তাহারা গ্রাহ্য করে না। আত্মবিবেচনাপ্রসূত স্বার্থপর আচরণকেই শ্রেয় জ্ঞান করিয়া ধর্ম্মের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করে, এবং আসল যায়গায় ঠকিয়া যায়। আদর্শ জীবন লাভ করা সহজ নহে; পূর্ণ আদর্শের অনুরূপ জীবন কেহ পাইয়াছেন কি না, সে সম্বন্ধেও সন্দেহ আছে। তাহা হইলেও সম্যক্ ও সমুন্নত আদর্শই সম্মুখে রাখিতে হইবে। আদর্শচ্যুত হওয়াও ভাল কথা নহে; কিন্তু হীনাদর্শ হওয়া একেবারে অকল্যাণকর, অপ্রার্থনীয়। আদর্শ যদি ছোট হইয়া যায়, জীবন কোন ক্রমেই সুন্দর ও সুস্থ হইবে না; সমুন্নত হওয়া ত একেবারেই সম্ভবপর নহে। এজন্য আদর্শ পূর্ণ ভাবে, সমুন্নত ভাবে এবং সম্যক রূপেই জানিতে হইবে এবং সম্মুখে রাখিতে হইবে। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের লক্ষ্য—আদর্শ—অতি উদার ও মহৎ। ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মানবের ভ্রাতৃত্ব সাধনই ইহার লক্ষ্য, ধর্ম্মের ইহাই সার কথা। 'তৃনাদপি সুনীচেন' প্রভৃতি আদর্শের অনুরূপ জীবন যাপন করা সহজ বা সম্ভবপর কি না সন্দেহ; তাহা হইলেও বৈষ্ণবগণ ঐ আদর্শকেই সম্মুখে রাখিয়াছেন, এবং তাহারই গুণে তাঁহারা বিনয়, দীনতা প্রভৃতি ভূষণে ভূষিত হইয়া ধর্ম্মরাজ্যে শ্রেষ্ঠ জীবন যাপন করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। তাই আদর্শকে ছোট করিলে চলিবে না। তাহার সমুচ্চ উজ্জল মূর্ত্তি সম্মুখে রাখিয়াই জীবনযাত্রা আরম্ভ করিতে হইবে। আমাদের সম্মুখে বৈষ্ণবগণের যে আদর্শ তাহা ত আছেই, তাহার সঙ্গে সঙ্গে আছে ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থের মহদুক্তি

"যৎ কল্যাণ মভি ধ্যায়েৎ তত্রাত্মা নং নিয়োজয়েৎ।
ন পাপে প্রতিপাপঃ স্যাৎ সাধুরেব সদা ভবেৎ॥

যাহাতে আপনার কল্যাণ জানিবে তাহাতে আপনাকে নিযুক্ত করিবেক। পাপাচারী ব্যক্তির প্রতি পাপাচার করিবে না, কিন্তু সদা সাধুই থাকিবেক।

"অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধং অসাধুং সাধুনা জয়েৎ
জয়েৎ কদর্য্য দানেন জয়েৎ সত্যেন চানৃতম্॥"

অক্রোধ (ক্ষমা) দ্বারা ক্রোধ জয় করিবে, সাধুতা দ্বারা অসাধুতাকে জয় করিবেক, উপকার দ্বারা অপকারীকে জয় করিবেক এবং সত্য দ্বারা মিথ্যাকে জয় করিবেক।

"যান্য বদ্যানি কর্ম্মাণি তানি সেবিতব্যানি নো ইতরাণি।" কল্যাণকর যে সকল কর্ম্ম তাহার অনুষ্ঠান করিবেক। অকল্যাণকর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেক না।

"সত্যান্ন প্রমদিতব্যং ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যং কুশলান্ন প্রমদিতব্যং"। সত্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেক না, ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেক না, শুভকর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেক না। এ সমস্ত আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়াই স্বদেশ প্রেম ও দেশহিত সাধন করিতে হইবে, এবং মানবের ভ্রাতৃত্ব সাধন করিতে হইবে। পাপকারীর প্রতি পাপাচরণ করিলে চলিবে না। প্রত্যুত সাধুতা দ্বারা অসাধুতাকে জয় করিতে হইবে। সত্যের দ্বারা মিথ্যাকে, উপকার দ্বারা অপকারকে, জয় করিতে হইবে। তাহা হইলেই বর্ত্তমান দেশোদ্ধারের কার্য্যে আমাদিগকে কি ভাবে যোগ দিতে হইবে, সে সম্বন্ধে খুব বিবেচনার সহিত কার্য্য করিতে হইবে। দেশপ্রেমের অনুরোধে ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইলে চলিবে না। দেশের কল্যাণসাধন অতি উপাদেয় এবং অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তাহা ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়া, উদার ভ্রাতৃপ্রেমকে রক্ষা করিয়াই, করিতে হইবে। সাধুতা দ্বারাই অসাধুতাকে, প্রেম দ্বারাই অপ্রেমকে জয় করিতে হইবে। পুরাতন বাইবেলে উক্ত হইয়াছে "তুমি মনে মনে ভ্রাতাকে ঘৃণা করিবে না, কিন্তু যে কোন প্রকারে হউক স্বীয় প্রতিবাদীকে অনুযোগ করিবে এবং তাহাকে পাপ করিতে দিবে না। তুমি প্রতিহিংসা করিও না, ও স্বজাতির প্রতি দ্বেষ করিও না; কিন্তু প্রতিবাদীকে আত্মবৎ প্রীতি করিবে।"

উন্নত প্রেমের জীবন যাপন করা সহজ নহে। সকলের দুঃখে দুঃখী হইয়া, সকলের কল্যাণ সাধনে আপনাকে নিযুক্ত রাখা সহজ নহে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে সকলেই আমাদের ভাই। সকলেরই কল্যাণসাধনের জন্য অন্ততঃ প্রার্থনাপরায়ণ হইতে হইবে। অন্যেরা আমাদের ক্ষতি করিয়াছে, সুতরাং তাহাদের ক্ষতি করিতেই হইবে, এ ভাব একান্ত সাংসারিক ভাব। ধর্ম্ম ইহাতে রক্ষা পায় না, ধর্ম্মসাধন এ ভাবে হয় না। কার্য্যতঃ যাহা করা উচিত বা যাহা হওয়া উচিত, তদনুরূপ যদি হইতে না পারি, তাহা হইলেও তাহার বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করিলে, প্রেমের বিরুদ্ধ আচরণ করিলে, চলিবে না। সম্যক্ আদর্শের অনুরূপ জীবন যাপন না করিতে পারিলেও, তাহার বিরুদ্ধ চেষ্টার সহিত যুক্ত হইলে কখনই ধর্ম্মসাধন হইবে না। মহান্ লক্ষ্যের বিরুদ্ধ যাহা তাহা হইতে দূরে থাকিতে হইবে। জানিয়া শুনিয়া অপ্রেমকে প্রশ্রয় দিলে প্রেমের ধর্ম্ম, "ভ্রাতৃত্ব সাধন", কখনই সাধিত হইতে পারে না।

প্রাপ্ত

ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি

মাঝে মাঝে এই পুরাতন প্রশ্ন ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য ও উপাসকদিগের নিকট শুনিতে পাওয়া যায়,—ধ্যানের পর যে প্রার্থনা করা হয়, তাহা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের "ব্রাহ্মধর্ম্ম" গ্রন্থে সঙ্কলিত প্রাচীন বৈদিক ঋষিদের প্রার্থনা—

"অসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়। আবিরাবীর্ম্মএধি।
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।"—

অনুযায়ী হওয়া উচিত, কি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাঙ্গালা ভাষায় অনূদিত ও রূপান্তরিত—

"অসত্য হইতে আমাদিগকে সত্যেতে লইয়া যাও। অন্ধকার হইতে আমাদিগকে জ্যোতিতে লইয়া যাও। মৃত্যু হইতে আমাদিগকে অমৃতেতে লইয়া যাও। হে সত্যস্বরূপ, আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হও। দয়াময়, তোমার যে অপার করুণা, তাহার দ্বারা আমাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা কর।"—হওয়া উচিত? এ বিষয়ে আলোচনা অনেকবার হইয়াছে, কিন্তু কোনও সমাধান হয় নাই; সর্ব্ববাদী সমাধান কখনই হইবেও না।

কোনও কোনও আচার্য্য আবার "হে সত্যস্বরূপ, আমাদিগের নিকট প্রকাশিত থাক,"—এরূপও বলিয়া থাকেন।

যাঁহারা মহর্ষির প্রবর্ত্তিত প্রণালীর বিরোধী, প্রধানতঃ তাঁহাদের দুইটী আপত্তি। একটি—সংস্কৃত ভাষা উপাসকমণ্ডলীর সকলের বোধগম্য নহে। অপরটি—উহাতে উপাসকের ব্যক্তিগত প্রার্থনা হয়, মণ্ডলীর প্রার্থনা হয় না।

প্রথম আপত্তির উত্তরে বক্তব্য এই যে, সংস্কৃত ভাষা সর্ব্বসাধারণের সহজবোধ্য নহে বলিয়া যদি বাঙ্গালা ভাষার শরণাপন্ন হইতে হয়, তাহা হইলে আরাধনার যে বীজমন্ত্র—"সত্যং জ্ঞান মনন্তং ব্রহ্ম"—ইত্যাদি তাহাও বর্জ্জন করিতে হয়। কিন্তু এ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে কোনও আপত্তি কাহারও নিকট শুনা যায় নাই।

সংস্কৃত ভাষার—বিশেষতঃ বৈদিকমন্ত্রের—যে গাম্ভীর্য্য, ভারতবাসীর নিকট তাহার যে পবিত্রতা, তাহা অপর কোনও ভাষার আছে কি? যখন ভাবা যায়, স্মরণাতীত কাল হইতে সাধক ঋষিকুল, ভক্তদল, এই সকল মন্ত্রে ভগবানের উপাসনা করিয়াছেন, তখন প্রাণে কি এক অপূর্ব্ব ভাব ও ভক্তির সঞ্চার হয়,—মন সহজেই ভগবৎ আরাধনায় নিবিষ্ট হয়।

মহর্ষি ব্রহ্ম-প্রেরণায় উপাসনার যে সকল মন্ত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় ঋষিদের জীবনের সাধন লব্ধ মহামূল্য রত্ন,—প্রত্যক্ষ অনুভূতিমূলক জ্ঞান, শ্রুত বা অধীত জ্ঞান নহে,—সিদ্ধ মন্ত্র। সেই সকল সিদ্ধ মন্ত্রের সাহায্যে মহর্ষির জীবনে কি মহৎ ফল ফলিয়াছিল, তাহা আমরা দেখিয়াছি;—"সত্যং" বলিতে তাঁহার মুখশ্রী দিব্য জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত, মাথার কেশ দণ্ডায়মান হইত। দেখিয়াছি, ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ "হরি ওঁ হরি ওঁ হরি ওঁ" এবং "ওঁ তৎসৎ ওঁ তৎসৎ ওঁ তৎসৎ" জপিতে জপিতে কি রূপ সমাধিপ্রাপ্ত হইতেন; ভক্ত কালীনারায়ণ গুপ্ত উপাসনা কালে "ওঁ ব্রহ্ম" ধ্বনিতে উপাসকদের প্রাণে কি ভাব-প্রবাহ ছুটাইতেন! পূর্ব্বোক্ত সাধু ভক্তদের জীবনে ঋষিদের সিদ্ধ মন্ত্রের এইরূপ প্রভাব আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সিদ্ধ মন্ত্রের প্রভাব কোন্ সাধক না জীবনে অনুভব করিয়াছেন? সিদ্ধ সাধকের প্রভাব যদি মানিতে হয়, তবে সিদ্ধ মন্ত্রের প্রভাব কেন মানা হবে না? তবে যার যে নামে প্রাণে ভাব ভক্তির উদয় হয়, তার পক্ষে সেই নামই সাধনমন্ত্র হইতে পারে; কিন্তু তাহাতে সাধন "চক্র" বা "মণ্ডলী" গঠনের সম্ভাবনা কম। প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায় বা মণ্ডলীর এক একটি বিশিষ্ট সাধন প্রণালী থাকে, তাহাতে সাধকদের মধ্যে পরস্পরে ঘনিষ্ঠ বন্ধন বা জমাট ভাব-যোগ জন্মে। সাধকের একতা ব্যতীত মণ্ডলী গঠন ত দূরের কথা, ধর্ম্মবন্ধুতাও হয় না। এক ভাবের ভাবুক ও এক সাধন-পথের পথিক না হইলে ভাবের বিনিময় হয় না; ভাবের আদান প্রদান না হইলে সাধক দল গঠিত হয় না। ব্রাহ্মসমাজে যে জমাট ভাব গঠিত হইতেছে না, তাহার প্রধান কারণ, সাধনের একতার অভাব। ব্রাহ্মসমাজে এক সময় যে জমাট ধর্ম্মভাব দেখা গিয়াছিল, তাহার কেন্দ্র ছিলেন,—ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র; তাঁহার সহচর অনুচরগণ তাঁহার সঙ্গে এক সাধনপন্থাবলম্বী ছিলেন। সাধনের একতার জন্য তিনি ব্রাহ্মসমাজে সঙ্গতের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সেই সঙ্গত শুধু ধর্ম্মমত ও বিশ্বাসের আলোচনার স্থল ছিল না,—ধর্ম্মসাধন-চক্র ছিল। ব্রহ্মানন্দ সেই সাধনচক্রের কেন্দ্র বা নেতা ছিলেন। সাধনের একতা রাখিতে হইলে রাজর্ষি ও মহর্ষির অবলম্বিত সাধকপরম্পরাগত সাধনপন্থাই যেন শ্রেয়ঃ ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়। রামমোহন সর্ব্বধর্ম্ম প্রতিপাদ্য বিশ্বজনীন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হইলেও, সাধন সম্বন্ধে জাতীয় ভাবাপন্ন ছিলেন—ভারতীয় ঋষিদের পন্থাবলম্বী ছিলেন; দেবেন্দ্রনাথও তাঁহারই অনুসরণ করিয়াছিলেন।

তারপর ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা-পদ্ধতি ত শুধু বাঙ্গালীর জন্য নহে। ভারতের সর্ব্বত্রই হিন্দুদের মধ্যে উপাসনা-পদ্ধতিতে সংস্কৃত মন্ত্রের প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দু মাত্রেরই অল্পাধিক সংস্কৃত জ্ঞান আছে। আজকালকার দিনে ভারতের সকল প্রদেশের শিক্ষিত পুরুষ রমণীরাই বেদ, উপনিষদাদি পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের অনেকে দেশের লোকদের যত অজ্ঞ মনে করেন, প্রকৃত অবস্থা তাহা নহে। ভারতের অপর প্রদেশের যাঁহারা আমাদের উপাসনাতে যোগদান করেন, তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষার আরাধনাদি অনুসরণ করিতে না পারিলেও, আরাধনার ও প্রার্থনার মন্ত্রগুলি সংস্কৃত হইলে আংশিক ভাবে তাহাতে যোগ দিতে পারেন। উৎসবাদির সময় অপর প্রদেশ-বাসী যে সকল ব্রাহ্ম বাঙ্গালা দেশে আসেন, তাঁহাদের নিকট ইহা শুনিয়াছি। উপাসনাতে প্রাচীন ভাষার মন্ত্রের প্রয়োগ, হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ, পার্সিক, য়িহুদী, ইস্‌লাম প্রভৃতি সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়।

অপর আপত্তিটির সম্বন্ধে নিজের অযোগ্যতা সত্ত্বেও সত্যের অনুরোধে যৎকিঞ্চিৎ বলিতে বাধ্য হইতেছি। কেননা, অনেকে এ বিষয়ের উপরই অধিক জোর দিয়া থাকেন। তাঁহারা এজন্য এই প্রার্থনার নাম দিয়াছেন, "সাধারণ বা সমবেত প্রার্থনা।"

রাজর্ষি রামমোহন রায়ের সময়কার উপাসনা-পদ্ধতির বিষয় যাহা জানা যায়, তাহাতে "গায়ত্র্যা" উপাসনার প্রতিই অধিক ঝোঁক ছিল মনে হয়। বিধিবদ্ধ উপাসনা-প্রণালী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথই উপনিষদাদি হইতে সংগ্রহ ও সঙ্কলন করিয়াছিলেন; তাহাতে সাধারণ বা সমবেত প্রার্থনার উল্লেখ দেখিতে পাই না। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ" প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা ভাষায় অনুদিত ও রূপান্তরিত প্রার্থনার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তখন তিনি খৃষ্টপ্রভাবে প্রভাবান্বিত ছিলেন। পরবর্ত্তী জীবনে তাঁহাকে পূর্ণমাত্রায় হিন্দুভাবাপন্ন দৃষ্ট হয়;—তখন ভক্ত রামপ্রসাদের ন্যায় তাঁহাকে মাতৃভাবের সাধক দেখিতে পাওয়া যায়। উভয়ে একগোত্রজ বা একবংশজ ছিলেন কি না জানি না; তবে গরিফা ও হালিসহর নিকটবর্ত্তী পল্লী বটে। অথবা রামকৃষ্ণ পরমহংসের সহিত আধ্যাত্মিক যোগের ফলও ইহা হইতে পারে;—কেশবচন্দ্রই সর্ব্বপ্রথম রামকৃষ্ণকে লোকচক্ষুর গোচরে আনিয়াছিলেন,—"ধর্ম্মতত্ত্বে" পরমহংসের উক্তি প্রকাশ করিয়া। কেশবচন্দ্রের অনুচররূপেই নরেন্দ্রনাথ দত্ত রামকৃষ্ণের সংস্রবে আসিয়াছিলেন। তখন তিনি ব্রহ্মমন্দিরে সংগীত করিতেন এবং নববৃন্দাবন নাটকের একজন অভিনেতা ছিলেন; পরে বিবেকানন্দ হইয়াছিলেন। "বিবেক ও বিবেকবাণী" শব্দাদির প্রয়োগ ব্রাহ্মসমাজ দেশে প্রথম প্রচার করিয়াছিলেন।

খৃষ্ট ও মুসলমান উপাসনা-প্রণালীতে "কন্তের" স্থান আছে; প্রাচীন হিন্দু, বৌদ্ধ প্রভৃতি ভারতীয় উপাসনা-প্রণালীতে "কন্তের" স্থান নাই,—উঠা বসার বিধান নাই। দেশগত ও জাতিগত পার্থক্যের উপর উপাসনা-প্রণালীর পার্থক্য দৃষ্ট হয়। সকল ধর্ম্মের মূল সত্য এক হইলেও, দেশ, কাল ও পাত্র ভেদে বিভিন্ন ধর্ম্ম-বিধানের সাধনপ্রণালী বিভিন্ন ভাবে প্রকটিত হইয়াছে। ব্রহ্মানন্দ বোধ হয় খৃষ্টীয় উপাসনা প্রণালীর অনুকরণে ব্রাহ্মসমাজে এই সমবেত প্রার্থনার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, এবং তজ্জন্যই এই প্রার্থনাটী দাঁড়াইয়া করিবার প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। আদি সমাজে ধ্যানের পূর্ব্বে উদ্বোধন বা আরাধনান্তে প্রার্থনাকালীন দাঁড়াইবার নিয়ম নাই। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে সদ্বিবেচনার সহিতই এই দুইটি নিয়ম বর্জ্জন করা হইয়াছে। আরাধনা করিতে করিতে উপাসকের প্রাণ স্বতঃই ধ্যানে প্রবেশ করে। তখন আর একটা উদ্বোধন হইলে ধ্যানের অনুকূল না হইয়া বরং অন্তরায় হয়। তেমনি ধ্যানের অবসানে প্রার্থনা কালীন দাঁড়াইতে গেলে ভাববিপর্য্যয় ঘটে।

আরাধনার পরিণতি ধ্যান ও সমাধি,—ভগবানের সহিত ওতপ্রোত ভাব,—"তোমাতে আমি, আমাতে তুমি" এই ভাবের সাধন,—এখানে তৃতীয়ের স্থানাভাব। "তুমি আর আমি মাঝে কেহ নাই, কোন বাধা নাই ভুবনে।" ধ্যানের মন্ত্র—"ত্বং হি," "ওঁ ব্রহ্ম," "ওঁ তৎসৎ"। ইহার কোনও একটী মন্ত্রের সাহায্যে ভগবৎ সত্তাতে অবগাহন, নিমজ্জন, আত্মবিস্মরণ। মহর্ষি গায়ত্রী মন্ত্র অনুধ্যান করিতে করিতে ধ্যান-নিরত হওয়ার ক্রম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ব্যক্তিগত সাধনের যে ক্রম, সামাজিক ও সম্মিলিত উপাসনায় তাহার আভাস মাত্র ইঙ্গিত হয়।

এখন কথা এই, উপাসনা যখন গভীর হয়, পরোক্ষ না হইয়া প্রত্যক্ষ হয়, আরাধনা করিতে করিতে ব্রহ্মসত্তাতে যখন আচার্য্য বা উপাসকের প্রাণ নিমজ্জিত হয়, তখন উপাসকমণ্ডলীর কথা দূরে থাকুক, পার্শ্ববর্ত্তী উপাসকের, এমন কি আপনার দেহের অস্তিত্ব জ্ঞান থাকে কি? উপাসনাতে এই অবস্থা লাভই ত আদর্শ ও বাঞ্ছনীয়। এ অবস্থায় সমবেত প্রার্থনার স্থান কোথায়? সাধক আচার্য্যই হউন, আর উপাসকই হউন, প্রত্যক্ষ ভাবের আরাধনা হইলে ব্রহ্মসত্তাতে আত্মানুভূতি ব্যতীত ত অপর কোনও অনুভূতি থাকে না, থাকিবার কথাও নয়। তখন "তুমি আর আমি" ছাড়া ত আর কিছুই থাকে না,—তৃতীয়ের স্থানাভাব ঘটে। তদবস্থায় প্রার্থনাকালে "আমাদিগকে" বলিবার সুযোগ কোথায়? তখন ত "অসতোমা সদ্গময়" ইত্যাকার প্রার্থনা করাই স্বাভাবিক। তন্ময় ভাবের উপাসনাতে যদি আচার্য্যের সহিত উপাসকের যোগদান সম্ভব হয়, তবে আচার্য্য যখন প্রার্থনাতে বহুবচন প্রয়োগ না করিয়া একবচন প্রয়োগ করেন, তখন তাহাতে যোগ দিতে না পারিবার কোনও বিশিষ্ট কারণ দেখা যায় না। সকলেই যদি একমন, একপ্রাণ হইয়া এক বচন প্রয়োগ করেন, তাহাতে কি সমবেত প্রার্থনার ফল হয় না?

"মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না,"—যাঁহাদের জীবনের এই অবস্থা,—তাঁহাদের পক্ষে "প্রকাশিত থাক"—এরূপ প্রার্থনা সত্য-সঙ্গত নহে। যাঁহারা ভগবৎ সত্তা জীবনে অব্যাহত রূপে সদা অনুভব করেন, তাঁহাদের পক্ষেই এরূপ প্রার্থনা করা সম্ভবপর। মত, বিশ্বাস ও জ্ঞানের কথা এক, প্রত্যক্ষ অনুভূতির বিষয় স্বতন্ত্র। ব্রাহ্মসমাজে পরলোকগত সাধক দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ, কেশবচন্দ্র, প্রতাপচন্দ্র, অঘোরনাথ, বিজয়কৃষ্ণ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, শিবনাথ, গৌরগোবিন্দ, উমেশচন্দ্র, নবদ্বীপচন্দ্র, অবিনাশচন্দ্র, কালীনাথ, কালীনারায়ণ,—প্রভৃতির কাহাকেও "প্রকাশিত হও" ব্যতীত "প্রকাশিত থাক"—প্রার্থনা করিতে শুনা যায় নাই। ইঁহাদের অপেক্ষা উচ্চ অঙ্গের সাধকদের কথা স্বতন্ত্র;—অধিকারী ভেদে সাধনার প্রভেদ সর্ব্বত্রই ঘটিয়া থাকে।

কাহারও কাহারও আর একটী আপত্তি আছে,—ভগবানকে "রুদ্র" বলিতে! তাঁহারা ভগবানকে পরম দয়ালু, পরম মঙ্গলময় রূপে দেখিতে চাহেন,—তাঁহার যে রুদ্র ভাবও আছে, তাহা মানিতে চাহেন না। কিন্তু প্রকৃতি-রাজ্যে, মানব-সমাজে ও ব্যক্তিগত জীবনে ভগবানের রুদ্র ভাবেরও অভাব নাই। মানুষ পাপ, প্রলোভন ও অভ্যাসের দাস; রোগ, শোক ও জরা মৃত্যুর অধীন। তাহাকে ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে হইলে কত সংগ্রামের ভিতর দিয়া চলিতে হয়,—তখন কত সময় ভগবানের রুদ্র মূর্ত্তি প্রাণে অনুভব করিতে হয়। সাধনপথের পথিক অনেককেই অল্পাধিক পরিমাণে ভগবানের রুদ্র ভাবের সহিত পরিচিত হইতে হয়, তাঁহাদিগকে "ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাম্; গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাম্" বলিতেই হয়। প্রত্যেক সাধক, প্রত্যেক উপাসক চিন্তা করিয়া দেখুন, জীবনে কখন না কখন ভগবানের রুদ্র ভাবের পরিচয় পাইয়াছেন কি না? বাস্তব জীবনে যাহা ঘটে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহা মানিতেই

হয়। তাই প্রাণ হইতে স্বতঃই প্রার্থনা উঠে,—"রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।" রুদ্র! তোমার যে প্রসন্ন মুখ, তাহার দ্বারা আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা কর। ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

ব্রাহ্মসমাজ

সপ্তনবতিতম মাঘোৎসব—প্রেমময়ের অপার করুণায় পুনরায় আমাদের প্রিয় মাঘোৎসব সমুপস্থিত। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে আগামী সপ্তনবতিতম মাঘোৎসব সম্পন্ন করিবেন স্থির করিয়াছেন। আবশ্যক হইলে ইহার কিছু পরিবর্ত্তনও হইতে পারিবে। ব্যাকুলহৃদয় বিশ্বাসিগণের সম্মিলনের উপর উৎসবের সফলতা বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। তাই কার্য্যনির্ব্বাহক সভা উৎসবে যোগদান করিয়া উহাকে সফল করিবার জন্য, সকলকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিতেছেন। প্রাতে ৭ ও সন্ধ্যা ৬।৷৹ ঘটিকায় কার্য্য আরম্ভ হইবে।

১লা মাঘ—(১৫ই জানুয়ারী ১৯২৭) শনিবার—প্রাতে—ব্রাহ্ম পরিবার এবং ছাত্র ও ছাত্রীনিবাসসমূহে ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা। সন্ধ্যায়—উৎসবের উদ্বোধন। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস, এম, এ।

২রা মাঘ—(১৬ই জানুয়ারী) রবিবার প্রাতে—উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র রায়, বি, এ। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় বরাহনগরস্থ শ্রমজীবিগণের নগর সঙ্কীর্ত্তন। সন্ধ্যায়—বরাহনগরস্থ শ্রমজীবিগণের উৎসব উপলক্ষে উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার, এম, এ।

৩রা মাঘ—(১৭ই জানুয়ারী) সোমবার—প্রাতে উপাসনা; আচার্য্য—শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র সোম। সন্ধ্যায়—বক্তৃতা। বক্তা—শ্রীযুক্ত ভবসিন্ধু দত্ত।

৪ঠা মাঘ—(১৮ই জানুয়ারী) মঙ্গলবার প্রাতে—উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায়। সন্ধ্যায়—সঙ্গত-সভার উৎসব উপলক্ষে বক্তৃতা।

৫ই মাঘ—(১৯শে জানুয়ারী) বুধবার ছাত্রসমাজের উৎসব উপলক্ষে প্রাতে—উপাসনা। সন্ধ্যায়—বক্তৃতা।

৬ই মাঘ—(২০শে জানুয়ারী) বৃহস্পতিবার প্রাতে—উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ। সন্ধ্যায়—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি সভা। সভাপতি—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, বি, এ। বক্তা—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম্ এ, ডাঃ কালীদাস নাগ, শ্রীযুক্তা হেমলতা সরকার, শ্রীযুক্ত অমলকুমার সিদ্ধান্ত, এম্, এ।

৭ই মাঘ—(২১শে জানুয়ারী) শুক্রবার—প্রাতে উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। সন্ধ্যায়—তত্ত্ববিদ্যা সভার উৎসব উপলক্ষে বক্তৃতা। বক্তা—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ। বিষয়—বিশ্বরূপ দর্শন।

৮ই মাঘ—(২২শে জানুয়ারী) শনিবার প্রাতে—মন্দিরে ব্রাহ্ম মহিলাদিগের উৎসব উপলক্ষে উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্তা হেমলতা সরকার। (পুরুষদিগের জন্য সিটি-কলেজ-গৃহে পৃথক উপাসনা)। সন্ধ্যায়—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক সভা। (কেবল সভ্যদের জন্য)।

৯ই মাঘ—(২৩শে জানুয়ারী) রবিবার প্রাতে—ব্রাহ্ম যুবকদিগের উৎসব উপলক্ষে কীর্ত্তন ও উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্তা হেমলতা সরকার। অপরাহ্ণ ১½ ঘটিকায় যুবকদিগের আলোচনা। ৪ ঘটিকায়—নগর সংকীর্ত্তন; সন্ধ্যায় উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, বি, এ।

১০ই মাঘ (২৪শে জানুয়ারী) সোমবার প্রাতে—কলিকাতাস্থ উপাসকমণ্ডলীর উৎসব উপলক্ষে উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী। অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায়—নবদ্বীপচন্দ্র-স্মৃতিসভা। সভাপতি হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়, এম, এ বক্তা—শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস, এম, এ, শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু, বি, এ, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত, শ্রীযুক্তা অবন্তী ভট্টাচার্য্য। সন্ধ্যায়—উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম, এ।

১১ই মাঘ—(২৫শে জানুয়ারী) মঙ্গলবার—**সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব**। প্রাতে ৫ ঘটিকায়—কীর্ত্তন, ৭ ঘটিকায়—উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য এম, এ। অপরাহ্ণ ১ ঘটিকায় উপাসনা; আচার্য্য—শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু, বি, এ। ২ ঘটিকায় পাঠ ও ব্যাখ্যা। পাঠক—শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস, এম, এ, শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর রায়, এম, এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু, বি, এ। ৪ ঘটিকায়—ইংরাজীতে উপাসনা; আচার্য্য—শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ, এম্, এ। সন্ধ্যায়—কীর্ত্তন ও উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় এম, এ।

১২ই মাঘ (২৬শে জানুয়ারী) বুধবার প্রাতে—সাধনাশ্রমের উৎসব উপলক্ষে উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী। অপরাহ্ণ ২ ঘটিকায়—আলোচনা। সন্ধ্যায়—বক্তৃতা। বক্তা—শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ, এম, এ।

১৩ই মাঘ (২৭শে জানুয়ারী) বৃহস্পতিবার প্রাতে—উপাসনা। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায়—মেরীকার্পেন্টার হলে রবিবাসরিক নীতিবিদ্যালয়ের উৎসব। সন্ধ্যায়—ইংরাজীতে উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়, এম, এ।

১৪ই মাঘ (২৮শে জানুয়ারী) শুক্রবার প্রাতে—উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী। অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় বালকবালিকা সম্মিলন। সন্ধ্যায়—বক্তৃতা। বক্তা—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, বি, এ।

১৫ই মাঘ (২৯শে জানুয়ারী) শনিবার প্রাতে—উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত ভবসিন্ধু দত্ত। অপরাহ্ণে কাঙ্গালী বিদায়। সন্ধ্যায়—উপাসনা।

১৬ই মাঘ (৩০শে জানুয়ারী) রবিবার প্রাতে—উপাসনা; আচার্য্য—শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী বি, এ। সন্ধ্যায়—উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ, এম, এ।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও মফঃস্বল হইতে আগত ব্রাহ্ম অতিথিদিগের বাস ও আহারের বন্দোবস্ত করা হইবে। মহিলাদিগের জন্য শিবনাথ স্মৃতিভবন (২১০।৬ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট এবং পুরুষদিগের জন্য নূতন সিটিকলেজ (১০২ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট) বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। মফঃস্বল হইতে যাঁহারা উৎসবে যোগদান করিতে সংকল্প করিয়াছেন, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক পূর্ব্বেই উৎসবকমিটির সম্পাদককে তাঁহাদের কলিকাতা পৌঁছিবার নির্দ্দিষ্ট তারিখ জানাইলে উপযুক্ত অভ্যর্থনার বন্দোবস্ত হইতে পারে।

২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
কলিকাতা
২৭শে ডিসেম্বর ১৯২৬।

শ্রীব্রজসুন্দর রায়,
সম্পাদক, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ১৮ই ডিসেম্বর চট্‌কাবেড়ে গ্রামে বাবু হেমন্তকুমার চৌধুরী পরলোক গমন করিয়াছেন।

বিগত ২৩শে ডিসেম্বর কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত জ্যোতিপ্রকাশ সরকারের পত্নী (শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা) কমলকুমারী তিনটী শিশু সন্তান রাখিয়া দীর্ঘকাল রোগের অবসানে ৩০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন।

বিগত ২৭শে ডিসেম্বর কলিকাতা নগরীতে বাবু হেমচন্দ্র রায় ৬৯ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন।

বিগত ২৯শে ডিসেম্বর কলিকাতা নগরীতে বাবু দুর্গাচরণ গুহ পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা দীর্ঘকাল ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়াছেন।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চির শান্তিতে রাখুন ও আত্মীয় স্বজনদিগের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

শুভবিবাহ—বিগত ১৫ই ডিসেম্বর কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাসের দ্বিতীয়া কন্যা কল্যাণীয়া কমলা ও শ্রীযুক্ত মতিলাল সরকারের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান নিরঞ্জনের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র রায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে কন্যার পিতা ব্রাহ্মসমাজে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

প্রেমময় পিতা নবদম্পতিকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

দান—শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর দিন্দা তাঁহার পুত্র পরলোকগত প্রভাতকুমার দিন্দার সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে সাধারণ সমাজে ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন।

এ দান সার্থক হউক ও পরলোকগত আত্মা শান্তিলাভ করুন।

কৃতী ছাত্র—শ্রীযুক্ত প্যারীকান্ত মিত্রের পুত্র শ্রীমান্ অমিয়কান্ত মিত্র এডিন্‌বরার রয়েল ভেটেরেনারী কলেজ হইতে এম্, আর্, সি, ভি, এস্ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, জানিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম।

গিরিডি ব্রাহ্মসমাজ—বিগত ২৪শে, ২৫শে ও ২৬শে ডিসেম্বর এই তিন দিন গিরিডি ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চচত্বারিংশ বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। ২৪শে প্রাতে শ্রীযুক্ত রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্বোধন উপলক্ষে উপলক্ষে উপাসনা ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রদত্ত একটী উদ্বোধনের উপদেশ পাঠ করেন। সন্ধ্যাকালে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় "ভয় ও বিশ্বাস" বিষয়ে একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা পাঠ করিয়াছিলেন। ২৫এ ডিসেম্বর গিরিডি ব্রাহ্মসমাজের মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন। প্রাতে ডাক্তার ভি রায় উপাসনা ও মহাত্মা যীশু খৃষ্টের জন্মদিন উপলক্ষে তাঁহার প্রদত্ত উপদেশ অবলম্বনে উপদেশ দিয়াছেন। উপাসনান্তে শ্রীযুক্ত গগনচন্দ্র হোম "তিনকড়ি বসু প্রচারকাশ্রমের" ভিত্তি স্থাপন করেন। তদুপলক্ষে তিনি তিনকড়ি বাবুর সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র স্মৃতিগাথা পাঠ করিয়াছিলেন। পাঠান্তে একটী প্রার্থনা করিয়া ভিত্তি স্থাপন করেন এবং ভিত্তিস্তম্ভের মধ্যে যে পাত্রটী প্রোথিত করা হইয়াছে, তাহাতে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের কয়েকটী মুদ্রা ১৯এ ডিসেম্বরের "ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার" ও ১৬ই অগ্রহায়ণের "তত্ত্বকৌমুদী" আর নিম্নলিখিত স্মারকলিপি রক্ষিত হইয়াছে, প্রকাশ করেন।

"ওঁ তৎসৎ"

অদ্য ১৮৪৮ শকাব্দের, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের ও ৯৭ ব্রাহ্মাব্দের ১০ই পৌষ তারিখে এবং ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে শনিবার হাজারীবাগ জেলার অন্তর্গত গিরিডি ব্রাহ্মসমাজ মন্দির প্রাঙ্গণে পরম পিতা পরমেশ্বরের নামে গিরিডি ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সর্ব্বজন প্রিয় ও সকলের শ্রদ্ধেয় ৺তিনকড়ি বসু মহাশয়ের এই স্মৃতি মন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হইল।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।"

অপরাহ্ণ ৪টার সময় শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দত্ত এম্, এ প্রার্থনার পর উপনিষদের সাধনতত্ত্ব ও বৌদ্ধ সাধনতত্ত্ব বিষয়ে একটি সারগর্ভ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন। রাত্রিতে শ্রীযুক্ত ভবসিন্ধু দত্ত উপাসনা করেন ও উপদেশ দেন।

২৬এ ডিসেম্বর প্রাতে শ্রীযুক্ত মথুরানাথ গুহ উপাসনা করেন ও উপনিষদোক্ত ইন্দ্র-বিরোচন উপাখ্যান অবলম্বনে উপদেশ প্রদান করেন। অপরাহ্ণে বালকবালিকা সম্মিলন হয়। তখন শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দত্ত প্রার্থনা করেন এবং শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় উপদেশ দেন। সন্ধ্যাকালে শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র নাগ উৎসবের শেষ উপাসনা ও শান্তিবাচন করেন। বাবু ভবসিন্ধু দত্ত সংগীত ও সংকীর্ত্তন করিয়া উপাসকদের প্রাণ পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। সংপ্রতি আশ্রমের জন্য দুইটি পাকা ঘর প্রস্তুত হইবে। তাহার একটির সমগ্র ব্যয় ৭৫০৲ টাকা গগন বাবু প্রদান করিয়াছেন।

বিজ্ঞাপন

আগামী ৮ই মাঘ শনিবার (ইং ২২শে জানুয়ারী ১৯২৭) সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকার সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা-মন্দিরে সমাজের বার্ষিক সভার অধিবেশন হইবে। সভ্যদিগের উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়।

আলোচ্য বিষয়

১। ইং ১৯২৬ সালের বার্ষিক কার্য্যবিবরণী ও আয় ব্যয়ের হিসাব। ২। সভাপতির অভিভাষণ। ৩। সমাজের কর্ম্মচারিগণের নিয়োগ। ৪। অধ্যক্ষ সভার সভ্যগণের নিয়োগ। ৫। পরলোকগত স্যার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্তের স্থলে ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ের একজন ট্রষ্টী নিয়োগ। ৬। বিবিধ।

১৯২৭ সালের অধ্যক্ষ সভার সভ্য মনোনয়নের জন্য ভোটিং পত্র সমূহ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদিগের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। সভ্যদিগের মধ্যে যাঁহারা এখনও তাঁহাদের ভোটিং পত্র প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক মহাশয়ের নিকট পত্র লিখিয়া ভোটিং পত্র চাহিয়া লইবেন।

আগামী ইং ১৯২৭ সালের ৭ই জানুয়ারী সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকার সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা-মন্দিরে অধ্যক্ষ সভার চতুর্থ ত্রৈমাসিক সভার অধিবেশন হইবে। সভ্যদিগের উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়।

আলোচ্য বিষয়

১। কার্য্যনির্ব্বাহক সভার চতুর্থ ত্রৈমাসিক কার্য্যবিবরণী ও আয় ব্যয়ের হিসাব।

২। ১৯২৬ সালের বার্ষিক কার্য্যবিবরণী ও আয় ব্যয়।

৩। ভোটগণনাকারী সব কমিটি নিয়োগ।

৪। বিবিধ।

শ্রীব্রজসুন্দর রায়
সম্পাদক, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় দ্বারা ১৭ই পৌষ মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রীবরদাকান্ত বসু, বি-এ

Registered N0 65

অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৬ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৪৯ম ভাগ।
১৯শ সংখ্যা।

১লা মাঘ, শনিবার, ১৩৩৩, ১৮৪৮ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯৭
15th January, 1927.

প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০
অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

হে করুণাময় উৎসবপতি, তোমারই অসীম দয়ায় ও প্রেমে আমরা আবার উৎসব-দ্বারে আসিয়া উপস্থিত। আমরা কিরূপ আয়োজন লইয়া, কি ভাবে প্রস্তুত হইয়া, আসিয়াছি, তাহা তুমিই জান। তোমার প্রেমের আহ্বান ত আমরা বহুদিন হইতে শুনিতেছি; উৎসব সত্য ভাবে উপভোগ করিবার উপযুক্ত হওয়ার অনেক সুযোগও তোমার কৃপায় আমরা পাইয়াছি। কিন্তু আমরা যে তাহার যথোচিত ব্যবহার করিতে পারি নাই! আমাদের উদাসীনতা অবহেলা, মোহঘুমের ঘোর, যে কিছুতেই সম্পূর্ণ রূপে ভাঙ্গে না, তাহা তুমি জান। আবার, তোমার কৃপায় যদি একটু প্রস্তুত হইতে পারি, তবে অহঙ্কার আসিয়া, আপনার চেষ্টা ও বলের উপর নির্ভর আসিয়া, যে সমস্ত পণ্ড করিয়া দেয়, তাহাও তোমার অজ্ঞাত নাই। দীন হীন কাঙ্গালের বেশে না আসিলে যে তোমার গৃহে প্রবেশ করা যায় না, সাধন ভজনের অহঙ্কারে উন্নতমস্তক হইয়া উপস্থিত হইলে যে দ্বার হইতেই প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়, তাহা ত আমরা ভাল রূপেই জানি। বহু বার জীবনে তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। তবু কেন যে আমরা মিথ্যা অহঙ্কারের বশীভূত হই, জানি না। আমরা সত্যই যে নিতান্ত দীন হীন, আমাদের শক্তি সামর্থ্য যে কিছুই নাই, সে বিষয়ে ত কোনই সন্দেহ নাই। তোমার করুণা ভিন্ন আর কোনও উপায়েই যে আমরা তোমার গৃহে প্রবেশ করিতে পারি না, তাহা ত বহু বার জীবনে দেখিয়াছি। তবুও কেন যে আমাদের মোহান্ধকার বিদূরিত হয় না, জানি না। হে হৃদয়বিহারী দেবতা, তুমি হৃদয়ে থাকিয়া আমাদিগকে তোমার উপযুক্ত করিয়া না লইলে যে আর অন্য কোনও উপায় নাই। তুমি কৃপা করিয়া আমাদের সকল মোহ কলুষ দূর করিয়া দেও, আমাদিগকে তোমার গৃহে লইয়া চল। আমাদের জন্য যাহা কল্যাণকর তুমি তাহার ব্যবস্থা কর। আমাদিগকে তোমার গৃহের এক কোণে রাখিয়া দেও,—আনন্দ শান্তি না দিতে হয়, দুঃখ বেদনা লাঞ্ছনাই দেও এবং যাহাতে তোমার প্রেমের ব্যবস্থা আমরা কৃতজ্ঞ চিত্তে গ্রহণ করিতে পারি তাহাতে আমাদিগকে সমর্থ কর। আমাদের জীবনে ও সমাজে তোমার ইচ্ছাই জয়যুক্ত হউক। আমরা সকলে সত্য ভাবে উৎসব সম্ভোগ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হই। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

নিবেদন।

ইচ্ছার সংযম—তোমার যাহা ইচ্ছা, কতদিন ধ'রে যা করবে ব'লে কামনা ক'রে এসেছ, তাহাও কর্ত্তব্যের অনুরোধে, প্রভুর নির্দ্দেশে সংযত করতে হয়। যে কাজ করতে ইচ্ছা করেছ, যার জন্য কত নির্য্যাতনও সহ্য করেছ, যা দেশের ও দশের কল্যাণ ব'লে জান, সেই ইচ্ছাও কর্ত্তব্যের খাতিরে পরিত্যাগ করতে হয়। প্রাণে বেদনা পাবে, দশজনে নানা কথা বলবে, কিন্তু তোমার উপায় নাই। তুমি প্রভুর চরণে হৃদয় পেতে দিবে, তুমি বলবে, 'প্রভু, বলে দাও, আমাকে কি করতে হবে। আমি যে মহা সমস্যায় পড়েছি। তুমিই ত এ পথে এনেছ; আমি কত আশা ও আকাঙ্ক্ষা ল'য়ে, কত কল্যাণ ভাব নিয়ে এ পথে এসেছি! এখন এই মুহূর্ত্তে তুমি যদি বল, ফিরে যাও, ফিরে যেতে হবে। অন্য সব সহযাত্রীরা চ'লে যাবে, আনন্দধ্বনি করতে করতে চ'লে যাবে; আমাকে হয় ত কত কথাও শুনাবে, আমার উত্তর দিবারও শক্তি থাকবে না। তবুও হে নাথ, তুমি যদি বল, এখন এত দূর এসেছ, তবুও ফিরে যাও, আমাকে ফিরে যেতেই হবে।' ইহাই জীবনের পথ। তবে এস, আমরা

তাঁরই আদেশ ধ'রে চলি। সকল ইচ্ছা, সকল কামনা, সকল কল্যাণকামনা, সেবার আকাঙ্ক্ষা, তাঁরই নির্দ্দেশে ও ইঙ্গিতে নিয়মিত করি। সম্পূর্ণ রূপে তাঁর হাতে প্রাণ মন ছেড়ে দেই।

দোটানা ভাব—অনেক নদী আছে, যার ভিতরে দুই দিক দিয়াই জোয়ার আসে; আবার ভাঁটার সময় দুই দিক দিয়াই জল টানে। সেই সব নদী শীঘ্রই ম'রে যায়; জোয়ারে যে মাটি নিয়ে আসে, তা তলায় পড়ে; অবিলম্বে নদী ভরাট হ'য়ে যায়, ক্রমে জল শুকিয়ে যায়, আর চলাচলের সুবিধা থাকে না। এই সব মৃত নদীর দ্বারা দেশের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, ব্যারাম পীড়ার সৃষ্টি হয়। অনেকের দোটানা ভাব আছে। তাঁরা ঈশ্বরকেও চা'ন, সংসারের সুখ সুবিধাও চা'ন। এক সময়ে ঈশ্বরের নামে মেতে উঠ্‌লেন—তাঁদের চাল চলন, কথা বার্ত্তা, ভাবগতিক দেখে মনে হ'তে লাগ্‌ল, এরা আপনাদিগকে ত ঈশ্বরচরণেই সম্পূর্ণ রূপে সমর্পণ কর্‌লেন। যেখানে ঈশ্বরের নাম, যেখানে ধর্ম্ম প্রসঙ্গ, যেখানে সেবার কার্য্য, সেখানেই তাঁরা উপস্থিত। কিন্তু কিছু দিন পরে দেখা গেল, তাঁরা ক্রমে ক্রমে দূরে স'রে পড়েছেন; স্বার্থে আঘাত লেগেছে, মান প্রতিপত্তি হ্রাস হয়েছে, অর্থ হানি হয়েছে। ঈশ্বর যখন চড় চড় ক'রে সব টেনে ধরেছেন, তখন ভয় এসেছে; তাঁরা তখন ভাব্‌লেন, বন্ধু বান্ধবগণও বল্‌তে লাগ্‌ল, অতটা ভাল নয়। আর দশ জনও ত আছেন, তাঁরাত তোমার মত বাড়া বাড়ি করেন্‌ না। এই পাটোয়ারি বুদ্ধি জন্মিল। তাঁরা যে ধর্ম্ম পরিত্যাগ কর্‌লেন, তা নয়; কিন্তু আত্মসমর্পণের ভাব আর রইল না; এই দোটানাতে পড়ে জীবনে পলি পড়তে লাগ্‌ল; জীবনের স্রোত বন্ধ হ'তে লাগ্‌ল। আর অনুপ্রাণনা জাগে না, সরসতা আসে না। জীবন-নদী শুকিয়ে গেল; যাঁরা তাঁদের দিকে তাকিয়ে ছিল, তাদের প্রাণেও নিরাশা এল; কল্যাণের স্রোত বন্ধ হলো। দোটানা ভাব ত্যাগ কর; এক দিকের স্রোতে, ঈশ্বরের প্রেমের স্রোতে জীবন ছেড়ে দাও। তাতেই কল্যাণ ও শান্তি।

আমার প্রতিও স্নেহ!—অনেক সময় মনে হয়, আমি ত ক্ষুদ্র, আমি ত মলিন; আর তিনি বিরাট পুরুষ, অনন্ত দেব, রাজাধিরাজ, পুণ্যময়। তিনি কি আমার খবর রাখেন? বিশ্ব-চরাচর তাঁর ইঙ্গিতে চল্‌ছে; আমাকে কি তিনি জানেন? আমার সুখ দুঃখের খবর কি তাঁর কাছে পৌছায়? আমি কোথায়, কোন্ গৃহ-কোণে ব'সে ক্রন্দন করি, তা কি তিনি দেখেন? আমার কাতর প্রার্থনা কি তিনি শোনেন? তাই অনেক সময় সংশয় আসে, নিরাশা আসে। কিন্তু আমরা পৃথিবীর রাজার সঙ্গে তাঁর তুলনা ক'রেই ত এইরূপ ভ্রমে পড়ি। তিনি যে বিশ্বচক্ষু; তিনি যে সবই দেখেন; তিনি যে সবই জানেন। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীটও যে তাঁর জানার মধ্যে। তিনি যে আমাকে কেবল জানেন, তা নয়, তিনি যে আমাকে ভাল বাসেন, প্রত্যেককে ভালবাসেন, আমার যতটুকু আমি না জানি, তাহাও তিনি জানেন। তিনি নিয়ত আমার সঙ্গে আছেন; আমার এক ফোঁটা চোখের জল, একটা দীর্ঘশ্বাস, তাঁহাও তিনি জানেন। আমার বেদনা তাঁর প্রাণ স্পর্শ করে। তিনি আমারই কল্যাণ চিন্তা করেন। আমার সুখ দুঃখের ভিতরেই তাঁর প্রেমের লীলা। তিনি কল্যাণের পথে নিয়ে চলেছেন। আমরা অন্ধ, তাই তাঁর লীলা, প্রেমের লীলা দেখ্‌তে পাই না। তিনি নিয়ত আমার সঙ্গে রয়েছেন, প্রাণের প্রাণ হ'য়ে আছেন। তবে আর ভয় কি? তাঁর স্নেহ-ক্রোড়ে রয়েছি, তাঁর প্রেম পেতেছি; আমি তাঁরই প্রিয়।

সম্পাদকীয়

উৎসব-দ্বারে—প্রেমময় উৎসব-দেবতার কৃপায় আমরা উৎসব-দ্বারে উপস্থিত। বহুদিন হইতে আমরা উৎসবের আহ্বান শুনিয়া আসিতেছি, তাহার জন্য প্রস্তুত হইতেও কিছু চেষ্টা যত্ন করিয়াছি যতটা করা উচিত ছিল, কেহ যে ততটা করিতে পারিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু যে যত আয়োজনই করি না কেন, সর্ব্বোপরি স্মরণে রাখিতে হইবে যে, যদি আমরা সে সকল আয়োজনের উপরই নির্ভর রাখি, তাহার বলেই আমরা উৎসব-গৃহে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইব মনে করি, তবে নিশ্চয়ই আমাদিগকে দ্বার হইতে ব্যর্থমনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে। আমরা গত সংখ্যায় কয়েকটী আয়োজনের উল্লেখ করিয়াছিলাম—বিশেষ আত্মচিন্তা ও আত্মপরীক্ষার দ্বারা সত্য অভাববোধ, আকুল আকাঙ্ক্ষা ও ব্যাকুল প্রার্থনা প্রাণে জাগান, নিজ জীবনে ও জগতে প্রেমময় মঙ্গলবিধাতার জীবন্ত লীলা দর্শন করিয়া করুণাময়ের করুণাতে আশা বিশ্বাস ও নির্ভর স্থাপন, তাঁহার করুণাধারা গ্রহণ করিবার জন্য সতত সজাগ, নিয়ত উন্মুখীন, অবিশ্রান্ত প্রার্থনাশীল, চিরপ্রস্তুত থাকা, ব্যক্তিগত অভিরুচি ও মোহপ্রসূত ভ্রান্তধারণা হইতে মুক্ত হইয়া প্রেয়ের পরিবর্ত্তে শ্রেয়কে সমাদর করা, সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া জীবন যাহাতে অপ্রতিহত গতিতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে, তাহার জন্য অভ্যাসের শৃঙ্খলকে শিথিল করিবার জন্য চেষ্টান্বিত হওয়া। এ সকল আয়োজন যে নিতান্ত আবশ্যক, ইহা ব্যতীত যে উৎসবসম্ভোগ সম্ভবপর নয়, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া এ সকল আয়োজন হইলেই যে যথেষ্ট হইল, অমনি আমরা আপনা হইতে উৎসব-গৃহে প্রবেশ করিতে পারিব, কোনও ক্রমেই এরূপ বলা যায় না। কেননা, তাহা আমাদের কোনও কার্য্যের বা অবস্থার উপর নির্ভর করে না, তাহা সম্পূর্ণরূপেই উৎসব-দেবতার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তাঁহার করুণা ও ইচ্ছা বাহিরের কোনও অবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, তিনি বাহিরের কিছুর অধীন নহেন, অপর কিছুর তাঁহার উপর কোনও ক্ষমতা নাই। বিশেষতঃ এই সকল অবস্থার কতটা হইলে যে যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইবে, কি হইলে যে ঠিক উপযোগী অবস্থা হইবে, তাহা কেহ বলিতে পারে না। সে বিষয়ের ভার সম্পূর্ণরূপে তাঁহার পূর্ণ জ্ঞানের উপর। কোন্ সূক্ষ্ম আবরণ যে আমাদিগকে তাঁহার প্রকাশ হইতে দূরে রাখিতে

পারে, তাহা কেহ জানে না। সুতরাং কোন্ অবস্থায় বা আয়োজনে যে আমরা নিশ্চয়ই তাঁহার সাক্ষাৎকার পাইয়া কৃতার্থ হইতে পারিব, তাহা কেহ বলিতে পারে না, তাহার কোন নির্দ্ধারিত নিয়ম নাই। কিন্তু কোন্ অবস্থায় তাহা হইতে পারে না, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায়, সে পথের বাধাগুলি সহজেই বুঝিতে পারা যায়—তাহার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম আছে। সুতরাং আমাদিগকে সে সকল বিষয়ে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে। তাহা না করিলে আমাদের আর সকল আয়োজনই ব্যর্থ হইবে।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, সে সকল বাধার মধ্যে আমাদের আয়োজন চেষ্টার উপর নির্ভর, আকুলতা ব্যাকুলতা ও সাধন ভজনের অহঙ্কার সর্ব্বপ্রধান। সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের সকল শ্রেণীর লোকের অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য এই যে, অহঙ্কারীর সে রাজ্যে প্রবেশাধিকার নাই, দীন হীন অকিঞ্চন না হইলে সেখানে প্রবেশ করা যায় না। তৎসঙ্গে ইহাও স্মরণে রাখিতে হইবে যে, দীনতার মধ্যেও অহঙ্কার থাকিতে পারে; আপনার দীনতার উপর যদি নির্ভর থাকে, দীনতার বলে সে রাজ্যে নিশ্চয়ই প্রবেশ করিতে সমর্থ হইব, এরূপ ধারণা জন্মিলে, নিজেকে যথেষ্ট দীন হীন মনে করিলে, প্রকৃতপক্ষে অন্তরের অন্তরে দীনতার অহঙ্কার আছে বুঝিতে হইবে। তাহা যে প্রকৃত দীনতা নহে, ইহাতে আশা ও নির্ভর যে যথার্থতঃ নিজেরই উপর, জীবন-দেবতার উপর নহে, তাহা আর অধিক করিয়া বলিতে হইবে না। অনন্য-গতি ও অনন্যশরণ না হইলে,—আপনার কোনই যোগ্যতাই নাই, আর কিছুতেই কিছু হইবে না, একমাত্র তাঁহার করুণাই ভরসা, অন্তরের অন্তরে ইহা পরিষ্কাররূপে অনুভব না করিলে,—কোনও প্রকারেই চলিবে না। আরও সূক্ষ্ম ভাবে অহঙ্কার হৃদয় মধ্যে লুক্কায়িত থাকিতে পারে। আপনার কোনও যোগ্যতার উপর নির্ভর না রাখিয়া, তাঁহার করুণার উপর সম্পূর্ণ আশা স্থাপন করিয়াও, তাঁহার বিশেষ করুণা লাভের একটা দাবী, সে রাজ্যে প্রবেশ করিবার একটা অধিকার, হৃদয় মধ্যে পোষণ করা সম্ভবপর। আমরা যাহা পাইতে ইচ্ছা করি, যাহা লাভ করা বাঞ্ছনীয় মনে করি, তাঁহার কৃপায় তাহাই পাইব, তাহা যদি না পাই তবে তাঁহার কৃপা হইতেই বঞ্চিত হইলাম, এরূপ ভাব মনের মধ্যে থাকিতে পারে। সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ দ্বারা এই ভাবের মূল পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, ইহার মধ্যে অহঙ্কার লুক্কায়িত আছে—আমি ইহা পাইবার উপযুক্ত, তিনি যদি অপর কিছু ব্যবস্থা করেন, তবে তাঁহার কৃপার অভাবই সূচিত হইল, এই প্রকার একটা ভাব আছে। অর্থাৎ তিনি যাহা ব্যবস্থা করেন তাহাই ভাল, তিনিই তাঁহার পূর্ণজ্ঞানে জানেন আমার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা কল্যাণকর কি, এবং তিনি নিশ্চয়ই তাহার ব্যবস্থা করিবেন, তিনি তাঁহার অসীম প্রেমে অন্য কোনও প্রকার ব্যবস্থা করিতে পারেন না, তাঁহাতে এই প্রকার নির্ভর ও আস্থা নাই—আপনার বুদ্ধি বিচারের উপরই অধিকতর বিশ্বাস আছে,—দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা যে প্রকৃত দীনতার অবস্থা নহে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। প্রকৃত দীনতা যাহার মধ্যে আসিয়াছে, সে আপনাকে অযোগ্যই মনে করিবে, গৃহের এক কোণে যদি সকলের নীচে তাহাকে ফেলিয়া রাখা হয়, তাহাতেই কৃতার্থ বোধ করিবে; আর যদি বাহিরে দূরে রাখা হয়, তাহা হইলেও কোনও অভি-যোগ না করিয়া, অবনতমস্তকে তাহা গ্রহণ করিবে, তাহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গলকর ও উপযুক্ত ব্যবস্থা বলিয়া গ্রহণ করিবে। তিনি যাহা করেন তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল, এই বিশ্বাস, প্রকৃত বিশ্বাসীর হৃদয়ে সর্ব্বদাই উজ্জ্বল ভাবে বর্ত্তমান থাকে—এ বিশ্বাস যাহার নাই, তাহাকে কিছুতেই প্রকৃত বিশ্বাসী ও নির্ভরশীল বলা যায় না।

তাহার পর, আনন্দ শান্তি আরামই, অথবা তাঁহার সাক্ষাৎকারই, সকল সময়ে তাঁহার কৃপার শ্রেষ্ঠ পরিচয়, দুঃখ বেদনার তাপ, অথবা বিরহ, মোটেই তাঁহার কৃপার দান নহে, বরং তাঁহার কৃপার অভাবেরই পরিচায়ক, জীবনের অভিজ্ঞতা কখনও এরূপ কথা বলে না। একটু অনুসন্ধান করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে, উহার বিপরীত কথাও অনেক সময় সত্য। দুঃখ বেদনা, বিরহ বিচ্ছেদ অনেক সময় জীবনের অধিকতর কল্যাণ সাধন করে—তাহা আমাদিগকে যতটা উন্নতির পথে অগ্রসর করে, অপর কিছু ততটা করিতে পারে না। সুতরাং বিরহও অনেক সময় তাঁহার করুণারই দান। আমাদের উদাসীনতা অবহেলা দ্বারা আমরা যে বিচ্ছেদ আনয়ন করি, আমরা তাঁহা হইতে বঞ্চিত হইয়াও যে কোনও দুঃখ বেদনা বা অভাববোধ অনুভব করি না, তাহা নিশ্চয়ই অনিষ্টকর—উহা মৃত্যুরই পূর্ব্ব লক্ষণ। কিন্তু যে বিরহ আমাদের ব্যাকুলতাকে বর্দ্ধিত করে, আমাদের অযোগ্যতার দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া আমাদিগের দীনতা বাড়াইয়া দেয়, তাঁহার শরণাপন্ন হইতে বাধ্য করে, সকল প্রকার অহঙ্কার ও আত্মনির্ভরকে চূর্ণ করিয়া দেয়, তাহা কোনও প্রকারেই অনিষ্টকর হইতে পারে না। আমরা উন্নতি কল্যাণের পরিবর্ত্তে আনন্দ ও আরামের দ্বারা বিচার করিতে যাইয়াই, এরূপ ভ্রান্তিতে পতিত হই। তাঁহার প্রকাশে আনন্দ শান্তি যথেষ্ট আসে বটে, কিন্তু সকল সময়ে নয়,—অনেক সময় দুঃখ বেদনাও আসে। এই কথা স্মরণে না থাকাতেই আমাদের লক্ষ্য সম্বন্ধে আমরা ভ্রমে পতিত হই। অথচ লক্ষ্য স্থির না থাকিলে আমরা কিছুতেই প্রকৃত উপকার লাভ করিতে পারি না,—আমরা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া বিপথে চালিত হইবই।

আনন্দ আরামটা যে প্রধান লক্ষ্য নহে, প্রকৃত কল্যাণকেই যে সর্ব্বাগ্রে লক্ষ্য স্থানে রাখিতে হইবে, এই কথা স্মরণে না থাকাতেই অনেক সময় আমরা উৎসব হইতে সত্য উপকার লাভ করিতে পারি না। কেন না, আমরা যাহা খুঁজিয়া বেড়াই, তাহা পাইবার জন্যই ব্যস্ত হই, অপর কিছু নিকটে পাইলেও তাহা গ্রহণ করিবার আগ্রহ জন্মে না, তাহা মূল্যবান জ্ঞান হয় না, এবং অবহেলার সহিত তাহা পরিত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত হই না। কল্যাণকে লক্ষ্য স্থানে রাখিতে গেলেও আবার দেখিতে হইবে, প্রকৃত কল্যাণ, স্থায়ী কল্যাণ কোথায়। জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত না হইলে, বিধাতানির্দ্দিষ্ট উন্নতির পথে জীবনের গতি ধাবিত না হইলে, অথবা এক কথায় জীবনে জীবনবিধাতার ইচ্ছানুবর্ত্তিতা ও বাধ্যতা না আসিলে, কিছুতেই

উন্নতি বা কল্যাণ নাই। সুতরাং ইহাকেই যদি প্রধান লক্ষ্য স্থানে না রাখা হয়, তবে সবই বৃথা। আর ইহাকে লক্ষ্যস্থানে রাখিলে কোন বাধাই উন্নতির পথ রুদ্ধ করিতে পারে না, অহঙ্কার অবিশ্বাসও হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে না, ক্ষুদ্রতা মলিনতাও স্পর্শ করিতে পারে না—জীবন শুদ্ধ সুন্দর না হইয়া পারে না। জীবন যদি শুদ্ধ সুন্দরই না হইল, তবে উৎসবের কোনও সার্থকতাই রহিল না। শুদ্ধ সুন্দর না হইয়া পবিত্রস্বরূপের গৃহে কিছুতেই প্রবেশ করা যায় না। কাজেই এই শুদ্ধতার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বলা বাহুল্য যে শুদ্ধতা, বলিতে সকল বিষয়ে শুদ্ধতাই বুঝায়। যেমন ইচ্ছা বিশুদ্ধ হইবে, তেমনি হৃদয়ের প্রেমও বিশুদ্ধ হইবে।

অপ্রেম বিদ্বেষ বিরোধ লইয়া সে রাজ্যে প্রবেশ করা যায় না। এই জন্যই যিশু বলিয়াছিলেন, পূজার ডালি দ্বারে রাখিয়া আগে যাইয়া বিরোধ মিটাইতে হইবে, অপ্রেম দূর করিয়া মিলন ঘটাইতে হইবে; তাহা না হইলে পূজার অধিকার জন্মিবে না। তাই ভক্ত আচার্য্য গাহিয়াছেন "প্রেমের অনলে নিজে না দহিলে, সে দ্বারে পশিতে পাবে না।" বাস্তবিক প্রেম ভিন্ন নীচতা ক্ষুদ্রতা ভস্মীভূত হইয়া প্রকৃত শুদ্ধতা সাধিত হইতে পারে না। যে আপনাকে লইয়া আপনার মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে চায়, সে তাঁহা হইতে বঞ্চিতই হয়। তিনি সকলকে লইয়াই আছেন, অপর সকলকে পরিত্যাগ করিয়া শুধু তাঁহাকে পাওয়া যায় না। আপনাকে যতই অপরের মধ্যে হারাইয়া ফেলা যায়, ততই তাঁহাকে পাওয়া যায়। যে যে পরিমাণে অপরের দুঃখ বেদনার অংশী হয়, সে সেই পরিমাণে প্রেমস্বরূপকে হৃদয়ে প্রাপ্ত হয়। প্রেম হৃদয়কে উন্মুক্ত ও প্রশস্ত করিয়া, সকল দ্বার খুলিয়া দিয়া, যেমন একদিকে সকলের সঙ্গে একপ্রাণতা ঘটায়, তেমনি অপর দিকে তাঁহাকেও পূর্ণতররূপে গ্রহণ করিতে সমর্থ করে। প্রেমে যেমন আত্মবিলোপ ঘটায়, অপর কিছুতেই তাহা সম্ভবপর হয় না। বাস্তবিকই প্রেম অনলের ন্যায় সকল ভস্মীভূত করিয়া ফেলে,—আপনার কর্তৃত্ব ও ব্যক্তিত্ব, বা বিশেষ আকাঙ্ক্ষা অভিরুচি কিছুই থাকে না। তখনই পূর্ণ আত্মসমর্পণ আসে এবং এই অবস্থায়ই প্রেমময় পিতা হইতে সম্পূর্ণ নূতন জীবন পাইয়া নূতন ভাবে গড়িয়া উঠা সম্ভবপর হয়। এই ভাবে আমরা যখন নব জীবন প্রাপ্ত হইয়া, নব ভাবে গঠিত হইয়া, নূতন উৎসাহ ও বল প্রাপ্ত হইয়া, জীবনপথে চলিতে সমর্থ হই, তখনই উৎসব সফল হইয়াছে, মনে করা যায়। দুই একটা বিশেষ দান পাইলেই যথেষ্ট হইল না, তাহা লইয়া তৃপ্ত থাকিলে প্রকৃত জীবন লব্ধ হইল না, জীবনের গতি রুদ্ধই হইল। আর, সে দান বাছিয়া লইতে গেলে আমাদের অজ্ঞতা বশতঃ যে আমরা ভ্রমে পতিত হইব এবং তাহাতে যে তাঁহার উপর বিশ্বাস ও নির্ভরের অভাবই সূচিত হয়, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং তিনি কি ভাবে আমাদিগকে উৎসব সম্ভোগ করাইবেন—আমাদিগকে ভিতরে ডাকিয়া নিবেন কি বাহিরে এক কোণে ফেলিয়া রাখিবেন, আনন্দ শান্তি দিবেন, কি দুঃখ বেদনা দিবেন, তাহাও যে আমাদের ভাবিবার বিষয় নহে, সে কথাও পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

দীনহীন কাঙ্গালের বেশে এক পাশে বসিয়া থাকিতে ত হইবেই, কিন্তু তাহাই যথেষ্ট নহে। নিজের বাঞ্ছিত কোনও প্রার্থনা লইয়া প্রতীক্ষা করিলেও চলিবে না,—সর্ব্ব বিষয়ে একমাত্র তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক, এই প্রার্থনা লইয়াই আশা ও ধৈর্য্যের সহিত প্রতীক্ষা করিতে হইবে। প্রাণের এরূপ অবস্থা যে সহজেই জন্মে তাহা নহে, আমরা ইচ্ছা করিলেই যে এই অবস্থা পাইতে পারি, সে কথা বলা যায় না। মুখে বলা, কি চিন্তাবলে কল্পনা করা, সহজ হইতে পারে, প্রাণে উক্ত প্রকার সরল সত্য অবস্থা পাওয়া খুব কঠিন। কিন্তু কঠিন হইলে কি হইবে? উহা না হইলেও চলিবে না। সে অবস্থা পাইবার জন্য আমাদিগকে আকাঙ্ক্ষিত ও চেষ্টিত হইতেই হইবে। তবে এবিষয়েও আমাদিগের নিজের চেষ্টা যত্নের উপর আশা ও নির্ভর রাখিলে, আমরা সফল হইতে পারিব না—করুণাময় পিতার করুণার উপরই সে ভার অর্পণ করিতে হইবে। তিনি ভিন্ন আর কেহ আমাদিগকে সে ভাবে প্রস্তুত করিতে পারিবে না, আর তিনিও আমাদিগকে সেই ভাবেই প্রস্তুত করিতে চাহেন, ইহা নিশ্চয় জানিয়া আশার সহিত তাঁহারই শরণাপন্ন হইতে হইবে। আমরা যাহাতে সত্য ভাবে উৎসব সম্ভোগ করিতে পারি, প্রকৃত কল্যাণ ও জীবন লাভ করিতে পারি, তাহাই তিনি ইচ্ছা করেন, সেই ভাবে আমাদিগকে গড়িয়া তুলিতেই তিনি সতত নিযুক্ত রহিয়াছেন। সুতরাং আমাদের নিরাশার কোনও কারণ নাই। আমরা যদি ইচ্ছা করিয়া তাঁহার অনুগত হই, তাঁহার উপর সকল ভার অর্পণ করি, আমাদের সকল ইচ্ছা অভিরুচি পরিত্যাগ করি, তবে সহজ ভাবে তাঁহার ইচ্ছা আমাদিগের মধ্যে জয়যুক্ত হইতে পারে, আমরা বিনা বাধায় তাঁহার পথে চলিতে পারি। আর, যদি তাহা না করি, তাহা হইলেও আমাদের সকল বিরোধিতা ও বাধা বিঘ্ন চূর্ণ করিয়া, তিনি তাঁহার ইচ্ছাকে জয়যুক্ত করিবেনই—এক দিন না একদিন আমাদিগকে তাঁহার পথে চালিত করিবেনই। তবে সে অবস্থায় সে কার্য্য তত সহজে হইবে না, অনেক ধাক্কা খাইয়া, দুঃখ বেদনা পাইয়া, লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াই, আমাদিগকে পথ চলিতে হইবে। সুতরাং এরূপ অবস্থায় যদি আমরা আনন্দ শান্তির পরিবর্ত্তে দুঃখ বেদনাই পাই, ভিতরে প্রবেশ করিবার,—তাঁহার দর্শন পাইবার—অধিকার হইতে বঞ্চিতই হই, তিনি আমাদিগকে দূরেই রাখিয়া দেন, তথাপি তাহা যে তাঁহারই মঙ্গল ব্যবস্থারই অন্তর্গত, করুণারই দান, আমাদিগকে জীবনপথে অগ্রসর করিবার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়, সে কথা স্মরণে রাখিয়া আমাদিগকে প্রশান্ত চিত্তে, কৃতজ্ঞ হৃদয়ে, উহাকেই বরণ করিয়া লইতে হইবে। এরূপ পূর্ণ নির্ভর ও আত্ম সমর্পণ লইয়াই দ্বারে প্রতীক্ষা করিতে হইবে। তাহা হইলে উৎসবে আমরা যাহাই পাই না কেন, তাহাতেই উহা আমাদের জীবনে পূর্ণ সার্থকতা লাভ করিবে, কিছুতেই আর উহা ব্যর্থ হইবে না। আমরা সকলে যেন এই ভাবেই উৎসবদ্বারে উপস্থিত হই। আমরা যেন কেহ আপনার ইচ্ছা অভিরুচির দ্বারা চালিত হইয়া, তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছার বিরোধিতা না করি, উৎসবের পূর্ণ সাফল্য বিষয়ে কোনও বাধা উপস্থিত না করি। তিনি কৃপা করিয়া আমাদিগকে

সে বুদ্ধি ও সঙ্কল্প প্রদান করুন। আমরা তাঁহাতে পূর্ণ আশা নির্ভর স্থাপন করিয়া, দীন হীন কাঙ্গালের বেশে, তাঁহার দ্বারে উপস্থিত হই। তিনি যাহাকে যেরূপ ভাবে উৎসব সম্ভোগ করিতে দেন আমরা প্রত্যেকেই যেন তাহা কৃতজ্ঞ চিত্তে বরণ করিয়া লইতে পারি। তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছাই সকল বিষয়ে পূর্ণরূপে জয়যুক্ত হউক। তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

নীরব সাধকের নিভৃত চিন্তা ও প্রার্থনা।

(১)

হে প্রভো করুণাময়, "তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক" এ প্রার্থনা ত হামেসাই হইয়া থাকে। কিন্তু তোমার ইচ্ছা যে আমার জন্য কি রূপ, আমার জন্য যে তুমি কি ভাল জান, সে দিকে ত মন দিই না। কিন্তু যখন তোমার ইচ্ছা আমার অভিপ্রায়ের বিপরীত ভাবে ব্যক্ত হয়, আমার জন্য এমন ব্যবস্থা হয় যে তাহা আমার ভাল লাগে না, তখন ত খুবই সমস্যা কঠিন হইয়া পড়ে। হে প্রভো, যদি তুমি আমার জন্য এমন ইচ্ছাই কর যে আমাকে একেবারে অন্নবস্ত্রহীন করিয়া পথের কাঙ্গাল হইয়া পড়িতে হয়, আমি কি তাহা মানিয়া লইতে পারিব? যদি তাহাই তোমার ব্যবস্থা হয়, তবে তাহাকে মানিয়া লইতে, সহিয়া লইতেই, যেন সামর্থ্য হয়, এবং প্রফুল্লমনেই যেন তোমার বিধি মানিয়া লইতে পারি, এই আশীর্ব্বাদ কর। তোমার ব্যবস্থার উপরে সমালোচনা করিতে যেন আর বুদ্ধি না হয়।

(২)

প্রভো, সংগীতে আছে "বাছিয়া লইব না তোমার দান, তুমি যাহা দেও তাই ভাল"। আমার বুদ্ধি জ্ঞান কি এত বেশী যে আমি তোমা অপেক্ষা আমার ভালমন্দ বুঝিতে পারি? আমি কি বা জানি কি বা বুঝি! আপনার জন্য যাহা আবশ্যক তাহা যখন তোমা হইতে আসে, তখন কেন যে আবার বুদ্ধি খাটাইয়া, সাধুগণের উক্তি খুঁজিয়া বাছিয়া বাছিয়া, সাধুগণের সম্পদ্-সকল চাহিতে যাই। শুভ বুদ্ধিদাতা, শুভবুদ্ধি দেও, তোমার দানকেই বড় করিয়া যেন জানি ও মানি। তাহা লইয়াই যেন সন্তুষ্ট থাকি। আমার বুদ্ধি ও বিচারকে তুমি ধিক্কার দেও।

(৩)

পাঁচ জনকে লইয়া যখন তোমার উপাসনায় প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তখন প্রায়শঃ দেখা যায় নিজের আধ্যাত্মিক জ্ঞান এবং পাণ্ডিত্যাদি প্রদর্শনের একটা প্রবৃত্তি বাহির হইয়া পড়ে। যেখানে কেবলই সরলতা, দীনতা, আকিঞ্চনাদি থাকা আবশ্যক, যে স্থলে কেবলই শিশুর মত আকুল সরল ভাব থাকা আবশ্যক, সেখানে যখন এরূপ পাণ্ডিত্যাদি প্রদর্শনের ভাব প্রকাশ পায়, তখন তাহা যে শুধু অশোভন হয় তাহা নহে, তাহা তোমার উপাসনার বিশেষ ক্ষতিরও কারণ হয় এজন্য তুমি আমাদিগকে সাবধান কর।

(৪)

হে পিতা, বালকত্ব আমাদের খুবই আছে। বালকেরা যেমন মায়ের সহিত বিবাদ করিয়া জেদ পূর্ব্বক মন্দ হইতে চাহে, যেন মন্দ হইলেই মা জব্দ হইবেন। আমরাও যেন অনেক সময় তেমন করি। কিন্তু বালকের সে সরলতা আমার কই? সে যে সহজে ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হইয়া মায়েরই শরণ লয়, তার সে জেদ, মন্দ হইবার সংকল্প ত তার আর থাকে না! আমার তাহা হয় কই? সে সরলতা আমাকে দেও, যাহাতে তোমার কাছে যাইতে আর মান অভিমান থাকবে না। সহজে দৌড়িয়া গিয়া তোমার ক্রোড়েই আশ্রয় করিব। তোমার আদর স্নেহ পাইয়াই কৃতার্থ হইব। সেই শিশুর ভাব আমাকে দেও, যাহা পাইলে তোমার সহিত সহজে মিলিত হইতে পারা যায়।

(৫)

হে পিতা, যেরূপে এবং যাহা তোমার কাছে চাহিতে হয়, সেরূপে এবং তাহা ত এখনও চাহিতে শিখিলাম না। যেরূপ আকুলতার সহিত চাহিলে, যেরূপ আগ্রহ ও জেদের সহিত চাহিলে, পাওয়া যায়, তাহা ত হইল না। তাই বুঝি পাই না। যদি পাইতাম, তবে আর দুঃখ দুর্গতি থাকিতেছে কেন? দেও শিখাইয়া যেরূপে চাহিতে হইবে। লোকে শারীরিক অভাব দূরের জন্য কত সময় একেবারে "হত্যা" দিয়া পড়িয়া থাকে। না পাইলে উঠে না। সেরূপ সহিষ্ণুতার সহিত পড়িয়া থাকিতে শক্তি ও সহিষ্ণুতা দেও। এখন যে পড়িয়া থাকিতে পারিতেছি না। আকাঙ্ক্ষাও তেমন নাই। সহিষ্ণুতা তেমন নাই। তবে কি উপায় হইবে? প্রভো, এইবার যেন এ দেহ থাকিতে থাকিতে, এদেশ হইতে যাত্রা করিবার পুর্ব্বেই, তোমার হইতে পারি। তোমার হইলাম, তোমা কর্ত্তৃক গৃহীত হইলাম, ইহা জানিয়াই যেন আশ্বস্ত হইয়া যাইতে পারি। তুমি আশীর্ব্বাদ কর, এরূপ শুভ সুযোগ পাইয়া সান্ত্বনা লাভ করি।

(৬)

হে প্রভু করুণাময়, তোমার প্রিয়কার্য্য করি, এমন সম্ভাবনা আর দেখি না। শরীর মন সবই বিকল হইয়া পড়িতেছে। যাহা থাকিলে তোমার কার্য্য করিবার সুযোগ হয়, তাহা ত নাই বলিলেই হয়। তবে এখন কেমনে তোমার কার্য্য করিব? অথচ আছি যখন কিছু করাও আবশ্যক। প্রভু তবে দেও অন্তরশুদ্ধি। শুদ্ধ প্রীতি দেও। তাহার প্রভাবে দৃষ্টিশক্তি জ্যোতি বিস্তার করিবে; লোকে সেই দৃষ্টি দেখিয়া শুদ্ধতার, কল্যাণের সংবাদ পাইবে; শুদ্ধ হইতে, কল্যাণ লাভ করিতে, সুযোগ পাইবে। তাহা হইলে বাক্য এমন শুদ্ধ ও সরল হইয়া বাহির হইবে, যাহা শুনিয়া সকলেই শুদ্ধতার পক্ষপাতী হইবে, অনুরাগী হইবে; শুদ্ধকার্য্যে সকলে মন দিবে। এখন যে সহজে বিরক্তি আসে, অসহিষ্ণুতা আসে, তাহা আর থাকিবে না। প্রেম ও সহিষ্ণুতা ও শুদ্ধতা সর্ব্বত্র প্রাণ হইতে, মন হইতে বিকীর্ণ হইবে। প্রভু, এমন শুভদিন কবে আসিবে। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

(৭)

হে পিতা, চাহিবার কত আছে, এবং তোমার কাছে কতই চাহিয়াছি ও চাহিতেছি! দৈন্য, দুঃখ অভাব যখন আমাদের আছে, তখন তোমার নিকট না চাহিয়া আর কোথায় কাহার নিকট চাহিব? আমাদের দুঃখ দারিদ্র্য দূর করিতে সমর্থ ও ইচ্ছুকই বা আর কে আছে? তাই প্রভু, এই প্রার্থনা, আমাদিগকে তোমাতেই লইয়া যাও, তোমাতেই নিমগ্ন রাখ। মন চঞ্চল হইয়া বারম্বার তোমা হইতে ফিরিয়া আসিয়া এখানকার ক্ষুদ্র তুচ্ছ পদার্থের দিকেই ছুটিয়া যায়। এরূপ গতাগতি তুমি দূর করিয়া দাও। তোমাতেই নিমগ্ন হইয়া এবং তোমার হইয়াই স্বাস্থ্য সৌন্দর্য্য এবং শক্তিলাভ করিয়া কৃতার্থ হই। সর্ব্বাংশে আমাদের উপরে তোমারই জয় হউক।

(৮)

হে পিতা; তোমার অতুল শোভার কথা কি কেবল শুনিয়া শুনিয়াই পরিতুষ্ট হইব! সাধ ত হয় তোমাতে নিমগ্ন হইয়া, তোমার পরিচয়—আস্বাদন—যথার্থতঃ পাইয়া, একেবারে চিরদিনের তরে তোমাতেই বিমুগ্ধ হইয়া থাকি। শর যেমন লক্ষ্যে গিয়া প্রবিষ্ট হয় এবং তাহার আর লক্ষ্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে হয় না, তেমনি তোমাতে কি এ দীন জনকে চির তরে নিমগ্ন রাখিয়া মুগ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না! বার বার যে প্রতিহত হইয়াই আসিতেছি! একেবারে ডুবিবার সুযোগ দাও। প্রভু, দীনের দীনতা চলিয়া যাউক। তোমার হইয়া, তোমাতে প্রীত হইয়া, ধন্য হই, কৃতার্থ হইয়া যাই।

(৯)

"বাধা নাহি ছিল কিছু দিতে শুধু দুঃখ, তবু দয়াময় দিলে কত সুখ"। হে প্রভু, সুখ পাইতে পারি এমন কোন আয়োজন দেখি না, তবু যে নানা প্রকারের সুখ পাইলাম, সে কেবল তোমারই অকৃত্রিম দয়াগুণে। যে প্রকারের অবোধ ও অকৃতজ্ঞ হইয়া আছি, তাহাতে যদি তুমি নানা প্রকারে নানা আকারে সুখ দানের ব্যবস্থা না করিতে, তাহা হইলে ত এ মূঢ় তোমাকে স্বীকারই হয়ত করিত না। তোমার আনন্দদানের এই পদ্ধতি দেখিয়া আমার মত মূঢ়ও তোমার দানশীলতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। হে পিতা, তোমার এ কেমন রীতি? যে তোমাতে অনুরক্ত হইতে চায় না বা অনুরক্ত হইতে পারে না, তাহাকে আকর্ষণ করিয়া, মুগ্ধ করিয়া, লইতে বুঝি এইরূপ করিতে হয়! প্রভু, দিলে অনেক, কিন্তু সছিদ্র পাত্র হইতে যেমন জল ঝরিয়া যায় কোনমতেই তাহাতে স্থির হইয়া থাকে না, তেমনি এ প্রাণ হইতে, এ সছিদ্র প্রাণ, হইতে তোমার প্রদত্ত সম্পদ্‌সমূহ ঝরিয়া পড়িতেছে। এমন কেন আমার অবস্থা হইল! এ দুর্গতি এইতে কে আর রক্ষা করে? পিতা, অবোধ সন্তান বলিয়া ইহার সদ্গতির ব্যবস্থা তোমাকেই করিতে হইবে। আর কার কাছে দুর্গতির কথা বলি? যাহা হউক, উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া এ দুঃখীর দুঃখ শেষ কর।

উৎসবের ডাক

মহা মাহোৎসবে ডাকিছেন সবে
পরম দয়াল পিতা আমাদের;
জাগো নরনারী মোহনিদ্রা ছাড়ি'
কর আয়োজন মহামিলনের।
সম্বৎসর পরে, মিলে পরস্পরে,
জয় ব্রহ্ম ব'লে মাতো আর বার;
মেতে বিশ্বজন হ'য়ে হৃষ্ট মন
ধর্ম্ম পথে সবে হ'ক আগুসার।
শু'নে নামধ্বনি নাচুক ধমনী,
কাঁপুক মেদিনী জয় ব্রহ্মনাদে;
প্রেমিক ভকত হ'য়ে পুলকিত
পূজুক আরাধ্য দেবে মনোসাধে।
পাষণ্ড অসুর অভাগা আতুর,
কেন ম্রিয়মাণ নিরাশা আঁধারে?
আশার আলোক হেরে কত লোক
পেলো পরিত্রাণ অকুল-পাথারে।
মৃত দেহে প্রাণ করিবেন দান
দীন হীন সবে দয়ার ঠাকুর;
এস এস সবে মহা মহোৎসবে—
কতই সুন্দর কতই মধুর!
যাবে সব জ্বালা এ যে ধর্ম্মশালা—
অভুক্ত ফেরে না কোন দিন কেহ;
কল্পতরু তিনি বিশ্ব কর্ম্মী যিনি—
কাঙ্গালের প্রতি তাঁর কত স্নেহ!
নূতন জীবন লভি' কত জন
কৃতার্থ হইল প্রেমান্ন-ভোজনে;
অবারিত দ্বার, সম অধিকার,
ছোট বড় ভেদ নাহি সে ভবনে।
তাই বলি' আয়, ডাকিছেন মায়,
দিস্ নে হেলায় শুভ অবসর;
এস মহোৎসবে জয় ব্রহ্ম রবে
হও সবে আজ হেথা অগ্রসর।
নিবিবে বাসনা, পুরিবে কামনা,
ঘুচিবে বেদনা যত অবসাদ;
সুখ-সিন্ধুনীরে ডুবিয়ে অচিরে,
মিটাও চির জনমের সাধ।

শ্রী চন্দ্রনাথ দাস

প্রাপ্ত

চিরদাসের বিনীত নিবেদন।

(ব্রাহ্মসমাজের তিনটী শাখামণ্ডলীর আদর্শের একতা ও ভিন্নতা এবং তন্মধ্যে সম্মিলনের প্রয়োজনীয়তা।)

মঙ্গলময় ঈশ্বরের অপূর্ব্ব বিধানে এবং মানব প্রকৃতির বিচিত্র

নিয়মে, ব্রাহ্মসমাজ ত্রিধা বিভক্ত হইয়া তিনটী স্বতন্ত্র মণ্ডলীতে পরিণত হইয়াছে। এই বিভাগের জন্য আমরা যতই কেন দুঃখ অনুভব করি না, অথবা অপরে যত কেন বিরুদ্ধ সমালোচনা করুন না, ইহাদিগকে আমরা কোন ক্রমেই উপেক্ষা বা অগ্রাহ্য করিতে পারি না। বস্তুতঃ এই তিনটী বিভাগ ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি ও বিকাশের তিনটী অপরিহার্য্য স্তর ও সোপান। সমুদায় ব্রাহ্মসমাজ যেমন ব্রহ্মজ্ঞান, বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ ও ব্রহ্মোপাসনার সুমহান্ আদর্শ বক্ষে ধারণ সাধন ও প্রচার করিয়া, আপনার সাধারণ একত্ব রক্ষা করিতেছেন, তেমনি ইহার অন্তর্গত তিনটী শাখামণ্ডলী সাধারণ আদর্শ (common Ideal) রক্ষা করিয়াও আপনাদের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। ন্যূনাধিক সত্তর বৎসর পূর্ব্বে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক সুসংস্কৃত একমাত্র কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ বা আদি ব্রাহ্মসমাজই ছিল। তৎপর বিচিত্র ঘটনাপরম্পরায় আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষার ঘাত-প্রতিঘাতে ও স্বভাবের অপরিহার্য্য নিয়মে, ব্রাহ্মসমাজ খণ্ডিত ও বিভক্ত হইয়া পড়িল, এবং একটী মণ্ডলীর স্থলে তিনটী মণ্ডলী স্থাপিত হইল। যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস ও বিকাশের ক্রম মনোযোগ পূর্ব্বক অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা এই তিনটী মণ্ডলীর অপরিহার্য্যতা কোন ক্রমেই অস্বীকার করিতে পারেন না। এই তিনটী মণ্ডলী মূলতঃ বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদী ও এক-ব্রহ্মোপাসক হইলেও, ইহাদের প্রত্যেকেরই এক একটী স্বতন্ত্র আদর্শ ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই আদর্শত্রয় এমনি সুস্পষ্ট যে, তাহা কিছুতেই অধঃকরণ বা অগ্রাহ্য করিবার সম্ভাবনা নাই। আমরা আশা করি ভগবানের কৃপায় যথাকালে এই আদর্শত্রয় এক মহান্ আদর্শে পরিণত হইবে ও ব্রাহ্মসমাজের সকল বিচ্ছেদ ও ভিন্নতা চলিয়া যাইবে। কিন্তু যতদিন তাহা না হইতেছে, ততদিন প্রত্যেক মণ্ডলী নিজ নিজ আদর্শের প্রতি বিশ্বস্ত থাকিয়া ও অপর মণ্ডলীর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান পোষণ ও পরস্পরের সহিত যথাসম্ভব যোগ রক্ষা করিয়া অনন্ত উন্নতির পথে অগ্রসর হউন, এই আমাদের প্রাণগত আকাঙ্ক্ষা ও প্রার্থনা। আদর্শের কথা বলিতে গেলে বলা যাইতে পারে যে, আদি ব্রাহ্মসমাজ হিন্দু জাতীয় মণ্ডলী (Hindu national Church) রূপে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। সর্ব্বপ্রকার পৌত্তলিকতা পরিহার করিয়া, এক অদ্বিতীয় নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা হিন্দু সমাজে প্রতিষ্ঠা করা আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রধান লক্ষ্য। মহর্ষি দেবেরও ইহাই প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ছিল। তিনি যদিও বেদাদি শাস্ত্রের অভ্রান্ততা অস্বীকার করিয়া, আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ জ্ঞানের উপর ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি প্রচীন ঋষিদিগের জীবনই বিশেষ ভাবে আদর্শ এবং প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রকেই প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ও সাধন করিয়া গিয়াছেন। তিনিঃ হিন্দু সমাজ ত্যাগ করেন নাই, কেবল হিন্দু সমাজের বিধি ও আচারাদি পৌত্তলিকতা-বর্জ্জিত করিয়া গ্রহণ, ও নিজ মণ্ডলী মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, করিয়াছেন। এখানে জাতিভেদ ও বৈদিক ভাবের আধিপত্য বিশেষ ক্ষুন্ন হয় নাই। এই সমাজে উপবীতধারী ব্রাহ্মণগণ আচার্য্যকৃত্য ও পৌরহিত্য করিবেন, স্ব স্ব জাতির মধ্যে ব্রাহ্মদিগের বিবাহ হইবে, উপনয়নকালে ব্রাহ্মণ জাতীয় ব্রাহ্মগণ যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবেন, ব্রাহ্মণেতর জাতির উপবীত ধারণের অধিকার থাকিবে না, ইত্যাদি অনেক আচার ব্যবহারদ্বারা ইহা বিলক্ষণ প্রতীত হয় যে, ইহা হিন্দু জাতীয় মণ্ডলী (Hindu national Church), সার্ব্বভৌমিক মণ্ডলী নহে। ব্রহ্মজ্ঞান ও অপৌত্তলিক ব্রহ্মোপাসনার সঙ্গে হিন্দু জাতীয় ভাব রক্ষা, ইহাই আদি ব্রাহ্মসমাজের আদর্শের বিশেষত্ব।

আদি ব্রাহ্মসমাজের পরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথেরই এক দল স্বাধীন মতাবলম্বী উন্নতিশীল বিবেকপরায়ণ ব্রাহ্ম অনুবর্ত্তী দ্বারা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হয়। এক ব্রহ্মানন্দ কেশব-চন্দ্রের নেতৃত্বাধীনে দুই শ্রেণীর যুবকদল দুইটী বিভিন্ন আদর্শ লইয়া আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। প্রথমে ইহাদের মধ্যে আদর্শের ভিন্নতা তেমন সুস্পষ্ট আকার ধারণ করে নাই, ফল্গু নদীর অন্তবাহী প্রবাহের মত প্রবাহিত হইতেছিল। ক্রমে কালসহকারে উক্ত আদর্শদ্বয় স্পষ্টতর হইয়া পড়িল। যদিও এই এই উভয় দলই সর্ব্বপ্রকার জাতিভেদ ও পৌত্তলিকতার বিরোধী, উভয়েই বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদী, উভয়েই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্য, তথাপি ইহাদের মধ্যে আদর্শ, ভাব ও কার্য্যের যথেষ্ট বৈষম্য পরিলক্ষিত হইত।

এই দুই শ্রেণীর ব্রাহ্মদিগকে বিভিন্ন আখ্যা দিতে হইলে বলা যাইতে পারে, ইহারা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ দল। অন্তরঙ্গ দল শুধু ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনায় তৃপ্তি অনুভব করিতেন না, তাঁহারা ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্মবাণী শ্রবণ ও ব্রহ্ম-ইচ্ছা-পালনের জন্য নিয়ত ব্যাকুল থাকিতেন। ইহারা বিশ্বাস ও বৈরাগ্যে প্রমত্তদিগের দলভুক্ত ছিলেন। ইহাদের অসাধারণ বৈরাগ্য ত্যাগ ও ধর্ম্ম সাধন এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার জন্য কষ্টসহিষ্ণুতা ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে উজ্জ্বলতম অধ্যায়রূপে পরিণত হইয়াছে। ইহারা যে দেশের ও সমাজের সেবা ও উন্নতি সাধন সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন তাহা নহে, তবে তাঁহাদের সেবার মূলে ছিল ঈশ্বর-প্রেরণা ও ঈশ্বরানুপ্রাণন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে কেশব-চন্দ্রের বহিরঙ্গদল ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনা রক্ষা করিয়া দেশের উন্নতি সাধন, সমাজসংস্কার, শিক্ষা বিস্তার, স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা, প্রভৃতি কার্য্যে অধিকতর মনোযোগী ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ যাহাতে নির্ব্বাচন-প্রথানুসারে প্রতিনিধি প্রণালীতে গঠিত ও শাসিত হয়, অল্পসংখ্যক প্রচারকগণের একাধিপত্য রহিত হইয়া, ব্রাহ্মসাধারণের ক্ষমতা ও আধিপত্য প্রবল হয়, এই সকল বিষয়ে তাঁহাদের অধিকতর লক্ষ্য ছিল। এই দুই ব্রাহ্ম দলের মধ্যে আদর্শের ভিন্নতা সুস্পষ্ট আকার ধারণ করিল। আদর্শ ভিন্ন হইলে একমণ্ডলীতে অবস্থান করা সম্ভবপর নহে। তাই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ দ্বিধা বিভক্ত হইল। এই দুই বিভাগ এক্ষণে নববিধান ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ নামে পরিচিত। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আদর্শের মধ্যে যৌক্তিকতা ও কর্ম্মশীলতার অধিকতর প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। এই মণ্ডলীভুক্ত ব্রাহ্মগণকে Rational Theist যুক্তিমার্গানুসারী বলিলে বোধ হয় অন্যায় হইবে না। ইহারা নিজ নিজ আদর্শ অনুসারে ব্রাহ্মসমাজে (Constitutional

method of Church Government) প্রতিনিধি-শাসন-পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করিয়া অপৌত্তলিক ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ও সমাজ ও দেশের সেবা করিয়া আসিতেছেন।

নববিধান ব্রাহ্মসমাজ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের আদর্শ লইয়া পড়িয়া আছেন। কেশবচন্দ্র একটী মহোচ্চ ও নবীন আদর্শ লইয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রবিষ্ট হন। আদি ব্রাহ্মসমাজে অবস্থান কালে এই আদর্শ কোরকাবস্থায়, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে প্রথম স্তরে ইহা অর্দ্ধ বিকশিত পুষ্পাবস্থায় এবং নববিধানে উহা প্রস্ফুটিত শতদল পদ্মের আকার ধারণ করিয়াছিল।

কেশবচন্দ্রের জীবনে এই আদর্শ জলন্ত ও মূর্ত্তিমান হইয়াছিল। জীবন্ত ঈশ্বরে জীবন্ত বিশ্বাস যে জীবননদীর উৎপত্তি, তাহা ক্রমে যোগশৈলের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া, পৃথিবীকে জ্ঞান প্রেম বিশ্বাস ভক্তিতে সমুর্ব্বরা করিয়া, অবশেষে চিদানন্দ-সিন্ধুতে গিয়া নিপতিত হইল। 'চিদানন্দসিন্ধুনীরে প্রেমানন্দের লহরী, মহাভাব রসলীলা কি মাধুরী মরি মরি!' মহাভাবে সমুদায় একাকার হইল, দেশ কালের ব্যবধান ভেদাভেদ ঘুচিল। এই অবস্থা তাঁহার জীবনে হইয়াছিল। গ্রন্থের দিক দিয়া বলিতে গেলে True Faith (প্রকৃত বিশ্বাস) এ আরম্ভ, 'সুখী পরিবার' ও 'ব্রহ্মগীতোপনিষদে' বিকাশ এবং 'জীবন বেদ' ও 'নবসংহিতায়' পরিণতি দৃষ্ট হয়। এই আদর্শ পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য, ধর্ম্ম-সমাজে ঐক্য শান্তি ও সমন্বয়, গৃহে সুখী পরীবার এবং সমগ্র ব্রাহ্মসমাজে এক অভিন্নহৃদয় ব্রাহ্মভ্রাতৃমণ্ডলী গঠন; সমুদয় ধর্ম্মবিধানকে এক অখণ্ড ধর্ম্মে পরিণত, সমুদয় আদর্শকে এক মহান্ আদর্শে বিন্যস্ত এবং সমুদায় মানবমণ্ডলীকে এক মানবত্বে পরিণত করা এবং সর্ব্বোপরি এক অদ্বিতীয় জীবন্ত ঈশ্বরের সাম্রাজ্য ও কর্ত্তৃত্ব, পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব, বিধাতৃত্ব ও সর্ব্বস্বত্ব প্রতিষ্ঠা করা। আমরা নবসংহিতা হইতে মণ্ডলী সম্বন্ধে তাঁহার আদর্শ নিম্নে উদ্ধৃত করিলামঃ—

যে ধর্ম্মসমাজ সমস্ত প্রাচীন জ্ঞানরত্নের ভাণ্ডার, এবং সমুদায় আধুনিক বিজ্ঞানের আধার, যাহা সমস্ত মহাজন এবং সাধুগণের মধ্যে সামঞ্জস্য, তাবৎ ধর্ম্মশাস্ত্রের ভিতর একতা এবং সমস্ত ধর্ম্মবিধানের পূর্ব্বাপর যোগ স্বীকার করে, যাহা সর্ব্ব প্রকার পার্থক্য এবং বিভিন্নতাসম্পাদক বিষয় পরিত্যাগ করে এবং, সর্ব্বদা একতা ও শান্তির মহিমা ঘোষণা করে, যাহা জ্ঞান ও বিশ্বাস, যোগ এবং ভক্তি, বৈরাগ্য ও সামাজিক কর্ত্তব্যের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করে, যাহা পূর্ণ সময়ে সকল জাতি এবং সমস্ত সম্প্রদায়কে এক রাজ্যে ও এক পরিবারে বদ্ধ করিবে, সেই বিশ্বজনীন ধর্ম্মমণ্ডলীতে আমি বিশ্বাস করি।"

এইটী Universal Church বা সার্ব্বভৌমিক মণ্ডলীর চরম আদর্শ। ইহাতে ধর্ম্মের চারিটী অঙ্গ (National, Rational Universal and Apostolic) জাতীয়, যৌক্তিক, সার্ব্বভৌমিক ও প্রত্যাদেশমূলক ভাব সকল সম্মিলিত হইয়াছে। এখানে রামমোহন, দেবেন্দ্র, কেশবচন্দ্রে কোন বিরোধ নাই। ইহাতে জ্ঞান ও বিশ্বাস, যোগ ও ভক্তি, কর্ম্ম ও নীতির সম্মিলন হইয়াছে। এই মহান্ আদর্শে আদি সাধারণ ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের আদর্শত্রয় একত্র মিশিয়া (merge) গিয়াছে। ইহা বর্ত্তমান যুগের নবীন স্বর্গরাজ্য, নববৃন্দাবন।

আমরা ব্রাহ্মসমাজের শাখাত্রয়ের বিভিন্ন আদর্শ সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম। প্রত্যেক মণ্ডলীর পক্ষে এক একটি বিশেষ আদর্শ যেমন একান্ত প্রয়োজনীয়, তেমনি উহা প্রত্যেকের অতি আদরের সামগ্রী। সুতরাং আমরা কোন মণ্ডলীকে তাঁহাদিগের চিরপোষিত আদর্শ ত্যাগ করিতে বলিতে পারি না। কিন্তু এই খণ্ড খণ্ড আদর্শ ভিন্নও ব্রাহ্মসমাজের একটি সাধারণ আদর্শ আছে—সেই আদর্শকে ভিত্তি করিয়া তিন সমাজের ব্রাহ্মগণ একত্রে ভ্রাতৃভাবে সম্মিলিত হউন, এই আমাদের প্রাণগত আকাঙ্ক্ষা ও প্রার্থনা। ব্রাহ্মসমাজের শাখাত্রয় এই মিলন অভাবে শুধু যে দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে তাহা নহে, ক্রমে পরস্পরের মধ্যে যোগ প্রীতি, সহানুভূতি ও সদ্ভাব হারাইয়া সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডীতে প্রবিষ্ট হইতেছে। ব্রাহ্মসমাজের উত্থান পতনের সঙ্গে ভারতের উন্নতি ও উত্থান পতন গ্রথিত। মিলনাভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম যথাযথ ভাবে প্রচার হইতেছে না; সুতরাং সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম, কুসংস্কার ও ধর্ম্মান্ধতা আবার ভারতে প্রবল হইয়া উঠিতেছে। ব্রাহ্মসমাজ সংখ্যায় নগণ্য হইলেও ইহাতে যে শক্তি রহিয়াছে তাহা সম্মিলিত হইলে সমস্ত পৃথিবী কম্পিত হইতে পারে। আত্মরক্ষার জন্যও এই সম্মিলন একান্ত প্রয়োজনীয়। ব্রাহ্মগণের মধ্যে সম্মিলন অভাবে অনেকে ব্রাহ্মধর্ম্মে আস্থাহীন ও সমাজের মহান্ আদর্শের প্রতি উদাসীন হইয়া, কেহ কেহ বিষয়াসক্তি সাগরে ডুবিতেছেন, কেহ বা হিন্দু বা খৃষ্টান সমাজের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছেন ও পশ্চাৎ দ্বার দিয়া পলায়নের চেষ্টা পাইতেছেন। এ অবস্থায় ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা ও সমুন্নত করিতে হইলে সমাজের ভিন্ন ভিন্ন শাখার মধ্যে সম্মিলনের একান্ত প্রয়োজন। মফঃস্বলের ব্রাহ্মদিগের অবস্থা অনেক স্থলেই শোচনীয়। তাঁহারা এক এক ক্ষুদ্র পল্লী বা নগরে নির্ব্বাসিতের ন্যায় বাস করিতেছেন। কে বা তাঁহাদিগকে দেখে, কে বা তত্ত্ববার্ত্তা লয়! তাঁহাদের পক্ষে ছেলে মেয়েদের শিক্ষা দান ও নিজেদের ধর্ম্ম বিশ্বাস বজায় রাখা যে কতদূর সুকঠিন, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন আর কেহ বুঝিতে পারিবেন না। ভারতের বহু ভাগ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের ন্যায় বিশুদ্ধ সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম এবং ব্রাহ্মসমাজের মত সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মমণ্ডলী স্থাপিত হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের শত দোষ ত্রুটি সত্ত্বেও ইহা অতি মহান্ এবং ইহা ভিন্ন ভারতের আর গত্যন্তর নাই। এই ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজের পবিত্র আদর্শ ব্রাহ্মগণের বিশেষ ভাবে উপলব্ধি এবং জনমণ্ডলীর মধ্যে প্রচার করা আবশ্যক। বর্ত্তমান যুগ সংঘবদ্ধতার যুগ। এ যুগের মূল মন্ত্র পরস্পর মিলন ও সমন্বয়। হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ই এক্ষণে সংঘবদ্ধ হইতেছেন, কেবল ব্রাহ্মগণ কি পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকিবেন?

শান্তি ও সম্মিলন স্থাপন যাঁহাদের লক্ষ্য, সমুদায় ভারতকে এক ধর্ম্মের বন্ধনে বদ্ধ করা যাঁহাদের উদ্দেশ্য, তাঁহাদের পক্ষে অসম্মিলন ও বিচ্ছিন্ন ভাব কি শোভা পায়? মহর্ষি দেবের জীবমানে বর্ষে বর্ষে ব্রাহ্মসাধারণের একটী সম্মিলন সভা হইত। এক্ষণে উহা আর নাই। এক্ষণে নববিধান ব্রাহ্মদিগের নববিধানবিশ্বাসী সমিতি নামে ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মসম্মিলনী নামে দুইটী স্বতন্ত্র সমিতি আছে। এই দুইটীর

প্রয়োজনীয়তা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। তবে এই দুই সমিতিতে তিন মণ্ডলীর ব্রাহ্মদিগেরই নিমন্ত্রিত ও বন্ধুভাবে উপস্থিত হওয়া আবশ্যক। তৎভিন্ন তিন মণ্ডলীর ব্রাহ্ম লইয়া একটী স্বতন্ত্র সমিতি স্থাপিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। ইহাতে সমগ্র ব্রাহ্মমণ্ডলীর হিতাহিত ও কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ ও পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে হইবে। "ব্রাহ্মসমাজ কমিটী" নামে ব্রাহ্মসাধারণের একটী সভা আছে, তাহা কার্য্যতঃ মৃতপ্রায় হইয়া রহিয়াছে। ইহাকে সজীব ও কার্য্যকারী করিতে হইবে। এখানে যাহাতে ব্রাহ্মগণ ঘন ঘন সম্মিলিত হইয়া ব্রাহ্মসমাজের হিত সাধন করিতে পারেন, তজ্জন্য প্রয়াস ও প্রযত্ন করিবেন। যাহাতে ভারতে সম্মিলনী ব্রাহ্মসমাজের সংখ্যা বর্দ্ধিত হয়, তিন সমাজের প্রচারকমণ্ডলী সমাদৃত হন, ব্রাহ্মদিগের পুত্র কন্যাদিগের শিক্ষাদির নিমিত্ত অল্পব্যয়ে (Endowed system এ) স্কুল কলেজ স্থাপিত হয়, ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিলাসিতা ও অপব্যয় বিদূরীত হইয়া ইহাতে বিশ্বাস বিবেক ও বৈরাগ্যের প্রাবল্য হয়, মফঃস্বলস্থ ব্রাহ্মদিগের তত্ত্বাবধান ও ব্রাহ্মদিগের ছেলে মেয়েদের রীতিমত নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষা হইতে পারে, তজ্জন্য ব্রাহ্মসমাজ কমিটী মনোযোগী হইবেন। এইরূপে ব্রাহ্মগণ গত কালের কলহ বিবাদ অসদ্ভাব ও ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ভুলিয়া যদি পুনরায় সম্মিলিত হইতে পারেন, ভগবানের কৃপায় ব্রাহ্মসমাজ পুনরায় ভারতে এক মহাশক্তিরূপে দণ্ডায়মান হইবে। ঈশ্বর কৃপা করিয়া ব্রাহ্মদিগের হৃদয়ে শুভবুদ্ধি প্রেরণ করুন এবং তাহাদিগকে প্রেম পুণ্যে একত্র গ্রথিত করিয়া পবিত্র সম্মিলনের সুধারস পান করান, এই আমাদের ব্রহ্মচরণে বিনীত প্রার্থনা। ওঁ ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্।

চিরদাস

টাঙ্গাইল শ্রীশশিভূষণ তালুকদার

প্রেরিত পত্র

(প্রেরিত-পত্রের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।)

সবিনয় নিবেদন—

গত ১৬ই অগ্রহায়ণ তারিখের তত্ত্বকৌমুদীতে "মৃত্যুর অন্ধকার" শীর্ষক একটী সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ক্রমাগত যেরূপ দুঃখজনক মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে তাহাতে মৃত্যু সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আপনি যে শোকার্ত্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিতেছেন, ইহা সময়োপযোগী হইয়াছে। আমি বিশেষ আগ্রহ সহকারে "মৃত্যুর অন্ধকার" শীর্ষক নিবন্ধটী পাঠ করিয়াছি। কিন্তু পাঠ করিতে করিতে একটী স্থানে উপস্থিত হইয়া কেমন একটু খটকা বোধ হইল। আপনি নিবন্ধটীর শেষাংশে লিখিয়াছেন—

"পরলোকে যখন এখানকার প্রত্যবন্ধকসকল তিরোহিত হয়, তখন সে রাজ্যে যত শীঘ্র যাওয়া যায় ততই ভাল; কেন না ততই উন্নতির পথ সুগম হয়, বিকাশ সাধন দ্রুত হয়।"

আমাদের দেশে এক শ্রেণীর লোকের এই ভাব প্রবল যে, এই জন্ম গ্রহণ ও জীবন যাপন করা এক শাস্তি বিশেষ। সুতরাং যত শীঘ্র এই পৃথিবী হইতে যাওয়া যায় ততই মঙ্গল। আপনার উল্লিখিত উক্তি প্রকারান্তরে কি এই ভাবেরই সমর্থন করিতেছে না? কিন্তু এই ভাব কি ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুমোদিত? মানবজীবনকে বিধাতার অমূল্য দান বলিয়াই কি আমরা মনে করি না? বিধাতার বিধানে জীবনের কার্য্য অবসানে যখন মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন কোন অভিযোগের কারণ থাকে না; কিন্তু তাই বলিয়া অকাল মৃত্যুও কি বিধাতার অভিপ্রেত ও আমাদের স্পৃহনীয়? অনেকস্থলে আমাদিগের অজ্ঞানতা, অসংযম, অসাবধানতাই কি অকাল মৃত্যুর কারণ নয়? আপনার যে উক্তি উপরে উদ্ধৃত হইল, উহা স্বীকার করিলে আমাদের এই হতভাগ্য দেশে যে অকাল মৃত্যুর হার অন্যান্য সভ্য দেশ অপেক্ষা বহুগুণে অধিক ইহা অতি কল্যাণকর বলিয়াই মনে করিতে হইবে; কারণ, আপনার মতে পরলোক যত শীঘ্র যাওয়া যায় ততই মঙ্গল।

অকাল মৃত্যু অধিকাংশস্থলে আমাদিগেরই পাপ, অজ্ঞানতা ও অযোগ্যতা প্রসূত এবং ইহা নিবারণযোগ্য বলিয়া মনে করি—জ্ঞানের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সভ্য দেশে অকাল মৃত্যুর হার ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে। মানবজীবন আনন্দময় বিধাতার দান। এই পৃথিবীতে দীর্ঘজীবন যাপন করিয়া আমরা তাঁহার নির্দিষ্ট কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন করিব এবং জীবনের আনন্দ সম্ভোগ করিব, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায় বলিয়া মনে করি। সুতরাং অকাল মৃত্যু নিবারণ কল্পে আমাদিগের সর্ব্ববিধ উপায় অবলম্বন করাই সঙ্গত। অকাল মৃত্যু কখনই স্পৃহনীয় হইতে পারে না।

আপনার লিখিত বিষয় বুঝিতে আমি কোন ভুল করিয়া থাকিলে, আমার ভুল সংশোধন করিলে একান্ত বাধিত হইব। ইতি

নিবেদক

শ্রীতড়িৎ মোহন গুপ্ত।

[আমাদের মন্তব্যটী ভাল করিয়া পাঠ করিলে দেখিতে পাইবেন, তিনি উদ্ধৃত উক্তিটি যে ভাবে গৃহীত হইবার আশঙ্কা করিতেছেন, সেরূপ ভুল বুঝিবার কোনও কারণ নাই। "এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ ও জীবন যাপন করা এক শাস্তি বিশেষ," এই ভাব যে এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে প্রবল, তাহা আমরা জানি এবং উক্ত মন্তব্যে অতি স্পষ্ট ভাবেই তাহার প্রতিবাদ করা হইয়াছে। সুতরাং প্রকারান্তরে উহা সমর্থিত হইবার কোনও কারণ দেখিতেছি না। মানবজীবন যে বিধাতার অমূল্য দান, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। তাহারও উল্লেখ তাহাতে আছে। অনেক স্থলে আমাদিগের অজ্ঞানতা অসংযম ও অসাবধানতাই যে অকাল মৃত্যুর কারণ, উহা যে পাপ ও অযোগ্যতা প্রসূত এবং নিবারণযোগ্য, কখনই স্পৃহনীয় হইতে পারে না এবং তাহার নিবারণ কল্পে আমাদের সর্ব্ববিধ উপায় অবলম্বন করাই সঙ্গত, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই; এ সকল বিষয়ে পত্র-প্রেরকের সহিত আমরা সম্পূর্ণ একমত। আমাদের কার্য্যের ফলেই হউক বা অন্য কোনও কারণেই হউক, যখন সত্যই মৃত্যু ঘটে, তখন যে উহা বিধাতার বিধানেই আসে এবং

যে বয়সেই আসুক না কেন, তাঁহার ব্যবস্থা অনুযায়ী উপযুক্ত সময়েই আসে, উক্ত ব্যক্তির এই সংসারে থাকিয়া আর উন্নতি ও কল্যাণ লাভ করা সম্ভবপর নয় বলিয়াই আসে, যে দেহ এক সময় এই পথের সহায় ছিল তাহা প্রতিবন্ধক স্বরূপ দাঁড়ায় বলিয়াই এবং পরলোকে সে পথের অধিকতর সহায়তা পাওয়া যাবে বলিয়াই আসে, সুতরাং উহা যে উপযুক্ত সময়েই আসিয়াছে এবং অধিকতর কল্যাণকর বলিয়াই ঘটিয়াছে, তাহাতেও কোনও সন্দেহ নাই—এই কথাটা বলাই আমাদের উদ্দেশ্য। ইচ্ছাপূর্ব্বক অসময়ে মৃত্যুকে ডাকিয়া আনা বা মৃত্যু ইচ্ছা করা, অথবা জীবন-রক্ষার জন্য উপযুক্ত চেষ্টা না করা, পাপ বলিয়াই গণ্য। কেন না সেখানে জীবন-বিধাতার ইচ্ছার বিরোধী কার্য্যই করা হয়।—তঃ সঃ]

ব্রাহ্মসমাজ

মাঘোৎসব—প্রেমময়ের অপার করুণায় পুনরায় আমাদের প্রিয় মাঘোৎসব সমুপস্থিত। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে আগামী সপ্ত-নবতিতম মাঘোৎসব সম্পন্ন করিবেন স্থির করিয়াছেন। আবশ্যক হইলে ইহার কিছু পরিবর্ত্তনও হইতে পারিবে। ব্যাকুলহৃদয় বিশ্বাসিগণের সম্মিলনের উপর উৎসবের সফলতা বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। তাই কার্য্যনির্ব্বাহক সভা উৎসবে যোগদান করিয়া উহাকে সফল করিবার জন্য, সকলকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিতেছেন। প্রাতে ৭ ও সন্ধ্যা ৬।০ ঘটিকায় কার্য্য আরম্ভ হইবে।

১লা মাঘ—(১৫ ই জানুয়ারী ১৯২৭) শনিবার—প্রাতে—ব্রাহ্ম পরিবার এবং ছাত্র ও ছাত্রীনিবাসসমূহে ব্রাহ্ম-সমাজের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা। সন্ধ্যায়—উৎসবের উদ্বোধন। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস, এম এ।

২রা মাঘ—(১৬ ই জানুয়ারী) রবিবার প্রাতে—উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র রায়, বি এ। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় বরাহনগরস্থ শ্রমজীবিগণের নগর সঙ্কীর্ত্তন। (কর্ণওয়ালিস্ স্কোয়ার হইতে আরম্ভ হইবে)। সন্ধ্যায়—বরাহনগরস্থ শ্রমজীবি-গণের উৎসব উপলক্ষে উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায়।

৩রা মাঘ—(১৭ ই জানুয়ারী) সোমবার—প্রাতে উপাসনা; আচার্য্য—শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র সোম। সন্ধ্যায়—বক্তৃতা। বক্তা—ডাঃ কালীদাস নাগ। বিষয়—ব্রাহ্মসমাজ ও ভারতের নব জাগরণ।

৪ঠা মাঘ—(১৮ ই জানুয়ারী) মঙ্গলবার প্রাতে—উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেন, বি এ। সন্ধ্যায়—সঙ্গতসভার উৎসব উপলক্ষে বক্তৃতা। বক্তা—শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র রায়, বি এ; বিষয়—শতবর্ষের তপস্যা।

৫ই মাঘ—(১৯ শে জানুয়ারী) বুধবার—ছাত্রসমাজের উৎসব উপলক্ষে প্রাতে—উপাসনা; আচার্য্য—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, বি এ। সন্ধ্যায় বক্তৃতা। বক্তা—শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, এম এ। বিষয়—ইউরোপ ও ভারতবর্ষে ধর্ম্মের বাহ্য প্রকাশ।

৬ই মাঘ—(২০ শে জানুয়ারী) বৃহস্পতিবার প্রাতে—উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ। সন্ধ্যায়—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি সভা। সভাপতি—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, বি এ। বক্তা—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম্ এ, ডাঃ কালীদাস নাগ, শ্রীযুক্তা হেমলতা সরকার, শ্রীযুক্ত অমলকুমার সিদ্ধান্ত, এম্ এ।

৭ই মাঘ—(২১ শে জানুয়ারী) শুক্রবার—প্রাতে উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। সন্ধ্যায়—তত্ত্ববিদ্যা সভার উৎসব উপলক্ষে বক্তৃতা। বক্তা—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ। বিষয়—বিশ্বরূপ দর্শন।

৮ই মাঘ—(২২ শে জানুয়ারী) শনিবার প্রাতে—মন্দিরে ব্রাহ্ম মহিলাদিগের উৎসব উপলক্ষে উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্তা হেমলতা সরকার। (পুরুষদিগের জন্য সিটি-কলেজ-গৃহে পৃথক উপাসনা)। সন্ধ্যায়—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক সভা। (কেবল সভ্যদের জন্য)।

৯ই মাঘ—(২৩ শে জানুয়ারী) রবিবার প্রাতে—ব্রাহ্ম যুবকদিগের উৎসব উপলক্ষে কীর্ত্তন ও উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্তা হেমলতা সরকার। অপরাহ্ণ ১½ ঘটিকায় যুবকদিগের আলোচনা। সভাপতি—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম এ। ৪ ঘটিকায়—নগর সংকীর্ত্তন; (বিডন স্কোয়ার হইতে আরম্ভ হইবে।) সন্ধ্যায় উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, বি এ।

১০ই মাঘ (২৪ শে জানুয়ারী) সোমবার প্রাতে—কলিকাতাস্থ উপাসকমণ্ডলীর উৎসব উপলক্ষে উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী। অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায়—নবদ্বীপচন্দ্র-স্মৃতিসভা। সভাপতি—শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়, এম এ; বক্তা—শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু, বি এ, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত, শ্রীযুক্তা অবন্তী ভট্টাচার্য্য। সন্ধ্যায়—উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম এ।

১১ই মাঘ—(২৫ শে জানুয়ারী) মঙ্গলবার—**সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব**। প্রাতে ৫ ঘটিকায়—কীর্ত্তন, ৭ ঘটিকায়—উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য এম এ। অপরাহ্ণ ১ ঘটিকায় উপাসনা; আচার্য্য—শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু, বি এ। ২ ঘটিকায় পাঠ ও ব্যাখ্যা। পাঠক—শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর রায়, এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু, বি এ। ৪ ঘটিকায়—ইংরাজীতে উপাসনা; আচার্য্য—শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ, এম্ এ। সন্ধ্যায়—কীর্ত্তন ও উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় এম এ।

১২ই মাঘ (২৬ শে জানুয়ারী) বুধবার প্রাতে—সাধনাশ্রমের উৎসব উপলক্ষে উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী। অপরাহ্ণ ২ ঘটিকায়—আলোচনা। বিষয়—"ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার"; সভাপতি—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম এ, আলোচনা উত্থাপন করিবেন, সন্ধ্যায় বক্তৃতা। বক্তা—শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ, এম এ।

১৩ ই মাঘ (২৭ শে জানুয়ারী) বৃহস্পতিবার প্রাতে—উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত মথুরানাথ নন্দী। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায়—মেরীকার্পেণ্টার হলে রবিবাসরিক নীতিবিদ্যালয়ের উৎসব। সন্ধ্যায়—ইংরাজীতে উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়, এম এ।

১৪ ই মাঘ (২৮ শে জানুয়ারী) শুক্রবার প্রাতে—উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী। অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় বালকবালিকা সম্মিলন। সন্ধ্যায়—বক্তৃতা। বক্তা—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, বি, এ।

১৫ ই মাঘ (২৯ শে জানুয়ারী) শনিবার প্রাতে—উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য। অপরাহ্ণে কাঙ্গালী বিদায়। সন্ধ্যায়—উপাসনা; আচার্য্য—শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত।

১৬ ই মাঘ (৩০ শে জানুয়ারী) রবিবার প্রাতে—উপাসনা; আচার্য্য—শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী বি এ। সন্ধ্যায়—উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ, এম এ।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও মফঃস্বল হইতে আগত ব্রাহ্ম অতিথিদিগের বাস ও আহারের বন্দোবস্ত করা হইবে। মহিলাদিগের জন্য শিবনাথ স্মৃতিভবন (২১০।৬ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট এবং পুরুষদিগের জন্য নূতন সিটিকলেজ (১০২ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট) বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। মফঃস্বল হইতে যাঁহারা উৎসবে যোগদান করিতে সংকল্প করিয়াছেন, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক পূর্ব্বেই উৎসবকমিটির সম্পাদককে তাঁহাদের কলিকাতা পৌঁছিবার নির্দ্দিষ্ট তারিখ জানাইলে উপযুক্ত অভ্যর্থনার বন্দোবস্ত হইতে পারে।

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ৮ই জানুয়ারী ভাগলপুর নগরীতে প্রবীণ ব্রাহ্ম বাবু নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৮৪ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি দীর্ঘকাল নানাপ্রকারে ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়াছেন এবং চরিত্রমাধুর্য্যে সকলের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। তাঁহার পরলোকগমনে ব্রাহ্মসমাজ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

বিগত ৯ই জানুয়ারী কলিকাতা নগরীতে পরলোকগতা কমলকুমারী সরকারের আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে পিতা শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় কন্যার স্মৃতি রক্ষার্থ ৫০০৲ টাকা করিয়া হাজার টাকার দুইটি স্থায়ী ভাণ্ডার স্থাপন করিবেন। তাহার সুদ গরীবের সাহায্যকল্পে ব্যয়িত হইবে।

বিগত ৯ই জানুয়ারী কাঁথি নগরীতে পরলোকগত বাবু রাধাকৃষ্ণ মাইতির আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য এবং পৌত্র শ্রীমান শচীন্দ্রকুমার মাইতি সংক্ষিপ্ত জীবনীপাঠ ও প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে বিবিধ প্রতিষ্ঠানে ৭০৲ টাকা দান প্রদত্ত হইয়াছে এবং কাঙ্গালীদিগকে পরিতোষপূর্ব্বক আহার করাইয়া চারি আনা হিসাবে ভিক্ষা প্রদান করা হইয়াছে।

বিগত ৯ই জানুয়ারী কলিকাতা নগরীতে পরলোকগত বাবু হেমচন্দ্র রায় চৌধুরীর আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ২৭শে ডিসেম্বর শেষভাগে পুরী নগরীতে বাবু শরদিন্দু বিশ্বাস পরলোক গমন করিয়াছেন।

বিগত ১২ই জানুয়ারী কলিকাতা নগরীতে পরলোকগত সত্যকুমার দত্তের আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ৩০শে ডিসেম্বর গিরিডি নগরীতে শ্রীমতী প্রতিভা সেন তাঁহার মাতা পরলোকগতা নির্ম্মলাবালা দত্তের আদ্যশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়াছেন। ডাক্তার বি রায় আচার্য্যের কার্য্য ও জামাতা শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ সেন প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে দাতব্য বিভাগে ৩৲ প্রদত্ত হইয়াছে।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চির শান্তিতে রাখুন ও আত্মীয় স্বজনদিগের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

শুভবিবাহ—বিগত ১০ই জানুয়ারী কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীনাথ দত্তের দ্বিতীয়া কন্যা কল্যাণীয়া সুধা ও পরলোকগত বাবু কাশীচন্দ্র ঘোষালের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সুবিমলচন্দ্রের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। প্রেমময় পিতা নবদম্পতিকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

পরীক্ষায় কৃতিত্ব—বিগত এম্ এ পরীক্ষাতে শ্রীযুক্ত ললিতমোহন বসুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সুশীলকুমার বাঙ্গালা সাহিত্যে ১ম বিভাগে এবং নিম্নলিখিত ছাত্রীগণ বিভিন্ন বিষয়ে উত্তীর্ণ হইয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম:—বীণাপানি সিংহ (ইতিহাসে ১ম বিভাগে ২য় স্থান অধিকার করিয়া), স্নিগ্ধপ্রভা দত্ত (অমিশ্র গণিত, ১ম বিভাগে ৩য় স্থান অধিকার করিয়া) কোরা বার্ক (ইংরাজী সাহিত্যে, ২য় বিভাগে) রেণুকা চৌধুরী (ঐ তৃতীয় বিভাগে), জে হেলেন রোসেগুস্ (বাঙ্গালা সাহিত্যে ১ম বিভাগে ১ম স্থান অধিকার করিয়া), তটিনী দাস (দর্শন শাস্ত্রে, ১ম বিভাগে, ২য় স্থান অধিকার করিয়া)। বিশেষ আনন্দের বিষয় এই যে, ইহার মধ্যে কয়েকটি হিন্দু ছাত্রী আছেন এবং একটী বিদেশিনী ছাত্রী বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন।

উপাধি লাভ—বিগত নববর্ষ উপলক্ষে শ্রীযুক্ত কমললোচন দাস "রায় সাহেব" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন জানিয়া

আমরা সুখী হইলাম। এই উপলক্ষে তিনি ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন বিভাগে ২০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

দান—শ্রীমান শচীন্দ্রনাথ মল্লিক পিতামহের বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে তিন টাকা ফণ্ডে ৩৲ ও প্রচার ফণ্ডে ১৲, দান করিয়াছেন। এ দান সার্থক হউক ও পরলোকগত আত্মা শান্তিলাভ করুন।

"নিমৃতা ব্রাহ্মসমাজ"—বিগত ১লা জানুয়ারী নিমৃতা ব্রাহ্মসমাজের উনচত্বারিংসৎ বার্ষিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। প্রাতে সংকীর্ত্তনের দল গ্রামবাসীর দ্বারে দ্বারে ভগবানের নাম কীর্ত্তন করিয়া মন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে সমাধির নিকট শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস প্রার্থনা করেন। অনন্তর উপাসনা হয়; শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। মধ্যাহ্নে পাঠ, ব্যাখ্যা ও আলোচনা হয়। সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু উপাসনা করেন। বহু ভদ্র মহিলা ও মহোদয়গণ উৎসবে যোগদান করিয়া উৎসবকে সফল করেন। গরীব দুঃখীদিগকে আহার করান হইয়াছিল।

আন্দুল ব্রাহ্মসমাজ—আন্দুল ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে—১৭ই পৌষ (১লা জানুয়ারী) সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় উদ্বোধন করেন। ১৮ই পৌষ (২ রা জানুয়ারী) প্রাতে শ্রীযুক্ত অমৃতকুমার দত্ত প্রমুখ উষাকীর্ত্তনের দল কীর্ত্তন করিতে করিতে সমাজে উপস্থিত হইলে, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র উপাসনা করেন। উপাসনান্তে তিনি মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেন। অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত মাণিকলাল দে ও শ্রীযুক্ত অমৃতকুমার দত্ত প্রমুখ মহোদয়গণ নগর সংকীর্ত্তন করেন। সংকীর্ত্তন শেষে শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী "ভারতের ধর্ম্মের ধারা" বিষয়ে একটী বক্তৃতা দেন; তৎপরে কীর্ত্তন। শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু একটি প্রার্থনা করিলে উৎসবের কার্য্য শেষ হয়।

পুরাতন বস্ত্র-ভিক্ষা—বিপুল সম্মান পুরঃসর নিবেদন এই—জয়নগর ও তৎসন্নিহিত গ্রাম সমূহের দীন দুঃখী অনাথ বিধবা পিতৃহীন শিশু ও অন্ধ আতুরদিগের দৈন্য দশা ও দুঃখ দুর্গতির অবস্থা বিশেষ ভাবে পরিজ্ঞাত আছি। অনাহারে ও অল্পাহারে তাহারা ক্রমশঃ নিস্তেজ ও নির্জীব হইয়া পড়িতেছে,—উপযুক্ত আহারের অভাবে তাহারা নানাবিধ ব্যাধিগ্রস্ত হইতেছে; এবং পরিধেয় বস্ত্র ও শীত-বস্ত্রের অভাবে তাহারা এই দারুণ শীতে বড়ই ক্লেশ পাইতেছে। আমরা প্রতি বৎসর শীতকালে তাহাদের শীত-ক্লেশ নিবারণের জন্য আমাদের হৃদয়বান্ বন্ধু ও দয়াশীলা ভগ্নীগণের নিকট হইতে তাঁহাদের পরিত্যক্ত পুরাতন বস্ত্রাদি ভিক্ষা করিয়া, এই সকল দুর্দ্দশাগ্রস্ত শীতপীড়িত দুঃখী ও দুঃখিনীগণকে দিয়া থাকি। এই সকল পুরাতন বস্ত্র পাইয়া তাহারা কত খুসী হয়, কত কৃতজ্ঞ হয়! আপনারা যদি দয়া করিয়া আপনাদের পরিত্যক্ত বস্ত্র, কম্বল, এমন কি ছেঁড়া পরদাগুলি প্রদান করেন, তাহা হইলে তাহাদের কত উপকার হয়। এক টাকা চারি আনা হইলে এক খানি মোটা কাপড় কিনিতে পাওয়া যায়। তাহারা অনেক দিন নূতন কাপড় পরে নাই। যদি কোন দরিদ্র-বন্ধু তাহাদের জন্য দুই এক খানি নূতন কাপড় কিনিয়া দেন, কিম্বা নূতন বস্ত্র ক্রয়ের জন্য কিছু অর্থ আমাদের কাছে পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে তাহাদের বড় উপকার হয়। দরিদ্রেরা সাহায্যের জন্য আপনাদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে!—আশা করি, আপনারা সামান্য ত্যাগ-স্বীকার করিয়া তাহাদের এই আশা পূর্ণ করিবেন। বিনীত সেবক, শ্রীগোপালচন্দ্র দত্ত—লণ্ডন মিসনারী সোসাইটী, ১৭ নং এল্‌গিন রোড, কলিকাতা।

প্রাপ্তিস্বীকার—পণ্ডিত শ্রীনাথ চন্দ কর্তৃক ময়মনসিংহ হইতে সংগৃহীত দান কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকৃত হইতেছে:—

শ্রীমতী শশিপ্রভা গুপ্ত ৩৲, শ্রীমতী বামাসুন্দরী চন্দ ৩৲, কুমারী ভক্তিলতা চন্দ, এম এ, ৩৲, কুমারী শরৎকুমারী মিত্র ৩৲, পণ্ডিত শ্রীনাথ চন্দ ৩৲, শ্রীমতী অন্নদাসুন্দরী বিশ্বাস, ১৲ শ্রীমতী লক্ষ্মীপ্রভা বরা ১৲ শ্রীমতী হেমমালা দত্ত, ১৲ কুমারী রমা দত্ত, বি এ, ১৲ কুমারী সাবিত্রী আশ, ১৲ কুমারী সুরুচি-বালা রায়, বি এ, ১৲ কুমারী ক্ষিরোদমণি সেন, ১৲ কুমারী শান্তিলতা দত্ত, ১৲ কুমারী লাবণ্যলতা চন্দ, বি এ, ১৲ বাবু বিনোদবিহারী সেন, ১৲ বাবু সুধাংশুমোহন দত্ত ১৲ বাবু বিনয়ভূষণ ব্রহ্মব্রত, ১৲ বাবু হরানন্দ গুপ্ত, ১৲ বাবু চিত্তানন্দ আচার্য্য, ১৲ মোট ২৯৲ টাকা।

আন্দুল ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক কৃতজ্ঞতা সহকারে আন্দুল ব্রহ্মমন্দিরের সাহায্যকল্পে নিম্নলিখিত দানপ্রাপ্তি স্বীকার করিতেছেন—

বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র (কলিকাতা) ২০৲, বাবু মানিকলাল দে (কলিকাতা) ১০৲, বাবু আদিত্যনাথ চট্টোপাধ্যায় (আন্দুল) ৫৲, বাবু ফণীভূষণ চক্রবর্ত্তী (আন্দুল) ১৲, বাবু রঘুনাথ ঘোষ (আন্দুল) ১৲, বাবু অন্নদাচরণ পরামাণিক (আন্দুল) ২৲, বাবু নন্দলাল দে (আন্দুল) ১৲, বাবু যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (আড়াগাড়) ২৲, বাবু দাশরথী দাস (আড়াগাড়) ২৲, মোট ৪৪৲ টাকা।

নিবেদন

আমাদের পরম পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ে তাঁহার পুণ্যময় পবিত্র স্মৃতি রক্ষা করা ইহার ছাত্র ছাত্রীদের একান্ত কর্ত্তব্য। এই মহৎ উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে তিন হাজার টাকার প্রয়োজন। এই টাকা দ্বারা ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ে দরিদ্র ছাত্রীদের জন্য বৃত্তি স্থাপন করা হইবে। ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ের পুরাতন ও নূতন ছাত্র ছাত্র এবং সদাশয় নরনারীদিগের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন যে, তাঁহারা এই মহৎ উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিতে যথাসাধ্য সাহায্য করুন। যিনি যাহা দিবেন তাহা সাদরে গৃহীত হইবে। টাকাকড়ি ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ের লেডি প্রিন্সিপ্যালের নামে, ২৯৪ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইবেন। তিনি সকলকে টাকা প্রাপ্তির রসিদ দিবেন। দাতাদিগের নাম তত্ত্বকৌমুদী ও মেসেঞ্জারে প্রকাশিত হইবে।

নিবেদিকা

শ্রীকামিনী রায়, শ্রীঅবলা বসু, শ্রীকুমুদিনী বসু, শ্রীবাসন্তী চক্রবর্ত্তী।

বিজ্ঞাপন

আগামী ৮ই মাঘ শনিবার (ইং ২২শে জানুয়ারী ১৯২৭) সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকার সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা-মন্দিরে সমাজের বার্ষিক সভার অধিবেশন হইবে। সভ্যদিগের উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়।

আলোচ্য বিষয়

১। ইং ১৯২৬ সালের বার্ষিক কার্য্যবিবরণী ও আয় ব্যয়ের হিসাব। ২। সভাপতির অভিভাষণ। ৩। সমাজের কর্ম্মচারিগণের নিয়োগ। ৪। অধ্যক্ষ সভার সভ্যগণের নিয়োগ। ৫। পরলোকগত স্যার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্তের স্থলে ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ের একজন ট্রষ্টী নিয়োগ। ৬। বিবিধ।

প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় দ্বারা ৩রা মাঘ মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রীবরদাকান্ত বসু, বি-এ

Registered NO 65

অসতো মা সদগময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৪৯শ ভাগ।
২০শ সংখ্যা।

১৬ই মাঘ, রবিবার, ১৩৩৩, ১৮৪৮ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯৮
30th January, 1927.

প্রতি সংখ্যার মূল্য
অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য

প্রার্থনা।

হে প্রেমময় উৎসব-দেবতা, তুমি তোমার অসীম প্রেমে এই উৎসবের মধ্যে আমাদের উপর দিনের পর দিন তোমার কত করুণাই বর্ষণ করিতেছ! আমরা ত তাহা পাইবার কোনই আশা করিতে পারি নাই—আমাদের ত সেরূপ যোগ্যতা কিছুই নাই! তবু তুমি তোমার কৃপাবর্ষণে ক্ষান্ত নও। তুমি যে তোমার অপার করুণার আরও কত নিদর্শন আমাদিগকে প্রদান করিবে, তাহা আমরা কিছুই জানি না। তুমি যে নূতন আশা ও উৎসাহের সঞ্চার করিতেছ, নূতন সংকল্প জাগাইতেছ, তাহাতেই আমরা তোমার উপর নির্ভর রাখিয়া প্রতীক্ষা করিতেছি। তুমি আমাদিগকে কখনও পরিত্যাগ কর নাই, এখনও করিবে না। তুমিই আমাদের সকল উদাসীনতা অবাধ্যতা চূর্ণ করিয়া, আমাদিগকে তোমার উপযুক্ত করিয়া লইবে, আমাদের মৃত প্রাণে নবজীবনের সঞ্চার করিবে। হে জীবন-দেবতা, তুমি যে জীবন্ত ভাবে আমাদের মধ্যে কার্য্য করিতেছ, তাহার পরিচয় ত আমরা যথেষ্টই পাইতেছি। তুমি আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে কার্য্য করিতেছ, প্রত্যেককে তোমার জন্য গড়িয়া তুলিতেছ। আমরা যাহাতে তোমার হাতে আমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দিতে পারি, তুমি যাহাকে যে ভাবে তোমার পথে লইয়া যাইতে চাও, আমরা সেই ভাবেই চলিতে প্রস্তুত হইতে পারি, তুমি আমাদিগকে সে প্রকার শুভবুদ্ধি প্রদান কর, সে আকাঙ্ক্ষা ও শক্তি প্রদান কর। আমরা যেন আর মৃতপ্রায় না থাকি। তোমার নূতন জীবন পাইয়া নূতন বলে জীবন পথে চলিতে সমর্থ হই। আমাদের সকলের জীবনে তোমার মঙ্গল ইচ্ছাই জয়যুক্ত হউক। আমাদের মধ্যে তোমার পবিত্র রাজ্যই স্থাপিত হউক তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

সপ্তনবতিতম মাঘোৎসব।

আমাদের উৎসবের প্রকৃত বিবরণ প্রদান করা কোনও প্রকারেই সম্ভবপর নহে। উহা মূলতঃ প্রাণের ব্যাপার, প্রাণেই অনুভব করিতে হয়। তাহা বর্ণনা দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া কোনও লাভ নাই। তাই আমরা সেরূপ কোনও চেষ্টা না করিয়া, অন্যান্য বৎসরের ন্যায় শুধু বাহিরের কার্য্যবিবরণ ও উপদেশাদির মর্ম্ম প্রদান করিয়াই আমাদের কর্ত্তব্য শেষ করিব। উপদেশাদির মধ্য দিয়া যে তত্ত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা দ্বারাও অনেক উপকার সাধিত হইবে। সম্মিলিত উপাসনার মধ্য দিয়া সাক্ষাৎভাবে প্রাণে যে অনুপ্রাণনা আসে, তাহা যখন অন্য উপায়ে প্রদান করা যায় না, তখন আমরা ইহার অধিক আর কিছু করিতে পারি না।

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও সম্পূর্ণ পৌষ মাস প্রতি দিন নগরের বিভিন্ন অংশে ঊষাকীর্ত্তন ও উৎসবের প্রস্তুতির জন্য উপাসনা প্রার্থনাদি হইয়াছিল। দুই দিবস কলিকাতার বাহিরে যাওয়া হয়। এবার নানা কারণে অনেক বিঘ্নের মধ্যে এই কার্য্যটি সম্পন্ন করিতে হইয়াছে। তবু মঙ্গলময়ের কৃপাতে যে কার্য্যটি চলিয়াছে. ইহাতেই আমরা করুণাময়ের বিশেষ দয়া দেখিতেছি। পারিবারিক দুর্ঘটনানিবন্ধন শ্রীযুক্ত অমৃতকুমার দত্ত এবার সকল দিন উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। তাই অনেকদিন শ্রীমান ননিভূষণ দাস গুপ্ত ও শ্রীমান ভূপেন্দ্রনাথ মিত্রকে কীর্ত্তন পরিচালনের কার্য্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ সেন প্রভৃতি পুরাতন কর্ম্মিগণ অবশ্য সঙ্গে

ছিলেন। দুই তিন দিবস শ্রীযুক্ত রাজকুমার ঘোষের সাহায্যও পাওয়াতে বিশেষ উপকার সাধিত হইয়াছিল। উপাসনাদির কার্য্য শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মুখার্জ্জি, শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু ও এক দিবস শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় সম্পন্ন করেন।

১লা মাঘ (১৫ই জানুয়ারী) শনিবার—অদ্য প্রাতেও উষাকীর্ত্তন হইয়াছিল। আজ ব্রাহ্ম ছাত্র ও ছাত্রী-নিবাসসমূহে ও পরিবারসকলে ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণার্থ বিশেষ উপাসনা ও প্রার্থনা হয়। অনেক গৃহ এই উপলক্ষে পত্র পুষ্পে সুসজ্জিত করাও হইয়াছিল।

সায়ংকালে উৎসবের উদ্বোধন। কিছু কাল কীর্ত্তন হইলে পর যথা সময়ে উপাসনা আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। তিনি নিম্নলিখিত রূপে উপাসনার উদ্বোধন করেনঃ—

(আজি) নিমন্ত্রিত সবে সখার প্রেম-ভবনে,
(তাই) আনন্দ ধরে না আজি এ মলিন মনে।
মধুমাখা ডাকে হরি, (এনে) সবে নিমন্ত্রণ করি',
বিলাবেন প্রেমামৃত এ পাপী জনে।
ক্ষুধিত তৃষিত সবে, (সখার) মহাযজ্ঞ মহোৎসবে,
লভিব প্রেমান্ন আজি যত সাধ মনে।
সখার সনে সখার নাম, (আজি) আনন্দে করিব গান,
পাইব জীবন আজি মৃত জীবনে।
(আজি আনন্দ যে ধরে না প্রাণে)

আজ এই মহোৎসবে কে নিমন্ত্রণ করেছেন? সত্য, সমাজের সম্পাদক মহাশয় নানা ভাবে সকলের নিকট উৎসবের বার্ত্তা প্রচার করেছেন; কিন্তু তার ভিতরে আর কারও বাণী কি শুনি নাই? আর কাহারও নিমন্ত্রণের সাড়া কি আমরা পাই নাই? সখা যে আমাদিগকে ডাকিতেছেন। তিনি ত সর্ব্বদাই নানা ঘটনার ভিতর দিয়া, নানা অবস্থার ভিতর দিয়া, আমাদিগকে ডাকেন। আজ বিশেষ ভাবে এই মহোৎসবে ডাকিতেছেন—

মধুমাখা ডাকে হরি (এনে) সবে নিমন্ত্রণ করি',
বিলাবেন প্রেমামৃত এ পাপী জনে।
সখার সনে সখার নাম, (আজি) আনন্দে করিব গান,
পাইব জীবন আজি মৃত জীবনে।

তিনি মৃত প্রাণ জাগ্রত করবেন, তিনি মোহনিদ্রা হ'তে উদ্বুদ্ধ করবেন। এই মহাযজ্ঞের মহা নিমন্ত্রণে কাহাদের মুখ দেখিতেছ? ব্রহ্মোৎসবে কাহারা যোগ দিতেছেন? এ কোন্ উৎসব? এ ব্রহ্মের উৎসব কি কেবল এখানে যে কয়টি লোক উপস্থিত আছেন তাঁদের? অথবা ব্রাহ্মসমাজের যে কয়টি লোক, অথবা ইহলোকে যাঁরা আছেন, তাঁরাই যোগ দিবেন? এখানে কি কেবল নিমন্ত্রিতেরা এসেছেন? এ যে ব্রহ্মমন্দির। সকল দেশের সকল কালের নর নারীর এখানে মহা সম্মিলন। ঐ ব্রহ্মের সিংহাসনতলে যে ইহলোকবাসী পরলোকবাসী সকলেই সমবেত। সকলের প্রীতির যোগই যে আমরা অনুভব করিতেছি। আজ সকলকে প্রণাম করি, সকলের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি। আজ ব্রাহ্মসমাজের গুরুজনসকলের চরণে প্রণাম করি। আজ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ প্রচারক আচার্য্য সাধু সাধ্বীগণকে প্রণাম করি; তাঁদের প্রীতির যোগ অনুভব করি। তাঁরাও এই মহোৎসবে নিমন্ত্রিত। এই ব্রহ্মোৎসবে সক্রেটিস, মুসা, ঈশা, মহম্মদ, বুদ্ধ, কবির, নানক, চৈতন্য সকলেরই নিমন্ত্রণ; সকলেই জ্ঞান প্রেম ভক্তি সেবা ল'য়ে এই ব্রহ্মের মন্দিরে সমবেত। আজ তাঁহাদের সঙ্গে প্রীতির যোগ অনুভব করি, তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি। যাঁরা এখানে আস্তে পারেন নাই, দূর হইতে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতেছেন, তাঁদেরও স্মরণ করি, তাঁদের সঙ্গেও প্রীতির যোগ অনুভব করি। কেবল ব্রাহ্ম সমাজের লোকই নয়, অন্য সকল ভাই বোন যাঁরা আছেন, তাঁরাও যে ব্রহ্মের সন্তান, ব্রহ্মোৎসবে তাঁহাদেরও যে নিমন্ত্রণ; তাঁরাও যে আমাদের ভাই বোন। তাঁদেরও প্রীতির সঙ্গে স্মরণ করি।

আজ এই ব্রহ্মের মহোৎসবে, তাঁরই নিমন্ত্রণে, কেহই দূরে থাকিবেন না। সকলে এসে ব্রহ্মের সিংহাসনতলে বসিয়া তাঁর নাম গান ক'রে ধন্য হই।

এই সম্বৎসরে কত লোকের প্রাণের উপর দিয়া কত সংগ্রাম গিয়াছে! কত জনে প্রিয়জন হারাইয়া ব্যথিত হৃদয় লইয়া এসেছেন! কত জনের অশ্রুজলে বক্ষ ভেসে যাচ্ছে। কত দুঃখ দৈন্য, কত বেদনাই তাদের! বলি, ভাই বোন সকল, তোমরা এই ব্রহ্মের উৎসবে এস, দূরে থেক না; তাঁর করুণায় যে নূতন জীবন পাবে। সকল দুঃখের অবসান হবে, যাদের হারাইয়াছ, তাদের যে তাঁরই মধ্যে প্রাপ্ত হইবে। তুমি দীন হীন কাঙ্গাল, তুমি পাপে প'ড়ে আছ, তুমি সংগ্রামে ক্ষত বিক্ষত হয়েছ? তোমাকেও তিনি আহ্বান করেছেন।

শূন্য হৃদয় ল'য়ে নিরাশায় পথ চেয়ে
বরষ কাহার কাটিয়াছে,
এস গো কাঙ্গাল জন, আজি তব নিমন্ত্রণ
জগতের জননীর কাছে।
কা'র অতি দীন হীন বিরস বদন,
(ওগো) ধূলায় ধূসর মলিন বসন,
দুঃখী কে বা আছ, শুন গো বারতা,
ডেকেছেন তোমাদেরও জগতের মাতা।

তুমি দুঃখী, পাপী, আপনাকে হীন মনে করিতেছ। ব্রহ্মের উৎসবে তোমারও যে নিমন্ত্রণ! করুণাময় দেবতা তোমাকেও যে ডেকেছেন। এই সেই স্থান যেখানে নিরাশায় আশা, দুঃখে শান্তি, শোকে সান্ত্বনা, সংগ্রামে বল পাওয়া যায়। তবে আজ আমরা ব্রহ্মের ডাকে জাগ্রত হই, অসত্য হইতে সত্যেতে জাগ্রত হই, অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে জাগ্রত হই, মৃত্যু হইতে অমৃতে জাগ্রত হই, অপ্রেম হইতে প্রেমে, নিরাশা হইতে আশাতে জাগ্রত হই। আজ প্রেম ল'য়ে, আশা ল'য়ে, তাঁর করুণায় নির্ভর ক'রে, অসহায়ের সহায় যিনি, করুণার প্রস্রবণ যিনি, তাঁর চরণে পতিত হই। তাঁর নাম আমাদের সম্বল। ব্রহ্মনাম মধুর নাম, ঐ নাম গেয়ে গেয়ে, আমরা উৎসব-মন্দিরে প্রবেশ করি। দীন হীন কাঙ্গাল আমরা, অশ্রু জল ফেল্তে

কেঁদুতে তাঁর মন্দিরে প্রবেশ করি। ঐ যে তিনি ডাকছেন; ঐ যে জগতের সাধু সাধ্বী নর নারীগণ, ঐ যে ভক্ত জ্ঞানী সেবকগণও আমাদিগকে আলিঙ্গন ক'রে নিতে এসেছেন। আমরা ব্রহ্মের নাম নিয়ে, উৎসব-মন্দিরে প্রবেশ করি।

উপাসনান্তে তিনি যে উপদেশ প্রদান করেন তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল:—

প্রেমের নদী নামিল ধরায়,
তোরা কে যাবি রে আয় রে আয়।
দেখ, দয়াল ব'লে, প্রেমের জলে, পাপী তাপী ভেসে যায়;
এমন সুযোগ ছেড় না, তোমরা দেরী করো না,
গেল বেলা, ক'রে হেলা, সময় হ'লো না;—
ঐ নদীর জলে গা ভাসালে, অকূলে কূল পাপী পায়।
একবার পড় ঐ টানে, শক্তি পাবে রে প্রাণে,
অনায়াসে যাবে ভেসে ব্রহ্ম সদনে;
ঐ প্রেম-সলিলে স্নান করিলে, পাপের জ্বালা দূরে যায়।
ব'সে ভাব কি কূলে, সময় গেল যে চ'লে,
জাতি কুলের বাঁধন দড়ি দাও না খুলে,
গেয়ে নামের সার, নর নারী, ভেসে সবে যাই ত্বরায়।

প্রেমময়ের প্রেমের নদী আজ ধরায় নেমে এসেছে। এই মহোৎসবে, ব্রহ্মোৎসবে, তাঁর করুণার স্রোত প্রবাহিত হইবে; কত পাপ তাপ, শোক সন্তাপ ভেসে যাবে। মানুষ তাঁর করুণা পেয়েও তাহা ভু'লে যায়, সংসারের জাল জঞ্জালে জড়িত হয়। কত বার যে কত ভাবে তিনি মোহ-নিদ্রা ভেঙ্গে দিতে চান, কত ভাবে যে তিনি এক একবার এসে প্রাণ স্পর্শ করেন! উৎসবে ভক্ত জনের সমাগমে, ব্যাকুল আত্মাগণের পুণ্য সম্মিলনে, তাঁর প্রেমের বন্যা নেমে আসে; যেখানে দশটি ব্যাকুল আত্মা তাঁর নামে মিলিত হয়, সেখানে তাঁর প্রেমের ধারা নেমে আসে। কতবার উৎসবে তাঁর প্রেমের স্পর্শ অনুভব করেছি। কিন্তু উৎসবও শেষ হলো, প্রাণও শুকিয়ে গেল; জাগ্রত প্রাণ আবার নিদ্রিত হলো। তাই এই যে উৎসবে তাঁর করুণা-স্রোত প্রবাহিত হবে, আনন্দ-রস-ধারা বহিয়া যাইবে, তা যেন ধ'রে রাখ্তে পারি। এখানে উপাসনা হবে, বক্তৃতা হবে, সঙ্গীত সংকীর্ত্তন হবে, আলোচনা হবে; কত বন্ধু জনের দর্শনলাভ হবে। ইহাতে একটা আনন্দ আছে, সুখ আছে। কিন্তু এই সকলের ভিতরে জীবনের দেবতা যিনি তাঁকে দেখ্তে হবে, তাঁর বাণী শুন্তে হবে; জীবনের লক্ষ্য কি তাহা ভাল ক'রে হৃদয়ঙ্গম ক'রে, সেইটি যাতে সিদ্ধ হয়, তজ্জন্য নূতন ভাবে সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

আজ উৎসবের দ্বারে দাঁড়াইয়া পরম দেবতার চরণে বসিয়া কত কথা মনে হইতেছে! এ কেবল আমার জীবনের কথা নয়। সকলে ভাবিয়া দেখুন, কি ভাব লইয়া, কি আদর্শ লইয়া, এই পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেছিলাম। ভগবানের দর্শন লাভ, তাঁর স্পর্শ অনুভব, তাঁর সঙ্গে প্রীতি যোগে যুক্ত হইয়া তাঁরই প্রিয় কার্য্য সাধন, মানবের কল্যাণ-সাধন, ইহাই ত জীবনের লক্ষ্য ছিল। জীবনের উষাকালে কি মধুর সঙ্গীত শুনিয়া, কি প্রাণমোহনকারী আহ্বান শুনিয়া, ছুটিয়া এসেছিলাম,

সে বাণীর পরশ পেয়ে, নারনারী আসে ধেয়ে,
সঁপিবারে জীবন যৌবন রে।

এ কথা কি সত্য নহে? তোমার জীবনে, আমার জীবনে, কি ইহার সাক্ষ্য দিতে পারব? কত সুখের আশা, কত স্বার্থ-চিন্তা, কত আত্মীয় স্বজনের প্রীতি, কত পদ মানের আকাঙ্ক্ষা, সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া ঐ বাণী শুনে, ঐ মনোমুগ্ধকর সঙ্গীত শুনে, ছুটে এসেছি। ভেবেছিলাম, এ জীবন ধন্য হবে, কৃতার্থ হবে; পরমেশ্বরের স্পর্শ পেয়ে, তাঁকে প্রাণে দেখে, তাঁর বাণী শুনে ধন্য হব। ভেবেছিলাম, দেশের লোক, পৃথিবীর লোক, এই সুন্দর পরিত্রাণপ্রদ ধর্ম্মের শীতল ছায়াতে এসে তৃপ্তিলাভ করবে। ভেবেছিলাম, মানুষ সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে সাক্ষাৎ ভাবে হৃদয়মন্দিরে ভক্তি ও প্রীতি দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া কৃতার্থ হইবে; ভাবিয়াছিলাম মানুষ মনুষ্যত্বের অধিকার লাভ করিবে, আর মানুষ মানুষকে চাপিয়া রাখিবে না, মানুষের উন্নতিতে বাধা দিবে না। তুমি শূদ্র, তুমি নারী, তুমি কৃষ্ণাঙ্গ, এখানে তোমার অধিকার নাই; জ্ঞানে ধর্ম্মে তোমার অধিকার নাই। তুমি অস্পৃশ্য, উচ্চ বর্ণের সঙ্গে তোমার বসিবার অধিকার নাই। তুমি নারী, গৃহকোণে তোমার বাস, উচ্চ শিক্ষায় তোমার অধিকার নাই, স্বাধীন ভাবে চলিতে তোমার অধিকার নাই। তুমি কৃষ্ণকায়, শ্বেতাঙ্গের নিকটে বাস করিতে, তার সমান অধিকার পেতে, তোমার দাবী নাই; তুমি দুর্ব্বল সবলের উৎপীড়ন তোমার সহিয়াই যাইতে হইবে। ভাবিয়াছিলাম এই অধর্ম্মকর অসাম্য শীঘ্রই দূর হইবে; ভাবিয়াছিলাম, মানুষ, যেখানে দুঃখ, যেখানে ক্লেশ, যেখানে রোগ শোক পাপ তাপ, সেখানেই যাইয়া প্রাণ ঢালিয়া দিবে; পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য হইবে; মানুষ মানুষকে হাত ধরিয়া তুলিবে। ভাবিয়াছিলাম, এই ব্রাহ্মসমাজ এক ভ্রাতৃমণ্ডলী, এক ধর্ম্মমণ্ডলীতে পরিণত হইবে। এখানে সকলেই ঈশ্বরপ্রেম দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া, এক দিকে তাঁহাকে ভক্তির অর্ঘ্য প্রদান করিবে, অপর দিকে মানবের সেবাতে আপনাকে উৎসর্গ করিবে। জীবনের উষা-কালে এইরূপ স্বপ্ন দেখিতাম, এইরূপ আদর্শ কল্পনা করিতাম। এই স্বপ্ন, এই আদর্শ, যে কতক পরিমাণে সত্য হয় নাই, তাহা বলিতে পারি না। জগতে কি এক মহা পরিবর্ত্তন চলিতেছে! কি এক মঙ্গল আদর্শের দিকে মানব সমাজ জ্ঞাতসারে অজ্ঞাতসারে অগ্রসর হইতেছে! তুমি আমি দেখিতেছি হিংসা দ্বেষ অত্যাচার উৎপীড়ন, ভাই ভাইয়ের রক্তপাত করিতেছে, একজন অপরের সমস্ত আত্মসাৎ করিতেছে, এক জাতি অপর জাতিকে ধ্বংস করিতেছে। কিন্তু দিব্য দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখ, এসব সত্ত্বেও বিধাতার মঙ্গলবিধান পূর্ণ হইতেছে; তাঁহার নূতন স্বর্গ রাজ্য রচিত হইতেছে, মঙ্গল আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে

তুমি আমি নিশ্চয়ই তাঁহার যন্ত্র; কিন্তু ইচ্ছাপূর্ব্বক যদি আপনাদিগকে সমর্পণ করিতে পারি তবেই মঙ্গল। তাই দেখিতেছি অনেক দিন হইতে অনেকের মনে জাগিয়াছে যে,

আমরা যে আদর্শ দেখিয়া ছুটিয়া আসিয়াছিলাম, যেরূপ প্রেম-পরিবার গঠন করিবার জন্য আশা করিয়াছিলাম, তাহা সম্পূর্ণ সফল হয় নাই; যেন খাটিতে খাটিতে, সংগ্রাম করিতে করিতে, আমরা অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছি; এখনও অনেক পথ বাকী। ঐ লক্ষ্য স্থান, আনন্দময় ধাম, দূরে; ঐ তাহার উজ্জ্বল আলোক দেখা যাইতেছে! আমরা এখানেই অবসন্ন হইয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছি।

যদি আলস ভরে, আমি বসি পথের ধারে,
যদি ধূলায় আসন পাতি সযতনে,
তবে সকল পথ বাকী আছে, এই কথা রয় মনে;
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই, শয়নে স্বপনে।

এই যে জড়তা, এই যে অবসাদ, এই যে অবসন্ন ভাব, ইহা মৃত্যু ডাকিয়া আনে; এই ভাব দূর করতে হবে। ঐ

অনন্তের শ্রীমন্দিরে বাজিতেছে বাজনা,
ডাকিছে মধুর ডাকে, চল চল চল না;
অনন্তের উপাসনা, অনন্তের সাধনা,
যোগমগ্ন যোগী জনে হারাইয়ে আপনা;
আমরাও তাঁদের সনে, বসি তাঁর শ্রীচরণে,
যোগানন্দে ব্রহ্মনামে ভুলিব সব যাতনা;
জয় ব্রহ্ম জয় ব'লে ঘুচাব সব কামনা।

কেমন করিয়া এই মৃত্যু হইতে অমৃতে, এই অন্ধকার হইতে আলোকে, এই অসত্য হইতে সত্যে উপস্থিত হইতে হইবে, সকলের মধ্যেই এই চিন্তা জাগ্রত হইয়াছে। বর্ত্তমান অবস্থায় আর থাকা যায় না। একটা ছট্‌ফটানি উপস্থিত হইয়াছে। একটা অশান্তি, একটা অস্থিরতা, একটা অসন্তোষ, একটা তীব্র আকুলতা সকলেই অনুভব করিতেছি। প্রবীণ যাঁরা কেবল যে তাঁরাই অনুভব করিতেছেন, তা নয়; ঐ যুবক যাঁরা, প্রাপ্তবয়স্ক যাঁরা, নারী যাঁরা, তাঁরাও একটা অস্থিরতা, একটা অশান্তি অনুভব করিতেছেন,—যেন কি একটা আদর্শ দূরে দেখিতেছেন, প্রাণ আকুল হইয়া উঠিয়াছে।

এই পবিত্র ব্রহ্মোৎসব নব জাগরণের সুযোগ এনে দিয়েছে। তিনি যেন বলিতেছেন—উত্তিষ্ঠত জাগ্রত—উঠ জাগ।

প্রতি বৎসরই ত উৎসব আসে। কত বার ত কত ভাবে তিনি এসে জড়তা ভেঙ্গে দেন, নূতন জীবনের আভাস দেন। তবে আবার আমরা নিদ্রিত হ'য়ে পড়ি কেন? এই মধুর ভাব ধ'রে রাখ্‌তে পারি না কেন? যদি এই নব জাগরণের ভাব ধ'রে রাখ্‌তে চাই, তবে আমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে ঐ প্রেমের স্রোতে ছেড়ে দিতে হবে। দড়া দড়ির বাঁধন ছিন্ন ক'রে জীবন-তরণী ব্রহ্মপ্রেমের স্রোতে ভাসিয়ে দিতে হবে। তুমি যদি তরণীখানি খুঁটার সঙ্গে বেঁধে রাখ, তবে যতই স্রোত আসুক, অনুকূল বায়ু প্রবাহিত হউক, যতই দাঁড় টানিতে থাক, তরণী চলিবে না। যেখানে ছিলে সেখানেই থাকবে। আজ যে করুণার স্রোত নেমে এসেছে, এ জীবন-প্রদ প্রবাহে নির্ভয়ে, ঈশ্বরে বিশ্বাস ক'রে, তরণী ছেড়ে দাও। ঐ সুখের বন্ধন, ঐ স্বার্থের বন্ধন, ঐ ধন মান পদের বন্ধন, ঐ আরামের বন্ধন, ঐ বিলাসবিভ্রমের বন্ধন, সব দড়া দড়ি ছিন্ন ক'রে দাও।

ব'সে ভাব কি কূলে, সময় গেল যে চ'লে,
জাতি কুলের বাঁধন দড়ি দাও সব খুলে;
গেয়ে নামের সারি, নর নারী ভেসে সবে যাই ত্বরায়।

মুক্ত প্রাণ ল'য়ে, সব বন্ধন ছিঁড়ে, তাঁর নাম গেয়ে চল। তিনি যা দিবেন, যে অবস্থায় রাখ্‌বেন, সন্তুষ্ট চিত্তে তাহা গ্রহণ কর। তাঁর বিধান সকলকেই ত মান্‌তে হয়। কিন্তু তুমি তাঁর বিধান প্রেমের দান ব'লে মাথা পেতে নিও। তিনি যদি দুঃখ দেন, বেদনা দেন, অপমান নির্য্যাতন দেন, তাহাও তাঁর প্রেমের দান ব'লে মাথা পেতে নিবে। যদি শোকের পর শোক আসে, যদি প্রিয়জন একটি একটি ক'রে চলে যায়, সে শোকের ভিতরেও তাঁর করুণ হস্ত দেখে তাহা গ্রহণ করতে হবে। তিনি যে ইঙ্গিত করেন, যে বাণী শুনান, প্রাণপণে তা পালন করতে হবে। আমার ধন গেল, মান গেল, প্রতিপত্তি গেল, এ ভাব্‌লে চল্‌বে না। আমার সব দিক ঠিক থাক্‌বে, অথচ তাঁর প্রেমে ভেসে যাব, তা ত হয় না। নির্ভয়ে তাঁর প্রেম-সলিলে ঝাঁপ দিয়ে পড়্‌তে হয়। চড় চড় ক'রে মোহের বাঁধনগুলি ছিঁড়্‌বে, প্রাণে খুব ব্যথা লাগ্‌বে, কিন্তু উপায় নাই; তাঁকে যদি চাও, তবে এ সব ছিন্ন করতে হবে; পরে তিনি যে ভাবে যাহা দিবেন, তাহাই গ্রহণ করতে হবে।

উৎসবে তাঁর প্রেমের লীলা যদি দেখ্‌তে চাও, তাঁর প্রেমের স্পর্শ যদি পেতে চাও, নূতন ভাবে যদি জীবন গঠন করতে চাও, যে স্বর্গের দৃশ্যের স্বপ্ন দেখেছিলে, তাহা নিজের জীবনে ও মানব-সমাজে সফলতা লাভ করেছে, তা যদি দেখ্‌তে চাও, তবে প্রেম নিয়ে, ঈশ্বরপ্রেমপ্রসূত মানব-প্রেম নিয়ে, ঐ উৎসবে প্রবেশ করতে হবে।

সেণ্ট পলের লিখিত চিঠিতে পড়িয়াছিলাম—

Let love be without dissimulation. Abbor that which is evil; cling to that which is good.

Be kindly affectioned one to another with brotherly love, in honour preferring one another.

Bless them that persecute you; bless and curse not.

Rejoice with them that do rejoice and weep with them that weep.

Be of the same mind one toward another.

Romans.

Now I beseech you brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, and that there be no divisions among you; but that ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment.

Corinthians.

সেণ্ট পল রোম গ্রীস প্রভৃতি নানা দেশে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের পরিত্রাণের বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি সে সকল স্থান হইতে

ফিরিয়া আসিয়াও চিঠিপত্র দ্বারা তাহাদিগকে অনুপ্রাণিত করিতেন, এক হৃদয় হইয়া ধর্ম্ম সাধন করিতে, ধর্ম্ম প্রচার করিতে উপদেশ দিতেন। তিনি রোমানদিগকে সম্বোধন করিয়া এক স্থানে বলিয়াছেন ;—

"অকপট হৃদয়ে পরস্পরকে প্রীতি কর ; যাহা মন্দ তাহা ঘৃণা কর, যাহা উৎকৃষ্ট তাহাতে আসক্ত হও। পরস্পরের প্রতি তোমাদের প্রেম জাগুক, অনুরাগ বাড়ুক, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা হউক।

যাহারা তোমাদের উৎপীড়ন করে, তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর, কখনও অভিসম্পাৎ করিও না।

যাহারা আনন্দ ভোগ করে, তাদের সঙ্গে আনন্দ কর ; যারা ক্রন্দন করে, তাদের সঙ্গে সহানুভূতি করিয়া অশ্রুমোচন কর।

তোমরা পরস্পর এক হৃদয় হও।"

তিনি করিন্থবাসীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন ;—

"ভ্রাতৃগণ, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে তোমাদিগকে অনুরোধ জানাইতেছি, তোমাদের বাক্য এক হউক, তোমাদের মধ্যে যেন বিরোধ উপস্থিত না হয়, তোমরা যেন এক মন এক প্রাণ হইয়া সম্মিলিত থাক।"

প্রেমই ধর্ম্মজীবনের ভিত্তি। আর সব মৃত্যুর সঙ্গে চ'লে যাবে, এক প্রেমই অবিনশ্বর হ'য়ে সঙ্গে থাকবে। প্রেমের বিয়োগ নাই, প্রেম নূতন দৃষ্টি দেয়, নূতন আকাঙ্ক্ষা জাগায় ; প্রেম হৃদয়কে প্রশস্ত করে, পবিত্র করে। কাহারও প্রতি অপ্রেম থাকিলে ঈশ্বরের পূজা করা যায় না, তাঁর মন্দিরে প্রবেশ করা যায় না। তাই যীশু খৃষ্ট বলেছেন, 'যদি তুমি পূজার উপকরণ লয়ে মন্দিরে এসে থাক, আর তখন যদি মনে পড়ে কাহারও সঙ্গে তোমার মনোমালিন্য আছে, তবে পূজার উপকরণ রেখে যাও। আগে তার সঙ্গে মিলন ক'রে এস, তবে অর্ঘ্য প্রদান করো, নতুবা তোমার পূজা গৃহীত হইবে না।' কাহার প্রতি বিরুদ্ধ ভাব থাকিলে নিজ উপাসনা হয় না। ঈশ্বরে প্রীতি যেমন উপাসনার এক অঙ্গ, মানবপ্রীতিও অপর অঙ্গ। মনকে প্রেমে পূর্ণ করিতে হইবে। তাই এই যে উৎসব-মন্দিরে আমরা প্রবেশ করিব, এখানে কেবল যাঁরা আসিবেন, তাদের প্রতি নয়, সকলের প্রতি প্রেম থাকা প্রয়োজন। এই বিচিত্রতাময় জগতে মানব প্রকৃতিতেও বিচিত্রতা আছে। সকলে এক ভাবে চলে না, এক রকম কাজ করে না। চক্ষু শুনিতে পায় না, কর্ণ দেখিতে পায় না। চক্ষুকে যদি কর্ণ বলে তুমি শুন্‌তে পাও না কেন, আবার কর্ণকে যদি চক্ষু বলে তুমি দেখ্‌তে পাও না কেন, তা হ'লে কিরূপ হয়? অথচ মানবের পক্ষে চোখ কাণ নাক হাত পা সকলেরই প্রয়োজন আছে। কত বর্ণের ফুলে,কত স্বাদের ফলে,ধরা সুশোভিত! মানুষ সকলে এক প্রকৃতির হবে না। সকলে এক রকম কাজ করে না ; একটু উদার ভাবে, একটু প্রেমের চক্ষে দেখ, দেখ্‌বে সকলেই আপনার মতে, আপনার ভাবে, সেই "একের"ই কাজ কচ্ছেন, তাঁরই আদর্শ রচনাতে জ্ঞাতসারে কি অজ্ঞাতসারে সাহচর্য্য কচ্ছেন; সুতরাং তোমার মতের সঙ্গে মিলিল না, তোমার প্রণালীতে কাজ করলো না, তাই ব'লে তার প্রতি বিরূপ হইও না। সেও যে একই পিতার সন্তান ; তাঁরই প্রেমধারা তোমার আমার সকলের প্রাণে প্রবাহিত। আমরা ত গাহিয়া থাকি—

> পিতার দুয়ারে দাঁড়াইয়া সবে ভুলে যাও অভিমান
> এস ভাই, এস প্রাণে প্রাণে আজি, রেখো না রে ব্যবধান।
> সংসারের ধূলা ধুয়ে ফেলে এস, ল'য়ে মুখে এস হাসি,
> হৃদয়ের সনে ল'য়ে এস ভাই, প্রেম-ফুল রাশি রাশি।
> নীরস হৃদয়ে, আপনা লইয়ে, রহিলে তাঁহাকে ভুলে,
> অনাথ জনের মুখ পানে আজি, চাহিলে না মুখ তুলে,
> কঠোর আঘাতে ব্যথা পেলে কত, ব্যথিলে পরের প্রাণ,
> তুচ্ছ কথা নিয়ে বিবাদে মাতিয়ে দিবা হ'ল অবসান।
> তাঁর কাছে এসে তবুও কি আজ ভুলিবে না আপনারে?
> হৃদয় মাঝারে ডেকে নিয়ে তাঁরে, হৃদয় কি খুলিবে না?
> লইব বাঁটিয়া সকলে মিলিয়া প্রেমের অমৃত তাঁরি,
> পিতার অসীম ধন রতনের সকলি অধিকারী।

তাই বলি, এই উৎসবে উদার হৃদয় নিয়ে এস, প্রেম নিয়ে এস ; ক্ষমা চাও, ক্ষমা কর। সকলকে কাজ করতে দাও। কেবল এই নয়, যে তোমাকে আঘাত করে, যে বেদনা দেয়, যে অনিষ্ট করে, সেও যে তোমারি ভাই ; তাকেও তুমি কোলে টেনে লও। তারও কল্যাণ কর, তারও মঙ্গল চিন্তা কর। এই প্রেম না থাকলে ভগবানের চরণে উপস্থিত হওয়া যায় না। তাঁকে ত প্রীতি করতেই হবে, কিন্তু তাঁর সন্তান যারা, তাঁর প্রিয়জন যারা, তাদেরও হৃদয়ে স্থান দিতে হবে। যে দুর্ব্বল তাকে ভাই ব'লে তুলে ধরতে হবে, যে বিপথে গিয়াছে, তাকে অশ্রুসিক্ত হৃদয়ে বক্ষে টেনে আন্‌তে হবে। এই প্রেম হৃদয়ে ল'য়ে উৎসব-মন্দিরে প্রবেশ করি।

তিনি আমাদের প্রভু, আমরা সকলেই তাঁর দাস। তাঁর দাস হ'য়ে বিনীত ভাবে কাজ ক'রে যাব। তাঁর নাম গাইতে গাইতে সংসারপথে চলিব। আমাদের শক্তি কোথায়? যাহা কিছু তাহা ত তাঁহার প্রেমের দান ; সুতরাং সব অহঙ্কার অভিমান বিসর্জ্জন দিয়ে, তাঁর চরণে আপনাকে বিলিয়ে দিয়ে, আত্ম-বিলোপ ক'রে তাঁর কাজ করতে হবে।

> তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা
> অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।

হরি নাম কীর্ত্তন কে করতে পারে? যে তৃণ হইতেও আপনাকে হীন মনে করে, তরু হইতেও সহিষ্ণু, যে আপনি মান চায় না, অপরকে সম্মান করে, সে-ই হরি নাম কীর্ত্তন করবার উপযুক্ত।

Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of Heaven—দীন আত্মা যারা তাঁরাই ধন্য, কারণ স্বর্গরাজ্য তাঁদেরই। উন্নত মস্তক ল'য়ে তাঁর মন্দিরে প্রবেশ করা যায় না ; ধনের অভিমান, জনের অভিমান, পদ মানের অভিমান, বিদ্যা বুদ্ধির অভিমান,—এমন কি দারিদ্র্যেরও এক প্রকার অভিমান আছে, ধর্ম্মেরও অভিমান আছে, দীনতারও অভিমান আছে—সব পরিত্যাগ ক'রে, দীন হীন কাঙ্গাল হ'য়ে, তাঁর উৎসব-মন্দিরে প্রবেশ করতে হবে।

আপনার গৌরব নয়, অপরের গৌরব, প্রভুর গৌরব, কীর্ত্তন করবে। রূপ গোস্বামী সম্বন্ধে এক গল্প আছে। এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত তাঁর সঙ্গে বিচার করতে এসেছিলেন। রূপ গোস্বামী মহা পণ্ডিত লোক; কিন্তু তাঁর পাণ্ডিত্যের অভিমান ছিল না। তিনি বিচার ক'রে জয় লাভের প্রয়াসী ছিলেন না। তিনি বিচার করতে অস্বীকার করলেন; তখন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত বললেন তবে আপনি আমাকে জয়পত্রিকা লিখে দিন, আপনি পরাজিত হলেন লিখে দিন, রূপ গোস্বামী তাহাই করিলেন। পণ্ডিত ঐ জয়পত্রিকা লইয়া বাহির হইয়াছেন, তখন জীব গোস্বামীর সঙ্গে দেখা। তাঁহাকে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত বললেন, এই দেখ রূপ গোস্বামীকে আমি বিচারে পরাস্ত ক'রে এসেছি। জীব গোস্বামী বুঝলেন সব, তাঁর সঙ্গে সেখানেই তিনি বিচার আরম্ভ ক'রে পণ্ডিতকে পরাস্ত করলেন; উল্লাসের সহিত রূপ গোস্বামীর কাছে এসে জয়ের বিবরণ বললেন। রূপ গোস্বামী অত্যন্ত দুঃখিত হ'য়ে বললেন 'তোর এখনও বৈষ্ণব হওয়ার উপযুক্ততা হয় নাই; এখনও জয়ের আকাঙ্ক্ষা? যা, তোর আর আমি মুখ দর্শন করব না।' এই ব'লে জীবকে তাড়িয়ে দিলেন, জীব অনুতপ্ত হৃদয়ে চ'লে গেলেন। অনেক দিন অনুতাপে কাটিল, পরে রূপ গোস্বামী তাকে গ্রহণ করেন। এই গল্পটিতে দুইটি বিষয় শিক্ষা লাভ করি। এক প্রকৃত বৈষ্ণব হ'তে হ'লে, প্রকৃত ঈশ্বরভক্ত হ'তে হ'লে কতটা আত্মবিলোপ করতে হয়, অভিমান অহঙ্কার বর্জ্জন করতে হয়, তাহা দেখা গেল। আর জীব গোস্বামীর আচরণ দ্বারা দেখা গেল, গুরুজনের প্রতি কতটা শ্রদ্ধা তাঁর ছিল। এই গুরুতর দণ্ড বিনা আপত্তিতে তিনি মস্তক পাতিয়া লইলেন। গীতাকার যে বলেছেন, শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং, তাহা কত সত্য। গুরুজনের প্রতি, সাধু ভক্তদের প্রতি, সত্যের প্রতি, শ্রদ্ধা না থাকিলে ধর্ম্ম লাভ ত হয়ই না, ব্যবহারিক জ্ঞানও লাভ হয় না।

ধর্ম্মগ্রন্থসকলে এইরূপ শ্রদ্ধার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, আর ঐ দীনতা বিনয় আত্মবিলোপ দেখা যায়। চৈতন্যদেব অপরের উপকারের জন্য নিজের কৃত ন্যায়ের টীকা গঙ্গা বক্ষে নিক্ষেপ করিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কথা শুনেছি। তিনি আত্মচরিতে ১৮ হইতে ৪১ বৎসর পর্য্যন্ত জীবনের বৃত্তান্ত লিখেছেন। আর লিখলেন না কেন? তিনি নাকি বলেছিলেন, এর পরে আমার কার্য্য নয়, কেশবের কার্য্য; আর অতঃপর লিখতে গেলে কেশবের কার্য্যের প্রতিবাদ ক'রে আমার আত্মসমর্থন করতে হয়। তাই তিনি ঐ স্থানেই পুস্তক শেষ করলেন। ধর্ম্মলাভ করতে যিনি চান, তাঁকে আত্মবিলোপ করতে হবে, অপরের সম্মান বাড়াতে হবে, সকলের প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করতে হবে ধৈর্য্যের সহিত সকল দুঃখ বেদনা অপমান সইতে হইবে। এই উৎসবেও ত আমাদিগকে নানা কাজ করতে হবে। সকলে এক রকম কাজ করবেন না। কেহ উপাসনা করিবেন, কেহ সঙ্গীত করিবেন, কেহ বক্তৃতা করিবেন, আবার কেহ অর্থ তুলিবেন, কেহ আনন্দবাজারে রান্নার বন্দোবস্ত করবেন, কেহ পরিবেশন করিবেন, কেহ মন্দিরে শৃঙ্খলা রক্ষা করিবেন। কত রকম কাজ! কোন্ ভাবে আমরা কাজ করব? ঈশ্বরের প্রীতি দ্বারা অনুপ্রাণিত হ'য়ে, তাতে আত্মসমর্পণ ক'রে, তাঁর কাজ ব'লে, তাঁর সেবা ব'লে, কাজ ক'রে যাব। কোনও কাজই ছোট নয়, সবই তাঁর প্রেমে অনুরঞ্জিত। সুতরাং পরস্পরে প্রেমে যুক্ত হ'য়ে কাজ ক'রে যাব। কারও কাজ ছোট কারও কাজ বড়, বলব না। আপনার গৌরব বাড়াতে যাব না, অপরের সমালোচনা করতে যাব না। সে যদি তার কাজ না করতেও পারে, আমি যেয়ে ভাইয়ের কাজ নিজে গ্রহণ করব। আমরা যে সব এক পিতার, এক মাতার সন্তান। প্রেমে হাত ধরাধরি ক'রে কাজ ক'রে যাব। অনেকে হয়ত অতিথিগণের সেবা করতে যেয়ে মন্দিরে সকল সময় আসতেও পারবেন না। তাঁরা যদি ঈশ্বরে প্রীতি রেখে সেবার কাজই ক'রে যান, তবে তাহাই তাঁদের নিকট পূজায় পরিণত হবে—তাঁরা ঈশ্বরের নাম করতে করতে কাজ ক'রে যাবেন। যাঁরা মন্দিরে আসিবেন, উপাসনা বক্তৃতা আলোচনাতে আসিবেন, তাঁদেরও কর্ত্তব্য আছে, দায়িত্ব আছে। তাঁহারা প্রেম দিয়া, ব্যাকুলতা দিয়া, নিষ্ঠা দিয়া, সাহায্য করিবেন। তাঁদের প্রীতি, তাঁদের ব্যাকুল ভাব, উপাসনা বক্তৃতা আলোচনা সরস করিবে। তাঁরা যেন কৌতুহল পরবশ হ'য়ে, অথবা সমালোচনার ভাব ল'য়ে, উৎসবে যোগ না দেন। তাঁরা কিছু পাবেন, তাঁরাও কিছু দিবেন, এই ভাব ল'য়ে আসবেন। তাঁদের সরস ভাব, তাঁদের ব্যাকুলতা, সকলের প্রাণে সঞ্চারিত হবে।

তাই বলি এই যে মহোৎসবের আহ্বান এসেছে, এই যে ঈশ্বর-প্রেমের প্লাবন এসেছে, এই আহ্বান শুনে, এই প্লাবনে গা ভাসিয়ে দিয়ে, আমরা বলি,—

করুণা তোমার কোন্ পথ দিয়া কোথা নিয়ে যায় কাহারে,
আমি সহসা দেখিনু নয়ন মেলিয়া এনেছ তোমারি দুয়ারে।

তাঁর করুণা কা'কে কি ভাবে কোন ঘটনার ভিতর দিয়া, কোন্ অবস্থার মধ্য দিয়া, কোন্ সুখ কিম্বা দুঃখের মধ্যে, কোন্ সঙ্গীত কিম্বা কোন্ কথা অবলম্বন ক'রে, প্রাণ গলিয়ে দিবেন, নব জীবন দিবেন, প্রেমের দৃষ্টি খুলে দিবেন, তা' ত জানি না। আমরা তাঁর প্রেমের স্রোত ধ'রে রাখবার জন্য প্রস্তুত হই। তাঁর প্রেমে আত্মসমর্পণ করি, সব দড়াদড়ি ছিন্ন ক'রে, সব বাঁধন কেটে দিয়ে ঐ প্রেমের স্রোতে গা ঢেলে দেই; হৃদয়ে প্রেম ল'য়ে সকলের হাত ধ'রে ঐ প্রেমস্রোতে ভেসে যাই; আপনার অভিমান অহঙ্কার চূর্ণ ক'রে তৃণ অপেক্ষা নীচ হ'য়ে, বুকে প্রেম ও আশা ল'য়ে, প্রেমের স্রোতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি। শুদ্ধ চিত্তে, পবিত্র হৃদয়ে, শ্রদ্ধা সহকারে তাঁর প্রেম-মন্দিরে প্রবেশ করি। তা যদি না পারি, প্রাণ যদি শুষ্ক থাকে, হৃদয়ে যদি অপ্রেম থাকে, দীনতা যদি না আসে, চিত্ত যদি শুদ্ধ না হয়, বন্ধন ছিঁড়তে যদি না পারি, তবে কি নিরাশ হ'য়ে ফিরে যাব? তা নয়, তা নয়; ঐ শুষ্ক হৃদয় ল'য়েই তাঁর চরণে বসব,ঐ মলিন চিত্তেই তাঁর নাম গাহব, ঐ গর্ব্বিত মন ল'য়েই তাঁর চরণে প'ড়ে থাকব; হৃদয়ে যদি প্রেম না থাকে তবুও তাঁর চরণে প'ড়ে থাকব। তিনি যে দীননাথ, অগতির গতি, কাঙ্গালশরণ, পতিতপাবন। তিনি ভিন্ন যে আর গতি নাই। সরল চিত্তে, অভিসন্ধিবিহীন

হৃদয়ে, অনুতাপের অশ্রুজলে স্নাত হ'য়ে তাঁর চরণে বস্‌ব, চক্ষের জলে তাঁর চরণ ধৌত করব। দীননাথ অনাথশরণ ব'লে তাঁর চরণে লোটাব। প্রার্থনা—সরল প্রার্থনা—কর্‌বার ত অধিকার সকলেরই আছে। ভক্ত জনের সঙ্গে, শুদ্ধচিত্তদের সঙ্গে, ব্যাকুল আত্মাদের সঙ্গে, বস্‌বার যদি সৌভাগ্য না থাকে, দীন দঃখী যারা, মলিন বসন পরেছে যারা, সর্ব্বদা অশ্রুজলে সিক্ত হতেছে যারা, তাদের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে তাঁর নাম করব।

পিতা মোদের দয়ার নিধি, চরণ ধ'রে কাঁদি যদি
মনোবাঞ্ছা করিবেন পূরণ।

তাই আজ পাপী তাপী যে সে-ও আশা পেয়েছে। দয়াময় প্রেমময় বিধাতা আশা জাগিয়েছেন। তাঁর অপার করুণায় নির্ভর ক'রে, আশান্বিত প্রাণে, উৎসব দেবতার চরণে উপস্থিত হই। উৎসব আমাদের সফল হউক, জীবন পবিত্র হউক, তাঁর স্পর্শ পেয়ে, হৃদয় আসনে তাঁকে বসা'য়ে আমরা ধন্য হই, ধরাতে স্বর্গ অবতীর্ণ হউক।

২রা মাঘ (১৬ই জানুয়ারী) রবিবার—প্রাতে সংকীর্ত্তন ও উপাসনা। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র রায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশ নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

কাল উৎসবের উদ্বোধন হয়েছে। যে জাগেনি তাকে জাগ্‌বার জন্য ডাকা হয়েছে, যে জেগেছে অথচ জাগেনি, জেগেও ঘুমোচ্ছে, যেন অর্দ্ধজাগ্রত অর্দ্ধনিদ্রিত, ডাক শুনছে তবু যেন শুনছে না, ঘুম ভেঙ্গেছে কিন্তু ঘুমের ঘোর যেন যাচ্ছে না, নিদ্রা ও জাগরণ দুই-ই স্বপ্নের মতো চোখের উপর আনাগোনা কচ্ছে, তাকেও চোখ চেয়ে দেখ্‌বার জন্য, কান পেতে শুন্‌বার জন্য ডাকা হয়েছে। আর জেগেছে কিন্তু জাগার মতো জাগেনি, যে মোহের ঘোরে অচেতনের মত রয়েছে, কি যেন নেশাগ্রস্ত হ'য়ে বেহুঁস হ'য়ে আছে, কেমন যেন ভূতাবিষ্টের ন্যায় কি জানি কি শুনছে, কি দেখছে, এমনতর যে তাকেও ডাকা হ'য়েছে। 'আমার মধ্যে যেন আমি নই' এমনটি হ'য়ে না থেকে প্রকৃতিস্থ হ'য়ে, ঠিক সজাগ জ্যান্ত মানুষের মতো ভাল ক'রে দেখ্‌বার জন্য, মন দিয়ে শুন্‌বার জন্য, এইরূপই না ডাকা হয়েছে। আমরা ত সবাই সে ডাক শুনেছি, কিন্তু জেগেছি কি, ঠিক শুনেছি কি, আর যে টুকু শুনেছি তাই ধ'রে বেশ ক'রে চোখ মেলে চেয়ে কোন্‌খানে কি হালে আছি তা দেখেছি কি? ডাক যে শুনেছি, কার ডাক শুনেছি? আচার্য্যের ডাক? আচার্য্য কি নিজে ডেকেছিলেন? তিনি কি ব্রাহ্মসমাজের ডাক জানিয়েছিলেন, না আর কেউ তাঁকে দিয়ে ডেকেছিলেন? আচার্য্য ত দূরে ছিলেন, তিনি ত নিজে ব'য়ে এনে তাঁর ডাক আমাদের কানে পৌঁছিয়ে দেন নি। তিনি ত এক জায়গায় বসেছিলেন, ডাক্‌বার সময় জায়গা ছেড়ে ত একবারও উঠেন নি, তবে তাঁর ডাক কে এনে আমাদের কানে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন? আচার্য্য যে শুন্‌বার জন্য, দেখ্‌বার জন্য ডেকেছিলেন, তা কি যাঁকে দেখা যায় না, যিনি দেখা দেন না, তাঁকে দেখ্‌বার জন্য? যাঁকে শুনা যায় না, যিনি কথা বলেন না, তাঁকে শুন্‌বার জন্য? এক-খানা বইয়ে পড়েছিলাম মহাজনের উক্তি এই—ঈশ্বর মানবকে সৃষ্টি ক'রে বলেছিলেন, তুমি আমার সঙ্গে গূঢ় কথা বলিও, তা যদি না কর, তবে আমার প্রতি দৃষ্টি স্থাপন করিয়া থাকিও; তাহাও যদি না কর তবে আমার নিকট স্বীয় অভাব জ্ঞাপন করিও।' এ কি অলীক কথা? যে শুনে না, কথার উত্তর দেয় না, এমন জনের সঙ্গে গূঢ় কথা বল্‌তে হ'বে, এমন জনের নিকট অভাব জ্ঞাপন কর্‌তে হবে, যে দেখা দেয় না তার প্রতি দৃষ্টি স্থাপন ক'রে থাক্‌তে হবে? যাকে শুন্‌বার জন্য ডাকা হয়েছে, যার সঙ্গে গূঢ় কথা বল্‌বার জন্য বলা হয়েছে, সে জন কি মূকবধির, কথা বলে না, কথা শুনে না? এই উৎসবক্ষেত্রে এসে কা'কে দেখ্‌ব, কা'কে শুন্‌ব, কার কাছে প্রাণের কথা বল্‌ব? এখানে ত একটা মানুষের সভা দেখ্‌বার জন্য ডাকা হয় নি। আমরা কি জানি, আমরা কি বিশ্বাস করি, আমরা কি সত্যি বুঝি, প্রাণের মর্ম্মস্থলে অনুভব করি. যিনি উৎসবের পতি তাঁকে এখানে দেখ্‌ব, তাঁর কথা শুন্‌ব, যা আমাদের বল্‌বার আছে তাঁর কাছে বল্‌ব, তিনি ডেকেছেন, তিনি শুন্‌বেন, তিনি বল্‌বেন, তিনি দেখা দিবেন?

ঋষি বলেছেন, 'তিনি দ্রষ্টব্য, তিনি শ্রোতব্য'। তিনি দ্রষ্টব্য, কেন না তিনি স্বপ্রকাশ; তিনি শ্রোতব্য, কেন না তিনি বাঙ্ময়, তিনি কথা বলেন। তিনি কি শুধু ঋষির কাছে স্বপ্রকাশ, ঋষির কাছে বাঙ্ময়? স্বপ্রকাশ যিনি তিনি ত সর্ব্বদা সর্ব্বত্র দেখা দিয়েই রয়েছেন। আমরা দেখ্‌ছি কি? এই মণ্ডলীর মধ্যে শুধু মানুষ দেখ্‌ছি, না, তাঁকেও দেখ্‌ছি? বাঙ্ময় যিনি তিনি ত অবিশ্রান্ত কথা বল্‌ছেন, কথা বলাইতো তাঁর কাজ। রাজর্ষি জনক উপবনে ভ্রমণ কর্‌তে কর্‌তে শুনেছিলেন অদৃশ্য সিদ্ধগণ গান কচ্ছেন, 'অজস্রমুচ্চরন্তং স্বং তমাত্মানমুপাস্মহে'—যিনি 'আমি আছি' এই কথা অজস্র উচ্চারণ কচ্চেন আমরা সেই পরমাত্মাকে উপাসনা করি। আমরা কি এই উৎসবক্ষেত্রে এসে বল্‌তে পারি, 'আমি আছি' এই কথা যিনি অজস্র বল্‌ছেন আমরা তাঁকে উপাসনা করি? আমরা তাঁর অজস্র-উচ্চারিত বাণী শুনছি কি, আগে কখনও শুনেছি কি, কাল উদ্বোধনে শুনেছি কি, পরে যে শুনব তা বিশ্বাস করি কি? যত দেখা শুনা তা কি পুরণো কালের ঋষিদের আর সিদ্ধদের? এখন কি তিনি অদৃশ্য হ'য়ে গেছেন? তবে কা'কে দেখ্‌বার জন্য, কা'কে শুন্‌বার জন্য এসেছি? ঐ যে শুনেছি এক বনের মধ্যে ঈশ্বর মূসাকে বলেছিলেন, "যার নাম 'আমি আছি' আমি সেই, * * * 'আমি আছি' নামই আমার শাশ্বত নাম"। কেবল কি তিনি মূসার সঙ্গেই কথা বলেছিলেন? তাঁর বুঝি একটাই পেটের ছেলে? আর সব পিঠের ছেলে। আমাদের বুঝি তিনি কেউ নন? বালক পার্কার্ বাগানে কূর্ম্মকে মার্‌তে যেয়ে শুন্‌লো প্রাণের ভিতর থেকে কে তাকে নিষেধ কচ্ছে, মাকে যেয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লো 'মা কে আমাকে নিষেধ কচ্ছিল?' মা বল্লেন, 'লোকে ইহাকে বিবেক বলে, আমি বলি ইহা ঈশ্বরের বাণী'। গুরু নানক শিষ্যের আস্তিক্যদৃষ্টি পরীক্ষা কর্‌বার জন্য বল্‌লেন, যাও এই পক্ষিশাবককে এমন জায়গায় যেয়ে হত্যা ক'রে নিয়ে এসো যেখানে কেউ দেখ্‌তে পাবে না। শিষ্য

ঘুরে ঘুরে গৃহ, অরণ্য, দিবালোক, তামসী রজনী, সব পরীক্ষা ক'রে গুরুর কাছে ফিরে এসে বল্‌লো, কেউ দেখ্‌তে পায় না এমন জায়গা ত পেলাম না, যেখানে যাই সেইখানেই ত একজন চেয়ে আছেন। বালক পার্কার্ তাঁর কথা শুন্‌লো, নিরক্ষর শিষ্য যেখানে গেল সেইখানেই তাঁকে দেখলো, আর আমরা এই উৎসবক্ষেত্রে এসে শুধু ঘর দেখ্‌বো, মানুষ দেখ্‌বো, মানুষের গান আর কথাই শুন্‌বো, বাক্যয় বিশ্বতশ্চক্ষুকে শুন্‌বোও না, দেখ্‌বো ও না! এই জন্য কি উৎসবে এসেছি? সংবৎসর পরে যেমনটী এসেছিলাম তেমনটীই ফিরে যাব? কাল যে জাগবার জন্য ডাকা হয়েছিল, এই কি আমাদের জাগা? ঘুমের সময় কেহ যদি আমাদের কোন অঙ্গ স্পর্শ করে অম্‌নি আমাদের ঘুম ভেঙ্গে যায়, আর সারা বছর প্রাণের নিগূঢ় স্থানে, মর্ম্মস্থানে, কত আঘাত পেয়েছি, সারা জীবনের কত ক্ষত অন্তরের মধ্যে বহন ক'রে নিয়ে এসেছি, আর কদিন যাবতই ত ডাক এসেছে, ঘরে ঘরে খবর গিয়েছে, কাল কত ডাকা হলো, এখনও কি চেতনা হবে না? আঘাতের এত যাতনা সব কি ভুলে গিয়েছি, ক্ষতের এত জ্বালা তার ইতিহাস কি মনে নাই? আঘাতে যখন বুক ভেঙ্গেছিল তখন ত জেগেছিলাম, ক্ষতের জ্বালা যখন তীব্র তাপে পুড়িয়ে মার্‌ছিল, তখন ত চেতনা হয়েছিল। সেই যে জাগরণ, তাতে কার কণ্ঠস্বর শুনেছিলাম? প্রাণের মোহনিদ্রায়, জীবনের সুখ-বিলাসের মোহনিদ্রায়, বাসনার উদ্দাম উচ্ছ্বাসের সময়, ঐ কণ্ঠস্বর কখনও প্রলয়শঙ্খের ভৈরব নাদে, কখনও মধুর আহ্বান-ধ্বনিতে কানে বেজেছিল, প্রাণের মধ্যে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। যখন ভীষণ বিপদ্ পরীক্ষার দিনে জীবন তমসাচ্ছন্ন হয়েছিল, আর ঝড় ঝঞ্ঝার আঘাতে জীবননদীতে তরঙ্গের পর তরঙ্গ উঠেছিল, তখন ঐ কণ্ঠের ডাকে সংসারের মধুচক্র হ'তে মন বীততৃষ্ণ হ'য়ে ক্ষণকালের জন্য ঐ দিকে কান দিয়ে তাকিয়েছিল; আর তাকিয়ে দেখেছিল আবার সেই আঁধার জীবনে আলোক ফুটেছে। আজ কি সেই অতীত কাহিনী ভুলে গিয়ে, সেই ডাকের মালিককে এই চিরপুরাতন রাজ্য হ'তে নির্ব্বাসিত ক'রে, সেই আলোক নিবিয়ে দিয়ে, চক্ষু কর্ণ বসনে আবৃত ক'রে, চিত্রার্পিতের মত, ছায়াবাজির পুতুলের মত এখানে এসেছি? কিন্তু তাঁকে নির্ব্বাসিত কর্‌লেও যে তিনি নির্ব্বাসিত হন না, তিনি যে বিশ্বামিত্রকে দ্বিতীয় সৃষ্টির রচনায় কৃতকার্য্য হ'তে দেন না। সূর্য্যের আলোক ও বজ্রের ধ্বনি যে চক্ষুকর্ণ ঢেকেও একেবারে বাধা দেওয়া যায় না, মোহমদিরার বংশীরব যে সেই অনাহত ধ্বনির কাছে চাপা পড়ে যায়! সে ধ্বনি শুনি না বলি, এ কথা কি ঠিক? শুনি, কিন্তু শুন্‌তে চাই না, এই নয় কি? মোহের উন্মাদক বংশীরব বুঝি বেশী মিষ্ট? সে রবের পিছু ছুটলে যে নৌকাডুবি হয় তাও কি ভুলে গিয়েছি? এত পশরা খোয়া গেল, তবু ত চেতনা নাই! বাঁচবার পথে চল্‌বার ডাক শুন্‌তে এখনও অনিচ্ছা গেল না? যে পথ দেখিয়ে দেয়, তার অঙ্গুলীনির্দ্দেশ দেখ্‌বার জন্য এখনও চাইতে ইচ্ছা হয় না? মর্ম্মগ্রন্থী ছিন্ন হ'য়ে যাচ্ছে, তবুও দড়ি টেনে বাঁধন কশতে চাই! যে মোহজালের ভিতর থেকে কতবার সংগ্রাম ক'রে বেরিয়েছিলাম, আবার কি সেই ফাঁদে ধরা দিতে যাব? যে শৃঙ্খলের বাঁধ ভেঙ্গে, দাসত্বের খত ছিঁড়ে ফেলে, কারাগারের অন্ধকার থেকে আকাশের মুক্ত আলোকে, খোলা বাতাসে, এসে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিলাম, সেই শৃঙ্খলে আবার বন্দী হবার সাধ কি মেটে নি? জীবনের দিন যে ব'য়ে যাচ্ছে, তিল তিল ক'রে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আস্‌ছে, এখনও কি চেতনা হবে না? 'বেলা যে গেল, ক্ষুদ্র মেয়ের মুখে এই কথা শুনে মানুষ ঘুমের ঘোরে চেতনা লাভ ক'রে ঐহিকের সুখশয্যা পরিত্যাগ কর্‌ল, স্বপ্নেগড়া কল্পনার ঘর ছেড়ে যে পুত্রাৎ প্রিয়, বিত্তাৎ প্রিয়, অন্য সকলের চেয়ে প্রিয়, তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়্‌ল, সংসার তার রূপের পশরা খুলে আর ত সেই মানুষকে ভুলাতে পার্‌ল না! বিলাস বিভ্রম মধুর স্বরে আমন্ত্রণ ক'রে আর ত তাকে টান্‌তে পার্‌ল না। ক্ষুদ্র মেয়ের মুখে 'বেলা যে গেল' এই কথার মধ্যে সে মানুষ কার কথা শুনে রূপরসগন্ধের দেশ হ'তে আরেক নূতন রাজ্যের দিকে মুখ ফিরিয়ে দিল, তার জীবনযন্ত্রে সেই রাজ্যের সুর বেজে উঠ্‌ল, তার প্রাণের নিগূঢ় তন্ত্রীতে সেই সুরের ঝঙ্কার পড়্‌ল, সে তার স্পর্শপুলকে স্পন্দিত হ'য়ে নবজীবন লাভ ক'রে নূতন মানুষ হ'য়ে গেল। বেলা ত গেল, দিন ত ব'য়ে গেল—রোগ এসে, জরা এসে, মৃত্যু এসে কানের কাছে নিয়ত এই কথা বলে দিচ্ছে! এখনও আমরা ঘুমিয়ে থাকব, জাগ্‌ব না? আকাশে সূর্য্য উঠেছে, পাখীরা জেগে সেই সূর্য্যকিরণে কার স্পর্শ পেয়ে, কার নীরব কণ্ঠ শুনে, তাদের কলকণ্ঠে সংগীতের তরঙ্গ তুলে বিশ্বনাথের বন্দনা কচ্ছে? এই যে প্রভাতবায়ু কুঞ্জে কুঞ্জে সঞ্চরণ কচ্ছে, ইহার স্পর্শে কার স্পর্শ পেয়ে পুঞ্জে পুঞ্জে ফুল ফুটে উঠছে, আর ক্ষুদ্র জীবনের নিখুঁত নিটোল সৌন্দর্য্যের ডালি সাজিয়ে তাদের বুকভরা সৌরভের অর্ঘ্য দিয়ে বিশ্বনাথের পূজা কচ্ছে? নীরব ডাকে সবাই জেগেছে, আর আমাদিগকে জাগাবার জন্য কত আয়োজন, কত উদ্বোধন! আমরা কি জাগ্‌ব না, আমরা কি আমাদের অন্তরের রূপে রসে গন্ধে বিকশিত হ'য়ে, ভরপূর হ'য়ে, প্রাণের ধূপ দীপ নৈবিদ্যের ল'য়ে, উৎসবের পূজা-মন্দিরে বিশ্বনাথকে দর্শন ক'রে, তাঁর চরণে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে, তাঁর আশীর্ব্বাদ মাথায় নিয়ে, নূতন মানুষ হ'য়ে ঘরে ফিরে যাব না? একবার মোহের ঘোর ভেঙ্গে, একবার ঘুমের নেশা ছেড়ে দেখি, এখানে বিশ্বনাথের পূজার মেলা বসেছে, সকল পূজারীর মুখের স্বচ্ছদর্পণে বিশ্বনাথকে দর্শন করি, সকলের প্রাণে প্রাণে বিশ্বনাথের নিগূঢ় বার্ত্তার সঞ্চরণ অনুভব করি, সঙ্গীত ও উপাসনাকে বাহন ক'রে বিশ্বনাথের কোন্ বাণী আমাদের জন্য আস্‌ছে উৎকর্ণ হ'য়ে শুনি। উৎসবের পুণ্যক্ষেত্রে সকল আপনার জনকে নিয়ে আমাদের জন্য ব্রহ্মচক্র রচিত হয়েছে; স্বয়ং ব্রহ্ম সেই চক্রে আমাদের নিয়ে পরিক্রমণ কর্‌ছেন। "মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে"—বিশ্বনাথ মধ্যবিন্দু হ'য়ে রয়েছেন, তিনি সকলের মধ্যে স্ফুরিত ও প্রতিবিম্বিত হয়েছেন, আমরা তাই দেখে, প্রত্যক্ষ ক'রে, তাঁর বন্দনা কর্ত্তে এসেছি। চক্ষু কর্ণের আবরণ খুলে দি। যে চক্ষু আবৃত হ'য়ে মনে করেছিল সে যে দেখে না এটা তার দোষ নয়, দোষটা পৃথিবীর, পৃথিবীটাই অন্ধকার, আজ সেই চক্ষের

আবরণ খুলে দি, এই সাধনচক্রের মধ্যবিন্দু বিশ্বনাথকে সাক্ষাৎভাবে, চোখোচোখি, দর্শন করি, তাঁর কথা, তাঁর প্রেমে মাখা বাণী, সাক্ষাৎভাবে শ্রবণ করি। চাক্ষুষ না দেখলে, না শুনলে প্রেম হয় কি? যোগ হয় কি? প্রাণের তৃপ্তি হয় কি? 'সূত্রে মণিগণাইব'—সবাইকে একসূত্রে গ্রথিত না দেখলে ব্রহ্মপূজা যে পূর্ণ হ'য় না! আমাদের জ্ঞান, ভক্তি, বিশ্বাস, আমাদের বুদ্ধির বিশুদ্ধতা, চরিত্রের নির্ম্মলতা, যা কিছুর দাবি করি, যা কিছুর অহঙ্কার করি; আমাদের স্বদেশপ্রীতি, ভ্রাতৃপ্রেম, দয়াদাক্ষিণ্য উদারতা; আমাদের ত্যাগ, আমাদের সেবা, যা কিছুর জন্য কত সময় কত গর্ব্বিত হই; আমাদের মনুষ্যত্ব, আমাদের ধর্ম্মজ্ঞান অন্য কতজনের সঙ্গে তুলনায় যেন সত্যি বেশী, এই মনে ক'রে কত সময় বড় যে পুলকিত হই, স্ফীত হই,—এই সমুদয়, আমাদের প্রত্যেকের গোটা মানুষটা, এই উৎসবের সময়, ব্রহ্মস্ফূর্ত্তির বন্যার সময়, তাঁর প্রকাশের আলোকে সত্য পূজার কষ্টিপাথরে কষে দেখ্‌তে হবে; নিজের মলিনতা, নিজের অধমতা, নিজের অপদার্থতা এবার ভাল ক'রে বুঝে নিতে হবে। উৎসবে যদি সত্যই যোগ দিতে এসেছি, বাহিরের দর্শকরূপে নয়, বক্তারূপে নয়, গায়করূপে নয়, আচার্য্যের শ্রোতৃরূপে নয়, পূজারীরূপে, ভিখারীরূপে, কাঙ্গালরূপে যদি এসে থাকি, উৎসবে যদি সফলতা চাই, জীবনে যদি সার্থকতা চাই, প্রতিদিন উৎসবক্ষেত্রের নির্ম্মল মুকুরে বিশ্বনাথকে দর্শন কর্‌ব, উৎসবক্ষেত্রের পূজার ধ্বনিতে প্রতিদিন তাঁর বাণী শুন্‌ব। তিনি স্বপ্রকাশ, তিনি বিশ্বরূপী, তিনি বাঙ্ময়, অজস্র নিজকে উচ্চারণ কচ্ছেন। তিনি জীবননাথ, তিনিই উৎসবপতি, উৎসব তিনিই এনেছেন, উৎসবে তিনিই এসেছেন; একা আসেন নি, সবাইকে নিয়ে এসেছেন; তাঁরই উৎসব। তিনি চোখ দিয়েছেন দেখ্‌বার জন্য, আমরা আগে তাঁকেই দেখ্‌ব; তিনি জ্ঞান দিয়েছেন জান্‌বার জন্য, আমরা আগে তাঁকেই জান্‌ব; তিনি কান দিয়েছেন শুন্‌বার জন্য, আমরা আগে তাঁকেই শুন্‌ব। আর তাঁকে দেখে, তাঁকে জেনে, তাঁকে শুনে, সাক্ষাৎ ভাবে তাঁর সহিত, সকলের সহিত, প্রাণযোগে যুক্ত হ'য়ে, দিনের পর দিন উৎসব সম্ভোগ ক'রে আমরা ধন্য হব।

অপরাহ্নে বরাহনগরস্থ শ্রমজীবিগণের উৎসব উপলক্ষে নগর সংকীর্ত্তন। সকলে হেদুয়াতে সমবেত হইলে, শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী প্রার্থনা করেন। প্রার্থনান্তে কীর্ত্তন করিতে করিতে মাণিকতলা ষ্ট্রীট, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, বেচুচাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট হইয়া ব্রহ্মমন্দিরে উপস্থিত হইলে, কিছু সময় সংকীর্ত্তন চলিতে থাকে। অনন্তর উপাসনা; শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

মচ্চিত্তা মদ্গত প্রাণা বোধয়ন্ত পরস্পরম
কথয়ন্ত মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ

যাহারা মদ্গতচিত্ত মদ্গতপ্রাণ হইয়া, পরস্পরকে আমার তত্ত্ব বুঝাইয়া দেন ও পরস্পরের সহিত আমার কথাতে রত থাকেন এবং ইহাতেই যাহারা প্রীতি প্রাপ্ত হন ও আনন্দ সম্ভোগ করেন—

তেষাং সতত যুক্তানাং ভজতাং প্রীতি পূর্ব্বকম্
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে।

সেই সকল সতত যুক্ত এবং প্রীতি পূর্ব্বক আমার ভজনাকারিগণকে সেই জ্ঞান-যোগ প্রদান করি, যদ্দারা তাহারা আমাকে লাভ করে।

ভগবৎপ্রসঙ্গ ধর্ম্মসাধকদিগের মধ্যে প্রাচীন কালে ও বর্ত্তমান কালে প্রচলিত দেখা যায়। শ্রীচৈতন্য ভক্ত দলে মিলিত হইয়া, কত সুদীর্ঘ সময় ধর্ম্মপ্রসঙ্গে অতিবাহিত করিতেন! যে দিন গৃহ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস যাত্রা করিবেন, সেই দিন রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত ভক্তদলের সঙ্গে বসিয়া ভগবৎপ্রসঙ্গে সময় যাপন করিলেন। এইরূপ বুদ্ধ খৃষ্ট সকল মহাপুরুষগণই করিতেন। বর্ত্তমানকালে ব্রাহ্মসমাজে ঐরূপ দেখা যায়। যে ধর্ম্মসমাজে উহা যত অধিক, সেই সমাজই তত জীবন্ত হইয়া থাকেন। ৫টী বন্ধু মিলিত হইয়া সেই পরম বন্ধুর দয়ার ও গুণের কথা বলিতে বলিতে তাঁহার আবির্ভাব স্রোতে তাহাদের হৃদয়গুলি ভাসিয়া যায়। ৫টী জলন্ত প্রদীপ মিলিত হইয়া, পঞ্চ প্রদীপের শোভা ধারণ করিয়া, পরম বন্ধুর আরতি করিতে লাগিল। এইরূপ সুন্দর দৃশ্য জগতে দুর্লভ। গীতার ঐশ্বরিক উক্তিতে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, এই সকল সতত যুক্ত এবং প্রীতি পূর্ব্বক আমার ভজনাকারীদিগকে আমি বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যেন তাঁহারা আমাকে জানিতে পারে। বুদ্ধিযোগ অর্থ জ্ঞানযোগ। জ্ঞানই মানবাত্মার মূল বৃত্তি। এই জ্ঞান দ্বারা আমরা পরমাত্মাকে নিত্য সত্য পরম বন্ধুরূপে জানিতে পারি। জ্ঞান যদি তাঁহাকে এইরূপে জান্‌তে পায়, তবে হৃদয় বলে আমি প্রীতি উপহার দিয়া আনন্দ সাগরে লীন হব। তখন ইচ্ছা বলে আমি প্রেমময় পরমেশ্বরের ইচ্ছায় পূর্ণাহুতি দিয়া ধন্য হইব, সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হউক বলিয়া আমি তাঁহার জয়ধ্বনি করিব।

ঈশ্বর মানবাত্মাকে জ্ঞানে প্রেমে ইচ্ছায় তাঁহার সহিত যুক্ত হইতে দিয়া আমাদিগকে পরম সুন্দর করিয়াছেন। সকল মানবাত্মার এই সকল মহৎ ভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে; নিতান্ত মূর্খ যে সেও, তিনি আছেন, এই মহাতত্ত্ব জানিতে পারে। একটী অশীতিবর্ষ বৃদ্ধ, খৃষ্টান কোন বিলঅঞ্চলের একটী শ্রমজীবী, একটী ব্রাহ্ম প্রচারকের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্য শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আপনারা যে নূতন ধর্ম্ম বিষয়ে বলিলেন, "আপনারা যাহা বলিলেন, এই কথা কোন্ বাইবেলে আছে?" প্রচারক বলিলেন, আমরা কোন বাইবেল শাস্ত্র, কোন ধর্ম্মপুস্তককেই অভ্রান্ত বলি না; সকল শাস্ত্র হইতেই আমরা সার সত্য গ্রহণ করি"। তখন সেই বৃদ্ধ বলেছিল, "আপনারা বলিলেন বাইবেল কেতাব মানেন না, কিন্তু আমি দেখি এই সকল কথা দেলকেতাবে আছে।" সকল আত্মাতেই সহজ জ্ঞান আছে; তাই অন্তর হইতে ঠিক ঠিক ধ্বনি উত্থিত হয়। জ্ঞানী মূর্খ সকল ব্যক্তিই তাঁহাকে নিত্য সত্য পরম বস্তু বলিয়া জানিতে চায়।

আর, প্রেম সকল হৃদয়েই আছে; সুতরাং সকলেই তাঁহাকে মঙ্গলময় বলিয়া জানিতে চায়। একটী ব্রাহ্ম মহিলা কঠিন রোগে

আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি দুরন্ত পীড়ার সময় যখন বড় কষ্ট হইত, তখন ক্লেশ বোধ করিতেন, কিন্তু বলিতেন "তবু তুমি দয়াময়" "তবু তুমি দয়াময়"। একটী বয়স্ক পুরুষ আসাম তেজপুর জেলার মধ্যে কতিপয় মহিলাকে লইয়া ব্রহ্মপুত্র স্নানে আসিতেছিলেন। তিনি পথিমধ্যে মহিলাদের লইয়া বড় বিপদাপন্ন হইয়াছিলেন। দেখিলেন দূরে পাহাড়ের দিকে চেয়ে কতকগুলি বুনোমহিষ উহাদের আক্রমণ করিবার জন্য দূর হইতে আসিতেছে। ইহারা আসিয়া এখন আক্রমণ করিবে, আর রক্ষার উপায় নাই, ভাবিয়া উহারা বড়ই ভীত হইয়াছিল। এমন সময় ঈশ্বর ঐ পুরুষটীর প্রাণে বল সঞ্চার করিলেন। তখন সেই পুরুষটী আপন বিপদ দেখিয়া মহিলাদের বলিল, "দেখ, তোমরা যে যে দিকে পার যেয়ে প্রাণ বাঁচাও, আমি রহিলাম।" এই বলিয়া একখানা যষ্টি হস্তে লইয়া মহিষগুলির প্রতিকূলে দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান থাকিলেন। কি বলিব! মহিষগুলি ক্রোধান্বিত হইয়া ঐ লোকটীকে আক্রমণ করিয়া হত্যা করিয়া ফেলিয়াছিল। মৃত্যু সময় তাহার মুখে যেন আনন্দের আঁভা দেখা গেল। আনন্দ এই জন্য, যে আমি নিজে প্রাণ দিলাম, কিন্তু ইহাদের রক্ষা করিতে পারিলাম।

এই যে মানবাত্মায় জ্ঞান প্রেম ইচ্ছা, এই ত্রিবিধ বৃত্তি রহিয়াছে, ইহাতেই মানব জীবনকে পরমেশ্বর সকল জীব হইতে শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর করিয়াছেন।

একবার মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় স্বীয় মানসিক কুচিন্তার জন্য বড় ব্যথিত হইয়া গভীর রাত্রিতে পাঞ্জাবের রাবী নদীর তীরে প্রাণত্যাগে উদ্যত হইয়াছিলেন। একখানা ভারী প্রস্তর পরিহিত বস্ত্রদ্বারা গলদেশে বন্ধন করিয়া রাবী নদীতে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ ত্যাগ করিবেন, এই ইচ্ছায় গভীর রাত্রিতে নদীতীরে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, এমন সময় কেহ আসিয়া তাঁহাকে হস্তে ধরিয়া বলিল কি করিতেছ? তখন গোস্বামী মহাশয় বলিলেন "আমি পাপী মানুষ, তাই প্রাণ রাখ্‌ব না।" তিনি বলিলেন "বৎস, দেহ নাশে পাপের নাশ হয় না। তুমি কি জন্য পাপ জীবন লইয়া পরলোকে যাইতে চাও? পবিত্র হইয়া যাও। প্রতিদিন ভগবানের নাম সাধনা কর, তুমি পবিত্র হইয়া যাইতে পারিবে। তুমি যে কত সুন্দর তাহা এখন দেখিতেছ না, কিন্তু সাধনার দ্বারা সাধনপথের এক খানা আয়না যখন খুলে যাবে তখন তুমি দেখ্‌তে পাবে তুমি কত সুন্দর।"

ভগবান মানবকে কত সুন্দর করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা, আত্মবিস্মৃত বলিয়া, আমরা অনেক সময় বুঝ্‌তে পারি না। তিনি সত্যং শিবং সুন্দরং; তাঁহার সাধন দ্বারা আমরাও সত্য মঙ্গল সুন্দর হইতে পারি।

মহাত্মা বুদ্ধের সকল সাধনার লক্ষ্য ছিল ইন্দ্রিয় গ্রামের উর্দ্ধে মনকে উন্নত করা। একটী উপাখ্যানে আছে মার তাহাকে দলন করিবার জন্য বলেছিল। অর্হৎ, চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক ও মনের রাজ্য আমার। তুমি কি দিয়া আমাকে অতিক্রম করিবে? তখন তিনি মারকে বলিলেন, 'মন্দমতি, আমি চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক ও মনের রাজ্যে বাস করি না। সে লোকে তোমার গতি নাই"। মার পরাস্ত হইয়াছিল। এই সংসারের সার মর্ম্ম এই যে, এই শারীরিক জগতের উর্দ্ধে আধ্যাত্মিক জগৎ। সেই আধ্যাত্মিক রাজ্যে তিনি স্থিতি করেন আমরা যদি অধ্যাত্ম জগতে উন্নত হইতে পারি, তাহা হইলে তখন সত্যং শিবং সুন্দরংএর সাক্ষাতে আমরাও সত্য মঙ্গল ও সুন্দর হইতে পারি। তখন ঈশ্বরও সুন্দর, আমরাও সুন্দর। করুণাময় আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমরা তাঁকে লাভ করিয়া পবিত্র ও সুন্দর হইতে পারি। ক্রমশঃ

ব্রাহ্মসমাজ

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে,

বিগত ৭ই মাঘ পরলোকগত বাবু উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর পত্নী বিধুমুখী রায়চৌধুরী ৬১ বৎসর বয়সে হঠাৎ পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি হৃদয়ের মাহাত্ম্যে ও চরিত্রের মাধুর্য্যে বন্ধুবান্ধবদের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্রী ছিলেন।

বিগত ৯ই জানুয়ারী কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দত্ত ভ্রাতৃবধূর আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য ও হেমেন্দ্র বাবু সংক্ষিপ্ত জীবনী বর্ণনা করিয়া প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে প্রচার বিভাগে ২৲ সাধনাশ্রমে ১৲ ও দাতব্য বিভাগে ১৲ প্রদত্ত হইয়াছে।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চির শান্তিতে রাখুন ও শোকসন্তপ্ত আত্মীয় স্বজনদের প্রাণে সান্ত্বনা বিধান করুন।

শুভবিবাহ—বিগত ৩০ শে ডিসেম্বর বরিশাল নগরীতে শ্রীযুক্ত রসরঞ্জন সেনের কন্যা কল্যাণীয়া কমলা ও বাটাজোর নিবাসী শ্রীযুক্ত মনোমোহন দত্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান সুধীর-কুমারের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ১৫ই জানুয়ারী কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র-নাথ দত্তের জ্যেষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া সুরমা ও শ্রীযুক্ত হরকান্ত বসুর তৃতীয় পুত্র শ্রীমান নবনীকান্তের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে ব্রাহ্মসমাজের কাজে ১০৲ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রেমময় পিতা নবদম্পতিদিগকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

দান—শ্রীযুক্ত পি এন দত্ত মাতার বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে দাতব্য বিভাগে ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন। অমৃতকুমার দত্ত কনিষ্ঠ ভ্রাতা সত্যকুমার দত্তের আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ১০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

এ সকল দান সার্থক হউক এবং পরলোকগত আত্মাসকল চির শান্তি লাভ করুন।

উল্টাডাঙ্গা ব্রাহ্মসমাজ—উল্টাডাঙ্গা ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে বিগত ২৪ সে ডিসেম্বর সমস্তদিনব্যাপী উৎসব হয়। প্রাতে নগর সংকীর্ত্তন, তৎপর বেলা ৯ টায় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র উপাসনা এবং শ্রীমতী সুরমা সেন সঙ্গীত করেন। প্রীতি-ভোজনান্তে শ্রীযুক্ত শিশির কুমার দত্তের সভাপতিত্বে বার্ষিক সভা হয়; তখন শ্রীযুক্ত অনাথকৃষ্ণ শীল, শ্রীযুক্ত সুবোধকুমার দাস এবং শ্রীযুক্ত অনিলকুমার সেন সহকারী সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত হৃদয়কৃষ্ণ দে সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হন। অপরাহ্ণে শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ি শাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পরে কানাইলাল সেন-স্মৃতিসভায় শ্রীযুক্ত অক্ষয়চাঁদ দে সভাপতি হন এবং শ্রীযুক্ত হৃদয়কৃষ্ণ দে পরলোকগত আত্মার সদ্গুণাবলী ব্যক্ত করিয়া প্রার্থনা করেন। সন্ধ্যায় পণ্ডিত সুরেশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ উপাসনা এবং শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল সঙ্গীত করেন।

তৎপর দিন ২৫ শে ডিসেম্বর প্রাতে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় উপাসনা করেন এবং তাঁহার ভার্য্যা সঙ্গীত করেন। অপরাহ্ণে বালক বালিকা-সম্মিলনে পণ্ডিত চন্দ্রমোহন মজুমদার গল্প করেন এবং বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রমণীমোহন রায় বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দেখান। তৎপরে মিষ্টান্ন বিতরিত হয়। সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ি আলোকচিত্র সহযোগে "মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ" বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। শেষ দিন ২৬ শে ডিসেম্বর প্রাতে শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করেন।

বিগত ৬ই ডিসেম্বর তারিখে উল্টাডাঙ্গা ব্রাহ্মসমাজের ট্রাষ্টিগণের যে সভা হয়, তাহাতে পরলোকগত কানাইলাল সেনের স্থলে নববিধান সমাজের শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসুকে ট্রাষ্টি পদে নিযুক্ত করা হয়।

কাকিনা ব্রাহ্মসমাজ—শ্রীযুক্ত সুখময় দাস গুপ্ত লিখিয়াছেন—"এখানে রাধিকানাথ রায় নামে একজন ভদ্রলোক রাজ কাছারীতে মুন্সী ছিলেন। তিনি এক সময়ে ব্রাহ্মসমাজে গান গাহিতেন। শেষ বয়সে কাকিনা রাজসত্রের নায়েব হইয়া কাশীবাস করিতেন। রাধিকা বাবুর স্ত্রী নবদ্বীপ বাবুকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন। রাধিকা বাবুর মৃত্যুর পর নবদ্বীপচন্দ্র ইঁহাকে প্রতি মাসে সাহায্য করিতেন। নবদ্বীপ চন্দ্রের প্রেম কতদূর পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, এই ক্ষুদ্র ঘটনা ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিবে।

স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রাচীন সভ্য ভারতচন্দ্র গুপ্তের ঢাকা জেলার নিজ আবাসে মৃত্যু হওয়ায়, গত ২৬শে পৌষ তাঁহার আত্মার মঙ্গলের জন্য ছাত্রসমাজ-গৃহে উপাসনা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সেন আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে গুপ্ত মহাশয়ের পত্নী স্থানীয় সম্পাদকের নিকট ৩৲ টাকা পাঠাইয়াছেন। এই টাকা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে প্রেরিত হইবে। পরমেশ্বর মৃত ব্যক্তির আত্মার কল্যাণ করুন।"

কর্ম্মচারী ও অধ্যক্ষ সভা—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক সভাতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ আগামী বর্ষের জন্য কর্ম্মচারী ও অধ্যক্ষ সভার সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন :—

পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ—সভাপতি, শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর রায়—সম্পাদক, শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার সেন—সহকারী সম্পাদক, শ্রীযুক্ত অর্পণাচরণ ভট্টাচার্য্য—ঐ, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার রায়—ঐ, ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য—কোষাধ্যক্ষ।

অধ্যক্ষসভা—(কলিকাতা) বাবু অন্নদাচরণ সেন, বাবু ললিতমোহন দাস, বাবু হেমচন্দ্র সরকার, বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়, বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র, ডাক্তার কালিদাস নাগ, বাবু বরদাকান্ত বসু, মিস্ জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী, বাবু সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বাবু রজনীকান্ত গুহ, বাবু গুরুদাস চক্রবর্ত্তী, ডাক্তার দেবেন্দ্রমোহন বসু, বাবু অশোক চাটার্জ্জি, শ্রীমতী কুমুদিনী বসু, বাবু প্রভাতচন্দ্র গাঙ্গুলী, বাবু শশিভূষণ দত্ত, শ্রীমতী পূর্ণিমা বসাক, ডাক্তার সতীশরঞ্জন খাস্তগির, বাবু প্রতুলচন্দ্র সোম, শ্রীমতী শান্তা নাগ, ডাক্তার বি এল্ চৌধুরী, বাবু শিশিরকুমার দত্ত, ডাক্তার বিরজাশঙ্কর গুহ, বাবু অমল হোম, বাবু অনিলকুমার সেন, বাবু কালীমোহন ঘোষাল, বাবু সুশোভনচন্দ্র সরকার, শ্রীযুক্ত এস্ এম্ বসু, বাবু শ্রীশচন্দ্র রায়, বাবু অখিলচন্দ্র ঘোষাল, শ্রীমতী নলিনী বসু, বাবু সৌরেন্দ্রনাথ দত্ত, বাবু নির্ম্মলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীমতী সুরমা সেন, বাবু বীরেন্দ্রকুমার রায়। (মফঃস্বল) শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বল, শ্রীযুক্ত ভি আর সিন্ধে, শ্রীযুক্ত ই সুব্বাকৃষ্ণায়, শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায়, কাজি আবদুল গফুর, শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত জি বি ত্রিবেদী, ডাক্তার নলিনীকান্ত বসু, ভাই সীতারাম, মিস্ ভক্তিলতা চন্দ, শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ চন্দ, শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার বসাক, শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস, শ্রীমতী সুষমা দাস, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রকুমার বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত মধুসূদন জানা, শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্ত্তী, রায় সাহেব কে রঙ্গ রাও, শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দাস, শ্রীমতী প্রীতিলতা বসাক, শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র চৌধুরী, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বানার্জ্জি, রায় সাহেব শরৎচন্দ্র দাস, রাও সাহেব এ গোপালম, শ্রীমতী উষাবালা রায়, শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র দত্ত।

প্রতিনিধি বর্গ

বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র	টাঙ্গাইল	ব্রাহ্মসমাজ
,, মধুসূদন জানা	কাঁথী	,,
,, কালীমোহন বসু	কালীঘাট প্রার্থনা সমাজ	
,, কমললোচন দাস	গৌহাটী	,,
,, প্যারিমোহন মিত্র	তেজপুর	,,
,, মন্মথমোহন দাস	বরিশাল	,,
,, শ্রীব্রজবিহারী লাল	বাঁকীপুর	,,
,, নেপালচন্দ্র রায়	পূর্ব্ববাঙ্গলা	,,
রায় মহেন্দ্রকুমার গুপ্ত বাহাদুর	শিলং	,,
বাবু অনাথবন্ধু সেন	খাসি পাহাড়	,,
,, রমেশচন্দ্র মুখার্জ্জি	ধুবরী	,,
,, বীরেন্দ্রকুমার রায়	কালীকচ্ছ	,,

বাবু অজিতমোহন সেন	বাঙ্গালোর কেন্টনমেণ্ট ব্রাহ্মসমাজ	
,, হরকালী সেন	দিনাজপুর	,,
,, অনাথকৃষ্ণ শীল	উল্টাডাঙ্গা	,,
,, বরদাকান্ত বসু	আন্দুল	,,
,, হরিশচন্দ্র দত্ত	চট্টগ্রাম	,,
,, জয়কালী দত্ত	রাঁচী	,,
,, গগনচন্দ্র হোম	গিরিডি	,,
,, অনিলকুমার সেন	বাণীবন	,,
,, ইউ মানপ্পা	বাঙ্গালোর	,,
,, শিশিরকুমার দত্ত	কাওরাইদ	,,
,, প্রমথনাথ সরকার	কৃষ্ণনগর	,,
,, হরানন্দ গুপ্ত	ময়মনসিংহ	,,

ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ের ট্রাষ্টি—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক সভাতে পরলোকগত স্যার কে জি গুপ্তের স্থলে শ্রীযুক্ত এস্ এম্ বসু ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ের অন্যতম ট্রাষ্টি নিযুক্ত হইয়াছেন।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

মুক্তির পথ—(জেমস্ এলেন রচিত Divine Companion নামক গ্রন্থের কিয়দংশের বঙ্গানুবাদ।) শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক অনূদিত। মূল্য ।০ চারি আনা। এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানার দ্বারা ধর্ম্মার্থী ব্যক্তিদিগের সাধন বিষয়ে বিশেষ সহায়তা হইবে। আমরা ইহা পাঠে উপকৃত বোধ করিয়াছি। অমরবাবু সরল ভাষাতে এই অনুবাদ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, অনুবাদ বলিয়া কাহারও নিকট প্রতীতি হইবে না। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। প্রত্যেক সাধনার্থীর ইহা পাঠ করা কর্ত্তব্য হইবে মনে হয়।

মাণ্ডুক্যোপনিষদের ভূমিকা—(ওঁ কার বা প্রণব অবলম্বনে ব্রহ্মচিন্তা)— রাজর্ষি রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী হইতে ঢাকা ব্রহ্মবিদ্যা সমিতির পক্ষে শ্রীযুক্ত মথুরানাথ গুহ কর্ত্তৃক পুনঃ মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য /০ এক আনা। ইহার নূতন পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। ইহা পাঠে সাধনার্থিগণ বিশেষ উপকার লাভে সমর্থ হইবেন। ব্রহ্মবিদ্যা সভা সুলভ মূল্যে ইহার প্রচার করিয়া অতি ভাল কাজ করিয়াছেন। ইঁহারা পূর্ব্বেও আরও কয়েকখানা পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন। আশা করি, সকল ধর্ম্মার্থী ব্যক্তিই ইহা পাঠ করিয়া দেখিবেন। এরূপ গ্রন্থসকল যত বহুল ভাবে প্রচারিত হয়, ততই দেশের পক্ষে কল্যাণ।

নবদ্বীপচন্দ্র স্মৃতিভাণ্ডার—নবদ্বীপচন্দ্র স্মৃতিভাণ্ডারের সহযোগী-সম্পাদক কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছেন যে, বিগত ডিসেম্বর পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত দান প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে—

শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত সরকার ৫৲, রায় কুঞ্জবিহারী বিশ্বাস বাহাদুর ২১০৲ (তন্মধ্যে ১০০৲ টাকার একখানা ওয়ার বণ্ড), শ্রীযুক্ত জীবনলাল ১০৲, শ্রীযুক্ত অশোকমোহন বসু ৫০৲, শ্রীযুক্ত এ ন চক্রবর্ত্তী ২৫৲, সিয়ালকোট-ব্রাহ্মসমাজ ৫৲, শ্রীযুক্ত আশুতোষ পাল ১৲, কুমারী সুবোধবালা রায় ২৫৲, শ্রীযুক্ত এম এল সরকার ৫৲, জনৈক মহিলা ১০৲, শ্রীযুক্ত অজিতমোহন সেন ১০০৲, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার মুখার্জ্জি ১০০৲, মিসেস আর, সি, নাগ ২৫৲, শ্রীযুক্ত আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় (উদার ধর্ম্ম-বার্ত্তা বিক্রয় করিয়া) ১৭৸৶, শ্রীযুক্ত জগৎচন্দ্র দাস ১৲, কাজি আবদুল গফুর ২৲, শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী বসু ২৲, বাবু তিনকড়ি বসু ১৫৲, মিঃ ডি জি বৈদ্য ১৩৫৲, রাও সাহেব কে, রঙ্গরাও ১৫৲, শ্রীযুক্ত প্রশান্তকুমার গুহ ৫৲, পরলোকগত প্যারীলাল মিত্রের শ্রাদ্ধোপলক্ষে দান ৫০৲, শ্রীযুক্ত ললিতকুমার রায় ১০৲, রায় সাহেব শ্রীশচন্দ্র লাহিড়ী ২৫৲, শ্রীযুক্ত কালিদাস সরকার ২৲, শ্রীমতী সারদাসুন্দরী বসু ১০৲, শ্রীমতী শান্তিলতা কর ২৲, শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র রায় ৫৲, শ্রীমান্ রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ ৫৲, বাবু বেচারাম মল্লিক ৫৲, শ্রীযুক্ত উৎপল সরকার ২৲, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী ৫৲, শ্রীমতী সুরবালা বর্ম্মণ ৫৲, শ্রীমতী সুবালা দাস ৫৲, শ্রীযুক্ত অমিতাভ গুহ ২৲, শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার রায় ২৲, শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন মিত্র ১০৲, মিঃ ও মিসেস হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় ৩৩০৲, শ্রীমতী মাধুরিকা মিত্র ১৫৲, শ্রীযুক্ত শান্তিপ্রিয় দাস ১০৲, শ্রীমতী হিমানী গুপ্ত ৫৲, মিঃ এস কে ঘোষ ৫৲, স্যার এ্যাল্‌বিয়ান বানার্জ্জি ২৫৲, শ্রীযুক্ত প্রশান্ত রাও ১০৲, বর্দ্দ সদাশিব রাও ৫৲, শ্রীমতী নলিনী রায়চৌধুরী ৫৲, শ্রীমতী মণিকা রায় ৫৲, শ্রীযুক্ত মুক্তেশ্বর দাস ২৲, শ্রীমতী সরোজিনী সরকার ২৲, শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র গুহ ১৲, শ্রীমতী সুমতি মল্লিক ১০৲, পরলোকগত বেচারাম মল্লিকের পুত্রকন্যাগণ ১০৲, শ্রীমতী লীলা চক্রবর্ত্তী ২৲, শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন খাস্তগির ২০৲, শ্রীযুক্ত কানাইলাল ঘোষ ১৲, শ্রীযুক্ত বি এন্ সাহা ৫৲, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ দেব ৫৲, শ্রীমতী শশিপ্রভা গুপ্ত ২৫৲, শ্রীযুক্ত মথুরানাথ নন্দী ৫৲, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার বসু ও ভ্রাতাভগিনীগণ ২৲, শ্রীমতী সুকুমারী সেনগুপ্ত ১০৲, শ্রীমতী কৈলাসবাসিনী গুহ ৫৲, শ্রীযুক্ত বিহারীলাল গুপ্ত ৪৲, রায় সুরেশচন্দ্র সিংহ বাহাদুর ১০৲, শ্রীমান্ শচীন্দ্রনাথ মল্লিক ২৲। মোট ১৪৮৪৸৶০। ইহার দ্বারা ২০০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজ খরিদ করিয়া (তন্মধ্যে একখানা ১০০৲ টাকার ওয়ার বণ্ড) কার্য্যনির্ব্বাহক সভার হস্তে দেওয়া হইয়াছে—সুদ প্রচারকার্য্যে ব্যয়িত হইবে।

মহিলাদিগের নবদ্বীপচন্দ্র স্মৃতিভাণ্ডার—ইহার সুদ হইতে দুঃস্থ রোগীদের ঔষধ ও পথ্যাদির ব্যয়-নির্ব্বাহে যথাসম্ভব সাহায্য করা হইতেছে। ৬৫।৩ হ্যারিসন রোড় ঠিকানায়, সম্পাদিকার নিকট আবেদন করিতে হয়।

রোগমুক্তিতে উপাসনা—গত ৭ই জানুয়ারী বালিজান চা বাগানের শ্রীযুক্ত নন্দকুমার চৌধুরীর মাতার রোগ-মুক্তি উপলক্ষে রায় সাহেব শরৎচন্দ্র দাস উপাসনা করেন। নন্দকুমার বাবু প্রচার ফণ্ডে ১৲ দান করিয়াছেন।

আবেদন পত্র

আন্দুল ব্রাহ্মসমাজ ১৮৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। তদবধি এই ৪৩ বৎসর উহা পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু নিজের একটি উপাসনালয় না থাকাতে, সমাজ দীর্ঘকাল যাবৎ বিশেষ অসুবিধা অনুভব করিতেছে। করুণাময় পিতার কৃপায় সম্প্রতি বর্ত্তমান সম্পাদক এই উদ্দেশ্যে ট্রাষ্টিদের হস্তে এক খণ্ড জমী দান করিয়াছেন। উক্ত জমীতে একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিতে প্রায় ২০০০৲ দুই সহস্র টাকার প্রয়োজন হইবে। স্থানীয় সভ্যদের পক্ষে নিজেদের মধ্য হইতে এত টাকা সংগ্রহ করা কোনও প্রকারে সম্ভবপর নহে। এই হেতু আমরা এই আবেদন পত্র লইয়া সহৃদয় দানশীল সহানুভূতিকারকগণ ও অপরাপর স্থলের ব্রাহ্ম বন্ধুগণের নিকট উপস্থিত হইতেছি। দান, যত সামান্যই হউক, সম্পাদক কর্ত্তৃক কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত ও 'ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার', 'তত্ত্ব-কৌমুদী' ও 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় স্বীকৃত হইবে। অর্থাদি আন্দুল ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক, আন্দুল-মৌরী পোঃ, জিলা হাবড়া, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। অক্টোবর, ১৯২৬।

বিনীত

শ্রীসীতানাথ তত্ত্বভূষণ (সভাপতি, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ); শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র (সভাপতি), শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য, শ্রীবরদাকান্ত বসু, শ্রীশ্রীশচন্দ্র মল্লিক, শ্রীষ্টবিহারী চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদক)—ট্রাষ্টিদিগের প্রতিনিধি।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় দ্বারা ২২এ মাঘ মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রীবরদাকান্ত বসু, বি-এ

ওঁ ব্রহ্মকৃপাহিকেবলম্

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।

২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সপ্তনবতিতম মাঘোৎসব উপলক্ষে

১লা মাঘ হইতে ২৯শে মাঘ (১৩৩৩) পর্য্যন্ত পুস্তকাদির মূল্য হ্রাস করা হইয়াছে

অগ্রিম সিকি মূল্য পাঠাইলে ভিঃ পিঃ ডাকে পুস্তকাদি পাঠান হয়।

এ বৎসরের নূতন পুস্তক।

ঈশ্বরের স্বরূপতত্ত্ব ও প্রার্থনা (রামচন্দ্র দত্ত) মূল্য ॥০

ঈশোপনিষদের ভূমিকা (অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী লিখিত মুখবন্ধ সহ) ।/০

"জয় ভারতের জয়" (স্বর সংবাদ) শ্রীবাণী দেবী ১৲

জীবন প্রসঙ্গ ও প্রার্থনা (গুরুদাস চক্রবর্ত্তী) মূল্য বাঁধান ১৲...॥০
অবাধা ৸ ...।৵০

তত্ত্বী (কালীপ্রসন্ন বিশ্বাস) ॥০...।০

পরলোক তত্ত্ব (দীনবন্ধু মিত্র)
প্রথম খণ্ড—দেহান্তে কর্ম্মময় জীবন মূল্য ১৲
ঐ ২য় খণ্ড—আকা'র পরিগৃহীত আত্মা মূল্য ॥০

প্রেমিকবর নবদ্বীপচন্দ্র দাসের জীবন বৃত্তান্ত (শ্রীবঙ্কবিহারী কর) মূল্য ১৲

বেদান্ত গ্রন্থ (ব্রহ্মসূত্র) পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ লিখিত মুখবন্ধ সহ (১৮৮ পৃষ্ঠা) কাপড়ের বাঁধাই মূল্য ১৲

মাণ্ডুক্যোপনিষদের ভূমিকা (ওঁ কার ও প্রণব অবলম্বনে ব্রহ্মচিন্তা) মূল্য ।/০

মুক্তির পথ (James Allen এর Divine Companion নামক পুস্তকের কিয়দংশের অনুবাদ) শ্রীঅমরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক অনূদিত মূল্য ।০

ধর্ম্মেরতত্ত্ব ও সাধন—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী

অতীতের ব্রাহ্মসমাজ—ত্রৈলোক্যনাথ দেব ১৲ স্থলে ৸০

অদ্বৈতবাদ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য—(সীতানাথ তত্ত্বভূষণ) ১৲...॥০

অঞ্জলি (সতীশচন্দ্র রায়ের কতক-গুলি উপাসনা ও প্রার্থনা) ৸০...।৵০

অর্ঘ্য (মনোমোহন চক্রবর্ত্তী) আধ্যাত্মিক কবিতা, ।০

আশীর্ব্বাদী ..।০

আচার্য্যের উপদেশ ১ম ও ২য় খণ্ড (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর) প্রত্যেক খণ্ড ॥০...।০

আদর্শ বা দাদাঠাকুর (কথক হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন) ১৲

আর্ট ও সাহিত্য (ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর) ১৲

আমার খাতা (শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী) ৸০

আত্মিক-তত্ত্ব (দীনবন্ধু মিত্র) ॥০—।৵০

আত্ম সমর্পণ (শ্রীগুরুদাস চক্রবর্ত্তী) ৵০

আদি ব্রাহ্মসমাজের মণ্ডলী সংগঠন প্রস্তাবনা ৵০...৴০

আত্ম-তত্ত্ব বিদ্যা ৵০...৴০

আচার্য্য গিরিশচন্দ্র মজুমদার ।০

আচার্য্যের উপদেশ	১ম	৸০...॥০
ঐ	২য়	১৲...॥০
ঐ	৩য়	॥০...॥০
ঐ	৪র্থ	১৲...॥০
ঐ	৫ম	১৲...॥০
ঐ	৬ষ্ঠ	১।০...৸০
ঐ	৭ম	১৲...৸০
ঐ	৮ম	১৲...॥০
ঐ	৯ম	১।০...১৲
ঐ	১০ম	১॥০...১।০

আদর্শ বিশ্বাসী ৵০...৴০

আর্য্যধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পর ঘাত প্রতিঘাত ও সঙ্ঘাত ৵০...৴০

ইটনার স্বর্গীয় কালীকিশোর বিশ্বাস এবং তদীয় পত্নী দেবী কনকমণি ।০

ঈশোপনিষৎ (হরেন্দ্রচন্দ্র বসু) ৵০

উপহার (মহর্ষির অভিভাষণ) ৵০...৴০

উদানম্ (বিজয় মজুমদার) ৵০...৴০

উপমা সংগ্রহ (শাস্ত্রী মহাশয়ের গ্রন্থাবলী হইতে উমেশচন্দ্র চৌধুরী সংগৃহীত) ।০ স্থলে ৴০

উপদেশ (নূতন পুস্তক) (ভাই প্রতাপ চন্দ্র) ১ম ।০ ঐ ২য় ।৵০

উপনিষদ্ (সীতানাথ তত্ত্বভূষণ)
অবাধা দুই খণ্ড ১॥০
ঐ বাঁধান ২৲

উপাসনা, নিবেদন ও প্রার্থনা (৺প্রকাশচন্দ্র রায়) ১৲

উপদেশমালা ।৵০...৴০

উদার ধর্ম্মবার্ত্তা (আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়) ৴০

ওয়ার্ডন ওয়ার্থের অনুবাদ ।০...৴০

ঔপনিষদ ব্রহ্ম—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।০—৵০

করুণাধারা (নবদ্বীপচন্দ্র দাস) মূল্য ।০

কাব্য পরিক্রমা (৺ অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী) ॥০...।৵০

কীর্ত্তন ও বন্দনা (মনোমোহন চক্রবর্ত্তী) ॥০...।৵০

খেলার ছবি (এম, এম, মজুমদার) ৵০ . ৴০

খুকুমণির ঘুমপাড়ান ছড়া—১নং ও ২নং প্রত্যেকখানা ৶১০ স্থলে ৶৫

ক্ষেপার গান ও কীর্ত্তন (শ্রীচন্দ্রনাথ দাস ।০

গৃহধর্ম্ম (পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত) বাঁধা ।/০ আবাঁধা ৵০

গীতারহস্য (বাল গঙ্গাধর তিলক) ৩৲

গীতিমালা (বসন্তকুমার চৌধুরী)।০...৵০

গৃহের কথা—৺ লাবণ্যপ্রভা সরকার প্রণীত ।০

চরিত মাধুরী (কয়েকটী ব্রাহ্মিকার জীবনী) ৴০...।০

চরিত রহস্য ।০...৴০

চরিত কুসুমমালা (কাশীচন্দ্র ঘোষাল) ।০...।০

চরিত মুক্তাবলী ঐ ॥০...।৵০

চরিত রত্নাবলী ঐ ।০...৴০

চিন্তামঞ্জরী ।০...৴০

ছত্রপতি শিবাজী (ভবসিন্ধু দত্ত) ২৲

ছেলেদের গল্প (শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত) ।৵০

ছান্দোগ্যোপনিষদ্ প্রথমার্দ্ধ (পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ) সুন্দররূপে বাঁধান ১॥০
ঐ দ্বিতীয়ার্দ্ধ ১॥০
ঐ দুইখণ্ড একত্র ২॥০

ছোটদের বই (শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত ।৴০

ছোটদের গল্প (অমৃতলাল গুপ্ত প্রণীত) একটু অধিক বয়সের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাপ্রদ ও চিত্তাকর্ষক উৎকৃষ্ট ছবি ও গল্পের বহি) ১৵০.. ১৲

জর্ম্মনীর বর্ত্তমান রাষ্ট্রনীতির অভিব্যক্তি (ক্ষিতিন্দ্রনাথ ঠাকুর) ।০

জাতিভেদ (পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী) ৵০...৴০

জীবনালোক (Imitation of Christ অবলম্বনে লিখিত) উমাপদ রায়)।০...৵০

জীবন বেদ (ষষ্ঠ সংস্করণ) মূল্য ॥০

জীবন সম্বল (শশিভূষণ বসু) ৵০...৴০

জীবন ধর্ম্ম (সুরেন্দ্রশশী গুপ্ত) ৵০...৴০

জীবনের সুখ (উপন্যাস) (ইন্দুপ্রকাশ বন্দোপাধ্যায়) ॥০

জীবনকাব্য ৵০...৴০

জ্যোতিকণা (নবদ্বীপচন্দ্র দাস) ৴০...৶১০

জীবনালেখ্য (৺ দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়) ।০...৵০

জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি ৸০

ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশু—ললিতমোহন দাস এম, এ ৴০...৶১০

তত্ত্ব-পরিমল (কালীচন্দ্র ঘোষাল ।০
তাপসমালা (৬ষ্ঠ খণ্ডে সমাপ্ত) ৩৲...২॥০
তাপসী (অমৃতলাল গুপ্ত, ২য় সংস্করণ) এই সংস্করণে কাশীর তপস্বিনী রাজকন্যা মালিনী, সন্ন্যাসিনী সীতাদেবী, সন্ন্যাসিনী সুমেধা, জর্ম্মানীর ধর্ম্মশীলা রাণী লুইসা প্রভৃতি কয়েকটি নূতন জীবনচরিত মুদ্রিত হইয়াছে।
মূল্য কাগজের মলাট ১৵০...১৲
তোমরা ও আমরা (ক্ষিতিন্দ্রনাথ ঠাকুর) ।৶০...।০
থেরীগাথা (বিজয়চন্দ্র মজুমদার ১৲...৸০
দীনাত্মা কানাইলাল সেন ।০...৵০
দৈনিক (নূতন সংস্করণ) লাবণ্যপ্রভা সরকার। একত্রে বাঁধা দুই খণ্ড ২৲ এবং ২য় খণ্ড ১৲ স্থলে ॥০
দৈনিক উপাসনা (ব্রহ্মানন্দ) নূতন প্রকাশিত ।০
দীপ্তি ("বিকাশ" প্রণেতা) ৵০...৴০
দীপ্তি শিবার অভিষেক ৴০...৻১০
ধর্ম্মজিজ্ঞাসা—নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত ৩ খণ্ড একত্রে ১॥০...১৲
ঐ ৩য় খণ্ড ॥০ স্থলে ।০
ধর্ম্মসাধন—(ললিতমোহন দাস) ৸০ স্থলে ।৵০
ধর্ম্মের ভিত্তি (অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী) মূল্য ১।০...।৵০
ধর্ম্মসূত্র ৴০...৻১০
ধূলামাটী (শ্রীললিতমোহন সেন) ৵০ স্থলে ৴০
ধর্ম্মশিক্ষা (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) ৴০
ধর্ম্মজীবন (ডাঃ ধর্ম্মদাস বসু) ১॥০...১৵০...বাঁধান ১৸০...১।০
ধর্ম্মজীবন (শিবনাথ শাস্ত্রী) ২য় খণ্ড) ৸০...।৴০
ধর্ম্মজীবন (শিবনাথ শাস্ত্রী) ৩য় খণ্ড ৸০...।৵০
ধর্ম্মাদর্শ ৴০...৻১০
ধ্বংশোন্মুখ জাতি (P. N. Dutt B. Sc.) ৴০
নবপ্রেম সাধনা (তত্ত্বভূষণ) ৴১০...৴০
নিবেদন (৺প্রকাশচন্দ্র রায়) ...৶০
নীতিকথা (লাবণ্যপ্রভা সরকার) ।৶০
নিত্য ভিক্ষা (ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী) ।০...৶০
নেপালে বঙ্গনারী, (হেমলতা সরকার) ১৲...৸০
পরিবারে শিশুশিক্ষা ৴১০...৻১৫
প্রাচীন ইতিহাসের গল্প (প্রভাত মুখোপাধ্যায়) ... ১৲...৸০
পারিবারিক প্রার্থনা (ধর্ম্মদাস বসু) ৸০...॥০
পুণ্যবতীনারী (শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত ৸০ স্থলে ॥০
পুষ্পাঞ্জলী (শিবনাথ শাস্ত্রীর কবিতা) ।০...৶০
পুণ্য কাহিনী (কালীচন্দ্র ঘোষাল) ।৶০...।০

পৌরাণিক কাহিনী ১ম ।০
ঐ ২য় ।৵০
পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম (আচার্য্য দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।০...৵০
প্রিয়নাথ শাস্ত্রী ৸০...।৶
প্রভাতী (শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর) ৸০
প্রকৃতিচর্চ্চা (উমাপদ রায়) ।০...৶০
প্রার্থনামালা—গিরিশচন্দ্র মজুমদার (থিওডর পার্কারের প্রার্থনাবলীর অনুবাদ) ।০
প্রার্থনা (ব্রহ্মানন্দ) ব্রহ্মমন্দির ৵০...।০
প্রার্থনা ও প্রসঙ্গ (গুরুদাস চক্রবর্ত্তী) ১৲ স্থলে ॥০
পূর্ব্ব বাঙ্গলা ব্রাহ্মসম্মিলনীর একত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশনে সভানেত্রী শ্রীমতী কামিনী রায়, বি, এ, মহোদয়ার অভিভাষণ) —৴০
পাগলের কথা (দেবেন্দ্রনাথ দাস) ১৲
প্রবচন সংগ্রহ (দ্বারকানাথ) ৻১০
বাতায়ন (৺অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী) ॥০ স্থলে ৵০
বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী (বঙ্কবিহারী কর) ২॥০
বুদ্ধদেবের স্থান (ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী) ৵০
বৈদান্তিক পরলোক তত্ত্ব ৴০
ব্রাহ্মধর্ম্ম (মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ) ৸০
ব্রহ্মসঙ্গীত (১০ম সংস্করণ)
Silk bound ২৵০
ঐ ঐ
Cloth bonud ২৲
ঐ ঐ
Unbound ১॥৵০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (কাঙ্গালীচরণ সেন) ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ খণ্ড প্রতি খণ্ড ১।০ স্থলে ১৲
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান, (মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অগ্নিময় ব্যাখ্যান নিচয়) আবাঁধা ৸০...॥০
ব্রহ্ম দর্শন (শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার এম্ এ প্রণীত) ।৵০
ব্রহ্মোপাসনা (মহর্ষি) ৴০
ব্রহ্মজিজ্ঞাসা (ব্রহ্মবাদের দার্শনিক প্রমাণ ও ব্যাখ্যা) (সীতানাথ তত্ত্বভূষণ) ২৲...॥০
ব্রাহ্মধর্ম্মতত্ত্ব—(৩য় সংস্করণ) ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মোটামুটি সকল কথা এবং ধর্ম্ম ও সামাজিক অনুষ্ঠানাদির সংক্ষিপ্ত প্রণালী ॥০...৴০
ঐ (পুরাতন সংস্করণ) ৴...৵০
ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রশ্নোত্তর ৴০...৻১০
মায়ের ভালবাসায় আমাদের আশা (সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী) ৴১০...৻১৫
যুগপূজা (বিজয়চন্দ্র মজুমদার) ।০—৵০
রাজ নারায়ণ বসুর বক্তৃতা ১ম ও ২য় খণ্ড—প্রত্যেক খণ্ড ॥০...।০
রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত ১৲
রাজা রামমোহন রায়—(শশিভূষণ বসু) প্রণীত ॥০—৴০

রাজারামমোহন রায় (নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়) ১৲...৷৶০
রীতিনীতি (নবদ্বীপচন্দ্র দাস ৴০
ব্রাহ্মধর্ম্ম শিক্ষা—সীতানাথ তত্ত্বভূষণ (বালকবালিকার উপযোগী ধর্ম্মশিক্ষা ও সাধনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুস্তক) ।০...৵০
ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃতি ১৲
ব্রাহ্মসমাজের সাধ্য ও সাধনা ॥৶০...।৴০
ব্রহ্মোপাসনা প্রণালী (শিবনাথ শাস্ত্রী) নূতন সংস্করণ ৵০...৴০
ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষত্ব ।৶০...।০
ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ও আমার জীবনের পরীক্ষিত বিষয়—বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ৶০ ৵০
ব্রাহ্মধর্ম্মসাধন ও উন্নতি (গণপতি চক্রবর্ত্তী ৴০...৻১০
বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম—(কুমুদনাথ চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ,) ৴১০...৴০
ব্রাহ্মসমাজে বৈষ্ণব তরঙ্গ—(অবিনাশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়) ৴০
ব্রাদার লরেন্সের পত্রাবলী—(শ্রীহিমাংশুপ্রকাশ রায়) ৶০
বালকবালিকাগণের প্রার্থনা—(হরিশ্চন্দ্র দত্ত) ৴০...৻১০
বিধান (আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়) ৵০
ব্রহ্মচর্য্য (ভগিনী ডোরা) একটী চিরকুমারী পাশ্চাত্য নারীর জনসেবার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ।৶০...৶
ব্রাহ্মসমাজে চল্লিশ বৎসর—(শ্রীনাথ চন্দ) তিনি কিরূপে ব্রাহ্মসমাজে আসিলেন ; ৪০ বৎসর কি কি কার্য্য করিলেন এবং ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজের স্থাপনাবধি ইতিহাস, বাঁধান ১৲...৸০
স্বর্গীয় ব্রজসুন্দর মিত্র—উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পূর্ব্ববঙ্গের শিক্ষা সমাজ ও ধর্ম্মান্দোলনের আংশিক চিত্র—(হেমলতা সরকার) ১।০ বাঁধান ১॥০
বিশ্বকর্ম্মার সুসমাচার—(হরিশ্চন্দ্র দত্ত) ০
বক্তৃতা-মঞ্জরী ৵০
ভক্ত কালীনারায়ণ গুপ্তের জীবন বৃত্তান্ত (বঙ্কবিহারী কর) ॥০
ভক্তিলীলা (নূতন সংস্করণ) শ্রীনাথ চন্দ) ।০...৵০
ভক্তি চৈতন্যচন্দ্রিকা (ভাই ত্রৈলোক্য নাথ) ১৲...৸০
ভগবৎ গীতা সমালোচনা (জয়গোপাল দে) ।৵০
মহদ্বাক্যাবলী ৴১০...৻১৫
মহাবাক্য (কালীচন্দ্র ঘোষাল, Imitation of Christ অবলম্বনে) ।০—৶০
মাধুরী (সরোজিনী দত্ত এম্, এ।) ১৲—৸০
মাঘোৎসব (ব্রহ্মানন্দ) নূতন সংস্করণ ।০...৶০
মানব সখা ৶০...৴১০

মহতী বাণী (আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়) ৵৹
ম্যাডাম গেঁয়ো (নির্ঝরিনী ঘোষ) ৷
কাপড়ের মলাট ১৲
মহর্ষিদেবের ফটো চিত্র ১৲ স্থলে ৷৹
মহাপুরুষপ্রসঙ্গ (ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী) ৷৵৹—৷৹
মা (ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর) ৷৹
শ্মশানভস্ম (কেদারনাথ রায়) ৷৹—৷৵৹
শরচ্চন্দ্র (অমরচন্দ্র দত্ত প্রণীত) ১৲—৷৹
শিবচন্দ্র দেব ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীর জীবনী ২৷৹—৸৹
শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মজীবনী (নূতন সংস্করণ পরিবর্দ্ধিত) ৪৲ স্থলে ২৷৹
পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবনচরিত (হেমলতা সরকার) ৩৷৹...৩৲
শিখ পরিচয় (শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র) ।৹
শ্রদ্ধায় স্মরণ—শোকের সময়ের উপযোগী পাঠ এবং শ্রাদ্ধের উপাসনা। (লাবণ্যপ্রভা সরকার) ৷৹
শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম্ম ১৷৹...১৵৹
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এবং তাঁহার স্বভাব নিষ্ঠ যোগ ৷৹...৸৹
শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য ও শাঙ্কর দর্শন
১ম ভাগ ২৲
২য় ভাগ ৩৲
শ্রীনাথ দত্তের জীবনকথা (হরসুন্দরী দত্ত) ১৷৹ স্থলে ৸৹
শ্রীভগবৎ কথা (ক্ষিতীন্দ্র ঠাকুর)
অবাধা ৷৹...।৹
শিষ্টাচার (গণপতি চক্রবর্ত্তী) ।৹...৵৹
ঐ দ্বিতীয় খণ্ড ৷৹...।৹
শ্রাদ্ধিকী (চণ্ডীচরণ সেন প্রভৃতির জীবনী) ।৹
শ্রীনিবাস আচার্য্য চরিত (অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়) ১৷৹
শিবনাথ (সুনীতি দেবী) ৷৹
শিক্ষাসমস্যা ও কৃষিশিক্ষা (ক্ষিতিন্দ্রনাথ ঠাকুর) মূল্য ৷৹
শিক্ষা (যোগেন্দ্রনাথ মিত্র) ।৹
শিশুর সদাচার ৴১
সুকন্যা বিভুবালা ৵৹—৴৹

সাকার ও নিরাকার উপাসনা—(নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সাকারবাদ খণ্ডন ও নিরাকারের প্রতিষ্ঠা) ।৹—৵৹
সংস্কার ও সংরক্ষণ (ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্‌-এ, সমাজতত্ত্ব বিষয়ে দার্শনিক আলোচনা) ৸৹—৷৹
সন্ধ্যায় (ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর) ১৷৹...১৲
সুখের পথ (হৃদয়চন্দ্র দাস) ।৹—৵৹
স্বাভাবিক যোগ (কমলাকান্ত ব্রহ্মদাস) ১...৸৹
সাধন প্রসঙ্গ (আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়) মূল্য ৷৹
সাধন প্রসঙ্গ (গুরুদাস চক্রবর্ত্তী) ।৹...৵৹
সাধন-সঙ্কেত (নবদ্বীপচন্দ্র দাস) সাধকগণের পক্ষে অতি অপূর্ব্ব সামগ্রী ।৹...৶৹
সেবকের নিবেদন ১ম ও ২য় খণ্ড (নূতন সংস্করণ—আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন) ১৲...৷৹
ঐ তৃতীয় খণ্ড ১৲...৷৹
ঐ ৪র্থ খণ্ড ৸৹...৷৹
ঐ ৫ম খণ্ড ৷৹...৷৹
সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন—(মনোমোহন চক্রবর্ত্তী) ৷৹...।৵৹
সত্যপীর ব্রত কথা বা সমাজ সংস্কার (গণপতি চক্রবর্ত্তী) ।৹
সত্য ও সংস্কার—রজনীকান্ত গুহ ৵৹...৴৹
সৎপ্রসঙ্গ ৴১৹
সনেট পঞ্চাশৎ (শ্রীপ্রমথ চৌধুরী) ।৴৹
স্বরগ্রাম বর্ণপরিচয়—সঙ্গীত শিক্ষার্থীর উপযোগী ৴৹...৲৲
সঙ্গত (সঙ্গতসভার আলোচনা) ১৲...৸৹
সঙ্গীত প্রবন্ধ ৵৹...৴৹
সঙ্গীত মঞ্জরী (কালীপ্রসন্ন ঘোষ) ।৹...৵১
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলী নূতন সংস্করণ ৵৹
হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা (রাজনারায়ণ বসু) ৷
হরিগাথা (ললিতমোহন বসু) ৴৹
বরফের দেশ সুরেন্দ্রশশী গুপ্ত ৷৹

রামায়ণ (রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়) কাপড়ের বাঁধা ৩৲

প্রত্যেকটির মূল্য এক আনা

অনন্তের উপাসনা (নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়)
আলোক
জীবন ছায়া
দাস বা সাধনতত্ত্ব
পুণ্যদাপ্রসাদ (জীবনী)
প্রসাদী ফুল
ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিক ইতিবৃত্ত
মানবাত্মার সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষা ও ব্রাহ্মধর্ম্ম (ডাঃ পি কে রায়)
সমাজ সঙ্গীত (হরকালী সেন)
সাধনাশ্রম (সাধন ও প্রচারক প্রসঙ্গ)

প্রত্যেকটির মূল্য দুই পয়সা

তোমার বাবা কি ঘরে আছেন ? (শতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী)
ধর্ম্ম বিষয়ক প্রশ্নোত্তর (বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী)
পূজার ফুল
পূজার আয়োজন
বালিকা
ব্রাহ্মধর্ম্মের আধ্যাত্মিক ও শাস্ত্রীয় ভিত্তি
যৌবন ও ধর্ম্ম
সমাজ সংস্কারের কথা
সাধন পঞ্চক (বৈরাগ্য)
সাধু অলর্ক চরিত

প্রত্যেকটির মূল্য এক পয়সা

একটি চিত্র
খাসিয়াজাতি ও খাসিয়ামিশন
চিন্তা কণিকা (সীতানাথ তত্ত্বভূষণ)
নগেন্দ্র বালা (সীতানাথ বাবুর স্ত্রীর জীবনী)
প্রকৃত বিশ্বাস
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহ
আত্মরক্ষা ও সামাজিক উন্নতি
সাথী (ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের উপযুক্ত)
সাধু দৃষ্টান্ত
শুভশাস্ত্র সংগ্রহ

SUPPLEMENT TO THE TATTWAKAUMUDI 1ST MAGH, 1333.

SADHARAN BRAHMO SAMAJ, 211. Cornwallis Street, Calcutta.
Reduction Sale for Maghotsav from 15th Jan. to 12th Feb. 1927.

New Books :—

Krishna and the Puranas—Pandit Sitanath Tattvabhushan Rs. 1-4

Day Unto Day (A Companion to Daily Devotion, As. 4-0

Rebekah Simeon Walker—I. A. Isaac Rs. 2

The Children's Edition of the Pilgrim's Progress—Bunyan, John Rs. 1-14

The Religious Drama—Crosse G., M.A. Rs. 1-14

Religious Education of the Young—Davidson Rs. 3

Morality without Religion—Drawbridge, C.L., M.A. As. 3

Felix Holt, the Radical—Eliot, George Rs. 1-14

The Individual & Society (trans. W. R. V. Braid)—Eueken, Rudolph Rs. 1-14

Comparative Religion—Geden, A.S.D.D. Rs. 2-10

Personal Religion by Green. Rs. 1-14-0

What is meant by a Personal God and by Revelation ?—Hardy, T.J., M.A. As. 3

A Little Anthology—Hardy, Olive Rs. 1-14

The Presence of God—Holmes W. H. G. Rs. 2-10

Personal Idealism & Mysticism (Paddock Lecture 1906)—Inge, Dean Rs. 3-12

The Imitation of Christ by Kempil, Thomas Rs. 1-2-0

A serious call to a Devout & Holy Life—Law William, M.A. Rs. 1-5

The Practice of the Presence of God—Lawrence, Brother As. 6

St. Angustine's City of God—Hitchock F.R.M., M A., B.D. Rs. 2-4

Twelve Services of Family Prayer—"Layman, A" As. 6

The Psychological Approach to Religion—Mathews, Rev. W. R. Rs. 2-4

Zoroastrian—Meneile, Rev. H. As. 3

A Short History of the Oxford Movement—Ollard, S. L., M.A. Rs. 4-8

Fellowship in Prayer, Some Practical Suggestions—Porter, Horace Rs. 1-2

Private Prayers—Pusey, E. B. D.D. As. 12

God and the World—Rabinson, Rev. A. W., D.D. As. 9

Reality and Religion—Sadhu Sundar Singh Rs. 1-4 0

The Layman's Book of Prayers—Sampson, G. As. 12

The Practical Religion—Staby, Vernon Rs. 1-8

The Natural Religion—Staby, Vernon Rs. 1-14

Uncle Tom's Cabin—Stowe, H. Beecher Rs. 1-2

The Inner Way—Tauler, John Rs. 1-2

Burma, Its People and Religion—Trotman, J. E. Rs. 1-8

The Revelation of Eternal Life—Weston, Bishop. Rs. 3-6-0

The Ten Upanishads in Devanagari characters. Edited by Pandit Sitanath Tattvabhushan—with Sanskrit annotations and English translations—Second Edition in one Volume. Rs. 2-8.

The Message and Ministration by Dewan Bahadur Sir Venkata Ratnam, Kt., M.A., L.T., F.M.V.
Vol I Pp. xxxix and 398 Free to purchasers of Vols. II & III
Vol. II Pp. xx & 420 1-8 0
Vol. III Pp. xxx & 459 1-8-0
N.B. Each Vol. with introduction and photograph portrait and limp bound with Calico edges.

A Manual of Brahmo Ritual and Devotions by Sitanath Tattvabhushan As. 8-0

True Faith (New Edition) As. 4

Offering of Srimat Maharsi Devendranath Tagore 0-1-0

Arctic Home in the Rig-Veda An un-tenable position by Prof. Nalinikumar Dutta, M.A., Ph.D. Re. 1, now 0-10-0

All-India Theistic Conference Session at Lucknow by Prof. U. N. Ball Re. 1

Brahma Sadhan or Endeavours after the Life Divine—by Tattvabhushan (Cloth) Re. 1-8 now Re. 1

Brahmajijnasa An inquiry into the Philosophical Basis of Theism (S. N. Tattvabhushan) Rs. 1-0-0

Lectures in England (English Edition) (Vol. I. and II. combined)—by Minister K. C. Sen. Rs. 2-8 now Rs. 2

Lectures in India (Minister K. C. Sen) Rs. 3 now Rs. 2-8

Ram Mohan Ray, Life and Letters by S. D. Collet, edited by H. C. Sarkar M. A. Rs. 2-8-0 now Rs. 2

Rammohan Roy, The Father of Modern India by H. C. Sarker, M.A, 4 As. now 0-2-0

Brahmo Prayer-book by H. C. Sarkar, M A. 12 As. now 0 10-0

Religion of the Brahmo Samaj by H. C. Sarkar, M.A. 0-4-0

Spiritual Education and the Religion of Brahmo Samaj by Dr P. K. Roy As. 8 now 0-5-0

Sivanath Sastri by S.N.Tattwabhushan As. 8 now 0-4-0

The Theism of The Upanishads and other subjects, by Pandit Sitanath Tattvabhushan Rs. 2-0-0

Three stages of a Bible's life As. 4-0

Trust Deeds of some Brahmo Samajes, Part I As. 8 now 0-4 0

Trust Deeds of the Sadharan Brahmo Samaj As. 2-0

Twenty five years work of Brahmo Samaj in Khasi Hills A full account of the work with 31 illustrations As. 4 now 0-2-0

Brahmo Sangit in Khasi By Nilmani Chakravarty 0-3-0

History of the Brahmo Samaj. Sivanath Sastri.
Vol. I. 1-8-0
Vol. II. 1-8-0

Men I have Seen, by Sivanath Sastri Re. 1

SPECIAL REDUCTION.

One Anna Each.

All India Theistic Conference (Bankipur session.)

The Fundamental principles of Brahmoism by Pandit Sitanath Tattvabhusan.

Can we save ourselves yet ?—by P. N. Dutt, B.Sc.

Brahmoism by S. B. Bose.

Religion of Love, by Rajnarayan Bose.

Thirsting after God (prayers) by S. N. Tattvabhushan.

Two Pice Each.

The possibility of an all India Mission organisation by Nilmani Chakrabarty.

Educational Activities in the Brahmo samaj by S C. Roy.

Brahmo Samaj and the Religious Education.

Possibility of a universal Religion Rev. C. W. Wendte.

Discourse on Education.

Leading Ideas of Theism—Sir R. G. Bhandarkar, K.C.I.E.

One Pice Each.

All-India Theistic Conference (Address of Sir. K. G. Gupta.)

The Brotherhood of Man. By C. Gordon Ames D. D.

Principles of Religion

Revelation of the Father By S. H. Mellone.

The Transient and the Permanent in Christianity—by Theodore Parker.

The Miracles of the Bible. By Walter Lloyd.

Registered NO 65

অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৬ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৪৯ম ভাগ। ১লা ফাল্গুন, রবিবার, ১৩৩৩, ১৮৪৮ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯৮ প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০

২১শ সংখ্যা। 13th February, 1927. অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা

হে করুণাময় পিতা, উৎসবান্তে আমরা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তোমার অপার প্রেম ও করুণা স্মরণ করি। উৎসবের মধ্যে তুমি মুক্ত-হস্তেই তোমার করুণা বিতরণ করিয়াছ, আশাতিরিক্ত ভাবেই তোমার প্রেমের দান আমাদিগকে দিয়াছ। কিন্তু আমাদের উদাসীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতা বশতঃ আমরা সকলে তাহা স[illegible] রূপে গ্রহণ করিতে পারি নাই। কত সময় কত ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ[illegible] মত্ত হইয়া, অসারে মজিয়া, তোমা[illegible]কে [illegible] নানা দুঃখ বেদনাতে জর্জ্জরিত হই[illegible]ন, ও অপ[illegible] করিয়াছেন! তোমার প্রেম ও [illegible]াণকে প[illegible]ান করিতে[illegible] অপ্রেম ও কল্যাণকে বরণ করিয়া লইয়াছেন, কি[illegible] মহা অনিষ্ট সাধন করিয়াছেন। তোমাকে[illegible] পথে চলিতে গেলে যে কি সর্ব্বনাশ সাধিত হয়, কি প্রকারে মৃত্যুর পথে ধাবিত হইতে হয়, তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তুমি আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছ। আমাদের পথ যে কত সূক্ষ্ম ও দুর্গম, কিরূপ সামান্য সূত্র অবলম্বন করিয়া আমরা হয় জীবনের পথে, না হয় মৃত্যুর পথে চালিত হইতে পারি, আমাদিগকে কত সতর্ক হইয়া, তোমার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া, জীবনপথে চলিতে হয়, তাহা তুমি এবার আমাদিগকে স্পষ্টরূপেই বুঝিতে দিয়াছ। তবু যে কেন আমাদের চৈতন্যোদয় হয় না, আমরা দেখিয়াও দেখি না, ঠেকিয়াও শিখি না, বুঝিতে পারিতেছি না। হে জীবনের অদ্বিতীয় প্রভু, তুমি কৃপা করিয়া সকল জীবনে তোমার কর্ত্তৃত্ব ও প্রভুত্ব স্থাপন না করিলে যে আমাদের এই দুর্ব্বলতা ও স্বেচ্ছাচারিতার অবসান হইবে না, বর্ত্তমান দুর্গতি বিদূরিত হইবে না, তোমার পবিত্র প্রেমের রাজ্য আমাদের মধ্যে স্থাপিত হইতে পারিবে না। হে করুণাময় পিতা, তুমি কৃপা করিয়া আমাদের সকলকে তোমার কর, নূতন বর্ণে, নূতন ভাবে তোমার অনুগত হইয়া চলিতে সমর্থ কর। আমাদের মধ্যে তোমার পুণ্যরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হউক। সর্ব্ব প্রকারে তোমারই জয় হউক। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

সপ্তনবতিতম মাঘোৎসব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

[illegible] মাঘ (১৭ই জানুয়ারী) সোমবার—

[illegible]কীর্ত্তন ও উপাসনা। শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র সোম আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

মাঘোৎসব আমাদের বড় প্রিয়। ১১ই মাঘের স্মৃতি আমাদের নিকট বড়ই মধুর। আমরা এই ১১ই মাঘকে অবলম্বন করিয়া উৎসবে প্রবৃত্ত হই। মাঘোৎসব কি তবে প্রায় শত বৎসরের পূর্ব্বের একটী ঘটনার বার্ষিকী মাত্র। সেই মঙ্গল স্মৃতিই কি আমাদের আনন্দের হেতুভূত বস্তু, না আরো কিছু আছে? আছে বৈ কি? শতবৎসরের ব্রহ্ম-সঙ্গীতে সাহিত্যে সাধকজীবনে বিধাতার যে দান, ব্রহ্মের যে আত্ম-প্রকাশ, তাহা কি ব্রাহ্ম ভুলিতে পারে? যে সাধনসম্পদ্ ব্রাহ্ম ভক্তজীবনে আসিয়াছে, যাহা ব্রহ্মার্থীর উত্তরাধিকার হইয়া রহিয়াছে, তাহা ভাবিয়া ব্রাহ্ম আনন্দে উৎফুল্ল না হইয়া পারে কি?

কলিকাতায় ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠাকালে রাজা "ভাব সেই একে জলে স্থলে শূন্যে যে সমান ভাবে থাকে" এই বলিয়া তাঁহার দেশবাসীকে 'একম্ সৎ' এর দিকে আহ্বান করিয়া-ছিলেন। সেই ডাক যাহাদের 'কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল'

আর 'আকুল করিল মোর প্রাণ', তাহারা "দিব্যোহ্যমূর্ত্ত পুরুষে" প্রতীতি না করিয়া পারিল না। এই ব্রহ্মপ্রতীতি হইতে ব্রাহ্ম সাধক ও ভক্তজীবন ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। এই সাধন ও ভক্তি কিরূপ আকার ধারণ করিল আমাদের আরাধনার মন্ত্রই তাহার ইঙ্গিত করিতেছে। "সত্যম্ জ্ঞানমনন্তম্ ব্রহ্ম আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি শান্তং শিবমদ্বৈতম্ শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।" গোড়ার কথা ব্রহ্মসত্তার অনুভূতি। "অস্তীতি ব্রুবতোহন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে।" তিনি আছেন যাহারা বলিতে না পারিল, তাহারা কিরূপে ব্রহ্মের অনুভব করিবে? তিনি অধে, তিনি ঊর্দ্ধে, তিনি উত্তরে, তিনি দক্ষিণে, তিনি সম্মুখে, তিনি পশ্চাতে—এই অনুভূতি লইয়া সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে হয়। এই সত্তার অনুভূতির কথা কহিতে গিয়া টেনিসন্ বলিতেছেন—"হঠাৎ দেখিলাম উগ্র ব্যক্তিত্ববোধ যেন গলিয়া অসীম সত্তায় মিশাইয়া গেল। ইহা একটা অস্পষ্ট অনুভূতির অবস্থা নয়। যতদূর স্পষ্ট, যত দূর অপার্থিব হইতে পারে, ইহা তাহাই; কথায় প্রকাশ করিয়া বলিবার যো নাই, কিন্তু বেশ অনুভব হয় যে, মৃত্যু এক হাস্যোদ্দীপক অসম্ভব ব্যাপার; ব্যক্তিত্ববোধ বা অহংকারের বিলোপ হয় (যদি ইহা তাহাই হয়) বটে, কিন্তু বিনাশ ঘটে না, বরং বাস্তব জীবন লাভ হয়।" ইহা ব্রাহ্ম সাধকের ভূমানুভূতি বৈ কি? এই ভূমাতে পৌঁছিয়া সাধক আর আপনাকে 'শোকভাক্' মনে করেন না। স্বরাট্ স্বতন্ত্র ব্রহ্মের আনন্দ তাঁহাতে 'উপজয়'। ব্রহ্মের আনন্দকে জানিয়া আর ব্রহ্মজ্ঞ কোন ভয় রাখেন না। আরাধনা মন্ত্রের "সত্যম্ জ্ঞানমনন্তম্ ব্রহ্ম আনন্দরূপমমৃতম্ যদ্বিভাতি" ব্রাহ্ম সাধকের ব্রহ্মপ্রতীতির কথাই প্রকাশ করিতেছে। ব্রহ্মের সাক্ষিত্ব যে শুধু তাঁহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা নয়, ব্রহ্মের অনন্ত জ্ঞানবল ক্রিয়ার মধ্যে, ভূমা জীবনের মধ্যে স্থান পাইয়া তিনি ব্রহ্মের নিত্যমুক্ত স্বভাবের সেই আনন্দ তাহা অনুভব করিতেছেন। এই ভূমানন্দ ব্রহ্মস্বরূপে ঐশ্বর্য্য পর্য্যায়ের অন্তর্গত আনন্দ, ইহা রসের আনন্দ নয়। ব্রহ্মের মাধুর্য্য পর্য্যায়ে 'শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্ শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্' স্বরূপতা পাইয়াছে। রামানুজের ভাষায় ব্রহ্ম কল্যাণগুণময় ও হেয়গুণ-বিবর্জ্জিত। ব্রহ্ম শুধু সত্তা ও শক্তি নহেন, এমন কি শুধু ভূমানন্দও নহেন, তিনি প্রেম, যে প্রেম সদাই মানুষকে অসত্য হইতে সত্যে, অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে, মৃত্যু হইতে অমৃতে, পাপ ও অপ্রেম হইতে পুণ্যে ও প্রেমে লইয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত রহিয়াছে। ভক্ত রামানুজ বলেন গাভী মাতা যেমন চাটিয়া চাটিয়া নববৎসের গাত্রক্লেদ অপসৃত করে, তেমনি ভাবে ভগবান জীবকে পাপ মুক্ত করেন। ব্রহ্মের এই প্রেমের 'রীত' দেখিয়া সাধক ব্রহ্মপ্রীতি অনুভব করেন। শান্তস্বরূপের অনুধ্যানে ব্রাহ্ম সাধক স্থিতপ্রজ্ঞা লাভ করেন। বাস্ত প্রেমিক ব্রহ্মের আরাধনা করিয়া ব্রাহ্ম ভক্ত ব্রহ্ম-প্রেমে ও জীব-প্রেমে উন্মত্ত হইয়া উঠেন। প্রেমপ্লাবনে ব্যক্তিত্বের আলিগুলি ডুবিয়া যায়। তিনি 'ত্রিধা, পঞ্চধা, নবধা' হন, বহু জীবনের সঙ্গে এক হইয়া যান। এতাদৃশ অখণ্ড অদ্বৈতজীবন লাভ হয়। তিনি অপরের আনন্দে আনন্দিত, শোকে শোকান্বিত হন। পাপ তাপের বোঝা পরিশ্রান্ত ভারাক্রান্তের কাঁধ হইতে নামাইতে না পারা পর্য্যন্ত তাঁহার চিত্ত ব্যাকুল হইয়া বেড়ায়। এই বৃহৎজীবন, ব্রহ্মজীবন এখন তাঁহার তপস্যার বিষয়, ভজনার জিনিষ। সাধক ব্রহ্ম-প্রীতি হইতে ব্রহ্ম-ভক্তিতে উপনীত। এই ব্রহ্ম-ভক্তি অব্যভিচারিণী, অনন্য-ভজনাশূন্যা, একান্তিনী হইয়া যখন দাঁড়ায়, তখন ব্রহ্ম পুত্র হইতেও প্রিয়, বিত্ত হইতেও প্রিয়, আর সকল হইতেও প্রিয় হন। এবার ব্রহ্মভক্তি ব্রহ্মরতিতে পরিণত হইল। প্রাণরমণকে এখন সাধক 'সুন্দরং রুচিরং রসরূপং পূর্ণং' রূপে পাইয়াছেন, তাঁহার হৃদয় এখন আনন্দেতে নাচে গায়। স্বাস্থ্যের লক্ষণ ক্রীড়া। আত্মা যখন স্বাস্থ্য লাভ করিল, তখন সে ব্রহ্মক্রীড় হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? কিন্তু ব্রহ্মজীবন ক্রীড়াবসায়ী নহে ক্রিয়াবসায়ী। ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ। ইনি ক্রিয়াবান্ ব্রহ্মবিদ্‌দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। জীবনের পরিচয় ক্রিয়াতে। সাধককে তাঁহার ব্রাহ্মী স্থিতি, ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দ রসপানেই বিভোর করিয়া চুপ হইয়া বসিয়া থাকিতে দেয় না, ব্রহ্ম-ক্রিয়াতে নিযুক্ত করে। ধ্যানরত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে অন্তরাত্মার নির্দ্দেশে হিমালয় পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে দৌড়াইয়া আসিতে হইল। অন্য ক্রিয়াবান ভক্তদের কথা বলিবার আবশ্যকতা নাই। এই যে নবযোগ ও নবভক্তির প্রকাশ, গত শতবর্ষের সাধনসম্পদ, যাহা ব্রাহ্ম সাধু ভক্তদিগের জীবনে প্রকটিত হইয়া ব্রহ্মসঙ্গীতে সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে, যাহার কিঞ্চিন্মাত্র রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলীতে প্রকাশিত হইয়া জগতের পূজা পাইয়াছে, তাহা আমাদের আশা ভরসার উদয় করিয়া দিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই।

দেখিতেছি ব্রাহ্মজীবনে উপলব্ধ ও ব্রাহ্ম সাহিত্যে সম্প্রতিষ্ঠিত "সত্যম্ জ্ঞানমনন্তম্ ব্রহ্ম আনন্দরূপমমৃতম্ যদ্বিভাতি শান্তং শিবমদ্বৈতম্ শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্ সুন্দরং রুচিরং রসরূপং পূর্ণং" এই স্বরূপসাধনের মধ্য দিয়া দেশে এক সুধার ধারা প্রবাহিত [illegible]। এই নব গঙ্গা আবার সগর বংশকে উদ্ধার করিবে। হিন্দু আর মরিয়া থাকিবে না, মুসলমান মোহগ্রস্ত রহিবে না, ভেদবুদ্ধির বিলোপ হইবে। মহা সংযোগ, মহা সম্মিলন সংঘটিত হইবে। সে উষার রক্তিম রাগ আকাশে দেখা দিয়াছে। কবির ভাষায় বলি—

এ নহে কাহিনী এ নহে স্বপন
আসিবে সে দিন আসিবে।

আমরা মাঘোৎসবের আনন্দে মত্ত না হইয়া কি থাকিতে পারি?

গভীর নিনাদে হরি নামে গগন ছাওরে,
নাচ হরি ব'লে দুবাহু তু'লে, হরিনাম বিলাও রে,
হরিনামানন্দরসে অনুদিন ভাস রে।

সায়ংকালে ডাক্তার কালিদাস নাগ "The Brahmo Samaj and Indian Renascence (ব্রাহ্মসমাজ ও ভারতে নব জাগরণ) বিষয়ে ইংরাজীতে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

৪ঠা মাঘ (১৮ই জানুয়ারী) মঙ্গলবার— প্রাতে উপাসনা। শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেন আচার্য্যের কার্য্য করেন। "সকলের জন্যই ব্রহ্মকৃপা সর্ব্বদা রহিয়াছে," এই বিষয়ে

তিনি উপদেশ প্রদান করেন। দুঃখের, বিষয় প্রাপ্ত না হওয়াতে, তাহার মর্ম্ম প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

সায়ংকালে সঙ্গত সভার উৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র রায় "শত বর্ষের তপস্যা" বিষয়ে একটি বক্তৃতা পাঠ করেন।

৫ই মাঘ (১৯শে জানুয়ারী) বুধবার—ছাত্র সমাজের উৎসব। যুবকগণ নিকটস্থ পল্লীসমূহে উষাকীর্ত্তন করিয়া মন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, তথায় কিছু সময় কীর্ত্তন হয়। অনন্তর উপাসনা; শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার দত্ত উপদেশের মর্ম্ম এখন পর্য্যন্ত আমাদের হস্তগত না হওয়াতে প্রকাশ করিতে পারিলাম না। প্রাপ্ত হইলে পরে প্রকাশিত হইবে।

সায়ংকালে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় "ইউরোপ ও ভারতবর্ষে ধর্ম্মের বাহ্য প্রকাশ" বিষয়ে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

৬ই মাঘ (২০শে জানুয়ারী) বৃহস্পতিবার—প্রাতে সংকীর্ত্তন ও উপাসনা। পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার উদ্বোধন ও উপদেশের মর্ম্ম এই :—

মহর্ষির চরিত্রের সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক লক্ষণ তাঁহার ধ্যানপরায়ণতা। তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা, সময় সময় সারা রাত্রি ও দিন, ব্রহ্মধ্যানে যাপন করিতেন। আমরা যাহা অর্দ্ধঘণ্টাও করিতে পারি না তাহা তিনি এত দীর্ঘকাল কিরূপে করিতেন? 'গীতা' প্রভৃতি যোগশাস্ত্রে দেখা যায় এবং আমরা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাতেও দেখি যে, কাম বা বাসনা অর্থাৎ ক্ষুদ্র বিষয়ের প্রতি আসক্তিই ধ্যানের প্রধান অন্তরায়। মহর্ষি নিশ্চয়ই এই অন্তরায় জয় করিয়াছিলেন, নচেৎ ক্রমাগত এত দীর্ঘকাল ধরিয়া ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ করিতে পারিতেন না। "যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ"—যাহা লাভ করিলে অপর লাভ তাহা অপেক্ষা অধিক বোধ হয় না। আমরা ব্রহ্মসহবাস অপেক্ষা অন্য লাভ অধিক মনে করি, তাই ক্ষণকাল ব্রহ্মধ্যান করিতে না করিতেই ক্ষুদ্র বিষয়ে মন দিই। কিন্তু মহর্ষি এক দিকে যেমন গভীর ধ্যান-পরায়ণ ছিলেন, অপর দিকে তেমনি ক্ষুদ্রতম কর্ত্তব্যেও মনোযোগী ছিলেন। এই বিষয়ে অনেক কথা শুনিয়াছি, নিজেও কিছু কিছু দেখিয়াছি। আমার প্রথম বয়সের লেখা পুস্তকগুলি তাঁহাকে পাঠাইতাম। বইগুলি পড়িয়া তিনি তাঁহার আশীর্ব্বাদ আমাকে লিখিয়া পাঠাইতেন। এক খানা বই তিনি পান নাই, তাই লোক পাঠাইয়া কিনিয়া লইয়াছিলেন। আমি পরে জানিতে পারিলাম যে সেই লোক তাঁহার প্রেরিত। তৎপরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে সেই বইয়ে লেখা সমস্ত বিষয় আমাকে সংক্ষেপে বলিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মবিদ্যালয় যে বারো বৎসর চলিয়াছিল, সেই কয়েক বৎসরই তিনি স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া ইহার সাহায্যার্থ বার্ষিক পঞ্চাশ টাকা দান করিতেন। আমি একবার শান্তিনিকেতনে (তখন বিদ্যালয় প্রভৃতি হয় নাই) এক সপ্তাহ নির্জ্জন বাস করিয়াছিলাম। মহর্ষি জানিতে চাহিলেন সেখানে আমার সেবা শুশ্রূষা কিরূপ হইয়াছিল। মহান্ হইয়াও ক্ষুদ্র কর্ত্তব্যে মনোযোগ আদর্শ চরিত্রের লক্ষণ। মহর্ষি জীবনের শেষ দশা পর্য্যন্ত বিজ্ঞান দর্শনের আলোচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বিজ্ঞান দর্শন সংক্রান্ত কোনও পুস্তক লিখিয়া যান নাই। তাঁহার গভীর ঈশ্বর-বিশ্বাস ও ধ্যানসাধনের দার্শনিক ভিত্তি কি ছিল, তাহা জানিতে খুব ইচ্ছা হয়, কিন্তু জানিবার কোনও উপায় নাই। তাঁহার প্রকাশিত বক্তৃতা ও উপদেশগুলিতে তাঁহার মতের উল্লেখমাত্র আছে, যৌক্তিক ব্যাখ্যা নাই। কিন্তু এই সকল পুস্তক ধারাবাহিক ভাবে পড়িলে দেখা যায় তাঁহার মত ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। তিনি প্রথমে একান্ত দ্বৈতবাদী ছিলেন, জড় ও জীবকে ব্রহ্ম হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ মনে করিতেন। তাঁহার প্রথম পুস্তিকা "আত্মতত্ত্ববিদ্যাতে" "একাত্মবাদ-নিরসন" নামক একটী অধ্যায় ছিল। উহার দ্বিতীয় সংস্করণে দেখিলাম ঐ অধ্যায়টী উঠাইয়া দিয়াছেন। তখনও তিনি ইহলোকের কার্য্যক্ষেত্রে আছেন। "ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস," "ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের বক্তৃতা," "ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান," "জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি," ক্রম-প্রকাশিত এই সকল গ্রন্থে দেখা যায় তাঁহার প্রথম বয়সের দ্বৈতবাদ পরিবর্ত্তিত হইয়া দ্বৈতাদ্বৈতবাদের আকার ধারণ করিতেছে। এক দিন আমি তাঁহার চরণ দর্শন করিতে যাইয়া দেখি তাঁহার সম্মুখে টেপয়ের উপর একটী প্রস্ফুটিত শ্বেত-পদ্ম রহিয়াছে। আমাকে বসিতে বলিয়াই তিনি ঐ পদ্মটীর দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "দেখ সীতানাথ, তাঁর গায়ের কি সুঘ্রাণ"। ইহাতে বুঝিলাম 'জড়ের' জড়ত্ববোধ তাঁহার চলিয়া গিয়াছে, জগৎ ব্রহ্মময় দেখিতেছেন। তাঁহার ব্যাখ্যানের এক স্থানে আছে যে, যখন ব্রহ্মদর্শন হয়, তখন উষাকালে সূর্য্যচন্দ্রের এককালীন উদয়ে যাহা দেখা যায় তাহারই প্রতীতি হয়। চন্দ্রের কিরণ আপাততঃ স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা স্বতন্ত্র নহে, তাহা সূর্য্যেরই কিরণ। মহর্ষির "জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি"তে জগৎ ও ইহার সমুদয় আকারকে ঐশী শক্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ব্রহ্মধ্যানে অগ্রসর হইতে গেলে ঈশ্বর, জগৎ ও জীবের সম্বন্ধ বিষয়ে একটী দার্শনিক মীমাংসার উপর দণ্ডায়মান হইতে হয়, নচেৎ জগৎ ও জীব সর্ব্বদাই ব্রহ্মোপলব্ধির অন্তরায় হইয়া থাকে। আমরা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের লেখকেরা এরূপ একটী দার্শনিক তত্ত্ব স্থাপন করিয়া মহর্ষির প্রদত্ত ব্রহ্মযোগের আদর্শকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিতেছি। বিষয়জ্ঞান এবং নৈতিক জ্ঞানের বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় আমাদের সমুদয় বিষয়জ্ঞানের আধার "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এবং আমাদের সমুদয় নৈতিক সংগ্রামের কারণ আমাদের মধ্যে "শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্" রূপে ব্রহ্মের প্রকাশ। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ—এই সমুদয় স্বতন্ত্র বিষয় নহে,—এই সমুদয়ের অনুভবকালে এই সমুদায়ের জ্ঞানময় আধার পরমাত্মা আমাদের আত্মারূপে প্রকাশিত হন। আমাদের জ্ঞাত বিষয় আমরা ক্ষণে ক্ষণে ভুলিয়া যাই। এই ভুল চিরস্থায়ী হইত যদি আমাদের অন্তরাত্মা চিরস্মৃতিশীল না হইতেন এবং আমাদিগকে বিস্মৃত বিষয় স্মরণ করাইয়া না দিতেন। আমরা সুষুপ্তিতে সমুদয় জ্ঞান হারাইয়া ফেলি। যদি আমাদের আত্মার আত্মা চিরজাগ্রত থাকিয়া আমাদিগকে না জাগাইতেন,

তবে আমাদের জাগরণ সম্ভব হইত না। আমরা যতই পাপ-চিন্তা ও পাপকার্য্য করি না কেন, আমাদের বিবেকরূপী পরমাত্মা অপাপবিদ্ধ থাকিয়া আমাদিগকে সর্ব্বদাই তিরস্কার ও সাবধান করিতেছেন। জীব ও ব্রহ্ম এরূপ ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ হইলেও একান্ত অদ্বৈতবাদ সত্য নহে। ব্রহ্ম যদি একক হইতেন, জীব যদি তাঁহা হইতে ভিন্ন না হইত, তবে অজ্ঞানতা, জ্ঞানের বিকাশ, বিস্মৃতি, নিদ্রা ও পাপাচরণ একবারে অসম্ভব হইত। এই সকল ব্যাপারে নিঃসংশয়িত রূপে প্রমাণ হয় যে জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, অথচ ব্রহ্মের চির-আশ্রিত। এই ভেদাভেদতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া আমরা মহর্ষি-প্রদর্শিত ব্রহ্মযোগের আদর্শ সাধন করি এবং যোগস্থ হইয়া জীবনের সমস্ত কর্ত্তব্য সাধনপূর্ব্বক ধন্য হই, ঈশ্বর আমাদিগকে এরূপ কৃপা করুন্।

সায়ংকালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ-স্মৃতিসভা। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত অমলকুমার সিদ্ধান্ত (ইংরাজীতে), ডাক্তার কালিদাস নাগ ও সভাপতি মহর্ষির জীবনী সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন এবং শ্রীমতী হেমলতা সরকার নিম্ন লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন :—

আজ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের স্বর্গারোহণের দিন। বিধাতার শুভ বিধানে মাঘোৎসবের প্রারম্ভে এই ৬ই মাঘ দিনটী তাঁর্ স্মৃতি বহন ক'রে আমাদের নিকট উপস্থিত হয়েছে। মাঘোৎসব এক মহা যজ্ঞ; এ যজ্ঞে প্রবৃত্ত হবার পুর্ব্বে, আচার্য্য-গণের তর্পণ আমাদের পবিত্র কর্ত্তব্য। আজ সেই কর্ত্তব্য পালন ক'রে অন্তরকে বিশুদ্ধ করি। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চির স্মরণীয় অনুসরণীয় পুণ্যজীবনের কাহিনী কীর্ত্তন করিয়া জীবন ধন্য করি।

সর্ব্বাগ্রে এই কথাটীর উত্তর দিই—আমরা দেবেন্দ্রনাথকে মহর্ষি বলি কেন? ঋষি কথাটীর মূল অর্থ—ঋষি মন্ত্রদ্রষ্টা, মন্ত্র অর্থাৎ সত্য—মন্ত্র কথাটীর যথার্থ অর্থই তাহা। সংসারে সচরাচর কি হয়? না, সকলে অপরের মুখ হইতে সত্য গ্রহণ করে। আজ কাল মানুষ যেমন স্বপাকে খায় না, পাচকের প্রস্তুত অন্ন নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করে, তেমনি জগতের অধিকাংশ লোক সত্য দর্শন করে না, সত্য শ্রবণ করে, যেমন অবস্থায় পায়, নির্ব্বিচারে নির্ব্বিবাদে তাহা গ্রহণ করে। শাস্ত্রে কি আছে, সাধু মুখে কি শুনেছি, তাহাই লোকে অন্বেষণ করে, তাহাই পাঠ করে, তাহাই গ্রহণ করে, তাহাই ঘোষণা করে। কিন্তু সহসা কোথা হ'তে এক এক জন আবির্ভূত হন, যাঁরা আপনার অন্তরের গভীরতার ভিতর প্রবেশ ক'রে সত্যরত্ন আহরণ করেন; তাঁদের উক্তি প্রত্যক্ষ অনুভূতির কথা, তাঁরা সত্য দর্শন করেন, সত্য বলেন। আমরা সেই সকল লোককেই সত্যদ্রষ্টা ঋষি বলিয়া থাকি। নচেৎ আজন্ম ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে প্রতিপালিত ঐশ্বর্য্যবান্ দেবেন্দ্রনাথকে কখনই ঋষি বলিতাম না। তিনি সন্ন্যাস কখন গ্রহণ করেন নাই—বহিঃসন্ন্যাসের দারুণ বিরোধী ছিলেন, কখন বৈরাগ্যের বেশ পরিধান করেন নাই; অথচ সেই অনাসক্ত, অনাবিলচিত্ত, শান্ত, সমাহিত, পুরুষকে ঋষি না বলিয়া থাকিতে পারি না। বিধাতাকে অসংখ্য প্রণিপাত যে, উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে ঋষির অভ্যুদয় হইয়াছিল।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বলিলাম—এখন দেবেন্দ্র-নাথ যে মন্ত্রটীকে দর্শন করেছিলেন, সেই সম্বন্ধে দুটী একটী কথা বলিব।

দেবেন্দ্রনাথের জীবনের কথা বলিতে গেলে, বলিতে হয় রাজা রামমোহন রায় যে কাজ কর্‌বার জন্য এ দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, যে আদর্শ তিনি ভারতবাসীর চক্ষের সম্মুখে স্থাপন করেছেন, তাহা সমগ্র ভারতবাসী জ্ঞাতসারেই হোক, আর অজ্ঞাতসারেই হোক, অনুসরণ কর্‌ছে। কিন্তু তাঁহার জীবনের মন্ত্রটীকে যাঁরা গ্রহণ করে' সাধনায় সিদ্ধ হয়েছেন, তন্মধ্যে দেবেন্দ্র-নাথ প্রথম এবং প্রধান। রাজা রামমোহন রায় নবযুগের বার্ত্তাবহ, যুগাবতার মহাপুরুষ। তাঁর বাণী মুষ্টিমেয় লোকের জন্য নয়, বা দেশে কালে আবদ্ধ নয়; তাহা কোটী কোটী ভারতবাসীর যুগান্তব্যাপী সাধনার জন্য। রামমোহন রায় যে অমূল্য নিধি স্বদেশবাসীর জন্য দিয়া গেলেন, ব্রহ্মজ্ঞানের যে জ্যোতির্ম্ময় হারগাছটী স্বদেশবাসীর জন্য দিলেন, সেই দিব্য হারটী গ্রহণ কর্‌লেন সর্ব্বাগ্রে দেবেন্দ্রনাথ!

রাজা রামমোহন রায় বিলাতে যখন জীবন বিসর্জ্জন দিলেন, তখন দেশে যে সকল কার্য্যের তিনি সূত্রপাত করেছিলেন, তাহাও যেন নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইল; রাজা রামমোহনের প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ নির্জীব হইয়া পড়িল—নির্ব্বাণপ্রায় দীপশিখা ক্ষীণ জ্যোতিতে জ্বলিতেছিল। কোথা হইতে অদ্ভুতকর্ম্মা বিধাতা দেবেন্দ্রনাথের নিদ্রিত আত্মা প্রবুদ্ধ করিয়া তুলিলেন। অপ্রস্তুত অবস্থায়, সহসা পিতামহীর মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে বসিয়া দেবেন্দ্রনাথের আত্মা সচেতন হইয়া উঠিল। সে জাগরণ আত্মার জাগরণ। গঙ্গার ঘাটে বসিয়া আছেন, হঠাৎ তাঁর মনে এক আশ্চর্য্য উদাস ভাব উপস্থিত হ'ল। আত্মচরিতে লিখিয়াছেন তিনি যেন আর পূর্ব্বের মানুষ রহিলেন না। ঐশ্বর্য্যের উপর বিরাগ জন্মিল, যে চাঁচের উপর বসিয়া ছিলেন, তাহাই তাঁর পক্ষে ঠিক বোধ হইল, গালিচা দুলিচা, সকল হেয় বোধ হইল, মনের মধ্যে এক অভুতপূর্ব্ব আনন্দ উপস্থিত হইল। দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন "ভাষা সর্ব্বথা দুর্ব্বল, আমি সেই আনন্দ কিরূপে লোককে বুঝাইব? তাহা স্বাভাবিক আনন্দ. তর্কযুক্তি করিয়া সেই আনন্দ কেহ পাইতে পারে না। সেই আনন্দ ঢালিবার জন্য ঈশ্বর অবসর খোঁজেন, সময় বুঝিয়াই এ আনন্দ তিনি আমায় দিয়াছিলেন। কে বলে ঈশ্বর নাই? এই তো তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ। আমি ত প্রস্তুত ছিলাম না, তবে কোথা হ'তে এ আনন্দ পাইলাম? এই ঔদাস্য ও আনন্দ পাইয়া রাত্রি দুপ্রহরের সময় আমি বাড়ীতে আসিলাম। সে রাত্রিতে আমার আর নিদ্রা হইল না। এ অনিদ্রার কারণ আনন্দ। সারারাত্রি যেন একটা আনন্দ-জ্যোৎস্না আমার হৃদয়ে জাগিয়া রহিল।"

এ কি শ্মশান-বৈরাগ্য? তা কখনই নহে। শ্মশান-বৈরাগ্যে আনন্দ কোথায়? মন বিষাদে আচ্ছন্ন হইয়া গাম্ভীর্য্যে মগ্ন হয়। শ্মশান-বৈরাগ্য ত একটা অভাবাত্মক বস্তু; এ যে পরিপূর্ণ প্রাণ-প্লাবী আনন্দ! এ যে স্বর্গের আনন্দ! এ যে ব্রহ্মের প্রকাশ! বিলাসের স্রোতে ভাসমান, ১৮ বৎসরের তরুণ যুবার প্রাণে কি

অভিনব ব্যাপার! মানবের অন্তরে প্রবেশ কর্‌বার অনন্ত পথ, লীলাময়ের অনন্ত লীলা, অতি বিস্ময়কর ব্যাপার।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মচরিতে দেখিতে পাই, এই আনন্দের ভাব বহুদিন স্থায়ী হইল না, দেখিতে দেখিতে কোথায় মিলাইয়া গেল; তখন প্রাণ গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। ঘন বিষাদ! এমনি মনের অবস্থা যে জগৎসংসার ভুলিয়া গেলেন। প্রাণের জ্বালায় শিবপুর বোটানিকেল গার্ডেনে নির্জ্জনে বসিবার জন্য গমন কর্‌তেন। গলা ছাড়িয়া একাকী সঙ্গীত কর্‌তেন। কিন্তু প্রাণের গাঢ় অন্ধকার আর ঘুচিত না। দিবা দ্বিপ্রহরে সূর্য্যের প্রখর কিরণ কালো বোধ হইত। এই সময়ে লিখিতেছেন :—

"এই বিষাদ-অন্ধকারের মধ্যে ভাবিতে ভাবিতে বিদ্যুতের ন্যায় একটী আলোক চমকিত হইল। দেখিলাম বাহ্য ইন্দ্রিয়দ্বারা রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শের যোগে বিষয় জ্ঞান জন্মে। কিন্তু সেই জ্ঞানের সঙ্গে আমি যে জ্ঞাতা তাহাও জানিতে পারি। দর্শন, স্পর্শন, আঘ্রাণ ও মননের সহিত, আমি যে দ্রষ্টা, স্প্রষ্টা, মন্তা এই জ্ঞানতো পাই। বিষয়জ্ঞানের সঙ্গে বিষয়ীর বোধ হয়, শরীরের সঙ্গে শরীরীকে জানিতে পারি। আমি অনেক অনুসন্ধানে এই আলোকটুকু পাই। যেন ঘোর অন্ধকারাবৃত স্থানে একটী রেখা আসিয়া পড়িল।"

এই উক্তির ভিতর কি আমরা দার্শনিকের দৃষ্টি দেখিতে পাই না? এ যে উপনিষদের দার্শনিক তত্ত্বজ্ঞানের অনুরূপ! মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কত বড় দার্শনিক ছিলেন দেখিতে পাইলাম। নতুবা কি তিনি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ন্যায় দার্শনিক পণ্ডিতের জনক হইতে পারিতেন? দেবেন্দ্রনাথের জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া গেল, জ্ঞানের আলোকে ধর্ম্মের নিগূঢ় মন্ত্র দর্শন করিলেন।

আবার তাঁহার কথায় বলি :—

"জ্ঞানের প্রভাব বিশ্ব সংসারের সর্ব্বত্র দেখিতে পাই। আমাদের জন্য চন্দ্র সূর্য্য নিয়মিতরূপে উদয়াস্ত হইতেছে, আমাদের জন্য বায়ু বৃষ্টি উপযুক্তরূপে সঞ্চারিত হইতেছে। ইহারা সকলে মিলিয়া আমাদের জীবন পোষণের একটি লক্ষ্য সিদ্ধ করিতেছে। এইটী কাহার লক্ষ্য? জড়ের ত লক্ষ্য হইতে পারে না, চেতনেরই লক্ষ্য। অতএব একটি চেতনাবান পুরুষের শাসনে এই বিশ্ব সংসার চলিতেছে। তিনিই সেই প্রয়োজন বিজ্ঞানবান ঈশ্বর, যাঁহার শাসনে জগৎ সংসার চলিতেছে।"

এখানেও কি দার্শনিকের অনুভূতির কথা শুনিতেছি না? ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, দেবেন্দ্রনাথকে কেহ কখন ধর্ম্মোপদেশ দেয় নাই। তিনি আকণ্ঠ বিলাসে নিমজ্জিত ছিলেন—তাঁহার পারিপার্শ্বিক সমুদায় অবস্থা ধর্ম্মলাভের পরিপন্থী। এমন অবস্থায়ও মানুষ ভগবানকে পায়? লীলাময়ের অপূর্ব্ব লীলা। দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদের গভীর তত্ত্বসকল মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির ন্যায় নিজ হৃদয়ের অনুভূতির দ্বারা গ্রহণ করিলেন। তিনি প্রথমে প্রতীতি করিলেন যে, জগতের ক্রিয়াসকল এক লক্ষ্য সিদ্ধ করিতেছে—এক চেতনাবান পুরুষের শাসনে তাঁহারা বাঁধা। উপনিষদ পাঠ করার পূর্ব্বেই তিনি উপনিষদের তত্ত্বসকল হৃদয়ে গ্রহণ করিলেন। তাহার পরে আরও এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিল। একদিন বসিয়া আছেন হঠাৎ দেখিলেন, একখানি সংস্কৃত বইএর পাতা তাঁহার সম্মুখ দিয়া উড়িয়া যাইতেছে। কে জানে কেন তিনি তাহা হাত দিয়া ধরিলেন, এবং পড়িতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কোন অর্থই বুঝিতে পার্‌লেন না; বাড়ীর শ্যামাচরণ পণ্ডিতকে তাহার অর্থ করিয়া দিতে বলিলেন, শ্যামাচরণ অর্থ বুঝিতে পারিলেন না, বলিলেন "মনে হচ্ছে এ ব্রহ্মসভার কথা, হয়ত এক ব্রহ্মসভার রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ইহার অর্থ বুঝাইতে পারিবেন।" তখনই বিদ্যাবাগীশকে ডাকা হইল। তিনি পড়িয়া বলিলেন এ যে ঈশোপনিষদের পাতা। সেই পাতায় লেখা ছিল,

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃকস্যসিদ্ধনং।

ঈশ্বরের দ্বারা সমস্ত জগৎকে আচ্ছাদন কর; তিনি যাহা দান করিয়াছেন, উপভোগ কর, অন্য কাহারও ধনে লোভ করিও না।

দেবেন্দ্রনাথ লিখিতেছেন:—"আমি মানুষের নিকট হ'তে সায় পাইতে ব্যস্ত ছিলাম। এখন স্বর্গ হইতে দৈববাণী আসিয়া আমার মর্ম্মের মধ্যে সায় দিল, আমার আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হইল। আমি ঈশ্বরকে সর্ব্বত্র দেখিতে চাই। উপনিষদে কি পাইলাম? পাইলাম যে, ঈশ্বর দ্বারা সমুদায় জগৎকে আচ্ছাদন কর। আমি যাহা চাই তাহাই পাইলাম। এমন ক'রে আমার মনের কথা আর কোথায় শুনিতে পাই নাই। আহা! কি কথাই শুনিলাম! "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ—তিনি যাহা দান করিয়াছেন তাহাই উপভোগ কর। তিনি কি দান করিয়াছেন? তিনি আপনাকেই দান করিয়াছেন। সেই পরমধনকে উপভোগ কর। আহা! সেদিন আমার পক্ষে কি শুভ দিন! কি আনন্দের দিন!"

এ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার নয়? উপনিষদের ছেঁড়া পাতা কি করিয়া ঠিক সময়ে অন্তরের গভীর প্রশ্নের সদুত্তরের মত তাঁর সম্মুখে আসিয়া পড়িল। এ যে লীলাময়ের লীলা! তিনি না জানালে কি মানুষ জান্‌তে পাবে? জানাবার এত উপায়ও আছে! আমার পিতৃদেব যে আবেগভরে লিখিয়াছিলেন, সেই কথাগুলি মনে পড়ে:—

কবি বলে ওহে দেব! ওহে প্রাণারাম!
প্রাণবন্ধু, প্রাণসখা! নিরাকার নাম কে দিয়াছে.
দেখি না ত হেন নিরাকার, জীবের হৃদয় কাড়া নিত্য কর্ম্ম যার।

আমাদের ন্যায় স্থূলদৃষ্টি অবিশ্বাসী যাহারা, তাহাদের নিকট এ রহস্য উদ্‌ঘাটন করবে কে? দেবেন্দ্রনাথ যে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন, তাতে আর সংশয় নাই। এই প্রকারে দেবেন্দ্রনাথ যখন নবজীবন লাভ করিয়া ধর্ম্মপথের যাত্রী হইলেন, তখন ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁর কোন যোগ হয় নাই। পরে তিনি রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের ভার গ্রহণ ক'রে ধর্ম্মপ্রচারে মন দিলেন।

এখন একবার মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম্মজীবনের সোপানগুলির কথা বলি:—

(১) প্রথম উদ্বোধন, পিতামহীর মৃত্যু-শয্যাপার্শ্বে নিমতলার শ্মশানঘাটে বসিয়া! এ উদ্বোধন আত্মার আনন্দের উদ্বোধন।

(২) দ্বিতীয় সোপান, আনন্দের ভাব হারাইয়া, মনের গভীর অন্ধকার

(৩) তৃতীয় সোপান, ধর্ম্মসাধন ও আত্মশোধনের পালা। জীবনের এই অধ্যায়ে সংযম এবং ত্যাগের মন্ত্র সাধন করিয়াছিলেন।

(৪) চতুর্থ সোপান, ধর্ম্মজীবনের চরম উৎকর্ষতার সময়! তখন সমুদায় অগ্নি পরীক্ষায় পার হইয়া ভগবৎপ্রেমে তাঁহার প্রাণ মগ্ন হইল। এবং ভগবানের সান্নিধ্যবোধে আত্মা উদ্ভাসিত ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তখন হৃদয় জ্ঞান ও প্রেমে পূর্ণ হইয়া বৰ্দ্ধিত হইল। এই সময় হইতে ধ্যান ধারণা তাঁহার নিকট স্বাভাবিক এবং পরম সম্ভোগের ব্যাপার হইয়া উঠিল। ভগবানের সহিত যোগ এত দূর গভীর হইল যে প্রত্যক্ষ "আদেশবাণী" শুনিতে পাইলেন। সে আদেশবাণী শোনার কথা সকলেই অবগত আছেন; তবু তাঁরই কথায় বলি—

তখন তিনি সিমলায়। একদিন আশ্বিন মাসে খদে নামিয়া একটা নদীর সেতুর উপর দাঁড়াইয়া তিনি তাহার স্রোতের উদ্দাম গতি দেখিতে দেখিতে বিস্ময়ে ডুবিয়া গেলেন। তখন তাঁহার মনে এই প্রশ্ন হইল, এই যে নদীর জল এখানে কেমন নির্ম্মল, যদি যতই নীচের দিকে যাইবে ততই কর্দ্দমে পূর্ণ হইবে, তবে কেন নদী নীচের দিকেই ছুটিয়া চলিয়াছে? বিধাতার শাসনে মলিন হইয়াও ইহাকে পৃথিবীর মাটিকে সিক্ত ও উর্ব্বর করিতে হইবে। তিনি লিখিয়াছেন যে, যেমনি এই কথা ভাবিতেছেন, "অমনি সেই সময়ে হঠাৎ আমি আমার অন্তর্যামী পুরুষের গম্ভীর আদেশবাণী শুনিলাম "তুমি এই ঔদ্ধত্য ভাব ত্যাগ করিয়া এই নদীর মত নিম্নগামী হও, তুমি এখানে যে সত্য লাভ করিলে, যে নির্ভর ও নিষ্ঠা শিক্ষা করিলে, যাও পৃথিবীতে গিয়া তাহা প্রচার কর। আমি চমকিয়া উঠিলাম। তবে কি আমাকে এই পুণ্যভূমি হিমালয় হইতে ফিরিয়া যাইতে হইবে? আমার ত এ ভাবনা কখনও ছিল না। কত কঠোরতা করিয়া সংসার হইতে উপরত হইয়াছি, আবার সংসারে যাইয়া কি সংসারীদের সহিত মিশিতে হইবে? আমার মনের গতি নামিয়া পড়িল। সংসার মনে পড়িল, মনে হইল আবার আমাকে ফিরিয়া বাড়ী যাইতে হইবে। সংসার-কোলাহলে কর্ণ বধির হইয়া যাইবে। এই ভাবনাতে আমার হৃদয় শুষ্ক হইয়া গেল; ম্লান ভাবে বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। রাত্রিতে আমার মুখে কোন গান নাই। ব্যাকুল হৃদয়ে শয়ন করিলাম, ভাল নিদ্রা হইল না। রাত্রি থাকিতে থাকিতে উঠিয়া দেখি যে হৃদয় কাঁপিতেছে, বুক জোরে ধড়্ ধড়্ করিতেছে। আমার শরীরের এমন অবস্থা ত পূর্ব্বে কখনও ঘটে নাই। ভয় হইল কোনরূপ সাংঘাতিক পীড়াই বা আবার হইল। বেড়াইতে গেলে যদি ভাল হয়, এই মনে করিয়া বেড়াইতে বাহির হইলাম। অনেকটা পথ বেড়াইয়া সূর্য্য উদয় হইলে বাসাতে আসিলাম, তাহাতেও আমার বুকের ধড়্ ধড়ানি গেল না। তখন কিশোরীকে ডাকিয়া বলিলাম, কিশোরী, আর আমার সিমলা থাকা হইবে না, ঝাঁপান ঠিক কর। এই কথা বলিতে বলিতে দেখি যে আমার হৃদ্‌কম্প কমিয়া যাইতেছে। তবে কি এই আমার ঔষধ হইল?" মহর্ষি লিখিতেছেন "নদী যেমন আপনার বেগমুখে প্রস্তরের বাধা মানে না, আমি তেমনি আর কোন বাধা মানিলাম না।"

এই প্রকারে ভগবানের আদেশে দেবেন্দ্রনাথ আবার কর্ম্ম-ক্ষেত্রে আসিয়া পড়িলেন। জীবনের উন্নততর অবস্থায় তিনি ধ্যায়মান অবস্থায় দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর একান্তে নির্জ্জনে কাটাইতেন। এ গভীর সমাধি, এ সশরীরে স্বর্গবাস। ১৮ বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া দীর্ঘ জীবন কোলাহলময় সংসারে থাকিয়া গভীর সাধনায় কাটাইয়াছেন। দেবেন্দ্রনাথ যে মহর্ষি আখ্যা পাইয়াছিলেন তাহা তাঁহার প্রতি কিরূপ প্রযুক্ত্য সে সম্বন্ধে আর কাহারো সংশয় আছে কি?

এখন তাঁর নিকট হইতে আমরা কি পাইয়াছি, সে সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করি।

প্রথম শিক্ষা এই, ধর্ম্মলাভের জন্য সংসার ছাড়িয়া অরণ্যে যাইতে হয় না, যদিও সংসারে থাকিয়া ধর্ম্ম সাধন ও ধর্ম্ম অর্জ্জন করা অপেক্ষা বনে যাওয়া সহজ। মহর্ষি জীবনব্যাপী সাধনার দ্বারা দেখাইলেন, সংসারে থাকিয়া শুধু ধর্ম্ম হয় না, সংসার ও গৃহপরিবারই ধর্ম্মসাধনের প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র।

দ্বিতীয়তঃ, ধর্ম্মজীবন তখনই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়, যখন জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্মের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে, এবং স্বাভাবিক ক্রম-বিকাশের নিয়ম অনুসারে তাহা জীবনে আসে। মহর্ষির ধর্ম্ম-জীবন আশ্চর্য্য সামঞ্জস্যের দৃষ্টান্ত। অগ্রে জ্ঞান আসিলেন; জ্ঞান হইল চক্ষু, সত্য দেখাইয়া দিল, তৎ পরে প্রেম বা ভক্তি, অবশেষে সেবায় তাহা পর্য্যবসিত হইল।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সৌন্দর্য্যের উপাসক ছিলেন; ছন্দবদ্ধ কবিতা না লিখিলেও কবি ছিলেন। তাঁর জীবনই এক সুন্দর কাব্য। এত বড় কবি না হইলে কি আর রবীন্দ্রনাথের ন্যায় পুত্রের জনক হইতে পারিতেন?

মহর্ষির তৃতীয় দান সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ব্রহ্মপূজার পদ্ধতিপ্রণয়ন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নিকট যে আমরা কত ভাবে ঋণী, তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না। ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার নিকট অপরি-শোধনীয় ঋণে আবদ্ধ। দেবেন্দ্রনাথ রামমোহনের যথার্থ উত্তরা-ধিকারী বটেন। রাজা রামমোহনের বিরাট চিত্তে বিশ্বের স্থান হইত, তিনি সকল ধর্ম্মশাস্ত্র মন্থন করিয়াছিলেন; তথাপি সার্ব্বভৌমিকতার সহিত জাতীয়তার সম্মিলন কেমন করিয়া হইতে পারে জীবনে দেখাইলেন, তাঁহাকে জাতীয় ভাবে সার্ব্ব-ভৌমিক, বা সার্ব্বভৌমিক ভাবে জাতীয় বলিতে পারি। এই বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার প্রকৃত শিষ্য ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের চিত্তের প্রসার বা ব্যাপকতা রাজা রামমোহন রায়ের মত ছিল না বটে, কিন্তু তিনি জাতীয়তার পাণ্ডা ছিলেন। তাই অদ্যাবধি তাঁহার বৃহৎ পরিবার জাতীয়তার উন্নত দৃষ্টান্ত, এই উদ্‌ভ্রান্ত বিজাতীয়তার দিনে, এদেশে দেখাইতে সমর্থ হইতেছেন। গীত বাদ্য শিল্পকলায় তাঁহার পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ বঙ্গদেশে যুগান্তর আনিয়াছেন। তাহার মূলেও মহর্ষির প্রতিভা এবং সৌন্দর্য্যানুরাগ দেখিতে পাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ দার্শনিক ছিলেন, কবি ছিলেন। তাঁহার এই উভয়বিধ প্রতিভার উত্তরাধিকারী হইয়া দ্বিজেন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বঙ্গদেশে আর এক

জনেরও নাম করিতে পারি না, যিনি আপনার চরিত্রের প্রভাবে, আত্মার জ্যোতিতে, নিজ পরিবারকে এতখানি উন্নত করিতে পারিয়াছিলেন। বঙ্গদেশ যে সাহিত্য সঙ্গীত শিল্পকলায় ভারতের শীর্ষস্থান অধিকার করিতেছে, বাঙ্গালী কবি যে আজ বিশ্বসভার শ্রেষ্ঠ কবি, বাঙ্গালীর প্রতিভা যে আজ বিশ্বকে আলোকিত করিতেছে, তাহার মূলে অদৃশ্য শক্তিরূপে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ! ধন্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ধন্য তাঁহার জন্মভূমি! ধন্য হয়েছি আমরা তাঁহাকে ভক্তির অর্ঘ্য দিয়ে! ধন্য এই পবিত্র ৬ই মাঘ! মাঘোৎসবের দ্বারে দাঁড়াইয়া আজ ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্যকে প্রণাম করি!

৭ই মাঘ (২১শে জানুয়ারী) শুক্রবার—

প্রাতে সংকীর্ত্তন ও উপাসনা। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মুখার্জ্জি আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

সংসারে এই নিয়ম দেখা যায় যে, কিছু পেতে হ'লে কিছু দিতে হয়। তুমি যদি কিছু চাও, তোমাকে আগে তার জন্য কিছু দিতে হবে। যদি জ্ঞান অর্জ্জন করতে চাও, বা ধন উপার্জ্জন করতে চাও, তার জন্য ক্লেশ স্বীকার করতে হবে। সংসারে কিছু সুখ সুবিধা চাইলে, তার জন্যে আগে কত ক্লেশ স্বীকার করতে হয়! দুঃখ করলে তবে সুখ মিলে। জগতের এই নিয়ম। সাংসারিক বিষয়ে যে নিয়ম, আধ্যাত্মিক বিষয়েও সেই একই নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়। তুমি যদি সৎ হইতে চাও, তবে অসৎ যাহা তাহা তোমাকে ছাড়তে হবে; অন্যায় যাহা, দুর্নীতি যাহা, তাহা বর্জ্জন করতে হবে। আত্মোন্নতি করতে চাও, আলস্য ও ঔদাস্য ত্যাগ কর। মাথার ঘাম পায় ফেলে তবে কোন বিষয়ে উন্নতি সাধন করতে হয়। তুমি যদি পুণ্যজীবন লাভ করতে চাও, তবে পাপকে বর্জ্জন করতে হবে। তুমি পুণ্যজীবনের নির্ম্মল আনন্দ ও তৃপ্তি পাইতে চাও, অথচ পাপাসক্তিকে পরিত্যাগ করিবে না, তাহা হইলে চলিবে না। তুমি দেশের কিছু সেবা করতে চাও, সমাজের সেবা করতে চাও, অথচ তাহার জন্য কিছু ছাড়তে পারবে না, তা হ'লে চলবে না। তুমি তোমার সমাজকে ভালবাস, কিন্তু সমাজের আর্থিক অভাব মোচনের জন্য দুটী পয়সা দিতে হ'লে, তাহা পার না, কিছু শারীরিক শ্রম স্বীকার করতে পার না, এ ভালবাসার মূল্য কি? তবেই বুঝিব তুমি সমাজকে ভালবাস যদি দেখি, তার কল্যাণ ও উন্নতির জন্য যে ক্লেশ স্বীকার করতে হয়, তাহাতে তুমি প্রস্তুত আছ। তুমি তোমার ভাই বোনকে ভালবাস, কিন্তু তাদের সেবা করতে গিয়ে যে কষ্টটুকু তোমার স্বীকার করতে হয়, তাহাতে তুমি রাজি নও, তবে তোমার কেমন ভালবাসা? ভালবাসতে হ'লে কিছু ছাড়তে হবে, কিছু দিতে হবে। তুমি প্রেমিক হ'তে চাও, কিন্তু অন্যের দোষ মার্জ্জনা করতে, অন্যকে ক্ষমা করতে, আপনাকে যতটুকু খর্ব্ব করতে হবে, তাহা যদি না পার, অপরের মঙ্গলসাধনের জন্য যতটুকু ক্লেশ সইতে হয় তাহা যদি না পার, তবে ও তোমার কেমন প্রেম? আজ এক জনের পীড়া হয়েছে, তুমি সংবাদ পাইলে, রাত্রি জাগিয়া তাহার সেবা করতে হবে। কিন্তু তুমি ভাবিতেছ, রাত্রিজাগরণের ক্লেশ তুমি সহ্য করতে পারবে না, তাহাতে তোমার শরীর অসুস্থ হবে, তুমি তার সেবা করতে গেলে না; তবে কি ক'রে আশা করতে পার যে তুমি প্রেমিক হবে? তুমি ভক্তি লাভ করতে চাও, কিন্তু তুমি গুরুজন ও সাধু ভক্তদিগকে শ্রদ্ধা দিতে পার না, কাহারও নিকট মস্তক নত করতে পার না; তবে ভক্তিলাভ করবে কি রূপে? অহঙ্কারে তোমার মস্তক উন্নত রহিয়াছে। যদি বিনয় রূপ অলঙ্কার পরতে চাও, তবে ঐ অহঙ্কার ছাড়তে হবে। তুমি চাও যে সমাজে সকলে প্রেমে গ'লে এক হ'য়ে যাক্,—কথাটা শুনতে ভাল,—কিন্তু তুমি দলাদলি ছাড়তে পার না, অপরকে প্রেমের চক্ষে দেখিতে পার না, তাহার দোষ ত্রুটি মার্জ্জনা করতে পার না, তবে কি ক'রে সকলকে প্রেমের বন্ধনে বাঁধিয়া এক করিবে? তাই দেখা যাইতেছে, কোন কাজই ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার ভিন্ন সম্ভব হয় না।

দুটী টাকা অর্জ্জন করতে কত ক্লেশ সহ্য করিতে হয়! সকল ধনের শ্রেষ্ঠ ধন ঈশ্বর। তাঁহাকে লাভ করতে হ'লে কি কিছু ক্লেশ স্বীকার করতে হবে না? কিছু ছাড়তে হবে না? সঙ্গীতে শুনিয়াছি—"বিনা সাধনে সে ধনে কি রে পায় কেহ এ সংসারে।" ঈশ্বরকে লাভের জন্য এ জগতে সাধু মহাজনগণ চিরদিনই কত ত্যাগ ক'রেছেন! বুদ্ধ রাজ্য সম্পদ্ বিসর্জ্জন দিলেন, চৈতন্যদেব মাতা ও ভার্য্যাকে ছাড়িয়া গৃহত্যাগী হইলেন, লালজী ফকির হইলেন। কত সাধু, কত ভক্ত, ধন জন মান সব বিসর্জ্জন দিয়া ব্রহ্মচরণে আত্মসমর্পণ করলেন! এ সকল কাহিনীতে ধর্ম্মজগতের ইতিহাস পূর্ণ। আমাদের এই ব্রাহ্মসমাজেও কত জন, ধর্ম্মের জন্য, ঈশ্বর লাভের জন্য কত ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন, কত ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন! কত জনকে এই সমাজে আসিতে, পৈতৃক বিষয় সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া, এমন কি, পৈত্রিক গৃহ হইতে তাড়িত হইয়া আসিতে হইয়াছে! কত জনকে পিতা মাতা ও আত্মীয় স্বজনের চক্ষের জল উপেক্ষা করিতে হইয়াছে! এমন কাহারও কাহারও কথা জানি, উপবীত ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করাতে মাতা অনাহারে প্রাণ ত্যাগ করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইয়াছেন, কত দিন উপবাসে কাটাইয়াছেন, পুত্রও উপবাসী রহিয়াছেন, অবশেষে একে অপরের ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া অন্ন গ্রহণ করিয়াছেন। তথাপি পুত্র যাহা সত্য বুঝিয়াছেন, তাহা হইতে বিচলিত হন নাই। ভক্তিভাজন স্বর্গীয় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে পারিবারিক বিগ্রহের পূজা না করাতে পিতার হস্তে প্রহার পর্য্যন্ত খাইতে হইয়াছে! কত জনের কথা জানি, ব্রাহ্ম হওয়াতে কত নির্য্যাতন লাঞ্ছনা, অপমান সহ্য করিতে হইয়াছে। তাঁহাদের ত্যাগে ব্রাহ্মসমাজ গৌরবান্বিত হইয়াছে। অপর দিকে এই লাঞ্ছনা, নির্য্যাতন ও অপমানের মধ্য দিয়া তাঁহাদের জীবন ধন্য হইয়াছে। আমরা সৌভাগ্যবান্ যে এমন সমাজে স্থান পাইয়াছি। এই ব্রাহ্মসমাজের নিকট আমরা কত ভাবে ঋণী! এই সমাজে আসাতে আমাদের অশেষ কল্যাণলাভ হইয়াছে, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই সমাজের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য কত

গুরুতর! আমরা যদি ইহা অনুভব করি, তবে দেহ মন প্রাণ দিয়া কি ইহার সেবা করা উচিত নয়? কিন্তু এই সমাজের জন্য আমরা কে কি করিতেছি? সমাজের আর্থিক অভাব। আমাদের কি কর্ত্তব্য নয় যে অকাতরে অর্থদান করিয়া ইহার অভাব মোচন করি? এ কথা সত্য যে আমাদের সকলের শক্তি সমান নয়। কিন্তু এ কথাও ঠিক যে যদি সমাজের আর্থিক অভাব দূর করতে হয়, তবে কষ্ট স্বীকার করিয়া এবং নিজের সুখ সুবিধা কিঞ্চিৎ খর্ব্ব করিয়াই সকলকে সমাজের কাজে অর্থ দিতে হইবে। আমাদের সমাজের কাজ করিবার লোকের অভাব। সমাজের সেবা সকলেরই কাজ। আমাদের সকলেরই কর্ত্তব্য নিজ নিজ শক্তি এই সমাজের কার্য্যে অর্পণ করি। অনন্যকর্ম্মা হইয়া ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে জীবন অর্পণ করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়; কিন্তু নিজের আরাম ও বিশ্রামের জন্য যে সময় রহিয়াছে, তাহার কতকাংশ সমাজের কার্য্যে আমরা তো সকলেই দিতে পারি। সকলের পক্ষে সব কাজ করা সম্ভবপর নয়। কিন্তু কোন না কোন কাজে সকলেই ব্যবহৃত হইতে পারি। এই নিমিত্ত সকলেরই কিছু দিতে ও ছাড়তে প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। নতুবা সমাজের উন্নতি হইবে কিরূপে? আমাদের চক্ষের সম্মুখে কত জনের জীবন রহিয়াছে, যাঁহারা বিন্দু বিন্দু করিয়া শরীরের রক্ত দিয়া এই সমাজের সেবা করিয়াছেন; সমাজের সেবায় জীবন দান করিয়া অমর জীবন লাভ করিয়াছেন। আমরাও যদি সমাজের কল্যাণ চাই, তবে আমাদিগকেও আত্মদান করিতে হইবে। এই দানে জীবন ধন্য হবে। সমাজের কাজে দুটী টাকা দেওয়া সহজ, কিছু সময় দেওয়াও সহজ। কিন্তু প্রকৃত দান প্রাণটাকে সেই নিমিত্ত অর্পণ করা। যাঁরা এইরূপে ধর্ম্মের জন্য, সমাজের ও ঈশ্বরের সেবার জন্য আপনাকে অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা কিছু হারান নাই, তাঁহারা লাভবানই হইয়াছেন। তাঁহাদের ত্যাগ ও সেবাতে সমাজ উপকৃত হইয়াছেন, শুধু তাহা নহে; তাঁহারা নিজেরাও ধন্য হইয়াছেন। ঈশ্বরকে লাভ করিতে হইলে প্রাণটা তাঁহাকে দিতে হয়। প্রাণটা নানা আসক্তির খুঁটিতে বাঁধা রাখিয়া ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। প্রাণটা বিষয়ের জন্য লালায়িত থাকিবে, দুটী পয়সার জন্য হাহাকার করিবে, এরূপ প্রাণ লইয়া ঈশ্বর লাভ হয় না। বিষয়বাসনা প্রবল হইলে ঈশ্বর লাভ কঠিন। মহর্ষি ঈশা বলিয়াছেন "It is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for a rich man to enter into the Kingdom of Heaven"—ধনীর স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ অপেক্ষা ছুঁচের ছিদ্র-দ্বারা উষ্ট্রের গমন সহজ। ইহা অতীব সত্য যে প্রবল বিষয়-বাসনা লইয়া ঈশ্বরকে পাওয়া কঠিন। অনেকের জীবনে দেখা গিয়াছে পূর্ব্বে ঈশ্বরের প্রতি এবং সমাজের প্রতি অনুরাগ ছিল। যেই কিছু অর্থাগম আরম্ভ হইল, অমনি সেই দিকে মন এমন অনুরক্ত হইয়া পড়িল যে, ঈশ্বরোপাসনার জন্য, সমাজের সেবার জন্য, আর সেই পূর্ব্বের অনুরাগ নাই। বিষয়া-সক্তি ধর্ম্মজীবনের এক প্রধান শত্রু। এই জন্যই সকল ধর্ম্মা-বলম্বীদিগের মধ্যেই ধর্ম্মাচার্য্যগণ এই উপদেশ দিয়াছেন যে, ঈশ্বর এবং ধর্ম্মকে লাভ করিতে হইলে বিষয়াসক্তিকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম এ কথা বলেন না যে, বিষয়কে বা সংসারকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, প্রবল বিষয়বাসনা ঈশ্বরলাভের বিরোধী। এক জন ধর্ম্মপ্রাণ ব্রাহ্মের কথা বলি। তিনি সংসারে নির্ধন ছিলেন। তাঁহার পুত্র পিতার আর্থিক সংগ্রাম দেখিয়া পারিবারিক আর্থিক উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার ক্রমে ক্রমে উন্নতিও হইতে লাগিল। পুত্র বিদেশ হইতে পিতাকে তাহার পদোন্নতির সংবাদ জানাইলেন। পিতা উত্তরে লিখিলেন "তোমার উন্নতিতে সুখী হইলাম। আমি বিশ্বাস করি যে, তুমি চেষ্টা করিলে আরও উচ্চতর পদলাভ করিবে, কিন্তু তোমাকে আমার মনের কথা লিখিতেছি যে, আমি তোমার সেই উচ্চ পদলাভে তত সুখী হইব না, যত সুখী হইব যদি আজ শুনি তুমি বিষয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্ম ওয়ার্কারস্ সেল্‌টারে ওয়ার্কার হইয়াছ। বৈষয়িক উন্নতির জন্য টাকা টাকা করিয়া প্রাণটা দাও, তাহা চাই না। ধর্ম্মের জন্য এবং ঈশ্বরের জন্য প্রাণটা দাও, ইহাই চাই।" ভক্তিভাজন আচার্য্য শিবনাথ সঙ্গীতে গাহিয়াছেন "যদি প্রাণ পেতে চাও, প্রাণ তাঁরে দাও, সে পদে লুটায়ে পড় এখনি"; "প্রাণ দিলে প্রাণ মিলে বুঝিলে না সার"। ঈশ্বর আমাদের নিকট এই প্রাণ চান। এই উৎসবে আসিয়া আমরা তাঁর চরণে কি দিয়া যাইব? কেহ বা উৎসবের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে কিঞ্চিৎ অর্থদান করিব, কেহ বা কিছু সময় দিয়া পাঁচ জনের সেবা করিব, কেহ বা উপাসনা, কীর্ত্তন ইত্যাদিতে যোগ দিয়া আনন্দলাভ করিব। কিন্তু ইহাতেই কি তৃপ্ত হইব? ঈশ্বর আরও কিছু চান। তিনি চান আমাদের হৃদয়। তিনি চান আমাদের সমগ্র প্রাণ। আমরা তাহা দিতে পারি কই? "এ ছার হৃদয় দিলে যদি রে সে ধন মিলে, তবে সঁপি মন প্রাণ লভ না সে ধনে, লভিলে জীবন পাবে এখনি", এই কথা বুঝিয়াও বুঝিলাম কই? এই মলিন, ঘৃণিত হৃদয় তাঁহাকে দিলে যদি সুন্দর ও শুদ্ধ জীবন লাভ করা যায়, তবে তাহা তাঁহাকে দেই না কেন? "লৌহময় প্রাণ করিলে অর্পণ সোণার প্রাণ করেন দান" ধর্ম্ম জগতের ইতিহাস চিরদিন ইহার সাক্ষ্য দিয়া আসিয়াছে। আমাদের ভাগ্যে সেদিন কবে আসিবে, যেদিন আমরা আমাদের হৃদয় মন শক্তি, সামর্থ্য, সব তাঁহার চরণে অর্পণ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইব। ঈশ্বর তো আমাদিগের নিকট এই চান। কবে আমরা যথার্থই অন্তরের সহিত বলতে পারব "এই লও আমার প্রাণ মন, এই লও আমার জীবন ধন, এই লও আমার সর্ব্বস্ব ধন, আমি আর কোন ধন চাই না পিতা, কেবল তোমার শ্রীচরণ।"

সায়ংকালে তত্ত্ববিদ্যা সভার উৎসব উপলক্ষে পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ "বিশ্বরূপ দর্শন" বিষয়ে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

৮ই মাঘ (২২শে জানুয়ারী) শনিবার— মহিলাদের উৎসব উপলক্ষে সংকীর্ত্তন ও উপাসনা। শ্রীমতী হেমলতা সরকার আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশ নিম্নে প্রকাশিত হইল:—

ভগিনীগণ, আজ বড় গুরুতর দায়িত্বভার বহন ক'রে আপনাদের কাছে এসেছি! এতগুলি ব্রহ্মকন্যা আজ এই ঘরে সমাগত! তাঁরা কত আশা ক'রে, কত কষ্ট স্বীকার ক'রে, কত আগ্রহভরে এসেছেন! কেন না উৎসবক্ষেত্রে এসে তাঁদের প্রাণ শীতল হবে, এমন কিছু পাবেন, এমন কিছু শুনবেন, যা তাঁদের হৃদয়ে সম্বল ক'রে রাখবেন। নিজের কথা যখন ভাবি, এই গৌরবান্বিত আসনের কথা যখন স্মরণ করি, তখন ত হৃদয় সঙ্কুচিত হয়। এই আসনেই না আমার পিতৃদেব উপবেশন ক'রে, এই ব্রাহ্মিকা উৎসবের দিন, কি প্রাণস্পর্শী উপাসনা করিতেন! কি জ্বলন্ত উপদেশ তাঁর মুখে শুনেছি! এখনও স্মরণ হয় যেন সেই কণ্ঠধ্বনি শুনছি, যেন প্রাণের তারে তাঁর সে সুর বাজছে। আজ নিজের অন্তরের দিকে চাইলে তখনই জিহ্বা সংযত হয়, মুখে আর কথা সরে না। কিন্তু আজ ত আমি নিজের যোগ্যতা, কৃতিত্ব, বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দিতে আসি নাই; আমি এসেছি ভগবানের দয়ার সাক্ষ্য দিতে, শত শত ব্রহ্মকন্যার সঙ্গে সমস্বরে তাঁর নাম করবার শুভসুযোগ পাব ব'লে। এমন দিন ত রোজ রোজ আসে না, এত ব্যাকুলতা প্রাণে নিত্য জাগে না, এত গুলি মুখ ত রোজ দেখি না! তাই বলবার সুযোগ ছাড়তে পারি না। ধর্ম্মে বড় হই নাই, বয়সে বড় হইয়াছি; জীবনের অনেকটা পথ মাড়িয়ে এখানে পৌঁছিতে হয়েছে। অতএব প্রাচীনত্বের দাবী করা আমার পক্ষে নিতান্ত অসঙ্গত নয়। আজ এই চিন্তায় আমি আকুল হচ্ছি, কি কথা আজ বলব যা এই মহোৎসবের দিনে বলা যায়, কি কথা সে কথা যা আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর।

আমরা জননীর জাতি, আমরা পিতার আদরের কন্যা, আমরা ভাইদের স্নেহময়ী বোন। ভগবান নারীকে সংসারের আশ্রয়রূপে সৃষ্টি করেছেন। সংসার রাখে নারী। সংসার চালান নারী, সংসারে যাবৎ কল্যাণ কর্ম্মের মূলে নারী। তবে নারীর প্রভাব, নারীর কার্য্য অগোচরে চলে, নারী নিজ নামের ঘোষণা শুনবার জন্য ব্যাকুল নন; তাই নারী মহীয়সী হ'তে পারেন। ভগবানের কার্য্য যেমন গোপন এবং নিগূঢ়, নারীর কাজও সেই প্রকার গোপন এবং নিগূঢ়। এই প্রকারে নরচক্ষুর অগোচরে আত্মগোপন ক'রে কাজ করিতে নারী ভালবাসে। নারীচরিত্রের বিশেষত্ব এবং মহত্ব এখানে।

আমরা বাল্যাবধি একটী প্রার্থনার কথা শুনে আসছি—নিজ জীবনের কথা বলতে পারি, সহস্রবার আবেগভরে সেই প্রার্থনাটী আমরা করেছি—সে প্রার্থনাটী এই, "হে ভগবান, আমার জীবনে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক।" ইংরাজিতে বলি "Thy will be done." এই প্রার্থনাটীর ভিতর দুইটী ভাব লুক্কায়িত আছে। প্রথম, আমাকে সৃষ্টি করার ভিতর ভগবানের এক বিশেষ অভিপ্রায় আছে। দ্বিতীয়তঃ, আমি যেন সেই অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধাচরণ ক'রে তাহাকে না ব্যর্থ করি। অর্থাৎ আমার এমন দুর্ম্মতি হ'তে পারে যে, আমি জ্ঞাতসারেই হোক, আর অজ্ঞাতসারেই হোক, জীবনে ভগবানের বিরুদ্ধাচরণ করতে পারি। কেন পারি? মানুষ পারে। বৃক্ষ লতা পারে না, পশুপক্ষী পারে না, তাই তাদের পাপ নাই, দুষ্কৃত নাই, তাই তাদের অনুতাপ নাই, মর্ম্মের জ্বালা নাই। মানুষকে ভগবান স্বাধীন ইচ্ছা দিয়াছেন, মানুষের নিকট শ্রেয়ঃ এবং প্রেয়ঃ দুই পথ নিয়তই প্রসারিত আছে—মানুষ বিচার ক'রে গন্তব্য পথ ঠিক করবে। যে ভগবানের ইচ্ছা অন্বেষণ করে, যে তাঁর পথে চলতে চায়, যে প্রার্থনা করে, তারই কাছে তিনি অন্তরবাসী অন্তর্যামী। তিনি মানুষের কাছে নিত্য বিরাজ করেন, তিনি নিমেষে মানুষের অন্তর পূর্ণ ক'রে দেন। আমরা কি নিজ নিজ জীবনের অভিজ্ঞতায় জানি না যে, মন অনেক সময় একদিকে স্বাভাবিক রূপে ঝুঁকে পড়ে, মনে একটা প্রবল প্রেরণা আসে, তখন আমরা উপেক্ষা ক'রে উড়িয়ে দিই, বলি মানুষের আশ্চর্য্য প্রকৃতি; কিন্তু এ কথা কি স্মরণ করি যে, তিনি অন্তরে আছেন, তিনিই আমাদের প্রাণের ভিতর এই প্রেরণা এনে দিচ্ছেন। আমার একটী বন্ধু পীড়িত, বিপন্ন, আমার মনটা অকারণ বন্ধুর জন্য ব্যাকুল হ'ল, তাঁকে দেখবার জন্য ব্যস্ত হলাম, তখন গিয়া দেখি, আমার সেখানে যাওয়া নিতান্তই প্রয়োজন ছিল। বলি, মানুষের প্রাণ এমনই টানে। টানে কে, তাঁকে ত ভুলেও দেখি না। তিনি যে কর্ত্তব্যসংশয়ে শুভ বুদ্ধি দিতে পারেন, তিনি যে দুর্ব্বলতার সময় বল দিতে পারেন, তিনি যে বিপদের দিনে বিপদভঞ্জন রূপে আসেন, তিনি যে বিঘ্নবিনাশন, তিনি যে শোকের দিনে দুঃখহারী, তিনি যে ব্যথাহারী, তাঁর সঙ্গে যে অহর্নিশি এক ঘরে বাস করি, অচ্ছেদ্য আলিঙ্গনে দিবানিশি আবদ্ধ আছি—সেই কথাই যে সত্য কথা, সে কথা ভাবি না, বুঝি না, অনুভব করি না; তাই তো ভগবানকে ব্রহ্মাণ্ডের কোথায়ও খুঁজে পাই না, সব থেকে আলগোচ ক'রে, শূন্যে এক সিংহাসন গ'ড়ে সেখানে তাঁকে দেখবো ব'লে খুঁজি, সেখানে তাঁকে পূজা করতে আসি। কোথায়ও তাঁর দর্শন না পেয়ে ভাবি ভগবান বুঝি সাধারণ মানুষের—আমাদের মতন অধমদের—পাবার ধন নন। তাঁকে পাবার জন্য বোধ হয় কোন অলৌকিক পথ আছে। সে পথের কথা সাধু মহাজনগণ জানতেন, তাঁরাই ব'লে দিতে পারবেন। তাই দেখি মানুষ সাধুর দ্বারে হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকেন। ভগবানকে পাবার জন্য মানুষ কি না করে! হায়! হায়! ও পথ নয়, ও পথ নয়। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র প্রাণীর অন্তরে, ক্ষুদ্র ব্যাপারে, ক্ষুদ্র সুখ দুঃখে, সকল চিন্তায়, সকল কার্য্যে তিনি, প্রাণের ভিতর তাঁর অবিশ্রান্ত গতিবিধি—এই জ্ঞান, এই সত্য জ্ঞান, এই সত্য অনুভূতি, জাগ্রত করতে হবে, নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মত ইহাকে সহজ স্বাভাবিক করতে হবে; তবেই ধর্ম্মসাধন কঠিন অস্বাভাবিক হবে না, সহজ সুন্দর ও আনন্দের ব্যাপার হবে, তবেই জীবনে শক্তি জাগ্রত হবে, জীবন সার্থক হবে। আমরা কথায় কথায় ভগবানের ইচ্ছার কথা বলি। ভগবানের ইচ্ছা কি ক'রে জানবো? এই সৃষ্টিরাজ্যে ভগবানের ইচ্ছা মানুষ জানতে পারে—বৈজ্ঞানিক সত্যরূপে, জড়ের নিয়মরূপে। একটা অতি সামান্য দৃষ্টান্ত দিই—জল উত্তপ্ত হইলে বাষ্পরূপে উড়িয়া যায়, এটা প্রাকৃতিক জগতের নিয়ম। সমুদ্রের জল প্রখর সূর্য্যকিরণে বাষ্পাকারে উড়িয়া গিয়া মেঘের সৃষ্টি করে, সেই মেঘ বৃষ্টিধারায় পড়িয়া পৃথিবীকে সিক্ত করে, অবশেষে সেই জল গিয়া আবার সমুদ্রে

মিশে। বৈজ্ঞানিক যিনি তিনি প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যাখ্যা করেন; আর বিশ্বাসী যে সে সৃষ্টি রক্ষা বিষয়ে বিধাতার অভিপ্রায় বুঝবে। ভক্তের ভাষায় বলি প্রাকৃতিক জগতে ভগবানের বিধান নিয়ত পূর্ণ হচ্চে। তাঁরই বিধানে পুষ্প ফলে পরিণত হচ্চে। ফুলের যদি প্রার্থনা করবার ভাষা থাকত, সে প্রার্থনা করত, "আমায় প্রস্ফুটিত হ'তে দাও, আমায় ফল ফলাইতে দাও।" কিন্তু ফুলের প্রার্থনার জন্য বিধাতা অপেক্ষা করেন না, ফুল ফুটবেই, ফল ফলবেই। স্রষ্টার অভিপ্রায় এখানে অব্যর্থ, অমোঘ। প্রাণিরাজ্যে দেখি শাবকের প্রতি প্রসূতির কি অসীম বাৎসল্য! যে পশুর কোন জ্ঞান নাই, কোন বুদ্ধি নাই, শাবকের যতদিন প্রয়োজন ততদিন কি প্রবল টান, কি বাৎসল্য! কি মাতৃস্নেহ! যখন প্রয়োজন ফুরাইয়া যায়, মাতা সন্তানকে চেনে না, শত্রুতা করিতে যায়। প্রাণিরাজ্যে দেখি স্রষ্টার অভিপ্রায় কাজ করছে। মানব হৃদয়ে তাঁর ইচ্ছা ব্যক্ত হয়। দার্শনিক পণ্ডিতগণ মানব প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছেন। সেখানেও স্রষ্টার অভিপ্রায় বুঝিতে পারা যায়। তবে মানবের স্বাধীন ইচ্ছা থাকাতে ব্যাপারখানা জটিল হইয়া গিয়াছে। মানুষ চেষ্টা করিয়া স্বাভাবিক প্রকৃতিকে বিকৃত করিতে পারে। মানবসমাজে প্রকৃতির স্বাভাবিকত্ব অত্যন্ত বিরল। চীন দেশে শিশুকন্যার পা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া জনক জননী তাকে পঙ্গু করিয়া রাখিত; কিন্তু প্রকৃতি মাতা সে জন্য কখন চীন দেশের বালিকার পা ক্ষুদ্র করিয়া সৃষ্টি করেন নাই। ভগবানের ইচ্ছার উপর মানুষের ইচ্ছা এখানে জয়যুক্ত হ'তে পারে নাই। কিন্তু শিক্ষার দ্বারা, চেষ্টার দ্বারা, মানুষকে অর্থলোলুপ, স্বার্থপর, নিষ্ঠুর ক'রে তোলা যায়। বিধাতা জননীর প্রাণে অসীম বাৎসল্য দিয়েছেন। জননীর প্রাণের সেই স্বাভাবিক বাৎসল্য শিক্ষার দ্বারা কিরূপ রূপান্তরিত হ'তে পারে, তা প্রাচীন স্পার্টার মায়ের গল্পে শুনেছি। স্পার্টান মা দুর্ব্বল সন্তান জন্মিলেই তাহাকে পাহাড় হ'তে ফেলিয়া দিয়া হত্যা করতেন। রাজপুত মা কন্যাসন্তান জন্মিলেই নুন খাওয়াইয়া মারিয়া ফেলিত। এমন যে স্বাভাবিক মাতৃস্নেহ তাহাও শিক্ষা দ্বারা কতদূর বিকৃত হ'তে পারে, তা আমরা জানি। মানুষের স্বভাব নিয়ত বিকৃত হয়। ব্যক্তিগত জীবনে, সামাজিক জীবনে, বিধাতার অভিপ্রায় মানবসমাজে নিয়ত ব্যর্থ হচ্চে। স্রষ্টার অভিপ্রায়, মানব জীবনে, মানব সমাজে, নিয়ত প্রতিহত হচ্ছে, তার প্রতিক্রিয়া চলছে। বিধাতার বিধানের বিরুদ্ধাচারী হ'য়ে কারও নিষ্কৃতি নেই,—তা জ্ঞাতসারেই হোক, আর অজ্ঞাতসারেই হোক। বিধাতার বিধান অমান্য করলে তার ফল ভোগ করতে হয়। আমাদের এ সংসারে অকস্মাৎ স্রোতের ফুলের মত ভাসতে ভাসতে আসা নয়; যিনি এনেছেন, আমাদের প্রত্যেকের জীবনে তাঁর বিশেষ অভিপ্রায় পূর্ণ করবার জন্যই এনেছেন। প্রকাণ্ড বনস্পতি যিনি সৃষ্টি করেছেন, ক্ষুদ্র তৃণও তিনি সৃষ্টি করেছেন। জগতে বনস্পতির প্রয়োজন আছে, ক্ষুদ্র তৃণেরও প্রয়োজন আছে। নরনারী মিলে মানব সমাজ, নরনারী মিলে গৃহ পরিবার; কিন্তু গৃহেই নারীর প্রাধান্য, এখানে নারীর স্থান যত বড়; পুরুষের তত বড় নয়। ইহা বিধাতার বিধান, স্রষ্টার অভিপ্রায় এরূপ। তা যদি না হ'ত তবে নারীকে সন্তান-ধারণ, সন্তানের পালনের গুরুভার কখনই দিতেন না। যাঁরা মানবপ্রকৃতি অনুশীলন করেন, তাঁরা নারীপ্রকৃতির বিশেষত্বের কথা জানেন। নারী দেহের বলে পুরুষের সমকক্ষ নয়, নারী অবলা, দুর্ব্বলা, কিন্তু মনের বলে নারী যাহা পারে, সবল পুরুষেও তাহা পারে না। নারীর হৃদয়ে প্রচণ্ড শক্তি, নারীকে তাই শক্তি-রূপিণী বলা হয়। নারীর শক্তি কোথায়? দেহে নয়—মনে। মনের শক্তিই শক্তি। মনের বলই বল! আর নারীর বিশেষত্ব কি? নারীর প্রাণের কোমল প্রেম; মাতৃস্নেহ নারীকে মহীয়সী করিয়াছে। নারী প্রেমময়ী, তাই নারীর প্রাণ সহজেই ভগবানের দিকে ধাবিত হয়। জগতে তাবৎ ধর্ম্মের ইতিহাস পাঠ করলে দেখা যায় যে, নারীগণ যখন কোন ধর্ম্মগ্রহণ করেন, একেবারে প্রাণ মন দিয়া ধরেন—পুরুষের ধর্ম্মবিশ্বাস যখন শিথিল হয়, তখন নারী আরও নিষ্ঠার সহিত ধর্ম্মকে বুকে ধারণ করেন। কাশীতে কি দেখিলাম! সে কি দৃশ্য! গঙ্গাতীরে নারীর মেলা! অশীতিপর বৃদ্ধা কত কষ্টে সোপানশ্রেণী পার হ'য়ে দেবদর্শনে চলেছেন! অসমর্থতা হেতু ক্ষণে ক্ষণে দাঁড়াইতেছেন, তবু পশ্চাৎপদ হবার নাম নাই। কি ভক্তি! কি নিষ্ঠা! হিন্দু রমণী ধর্ম্মের জন্য তীর্থে তীর্থে যে কষ্ট স্বীকার করেন, তা দেখলে আশ্চর্য্য হ'তে হয়। নারীর স্বভাবই তাহা। নারীর নারীত্ব এবং সৌন্দর্য্য এখানে। নারীকে তিনি এ সংসারে কেবল পরিবার রক্ষা নয়, ধর্ম্মরক্ষার ভার দিয়াছেন। এ কথা যদি বিস্মৃত হই, তবে আর এ প্রার্থনা করবার দাবী করতেও পারব না, "হে প্রভো আমার জীবনে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক"। তাঁর বিধান নারীকে ধর্ম রক্ষা করতে হবে। নারীর হৃদয় প্রেম ভক্তি পোষণের জন্য ভগবান সৃষ্টি করেছেন; সেবা, দয়া মায়া, প্রেম ভক্তি, ইহা নারীর বিশেষত্ব, নারীপ্রকৃতির বিশেষ লক্ষণ। নারীজীবনের ইতিহাস একটী কথায় লেখা যায়—তা প্রেম। এক প্রেমেরই প্রয়োগভেদে বহু নামকরণ—যদি প্রেম সন্তানের প্রতি ধাবিত হয়, বলি বাৎসল্য। যখন প্রেম পতির প্রতি ধাবিত হয়, বলি প্রণয়। যখন প্রেম গুরুজনের প্রতি ধাবিত হয়, বলি শ্রদ্ধা ভক্তি। যখন প্রেম স্বদেশের প্রতি ধাবিত হয়, বলি স্বদেশানুরাগ। যখন প্রেম ভগবানের প্রতি ধাবিত হয় বলি পূজা। নারীর জীবনে প্রেমের আধিপত্য জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত, প্রতি মুহূর্ত্তে প্রেমের অধীন হইয়া কার্য্য করা নারীর প্রকৃতি; তাই নারী ভক্তিমতী হইলে এত স্বাভাবিক, এত সুন্দর হয়। নারীর প্রাণে যদি ভগবৎপ্রেম না ফুটিয়া উঠে, তাহা হইলে এক বিসদৃশ ব্যাপার। নদীর যদি খাতই থাকে, তাহাতে বিন্দুমাত্র জল না থাকে, তবে সে কি নদী? ফুলে যদি সৌন্দর্য্য ও গন্ধ না থাকে, তবে সে কি ফুল? বৃক্ষে যদি পত্র পুষ্প না থাকে, তবে সে কি বৃক্ষ? নারীপ্রাণে যদি প্রেম ভক্তি না থাকে তবে সে কি নারী? যে নারীর প্রাণে ভগবৎভক্তি আশ্রয় না পাইল সে নারীর জন্মই বৃথা। খৃষ্টধর্ম্মের ইতিহাসে কি দেখি? নারীরা যখন খৃষ্টধর্ম্ম প্রাণে পোষণ করলেন তখনই খৃষ্টধর্ম্ম প্রচণ্ড শক্তি হইয়া দাঁড়াল। বৌদ্ধধর্ম্ম যখন প্রচারিত হ'ল তখন নারীগণ দলে দলে বুদ্ধের শান্তি মন্ত্র প্রাণে ধারণ করলেন। নারী মাত্রেই সেবিকা। যে জন্ম ভরিয়া মানুষের সেবা করিল,

অথচ অন্তরবাসী দেবতার সন্ধান পাইল না, তার জন্ম বৃথা। নারীর প্রাণ ভক্তির আধার। প্রেমভক্তিহীন নারী আর বারি-বিহীন নদী ঠিক এক! নদীতে ধুধু বালু, কিন্তু জল নাই, তাতে তৃষিতের পিপাসা ঘোচে কি? নারীর প্রাণে যদি ভক্তি না থাকে তবে আছে কি? আজ মাঘোৎসব-ক্ষেত্রে আমরা এই প্রার্থনা হৃদয়ে জাগ্রত করি "হে প্রভো, তোমার প্রেমে সরস ক'রে নারী-জীবন ধন্য করতে দাও"

পুরুষদিগের জন্য সিটিকলেজ গৃহে পৃথক উপাসনার বন্দোবস্ত করা হয়। তথায় ডাক্তার পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম হস্তগত না হওয়াতে প্রকাশ করিতে পারিলাম না। প্রাপ্ত হইলে পরে প্রকাশ করিব।

সায়ংকালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক সভার অধিবেশন। তাহাতে উপাসনান্তে বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠ ও গ্রহণ, সভাপতির অভিভাষণ, কর্ম্মচারী, অধ্যক্ষসভার সভ্য, ব্রাহ্ম-বালিকা শিক্ষালয়ের ট্রাষ্টী (নাম পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে) ও হিসাবাদি পরীক্ষার জন্য একটি সব কমিটী নিয়োগ প্রভৃতি কার্য্য সম্পন্ন হইলে অবশিষ্ট কার্য্যের জন্য ৪ঠা ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত অধিবেশন স্থগিত হয়। ক্রমশঃ

ব্রাহ্মসমাজ

কার্য্যনির্ব্বাহক সভা—অধ্যক্ষ সভার বিগত ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখের বিশেষ অধিবেশনে নিম্নলিখিত মহোদয়গণ কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন:—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দত্ত, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস, শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেন, শ্রীযুক্ত বরদা-কান্ত বসু, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ডাক্তার কালিদাস নাগ, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মুখার্জ্জি, শ্রীযুক্ত সুধাংশুমোহন বসু ও শ্রীযুক্ত অশোক চাটার্জ্জি। শ্রীযুক্ত শিশির-কুমার দত্ত প্রচারকদিগের প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছেন।

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী কলিকাতা নগরীতে বাবু রজনীকান্ত দে ৬৮ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি নানা প্রকারে ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়াগিয়াছেন।

বিগত ৯ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা নগরীতে পরলোক গত বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায়ের পত্নী কালীতারা দেবী পরলোকগমন করিয়াছেন।

বিগত ১১ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত সন্তোষ কুমার লাহিড়ীর মাতামহী রামদাসী দেবী পরলোক গমন করিয়াছেন।

বিগত ১২ই ফেব্রুয়ারী পরলোকগত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায়ের কনিষ্ঠপুত্র নিশান্ত দীর্ঘকাল টাইফয়েড রোগে ভুগিয়া ১২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন।

বিগত ৩০শে জানুয়ারী পরলোকগতা বিধুমুখী রায় চৌধুরীর আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য আচার্য্যের কার্য্য করেন। এবং শ্রীযুক্ত গগনচন্দ্র হোম ও শ্রীমতী হেমলতা সরকার জীবনী সম্বন্ধে কিছু বলিয়া প্রার্থনা করেন।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চিরশান্তিতে রাখুন ও আত্মীয় স্বজনদিগের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

মফঃস্বলে মাঘোৎসব—ঢাকা পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজ নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে সপ্তনবতিতম মাঘোৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন:—

১লা মাঘ হইতে ৪ঠা মাঘ পর্য্যন্ত ব্রাহ্ম পরিবারে ব্রাহ্ম-সমাজের কল্যাণার্থ প্রার্থনা। ৫ই মাঘ সন্ধ্যায় উৎসবের উদ্বোধন; আচার্য্য শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী। ৬ই মাঘ প্রাতঃকালে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী; সন্ধ্যায় মহর্ষির স্মরণার্থ সভা; সভাপতি রায় বাহাদুর পি কে দাসগুপ্ত; বক্তা শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী, শ্রীযুক্ত গিরিশ চন্দ্র নাগ, বি এ, অধ্যাপক চারুচন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায়, বি এ। ৭ই মাঘ প্রাতঃকালে উপাসনা; আচার্য্য শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত সরকার; সন্ধ্যায় ইংরাজিতে বক্তৃতা; বক্তা শ্রীযুক্ত মনোমোহন বন্দোপাধ্যায়; বিষয়,—"The Religion of to-day". ৮ই মাঘ প্রাতঃকালে, উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন; ১০॥ ঘটিকায় মহিলা-উৎসব উপলক্ষে উপাসনা; আচার্য্য রায় বাহাদুর পি কে দাসগুপ্ত; মধ্যাহ্নে পাঠ ও ব্যাখ্যা—ব্যাখ্যাতা শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী; সন্ধ্যায় বক্তৃতা; বক্তা শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী; বিষয় "ভারতে ধর্ম্মের লীলা।" ৯ই মাঘ প্রাতঃকালে ছাত্রসমাজের উৎসব উপলক্ষে উপাসনা; আচার্য্য রায় বাহাদুর পি কে দাস-গুপ্ত; সন্ধ্যায় উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত। ১০ই মাঘ প্রাতঃকালে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী; উপাসনান্তে নবদ্বীপচন্দ্র স্মৃতিসভা; সভাপতি শ্রীযুক্ত মথুরানাথ গুহ; বক্তা শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত, শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র লাহিড়ী, শ্রীযুক্ত বঙ্কবিহারী কর, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র নাগ, রায়বাহাদুর পি কে গুপ্ত। মধ্যাহ্নে নগর সংকীর্ত্তন, (সংকীর্ত্তন রায় সাহেব প্যারীমোহন দাসের বাড়ী হইতে আরম্ভ হয় এবং গৃহস্বামী উপস্থিত বন্ধুদিগকে প্রীতিজলযোগে আপ্যায়িত করেন)। সন্ধ্যায় উপাসনা; আচার্য্য রায় বাহাদুর পি কে দাসগুপ্ত। ১১ই মাঘ অতিপ্রত্যুষে উষাকীর্ত্তন, তৎপর

উপাসনা; আচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত; উপাসনান্তে মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রীতিভোজন; মধ্যাহ্নে ২ ঘটিকায় উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত মথুরানাথ গুহ; উপাসনান্তে পাঠ ও ব্যাখ্যা; ব্যাখ্যাতা শ্রীযুক্ত মথুরানাথ গুহ ও শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য; তৎপরে প্রবন্ধ পাঠ; পাঠক শ্রীযুক্ত উমাচরণ সেন; বিষয় "রাজা রামমোহন রায় ও বর্ত্তমান জাতীয়-সমস্যা"। ৫ ঘটিকায় কীর্ত্তন, সন্ধ্যায় উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী। ১২ই মাঘ প্রাতঃকালে সাধনাশ্রমের উৎসব উপলক্ষে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত; মধ্যাহ্নে ২ ঘটিকায় বালক বালিকা উৎসব। (প্রায় ৫০০ বালক বালিকা সম্মিলিত হইয়াছিল এবং ইহাদের প্রীতি-জলযোগের সমুদয় ব্যয় রায় সাহেব প্যারীমোহন দাস বহন করেন)। সন্ধ্যায় ইংরাজি বক্তৃতা; বক্তা শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র নাগ; বিষয় "Religion Preached Versus Religion Practised." ১৩ই মাঘ প্রাতঃকালে উপাসনা; আচার্য্য শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য; ২ ঘটিকায় দরিদ্রদিগকে দান; সন্ধ্যায় সঙ্গত সভার উৎসব উপলক্ষে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার সেন; উপাসনান্তে সাধন-প্রসঙ্গ—শ্রীযুক্ত মথুরানাথ গুহ ও শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। ১৪ই মাঘ প্রাতঃকালে; উপাসনা; আচার্য্য শ্রীযুক্ত বঙ্কবিহারী কর; সন্ধ্যায় বক্তৃতা; বক্তা শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়; বিষয় "সত্যান্ন প্রমদিতব্যং"। ১৫ই মাঘ যুবকসম্মিলনীর উৎসব; প্রাতঃকালে উপাসনা; আচার্য্য শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী; সন্ধ্যায় সম্মিলন। ১৬ই মাঘ প্রাতঃকালে গেণ্ডারিয়া উদ্যানে উপাসনা; আচার্য্য শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র লাহিড়ী; তৎপরে প্রীতিভোজন; সন্ধ্যায় মন্দিরে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

তেজপুর—তেজপুর ব্রাহ্মসমাজে ৭ই হইতে ১১ই মাঘ পর্য্যন্ত প্রিয় মাঘোৎসব সম্পন্ন করা হইয়াছে। উৎসবে ১০ই এবং ১১ই মাঘ স্থানীয় ভদ্র মহোদয় এবং মহিলারা অনেকেই যোগদান করিয়া আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

আগ্রা—বিগত ১১ই মাঘ সন্ধ্যায় মেজর মনীন্দ্রনাথ দাসের গৃহে ব্রহ্মোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। প্রায় এক শতাধিক বাঙ্গালী পুরুষ ও মহিলা উপাসনায় যোগদান করিয়াছিলেন। উপাসনান্তে সকলকে মিষ্টান্ন বিতরণ করা হইয়াছিল।

কালিকচ্ছ—ভগবানের কৃপায় কালীকচ্ছ ব্রাহ্মসমাজে নিম্ন লিখিত প্রণালী অনুসারে মাঘোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে:—

৬ই মাঘ প্রাতে ব্রাহ্মপরিবারে ব্রাহ্মসমাজের জন্য প্রার্থনা; সন্ধ্যায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিসভা—সভাপতি পণ্ডিত রজনীকান্ত স্মৃতিরত্ন, বক্তা শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন ও শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ নন্দী। ৭ই মাঘ অপরাহ্নে নগর সংকীর্ত্তন; সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী দত্তের বাড়ীতে উপাসনা ও কীর্ত্তন, শ্রীযুক্ত প্যারীনাথ নন্দী উপাসনার কার্য্য করিয়াছেন। ৮ই মাঘ সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দীর বাড়ীতে কীর্ত্তন ও উপাসনা, শ্রীযুক্ত প্যারীনাথ নন্দী উপাসনার কার্য্য করেন। ৯ই মাঘ প্রাতে ব্রাহ্মমন্দিরে উপাসনা, শ্রীমতী বিনোদিনী নন্দী উপাসনার কার্য্য করেন। অপরাহ্ন ৩ ঘটিকায় বালক বালিকা সম্মিলন। শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সভাপতি, শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ নন্দী ও পণ্ডিত রজনীকান্ত স্মৃতিরত্ন উপদেশ দিয়াছেন। সন্ধ্যায় মন্দিরে উপাসনা ও কীর্ত্তন, শ্রীযুক্ত প্যারীনাথ নন্দী উপাসনার কার্য্য করেন। ১০ই মাঘ প্রাতে মন্দিরে কীর্ত্তন ও উপাসনা, শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ নন্দী উপাসনার কার্য্য করেন। সন্ধ্যায় মন্দিরে উপাসনা, শ্রীযুক্ত বিবেকচন্দ্র নন্দী উপাসনার কার্য্য করেন। ১১ই মাঘ উষা কীর্ত্তন ও উপাসনা, শ্রীযুক্ত প্যারীনাথ নন্দী উপাসনার কার্য্য করেন ১০ ঘটিকায় শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দীর পারিবারিক ব্রাহ্মমন্দিরে উপাসনা, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দী উপাসনার কার্য্য করেন। অপরাহ্ন ৩ ঘটিকায় মন্দিরে পাঠ ও কীর্ত্তন, সন্ধ্যায় মন্দিরে উপাসনা, শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ নন্দী উপাসনার কার্য্য করেন। ১২ই মাঘ প্রাতে মন্দিরে উপাসনা, শ্রীযুক্ত প্যারীনাথ নন্দী উপাসনার কার্য্য করেন। অপরাহ্নে মন্দিরে মহিলা-উৎসব, শ্রীমতী বিনোদিনী নন্দী উপাসনা ও পাঠ করেন। শ্রীমতী সরযুবালা দেবী রচনা পাঠ করেন। ১৩ই মাঘ উদ্যান-সম্মিলন, শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ নন্দীর বাগানে প্রাতে উপাসনা। ২ ঘটিকায় কীর্ত্তন, তৎপরে প্রীতি-ভোজন। শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ নন্দী প্রীতি-ভোজনের ব্যয় বহন করিয়াছেন।

শুভবিবাহ—বিগত ৬ই ফেব্রুয়ারী গিরিডিতে শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র নাগের তৃতীয়া কন্যা কল্যাণীয়া প্রফুল্লকুমারী ও কলিকাতা প্রবাসী শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর দাসের তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্ সিদ্ধেশ্বরের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। এতদুপলক্ষে কন্যার পিতা স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজে ২ টাকা প্রদান করিয়াছেন। প্রেমময় পিতা নবদম্পতিকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

বৃত্তি—বিগত বি.এ পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্য শ্রীমান অরুণকুমার সেন প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে ৩০৲ টাকার একটি ও আইন কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর প্রতিযোগীতা পরীক্ষায় ১০৲ টাকার আর একটি বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন জানিয়া আমরা সুখী হইলাম। এই উপলক্ষে শিবনাথ স্মৃতি-ভাণ্ডারে শ্রীমান অরুণকুমার ১০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

দান—পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে শ্রীযুক্ত দেবব্রত মল্লিক মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজে ৫৲ ও ডিব্রুগড় ব্রাহ্মসমাজে ৫৲ দান করিয়াছেন। এ দান সার্থক হউক ও পরলোকগত আত্মা চিরশান্তি লাভ করুন।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় দ্বারা ১৬ই ফাল্গুন মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রীবরদাকান্ত বসু, বি-এ।

Registered N0`65.

অসতো মা সদগময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময়॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৬ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৪৯ম ভাগ। ১লা চৈত্র, মঙ্গলবার, ১৩৩৩, ১৮৪৮ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯৮ প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০

২৩শ সংখ্যা। 15th March, 1927. অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা

হে নিত্যক্রিয়াশীল বিশ্ববিধাতা, তুমি আমাদের প্রত্যেক জীবনে ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নিয়ত জীবন্ত ভাবে কার্য্য করিতেছ, সকলকে সতত মঙ্গল ও কল্যাণের পথে নিয়া চলিয়াছ। আমরা মোহবশতঃ অনেক সময় তোমার পথ পরিত্যাগ করিয়া, আপনার ভাবে, আপনার খেয়ালে চলিয়া, তোমার কার্য্যে নানা বিঘ্ন উপস্থিত করি। আমাদের জীবনে ও কার্য্যে অনেক ব্যর্থতা আনয়ন করিলেও, তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ কর না, অধিক দূরে যাইতে দেও না। তুমি সর্ব্বদা সঙ্গে থাকিয়া আমাদিগকে তোমার কল্যাণের পথ দেখাইয়া দেও, বার বার আমাদিগকে তোমার পথে ফিরাইয়া আন, সকল বিরোধিতা সত্ত্বেও তোমার কার্য্য কিছু পরিমাণে করাইয়া লও। হে করুণাময় পিতা, তুমি যদি এমনি করিয়া আমাদিগকে নিয়ন্ত্রিত না করিতে, তাহা হইলে যে আমরা কোথায় যাইয়া পড়িতাম, তোমার সমস্ত কার্য্য কিরূপ পণ্ড করিয়া ফেলিতাম, তাহা কে জানে? তোমার অপার প্রেমেই তুমি তাহা করিতে দেও না, আমাদিগকে নানা দুঃখ বেদনা লাঞ্ছনার মধ্য দিয়া আবার তোমার পথে লইয়া আইস। কিন্তু এই ভাবে যে আমরা জীবনকে কত ব্যর্থ করিতেছি, তোমার মহৎ কার্য্যে কত বাধা দিতেছি, তাহা আমরা ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখি না! তাই এখনও সম্পূর্ণ রূপে তোমার হাতে আপনাদিগকে অর্পণ করিতেছি না, তোমার অনুগত হইয়া চলিবার জন্য ব্যস্ত হইতেছি না। তুমি কৃপা করিয়া আমাদের এই দুর্বুদ্ধি দূর কর, আমাদের হৃদয়ে বল ও শুভসংকল্প দেও; আমরা তোমার হইয়া, তোমার কার্য্য করিয়া, ধন্য ও কৃতার্থ হই। তোমার মঙ্গল ইচ্ছাই আমাদের সকলের জীবনে পূর্ণরূপে জয়যুক্ত হউক! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

সপ্তনবতিতম মাঘোৎসব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

১১ই মাঘ (২৫শে জানুয়ারী) মঙ্গলবার—

(প্রাতঃকালীন) উপাসনান্তে আচার্য্য (শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য) নিম্নলিখিত উপদেশ প্রদান করেন:—

জগতের যত বেদনা তার মধ্যে শোক এবং পাপ এই দুইটী দুশ্চিকিৎস্য। ভেবে যদি দেখেন, দেখিবেন মানুষের ক্লেশের অনেক কারণ আছে; কিন্তু সেগুলি মানুষের দ্বারা কতকটা উপশমিত হ'তে পারে। দারিদ্র্যের যে ক্লেশ, ধনী মানুষের দ্বারা তাহার কিছু নিবৃত্তি হ'তে পারে; ব্যথার যে ক্লেশ, পার্থিব চিকিৎসার দ্বারা তাহার কিছু উপশম হ'তে পারে। এমনি ক'রে অনেক ক্লেশের প্রতিকারের উপায় আছে। কিন্তু শোক আর পাপের প্রতিকার মানুষের অসাধ্য; অথচ শোক পৃথিবীতে নিত্য, পাপ প্রতি মুহূর্ত্তে বর্ত্তমান। পরমেশ্বর ইহার কি বিধান করিয়াছেন, আজ তাই বু'ঝে দেখ্‌তে চেষ্টা করি। মঙ্গলময় পরমেশ্বরের পূজা ততক্ষণ সন্দেহযুক্ত থাকে, যতক্ষণ ইহার মধ্যে এই দুইটী মহা বিপদের উদ্দেশ্য এবং প্রতিকার খুঁজে না পাই। শোকের বিষয়ে দুইটী কথা বল্‌ব। নারদের উপাখ্যান ধর্ম্মজীবন মাত্রেরই আরম্ভের উপাখ্যান। আপনারা জানেন, বৃদ্ধের পক্ষে পুত্রশোক যেমন, বালকের পক্ষে মাতৃশোক তারচেয়ে কম নয়। নারদ মাতৃশোক পেলেন, সংসার আর ভাল লাগ্‌ল না, সংসারে একা, আর কেহ নাই, তিনি মহাপ্রস্থান করলেন, 'বানপ্রস্থ অবলম্বন করলেন। আপনারা অনেকেই

দেখে থাক্‌বেন নিদ্রার অবসানটা বড় একটা শুভ মুহূর্ত,—ভগবানের অনেক ইঙ্গিত এই সময় পাওয়া যায়। একদিন নিদ্রার অবসানে নারদ ভগবানের মূর্ত্তি দর্শন কর্‌লেন। সে যে ভগবানের মূর্ত্তি জান্‌লেন কেমন ক'রে? চারিদিক মধুময় হ'য়ে গেল—অনেক বর্ণনা আছে, মধুময় এই এক কথাই যথেষ্ট—চারিদিক মধুময় হ'য়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে মূর্ত্তি আর দেখা গেল না। কতদিনধ'রে বনে জঙ্গলে ঘুর্‌লেন, কত খুঁজ্‌লেন, কত ধ্যান কর্‌লেন, মূর্ত্তি আর দেখা গেল না। আকাশে দৈববাণী শুন্‌লেন—নারদ, অপরিশুদ্ধ-

যারা, ভগবান তাহাদিগকে তাঁর পথে প্রলুব্ধ কর্‌বার জন্য কৃপা ক'রে একবার ঐ রকম দর্শন দেন। আবার যদি চাও, তবে তোমার অন্তরের যে ক্লেদ তাহা সব দূরীভূত কর।" শোকের পর নারদ একবার তাঁকে দর্শন কর্‌লেন, কিন্তু স্থায়ী শান্তি তাতে পাওয়া যায় না। নারদ নারদ হ'তে পারেন নাই, যতদিন তিনি জগতের দুঃখে দুঃখী না হ'লেন। যেদিন বীণা-যন্ত্র নিয়ে জগতের দ্বারে দ্বারে হরিগুণগান কর্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন, জগতের দুঃখ বিনাশের জন্য মধুময় হরিনাম যখন চারিদিকে ছড়াতে আরম্ভ কর্‌লেন, তখন আর কোন মনস্তাপ রইল না।

বুদ্ধের একটা গল্প বলি—সকলে জানেন, সংক্ষেপে বল্‌ব। এক সন্তানহীনা জননী বুদ্ধের অপার করুণার কথা শু'নে, মৃত সন্তান কোলে ক'রে বুদ্ধের চরণে এনে স্থাপন কর্‌লেন। "অসীম দয়ার আধার তুমি, আমি অনাথা, একমাত্র শিশু আমার, প্রেমের পুতুলি; দেখ তার দশা, এর জীবন চাই ঠাকুর, এর জীবন চাই।" বুদ্ধ তার কাতরোক্তি শুন্‌লেন, তার চিত্তের ব্যথা অনুভব কর্‌লেন। যারা ব্যথাজয়ী হ'য়েছেন তাঁরা ব্যথা বুঝেন না, এমন নয়। জগতের ষোল আনা ব্যথা বু'ঝে, তবে ব্যথাজয়ী হয়েছেন। যেমন বুদ্ধ, তেমনি খৃষ্ট, তেমনি অপর সকল সাধু। জগতের ভার নিজের বুকে না নিয়ে কেহ শোকবিজয়ী হ'তে পারেন নাই। তিনি বুঝ্‌লেন, বু'ঝে বল্লেন "মা, যাও তুমি, এক মুষ্টি সর্ষপ ভিক্ষা ক'রে আন, আমি তোমার সন্তান জিইয়ে দেব। কিন্তু দেখ', এমন ঘর থেকে সর্ষপ এন না, যে বাড়ীতে মৃত্যু কখনও ঘটেছে।" পুত্রশোকে বিকল জননী কথাটার কতদূর লক্ষ্য বুঝ্‌তে পারল্‌ না; সে ছুটল সর্ষপ আন্‌তে। গেল এক বাড়ীতে, সর্ষপ চাইল, তারা দিতে এল; তখন সে বল্‌ল "মাগো, একটী কথা বল্‌বার আছে, তোমাদের বাড়ীতে কারো মৃত্যু ত হয় নাই?" যে ভিক্ষা দি'চ্ছিল সে চোখের জল ছেড়ে দিল,—"বল কি মা! সোণার পুতুলি পুত্র আজ কয়দিন হ'ল বিসর্জ্জন দিয়েছি!" দুঃখে দুঃখিনী মাতার বুক ফেটে গেল, ভিক্ষা নিল না; আর এক বাড়ী গেল—ঐ এক কথা। দ্বারে দ্বারে সর্ষপ ভিক্ষা করে, কাতর কাহিনী শোনে—মৃত্যু সব গৃহে হানা দিয়ে গিয়েছে—চারিদিকে কেবল চোখের জল দেখে। অনেক ঘুরল, পরের অনেক শোক সে হৃদয়ে পুঞ্জীকৃত ক'রে নিল, এবং বুদ্ধের চরণে ফি'রে গেল। কিন্তু সেই প্রথম বৃদ্ধা আর নাই, জগতের শোকের মধ্যে নিজের শোক কোথায় হারাইয়া ফেলেছে,—শোক আর নাই, প্রশান্তমূর্ত্তি হ'য়ে গেছে! এই ব্রাহ্ম-সমাজের উৎসবের অব্যবহিত পূর্ব্বে আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় আচার্য্য ও অন্যান্যের গৃহে মৃত্যু হানা দিয়েছে। সেখানেও ঐ লীলা দেখ্‌লাম—কন্যার শ্রাদ্ধ কর্‌ছে মা বাপ, আর এক পুত্র-হীন উপাসনায় গিয়েছে, উপাসনা শেষ হ'ল তবু দরজায় দাঁড়াইয়া অবিরল অশ্রুধারা তিনি ফেল্‌ছেন। এ তাঁর নিজের ব্যথা ষোল আনা নয়, ব্যথীর ব্যথাতে শোকাশ্রুর সঙ্গে শোকাশ্রু মিলিয়ে আজ তিনি ধন্য হ'লেন। ভাই বোন, তোমরা নিজের কথা ভু'লে এমনি ক'রে পরের জন্যও অশ্রুপাত কর্‌তে শিখেছ। ব্রাহ্মসমাজকে ধন্য বলি, তোমরা এই সাধনার পথ পেয়েছ। অশ্রুতে অশ্রু মিশিয়ে, জগতের বেদনা বুকে তুলে নিয়ে, শোকা-বেগ তোমরা প্রশমিত কর্‌বে। ধন্য হউক প্রভুর নাম। জগতের সকল মানব কাঁদ্‌বে, আর আমার পুত্রশোক প্রশমিত হ'য়ে যাবে? আমি যদি ভগবানের শরণাপন্ন হই, তিনি শোক প্রশমিত করেন, কিন্তু পথটা দেখিয়ে দেন—ঐ রমণীর মত দ্বারে দ্বারে ক্রন্দন ক'রে এস, সকলের চক্ষের জলে চক্ষের জল ফে'লে এস, নারদের মত, দুঃস্থ শোকার্ত্ত যারা তাদের দ্বারে যাও, ভগবানের গুণানুকীর্ত্তন কর, তোমার শোক প্রশমিত হবে। ভেবে দেখ ভগবানের কাছে এর কম কিছু চাওয়া যায় না। আমরা সংসারে থেকে অনেক বিষয়ে স্বার্থপর হয়েছি। সাধনার বিষয়ে, উচ্চতর জীবনের বিষয়ে, সেই স্বার্থপরতার পথ অবলম্বন করিতে চাই প্রভু; জগতের সকলের দুঃখ কর্ণেও পৌছায় না, সকলকে তেমন ক'রে বরণ কর্‌তে, স্মরণ কর্‌তে, ত জানি না, তাদের দুঃখ তেমনি রইল, ওগো আমার পুত্রশোকের ব্যথা প্রশমিত ক'রে দাও, আমি বল্‌তে পারি। কিন্তু ভগবানের যে অসংখ্য গৃহ রইল, অসংখ্য পুত্র কন্যা রইল, শোকার্ত্ত! তাদের জন্য যে তোমার কিছু ক'রে আস্‌তে হবে! নিতে হ'লে দিতে হবে। যাও নারদ, যাও, অন্য শোকার্ত্তের কাছে যাও, ভগবানের নাম দ্বারে দ্বারে গেয়ে এস, তারপর দেখ তোমার চিত্ত কেমন হয়—এই ভগবানের ব্যবস্থা।

পাপের কথাও কিছু বলি—সেখানেও ঐ এক লীলা। এখানে ব'সে প্রার্থনা কর্‌ব,—ভগবান, পাপের অগ্নি নির্ব্বাণ ক'রে দাও, গোপনে ব'সে প্রতিদিন ডাক্‌ব, আমায় শান্তিসুখ দাও,—ভগবান শুন্‌বেন, কিছু আশ্বাস দিবেন, কিন্তু প্রাণের আশা মিট্‌বে না। মূসা শৈলশিখরে ভগবানের নিকট বিধি পেলেন, ভগবানের সামীপ্যে সাহচর্য্যে যে আনন্দ সে আনন্দ পেলেন, মগ্ন হ'য়ে রইলেন। ভগবান বল্লেন মোজেস্, Go, get thee down; for thy people, which thou broughtest out of Egypt, have corrupted themselves.—যাও, নেমে যাও, তুমি ইজিপ্ট, হইতে তোমার যে সকল লোকদিগকে এনেছিলে, তারা আপনাদিগকে মলিন করিয়া ফেলিয়াছে।

ভগবানের সামিপ্যে ও সাহচর্য্যে শান্তি আর আরাম সাধক-জীবন অবিশ্রান্ত ভোগ কর্‌তে পার্‌বে না। স্বর্গসুখ ভোগ কর্‌বে, দাস দাসী সেবা কর্‌বে, কোন ভাবনা নাই, সেখানে গেলে লোক মর্ত্ত্যের কথা ভু'লে যায়, তা-ই কি স্বর্গ? ভগবানের বিধানে চারিদিকে যে শোক সন্তাপ, পাপ-অগ্নি, বর্ত্তমান রয়েছে, স্বর্গে যেয়ে তা ভু'লে গেলে চল্‌বে না। সে স্বর্গ ই নয়—সে নিষ্ক্রিয় স্পন্দনহীন, বর্ণহীন অবাস্তব স্থান। ভগবান্ মূসাকে প্রেরণ কর্‌লেন। উদাহরণ এক নয়। ধর্ম্মাচার্য্যদের, সাধুদের, জীবন-

চরিত্রের সর্ব্বাংশ ভাল ক'রে লেখা হয় না ; কিন্তু আমি জীবনে অনুভব করেছি—এই সাধারণ নিয়ম। মুসাই যে কেবল নেমে এসেছেন, তা নয়। দেবেন্দ্রনাথ হিমালয়শিখরে ভগবানের ধ্যান ক'রে, শান্তির মধ্যে, নৈসর্গিক শোভার মধ্যে, অপূর্ব্ব তাঁর লীলা দেখে আপ্লুত হয়েছিলেন,—'আর এ সুখ ছেড়ে যাব না।' ঠিক ঐ এক বাণী—নাব নাব নাব। গঙ্গা যেমন নেমে যায়, স্বচ্ছবক্ষে হিমালয়ে আবদ্ধ থাকুক, এ কথা কেহ বল্‌বে না—স্বচ্ছতা যায় তাও স্বীকার, তবু নাব নাব নাব, অবতীর্ণ হও। রামমোহনের প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ মৃতপ্রায় হ'য়ে রয়েছে, জগতের উদ্ধার যে সমাজ করবে, সে সমাজ যায় যায়। আর তুমি শৈলশিখরে ব্রহ্মস্পর্শসুখ অনুভব করতে ব'সে আছ! হবে না, যাও, নাব নাব নাব। শোকের পথ, পাপের পথ—সকল পথে ভগবান্ স্বার্থপর উপাসনা নিবেন না, স্বার্থপর ধ্যান নিবেন না! মানুষ এই সংসারে প্রত্যেকে একটী দ্বীপ হ'য়ে ব'সে আছে, চারি দিক এমনি ক'রে জলাকীর্ণ ক'রে রেখেছে, কোন দিকে আদান প্রদান যেন না হয়—কেহ যেন আমার গণ্ডীর ভিতর অনধিকার প্রবেশ করতে না পারে,—এমনি ক'রে দ্বীপ রচনা করেছে মানুষ। কিন্তু ভগবানের বিধানে এই সকল দ্বীপ এক মহাপ্রদেশে পরিণত হইবে। মানুষকে অল্পে তিনি ছাড়েন না। পাপের তাড়না কার নাই ভাই? এ তাড়না এড়াতে চাই, প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই। প্রায়শ্চিত্তের প্রণালী—শাস্ত্র বল্‌ছে—পাপ আর কর্‌বো না, করব না ব'লে প্রতিজ্ঞা কর ভগবানের কাছে, তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হ'য়ে যাবে। কিন্তু শাস্ত্র সম্যক্ দর্শন করে নাই, অর্দ্ধেক কথা বলতে ভুলে গেছে—এতে হবে না। এ কথা যতদূর বলা হয়েছে ততদূর ঠিক; কিন্তু এ অর্দ্ধেক। সমুদ্র বাষ্পাকারে আকাশপথে নিজের জল পাঠিয়ে দেয়, আকাশ যখন সে জল প্রত্যর্পণ করে, তখন উহা আকাশপথে সমুদ্রে যেয়ে পড়ে না—আকাশ অবশ্য সে জল পৃথিবীকে ধৌত ক'রে সমুদ্রে ফিরিয়ে দেয়। আমাদের পূজা, আমাদের প্রার্থনা, পাপের জন্য আমাদের ক্রন্দন, অধ্যাত্মপথে ভগবানের চরণে যায়; কিন্তু জবাব আসে আর এক পথে। প্রার্থনার উত্তর মানুষ অনেক সময় পায় না। কেন পায় না? ভগবানের পথটী থাকে ভিন্ন,—ভগবানের বাক্যে প্রার্থনা যায়, ফিরে আসে ঐ চক্রাকার পথে। যদি অর্দ্ধেক দেখি, অপূর্ণ প্রার্থনা দেখ্‌বার সম্ভাবনা থাকে। যদি পূর্ণ দেখ তবে তোমার প্রার্থনা জগতের ক্রন্দনের সঙ্গে মিলে' আর এক পথে তোমার কাছে আসবে। উদ্ধার হচ্ছ না কেন ভাই বোন? পাপ থেকে উদ্ধার হচ্ছ না কেন? প্রথমতঃ, ভগবানের কাছে ডাকা তোমার হয় নাই; দ্বিতীয়তঃ, পাপকে বর্জ্জন তুমি কর নাই। আর করব না বল, কিন্তু কর। সেখানে বরং সেণ্টপলের ভাষায় বলতে পারি—"আমার রক্তমাংস, আমার অভ্যাস, আমাকে কি সঙ্কটে ফেলেছে! আমি যা করতে চাইনা, তা-ই করি, আর যা করতে চাই তা' করি না।" সাধকশ্রেষ্ঠ সেণ্ট পল যদি শুধু এ কথা ব'লে যেতেন, তবুও জগৎ তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকত। বড় পাকা কথা। এমনি ক'রে কে বলতে পারে? দুঃখের দুঃখী, আমাদের সমব্যথী কে আছে? যা করতে চাই না তা-ই করি, যা করতে চাই তা করি না! সুতরাং ভগবানের কাছে যদি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই, দুর্নীতি, পাপ হ'তে দূরে থাকব, তবে সে প্রতিজ্ঞাবাক্য রক্ষা করতে পারব কি না সন্দেহ। এই জন্য পাপের তিনটী প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে—(১) ভগবানের শরণাপন্ন হওয়া (২) সংকল্প, প্রতিজ্ঞা (৩) আর—আর কি?—জগতের পাপের জন্য ব্যথিত হ'য়ে, যথাসাধ্য যতটুকু সম্ভব আমি তার প্রতিকার করব।

একাকী যাইলে পথে নাইকো নিস্তার। যে পড়ে রইল, যারা পাপী, তাদের জন্য হস্ত নাড়লাম না, সমবেদনার কথা বল্লাম না, সংসারত্যাগী হ'লাম, সংসারকে মায়া বল্লাম, নির্জ্জন গুহায় একাকী ধ্যান ধারণা করলাম! এ সাধনায় ত্রুটী র'য়ে গেল! তুমি ভগবানের একলা? ভগবান তোমাকে অথবা ঐরূপ দুই চারি জন সংসারত্যাগীকে উদ্ধার ক'রে নেবেন? এই সংসার কি ভগবানের কেহ নয়? মায়া মায়া মায়া? কার মায়া? যদি মায়া হয়, তবে সত্য কোথাও নাই। দার্শনিকরা বুঝিয়ে দিয়েছেন,—বাহিরকে অস্বীকার কর, ভিতর স্বীকার করা কঠিন হবে, ভিতর থাকবে না। তুমি এই যে ধ্যান ধারণা কর, এই যে অন্তরের তপস্যা কর, বলবে—এ মায়া নয়। বিশ্বনাথের জগতে, জগন্নাথের জগতে, তাঁর পুত্র কন্যা আমরা। আমার যদি দুঃখ থাকে, আমার যদি পাপের আগুন থাকে, জগন্নাথ যদি তোমার প্রতি কৃপাপরবশ হন, তুমি যদি তাঁর চরণাশ্রয়ে লুটিয়ে প'ড়ে থাক, তোমার দুঃখ যদি প্রশমিত ক'রে দেন, তাহা হইলেও সে সাধনা সম্যক্ সফল হবে না। তোমায় তিনি আশ্বস্ত করবেন, কিন্তু তোমার পূর্ণ মুক্তি হ'ল না, পাপ র'য়ে গেল। জগতের অধিপতি কি করেন? তিনি নিষ্ক্রিয় নন, মোটেই নন—তিনি চিরক্রিয়াশীল। নিষ্ক্রিয়ের আবার কে ক্রিয়া জানতে চায়? তাঁর সঙ্গে কার সম্পর্ক? আমার পিতা আমার দুঃখে দুঃখী, আমার উদ্ধারের চির উপায় পিতা মাতা, এ যখন জানি, যখন আরো জানি তিনি সীমাবিশিষ্ট পিতা মাতা নন, অসীম পিতা মাতা, অসীম মঙ্গলময়, অসীম প্রেমিক, তখন সাহস হয়, আশ্বাস পাই, আশা হয়। কার উপর নির্ভর ক'রে ধর্ম্মসাধন হয়, ধর্ম্মসাধনে এই আশা যদি জাগিতে না থাকে, এই প্রতিশ্রুতি যদি ভগবান না দেন—আমি মঙ্গলনিধান, আমি প্রেমময়, তোমাদের জন্য আমি আছি? সেই পিতা নিষ্ক্রিয় নন, চিরক্রিয়াশীল, প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁর প্রেমের বন্যা ব'য়ে যাচ্ছে। সেই ভগবান, তাঁকে সম্মুখে রেখে, তাঁর কাছে কৃপাপ্রার্থী হ'য়ে, জগতে উদাসীন হ'য়ে যাব? তা নয়। বরং কত ভক্ত বলেছেন—পিতা, জগৎকে তুমি উদ্ধার কর, আমি থাকি, সর্ব্ব শেষে আমারও উদ্ধার হবে; কিন্তু স্বার্থপরতা অনেক করেছি সাংসারিক জীবনে, এখানে আর তা করব না; আমি যাব আগে, আমার জন্য দরজা খোল তোমার উৎসব মন্দিরের—এ আর বলব না। সংসারের বেলা অনেক বলেছি। অনেক সাধু এমন প্রার্থনা করেছেন জগতের মুক্তি হউক, আমি রইলাম প'ড়ে। যদি জগৎ মুক্ত না হয়, যদি একটি পাপীও পড়ে থাকে, তবে আমিও তার কাছে থাকব, তার সেবা করব, নরক হ'লেও আমি সে নরক বরণ ক'রে নেব।

আজ ভাই বোন, বিশেষ ভাবে আমার যুবকবন্ধুগণ,

তাদের কাছে এর যে কি অর্থ হয়, তা-ই বল্‌তে চাই। তোমরা দেশের প্রতি দৃষ্টিপাত কর্‌ছ। কি দেখ্‌ছ? এক এক ক'রে নাও। পাপের কথা বল্‌লাম—একটী কথা বলা আবশ্যক—পাপ বল্‌তে এ কথা বুঝ' না, যে কয়টা নিষেধের আজ্ঞা আছে তার বিরোধী হ'লেই পাপ হয়। ওটা পাপের অতি অল্প অংশ। তোমরা একটী কথা শু'নে থাক্‌বে, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের "সেবকের নিবেদনের" একটী অংশ প'ড়ে থাক্‌বে—যেখানে তিনি বলেছেন, আমার চারিদিকে ভীষণ সর্পের ন্যায় পাপ কিলবিল কর্‌ছে। কথাটা কি ব'লে বুঝ? তোমরা কি মনে কর, ব্রহ্মানন্দ ভেবেছেন আমি মিথ্যা কথা অনেক বলেছি, পরস্ব অপহরণ অনেক করেছি, আমি অনেকরূপ হীন পাপের অনুষ্ঠান করিয়াছি, রক্তপাত করিয়াছি? এ সব জীবনে তিনি কিছুই করেন নাই। তবে কি মিথ্যা কথা বলেছেন, অতিরঞ্জিত কথা বলেছেন? না, ভাই, মিথ্যা এর মধ্যে নাই। পাপের কোন বিশিষ্ট কর্ম্ম করা না করাই কেবল পাপ নয়। ভগবান তোমাদের জন্য একটী গতি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন—আজ তোমরা মানুষ আছ, তোমাদিগকে দেবতা হ'তে হবে। এই তোমার নিয়তি। এ আজ্ঞা কার? ভগবানের আজ্ঞা। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, যে উপায়েই হউক, পশুর ভিতর মানুষ আস্‌বে। কিন্তু মানুষই কি সৃষ্টির পরিণতি? মানুষের মধ্যে কত ভিন্নতা দেখ্‌ছি! এক জনকে আর এক জনের তুলনায় পশু বল্‌লেও দোষ হয় না। এখানেও মানুষের মধ্যে পশু থেকে দেবতা উৎপন্ন হয়েছে। যা কিছু হয়, ভগবানের রাজ্যে সব ক্রমে হয়। তোমরা যে মনে কর মর্‌লে স্বর্গ পাব, কথাটা ঠিক নয়। যদি বেঁচে থাক্‌তে স্বর্গ পাই, তবেই মর্‌লে স্বর্গ পাব। যদি বেঁচে থাক্‌তে তার কোন সন্ধান না পাই, মরামাত্রই স্বর্গ এগিয়ে আস্‌বে? আস্‌বে না। দেবতা যদি হ'তে হয়, এখান থেকে তার আরম্ভ। স্বর্গ পাওয়া আর দেবতা হওয়া, এক কথা দুই আকারে বলা হয়। এখানেই পেতে হবে। যে সকল লোক পেয়েছে, হয়েছে কি তাদের? ভগবানের স্বরূপ সসীম নয়, অসীম। যে দেবত্ব প্রাপ্ত হয়, অসীমের আদর্শ ক্রমে ক্রমে তার কাছে খুল্‌তে থাকে। কোন বিশেষ ব্যক্তি বা শরীর ল'য়ে দেবতা হয় না। অসীম পুণ্যের আদর্শ, প্রেমের আদর্শ, যার কাছে ধীরে ধীরে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, সে ধীরে ধীরে যবনিকার অন্তরালে দেবলোকে প্রবেশ কর্‌ছে। এ যার হয়, তার জীবনের চারিদিকে কত স্মৃতি বর্ত্তমান! যা করা হয়েছে কেবল তা নয়, যা করা হয় নাই সেগুলিও দেখা যায়। পুণ্যাত্মা যতই ভগবানের তীব্র আলোকের কাছে যায়, ততই যা করা হয় নাই, যা করা হয়েছে, এই দু রকম পাপের বিন্দুগুলি ক্রমে বৃহৎ আকার ধারণ করে; সেই ভাবে পাপ পুণ্য মনে হ'য়ে মানুষ আতঙ্কিত হয়; হওয়া উচিত—স্থূল অঙ্গের পাপ মানুষের মধ্যে অনেক আছে। আমরা যে পাপী, এ কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য, অতি সত্য। কত কর্‌বার কথা ছিল, করি নাই! একটী কথা ধর—ভক্তের চক্ষে ভগবানকে বিস্মৃত হওয়া মহাপাপ। এ পাপ আমিও করেছি, তুমিও করেছ, বিস্মৃতির মধ্যে তাঁকে ডুবিয়ে রেখেছি। যিশু বলেছিলেন "ক্ষুধিত তৃষিত হ'য়ে তোমার দ্বারে আমি গিয়াছিলাম, তুমি ত আমাকে কিছু দাওনি।" তোমরা ভাববে বেশ একটা সাজান রূপক কথা হ'ল! তা ত নয়। এ রূপক নয়, কল্পনা নয়, এ একেবারে খাঁটি সত্য। ঘটে ঘটে ভগবান বর্ত্তমান। কত ভগবান তোমার দ্বারে এসে ভিক্ষাপাত্র পেতেছে, তুমি ভগবানকে প্রত্যাখ্যান করেছ! শুধু ভিক্ষা দেওয়া কি? তাদের কত নির্য্যাতন করেছ! তুমিই করেছ। বল্‌বে আমি কেমন ক'রে কর্‌লাম? হাঁ, তুমিই করেছ। কিরূপে? সমাজ যদি করে, সে সমাজে যেটুকু সুখের সেটুকু যদি গ্রহণ কর, সে সমাজে যেটুকু পাপ তাও গ্রহণ কর্‌তে হবে—তুমি তার অংশী। যুবক ভাই, তোমাদের এই দেশে কত অবলা পু'ড়ে মরে! রামমোহন রায় সতীদাহ নিবারণ করিয়াছিলেন। কয়টা সতী হ'ত? কিন্তু জীবনের সুখ দুঃখ বোধ হবার পূর্ব্বেই কত অল্পবয়স্কা বালিকা নিজ হাতে নিজ দেহ অগ্নিতে অর্পণ করে, পু'ড়ে মরে! এ পাপ কার? পণপ্রথার জন্য এটা হয়। যদি পণ নিয়ে থাক, তোমার তাতে অংশ আছে। এই পু'ড়ে মরার তুমি অংশী। বল্‌বে আমি কি কর্‌ব? বন্ধ কর নাই ত কোন দিন, অটল হ'য়ে দাঁড়াও নি, বাধা দেও নি। পাপকে বাধা যে দেয় না, যে পাপীর পাপের একম্‌প্লিস, (সহায়কারী) সে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হবে; যে পাপ করে তার যেমন দণ্ড হয়, যে তার সঙ্গী, পাপে যে বাধা দেয় না, তারও তেমন দণ্ড হয়। সমাজে কত অকর্ত্তব্য হচ্ছে, কর্ত্তব্যহীনতা আছে।

ব্রাহ্মসমাজে এই দু'টী দিক দেখি,—আর কিছু না পারুন, চিরদিন ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেছে এবং যথাসাধ্য কিছু কর্‌তে চেষ্টা করেছে। দু'টী দিক। প্রথমতঃ সমাজে নিপীড়িত আমাদের দুই শ্রেণী আছে—(১) মা বোন, (২) যারা সমাজকে খাওয়ায়, কৃষক শ্রেণী। এর জন্য করণীয় যা তা যদি না করি, সেটা কি পাপ ব'লে মনে কর্‌ব না? তোমরা তাদের কিছু অন্যায় কর নি, এই ভেবে নিশ্চিন্ত থাক্‌বে? করণীয় যা তা কর্‌লে না, এটা কি ভগবানের খাতায় পাপ ব'লে লেখা পড়্‌বে না? দেশময় কি করুণ কাহিনী শুনছ? দুর্ব্বৃত্তেরা কি পৈশাচিক ভাবে স্ত্রীজাতিকে প্রধর্ষিত কর্‌ছে! যুবক, ব্রহ্মোপাসনা যদি কর, ব্রহ্মাগ্নি যদি তোমার মধ্যে থাকে, তবে নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পার না, তোমার প্রাণে ব্যথা লাগ্‌বে। ঐ অশীতিপর বৃদ্ধ দৃষ্টিহীন কৃষ্ণকুমারের উপর সে ভার ন্যস্ত ক'রে তোমরা উদাসীন থাক্‌বে? এ কি তোমাদের পাপ নয়? এ কর্ত্তব্যভার আজ কে নেবে? পাপকে নিবারণ কর্‌বার জন্য ভগবান হস্তে শক্তি দিলেন কেন? স্বার্থপর হ'য়ে সেই শক্তির ব্যবহার ক'রে সুখের অন্ন আন্‌বে, আর কি কর্‌বে খুঁজে পাও না, তাই কোন রকম ক'রে ব্যায়াম চর্চ্চা ক'রে শক্তির তৃপ্তি সাধন কর! ব্যায়ামের সঙ্গে জগতের দুঃখনিবারণ কর্‌বার যে পন্থা রয়েছে, সে দিকে যাবে না? পাপের জন্য তোমার প্রার্থনা যদি সরল হয়, তবে ভাই, দেশময় যে পাপ তার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হ'তে হবে। তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত যদি কর্‌তে চাও, পাপের শাস্তি যদি চাও, প্রতিজ্ঞা কর পাপ কর্‌বে না। আর বল্‌তে হবে, পাপীর সেবা ক'রে আমি তাকে পাপপথ হ'তে উদ্ধার কর্‌ব।

সকল পাপের মূল নির্ম্মল বুদ্ধির অভাব। আজ তোমরা কত লোক এই ব্রহ্মোপাসনায় এসেছ, ব্রহ্মের কথা শুনছ। কত জন আসে নি! তাদের তুলনায় তোমরা কয়জন? সাগরে বিন্দু, এইত! কেন আসে নি? তাদের দ্বারে ভগবানের নাম পৌঁছায় নি। ভগবান কেমন তাদের সে কথা কেহ শোনায় নি। ভগবান না হইলে কি হয়, কেহ তাদের সে কথা বলেনি। শিক্ষার দায়িত্ব তোমার আছে। তোমরা স্থূল ভাবে দেখ, যেখানে ঈশ্বরের সঙ্গে তোমার ব্যাপক সম্বন্ধ সেটা বুঝ্‌লে না। আজকাল বুঝ্‌তে আরম্ভ করেছ। ভোটার প্রস্তুত কর্‌তে হবে! চুলোয় যাউক ভোটার। ভগবানের পুত্র কন্যাকে ভগবানের রাজ্যে আন্‌বার যে ব্যবস্থা, দেশের সংক্রামক নানাবিধ পাপের বীজ নির্ম্মূল কর্‌বার যে ব্যবস্থা, তা কোন কাজের হ'ল না—ভোটার, ভোটার। চুলোয় যাউক, চাই না ভোটার। কি চাই? আজ ভাই, সুশিক্ষার বিস্তার কর। ব্রাহ্মসমাজের যুবক, ঐ নিম্নশ্রেণী কৃষকজাতিমধ্যে শিক্ষা বিস্তারের ভার কা'কে দিয়েছ? এক কাণাকে দিয়েছ নারীরক্ষার ভার, আর এক কাণার উপর দিয়েছ নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষাবিস্তারের ভার। ধন্য তাঁরা, রক্তবিন্দু দিয়ে যা' কর্‌বার ক'রে যাচ্ছেন। তোমার পাপের মার্জ্জনা কি জন্য চাও? আজ যে কথায় কথায় হিন্দুমুসলমানে রক্তারক্তি হয়, কিসে থাম্‌বে? রাজবিধানে থাম্‌বে, না, কাউন্সিলে থাম্‌বে? যতদিন পর্য্যন্ত শিক্ষার দ্বারা মানুষকে সহিষ্ণু ক'রে আন্‌তে না পার, যতদিন পর্য্যন্ত সামান্য স্বার্থের জন্য ভাই এর রক্তপাত থামাতে না পার, ততদিন কি থাম্‌বে? জগতের আদিতে কেইন ও এবেল দুই ভাই ছিল, মাৎসর্য্য বশতঃ কেইন এবেলকে হত্যা করে। ভগবান যখন জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—where is Abel? কেইন উত্তর করিল, I do not know. Am I my brother's keeper? আজও একথা চল্‌ছে। তুমি তোমার ভাই এর "কিপার" নও, রক্ষক নও? ভগবানের রাজ্য অস্বীকার কর তাহা হইলে! তুমি তোমার ভাই এর রক্ষক। কেইনের সেই উক্তি ভগবান গ্রহণ করেন নাই। আজ বাতাসে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে—I am my brother's keeper. Am I my brother's keeper? Yes, you are your brother's keeper. চুরি চামারি হচ্ছে,—এ কণ্টক উদ্ধৃত হবে কবে? বস্তি যদি উৎসন্ন কর, আবার বস্তি হবে, গুণ্ডা যদি বহিষ্কৃত কর, গুণ্ডা আবার হবে। মূল এখানে নয়। মূল না ধ'রে শাখা প্রশাখা কাট্‌লে কি হবে? শিক্ষার বিস্তার কৈ? তুমি তার কোন উপায়ই অবলম্বন কর নাই। তবে তোমার পাপের ক্ষমা প্রার্থনা কর কিসে? সত্য প্রার্থনা যদি কর্‌তে চাও, তবে লেগে যাও। যেমন প্রার্থনা তেমনি পাপের প্রায়শ্চিত্ত। প্রায়শ্চিত্ত প্রতিভূদ্বারা করাতে হয়! বাপ মার প্রায়শ্চিত্ত সন্তান ক'রে থাকে; সমাজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত, সমাজে যারা পাপ করে নাই, তাদের কর্‌তে হবে। যিশু জগতের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন—তাঁর নিজের জীবনের কৃত পাপ নয়। যিশুর মত পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে হবে—হবে, হবে,—মিলিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত। সমাজের যে দুর্নীতি তা নিবারণের জন্য তুমি তোমার হস্ত উত্তোলন কর্‌ছ না, বজ্রগম্ভীর স্বরে সেই দুর্নীতিকে প্রত্যাখ্যান কর্‌ছ না, সকল শক্তি দিয়ে তার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হচ্ছ না! জেনে নেও সে প্রত্যবায়ের ভাগী তুমি। হাঁ, ভগবানের কাছে যেদিন যাবে, শু'নে আস্‌তে হবে "যাও যাও—Go, get thee down. মূসা নেবে এসেছেন, দেবেন্দ্রনাথ নেবে এসেছেন। তোমরা কোন্ ছার। Go, get thee down. ভগবানের অত্যাচরিত সন্তান সন্ততির পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর। "আমি যে ক্ষুধিত হ'য়ে তোমার দ্বারে উপস্থিত হয়েছি, তোমরা কিছু দেও নি।" ভগবান বল্‌ছেন "আমি গ্রামে গ্রামে অত্যাচরিত হয়েছি, এখনও হচ্ছি। কি কর্‌ছ? তুমি আমার সামান্য শিক্ষার জন্য কি কর্‌ছ? আমি নিরক্ষর রয়েছি।" ভগবানের নামে জগতে কি প্রচার হচ্ছে? ছাপার বইয়ের সাহায্যে একটু পড়্‌লাম, এই উপায় সব নয়। এই যে লোক অপরাধের মধ্যে ব'য়ে গেল—না জানার অপরাধ—তুমি তার অংশী। দেশের অজ্ঞতার তুমি অংশী। তাই আজ ভগবানের কাছে যে প্রার্থনা যাবে। দুইটী বড় বেদনার কথা বল্‌ছি—শোক আর পাপ—এই দুই আগুন। শোকের আগুন আর পাপের আগুন যদি নিজের অন্তরে নিরস্ত কর্‌তে চাও,' তবে এখনি ছোট চারিদিকে, স্ফুলিঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়—তোমার ঘরে আগুন লাগে নাই ব'লে নিশ্চিন্ত থেক না। দেশ আগুনে পুড়ে গেল,—স্ফুলিঙ্গ থেকে স্ফুলিঙ্গ, এক ঘর থেকে আর এক ঘর—অপবিত্রতায় দেশ ডুবে গেল। ধর্ম্ম কি নিন্দা করে? ধর্ম্ম কি কাকে অশ্রদ্ধা করে? তাহাই দেশময় হ'য়ে গেল! নিবারণ কর, নিবারণ কর। যদি প্রত্যবায় হ'তে রক্ষা পেতে চাও, যদি পাপের পরিত্রাণ চাও, যদি ঈশ্বরের প্রসন্নতা চাও, যদি জীবনে শান্তি অনুভব কর্‌তে চাও, সেই শিবস্বরূপকে জান, যার সম্বন্ধে প্রাচীন বর্ণনায় আছে

বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং জ্ঞাত্বা শিবং শান্তি মত্যন্ত মেতি।

যত কিছু উপনিষদের শ্লোক এই এক জানার কথা বলেছে, কেবল জানার উপর জোর দিয়েছে। তোমরা গোটা মানুষ, তোমরা শুধু জান না, শুধু তোমাদের জ্ঞান নাই; তোমরা হৃদয়বান্ মানুষ, ইচ্ছাশীল মানুষ, সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিবার শক্তি তোমাদের আছে। সমবেদনা ও কর্ম্মশক্তি নিয়া তোমরা চল; নবীন ব্রাহ্মধর্ম্ম বল্‌ছে গোটা হৃদয় নিয়ে, উৎসাহ নিয়ে, জ্ঞান নিয়ে চল। ইউরোপের কথা শুনছ, তারা আবার আর এক দিকে দাস হয়েছে। তারা কর্ম্মকে বড় ক'রে ধরেছে, ভগবানের ধ্যান ধারণাকে তারা তত আবশ্যক মনে করে না। ভারতবর্ষকে তোমরা পুণ্যক্ষেত্র বল—এ বড়াইয়ের কথা নয়, স্পর্দ্ধার কথা নয়, বাস্তবিক পুণ্যক্ষেত্র। এই অর্থে পুণ্যক্ষেত্র—এই ভারতে নব প্রেমের ধর্ম্ম, নব জ্ঞানের ধর্ম্ম, মিলনের ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যোগবাশিষ্ট বলেছে

উভাভ্যামেব পক্ষাভ্যাং যথা খে পক্ষিণাং গতিঃ
তথৈব জ্ঞানকর্ম্মাভ্যাং জায়তে পরমং পদং॥

যেমন আকাশে দু' খানি পাখা দিয়ে পাখী গন্তব্য দেশে যায়, তেমনি তোমরা জ্ঞান এবং কর্ম্ম এই উভয় পক্ষের সাহায্যে ব্রহ্মপদে উপনীত হবে। কর্ম্মের প্রাচীন অর্থের প্রয়োজন নাই, যাগ যজ্ঞ এই অর্থের প্রয়োজন নাই। কর্ম্ম মানে হৃদয় আর

ইচ্ছাশক্তির সমবায়ে যা উৎপন্ন হয় তা-ই। ব্রহ্মকৃপায় হৃদয়বান লোক ভগবানের প্রকৃষ্ট আলোক নিয়ে যা দেখ্‌তে পায়, সেই তার কর্ম্ম। ঐ রকম রচিত অর্থহীন প্রাচীন কর্ম্মের কি প্রয়োজন? সম্মুখে বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র। তাই বলি ভাই, পাপের মুক্তি নাও, ভগবানের হাত থেকে নাও। পাপকে ঘৃণা কর মানে এই নয় একটা মানুষকে ঘৃণা কর। পাপকে যদি ঘৃণা করতে হয়, তার অঙ্কুর উৎপাটিত কর—যেমন নিজের চিত্ত থেকে, তেমনি সমাজ-দেহ থেকে, তাকে সমূলে উৎপাটিত কর। তবে প্রার্থনার জবাব আস্‌বে। আকাশ পথে সংস্কার রাজ্যে পাপের নির্ব্বাণ চাইবে, ভগবান দেখা দিবেন। যাও গ্রামে যাও,যত রকম দুর্নীতি দূর কর, পাপের আগুন তাতে নির্ব্বাপিত হবে।

আজ এই দিনে, ব্রাহ্মধর্ম্ম,—যার কথা বল্‌ছি, বাস্তবিক এমন ধর্ম্ম তোমাদের আমাদের কয়জনের ধর্ম্ম ব'লে গৌরবের কথা বলছি না—কোন্ ধর্ম্মে দেখ্‌তে পারি যেখানে মুসলমান খৃষ্টান বৌদ্ধ হিন্দু সব এক সঙ্গে মিলিত হয়েছে, যেমন আমি আজকের উদ্বোধনে এক একজন সাধকের কথা বলেছি—সক্রেটিশের পাশে জনক, জনকের পাশে ডেভিড্ এর চিত্র দেখিয়েছি—এ চিত্র ভারতে এনেছে, এই আশা ভারতবাসীর বুকে বীজের মত অঙ্কুরিত করছে। রামমোহন এই নবীন ব্রাহ্মধর্ম্ম, যাতে জ্ঞান ও কর্ম্মের সমাবেশ হয়েছে, উচ্চকণ্ঠে প্রচার করেছেন,—নব জগতে নব ভাবের, এই সাম্য মন্ত্রের, উদ্বোধন হইয়াছে। নব মন্ত্র, নব বল নিয়ে যাও। উৎসবকে জীবনে সফল ক'রে তোল। নব জীবন দেখ্‌তে চাও, মন্দির থেকে ফিরে যাও, যেমন একদিক ভগবানের চরণে বস্‌বে তেম্‌নি অন্য দিকে দেশের সকল দুষ্কৃতির বিরুদ্ধে, সকল অভাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কর। সংখ্যায় অল্প ব'লে ভয় করো না—সেনাপতি বিশ্বপতি রণে সহায় হবেন। পাপের সঙ্গে সংগ্রাম যদি একজন লোকও কর, ভয় নাই, ভয় নাই; যিনি সর্ব্বভয়হর তিনি তোমার দিকে তাঁর সস্নেহ সফল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন। যুদ্ধে তোমরা প্রবৃত্ত হও। উপাসনা সার্থক হউক, জগতে ব্রহ্মের জয়ধ্বনি উত্থিত হউক।

হে করুণাময় পিতা, স্বার্থপর হ'য়ে জগতে অনেকে বিচরণ করিয়া থাকি। তোমার রাজ্যে স্বার্থপর হ'য়ে আস্‌বার পথ রুদ্ধ কর। প্রার্থনা যখন করি প্রভো, পাপের যখন উদ্ধার প্রার্থনা করি, ভাই বোন মিল্‌বার প্রার্থনা যখন করি, সে সময় তুমি যেন হৃদয় মাঝে উদিত হ'য়ে আমাদিগকে আশান্বিত কর। কাপুরুষ করো না। দেশবিস্তৃত পাপের সঙ্গে কি ক'রে একলা লড়্‌ব প্রভো! একলা ব'লে ভাব্‌তে দিও না। তুমি আছ, পাপীর উদ্ধার তোমার কাজ। প্রভু, তোমার হাতের কাজ একটু নিতে শিখাও। কি ক'রে তোমার পুত্র হব, তুমি যদি কাছে না থাক? পিতা কি এমনি ক'রে পুত্রের পরীক্ষা করে? কৃপা যদি কর প্রভো, হৃদয়ে প্রেম দাও, হস্তে তোমার কাজ তু'লে নিবার বাসনা দিয়ে ধন্য কর। এ জীবনে তোমার নাম, এই অত্যাচরিত অধঃপতিত দেশে, সর্ব্বত্র বিঘোষিত হউক। তুমি পুণ্যময়, তুমি অত্যাচরিতের সহায়, তুমি দুর্ব্বলের বল, দেশময় তোমার নাম, অনাথের নাথ নাম, সর্ব্বত্র ঘোষিত হউক। এই তোমার নিকটে প্রার্থনা। ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

অনন্তর অনেকক্ষণ সংকীর্ত্তন চলিতে থাকে। অবশেষে প্রাতঃকালের এই মহা পূজা শেষ হয়। কিন্তু তখনও কেহ কেহ মন্দিরে থাকিয়া ব্যক্তিগত প্রার্থনা ও ধ্যানাদিতে নিযুক্ত থাকেন। মন্দির কখনও একেবারে লোকশূন্য হয় না। একদিকে প্রাঙ্গণে বহুলোক প্রীতিভোজনের আনন্দ-কোলাহলে মত্ত হন, অন্যদিকে কেহ কেহ মন্দিরে আপনার নির্জ্জনতার মধ্যে ডুবিতে সচেষ্ট হন। ১ ঘটিকার সময় পুনরায় উপাসনা হয়। তাহাতে শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

আজ আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দিন। ব্রাহ্মসমাজের ও মাঘোৎসবের প্রসাদে আমরা জীবনে প্রেমময়ের যে অপার প্রেম প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দিন। মানুষের পক্ষে কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ স্বাভাবিক, একটি অবশ্যপালনীয় কর্ত্তব্যও। মানুষের কেন, পশুপক্ষীর পক্ষেও কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ স্বাভাবিক। তাহার কত দৃষ্টান্ত আমরা সর্ব্বদা চারিদিকে দেখিতে পাইতেছি! এই জন্য কৃতঘ্ন বা অকৃতজ্ঞ মানুষকে পশুরও অধম বলা হইয়া থাকে। বাস্তবিক অকৃতজ্ঞতা ও কৃতঘ্নতা অতি ঘৃণিত অপরাধ বলিয়াই বিবেচিত হয়। এই দিনে, বিশেষতঃ এই পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে, আমরা জীবনে যে অমূল্য সম্পদ্ লাভ করিয়াছি, প্রেমময় পিতার যে অপার প্রেম ও করুণার লীলা দেখিয়াছি, সম্ভোগ করিয়াছি, তাহার জন্য যদি আজ আমরা সম্যক্ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে সমর্থ না হই, তবে কি আমরা নিশ্চয়ই গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইব না? তাই দেখিতে হইবে, আমাদের অন্তর আজ কৃতজ্ঞতাভরে করুণাময় পিতার নিকট অবনত হইতেছে কি না। মুখে দুই চারিটা কৃতজ্ঞতার কথা বলিলেই সত্য কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ হয় না। উহা একটা বাহ্যিক ব্যাপার নহে; যদিও বাহিরেও উহা নিঃসন্দেহ-রূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। হৃদয়ে সত্য অনুভূতি না থাকিলেও বাহিরে অনেক কৃতজ্ঞতার কথা বলা যায়। কিন্তু তাহার যে কোন মূল্য নাই, উক্ত মিথ্যাচার যে একটা অপরাধই, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। অপর দিকে অন্তরের অন্তরে সত্যভাবে অনুভূত হইলে উহা কখনও যে লুকায়িত থাকিতে পারে না, বাহিরে প্রকাশ পাইবেই পাইবে—সে প্রকাশ বাক্যে হইতেও পারে, নাও হইতে পারে, কিন্তু মুখে চোখে, আচারে ব্যবহারে, আকারে ইঙ্গিতে, প্রকাশিত না হইয়া পারিবে না। হৃদয় ভাবে পূর্ণ হইলে, তাহা উদ্বেলিত হইয়া উঠিবেই উঠিবে, জীবনে মূর্ত্ত হইবেই হইবে, আমাদের জীবনকে উন্নত ও মহৎ করিয়া তুলিবেই তুলিবে। পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থিত তাপ যখন প্রবল হইয়া উঠে, তখন উহা উপরের স্তরকে উর্দ্ধে উত্থিত করিবেই, ধরণীপৃষ্ঠ পর্ব্বত আকারে অনন্ত আকাশে মস্তক উত্তোলন না করিয়া পারিবে না। আবার সময় সময় পর্ব্বতদেহ বিদীর্ণ হইয়া অগ্ন্যুদ্গীরণও হইয়া থাকে; কিন্তু তাহা না হইলেও উহার উন্নত মস্তক সততই মেঘ ও তুষাররাশি ভেদ করিয়া চির আলোকের রাজ্যে বিরাজ করিবে, নির্ম্মল সূর্য্যকিরণ উহার শিখরদেশকে নিত্য উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত করিবেই। আর পর্ব্বত যে শুধু আপনিই উত্থিত হয় তাহাও নহে, পার্শ্ববর্ত্তী দেশকেও সঙ্গে

সঙ্গে টানিয়া উঠায়, একটা কম্পনও উৎপন্ন করে। ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। ইহার কোনও ব্যতিক্রম কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। অধ্যাত্মরাজ্যেও ইহার অনুরূপ নিয়মই কার্য্য করিতেছে। প্রেম ও কৃতজ্ঞতায় হৃদয় পূর্ণ হইলে,তাহা উচ্ছ্বসিত হইয়া কৃতজ্ঞতার পাত্রের দিকে ধাবিত হইবেই হইবে, আকাঙ্ক্ষা অভিলাষকে উন্নত করিবেই, উৎসাহাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবেই,জীবনে আনুগত্য আনিয়া দিবেই। করুণাময় পিতার যত করুণা আমরা জীবনে পাইয়াছি,তাহা স্মরণ করিয়া যদি আমাদের হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হয়, তবে কি তাহা উচ্ছ্বসিত হইয়া আমাদের জীবনকে উন্নত ও মহৎ করিয়া তুলিবে না? হৃদয়ের সকল আকাঙ্ক্ষা অভিলাষকে প্রেমময় জীবনদেবতার দিকে প্রধাবিত করিবে না? তাঁহার অনুগত জীবন যাপনের বল ও শক্তি আনিয়া দিবে না? অনুতাপানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া ক্ষুদ্র বাসনাকে দগ্ধ করিবে না? সেরূপ হইলে কি পাপ ও মলিনতার মধ্যে নিম্নভূমে অলস দুর্ব্বলভাবে পড়িয়া থাকা আর সম্ভবপর হইবে? শুদ্ধ স্বপ্নের না হইয়া কি থাকা যাবে? তাহা কোনও ক্রমেই সম্ভবপর হইবে না। ভাবই সকল কার্য্যের চালক, শক্তির জনক। সত্য কৃতজ্ঞতার ভাব হৃদয়ে জাগিলে, প্রেমের জন্ম হইবেই; উহা প্রেমাস্পদের সঙ্গ লাভের জন্য, তাঁহার অনুগত হইবার জন্য জীবনকে ঊর্দ্ধদিকে প্রবল বেগে টানিয়া তুলিবেই, একটা বল ও শক্তি আনিয়া দিবেই। কিছুতেই সে গতি ও শক্তিকে রোধ করিতে পারে না। নিম্ন ভূমির সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, সকল অন্ধকার ও মেঘরাশি ভেদ করিয়া, জীবন অনন্ত আলোকের দেশে, প্রেম-রবির চির প্রকাশের রাজ্যে, শুদ্ধমপাপবিদ্ধমের অসীম পুণ্যের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের মধ্যে, উন্নীত হইবেই হইবে! এবং তখন প্রেম-রবির, পুণ্য-সূর্য্যের শান্ত উজ্জ্বল নিত্য প্রকাশে উদ্ভাসিত উন্নত গৌরবমণ্ডিত মস্তকে চিরশান্তি বিরাজ করিবেই করিবে। নিম্নভূমির কিছুই সে ঊর্দ্ধদেশে উঠিতে পারিবে না, সে গৌরবকে ম্লান করিতে পারিবে না, সে শান্তিকে বিনষ্ট করিতে পারিবে না। ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম, কোথাও ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না। সকল দেশের সকল কালের ধর্ম্মজীবনের ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। বর্ত্তমান কালে আমাদের এই ব্রাহ্মসমাজের মধ্যেও যে এরূপ জীবনের আভাস আমরা দেখিতে পাই নাই, এরূপ কথা বলিতে পারি না; বরং যাহা দেখিয়াছি তাহাতে এ কথার সত্যতাই প্রমাণিত হইতেছে। এরূপ জীবন যে শুধু আপনিই উন্নত হয়,নিজে চিরশান্তি লাভ করে, তাহা নহে। উহার প্রভাব চারিদিকে অপরের মধ্যেও প্রসারিত হয়, তাহা অপরকেও, চতুষ্পার্শ্বস্থ সকলকেও, কিছু না কিছু উন্নত করেই। তাহার প্রমাণও আমরা ব্রাহ্ম সমাজের ইতিহাসের মধ্যে যথেষ্ট প্রাপ্ত হই। এক একটা ব্রাহ্মজীবন জ্বলন্ত অগ্নিখণ্ডের ন্যায় কার্য্য করিয়াছে। ব্রাহ্ম জীবনের প্রভাবে কত পাপ কুসংস্কার ভস্মীভূত হইয়াছে, চারিদিকের সমাজ বিশুদ্ধ ও উন্নত হইয়াছে, তাহার প্রমাণের অভাব নাই।

আগ্নেয়গিরি হইতে অগ্ন্যুৎপাতও হয় এবং তাহাতে চারিদিক ভস্মীভূতও হইয়া যায়; কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায় উহা শুধু ধ্বংস করিয়াই ক্ষান্ত হয় না, উহার ফলে সেই ভস্মাচ্ছাদিত দেশ উর্ব্বরও হইয়া উঠে, নূতন তৃণ শস্যে অধিকতর সুশোভিতও হইয়া থাকে। প্রকৃত ধর্ম্মের কার্য্যও ইহারই অনুরূপ। বিশুদ্ধ ধর্ম্ম এক দিকে অনেক পাপ-মলিনতা কুসংস্কারকে বিনষ্ট করে, দুর্নীতি কদাচারকে ভস্মীভূত করিয়া দেয়, মিথ্যার অট্টালিকাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলে; অপর দিকে তাহার স্থলে প্রেম পুণ্যে, বিশুদ্ধ জ্ঞানে বিজ্ঞানে, সন্নীতি সদাচারে, সকল সুন্দর ও সুশোভন করে, সত্য ও ন্যায়ের উন্নত অট্টালিকা গড়িয়া তোলে। ব্রাহ্মজীবন ও ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা, যত অল্প পরিমাণেই হউক, ব্রাহ্মধর্ম্মের এই কার্য্যও প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং এই সকল লক্ষণ দ্বারা বিচার করিলেই আমরা নিঃসন্দিগ্ধরূপে বুঝিতে পারিব আমাদের হৃদয়ে সত্য কৃতজ্ঞতা কতটা জাগিয়াছে, আমরা অদ্যকার দিনের গুরুত্ব কতটা অনুভব করিতে পারিয়াছি। মৌখিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অধিক মূল্য নাই! জীবনদ্বারাই প্রকৃত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে হইবে—জীবনে কৃতজ্ঞতা মূর্ত্ত না হইয়া উঠিলে উহার অস্তিত্বের বিশেষ কোনও প্রমাণ নাই। আমাদের প্রত্যেককে করুণাময়ের অপার করুণার জীবন্ত নিদর্শনরূপে কৃতজ্ঞতার এক একটি উন্নতশির স্তম্ভ বা পর্ব্বতশিখর স্বরূপ গড়িয়া উঠিতে হইবে। আমরা আজ নিজ নিজ জীবন পরীক্ষা করিয়া দেখি, আমরা করুণাময় পিতার যে অশেষ করুণা পাইয়াছি, পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রসাদে, ইহার আশ্রয়ে আসিয়া, যে অমূল্য সম্পদ্ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার জন্য কি সম্যক্ কৃতজ্ঞতা হৃদয়ে অনুভব করিতেছি,? আজ কি আমাদের হৃদয় কৃতজ্ঞতাভরে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে? প্রাণ কি প্রবল বেগে সেই প্রেমরবি, শান্তি-সূর্য্যের পানে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতেছে? সকল আকাঙ্ক্ষা অভিলাষ, আগ্রহ প্রার্থনা কি উন্নত ও মহৎ হইয়া উঠিতেছে? পুণ্যের অনল প্রজ্জ্বলিত হইয়া আমাদের পাপ তাপকে কি ভস্মীভূত করিয়া ফেলিতেছে? আশা উৎসাহের আগুন এক হৃদয় হইতে অপর হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়া সকলকে কি উত্তপ্ত করিয়া তুলিতেছে? যে পরিমাণে আমরা জীবনে ইহা দেখিতে পারিব, সেই পরিমাণেই আমাদের উৎসব সফল হইয়াছে, আমরা সত্য উৎসব করিতেছি, বুঝিতে হইবে। আর তাহা যদি অল্প পরিমাণেও না হয়, আমরা যদি নিজেরা একটুও উঠিতে না পারি এবং অপরকেও কিছু পরিমাণে উঠাইতে সমর্থ না হই, আমাদের জীবনের প্রভাব যদি এ দেশের পাপ কুসংস্কার দুঃখ দুর্গতি বিন্দুমাত্রও দূর করিয়া ইহাকে প্রেম পুণ্য সত্যের পথে কিছুটাও অগ্রসর হইতে সহায়তা না করিতে পারে, তবে বুঝিতে হইবে সকলই ব্যর্থ—আমাদের সকল আয়োজন, সকল বাহিরের উচ্ছ্বাস, মিথ্যা। জীবনের পরিবর্ত্তন ও আনুগত্যের দ্বারাই ভাবের গভীরতা ও সত্যতা নির্ণীত হইবে। যেখানে আনুগত্য ও পরিবর্ত্তন নাই, সেখানে সত্য ভাব নাই, ভাবের অভিনয় আছে, ভাবুকতা আছে। তাই আমরা যেন একটা সাময়িক মিথ্যা উচ্ছ্বাসের দ্বারা আত্ম-প্রতারিত না হই। আমরা যাহাতে সম্পূর্ণরূপে জীবন-দেবতার অনুগত হইয়া চলিতে পারি, তাঁহাকে জীবনের কর্ত্তা ও প্রভু করিয়া, তাহার অসীম প্রেমের হাতে আপনাদিগকে সম্পূর্ণরূপে অর্পণ করিতে পারি, তাহাই আমাদিগকে করিতে হইবে।

আমাদের সকল আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা যেন একমাত্র তাঁহার দিকেই ধাবিত হয়, তাঁহারই পানে উত্থিত হয়, তাঁহার পবিত্র ধর্ম্ম যেন আমাদের জীবনে মূর্ত্ত হইয়া উঠে। তাঁহার পবিত্র ইচ্ছাই আমাদের সকল জীবনে, আমাদের প্রিয় ব্রাহ্মসমাজে ও জগতে সর্ব্বত্র জয়যুক্ত হউক। তাঁহার পুণ্যরাজ্য সর্ব্বোপরি প্রতিষ্ঠিত হউক।

ইহার পর ৪ ঘটিকা পর্য্যন্ত পাঠ ও ব্যাখ্যা চলিতে থাকে। শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর রায়, ভাই সীতারাম ও শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু এই কার্য্য সম্পন্ন করেন। ৪ ঘটিকার সময় ইংরাজীতে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্মানুবাদ আমরা পরে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। অনন্তর সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তন চলিতে থাকে। পুনরায় যথা সময়ে সায়ংকালীন উপাসনা আরম্ভ হয়। তাহাতে শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। তিনি বেদী গ্রহণ করিয়া নিম্নলিখিত রূপে উদ্বোধন করেন:—

জগৎপতির প্রকাশপ্রার্থী হ'য়ে আমরা এখানে এসেছি। তিনি আমাদের মধ্যে প্রকাশিত হউন, আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন। কেবল তা-ই নয়—আমাদের প্রতিদিনের প্রার্থনা এই হওয়া উচিত, তিনি সর্ব্বত্র প্রকাশিত হউন, জগতের সকল দেশে, সকল গৃহে, তাঁর সন্তান যিনি যেখানে আছেন, পাপ তাপ রোগে শোকে ভগ্ন সকল হৃদয়ে, তিনি প্রকাশিত হউন। যদি কেবল আমাদের অন্তরে তাঁর প্রকাশ ভিক্ষা করি, সে প্রার্থনার বড় মূল্য নাই—হয়ত আমাদের কিছু কল্যাণ হ'তে পারে, কিন্তু বড় বেশী কল্যাণ হয় না। প্রাণ হ'তে দিবানিশি ভগবৎচরণে এই প্রার্থনা উঠা উচিত—সেই অখিলতারণ, জগত্তারণ, জগদাশ্রয়, জগৎপতি, জগৎগুরু, জগৎপিতা সর্ব্বত্র প্রকাশিত হউন। প্রতিদিনের এই প্রার্থনা হওয়া উচিত; কেবল আপনার শান্তির জন্য যদি প্রার্থনা করি, সে প্রার্থনার মূল্য নাই। জগতের বেদনা আপনার ক'রে নিতে হবে। নিয়ত এই প্রার্থনা করতে হবে— সর্ব্বত্র তাঁর মুখজ্যোতিতে জগতের আঁধার দূর হউক, সকলের প্রাণের আঁধার দূর হউক, পাপ-অন্ধকার জগৎ হ'তে দূর হউক, তাপ মৃত্যুভয় দূর হউক, সকল পাপতাপদগ্ধ হৃদয় নব জীবন লাভ করুক—তাঁর মুখ দর্শনে। আজ বিশেষ ভাবে একটী প্রার্থনা উঠ্‌ছে। যাদের নিয়ে উৎসব করেছি এই মন্দির নির্ম্মিত হওয়া অবধি, তার পূর্ব্বেও যাদের নিয়ে মাঘোৎসব করেছি, আজ তাঁহাদিগকে স্মরণ করিতেছি। আমাদের উপাসনার মূল্য নাই, যদি পরলোক দূরে রাখি এবং এই যদি আকাঙ্ক্ষা না হয়—ইহলোক পরলোক আমাদের নিকট এক হ'য়ে যাউক। প্রতিদিনের প্রার্থনায় এটা সাধন করতে হবে, বিশেষতঃ এই উৎসবদিনে। কারো নাম করব না। শ্রদ্ধেয় আচার্য্য মহাশয় প্রাতঃকালে অনেকের নাম করেছেন। জগতের যাঁরা সাধক ভক্ত, যাঁরা ধর্ম্মাচার্য্য, ধর্ম্মোপদেষ্টা এবং ব্রাহ্মসমাজের যাঁদের আমাদের অনেকের সঙ্গে হৃদয়ের যোগ আছে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর যাঁদের সঙ্গে এখানে দেখা হয়েছে, আজ তাঁরা অন্ত লোকে। এই ভাবে ভগবান আমাদের নিকট প্রকাশিত হউন, আমাদের ইহ পরলোক দুই না থেকে যেন এক হ'য়ে যায়, তাঁদের সান্নিধ্য যেন অনুভব করতে পারি। যাঁরা ভগবানেরই মঙ্গল বিধানে ইহলোক হইতে চলিয়া গিয়াছেন, যাঁদের প্রেমসিক্ত বদন দেখে কত সময় উৎসবে আমরা আরাম লাভ করেছি, যাঁদের সঙ্গলাভে আমরা বিমল ভগবৎপ্রীতির আস্বাদন পেয়েছি, তাঁরা আমাদের নিকট আসুন। নিকটে যাঁরা আছেন তাঁদের সান্নিধ্য ত প্রাণে অনুভব করিতেছিই। এই ভাবে তাঁর প্রকাশ আকাঙ্ক্ষা ক'রে তাঁর পূজায় প্রবৃত্ত হই। তিনি অসম্ভব সম্ভব করেন, তিনি মূককে বাচাল করেন, তিনি পঙ্গুদ্বারা গিরি লঙ্ঘন করান। আমরা যে শোকতপ্ত প্রাণে ধর্ম্মজীবনের কথা বলি, কোন্ সাহসে বলি? তাঁর নাম জপিতে জপিতে তাঁর কৃপা সকলের হৃদয়ে অবতীর্ণ হয়। আমাদের জীবনে কত সময় না দেখেছি—তাঁর প্রকাশে এক মুহূর্ত্তে কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন অন্তরে ঘটে, চির অনাথ গতিহীন হয় সনাথ, সেই প্রেমরসপরশে। আমরা জীবনে তাও অনেক সময় প্রত্যক্ষ করেছি। আজ তাঁর কৃপায় আবার তা-ই ঘটুক, আমাদের জীবনে নূতন অধ্যায় আরম্ভ হউক, তাঁর আবির্ভাবে। কেবল আমাদের প্রাণে নয়, জগতে নূতন যুগ আরম্ভ হউক, তাঁর আবির্ভাবে। সর্ব্বত্র নব প্রেমদীক্ষা, নব আনন্দ জগতে আরম্ভ হউক তাঁর প্রকাশে, এই আকাঙ্ক্ষা ও প্রার্থনা ক'রে তাঁর পূজায় প্রবৃত্ত হই। হে জগত্তারণ, জগদাশ্রয়, জগৎগুরু জগৎপতি, তোমার নাম আমাদের কণ্ঠে তুমি দিয়াছ। ঐ নাম আমাদের একমাত্র সম্বল। তুমিই এই দীন সন্তানদের একমাত্র সম্বল। তুমি সকল সন্তানের একমাত্র সম্বল। আমরা তোমার নাম ল'য়ে তোমার পূজায় প্রবৃত্ত হই। তুমি আমাদের সকলের প্রাণে আবির্ভূত হও, আমাদের ইহকাল পরকাল যেন এক হয়, ভেদাভেদ যেন না থাকে। স্নেহপ্রেমরসে আমাদের হৃদয় পূর্ণ হউক, সকল অপ্রেম দূর হউক, তোমার মুখজ্যোতিতে অন্তরের অন্ধকার দূর হ'য়ে যাউক—এই প্রার্থনা। তোমার কৃপা ভিক্ষা ক'রে আমরা তোমার পূজায় প্রবৃত্ত হই।

"তুমি সর্ব্বস্ব আমার, নাথ" ইত্যাদি সঙ্গীত গীত হইলে উপাসনা হয়। উপাসনান্তে তিনি যে উপদেশ প্রদান করেন তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল:—

"Now abideth faith, hope charity, these three but the greatest of these is charity.

বিশ্বাস, আশা, প্রেম এই তিনটীর মধ্যে প্রেম শ্রেষ্ঠ। প্রেম সকল সহ্য করে, সকল বিশ্বাস করে, সকল আশা করে, সকল মাথা পেতে নেয়। কিছু দিন পূর্ব্বে আমি একখানি পুস্তিকার বিজ্ঞাপন দেখ্‌লাম—The Passing and the Permanent in St. Paul. বড় আশা ক'রে, বইখানি আমার কলেজ লাইব্রেরীর জন্ত আনালাম। দুই একটা পাতা উল্টাইয়া

নিরাশ হইলাম—আমি যাহা মনে করিয়াছিলাম, সেণ্টপল সম্বন্ধে একটু আধটু যা চিন্তা করিতে অবসর পাই তার মধ্যে সার কথা যা, তার বড় বেশী আভাস পেলাম না। তার মধ্যে অনেক গ্রীক দর্শনের কথা—সে সব ব'লে কি হবে? সেণ্টপলের কথাগুলির মধ্যে যা অতি মূল্যবান—পূর্ব্বে কখন কখন বলেছি—তার অর্থ কে উদ্ধার না করবে, উপদেশবাক্য কে স্মরণ না করবে? তার মধ্যে একটী প্রধান কথা—প্রেম বড় বস্তু, এর তুল্য বস্তু আর নাই, প্রেম সকল সহ্য করে, সকল আশা করে, বিশ্বাস করে। গভীর আধ্যাত্মিক সত্যসকলের কোন প্রমাণ নাই—আমার উপর অনেকে বিরক্ত হবেন—কেবল আত্মার প্রেমের দ্বারা সেই সকল সত্যের উপলব্ধি হয়। তবে জগতের লোক আকৃষ্ট হয় কেন? প্রত্যেকের প্রাণে সেই সত্য নিহিত রহিয়াছে; যখন সাধক বা ধর্ম্মাচার্য্য সেই সকল সত্য প্রচার করেন, সকলের হৃদয়ের তার বেজে উঠে। যত বড় সত্যই হউক না, কোন প্রমাণ দ্বারা প্রচারিত হয় না। মানবের প্রাণে কতকগুলি অতি নিগূঢ় মহৎ সত্য নিহিত আছে, যার উপর তার মুক্তি নির্ভর করে, যার উপর তার শান্তি নির্ভর করে, যার উপর তার অনন্ত কালের কল্যাণ নির্ভর করে। কোন প্রমাণ তার নাই, একটী প্রমাণও নাই—কিছু কিছু আছে, সেগুলি নিয়ে বেশী দূর অগ্রসর হওয়া যায় না। জন ষ্টুয়ার্ট মিল পরমেশ্বরের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নাই, ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য "Three Essays on Religion" লিখ্‌তে আরম্ভ করলেন, শেষ করলেন এই ব'লে—বিশ্বের পশ্চাতে চিন্তাশীল পুরুষ রয়েছে, এ না ব'লে ক্ষান্ত হওয়া যায় না। শুনেছি বই যখন বেরুল, মর্লি বিরক্ত হলেন। মর্লি মিলের শিষ্য, তিনি আশা করেছিলেন অন্য ভাবে লিখিত হবে, আস্তিকতার দিকে একটা ঝোঁক দিবেন বুঝ্‌তে পারেন নাই। মিল বল্‌তে আরম্ভ করলেন—ব্রহ্মবাদিগণ যে মত প্রচার করেন তার কোন ভিত্তি নাই, শেষ কথা বল্লেন স্বীকার কর্‌তেই হয় ইণ্টেলিজেন্স (জ্ঞান) পশ্চাতে রয়েছে, নচেৎ বেশী দূর অগ্রসর হওয়া যায় না। সেই ইণ্টেলিজেন্স, আমার সঙ্গে আর সম্পর্ক, কোথাও তার প্রমাণ হয় না; তার সৌন্দর্য্যের কোন প্রমাণ এ পর্য্যন্ত কেহ দিতে পারে নাই। তিনি যে প্রেমস্বরূপ তার কোন প্রমাণ কেহ দিতে পারে না। রসনা তার প্রেম আস্বাদন করেছে, চক্ষু তার সৌন্দর্য্য আস্বাদন করেছে, আত্মার রসনা তার রস আস্বাদন করেছে,—এমনি ভাবে কথা বলেছে। আমার মধ্যে যে সত্য লুক্কায়িত রয়েছে, তাই আমার প্রাণের তারে বেজে উঠেছে।

The greatest of these is charity. প্রেমের তুল্য বস্তু জগতে নাই। কে ব'লে দিল? জানি না কে বল্‌ল, প্রাণে তার সায় পাই। প্রাণে এক আদেশ পাই—চ'লে যাও ঐ পথে, যা হয় হউক, জলে ডুব, আগুনে পোড়, গায়ের মাংস ছিঁড়ে যাউক, কাঁটা বনের মাঝ দিয়ে চ'লে যাও; চল্‌তে পার না, চেষ্টা কর, প্রার্থনা কর, আমার চরণভিখারী হ'য়ে থাক। কি প্রমাণ দিবে? কোন প্রমাণ নাই। কেবল আত্মাতে বিশ্বনাথের আদেশ অনুভব কর। চৈতন্যের সঙ্গে এক সাধু পুরুষের দেখা হইল, সাধু পুরুষ বল্লেন—আমার শুধু এই প্রার্থনা জগতের বেদনা আমার হউক, আর সকল জগজ্জন মুক্তিলাভ করুক। এ কি যুক্তি? সকলের বেদনা আমার কর—এর কোন যুক্তি নাই—শুধু প্রাণে অনুভব কর। প্রেমধর্ম্ম প্রচারের জন্য জগতে এসেছি, যা হয় হউক, এতে ব্রহ্মের স্বরূপ যেমন প্রকাশ পায়, আমাদের জানা শুনা কোন বস্তুতে তেমন প্রকাশ পায় না? প্রেমের পথে চ'লে যাও, যা হয় হউক। তুমি তা পারছ না! কোথায় তোমার প্রেম? কোথায় তোমার আশ্রয়?

একদিন একস্থানে উপদেশে বলেছিলাম—all high affections are fraught with deep pain. সে কথাটী আজ বল্‌তে চাই। যে শ্রদ্ধা প্রীতি জগদ্ব্যাপী, এবং যে মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রীতি, তার মধ্যে গভীর বেদনা রয়েছে। যারা আমেরিকায় স্লেভারী এবলিস্ (দাসত্ব দূর) করতে চেষ্টা করেছিল, দুই শতাব্দী ধ'রে তারা প্রাণে কি গভীর বেদনা অনুভব করিয়াছিল, একবার সকলে ভেবে দেখুন! স্বদেশকে যিনি ভাল বাসেন, দেশের দুর্দ্দশা দেখে বেদনা পান আমি জানি না, আপনারা কেহ স্মরণ করেন কি না সেই মোপ্লাদের যারা তৃষ্ণায় জল না পেয়ে মরে গেল—আমি প্রায় প্রতিদিন তাদের স্মরণ করি, কোন দিন বাদ যেতে পারে—একটু তৃষ্ণায় জল না পেয়ে ম'রে গেল! চৌরী চুরাতে আগুনে পুড়ে মেরে ফেল্লে—আগুনে পুড়ে! আমি জানি না আপনারা তাদের স্মরণ করেন কি না, আমি প্রায় প্রতিদিন তাদের স্মরণ করি—তারা কি মানুষ নয়? তারা কি আমাদের ভাই নয়? হিন্দু মুসলমানে কি ব্যাপার, কত ঘটনা ঘট্‌ছে! মৃত্যু অপেক্ষাও কত কষ্টকর ঘটনা ঘটেছে! তার চেয়ে মৃত্যু বরং ভাল ছিল। প্রেমের সঙ্গে সঙ্গে বেদনা রয়েছে, প্রেম থাকলে ব্যাথা থাকবে। সে ব্যাথাকে আদর ক'রে বুকে ধ'রে নিতে হবে—যায় প্রাণ যাউক, যায় প্রাণ যাউক। জেনেভায় আমার এক বন্ধু দুই জন রাশিয়ান মহিলার সঙ্গে এক বাড়ীতে ছিলেন। তাঁরা সম্ভ্রান্ত পরিবারের, একজন দেশ থেকে বাহির হইয়াছিলেন ভাষা শিখিবার জন্য, ইউরোপের নানা স্থানে বেড়িয়ে যুদ্ধ আরম্ভের পূর্ব্বে উক্ত স্থানে আসেন; যুদ্ধ আরম্ভের পর আর বাড়ী যেতে পারেন নাই। পিতা মাতার সংবাদ নিতে চেষ্টা করলে তিনি বল্লেন তাদের মেরে ফেল্‌বে। ধনী ঘরের মেয়ে, অতি সামান্য রকম কাজ ক'রে দৈনিক যা কিছু পান তাতে বাড়া ভাড়ার টাকা দিতে পারেন না, সেও লেডী বল্লেন পৃথিবীতে আমার কেহ নাই, জেনেভায় যে কয়খানা বাড়ী আছে তারই ভাড়াতে আমার চল্‌বে, তোমার ভাড়া দিতে হবে না। সেই মহিলাকে আমি স্মরণ করি, এই ব'লে স্মরণ করি, জগৎপতি তুমি সন্তানদের আশ্রয়, এই অসহায় মহিলাদের মা বাপ আছেন, অথচ কেহ নাই, তুমিই তাহাদের মা বাপ। এই যে ভাব বিশ্বপিতা অন্তরে দেন—পরের বেদনাকে আপনার করা—এই ভাব না হইলে আর কোন প্রকারে সেবা করতে পারবে না। এই ভাব কেন আসে? প্রেমস্বরূপ যিনি তাঁর ইচ্ছায় এ আদেশ প্রাণে এসে পৌঁছায়। এ ছাড়া আর কিছুতেই তা আসতে পারে না। আমরা ত প্রেমিক নই, আমরা জানি আমাদের ষোল আনা সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বজায় থাকুক ইহাই চাই। কিন্তু তাতে কি সুখ হ'তে পারে? রাত্রে শুতে যাবার সময় সমস্ত হাঁসপাতালের কথা স্মরণ করা উচিত। তুমি সুকোমল শয্যায় শুয়ে আরাম পেলে! ভেবে দেখ জগতের জেলখানা গুলি। তুমি একটি উদ্ধার হ'য়ে গেলে, তোমার তাতে সুখ হ'ল; তবু কে ব'লে দিচ্ছে বেদনায় ভয় পেও না, ঐপথে চল, ঐ পথে চল; কেন না, প্রেমে ভগবৎস্বরূপের যেমন আভাস পাই, আর কিছুতে তেমন পাই না. As every pool reflects the image of the Sun so every thought and thing restores us an image and creature of the Supreme Good. খানা ডোবার জল যেখানে একটুখানি জল, তাতেও সূর্য্য প্রতিভাত হয়; তেমনি প্রত্যেক বস্তুতে, প্রত্যেক চিন্তাতে সেই অসীম পুরুষের, পরম মঙ্গলস্বরূপের ছায়া আছে। কিন্তু কোনটীতে বেশী আছে, কোনটীতে কম আছে। তিনি প্রেম-স্বরূপ, অপরকে প্রেম দিবার প্রবৃত্তির ভিতর তাঁর আভাস যেমন পাই, আর কিছুতেই তেমন পাই না। এতেই বুঝ্‌তে পারি এটা স্বর্গীয় বস্তু। যায় প্রাণ যাউক, অপরকে ভাল বাস্‌তে যদি প্রাণ দিবানিশি ডুবে থাকে থাকুক, ঐ পথে চল্‌তেই হবে। এই উপদেশ কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। ধর্ম্ম-জীবন কতকগুলি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত—কোন প্রমাণ নাই। ভগবানের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য—কে তাঁর প্রমাণ করিতে পারিয়াছে? কিন্তু অতি সত্য, যারা তা না দেখেন, বল্‌তে হবে তাঁরা চোখ থাকতে কাণা। বহুদিন পূর্ব্বে জ্ঞানাঙ্কুর নামক পত্রিকা ব্রাহ্মদের

বিদ্রূপ ক'রে প্রবন্ধ লিখেছিল—নিরাকার জ্যোতি, জ্যোতি আবার নিরাকার হয়? হাক্সেজ নির্ব্বোধ, ইমার্সন নির্ব্বোধ, সব নির্ব্বোধের দল, তোমরাবু দ্ধিমান, মাটী দিয়ে গ'ড়ে পুতুল পূজা কর। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন, যারা বলেছেন তারা নির্ব্বোধ। সেই রূপের আভাস পেয়ে সেলী মুগ্ধ হ'য়ে বলেছিলেন Oh thou awful loveliness! সুগভীর সৌন্দর্য্য ব্যক্ত করা যায় না, গাম্ভীর্য্য ও মধুরতায় সংমিশ্রিত রচনাতীতের রূপের ভাষা কে দিতে পারে? কবিশ্ব সে রূপের আভাস পেয়ে বল্‌ল—Oh thou awful loveliness

তার প্রমাণ আত্মার রসনা পায়, পেয়ে এমন ভাবে কথা বলে অন্তের প্রাণ সেই ভাবে নড়ে উঠে। আর কি প্রমাণ দিবে? অনেক দিন পূর্ব্বে মন্দিরের পাশে আমি ঢুকছি, —মন্দিরে তখন উপাসনা হচ্ছে—আমি প্রবেশ করি নাই, সঙ্গীত হচ্ছিল—"কেন বঞ্চিত হব নাথ" এমন সময়, এমন শুভ মুহূর্ত্তে, কথাগুলি কাণে এসে বাজল, প্রাণের ভিতর নাড়াচাড়া দিয়ে উঠল, প্রাণের তার একেবারে বেজে উঠল। এই প্রেম যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তু তাঁর প্রমাণ কে দিবে? কেহ দিতে পারে না। এর প্রমাণ কেবল এই—আমাদের অন্তরে ভগবানের আদেশ—যাও তুমি ঐ পথে, যা হয় হউক, যা ঘটে ঘটুক, ঐ পথে যাও, কাঁটা বনে ছিঁড়ে যাউক, তুমি অকুল পাথারে পড়ে যাবে, আগুনে পুড়বে, যাও তুমি ঐ পথে। শাস্ত্রী মহাশয় তাঁর কবিতায় বলেছেন প্রেম আঁধারে আলো; আমাদের একটা প্রাচীন ব্রহ্মসঙ্গীতে আছে প্রেমের আলো জেলে যাবে। যারা সাধুজন তারা এই ভাবে প্রেমের মহত্ত্ব ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন। প্রেমের সঙ্গে সঙ্গে বেদনা আছে। আমরা যাকে শোক বলি তার চেয়ে অধিক বেদনা আছে। কি বেদনাতে সেণ্ট অগাষ্টাইনের জননী ৪০বৎসর ধ'রে,সন্তান ধর্ম্মপথে আসুক, এই প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ভেবে দেখুন সেই বেদনার কথা। মূলার ৬০ বৎসর এক জনের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন—বিপথে চলেছে, সুপথে আসুক। বেদনা না হ'লে কি এইরূপ প্রার্থনা করা যায়? ৯৩ বৎসরে দেহত্যাগ হয়; জীবনের শেষ ৬০ বৎসর প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাঁর দেহত্যাগের পর তাঁর সম্পর্কিত একজন তাঁর জীবনচরিতে বলেছেন—সুমতি হয়েছে, ধর্ম্ম পথে এসেছে। শোকের চেয়ে এটা প্রাণে বেশী বাজে। প্রিয়জন, যাকে প্রেমের চক্ষে দেখছি, সে বিপথে চল্‌বে, এ বেদনা সহ্য কর্‌তে পারা যায় না। সে বেদনা প্রেম আদর ক'রে নেয়। আশ্চর্য্য, সকল দেশের ধর্ম্মাচার্য্যগণ বেদনার ভিতর দিয়ে ভগবানকে পাবার কথা বলেছেন। শঙ্কর বলেছেন—

খেদ এব পরা পূজা খেদে চিত্ত নিরাশ্রয়ঃ।

যে রকমেই হউক আপনাকে নিরাশ্রয় বোধ কর্‌তে হবে; তা নহিলে ভগবানকে পাওয়া যায় না। ইউরোপে যাকে জ্ঞানীপ্রধান বলা হয়েছে—যদিও আমি স্বীকার করি না—তাঁর উক্তি শুনুন,

Who never ate his bread in sorrow,
Who never spent the darksome hours
Weeping and watching for the morrow,
He knows you not, ye heavenly powers.

চোখের জল ফেলে যে অন্ন গ্রহণ করে না, কখন প্রভাত আস্‌বে এই ভেবে যে রাত্রি যাপন করে না, তোমার দেখা সে পায় না। একই কথা—শঙ্করাচার্য্যের সঙ্গে গেটে মিলে গেল। চারিদিক থেকে বল্‌ছে বেদনার পথে যেতেই হবে, তাহা না হইলে শুধু ভগবৎসঙ্গ নয়, মহৎসঙ্গও হয় না। যারা বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে শান্তিতে কাটায়, ঘরে অনেক ধন আছে, আসবাব আছে, অনেক পরিচারক পরিচারিকা আছে, অনেক বন্ধু বান্ধব আছে, তারা বাহির নিয়ে মত্ত হ'য়ে থাকে, ভগবানের দেখা পায় না। তাই ব'লে তাহাদিগকে ঈর্ষা কর্‌তে হবে, তা নয়। তা'দের মধ্যেও অনেক মহৎলোক আছেন। এ হ'লেই একজন মহৎ ব্যক্তি হবেন, তার অর্থ নাই—অনেক সময় তার বিপরীতই ঘটে। কবিগুরু দান্তে বলিয়াছেন—Sorrow remarries us to God. তার জন্মস্থানে, বাড়ীর সাম্‌নে, গিয়ে দাঁড়ালাম! নামে ফ্লোরেন্স গৌরবান্বিত,—চিরকাল বিদেশে ঘুরেছেন। তাঁর মত লোকের সঙ্গ কি ক'রে পাব ব্যথা যদি না পাই? তার সঙ্গ পাবার চেষ্টা কি ক'রে করি? সঙ্গ পেলে বেঁচে যাই। কি ক্লেশ! জীবনে আট মাস একটা ঘরে সলিটারী কন্‌ফাইন্‌মেণ্টে (নির্জ্জন কারাবাসে) রেখে দিয়েছিল। ঘরটার পশ্চিম জানালা দিয়ে সময় সময় রৌদ্র আস্‌ত। ইউরোপে এরূপ আবদ্ধ থাকা কি কষ্টকর আপনারা জানেন না। বাড়ী ঘর যাতে শীতের চেয়ে বাচান যায়, সেইভাবে নির্ম্মিত। সে দেশে আটমাস সলিটারী কন্‌ফাইন্‌মেণ্ট! ঘরের মধ্যে আবদ্ধ থাক্‌বেন—ডাক্তার বল্লেন,ব্যারাম হয়েছে, এক ঘণ্টার জন্য বাতাসে বেড়াতে পার। যারা ধর্ম্মাচার্য্য ব'লে গণ্য নয়—স্কট—তার রাজপ্রাসাদ দেখ্‌তে গেলাম, রাজপ্রাসাদের খিওরী ভেঙ্গে গেল। এমন শোকাকুল ঘটনা ঘট্‌ল, বাড়ী রইল বটে, কিন্তু তিনি ভিখারী হলেন। তাঁর জীবন-চরিতলেখক বলেছেন সেই সময় তাঁর মহত্ত্ব প্রকাশিত হ'ল। এই যে রাজপ্রাসাদের মত বাড়ী এ ত খেলা,—বিপদের উপর বিপদ—তার বর্ণনার প্রয়োজন নাই,—আপনারা সকলে জানেন। মৃত্যুশয্যাতে Lockheartকে কাছে ডেকে বল্লেন—One thing only can give you peace and that is being good. লকহার্ট, সাধুচরিত্র যদি হ'তে পার শান্তি আছে, নচেৎ শান্তি নাই। ইউরোপব্যাপী খ্যাতি যার, তার মুখ দিয়ে একথা বেরুল! ইতালী থেকে ফিরে এলেন, সেখানে তাঁর ছবি বিক্রয় হচ্ছে, পাছে লোকে চিনে ফেলে, সেই ভয়ে আস্তে আস্তে পালালেন। তারপর গেটে জগৎবিখ্যাত লোক, কিন্তু যখন শুনিলেন রোমে (Rome) তাঁহার পুত্র গত হয়েছেন, সে আঘাতেই তাঁহার মৃত্যু হইল। ধন মান ঐশ্বর্য্য অসময়ে কি কাজে লাগে? কিন্তু যার অন্তরে সাধুতা আছে, মহত্ত্ব আছে, তার সাধুতা ও মহত্ত্ব প্রকাশিত হয় শোকের দিনে। চৈতন্যকে যিনি বলেছিলেন জগতের বেদনা আমার হউক, আর সকলে শান্তিলাভ করুক, তাঁর এই স্বর্গীয় ভাবে যদি আমরা ভগবানের মঙ্গল রূপের পরিচয় না পাই, তবে কিসে পাব? সেখানে মানুষ দেবতা, যেখানে সে পরের বেদনাকে আপনার ক'রে নিতে পেরেছে। আমরা অনেক সময় দুঃখ শোক সম্বন্ধে নিরাশার কথা বলি; ভেবে চিন্তে দেখা উচিত, ত্যাগ ব্যতীত তাঁকে পাব না, তাই আমাদের জন্য তিনি ত্যাগের ব্যবস্থা করেছেন। বিনা সাধনায় ত তাঁকে পাওয়া যাবে না। তিনি বিরহ বিচ্ছেদের ব্যবস্থা করেছেন—তোমার বুকে আগুন জাল্‌তে হবে, আগুনের পাত্র বুকে ধ'রে রাখতে হবে! এর চেয়ে ত্যাগ কিসে পাবে? শরীর আহার কর্‌ছে, কিন্তু প্রাণ ত আহার কর্‌ছে না। অন্ন জল লবণে শরীর পুষ্ট করে, প্রাণ ত পুষ্ট করে না! ভগবান যাঁর প্রতি কৃপা করেন, সে আরাম পায় না—সুকোমল শয্যায় শুয়েও আরাম নাই। এর চেয়ে বেশী ত্যাগ পারে না। ত্যাগ—ত্যাগ কি কারুকে ছেড়েছে? বুকে আগুন জেলে দিয়েছে, ঐ আগুন ধ'রে রাখ, ঐ তোমার স্বর্গ, ঐ তোমার ত্যাগ। বিনা সাধনায় তাকে পাওয়া যাবে না, ত্যাগ ব্যতীত জীবন নাই, It is only with renunciation that life, properly speaking, can be said to begin. ত্যাগ ছাড়া জীবনের আরম্ভ হয় না। যিনি বলেছেন জীবনে ত্যাগী একেবারে ছিলেন না, ভগবান ক'রে নিলেন। তিনি প্রতিভাশালী ছিলেন, একমাত্র পুত্র রোমে গত হয়েছে! সংবাদ শু'নে ভেঙ্গে পড়লেন, তাতেই মৃত্যু। একথাটী অতি সত্য—ত্যাগ ব্যতীত জীবনের আরম্ভ হয় না। জীবনের কোন অর্থ নাই ত্যাগ ব্যতীত। বৈরাগ্য? এই ত বৈরাগ্য। স্বাস্থ্যের অনুরোধে তুমি শরীরের যা প্রয়োজন পোষাক পরিচ্ছদ পর, আহার কর, শয়ন কর, বেড়াও; কিন্তু ব্রহ্ম যদি কৃপা ক'রে প্রকাশিত হন, মনে হবে এ আহার আহার নয়, এ বেড়ান বেড়ান নয়, তখন তাঁর চরণসৌন্দর্য্যের মধ্যে বিহার কর্‌বে, মনে হবে

আর আমার বেড়াবার জায়গা নাই। এই ভাবে তিনি আমাদিগকে তাঁর নিকটস্থ করেন। গিতা বলিয়াছেন—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ—এক আমার শরণাপন্ন হও। ব্যথাতে এই উপদেশ যেমন আমরা পালন করি, তেমন আর কখনও করি না। অন্তরে প্রবেশ করিয়া ক্ষত স্থানের ঔষধ লাগাইয়া দিতে আর কেহ নাই। তবে তাঁর শরণাপন্ন না হইয়া কার শরণাপন্ন হইব? এলাহাবাদের অপর পারে অনেক সাধু সন্ন্যাসী আছেন। একবার তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলাম। তিন জনের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল, একজন খুব প্রাচীন হইয়াছেন, খাটে ব'সে পড়েছেন—ছোট ঘর ধুঁয়োতে ভরা, তাঁর শিষ্য নিকটে আছে। আমাদের দেখে তিনি শুয়ে পড়লেন, আমরা যে প্রশ্ন করি শিষ্য তার উত্তর দিতে আরম্ভ করলেন। আমি বল্লাম ইঁহার মুখে শুনতে চাই। একটী প্রশ্ন এই ছিল, উপাস্য কে। তার উত্তর এই হ'ল—যাঁর সম্বন্ধে তোমার মনের এই ভাব হবে, তিনি ভিন্ন আমার আর গতি নাই, তাঁর উপাসনা করবে। ভেবে দেখুন, বেদনাতে একথা যেমন ক'রে বুঝি—তিনি ভিন্ন আর গতি নাই—বেদনাতে একথা যেমন বুঝি, আর কখনও তেমন বুঝি না। তাই দান্তে বলিয়াছেন—sorrow remarries us to God. নকলের দ্বারা হয় না। সব সৌন্দর্য্য ভগবানের রূপের নকল, সকল মধুরতা তাঁর মধুরতার নকল, সকল প্রেম তাঁর প্রেমের নকল। নকল ক'রে চলে না। আত্মা অরিজিনেল (আসল) ব্যতীত নকলকে গ্রহণ করে না, বাহিরে ফে'লে রাখে। আপনারা মিষ্টি কথা বলেন, বেশ, সেও ভগবানের কৃপা; কিন্তু সেই কৃপাময় পুরুষকে দেখতে চাই। অতি মলিন আমরা, আমাদিগকে তিনি কৃপা ক'রে স্পর্শ করুন। তার মঙ্গলং শান্তং রূপ শুদ্ধ করে, সকল সৌন্দর্য্য তাঁর রূপের আভাস। আমরা অমৃত লোকের কিছু জানি না, সে দেশ হ'তে কখন একটু আধটু জ্যোতি চোখে এসে পড়ে। বুঝতে হবে সেই আমাদের প্রকৃত দেশ, এটা আমাদের স্বদেশ নয়। নকলের দ্বারা প্রাণের অভাব যায় না, কেবল তিনিই প্রাণে প্রবেশ করতে পারেন, আর কারো প্রবেশের অধিকার নাই। আনন্দ দূরে, যাতনায় কে শান্তি দিতে পারে? তাঁহার আশ্বাসবাণী ব্যতীত, পতিত-পাবনের আশ্বাসবাণী ব্যতীত, অসংখ্য প্রাণে কে শান্তি দিতে পারে? তবে এই যে সেন্টপল বলেছেন—Charity beareth all things, hopeth all things, endureth all things—হাঁ, প্রেমের পথে চলতে হবে। তাঁর আদেশে প্রেমের সঙ্গে সঙ্গে বেদনা রয়েছে; তা কাউকে বোঝাতে হবে না। আমরা আশা করি, কেমন ক'রে করি, বলতে পারি না। যারা স্লেভারি দূর করবার জন্য দুই শতাব্দী পরিশ্রম করিয়াছিল, কেমন ক'রে তাদের প্রাণে আশা ছিল, জানি না। প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিল যারা, কেমন ক'রে আশা তাদের প্রাণে ছিল জানি না। আশার আর কোন স্থান নাই, আশার উৎস সেই মঙ্গল স্বরূপের আভাস। সেখান থেকে তাঁর বাণী আসে—আমাদের প্রাণেও অনেক সময় এসেছে। ভগবৎকৃপায় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হওয়া অবধি অনেক অনেক ছিলেন এবং আছেন, যাঁরা ভগবানের মঙ্গলরূপ, কেবল বিদ্যুৎ-আলোকের মত নয়, দিবালোকের মত, পেয়েছেন। তাঁরা যে সাক্ষ্য দেন তাতেই বুঝতে পারি। আমি দীন হীন—এটুকু বলতে পারি—বিদ্যুৎ-আলোকের মত, তিনি প্রবুদ্ধ করলেন। তাঁর রূপ প্রকাশিত না হ'লে, তাঁর আশ্বাসবাণী না শুনলে এত দিন খাড়া আছি কি ক'রে? কত বার ভয় হ'য়েছে—ভেঙ্গে পড়লাম, তিনি খাড়া ক'রে দিলেন, তাই খাড়া হ'তে পারলাম। আশার মূল তিনি, তিনি কত সময় অভয় ও সান্ত্বনা দিয়েছেন, কত সময় পথ ব'লে দিয়েছেন! আমি প্রার্থনা করি নাই, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিন্তায় তাঁকে বলেছি। তিনি জানেন ওর অন্তরে ব্যথা রয়েছে, দিবসের পরিশ্রমের পর শয়ন করতে যাব, প্রাণে চিন্তা, বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবছি—আপনা হ'তে বাণী এল "ভয় করো না।" আমাকে দীন হীন দেখে আমার সঙ্গে প্রেমালাপ করছেন। আমি তাঁকে ডাকি নাই—তিনি জানেন ওর আরাম আবশ্যক, বড় শ্রান্ত, ক্লান্ত,—তখন আরাম এল। অনেক সময় কোন প্রকার চিন্তা রয়েছে, একেবারে উত্তর এল—ভয় নাই, ভয় নাই। তিনি আমার সঙ্গে কথা বলছেন যখন, তিনি কি আমার অভাব বুঝছেন না? ঘোর শোকের সময় কত সান্ত্বনা দিয়েছেন, জগতের সাধু জন তার সাক্ষী দিচ্ছে। শোকে ভেঙ্গে পড়লে, ভগবান এসে বল্লেন—কি কর তুমি, আমার প্রতি এত অবিশ্বাস? তোমার প্রিয়জন আমি কেড়ে নিইনি। অমৃতলোকে তোমার প্রাণের প্রিয়ধনকে নিয়ে এসেছি। তোমার হাতে ছিল, আমার হাতে এল, শান্তির রাজ্যে এসেছে, আনন্দ কর। তিনি যে আমাদের সঙ্গে কথা বলেন, আশ্বাসবাণী শোনান,—এখানে আশা রাখতে হবে। একটী ব্রহ্ম সঙ্গীতে আছে—"যাঁহার প্রসাদে এক মুহূর্ত্তে সকল শোক অপসারি"। তুমি একথা বলতে পারছ না কেন? তোমার মনে ধারণা আছে, তুমি আমার উপাসনা কর; খুঁজে দেখ কোন্ জায়গায় গোল আছে, উপাসনা হয় না, পূজা হয় না, ডাকার মত ডাকতে পারনি। সাধনায় উৎসাহিত করবার জন্য, যাতে তাঁর চরণে একান্তে প'ড়ে থাকতে পারি তার জন্য, তিনি দুঃখ বিপদ দ্বারা নব চেতনা আনেন এবং ভাল ক'রে টেনে ধরেন,—আমি তোমার কাছে দাঁড়িয়েছি, তোমার বুকে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি, তোমায় অভয়বাণী শোনাচ্ছি। আজ আমরাও একাগ্রতার সঙ্গে তাঁকে ভাল ক'রে ধরব। ঐ তিনি আমাদিগকে উপদেশ দিচ্ছেন—আমাদের আচার্য্যগণ সেই সকল কথা বলেছেন। "যাঁহার প্রসাদে এক মুহূর্ত্তে সকল শোক অপসারি"। এই সকল কথা স্মরণ ক'রে বড় বল পাওয়া যায়। যাঁদের নাম আপনারা শোনেনি এই রকম কোন কোন সাধু ব্যক্তি উপদেশ দিয়েছেন—তাঁহাকে এক মুহূর্ত্তের জন্য ছাড়বে না, অনবরত ভগবানকে ডাকবে, ডাকতে ডাকতে নিরাশ প্রাণে আশা আসবে, উত্তর আসবে। এই রূপ সাধক আছেন যারা তাঁর কৃপাতে তাঁর অভয় মূর্ত্তি দেখেছেন। তাঁদের মুখের উপদেশ আমরা নানা শাস্ত্রে পড়ি, নানা কথায় বলি। আমাদের কয়েকটা সঙ্গীতের মধ্যে সাধকেরা তাঁর কৃপার যে সাক্ষী দিয়েছেন তার একটী এই "যাঁহার প্রসাদে এক মুহূর্ত্তে সকল শোক অপসারি"। আজ তাঁদের সঙ্গলাভ আবশ্যক, আজ উপাসনার সময় আহ্বান করি তাঁহাদিগকে, পরলোক হ'তে তাঁরা আমাদের কাছে আসুন। মিস্ কলেটের ক্যান্সার রোগের কথা শুনিয়া শাস্ত্রী মহাশয় কাতর হইলে, তিনি তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলেছিলেন "শিবনাথ, তুমি এত ভাব কেন? What is death? death is nothing." রামমোহন রায়ের জীবন চরিত্রের ভূমিকায় লেখেছেন আমি শেষ করতে পারব না, আর একজন সমাপ্ত করবে। রামমোহন রায়ের দেখা পেলে কি বলব? দেবেন্দ্র নাথ, রামমোহন, কত কত ভক্ত যাঁদের নাম শুনি নাই, মৃত্যুর পরপারে চলিয়া গিয়াছেন। আজ আহ্বান করি তাঁহাদিগকে। যে সাধু বলেছিলেন এক মুহূর্ত্তের জন্য তাঁকে ভুলবে না—তাঁর সে বাণী আজ স্মরণ করি। "ডাকার মত যদি পরিতাম ডাকতে!" কত সময় তাঁকে ভুলেছি, তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। এক রোমেন ক্যাথলিক সাধক বলেছিলেন তোমার দিন কাটে না ব'লে আক্ষেপ কর, ভেবে দেখ কত সময় ভগবানকে ভুলে রয়েছ, ভেবে দেখ সংসারের অসার আমোদ প্রমোদে কত সময় চলে গেছে, একান্তে তাঁর শরণাপন্ন হও। কত বিশ্বাসী, তাঁদের উপদেশবাক্য আমাদের সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে, তাঁদের সান্নিধ্য উপলব্ধি করতে চেষ্টা কর। ইমার্সনের দেহ সমাধিস্থ করবার সময় জেমস্ ফ্রিমেন ক্লার্ক বলেছিলেন The saying of the liturgy is wise and true that in the midst of life we are in death; but it is still more true that in the midst of death we are in life.

মৃত্যুর মধ্যে অমর জীবন রয়েছে, ইহলোক-পরলোকের ভেদ আমরা সৃষ্টি করেছি মোহবশতঃ। জীবনের ত কেবল আরম্ভ হয়েছে! কত শিখ্‌তে হবে, কত পড়্‌তে হবে! ভগবানের রূপের কি জানি আমরা? দেবেন্দ্রনাথ বলেছিলেন—দেখ শিবনাথ, আমরা তাঁর স্বরূপের দুই একটী কথা মাত্র এখানে শিখেছি, আরো কত রূপ তাঁর প্রকাশিত হবে, কেবল আরম্ভ হয়েছে। তবে কেন আমরা অধীর হ'য়ে পড়ি? সেণ্ট পল বলেছেন The fashion of this world passeth away. সংসারের আরাম পাওয়া শীঘ্রই ঘুচিয়া যাইবে। কয় দিন আছি এখানে? এই ভাবে চল যেন কেনা বেচা করছ; কারণ, the fashion of the world passeth away. স্যার ফিলিপ সিড্‌নি প্রেমে বিফলমনোরথ হ'য়ে এই ব'লে সান্ত্বনা দিয়েছেন, এ বেদনা আমার আর কয় দিন থাকবে? এ ত অল্প রাস্তা, মৃত্যু পর্য্যন্ত পৌঁছিতে বেশী দেরী নাই। কিন্তু একটী কথা—অল্প রাস্তা হ'লেও, প্রাতে শুনেছেন ভক্তিভাজন আচার্য্য মহাশয় বলেছেন—সেই লোকের জন্য যদি প্রস্তুত না হই, দেহ ত্যাগ হ'লেই স্বর্গে যাব, তা হয় না। প্রস্তুত হ'তে হবে, এই ভাবে চল্‌তে ফির্‌তে হবে যেন অনন্ত কাল চলা যায়। ফিক্টে সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন—তিনি বলেছেন, সেই ভাবে কাজ করতে হবে, যে ভাবে চিরকাল করা উচিত। To act rightly is to act in the way in which you would act for ever. চিরকাল যে ভাবে আচরণ করবে, চল্‌বে ফির্‌বে, সেই ভাবে আচরণ কর, চল, ফির,—সাধু আচরণ সাধু ব্যবহার—এটা যেন মনে থাকে। এমন কোন কাজ যেন না কর, যা'তে বল্‌তে হবে ভুল হ'য়ে গেছে। ভগবানের দিকে মুখ রেখে, তিনি যা'তে গৌরবান্বিত হন, আমি তাঁর অনুগত হ'য়ে চল্‌তে পারি, সেই ভাবে চল্‌তে হবে। চেষ্টা সত্ত্বেও আমাদের অনেক অপরাধ হবে, তবু চেষ্টা—তিনি যা'তে গৌরবান্বিত হন। অন্তরতম তিনি, অন্তরে থেকে আমাদিগকে নিয়ে যাচ্ছেন। বেদনা কার কাছে বলি? বেদনার পরিমাণ নির্দ্দেশ ক'রে দিয়ে, আচার ব্যবহার চলন ফিরন সকলের ভার তুমি নিয়ে চলেছ। আমাকে তোমার হাতের পুতুল করে রা'খ, এই প্রার্থনা ব্যতীত আমাদের তাঁর অভয় পদ লাভের অন্য উপায় নাই। জগজ্জনকে তাঁর পথের কথা ব'লে আশান্বিত করতে পারব না। তিনি আমাদের প্রেরিত করেছেন, সকল ভার তিনি গ্রহণ করেন। কেবল বাহিক কাজের ভার নয়, কোন চিন্তা কতক্ষণ ধ'রে ভাবি তার ভারও। অন্তর বাহির চারিদিক থেকে আমাকে বেষ্টন ক'রে ফেলেছেন, এ যদি অনুভব করতে পারি, তাহা হইলে তাঁর কৃপায় জান্‌তে পারব মৃত্যু অমৃতের সোপান। আমাদের সকলের জীবন প্রাণমন তিনি কৃপা ক'রে অধিকার করুন—তাঁর কাছে এই আমাদের আবদার। আমাদের দুর্ব্বল হৃদয়ে তিনি প্রেমময় রূপে প্রকাশিত হউন। তিনি স্বপ্রকাশ; জীবনে দেখেছি যখন সাধন ভজন দূরে থাকে, আমরা তাঁর বিরোধী হ'য়ে দাঁড়াই, তখন তিনি জানেন দেখা না দিলে সর্ব্বনাশ হয়, অমনি প্রাণে এসে দাঁড়ালেন। অসময়ে তিনি আসেন—তাও আমাদের মলিন প্রাণে কত সময় দেখেছি! যে ভাবে অনেক সময় অনেককে তিনি দেখা দিয়েছেন, অনেকে তার অভয় পদ পেয়েছে, তাদের কথায় বুঝতে পারি। আমি মলিন, সে অবস্থা পাই নাই, বিদ্যুৎ-আলোকের মত তাঁকে দেখেছি। কখন কখন দিনের পর দিন সপ্তাহের পর সপ্তাহ, তাঁর শান্তি প্রাণকে একেবারে রসে তৃপ্ত ক'রে রেখেছে। কিন্তু তিনি আমাদের নিকট চির প্রকাশিত হউন—এই আমাদের প্রার্থনা। শোক তাপ বেদনা কমে যেতে পারে, আমরা একটা প্রেমপরিবার যদি হই, পরস্পরের কাছে যদি ব্যথার ব্যথী হ'য়ে দাঁড়াতে পারি, আর বিশ্বাস ভক্তির কথা যদি পরস্পরকে বল্‌তে পারি। যিনি যতটুকু পেয়েছেন অপরকে যদি তা দেন, তাহা হইলে আমাদের মধ্যে এমন শান্তি আসবে পারে যাতে জগজ্জনকে বল্‌তে পারি—এস ভাই এই প্রেম-পরিবারে এস, ঘোর দুঃসময়ে এখানে বল শান্তি ভরসা পাবে, এস। জগত ক্ষুধিত, তৃষিত, দুর্ভিক্ষপীড়িত, বেদনাপীড়িত, কত পাপাচারে আসক্ত! ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাগণ, ভগবৎচরণে কাতর হ'য়ে প'ড়ে তাঁদের সিদ্ধি দ্বারা, জীবনের দ্বারা, প্রেমস্বভাব দ্বারা, পুণ্যস্বরূপের আনুগত্য দ্বারা, সেই অসীম পুরুষকে এমন ভাবে গৌরবান্বিত করুন, যাতে জগজ্জন আশা পায়—এই আমাদের দীক্ষা হউক।

হে অখিলতারণ, তুমি জগত-তারণ, জগদাশ্রয়, জগৎ-গুরু, জগৎপতি, আমাদের দুর্ব্বল প্রাণে এস। বিশ্বাসের বল দাও, তোমার প্রকাশে সকল দীনতা ঘুচে যায়, পথ-হারা পথ পায়, মৃত্যু অমৃতের সোপান হ'য়ে যায়। তুমি এস আমাদের সকলের প্রাণে, আমাদের অপ্রেম কলহ দূর ক'রে দিয়ে পুণ্য ধারা বর্ষণ ক'রে আমাদের জীবন পবিত্র কর এবং আমা-দিগকে প্রেমপরিবার ক'রে দাও। ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে কি কোলাহল! হায় হায় হায়, কোথায় তোমার দিকে ব্যাকুল হ'য়ে ছুটে যাব, তা নয় ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে কি কোলাহল! পান করি হলাহল, অপ্রেমের হলাহল পান করি, বিষয় বাসনার হলাহল পান করি তোমাকে ভুলে। আজ এই প্রার্থনা করি আমাদের জীবনে তোমার নাম গৌরবান্বিত হউক। আমরা তপ্ত, দগ্ধ—কৃপাবারি আমাদের সকলের প্রাণে বর্ষণ কর। জগজ্জনকে যাতে আশার কথা বল্‌তে পারি, এই বল, এই শান্তি আমাদিগকে দাও। তোমার প্রসন্ন মুখ আমরা দেখি, সকল জগজ্জন অনাথ গতিহীন জন হউক সনাথ, এই আমাদের ভিক্ষা, এই আমাদের প্রার্থনা। তোমার প্রকাশ আমাদের ইহলোক পরলোক এক হউক। তুমি আমাদের বাড়ী ঘর হও, আরামের স্থল হও, আমাদের এই ভিক্ষা। এই প্রার্থনা পূর্ণ কর।

সঙ্গীতান্তে শ্রীমতী সরলা দেব একটি প্রার্থনা করেন। পুনরায় অনেকক্ষণ সংকীর্ত্তন চলিতে থাকে। অবশেষে অদ্যকার উৎসব শেষ হয়। ক্রমশঃ

ব্রাহ্মসমাজ

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ১১ই মার্চ্চ কলিকাতা নগরীতে পরলোকগত বঙ্কবিহারী বসুর জ্যেষ্ঠা কন্যা (শ্রীযুক্ত মণিমোহন মজুমদারের পত্নী) কনকপ্রভা চারিটি শিশু সন্তান রাখিয়া দুই তিন দিনের জ্বর নিমোনিয়া রোগে পরলোক গমন করিয়াছেন।

বিগত ১১ই মার্চ্চ কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত রসিকলাল রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুধীরকুমার জড়িত অন্ত্র রোগে হঠাৎ পরলোক গমন করিয়াছেন। পরিতাপের বিষয়, বিবাহের এক মাসের মধ্যেই নব পরিণীতা পত্নীকে বৈধব্য ক্লেশ ভোগ করিতে হইল।

বিগত ১৩ই মার্চ্চ কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত লালমোহন চট্টোপাধ্যায়ের পত্নী প্রমিলাসুন্দরী সাতটি পুত্র কন্যা রাখিয়া হঠাৎ পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি সেই দিনও অপরাহ্নে ব্রহ্ম মন্দিরে গমন করিয়াছিলেন।

বিগত ৬ই মার্চ্চ কলিকাতা নগরীতে পরলোকগত রজনীকান্ত দের আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র আচার্য্যের কার্য্য করেন। কন্যা শ্রীমতী মৃন্ময়ী রায় জীবন পাঠ এবং জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র দে জীবনী বর্ণন করিয়া প্রার্থনা করেন। তাঁহার স্মৃতি রক্ষার্থ ৫০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজ প্রচার ফণ্ডে প্রদান করা হইবে।

বিগত ৬ই মার্চ্চ কলিকাতা নগরীতে পরলোকগত বাবু আশুতোষ দাস গুপ্তের আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র রায় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চির শান্তিতে রাখুন ও আত্মীয় স্বজনদিগের শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় দ্বারা ১২ই চৈত্র মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রীবরদাকান্ত বসু বি-এ,

Registered NO 65.

অসতো মা সদগময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৬ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৪৯ম ভাগ। ২৪শ সংখ্যা।

১৬ই চৈত্র, বুধবার, ১৩৩৩, ১৮৪৮ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯৮
30th March, 1927.

প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০
অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা

হে চিরন্তন দেবতা, অনন্ত কালপ্রবাহে নিয়তই দিন মাস বৎসর লীন হইয়া যাইতেছে। ইহার মধ্যে এক মাত্র তুমিই অপরিবর্ত্তনীয় বিশ্ববিধাতা হইয়া, সকল ঘটনাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছ ও সকলকে তোমার চির কল্যাণের পথে অগ্রসর করিতেছ। আমরা নানা ঘটনাস্রোতের মধ্যে পড়িয়া কত বিব্রত হই, কত উত্থান পতনের মধ্য দিয়া চলি! কত সময় শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া একটু স্থিরভূমি লাভের জন্য, একটু দাঁড়াইবার স্থান পাইবার জন্য, ব্যস্ত হই! কিন্তু তুমি ত আমাদের জন্য সেরূপ ব্যবস্থা কর নাই! তুমি যে আমাদের জন্য অবিরাম অবিশ্রাম গতিতে চলিবারই ব্যবস্থা করিয়াছ! আমাদের জন্য অনন্ত পথই নির্দ্দেশ করিয়াছ। তাহাতেই আমাদের কল্যাণ ও উন্নতি রাখিয়া দিয়াছ। তোমার অসীম প্রেমে আবার সে পথকে তুমি সুখকর আনন্দকরও করিয়াছ, একটুও কণ্টকাকীর্ণ কর নাই। আমরা তোমার পথে না চলিয়া বিপথে যাই বলিয়াই, নানা সংগ্রামের মধ্যে ক্ষত বিক্ষত হইয়া, বিবিধ বাধা বিঘ্নের আঘাতে বার বার প্রতিহত হইয়া, ক্রমাগত উত্থান পতনের মধ্য দিয়া চলিতে বাধ্য হই। তোমার মঙ্গল ব্যবস্থাতে এরূপ লাঞ্ছিত হইয়া যখন একটু চৈতন্য লাভ করি, আপনার পথ পরিত্যাগ করিয়া তোমার পথে চলি, তোমার হাতে আপনাদিগকে অর্পণ করি, তখন ত দেখি তুমি তোমার অসীম স্নেহে কত সহজে ও আরামে আমাদিগকে তোমার পথে অগ্রসর কর। হে দেবতা, তুমি দেখিতেছ কোন্ মোহে পড়িয়া আমরা এই অভিজ্ঞতার কথা ভুলিয়া যাই। বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতেছে, আমরা কিছুতেই তোমার হাতে আপনাদিগকে অর্পণ করিয়া তোমার পথে চলিতে পারিতেছি না, অভ্যাসের দাস হইয়া, আপনার ভাবে আপনার পথে চলিয়া, কেবল দুঃখ ক্লেশ সংগ্রাম ও পরাজয় আনয়ন করিতেছি। আর একটি বৎসর চলিয়া যাইতেছে। এই সময় তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে শুভ বুদ্ধি দাও। আর যেন আমরা এ ভাবে বৃথা কালহরণ না করি। হে করুণাময় পিতা, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে তোমার কর। তোমার মঙ্গল ইচ্ছাই আমাদের সকলের একমাত্র চালক হউক। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

সপ্তনবতিতম মাঘোৎসব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

১২ই মাঘ (২৬শে জানুয়ারী) বুধবার— প্রাতে সাধনাশ্রমের উৎসব উপলক্ষে সংকীর্ত্তন ও উপাসনা। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। দুঃখের বিষয় তাঁহার প্রদত্ত উপদেশ এখন পর্য্যন্ত আমাদের হস্তগত না হওয়াতে প্রকাশ করিতে পারিলাম না। পরে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

অপরাহ্ণে 'প্রচার' বিষয়ে আলোচনা। পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ সভাপতির কার্য্য এবং শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আলোচনা উপস্থিত করেন। মিঃ ভিঃ আর সিন্ধে, ভাই সীতারাম, শ্রীযুক্ত হরকুমার গুহ, শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ সেন, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (দ্বিতীয়বার) সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র সোম, আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে আপনাদের বক্তব্য প্রকাশ করিলে সভা ভঙ্গ হয়।

সায়ংকালে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ "যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ" বিষয়ে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

১৩ই মাঘ (২৭শে জানুয়ারী) বৃহস্পতিবার —প্রাতে পাঞ্জাব হইতে আগত মহিলাগণ হিন্দি কীর্ত্তন করেন। তৎপরে উপাসনা। শ্রীযুক্ত মথুরানাথ নন্দী আচার্য্যের কার্য্য

করেন। দুঃখের বিষয় তাঁহার প্রদত্ত উপদেশ এখন পর্য্যন্ত আমাদের হস্তগত হয় নাই। প্রাপ্ত হইলে পরে প্রকাশ করিব।

অপরাহ্নে মেরী কার্পেন্টার হলে রবিবাসরীয় নীতিবিদ্যালয়ের বালক বালিকাদিগকে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দত্ত সভাপতির কার্য্য ও পুরস্কার বিতরণ করেন। বালকবালিকাগণ আবৃত্তি ও অভিনয়াদি করেন। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী বার্ষিক কার্য্যবিবরণী পাঠ এবং শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র রায় ও সভাপতি বালক বালিকাদিগকে উপদেশ প্রদান করেন। শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

সায়ংকালে ব্রহ্মমন্দিরে ইংরাজীতে উপাসনা। শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। দুঃখের বিষয় তাঁহার উপদেশের মর্ম্মানুবাদ সংগৃহীত না হওয়াতে প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

১৪ই মাঘ (২৮শে জানুয়ারী) শুক্রবার—
প্রাতে পাঞ্জাব হইতে আগত মহিলাগণ কর্ত্তৃক কীর্ত্তনের পর হিন্দিতে উপাসনা। ভাই সীতারাম আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম প্রাপ্ত না হওয়াতে প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

অপরাহ্নে বালকবালিকা-সম্মিলন। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত প্রার্থনা করিয়া একটা গল্প বলিলে পর, শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু তাহাদিগকে কিছু বলেন। অনন্তর অন্যান্য বৎসরের ন্যায় স্যার নীলরতন সরকারের ব্যয়ে বালকবালিকাদের প্রীতিভোজনান্তে এই উৎসব শেষ হয়।

সায়ংকালে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্রের অনুপস্থিতি বশতঃ শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র রায় "মানবের মুক্তি সাধন" বিষয়ে একটি বক্তৃতা পাঠ করেন।

১৫ই মাঘ (২৯শে জানুয়ারী) শনিবার—
প্রাতে উপাসনা। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল:—

প্রকৃত ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে হইলে সাধনার একান্ত আবশ্যক, তদ্ভিন্ন কখনই আমরা যথার্থ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিব না। এ জীবনে একদিকে যেমন দেবতার কৃপা ও আশীর্ব্বাদ যথেষ্ট পরিমাণে আছে ও চাই, অপরদিকে তেমনি নিজেদের যত্ন আগ্রহ এবং তাঁহার প্রতি সরল বিশ্বাসও থাকা চাই; তাহা না হইলে আমরা কখনই স্থির ভূমিতে দাঁড়াইতে পারিব না। আমরা ধর্ম্মসমাজে থাকিয়া প্রতিনিয়ত তাহা জীবনে অনুভব করিতেছি।

এই শরীর মন আত্মা লইয়াই ত আমাদের মানব জীবন। এই জীবনের যদি আমরা প্রকৃত উন্নতি চাই, তাহা হইলে নিশিদিন আমাদিগকে সাধনায় প্রবৃত্ত থাকিতেই হইবে। করুণানিধান পরমেশ্বর, এই দেহের পুষ্টির জন্য যেমন এ জগতে আলোক বাতাস প্রভৃতি এবং নানা প্রকার সুখাদ্য দ্রব্যের প্রচুর পরিমাণে রাখিয়াছেন, তেমনি আমাদের মনকে উন্নত ও প্রসারিত করিবার জন্য কত সংগ্রহ, কত দর্শন বিজ্ঞান, কত শত জ্ঞানের পথ সর্ব্বদা উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন—যাহাতে আমরা স্বাধীন চিন্তার দ্বারা প্রকৃত গন্তব্য পথে জীবনকে পরিচালিত করিতে পারি। সর্ব্বোপরি আমাদের এই আত্মা। এই আত্মাকে না জানিলে মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ হওয়া সম্ভবপর নহে। এই জন্যই মানুষের আত্মার এত গৌরব, মানুষের এত মহত্ত্ব। ঋষিরা বলিয়াছেন;—

হিরণ্ময়েপরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্।
তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদো বিদুঃ॥

"যাঁহারা স্বীয় আত্মাকে জানেন, তাঁহারা আত্মরূপ উজ্জ্বল ও শ্রেষ্ঠ কোষ মধ্যে, সেই নির্ম্মল নিরবয়ব জ্যোতির জ্যোতি, শুভ্র পরমাত্মাকে উপলব্ধি করেন।

জ্ঞানজ্যোতিতে উজ্জ্বল ও ধর্ম্মভূষণে ভূষিত যে মানুষের আত্মা, তাহাতেই তিনি সুন্দর রূপে প্রকাশিত হন। এই জন্যই আমাদের আত্মা পরমাত্মার শ্রেষ্ঠ কোষ। তিনি নির্ম্মল ও শুভ্র, তিনি জ্যোতির জ্যোতি, তিনি আত্মার জ্যোতি, তিনি জ্ঞান-জ্যোতি, পরব্রহ্ম। সে জ্যোতির রূপও নাই এবং অবয়বও নাই। ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তিরা জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা স্বীয় আত্মাতে সেই সত্যের জ্যোতি উপলব্ধি করেন।

এই যে ব্রহ্ম আত্মাকে ধর্ম্ম লাভের জন্য প্রবল স্পৃহা বলবতী করেন, ইহাতেই মানব ঈশ্বরকে নিকটতম বন্ধু রূপে পাইবার জন্য ব্যাকুল হয়। তাঁহার কৃপায় মানব জীবনসংগ্রামে জয়যুক্ত হইয়া অভয়প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সত্য ব্যাকুলতাই ধর্ম্মজীবনের শক্তি ও বল; এই ব্যাকুলতা আমাদিগকে তাঁহার সাধনায় প্রবৃত্ত করে। মানবাত্মা শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনাদি-দ্বারা আপনার আত্মোন্নতি সাধনে রত হয় ও ধর্ম্মসমাজকে বলশালী করে; এবং ধর্ম্মসমাজও তাহাদের সকলের পরিচর্য্যা করিয়া প্রত্যেক মানবাত্মাকে উন্নতির সোপানে আরোহণ করাইয়া দেয়। এই জন্যই তো ধর্ম্মমণ্ডলীতে থাকা নিতান্ত আবশ্যক। সকলের হৃদয়-সিংহাসনে তাঁহার প্রেমের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে; তদ্দ্বারাই আমরা অন্তরে তাঁহার প্রকৃত পরিচয় লাভ করি। জ্ঞানচক্ষু তাঁহাকে অন্তরে দেখাইয়া দেয়, প্রেম তাঁহাকে পরম প্রিয়তম বলিয়া অন্তরে অনুভব করে। আমরা যখন পরস্পর প্রেমের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া হৃদয়-নাথকে হৃদয়ে দেখিয়া তাঁহার পূজায় প্রবৃত্ত হই, তখন তাঁহার অধম সন্তান হইলেও, পিতা পরমেশ্বরের অতুলনীয় করুণায় আমরা সত্যই অমৃতের অধিকারী হইয়া অন্তরে পরমাত্মাকে লাভ করি। আমাদের পরস্পরের সংস্পর্শে প্রাণে এমন এক সূক্ষ্ম জীবনী-শক্তি কাজ করিতে থাকে এবং তাহা এক উন্নত ধর্ম্মজীবন দান করিয়া সকলের প্রাণকে এত আকুল করিয়া তোলে যে, তদ্দ্বারাই আমরা জীবনের পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়া পড়ি। এই রূপ না হইলে ধর্ম্মসমাজের সার্থকতা কোথায়?

আমরা এ জীবনে কত বার দেখিয়াছি, বৎসরের পর বৎসর কত ব্রহ্মোৎসবে মহা প্রাণসাগরের ঢেউ আসিয়া আমাদের প্রাণের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে; অথচ আমরা যেখানে ছিলাম, যেন সেই খানেই পড়িয়া রহিয়াছি, জীবনে যেন অগ্রসর হইতে

পারি নাই, পরে এইরূপ বোধ করিয়াছি। ইহার কারণ কি? কারণ আর কিছুই নয়, আমাদের জীবন প্রকৃত প্রতিষ্ঠা-ভূমি লাভ করে নাই। আমরা সাধনার বস্তু জীবনে কিছুই পাই নাই; তাই এ জীবন মৃতকল্প হইয়া পড়িয়া আছে। এই জন্যই আমরা জীবনে এই দুর্গতি ভোগ করিতেছি। সে উপাসনা উপাসনাই নয়, যে উপাসনার দ্বারা আমাদের জীবন গড়ে না, প্রাণে নবালোক পাওয়া যায় না, প্রকৃত নবজীবনের সঞ্চার হয় না। মানুষ যদি প্রাণের মধ্যে উন্নত ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষা ও ব্যাকুলতাকে বলবতী ক'রে রাখ্‌বার জন্য সচেষ্ট হয়, এবং আপনাকে বরাবর প্রতিজ্ঞার ডোরে সংযত করিতে ও বৈরাগ্যের অভ্যাসের দ্বারা নিজেকে বাঁধিতে পারে, তবেই জীবন-সংগ্রামে মানুষ জয়যুক্ত হইতে পারে, তদ্ভিন্ন অন্য পথ নাই। সাধনা একান্ত আবশ্যক, সাধনা ভিন্ন উপায় নাই। প্রকৃত ধর্ম্মজীবন গড়িবার জন্য প্রতিনিয়ত আমাদিগকে সংগ্রাম করিতেই হইবে, আত্মোন্নতিসাধনে রত থাকিতেই হইবে। আলোকে অন্ধকারে, জীবনে মরণে, আশায় নিরাশায়, উত্থানে পতনে, সেই ব্রহ্মের অভয়-ক্রোড় আশ্রয় করিতেই হইবে; প্রতিনিয়ত উপাসনা-ক্ষেত্রে আসিয়া ভাই ভগিনীর সঙ্গে প্রাণে প্রাণে মিলিত হইতে হইবে; প্রতিদিন ধর্মগ্রন্থাদি নিয়মিত রূপে পাঠ করিতেই হইবে। তা না হইলে আমরা কখনই প্রাণে শক্তি ও বল লাভ করিতে পারিব না। আমরা যদি কেবল নাটক নভেল পড়ি, বাহিরের বিষয়-কোলাহলে প্রতিনিয়ত মত্ত থাকি, এবং আপনার অমর আত্মার প্রতি দৃষ্টি না রাখি, তবে কোন কালে আমরা প্রকৃত ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে পারিব না, ইহা সুনিশ্চিত। বোধ হয়, এই জন্যই আমরা ধর্ম্মসমাজকে বর্ত্তমান সময়ে বলশালী করিয়া তুলিতে পারিতেছি না—ব্যক্তিগত জীবনেও দিন দিন হীন ও মলিন হইয়া পড়িতেছি।

প্রেমই আমাদের জীবনের আলোক। এই আলোকে প্রত্যেককে জীবনের পথ দেখিয়া লইতে হইবে। আমাদের গৃহ পরিবার সমাজ, নিজেদের কার্য্যক্ষেত্র ও এই বাহিরের জনসমাজ, সব এই প্রেমদ্বারা সুদৃঢ় করিয়া লইতে হইবে,—নরনারী নির্ব্বিশেষে সকলকেই প্রেমদান করিতে হইবে। আমরা মহান্ প্রেমের ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছি, জগতের একমাত্র পিতা পরমেশ্বর সকলের প্রভু ও প্রতিপালক, আর জগতের অসংখ্য নরনারী আমাদের ভ্রাতা ও ভগিনী, এই মহান্ ভাবে আত্মাকে সর্ব্বদা উদ্বুদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে। আমরা সঙ্কীর্ণ অনুদার মতের গণ্ডীতে পড়িয়া এই আত্মাকে কখনও বিনাশ করিতে পারি না। সর্ব্বদা আমাদের চক্ষের সম্মুখে অতি উচ্চ ধর্ম্মের আদর্শকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিব, তবেই না আমাদের জীবন! এই জীবনের স্বাদ পাইয়া একজন ইংরাজ কবি গাহিয়াছেন :—

My religion is Love! It's noblest and purest,
And my Temple the universe—widest and surest;
I worship my God, through his work, which are fair,
And the joy of my heart is perpetual prayer.

এই ভাবের কথা আমাদের ব্রাহ্মসমাজের দুইটি শ্লোকের মধ্যেও প্রাপ্ত হই।—

"সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং
চেতঃ সুনির্ম্মলং তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলংহি প্রীতিঃ পরমসাধনং
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে।"

আর একটি:—"তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।" এ সকল অতি উচ্চ দরের কথা। আমরা এই সকল ভাব যদি প্রতিনিয়ত সাধন করি, তবেই জীবনকে ধন্য করিতে পারিব। আমাদের আত্মোন্নতিসাধনের ক্ষেত্র স্বয়ং প্রভু পরমেশ্বর এই ধর্ম্মসমাজের মধ্যেই রাখিয়াছেন; কেবল সাধন করিয়া জীবনে বল লাভ করিতে হইবে। সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে, প্রাণের অনুরাগের সহিত, আর প্রীতি ভালবাসার সহিত, এই ধর্ম্মসাধনকে জীবনে অবলম্বন করিতে হইবে। ইহাতেই আমাদের কল্যাণ, জনসমাজের মঙ্গল, ধর্ম্মসমাজের শক্তি ও বল। এস ভাই বোন্, এই সাধনের জন্য আমরা আকাঙ্ক্ষিত হই, আমাদের আত্মার প্রতি প্রখর দৃষ্টি রাখি। আমরা এখন কি করিতেছি? গঙ্গার সুবর্ণ-রত্নাকর ফেলিয়া যেন মৃণ্ময় কাচখণ্ডের জন্য লালায়িত হইতেছি। 'অমূল্যনিধি' প্রেম আমাদের সকলের অন্তরে বিরাজিত। আমরা কখনও অন্য কাহার দ্বারস্থ হইব না। এই অন্তরেই তাঁর সত্য পরিচয় লাভ করিব, সরল সুন্দর প্রাণে বিশ্বাসকে পোষণ করিয়া, উত্তরোত্তর সত্য লাভের জন্য আত্মাকে ব্যাকুল করিব, তিনি যে আত্মার ক্ষুধার অন্ন, পিপাসার বারি হইয়া রহিয়াছেন, তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিব. তবে না সাধন, তবে না তপস্যা। ভক্তেরা জীবনে তাহার সাক্ষ্য কত দিয়া গিয়াছেন!

তবে আমরা এই অমর আত্মাকে জ্ঞানে প্রেমে পুণ্যে ক্রমাগত বিকশিত করিতে থাকি, নিরন্তর সরল ব্যাকুল প্রাণে হৃদয়দেবতাকে ডাকি, চির জীবনের আশ্রয়দাতা যিনি তাঁহার শরণাপন্ন হই, প্রেমের ঠাকুরকে এই হৃদয়-সিংহাসনে ভাল ক'রে বসাই—সজনে নির্জ্জনে, অন্তরে বাহিরে, বিশেষতঃ এই হৃদয়-গুহার মধ্যে, প্রাণব্রহ্মকে অন্বেষণ করি। দুঃখ ব্যথার মধ্যেও তিনি, সুখ সৌভাগ্যের মধ্যেও তিনি; তিনি চিরদিন আমাদের অনন্ত জীবনের সাথী। তাঁহারি হাত ধ'রে এই সংসার-পথে বিচরণ করিব, প্রতিদিনের জীবনে তাঁহার সাক্ষাৎ অনুভব করিব, সকলের মধ্য দিয়া তাঁহার অতি সুমিষ্ট প্রেম অন্তরে আস্বাদন করিব। এই জন্যই তো মানবজীবন। বিধাতা করুন, প্রকৃত সাধননিষ্ঠা আমাদের মধ্যে বলবতী হউক। তাঁহার নিকট আমরা এই প্রার্থনা করি, তিনি আমাদিগকে শুভবুদ্ধি প্রদান করুন, সকলকে আজ আশীর্ব্বাদ করুন, আমরা আত্মার মধ্যে সত্য পরমাত্মাকে দেখিয়া, নব বলে বলীয়ান হইয়া, ব্রাহ্মসমাজকে তুলিয়া ধরি ও নিজেদের জীবনকে ধন্য করি।

মধ্যাহ্নে কাঙ্গালী-বিদায়। সায়ংকালে আবার উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল:—

সিটি কলেজের বাড়ীতে যে তিন সমাজের মিলিত উৎসব

হইতেছে, আমি দুই দিন সেই উৎসবে যোগদান করিয়াছি। একদিন আমার শ্রদ্ধাস্পদ ও প্রিয় বন্ধু শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী উপাসনা করিয়াছিলেন। তাঁহার চিন্তাপূর্ণ উৎকৃষ্ট উপদেশটি আমার খুব ভাল লাগিয়াছিল। তিনি ব্রাহ্মসমাজের গঠনমূলক কার্য্যের দিকে আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। কোন ধর্ম্মসমাজের অভ্যুদয় হইলেই তাহাকে ভাঙ্গা ও গড়া, এই দুই রকম কর্ম্মেই প্রবৃত্ত হইতে হয়। সর্ব্বাগ্রে ভাঙ্গার কাজেই অনেক শক্তি ক্ষয় করিতে হয়। ব্রাহ্মসমাজেরও এই ভাঙ্গার কাজে অনেক শক্তি ক্ষয় করিতে হইয়াছে। এখনও যে এই কাজ শেষ হইয়াছে, তাহা নহে। তবে এখন আমাদের গঠনমূলক কার্য্যের জন্যই বিশেষ চেষ্টা করা আবশ্যক হইয়াছে। আমরা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারি যে, অনন্তস্বরূপ ঈশ্বরই নরনারীর যথার্থ উপাস্য-দেবতা, জাতিভেদের পরিবর্ত্তে মানুষের সঙ্গে মানুষের এক উদার ভ্রাতৃভাবই স্থাপন করা এবং উচ্চ শিক্ষার দ্বারা নারীজাতির অবস্থা উন্নত করিয়া তাঁহাদিগকে সকল বিষয়ে স্বাধীনতা ও উচ্চ অধিকার দেওয়া আবশ্যক; দেশের শিক্ষিত লোকদিগকেও এ কথা আমরা বুঝাইতে সমর্থ হইয়াছি। তাঁহারা মুখে স্বীকার করুন আর না করুন, তাঁহাদের গূঢ় মর্ম্মস্থানে ব্রাহ্মসমাজের উদার ও মহৎ ভাবই যে প্রবেশ করিতেছে, তাঁহারা যে জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে ব্রাহ্মসমাজের মতগুলিই অনেক পরিমাণে গ্রহণ করিতেছেন, সে কথা বলিলে এখন আর অত্যুক্তি হইবে না। বলিতে কি, এ বিষয়ে আমরা জয়লাভ করিয়াছি। ব্রাহ্মসমাজের বাহিরের মতের আদর্শ সমস্ত দেশের ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া যাইতেছে, কাহারও আর সাধ্য নাই যে উহাকে অতিক্রম করে।

এখন আমাদের প্রধান কর্ম্মই এই যে, আমাদের ধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ সাধনের দ্বারা যাহাতে আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে, পারিবারিক জীবনে ও সামাজিক জীবনে উজ্জ্বল হইয়া উঠে, সেজন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা। এ চেষ্টা যে হয় নাই, অথবা হইতেছে না, এমন অন্যায় কথা কে বলিতে পারে? কিন্তু এই দিকে আমাদের আরও অধিক শক্তি প্রয়োগ করা আবশ্যক হইয়াছে। আমাদের সাধনের জন্য অধিক সময় দিয়া এবং শ্রম করিয়া, ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন যাহাতে উন্নত হয়, সেজন্য বিস্তর চেষ্টা করা আবশ্যক। আমার ত মনে হয়, আমরা আমাদের পরিবারের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের সাধন ও আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা করি নাই। এই কার্য্যটির জন্য আমরা যদি সময় ও শক্তি দিতে না পারি, এ বিষয়ে যদি আমরা কৃতকার্য্য না হই, তাহা হইলে আমাদের ধর্ম্মের বিশেষত্ব কি রূপে রক্ষা পাইবে?

আমাদের ব্রাহ্মসমাজের এই সকল গঠন কর্ম্মের জন্য তিন সমাজের শক্তিকেই মিলিত করিয়া প্রাণপণ করিতে হইবে। শ্রদ্ধাস্পদ ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য মহাশয় তিন সমাজের মিলিত উপাসনায় যেদিন উপাসনা করিয়াছিলেন, সেদিন তিনি তাঁহার উৎকৃষ্ট উপদেশের মধ্যে প্রেমের উল্লেখ করিয়াছিলেন। আমাদের বিভিন্ন এবং ভিন্ন ভিন্ন ভাবাপন্ন লোকদিগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ভাব স্থাপন করিয়া, ব্রাহ্মসমাজের গঠনমূলক কার্য্যে শক্তি প্রয়োগ করিতে হইলে যে প্রেমের সাধনার একান্ত প্রয়োজন, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। বর্ত্তমান সময়ে জ্ঞানের উন্নতির জন্য মানুষের স্বাধীন চিন্তার বিকাশ হইতেছে; সুতরাং আমাদের মধ্যে অনেক ছোট ছোট বিষয়ে মতের পার্থক্য ত থাকিবেই। কিন্তু সেই সঙ্গে প্রেমের সাধনা থাকিলে; আমরা বিচ্ছিন্ন হইয়া ঝগড়া কলহের দ্বারা বৃথা শক্তি নষ্ট না করিয়া, আমাদের মিলিত শক্তির দ্বারা প্রিয় ব্রাহ্মসমাজের কত মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিব! সেই জন্য এই প্রেমের সাধনা বিষয়েই এখন আমি সংক্ষেপে দু-চারিটি কথার উল্লেখ করিব।

আমরা যদি নির্জ্জনে বসিয়া আপনার এবং পরিবারে বসিয়া প্রিয়জনদিগের ও সমাজে বসিয়া সমবিশ্বাসী বন্ধুদিগের জীবনে প্রেমময়ের প্রেমের লীলা দর্শন করিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ি। সেই প্রেমস্বরূপ আমাদের জীবনের শত সহস্র ঘটনার মধ্য দিয়া কি আশ্চর্য্যভাবে প্রেম প্রকাশ করিতেছেন! তাঁহার সেই অসীম প্রেমের তুলনা কোথায়? হায়, এই প্রেমের বিষয় আমরা সর্ব্বদা চিন্তা করি না; প্রেমময়ের এই প্রেম যে কত সত্য, এই প্রেমের মধ্য দিয়া তাহা উপলব্ধি করি না; আমাদের প্রিয় সমাজের প্রত্যেক সমবিশ্বাসীর প্রেম যে কত প্রকারে আমার জীবনকে সরস করিয়া তুলিতেছে, সেই অনুভূতিও অন্তরে জাগ্রত করিতে প্রয়াস পাই না। সেই জন্যই বোধ হয় আমাদের প্রেমের অত্যন্ত অভাব; সেই জন্যই বোধ হয় আমরা পরস্পর কাছাকাছি না হইয়া একের নিকট হইতে অপরে দূরে চলিয়া যাইতে চাই।

আমাদের একটি কথা মনে রাখিতে হইবে—ঈশ্বরের প্রেম প্রত্যক্ষ করিবার এবং তাঁহার প্রেমে যুক্ত হইবার জন্য যেমন সাধনা আবশ্যক, তেমনি স্বীয় সমাজের লোকদিগের সঙ্গে প্রাণে যুক্ত হইবার ও তাঁহাদের প্রেমের অনুভূতিতে হৃদয় পূর্ণ করিবার জন্যও সাধনার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। বাঁকিপুরের ভক্ত প্রকাশচন্দ্র রায় বলিতেন, সাধনা করিয়া মানুষকেও প্রাণের কাছে পাইতে হইবে। মানুষকে হৃদয়ের কাছে পাওয়া কি কম সৌভাগ্যের কথা? আমরা সমাজের সকলের হৃদয়, সকলের শক্তি, এক করিয়া ঈশ্বরের সেবায় প্রবৃত্ত হইতে পারিলে, প্রিয় ব্রাহ্মসমাজের কত মহৎকার্য্য সম্পন্ন করিতে পারি!

আমরা প্রেমের সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া যথার্থ প্রেম লাভ করিতে পারিলে, আমাদের অন্তরে কি রকম ভাবের বিকাশ হইবে? এই সংসারে মানুষ যখন মানুষকে গভীর ভাবে ভালবাসে, তখন মানুষের অন্তরে তিনটি আশ্চর্য্য ভাবের বিকাশ দেখিতে পাই। প্রথমতঃ, মানুষ যাহাকে ভালবাসে, তাহাকে প্রাণ ভরিয়া দেখিতে চায়। মানুষের অন্তরে যখন নির্ম্মল প্রীতি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, তখন তাহার প্রীতির পাত্রকে দেখিবার জন্য চিত্ত এমনই ব্যাকুল হয় যে, সে মনে ভাবে যদি পাখী হইতে পারিতাম, তাহা হইলে এই মুহূর্ত্তেই উড়িয়া ঘুরিয়া একবার আমার প্রিয় জনকে দেখিয়া দুই নয়ন সার্থক করিতাম। অসীম সুন্দর দেবতার জন্য যখন ভক্তের অন্তরের প্রেম উদ্বেলিত হইয়া উঠে, তখন তাঁহার দর্শনের আকাঙ্ক্ষা

সমস্ত মন প্রাণ আকুল হইয়া পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, মানুষ যাহাকে অত্যন্ত ভালবাসে, নিজে তাহার গুণগান করিয়া এবং অপরের মুখে তাহার গুণগান শুনিয়া, পরম আনন্দ লাভ করে। কেহ আমার অতি প্রিয় প্রেমের পাত্রের যখন গুণগান করে, তখন উহা শুনিতে শুনিতে আমার হৃদয় সুধায় সিক্ত হইয়া যায়। আমি মনে মনে বলি, আহা, কি মিষ্ট! কি মধুর! বল, বল, আরও বল। থামিলে কেন? আবার আমি নিজমুখে যখন প্রিয়জনের গুণগান করিতে থাকি, তখন ভাবে আত্মহারা হইয়া যাই, কিছুতেই আর থামিতে পারি না। এইরূপ প্রেমিক যখন অপরের মুখে তাঁহার প্রেমের দেবতার গুণগান শুনিতে থাকেন এবং নিজ মুখে যখন তাঁহার মধুর কাহিনী বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হন, তখন অন্তরে আনন্দ—শুধুই আনন্দের লহরী—জাগিয়া উঠে। আমাদের উপাসনা ভাল লাগে না, ঈশ্বরের নামে রুচি থাকে না! কেন এমন হয়? ঈশ্বরের প্রতি প্রেম নাই বলিয়া। একবার আসুক ত একটু প্রেম আমাদের অন্তরে; মধুর—মধুর—উপাসনা ও ঈশ্বরের নাম কতই মধুর মনে হইবে। তৃতীয়তঃ, এই সংসারে কোন মানুষকে প্রাণ দিয়া ভাল বাসিলে, তাহার সেবা করিতে, তাহার জন্য সুখস্বার্থ বিসর্জন দিতে, কতই আনন্দ হয়! তাহার যাহারা প্রিয়, তাহারা সকলেই তখন কতই আপন হয়! তেমনি আমরা প্রেমের সাধনায় ব্রতী হইয়া অন্তরে প্রেমলাভ করিতে পারিলে, ঈশ্বরের সেবায় আত্ম-সমর্পণ করিতে, তাঁহার প্রিয়কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে, অন্তরে কতই আনন্দের উচ্ছ্বাস হইবে! শুধু কি তাই? তখন, প্রেমময় ঈশ্বরের যে প্রিয় ব্রাহ্ম ভাই ভগিনীসকল, তাঁহাদিগকে কতই সহজে আপনার মনে করিতে পারিব, তাঁহাদের একটু সেবা করিয়া কতই সুখী হইব! হায়, আমাদের অনেকেরই প্রেমের সাধন নাই, অন্তরে প্রেমের উচ্ছ্বাস নাই। এই জন্য প্রাণের ঈশ্বর প্রাণের ভিতরে থাকিয়াও যেন কতই দূরে; যেন তিনি কোন্ সুদূর সাগরপারে, কোন্ রহস্যলোকে! তাঁহাকে কিছুতেই প্রাণের মধ্যে খুঁজিয়া পাই না! আমাদের অনেকের এই প্রেমের সাধনা ও প্রেমের অভাবেই ত ব্রাহ্মসমাজের লোকদিগকেও আপনার পরমাত্মীয় মনে করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে অন্তরের ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপন করিতে এবং তাঁহাদের ব্যথায় ব্যথিত ও সুখে সুখী হইতে পারি না। সামান্য কারণে আমরা পরস্পরের মধ্যে কতই ব্যবধান রচনা করি!

করুণাময় পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি এখন আমাদিগকে প্রেমের সাধনায় প্রবৃত্ত করুন। আমরা যেন তাঁহার দর্শন পাইবার জন্যই ব্যাকুল হই। তাঁহার গুণগান করিয়া এবং তাঁহার গুণগান শুনিয়া আমরা যেন অপার আনন্দ লাভ করি। তাঁহার জ্ঞানে, তাঁহার ধ্যানে, তাঁহার নামে, আমাদের হৃদয় যেন মধুময় হইয়া যায়! আমরা যেন আমাদের প্রিয় ব্রাহ্মসমাজের প্রত্যেক নরনারীকে যথার্থই আপনার লোক বলিয়া মনে করিতে পারি। আমরা যেন আমাদের প্রিয় ব্রাহ্মসমাজের জন্য একটু শ্রম করিতে, একটু ত্যাগ স্বীকার করিতে পারিলে, এই জীবন সার্থক হইল বলিয়া মনে করি।

১৬ই মাঘ (৩০শে জানুয়ারী) রবিবার— প্রাতে ও মধ্যাহ্নে উদ্যান-সম্মিলন। মন্দিরেও প্রাতে উপাসনা হয়। তাহাতে শ্রীমতী সুশীলা বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল:—

এই এক পক্ষকাল আমরা এই ব্রহ্মমন্দিরে পরব্রহ্মেরই জন্য সকলে মিলিত হইয়াছি, এবং তাঁহারই গুণগান ও তাঁহারই উপাসনা করিয়াছি বলিয়াই, আমাদের সংকল্পিত মহোৎসব প্রেমময়ের করুণা ও মঙ্গল ইচ্ছায় সুসম্পন্ন হওয়া সম্ভবপর হইল। আমরা বৎসরের সকল মুহূর্ত্ত, সকল দিন, সকল সপ্তাহ, সমস্ত মাস, তাঁহারই জন্য যাপন করি নাই—তাঁহাকে ভুলিয়া সমস্ত জীবন আপনার ভাবেই বিভোর, আপনার ইচ্ছাতেই ব্যতিব্যস্ত ছিলাম—তবুও যখনই আমরা সংকল্প করিলাম, যখনই তাঁহার জন্য মিলিত হইলাম, তখনই অজস্র ধারে তাঁহার করুণা বর্ষিত হইল। যখনই তাঁহার দিকে আমাদের দৃষ্টি, ইচ্ছা, এবং প্রেম প্রসারিত করি, তখনই যে তাঁহার প্রেম ইচ্ছা ও দৃষ্টির সহিত আমরা মিলিত হই, আর কল্পনা করিয়াও নিজেকে একাকী, অসহায়, দুঃখ ক্লেশ, পাপ তাপ, রোগ শোক, বিরহ বিচ্ছেদে মুহ্যমান, বলিয়া বোধ করিতে পারি না, তাহার অর্থ কি—সে কথাই আজ মনে জাগিতেছে। ইহার অর্থ আর কিছুই নহে, সেই দাতা দয়ালু পরমেশ্বর, সেই পূর্ণ প্রেম মঙ্গল ও পবিত্রতার আধার পরব্রহ্ম, আমাদের জন্য তাঁহার পূর্ণ প্রেম প্রসারিত রাখিয়াছেন—আমরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেও তিনি কখনও আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন না। আমরা তাঁহার জ্ঞান প্রেম ইচ্ছার সহিত যুক্ত থাকিয়াই উন্নত ও বিকশিত হইব, চরিতার্থতা লাভ করিব, ইহাই তিনি আমাদের স্বভাবে নিহিত করিয়াছেন, এবং কোন্ মুহূর্ত্তে আমাদের জ্ঞান প্রেম ইচ্ছা তাঁহার সহিত যুক্ত করিবার জন্য আমরা ব্যাকুল হইব, তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছেন। কোন্ মুহূর্ত্তে যে আমরা প্রতি জনে আমাদের জন্ম জীবন, সুখ দুঃখ, বিচ্ছেদ মিলন, পাপ মলিনতা, যাহা কিছু ঘটে সকলের মূল কারণ বুঝিতে পারিব, তিনি তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, এবং আমাদের অন্তর্নিহিত মূল কারণ জানিয়া তিনি প্রতিনিয়ত অন্তরে বাহিরে আমাদের সহিত তাঁহার মিলনের সুযোগ, সকল ভাব অভাব, সকল সুখ দুঃখ, সকল প্রীতি অপ্রীতি সকল ভয় ভাবনা, অস্থিরতা উদ্বেগ, সদ্ব্যবহার অসদ্ব্যবহারের মধ্যে, যোজনা করিতেছেন। তিনি তাঁহার সহিত আমাদের প্রত্যেকের মিলনের জন্য অবিচ্ছিন্ন ভাবে লাগিয়াই আছেন, অনন্তকাল লাগিয়াই থাকিবেন। উৎসবের মধ্যে এই আশ্বাস দিয়া আমাদিগকে অনন্ত বলে বলী করিতেছেন, অনন্ত আশায় উৎফুল্ল করিতেছেন—নিরাশা অন্ধকার বিদূরিত করিতেছেন।

তিনি আমাদের প্রতিজনের জন্য এই ভাবে প্রতীক্ষা করিতেছেন, আর আমরা তাঁহাকে ভুলিয়াই আছি, ইহা মনে করিয়া লজ্জাতে দুঃখেতে মাটীর সহিত মিশিয়া যাইতে ইচ্ছা হইতেছে। বাস্তবিক ইহাই আমাদের সকল দুঃখের বড় দুঃখ। ইহা ছাড়া অন্য কোন দুঃখ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অন্য সকল দুঃখ এই দুঃখেরই অনুপ্রকাশ। তিনি পূর্ণ-জ্ঞানময়, পূর্ণ মঙ্গলময়, পূর্ণ প্রেমময়, সর্ব্বশক্তিমান, অনন্ত করুণাময়,

তাঁহার ইচ্ছা অতিক্রম করিয়া আমরা যাহা করিব, যাহা ভাবিব, যাহা হইব,তাহাতে যদি দুঃখ ক্লেশে,নানা সঙ্কটজালে, অশেষ প্রকার মৃত্যুর অন্ধকারে, এবং বিবিধ অভাবের মধ্যে, জীবন পরিবার ও সমাজ সহ হাবুডুবু না খাইব, তাহা হইলে তাঁহার পূর্ণ জ্ঞান প্রেম ও মঙ্গল ইচ্ছার কোন অর্থই থাকে না। তিনি সত্য সত্যই পূর্ণ জ্ঞান প্রেম ও মঙ্গলের আধার। তাই যে মুহূর্ত্তে যে ভাবে তাঁহাকে অতিক্রম করি, সেই মুহূর্ত্তে সেই ভাবেই বেদনা প্রাপ্ত হই। অবশ্য আমাদের প্রেম তাঁহার সম্বন্ধে সচেতন নয় বলিয়া, আমরা বেদনায় অস্থির হইয়াও বেদনার কারণ অবধারণ করিতে সর্ব্বদাই ভুল করিয়া থাকি; মনে করি, আমার দুর্ভাগ্যের কারণ এই যে, আমার প্রতি ভগবান প্রসন্ন নহেন, আমার অবস্থা অনুকূল নয়, আমার প্রতি অপরের—পরিবার ও সমাজের—যে কর্ত্তব্য তাহা প্রতিপালিত হয় না, ইত্যাদি। অফুরন্ত অভিযোগ মনে পোষণ করিয়া নিজেকে প্রাণাধার হইতে স্বতন্ত্র—বিযুক্ত—করিয়া, তাঁহার দত্ত ইচ্ছা-শক্তি আপনার খেয়াল অনুসারে প্রয়োগ করিতে থাকি, আপনার ইচ্ছামত কল্যাণ সুখ সম্পদ লাভ করিবার জন্য প্রাণপাত করি। এ ক্ষেত্রে মঙ্গলময় জগৎপিতার এক অপূর্ব্ব কৌশল দেখিতে পাই। তাঁহাকে ভাল না বাসিলেও, তাঁহার অনন্ত প্রেমের সহিত যুক্ত করিয়া, অনন্ত পরিণতির, অসীম সৌন্দর্য্যের পূর্ণ অভিব্যক্তির, দিকে লইয়া যাইয়া, আমাদিগকে পরম চরিতার্থতা, পরম পরিতৃপ্তি দিতে চান বলিয়া, যে প্রেম আমাদের নিজস্ব করিয়া দিয়াছেন, সেই প্রেমেরই পরিপূর্ণ আবেগে,তাঁহা হইতে বিযুক্ত হইয়াই যাহাদিগকে আপনার করিয়াছি তাহাদিগের জন্য, হৃদয়ের সমস্ত শক্তির দ্বারা নিজের মনের মত কল্যাণসাধনে যত্ন করিতে চেষ্টা করিয়া আমরা, কল্যাণ বা সুখসম্পাদন সুদূরপরাহত দেখিয়া, অনন্ত বেদনায়ই কাতর হইয়া পড়ি। এবং মনে করি যাহাদের (নিজের মনের মত) সুখ বা কল্যাণ চেষ্টাই আমাদের জীবনের লক্ষ্য, বলিতে গেলে যাহাদের জন্যই জীবন ধারণ করিতেছি, তাঁহাদের স্বতন্ত্র বুদ্ধির জন্যই আমাদের সমস্ত প্রয়াস সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইতেছে। এই বোধ প্রেমের স্বাভাবিক ধর্ম্ম সন্দেহ নাই। প্রেম দূরত্ব—বিযুক্তি—বিচ্ছেদ সহ্য করিতে পারে না। প্রেম চায় ইচ্ছাযোগে একত্ব, পূর্ণ মিলন। বিন্দুমাত্র দূরত্ব, বিচ্ছেদ প্রেমের পক্ষে অসহ্য। প্রেম প্রেমাস্পদের জন্য পর্ব্বতপ্রমাণ দুঃখ দৈন্য প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার ক্লেশ প্রফুল্ল চিত্তে সহ্য করিতে,হাসি মুখে বহন করিতে,সমর্থ; কিন্তু সর্ষপপ্রমাণ অনৈক্যও বহন করিতে পিষ্ট হইয়া যায়। প্রেম ও প্রেমাস্পদ আমাদের সবারই আছে এবং সেই সঙ্গে বেদনাও অবশ্যম্ভাবী রূপে সকলকেই ভোগ করিতে হইতেছে। আমরা যে যে ভাবে পরিবার সমাজ রাষ্ট্র জগত গড়িয়া তুলিতে চাই, তাহাতেই বাধা অকৃতকার্য্যতা নিরাশা দুঃখ হাহাকার জগৎ-ব্যাপিয়া সবাইকে আলোড়িত করিতেছে। এই জগৎব্যাপী দুঃখ দৈন্য, রোগ শোক, পাপ তাপ হাহাকারের মূলে প্রবেশ করিলে দেখিতে পাইব, আমরা তাঁহাকেই বাদ দিয়া, তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র হইয়া, নিজের, পরিবারের, দেশের, দশের, জগতের কল্যাণসাধনে চেষ্টা করিতে যাই। নিজে অপূর্ণ—জ্ঞান প্রেম শক্তিতে নিতান্তই ক্ষুদ্র,—ইহা শত সহস্র প্রকারে জানিয়াও, যিনি পূর্ণ জ্ঞান প্রেম এবং শক্তির আধার হইয়া আমাদের প্রতিজনের জন্য প্রতি মুহূর্ত্তে সাহায্য যোগাইতে প্রতীক্ষা করিতেছেন—উৎসবে এবং জীবনের শত ঘটনায় প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াও—তাঁহার সাহায্য গ্রহণ করি না কেন? তাঁহা হইতে বিযুক্ত হইয়া সংসারধর্ম্ম, অধ্যয়ন অধ্যাপন, ব্যবসায় বাণিজ্য, শিল্প কৃষি প্রভৃতি যত কিছু কর্ম্মে আমরা অহোরাত্র ব্যতিব্যস্ত রহিয়াছি, সে সকলই আমাদের দুঃখ বিকৃতি অকল্যাণ হাহাকারের কারণরূপে আমাদিগকে বিষদগ্ধ শল্যের মত বিদ্ধ করিতেছে, আনন্দময়ের আনন্দরাজ্যে নিরানন্দ ভয় বিভীষিকার সঞ্চার করিতেছে। তাঁহার অভিপ্রায় উল্লঙ্ঘন করিয়া কোন প্রকারেই যে আমাদের শান্তি নাই, আমাদের প্রত্যেকের জীবন পরিবার সমাজ স্বদেশ তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তাঁহার প্রেম যেমন অপরাজেয়, তাঁহার ন্যায়ও তেমনি অক্ষুণ্ণ। আমরা সাক্ষাৎ ভাবে তাঁহার শাসন না মানিয়া চলিলেও, তাঁহারই সূক্ষ্ম অনতিক্রমণীয় ন্যায় ও প্রেমের শাসনে সর্ব্বদাই শাসিত হইতেছি। যতই পরার্থপর হই না কেন, তাঁহার প্রেম হইতে বিযুক্ত হইয়া আমরা প্রেম একতা মিলন ও কল্যাণ সাধনে অক্ষম হইয়া ধূলি ধূসরিত হইতেছি, যতই কেন স্বার্থপর হই না, তাঁহা হইতে বিযুক্ত হইয়া আপনার স্বার্থে আপনি কুঠারাঘাত করিতেছি। উচ্চ আদর্শ ও কল্পনার মোহে অন্ধ হইয়া জগতের সুমহৎ পরিবর্ত্তন সংসাধন করিব বলিয়া, যত সুসভ্য জাতি আমরা, তাঁহাকে বাদ দিয়া জ্ঞান বিজ্ঞান বল কৌশলে সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করিয়া, বড় হইবার উদ্দেশ্যে স্বজাতির গৌরবকে উপরে তুলিবার জন্য সচেষ্ট হইতেছি; কিন্তু তাঁহার অমোঘ শাসনে জগৎসমক্ষে সর্ব্বপ্রকারেই পরাজিত হইতেছি। জগতের দুঃখ হাহাকার বৃদ্ধিরই সহায়তা করিতেছি। তিনি যেমন প্রতিজনের কর্ত্তা বিধাতা, অভিভাবক, রক্ষক ও পালক, তেমনি বিরাট ভাবে সমস্তজগৎবাসী সকলেরও তাহাই। ক্ষুদ্র ভাবে তাঁহার ইচ্ছা অতিক্রম করিলেও বেদনা, বৃহৎ ভাবে তাঁহার ইচ্ছা অতিক্রম করিলেও বেদনা; বেদনার তার তম্য নাই, সব দুঃখই অসহনীয় এবং অমঙ্গল ও অকল্যাণ-জনক।

যে ক্ষুদ্র নগণ্য, সেও যদি তাঁহার ইচ্ছার অধীন হইয়া, তাঁহার প্রেমের সহিত যোগ রক্ষা করিয়া, চলিবার জন্য ব্যাকুল হয়, একমাত্র তাহাই যদি তাহার কাম্য হয়, তবে যিনি সাহায্য দিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন তিনি, দুঃখ বিপদের ঘোর ঝঞ্ঝাবাত ও অমানিশার গাঢ় অন্ধকারের মধ্যেও, তাহাকে তাঁহার আলোকে চলিতে সক্ষম করেন। তাঁহার পথে চলিতে সমর্থ হওয়াই যে তাঁহার আশীর্ব্বাদ, তাহাতেই যে তাঁহার পূর্ণ প্রেমের জীবন্ত স্পর্শ লাভ করিয়া অভয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, অমিত সাহস, অপরাজেয় শক্তি লাভ করা যায়, তাহার ভোগ করা ছাড়া বর্ণনা করা সম্ভবপর নহে। তাঁহার প্রেমেই শান্তি, তাঁহার প্রেমেই আনন্দ, তাঁহার প্রেমেই তৃপ্তি। যে কোন ভাবে তাঁহার সহিত যোগ রক্ষা করিয়া চলিলেই দুঃখও সুখসিন্ধুতে পরিণত হয়, মৃত্যুও অমৃতের সোপান হয়। এমন সত্য কথা জীবনে আর কিছুই নাই।

তিনি চাহেন আমরা তাঁহার প্রেম ভোগ করি, তাঁহার স্বরূপ দর্শন করিয়া অভয় প্রাপ্ত হই। এই ১৫ দিন আমরা তাঁহার এই

ইচ্ছার সহিত একটু যোগ দিয়াছি বলিয়াই তাঁহার মহামহোৎসবে তাঁহার প্রেম ভোগ করিতে পারিলাম, তাঁহার অভয় প্রাপ্ত হইলাম। কিন্তু তিনি কেবল এই কয়েক দিনের জন্যই এই ইচ্ছা করেন না। তিনি সমগ্র জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্তে, সকল ব্যস্ততা, সকল উদ্বেগ, সকল ভয় ভাবনা, সকল দুর্ব্বলতা, সকল সবলতা, সকল দুর্ভাগ্য ও সকল সৌভাগ্যের মধ্যে, তাঁহার প্রেমের জীবন-ব্যাপী মহামহোৎসব আরম্ভ করিতে চাহেন তাঁহার সকল সন্তানের জীবনে ব্যষ্টি এবং সমষ্টি ভাবে, নির্জ্জনে ও সজনে, অফুরন্ত প্রেমানন্দ সম্ভোগ করাইতে চান। এ উৎসব—আমাদের হৃদয়ে এই খণ্ড খণ্ড ভাবে তাঁহার প্রেমের আহ্বান—তাঁহার এই অভীপ্সিত মহোৎসবের উদ্বোধন মাত্র। আমরা যদি তাঁহার ইচ্ছা প্রতি মুহূর্ত্তে পালন করিতে চাই, তাঁহার অনুগত হইয়া চলিতে চাই, তবে তাঁহার প্রেমই আমাদিগকে সে পথে চলিতে শক্তি ও বুদ্ধি দিবে। তিনি ত তাঁহার প্রেম দ্বারা পরিবেষ্টিত রাখিয়া আমাদিগের পক্ষে তাঁহাকে অতিক্রম করিবার পথ রোধ করিতে সর্ব্বদাই নিযুক্ত। আমরা অন্যাভিমুখীন্ হইয়া তাঁহার এমন অবিচ্ছিন্ন প্রেম হইতেও আপনাকে ছিন্ন করিয়া ধূলি ধূসরিত হইতেছি, ক্ষত বিক্ষত হইতেছি, বেদনায় কাতর হইতেছি। এই বেদনা এবং লাঞ্ছনাও তাঁহার করুণা। তাঁহার না হইয়া যদি তাঁহার শান্তি প্রাপ্ত হইতে পারিতাম, তবে আর মিলনের কোন আশাই থাকিত না—বেদনা পাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাহারই ইচ্ছাকে সর্ব্বোপরি স্থান দিতে, তাঁহার অবিচ্ছিন্ন প্রেমের সহিত যোগ রাখিতে যত্ন করি। এই উৎসব যেন এই ভাবে বেদনা আঘাত দ্বারা উদ্বুদ্ধ করিতে করিতে আমাদিগকে তাঁহারই প্রেমানুগত ইচ্ছানুগত সন্তানরূপে, তাঁহার সেই অনন্ত মহোৎসবে তাঁহার সেই অনন্ত মিলনের দিকে জগৎবাসী সকলকে লইয়া যাইতে পারে; সেই উৎসবের সাহায্যকারী হইতে, পরস্পর পরস্পরকে ব্যক্তিগত ভাবে ও সামাজিক ভাবে সাহায্য করিয়া জগতে তাঁহারই অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে, তাঁহারই প্রেম প্রতিষ্ঠিত করিতে, তাঁহার প্রদত্ত প্রত্যেকের বিশেষত্বকে কার্য্যকারী করিতে পারে। তাঁহারই প্রেম আমাদিগকে জন্ম দিয়াছে। তাঁহার অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে আমাদের প্রত্যেকের প্রয়োজন আছে, তিনি সবাইকেই চান। আমরা সকলে সমগ্র ভাবে তাঁর অধীন হইয়া কৃতকৃতার্থ হই! আমাদের সংকল্পিত উৎসব শেষ হইতে চলিল, তাহার সংকল্পিত উৎসব আরম্ভ হইবার সূচনা হউক, এই আমাদের আশা ও প্রার্থনা।

উদ্যান সম্মিলনের উপাসনাতে শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশ স্থানাভাব বশতঃ এখানে প্রকাশ করিতে পারিলাম না। পরে প্রকাশ করিব।

সায়ংকালে মন্দিরে উৎসবের শেষ উপাসনা। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশ নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

উৎসব এক আনন্দের ব্যাপার। কিন্তু এবারকার মাঘোৎসবে আমরা পূর্ণমাত্রায় আনন্দ আস্বাদন করিবার অধিকার প্রাপ্ত হই নাই। আমাদিগের মধ্যে কেহ কেহ হৃদয়ে দারুণ শোক লইয়া উৎসবে যোগ দিয়াছেন, কেহ কেহ অসুস্থতা-নিবন্ধন পূর্ব্বাপর মন্দিরে উপস্থিত হইতে অসমর্থ হইয়াছেন, যাঁহাদিগের বাণী শুনিয়া ও সংস্পর্শে আসিয়া আমরা উপকৃত হইতাম, এমন কেহ কেহ দুরন্ত ব্যাধির কবলে পড়িয়া উৎসবক্ষেত্র হইতে দূরে রহিয়াছেন। বহু বৎসর ধরিয়া পূজার আয়োজনে যে পরিচিত মুখগুলি দেখিয়া আমাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধিত হইত, এবার তাহার অনেকগুলি নিকটে না পাইয়া আমাদিগের প্রাণ স্বতঃই ক্লিষ্ট হইয়াছে।

কিন্তু এই ক্লেশেরও সান্ত্বনা আছে। ব্রহ্মোৎসব একটা রাজসিক ক্রিয়া নহে। জনবল ও বাহিরের আড়ম্বর ইহার উপকরণ নয়। এই পুণ্যতীর্থে আমাদিগের প্রতিজনের পাপ তাপ দুঃখ দৈন্য শোক বেদনা বিধৌত হইবে, এই আশায় আমরা এই উৎসবের আয়োজন করি। ইহার উদ্দেশ্য দুইটী—একটী ব্যক্তিগত, একটী সামাজিক। প্রত্যেক উপাসক সংবৎসর ভরিয়া যে সংগ্রাম বহন করিলেন, যে শোকতাপে দগ্ধ হইলেন, যে অব্যক্ত ব্যথা বুকে লইয়া জীবনের কর্ত্তব্যগুলি করিয়া গেলেন, সমবিশ্বাসীদিগের সহিত ব্রহ্মচরণে বসিয়া সেগুলিকে আত্মার বলসঞ্চয়ের সহায় করিয়া তুলিবেন; অতীতে যত অশ্রু মোচন করিয়াছেন, ব্রহ্মযোগে তাহা হাসির মধ্যে আনন্দরশ্মি হইয়া ফুটিয়া উঠিবে; যেখানে প্রাণ নিবিড় অবসাদে নির্ব্বীর্য্য হইয়া পড়িয়াছিল, সেখানে করুণা-পবনস্পর্শে তাহা নবচেতনা লাভ করিবে; পাপের জন্য অকপট অনুশোচনা অন্তরকে শুদ্ধ করিয়া তথায় প্রতিজ্ঞার বল আনিয়া দিবে, অবিশ্বাসী বিশ্বাস পাইবে, অল্পবিশ্বাসীর বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হইবে, ভক্তের সঙ্গ পাইয়া অভক্তের হৃদয় ভক্তিরসে গলিয়া যাইবে—ব্রহ্মোৎসবের ইহাই প্রথম উদ্দেশ্য। ব্রহ্ম ব্রহ্মোৎসবের মধ্যবিন্দু; ব্রহ্মের সহিত মানবাত্মার সাক্ষাৎ অব্যবহিত অপরোক্ষ যোগ ব্রহ্মপূজার আদ্যক্ষর। যদি সারাবৎসর একাকী প্রযত্ন করিয়া আমরা এই যোগকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে না পারিয়া থাকি, তবে উৎসবের অনুকূল আবেষ্টনে এক পক্ষকাল যাপন করিয়া আমরা অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণেও তাঁহার নৈকট্য উপলব্ধি করিয়া কৃতার্থ হইব, ইহাই আমাদিগের আকিঞ্চন। কতবার আমাদিগের এই আকিঞ্চন পূর্ণ হইয়াছে। এবার হইয়াছে কি না, প্রতি জন নিজ নিজ অন্তরে সেই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিবেন।

ব্যক্তিগত জীবনে উৎসবের সাফল্যবিষয়ে একটী কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। যেমন প্রাকৃতিক জগতে, তেমনি অধ্যাত্ম-রাজ্যে কর্ম্মের সহিত ফলের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রহিয়াছে।

যাদৃশং বপতে বীজং তাদৃশং হরতে ফলং।
কল্যাণকারী কল্যাণং পাপকারী চ পাপকং।

"মানুষ যে প্রকার বীজ বপন করে, সেই প্রকার ফল আহরণ করে। কল্যাণকারী কল্যাণ ও পাপকারী পাপ (ফল) প্রাপ্ত হয়"—এই বুদ্ধবাণী সেকালে যেমন সত্য ছিল, আজও তেমনি সত্য। আমরা যদি সারা বৎসর সাধনবিষয়ে ঔদাস্য-পরবশ হইয়া চলিয়া থাকি, তবে উৎসবে আসিয়া সহসা আনন্দ-সলিলে ডুবিয়া যাইব, ইহা কিরূপে আশা করিতে পারি? সাড়ে

এগার মাস মনটা যেখানে পড়িয়া ছিল, উৎসবক্ষেত্রে দেহটাকে টানিয়া আনিয়া ফেলিলেও তাহা ঘুরিয়া ফিরিয়া সেইখানেই চলিয়া যাইবে। Conversion বা জীবনগতির পরিবর্ত্তন সহসা হইতে পারে বটে, কিন্তু পরিবর্ত্তনের পরে জীবনগতিকে নূতন পথে পরিচালিত করিতে হইলে চাই নিরন্তর কঠোর সাধন। এক মুহূর্ত্তে মানুষের মুখ ফিরিয়া যাইতে পারে, কিন্তু নূতন দিকে মুখ ফিরান, আর সেইদিকে অগ্রসর হওয়া, এক কথা নহে। মাঘোৎসবে কত পাপী নবজীবন পাইয়াছে—কিন্তু নবজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবার জন্য তাহাদিগকে অবিরাম সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। কত জন এই সংগ্রামের অভাবে পুনরায় অভ্যস্ত পাপের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। মাঘোৎসবের সাফল্য এই জন্যই বৎসরব্যাপী সাধনের উপরে নির্ভর করে। যিনি যে পরিমাণে প্রতিদিন ব্রহ্মচরণে আত্মসমাধান করিতে পারিয়াছেন, তিনি সেই পরিমাণে নামামৃত সম্ভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। প্রেমিক ব্যাকুল আত্মা উৎসবক্ষেত্র হইতে যে মধু আহরণ করিয়াছেন, স্থূলদৃষ্টি সুখলোলুপ ব্যক্তির পক্ষে তাহা দুষ্প্রাপ্য রহিয়া গিয়াছে। সংবৎসরের সাধন উৎসবকে মধুর করিয়া তুলিবে, উৎসবের মধুরতা সংবৎসরের সাধনকে বল দান করিবে, এইটী ব্যক্তিগত জীবনে উৎসবের সার্থকতা।

এই সার্থকতার কত উপাদান আমরা উৎসবে প্রাপ্ত হইয়াছি। তবে সেগুলি শ্রদ্ধার সহিত হৃদয়ে সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারিয়াছি কি না, তাহাই জিজ্ঞাস্য। জীবনীশক্তি নিস্তেজ হইয়া পড়িলে দেহ যেমন বাহির হইতে উপাদান আহরণ করিয়াও পুষ্টি লাভ করিতে পারে না, তেমনি শ্রদ্ধাহীন হৃদয়ের পক্ষে সরস শিক্ষাপ্রদ উপদেশও বৃথা হইয়া যায়। শ্রদ্ধেয় আচার্য্য তাই যুবকগণকে বলিয়াছিলেন, উপদেশ লিখিয়া রাখিবে এবং প্রতিদিন নির্জ্জন উপাসনার কালে শ্রদ্ধার সহিত তাহা পাঠ করিবে। সজন ও নির্জ্জন উপাসনা, সংযম ও ব্রহ্মচর্য্য, পাপের সহিত সংগ্রাম, সৎকার্য্যে উৎসাহ এবং আত্মবিসর্জ্জনে রতি, ইত্যাদি যে সকল সদুপদেশ বেদি হইতে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার এক একটী পালন করিলে যুবক বৃদ্ধ কাহার না কল্যাণ হয়? উপাসনাই ব্রহ্মোৎসবের প্রাণ; আচার্য্যগণ নানা ভাবে প্রধানতঃ ব্রহ্মার্পিতচিত্ত হইবার জন্য উপাসকগণকে উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। "চুপ ক'রে তাঁর কাছে বসে থাক", এই একটী কথায় সারা বৎসর ভরিয়া আধ্যাত্মিক জীবনের বল সঞ্চয় করা যায়। দুঃখী তাপী দীন দরিদ্র আমাদিগের সকলের জন্য কি আশার বাণীই উচ্চারিত হইয়াছে—There is guidance for each of us, and by lowly listening we shall hear the right word. আপনাকে নির্জ্জনে টানিয়া লইয়া যাও, প্রার্থনা করিয়া তাঁর বাণীর জন্য প্রতীক্ষা কর, দিবারাত্রি তাঁহাকে ডাক, এক মুহূর্ত্তও তাঁহাকে ভুলিও না—ইহা অপেক্ষা জীবনের সার কথা আমরা আর কি শুনিতে চাই? "সর্ব্বধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম প্রেম"—এই তত্ত্বের ব্যাখ্যা শুনিয়াও যদি আমাদের কঠিন হৃদয়ে একটু রসের সঞ্চার না হয়, তবে আর কিসে হইবে? "আমাকে তোমার হাতের পুতুল করিয়া রাখ", ইহা অপেক্ষা মহত্তর প্রার্থনাই বা কি আছে? তৎপরে, এই আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতার দেশে পরার্থপরতার ভাব উদ্দীপিত করিবার উদ্দেশ্যে আচার্য্য যখন উপদেশ দিলেন, "জগতের শোক ও পাপ হৃদয়ে ধারণ কর। তোমরা দেশের পাপরাশির অংশভাক্‌, কেন না, যে নির্ম্মল জ্ঞানের অভাবে পাপের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, সেই জ্ঞানের বিস্তারকল্পে তোমরা উদাসীন রহিয়াছ, নারীজাতির প্রতি, শিক্ষাবিস্তারের প্রতি তোমাদের যে দায়িত্ব আছে, তাহা তোমরা বহন করিতেছ না। তোমরা কি কেইনের ন্যায় বলিবে, Am I my brother's keeper? না, বল I am my brother's keeper; যাও, অবতরণ কর; জ্ঞান ও কর্ম্মের সাহায্যে ব্রহ্মাশ্রয় প্রাপ্ত হও"—এই উদ্দীপনাময়ী বিবৃতি শুনিয়া যদি আমাদিগের অসাড় প্রাণে চেতনার উদ্ভব না হইয়া থাকে, তবে উৎসব প্রকৃতই আমাদিগের পক্ষে নিরর্থক হইয়াছে। "ঈশ্বরের সহিত ও পরস্পরের সহিত ব্যক্তিগত সম্বন্ধ ধর্ম্মের কেন্দ্র"; "পরস্পরের নীরব সান্নিধ্য সাধনের বিষয়", 'ঈশ্বরের হস্তে আত্মসমর্পণ, পরস্পরের চরিত্রে অবগাহন, দুইটীই সাধনের লক্ষ্য, আত্মবিলোপ পরম সাধন—' এই রূপ এক একটী বাণীর অনুধ্যানে ও অনুসরণে সমগ্র জীবন কাটিয়া যাইতে পারে। সুতরাং আমাদিগকে বলিতেই হইবে, উৎসবের মধ্য দিয়া ব্যক্তিগত সাধনের উপাদান আমরা যথেষ্ট লাভ করিয়াছি।

কিন্তু মাঘোৎসব প্রধানতঃ একটী নৈমিত্তিক সমষ্টিগত সাধন। ব্রাহ্মসমাজ সমস্ত বৎসর সমবেত ভাবে ইহার আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক ব্যাপারগুলি কিরূপে নির্ব্বাহ করিয়াছেন, ইহা তাহা খতিয়ান করিয়া দেখিবার একটা অবসর। প্রকারান্তরে বলা যাইতে পারে, ইহা Stock-taking এর সময়। সামাজিক উপাসনা ব্রাহ্মসমাজের হৃৎপিণ্ড; ইহার জীবনীশক্তি সামাজিক উপাসনাতেই অন্তর্নিবিষ্ট রহিয়াছে। হৃৎপিণ্ড হইতে আধ্যাত্মিক শোণিত ইহার সর্ব্বাবয়বে সঞ্চারিত হইতেছে কি না, সপ্তাহের পর সপ্তাহ তাহা তত সহজে ধরা পড়ে না; কিন্তু বার্ষিক উৎসবে তাহা বৃহদাকারে চক্ষুর সম্মুখে দেদীপ্যমান হইয়া উঠে। ব্রাহ্মসমাজ কক্ষচ্যুত হইতেছে কি না, ইহার গতি কোন্‌ দিকে পরাবর্ত্তিত হইতেছে, মাঘোৎসব তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেয়।

আমরা বলিয়াছি, ইহার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সামাজিক, অর্থাৎ ইহা সমষ্টিগত ভাবে সমাজদেহে আধ্যাত্মিক বল সঞ্চারিত করিবে, বাহির হইতে আহরিত বিষাক্ত রোগবীজ নিষ্কাশিত করিয়া উহার স্বাস্থ্যরক্ষার সহায় হইবে, বিচ্ছেদপ্রাপ্তমুখ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির সংশ্লেষ ও সম্মিলন ও সহকর্ম্মিতা দৃঢ়তর করিয়া তুলিবে, উৎসবের ইহাই অন্যতম লক্ষ্য। যদি জীবদেহের এমন একটা অবস্থা ঘটে, যে, চক্ষু যে খাদ্য দর্শন করিতেছে, হস্ত তাহা তুলিতে কিংবা বদন তাহা গ্রহণ করিতে পারিতেছে না, তবে বলিতে হইবে, এই দেহ অস্বাভাবিক দশায় পতিত হইয়াছে, ইহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে সহযোগিতা বা co-ordination and co-operation নাই। তেমনি যদি দেখিতে পাই, ব্রাহ্মসমাজের অনেকে উৎসবের ব্রহ্মোপাসনাকে গৌণ স্থানে রাখিয়া ইহার বার্ষিক সভা, আনন্দবাজার, উদ্যানসম্মিলন প্রভৃতি বহিরঙ্গকেই মুখ্য কর্ম্ম বলিয়া বরণ করিতেছে, তবে

বলিতে হইবে, আমাদিগের নিবিষ্টচিত্তে ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে, যদি এই অবস্থা উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলে, তবে ব্রাহ্মসমাজের লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবার ভয় আছে কি না। এক শ্রেণীর লোক ভগবদারাধনার স্থলে উপস্থিত থাকে, আর এক শ্রেণীর লোক বৈষয়িক ব্যাপার পরিচালনা করে, এ প্রকার শ্রমবিভাগ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে কল্যাণকর নহে। পুরোহিত দেবার্চ্চনা করিতেছেন, গৃহপতি ও অন্যান্য সকলে বিষয়ান্তরে ব্যাপৃত রহিয়াছেন, এই ব্যবস্থা বদ্ধমূল হইয়া প্রাচীন সমাজকে জরাজীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজ এক দল পুরোহিত সৃষ্টি করিবার বিরোধী, ইহা ধর্ম্মাচার্য্যগণকে বিশেষ গৌরবের আসন দান করিতেও প্রস্তুত নহে; ইহা ঘোষণা করিয়া আসিতেছে, প্রত্যেক ব্রাহ্মই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারক। আমরা laymen ও clergymen এর ভেদ স্বীকার করি না। কিন্তু সামাজিক উপাসনার প্রতি বহু জনের অনুরাগবিহীনতাবশতঃ যদি ধীরে ধীরে অলক্ষিতে একটা নূতন শ্রেণীবিভাগ গড়িয়া উঠে, তবে সেজন্য ব্রাহ্মসাধারণই দায়ী হইবেন। ব্রাহ্মসমাজ একটী পরিবার; পরিবারের সকলে যোগ না দিলে যেমন পারিবারিক উৎসব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় না, তেমনি ব্রাহ্ম নরনারী সকলে উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত না থাকিলে মাঘোৎসবও অপূর্ণ থাকিয়া যায়। উৎসবের সামাজিক প্রয়োজন সিদ্ধির পক্ষে দুই চার দশ জনের ঔদাস্যও একটা গুরুতর প্রতিবন্ধক। তার পরে, একটা সাত্ত্বিক অনুষ্ঠান কিরূপে কালক্রমে রাজসিক ব্যাপারে পরিণত হয়, এ দেশে তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে। আমাদিগের উৎসবের সম্মুখেও কি সেই বিপদ বিদ্যমান নাই? আছে। যদি থাকে, তবে তাহা নিরাকরণের উপায় ব্রাহ্মসাধারণের ঐকান্তিক যত্ন ও অনুরাগ। এই যত্ন ও অনুরাগকে অপরিম্লান রাখিবার জন্য মাঘোৎসবের সামাজিক দিকটা উজ্জ্বলরূপে নয়নসমক্ষে রাখা প্রয়োজন।

আর একটা কথা। অভিব্যক্তিবাদ বলিয়া দিতেছে, জীবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অনুশীলনের অভাবে লুপ্ত হয়, এবং এইরূপে ক্রমে ক্রমে উহার প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। ব্রাহ্মসমাজের সমবেত আধ্যাত্মিক অনুশীলন যদি দিন দিন মন্দীভূত হইতে থাকে, তবে কালে ইহার প্রকৃতিও বদলাইয়া যাইবে, এবং বৈশিষ্ট্যের অভাবে হয় ইহা প্রাচীন সমাজের দেহে লয় পাইবে, না হয় শুধু একটা সুমার্জ্জিত ভব্য সংস্কারপ্রয়াসী দল রূপে বর্ত্তমান থাকিবে। ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃতি কি, তাহা ব্রাহ্মগণের নিয়ত অনুধ্যান করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মসমাজ একটা সংস্কারকের দল, বা সুরুচিসম্পন্ন সাহিত্যসভা, বা আহারবিহারবেশভূষায় অক্ষুন্ন স্বাধীনতার পক্ষপাতী নবালোকদীপ্ত শিক্ষিত পরিবারবৃন্দ, কিংবা বৈষয়িকোন্নতিলোলুপ সঙ্ঘসমুত্থানমূলক প্রতিষ্ঠান, অথবা গুপ্ত রাজনৈতিক সমিতি নহে; সংস্কার, সাহিত্য, সভ্যতা, বিষয়কর্ম্ম, রাজনীতি, কিছুই ইহার চক্ষুতে হীন নয়, কিন্তু ইহা সর্ব্বাগ্রে ও সর্ব্বোপরি একটী উপাসকমণ্ডলী, ব্যক্তিগত ও সামাজিক উপাসনা ইহার অস্থি মজ্জা প্রাণ। মাঘোৎসবের মধ্যে অনুভব করিয়াছি, ইহার প্রকৃতিতে বল সঞ্চার করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে।

এবারকার মাঘোৎসব আমাদিগকে এই শিক্ষা দিয়া গেল "তোমরা ব্যক্তিগত ও সামাজিক ভাবে সাধননিষ্ঠ হও।" আমরা "সত্য শিব সুন্দরের" উপাসক। সত্যের সাধন ও জ্ঞানের সাধন একই কথা। আমাদিগকে জগত্তত্ত্ব ও আত্মতত্ত্ব শ্রদ্ধার সহিত অনুশীলন করিতে হইবে। যাহা স্থূল তাহাকে সূক্ষ্ম ও যাহা সূক্ষ্ম তাহাকে স্থূল বলিয়া ভ্রম করিলে ধর্ম্মোন্নতির ব্যাঘাত ঘটে। ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে নির্ম্মল জ্ঞান না থাকিলে কেহই ধর্ম্মসাধনদ্বারা সুফল লাভ করিতে পারে না। ব্রাহ্মসমাজ চিরকাল জ্ঞানচর্চ্চার সমাদর করিয়া আসিতেছে। ইহার প্রতিষ্ঠাতা রামমোহন হইতে আরম্ভ করিয়া দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, শিবনাথ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ সকলেই জ্ঞানের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। আমরা জ্ঞানকে কদাপি ধর্ম্মের বিরোধী বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি না। কে না জানে এ দেশে ভক্তিধর্ম্ম বিশুদ্ধ জ্ঞানের অভাবে কি অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছে? সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত প্রভৃতি সকল বিদ্যাকেই আমাদিগের ধর্ম্মসাধনের সহায় করিয়া লইতে হইবে।

শিবের বা মঙ্গলের সাধন আমাদিগের দৈনন্দিন জীবনের ছোট বড় সমুদায় ঘটনায় সাধনীয়। আমরা অন্নবস্ত্র গৃহপরিবার সকলই মঙ্গলময় বিধাতার হস্ত হইতে প্রাপ্ত হইতেছি। আমাদিগের সুখ দুঃখ সম্পদ বিপদ হর্ষ বিষাদ বিচ্ছেদ মিলন শোক পরিতাপ, সর্ব্বাবস্থায় তিনি আমাদিগের সঙ্গে আছেন; সমস্ত দশাবিপর্য্যয়ে তিনি স্বয়ং হাত ধরিয়া আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া চলিয়াছেন; আমরা যেখানে যাই যেখানে থাকি, তিনি নিজে আমাদিগের জন্য সব ব্যবস্থা করিতেছেন; যখন মৃত্যুর ঘন অন্ধকার আমাদিগের গৃহে নিপতিত হয়, তখন সান্ত্বনাকারী রূপে হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়া তিনি আপনি আমাদিগকে তুলিয়া ধরেন; তিনি আপনি কঠিন আঘাত করেন, আপনি হাত বুলাইয়া ক্ষত আরোগ্য করিয়া দেন।—এগুলি জীবনের প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে অনুভব করিবার বিষয়। ঈশ্বর মঙ্গলময় অথচ জগতে দুঃখ, মৃত্যু ও পাপ বিদ্যমান কেন?—এই সমস্যার মীমাংসা কোনও দর্শন করিতে পারে নাই। ইহার মীমাংসা একা বিশ্বাসী ভক্তের অন্তর হইতেই নিঃসৃত হইয়াছে। জোবের উপন্যাস কোনও মহাকবির রচনা হইতে পারে, কিন্তু বিশ্বাসী সন্তান মহাদুঃখে প্রপীড়িত হইয়াও জোবের ন্যায় বলিতে পারেন, "যদিও তিনি আমাকে বধ করেন, তথাপি আমি তাঁহাতেই বিশ্বাস স্থাপন করিব।" এটা কবিকল্পনা নহে। আমাদিগের মধ্যেই এ প্রকার লোক বর্ত্তমান আছেন। ঈশ্বর যাহাকে যত ভালবাসেন, তাহাকে তত শাসন করেন। যদি আমরা শুধু সুখ সম্পদে তাঁহাকে মঙ্গলময় বলিয়া স্বীকার করি, আর দুঃখ দৈন্য শোক বেদনায় তাঁহার প্রেমমুখ দেখিতে না পাই, তবে আমাদিগের সাধনের কোনই মূল্য নাই। ইহা এক জীবনব্যাপী সাধন। ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল ঘটনার মধ্যে শিবস্বরূপকে উপলব্ধি করিতে হবে।

সুন্দরের সাধন বিষয়ে আমি নিজে কিছু বলিতে অক্ষম। এস্থলে প্লেটোর একটী বিখ্যাত নিবন্ধ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইতেছে। প্লেটো সুন্দরের ও প্রেমের সাধনকে এক সূত্রে গ্রথিত করিয়াছেন। "যে ব্যক্তি প্রেমতত্ত্বে এই পর্য্যন্ত শিক্ষালাভ

করিয়াছে, এবং যথাবিধি ও যথাক্রমে সুন্দরকে দেখিতে অভ্যস্ত হইয়াছে, সে সাধন-সীমায় সন্নিহিত হইয়া সহসা এক অপূর্ব্ব সুন্দর সত্তা দেখিতে পায়—সে সত্তা নিত্য, অপক্ষয়-বর্জ্জিত; তাহার হ্রাস নাই, বৃদ্ধি নাই। সে সত্তা যে এক দিক হইতে দেখিতে সুন্দর, অপর দিক হইতে দেখিতে কুৎসিত, এক কালে এক স্থানে, এক সম্পর্কে সুন্দর, অন্য কালে অন্য স্থলে, অন্য সম্পর্কে কুৎসিত, কিংবা হস্ত, পদ, মুখ বা অন্যান্য প্রত্যঙ্গের মত, বাক্য, বোধ বা অপর বস্তুর মত, জীব, স্বর্গ বা পৃথিবীর কোনও পদার্থের মত; তাহা নহে—উহা শুধু সুন্দর, পরম সুন্দর, নিত্য, স্বতন্ত্র, সদৈকরূপ, দ্বৈধভাবরহিত, হ্রাসবৃদ্ধি-বর্জ্জিত, অপরিবর্ত্তনীয়, জগতের মধ্যে নিত্য প্রবর্দ্ধমান ও বিনশ্বর সুন্দর পদার্থের মধ্যে উহা অনুস্যূত রহিয়াছে। * * * * প্রেমপথে যাত্রার প্রকৃষ্ট প্রণালী এই, যে পৃথিবীর সুন্দর পদার্থসমূহ উর্দ্ধলোকে ঐ পরম সুন্দরে উপনীত হইবার সোপানস্বরূপ হইবে; মানুষ একটী হইতে দুইটী, দুইটী হইতে তিনটী, এইরূপে সমস্ত বস্তুকে প্রীতি করিতে শিখিবে; এবং ক্রমে সুরূপ হইতে সুকর্ম্ম, সুকর্ম্ম হইতে সুমত, এবং সুমত হইতে পরম সুন্দরকে অবগত হইবে; সে অবশেষে জানিতে পারিবে, যে সৌন্দর্য্যের প্রকৃত স্বরূপ কি।" সোক্রাটিস, ১ম খণ্ড, ৪৮৫-৬ পৃঃ।

প্লেটো সুকর্ম্ম ও সুমত সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, আমি তৎপ্রতি আপনাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এস্থলে theory and practice, জ্ঞান ও কর্ম্মের মিলন সূচিত হইয়াছে। ১১ই মাঘ প্রাতঃকালে আচার্য্য যোগবাশিষ্ঠ হইতে যে শ্লোকটী উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহাতেও এই মিলনের কথা বলা হইয়াছে।

উভাভ্যামেব পক্ষাভ্যাম্ যথা খে পক্ষিণো গতিঃ।
তথৈব জ্ঞানকর্ম্মাভ্যাং জায়তে ব্রহ্মণঃ পদম্॥

"পক্ষী যেমন দুইখানি পক্ষের সাহায্যে আকাশে গমন করে, তেমনি সাধক জ্ঞান ও কর্ম্মের দ্বারা ব্রহ্মের আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।" উপনিষদেও ব্রহ্মপ্রাপ্তির theoretical and practical, তাত্ত্বিক ও ব্যাবহারিক উপায় বিষয়ে ভূরি ভূরি উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

আমরা সাধনে দুর্ব্বল। কিন্তু আমাদিগের ন্যায় দুর্ব্বল অধিকারীর জন্যও শাস্ত্রে এমন কত উপদেশ আছে, যাহা পালন করা আমাদিগেরও সাধ্যের অতীত নহে। তবে চাই সেজন্য অন্তরের আকুলতা ও ঐকান্তিক অভ্যাস। ভক্তি ধর্ম্মসাধনের চরম ফল। ভাগবতে (৭।৫।২৩, ২৪) ভক্তির নয়টী লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই লক্ষণগুলীকে ভক্তির সাধন বলিয়াও গ্রহণ করা যাইতে পারে। আমরা নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিব, যে এই সাধনপথে প্রবেশ করা আমাদিগের প্রত্যেকের পক্ষেই সম্ভবপর। প্রতিদিন ভগবানের নাম, গুণ ও মহিমা শ্রবণ, কীর্ত্তন এবং মনন; তাঁহার পুত্র কন্যার সেবাতে আত্মনিয়োগ, তাঁহার উপাসনা ও বন্দনা; তাঁহার প্রীতির জন্য তাঁহারই অনুগত ভৃত্যরূপে সকল কর্ম্ম-সম্পাদন,' তাঁহাতে ঐকান্তিক নির্ভর; এবং তিনি অন্নদাতা, এ দেহের ভরণ পোষণের ভার তিনি স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন, এই বিশ্বাস—এই নয়টী সাধন কাহার পক্ষে একান্ত দুরূহ?

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনং
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥

ভগবানের নামগুণ লীলাদি শ্রবণ, কীর্ত্তন, ও পুনঃ পুনঃ চিন্তা; তাঁহার পরিচর্য্যা, অর্চ্চন, বন্দন; তাঁহাতে কর্ম্মার্পণ, বিশ্বাস এবং দেহসমর্পণ; এই নবলক্ষণবিশিষ্ট ভক্তি যদি ভগবানে সমর্পণপূর্ব্বক অনুষ্ঠান করা যায়; আমার বিবেচনায় তাহাই উত্তম অধ্যয়ন।

আমরা যদি নিষ্ঠার সহিত ভক্তির সাধন গ্রহণ করি, তবেই এবারের মাঘোৎসব আমাদিগের পক্ষে সার্থক হইবে।

মঙ্গলময়ের কৃপায় আমরা যে, যত অসম্পূর্ণ ভাবেই হউক না কেন, উৎসবের বিবরণ প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলাম, তাহার জন্য কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁহাকে বার বার প্রণাম করিয়া আমাদের কর্ত্তব্য শেষ করিতেছি। তাঁহারই অপার করুণায় উৎসবের ফল সকল জীবনে স্থায়ী হউক, এই আমাদের প্রার্থনা।

ব্রাহ্মসমাজ

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যেঃ—

বিগত ১৮ই মার্চ্চ পরলোকগত গোবিন্দচন্দ্র মজুমদারের দ্বিতীয়া কন্যা হিরণ্ময়ী পরলোক গমন করিয়াছেন।

বিগত ২১শে মার্চ্চ কলিকাতা নগরীতে বাবু বটকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় দীর্ঘকাল রোগশয্যায় শায়িত থাকিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি বিশ্বাসী লোক ছিলেন এবং নানাপ্রকারে ব্রাহ্মসমাজের সেবাও করিয়াছেন। বিগত ২৯শে মার্চ্চ তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিতগ ২০শে মার্চ্চ কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ দত্তের পত্নী চপলাবালা পরলোক গমন করিয়াছেন।

বিগত ২৭শে মার্চ্চ পরলোকগত প্রমীলা চট্টোপাধ্যায়ের আদ্য-শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য এবং পতি শ্রীযুক্ত লালমোহন চট্টোপাধ্যায় জীবনী পাঠ ও প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে তাহার স্মৃতিরক্ষার্থে সাধনাশ্রমের কার্য্যের জন্য ১০০০৲ এক হাজার টাকার একটি স্থায়ী ফণ্ড স্থাপিত হইবে। এতদ্ব্যতীত বিবিধ প্রতিষ্ঠানে আরও ১০০৲ শত টাকা প্রদত্ত হইয়াছে। কন্যাও নানা প্রতিষ্ঠানে দান করিয়াছেন।

বিগত ২০শে মার্চ্চ বাগনানে পরলোকগত সুধীরচন্দ্র রায়ের আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন দাস ও শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মল্লিক আচার্য্যের কার্য্য, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস শাস্ত্রপাঠ এবং পিতা শ্রীযুক্ত রসিকলাল রায় ও পত্নী প্রার্থনা করেন। কনিষ্ঠা ভগিনী সুজলা সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করেন। এই উপলক্ষে রসিকবাবু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ২৲ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের ২৲, ও বাগনান ব্রাহ্মসমাজে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চির শান্তিতে রাখুন ও আত্মীয়স্বজনদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

দান—শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী বসু ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ তাঁহাদের পরলোকগত পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে মিশন ফণ্ডে ৩৲ দান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র বসুর পরলোকগতা পত্নী ইন্দুমতীর বসুর বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে পুত্র কন্যাগণ নিম্নলিখিতরূপে দান করিয়াছেন:—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মিশন ফণ্ড—৫৲, সাধারণ ফণ্ড ১৲, দুঃস্থব্রাহ্মপরিবার ফণ্ড ২৲। এতদ্ব্যতীত অন্যতমা কন্যা শ্রীমতী তটিনীবালা চট্টোপাধ্যায় অনাথ আশ্রমে ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন।

এ সকল দান সার্থক হউক ও পরলোকগত আত্মাসকল চির শান্তি লাভ করুন।

মফঃস্বলে মাঘোৎসব—বরিশাল—মাঘোৎসব যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী এবার অসুস্থ থাকায় উৎসবের কোন কার্য্য করিতে পারেন নাই; তাঁহার অভাব সকলেই বিশেষ ভাবে অনুভব করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস উৎসবের কার্য্যভার কিছু পরিমাণে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিগত ৩০শে পৌষ হইতে ৫ই মাঘ পর্য্যন্ত বিভিন্ন পল্লীতে ঊষা-কীর্ত্তন হয়, শ্রীযুক্ত রাজকুমার ঘোষ কীর্ত্তন পরিচালনা করেন। ৫ই মাঘ সায়ংকালে উৎসবের উদ্বোধন, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উপাসনা করেন। ৬ই মাঘ প্রাতে মহর্ষির স্মৃতিকল্পে উপাসনা, শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। সায়ংকালে মহর্ষির স্মৃতি সভা; শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে, শ্রীযুক্ত রসরঞ্জন সেন এবং শ্রীযুক্ত শ্রীচরণ সেন বক্তৃতা করেন। ৭ই মাঘ প্রাতে যুবকসম্মিলনীর উৎসব—প্রত্যুষে ঊষা-কীর্ত্তন লইয়া যুবক বন্ধুগণ মন্দিরে গমন করিলে উপাসনা হয়, আচার্য্য শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস। উপাসনান্তে সম্পাদক রিপোর্ট পাঠ করেন; প্রীতি-জলযোগে উৎসব শেষ হয়। সায়ংকালে ব্রাহ্মবন্ধু সভার উৎসব হয়। সতীশবাবু সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে, সঙ্গীত, প্রার্থনা ও রিপোর্ট পাঠান্তে, শ্রীযুক্ত তরণীকান্ত সেন, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার দাস প্রভৃতি কিছু কিছু বলেন; সভাপতির মন্তব্যান্তে কার্য্য শেষ হয়। ৮ই মাঘ প্রাতে পাঠ ও প্রার্থনা, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র সেন উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করেন। অপরাহ্নে মন্দির-প্রাঙ্গণে ছাত্রসমাজের উৎসব; শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কুমারী শান্তিসুধা ঘোষ ও বাবু সুশীলকুমার বসু প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং বাবু সুধীরকুমার দত্ত ইংরাজীতে কিছু বলেন; তৎপরে শ্রীযুক্ত শশিকান্ত গুপ্ত, শ্রীযুক্ত রসরঞ্জন সেন এবং সভাপতি মহাশয় বক্তৃতা করেন। সায়ংকালে, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "ভারতীয় যুবকের আশা ও সাধনা", এই বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন। ৯ই মাঘ প্রাতে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত রাজকুমার ঘোষ। অপরাহ্নে ব্রাহ্মিকা-সমাজের উৎসব। শ্রীমতী কুসুমকুমারী দাস আচার্য্যের কার্য্য ও শ্রীমতী স্নেহলতা দাস ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করেন। অপরাহ্নে শ্মশানক্ষেত্র হইতে নগর-সংকীর্ত্তন বাহির হইয়া বিভিন্ন রাস্তা ঘুরিয়া মন্দিরে উপস্থিত হইলে, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস উপাসনা করেন। ১০ই মাঘ প্রাতে, আচার্য্য নবদ্বীপচন্দ্রের স্মরণার্থ উপাসনা, শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস উপাসনা করেন। অপরাহ্নে কাঙ্গালী বিদায়। সায়ংকালের উপাসনায় শ্রীযুক্ত রাজকুমার ঘোষ আচার্য্যের কার্য্য করেন। ১১ই মাঘ উৎসবের বিশেষ দিন, প্রত্যুষে কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়া ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন চলিলে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন; ১০ ঘটিকায় উপাসনাদি শেষ হয়। পুনরায় অপরাহ্ণ ২ ঘটিকায় উপাসনা হয়, আচার্য্য শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস। ৪ ঘটিকার সময় শাস্ত্রপাঠ, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস এবং শ্রীযুক্ত রসরঞ্জন সেন পাঠ করেন। তৎপরে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন হইলে সায়ংকালীন উপাসনা হয়, আচার্য্য শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। উপাসনান্তে কীর্ত্তন হইয়া রাত্রি ৯টায় উৎসব শেষ হয়। ১২ই মাঘ প্রাতঃকালে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন দাস। অপরাহ্নে বালক বালিকা সম্মিলন। মিঃ এস্ কে হালদার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত রসরঞ্জন সেন ও শ্রীযুক্ত শরৎকুমার দাস উপদেশচ্ছলে কিছু কিছু বলিলে, সভাপতি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য প্রকাশ করেন। বালক বালিকাদিগকে মিষ্টান্ন বিতরণ করা হইলে, এই সুন্দর উৎসব শেষ হয়। সায়াহ্নে শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস "সমস্যা ও সাধন" বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন। ১৩ই মাঘ পাঠ ও প্রার্থনা হয়। শ্রীযুক্ত তরণীকান্ত সেন এবং শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বসু উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করেন। সায়ংকালে সঙ্কীর্ত্তন ও উপাসনা; আচার্য্য শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস। আজ উৎসবের শেষ দিন, বন্ধুগণের পরস্পর আলিঙ্গন ও সম্ভাষণান্তে প্রীতিভোজনে উৎসব শেষ হয়। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী দীর্ঘকাল রোগশয্যায় শায়িত আছেন, তবু রুগ্ন ও ভগ্নদেহ লইয়া অতি কষ্টে ১১ই মাঘ মনের উৎসাহে সকাল বেলায় উপাসনায় যোগ দান, ও বালক বালিকা সম্মিলনে আশীর্ব্বাদ ও আনন্দ প্রকাশ এবং শেষদিন সুহৃদ্ সম্মিলনে তাঁহার আত্মনিবেদন ও প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতে উপস্থিত হইয়া সকলের আনন্দ ও প্রীতি বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন দাস অসুস্থতা নিবন্ধন বিশেষ কিছু কার্য্য করিতে পারেন নাই; কেবল ১২ই মাঘ প্রাতে উপাসনা করিয়াছেন।

ধুবড়ী—৬ই মাঘ প্রাতে উৎসবের উদ্বোধন উপলক্ষে শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার চক্রবর্ত্তী উপাসনা করেন। সন্ধ্যায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিসভায় শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দে সভাপতির কার্য্য এবং শ্রীযুক্ত যোগজীবন পাল ও শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র সেন বক্তৃতা করেন। ৭ই মাঘ প্রাতে শ্রীযুক্ত যোগজীবন পালের বাড়ীতে পারিবারিক উপাসনায় শ্রীযুক্ত মতিলাল সরকার আচার্য্যের কার্য্য করেন। সন্ধ্যায় মহিলাদের উৎসবে অনেক ভদ্র মহিলা যোগদান করিয়াছিলেন; মিসেস্ সরলা দাস, মিসেস্ ভবতারিণী নাগ ও মিস্ বিশোকা নাগ লিখিত উপাসনা, উপদেশ ও প্রার্থনা পাঠ করিয়াছিলেন। ৮ই মাঘ প্রাতে শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র সেনের বাড়ীতে পারিবারিক উপাসনায়, শ্রীযুক্ত যোগজীবন পাল উপাসনা করেন। সন্ধ্যায় ছাত্র সমাজের উৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দাস সভাপতির কার্য্য এবং শ্রীযুক্ত যোগজীবন পাল, বিশ্বরঞ্জন দাস গুপ্ত ও অমলেন্দু সরকার বক্তৃতা করেন। ৯ই মাঘ প্রাতে মন্দিরে উপাসনা হয়, শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র রায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। অপরাহ্নে নগর সংকীর্ত্তনের পর রাত্রে মন্দিরে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। ১০ই মাঘ প্রাতে মন্দিরে স্বর্গীয় পণ্ডিত নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয়ের স্মৃতি উপলক্ষে উপাসনা হয়, আচার্য্য রায় সাহেব শরৎচন্দ্র দাস। সন্ধ্যায় মন্দিরে উপাসনায় শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দাস আচার্য্যের কাজ করেন। ১১ই মাঘ সমস্ত-দিনব্যাপী উৎসব। ব্রাহ্ম যুবকগণ প্রায় সমস্ত রাত্রি জাগিয়া মন্দির সাজান। রাত্রি প্রভাতের পূর্ব্বেই নগরের দ্বারে দ্বারে ভোর কীর্ত্তন করিয়া মন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে প্রাতে ৭ঘটিকার সময় উপাসনা হয়, আচার্য্য শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার চক্রবর্ত্তী। শ্রীযুক্তা বসন্তকুমারী মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত রায় সাহেব শরৎচন্দ্র দাস প্রার্থনা করেন। উপাসনার পর প্রমত্ত ভাবে সংগীত ও কীর্ত্তন হয়। তৎপর কেহ কেহ মন্দিরে থাকিয়া পাঠ ও ধ্যান করেন। মধ্যাহ্নে শরৎবাবুর বাড়ীতে প্রীতিভোজন। ১টার সময় উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত মতিলাল সরকার। প্রমত্ত কীর্ত্তন সঙ্গীত প্রার্থনা ও পাঠ হইলে অপরাহ্ণ ৩টার সময় ভিখারী-বিদায়; তৎপর কীর্ত্তনান্তে সন্ধ্যায় উপাসনা হয়। রায় সাহেব শরৎচন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করেন। ১২ই মাঘ প্রাতে শ্রীযুক্তা বসন্তকুমারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ার বাড়ীতে

পারিবারিক উপাসনা; শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী আচার্য্যের কার্য্য করেন; শ্রীযুক্তা বসন্তকুমারী মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার চক্রবর্ত্তী প্রার্থনা করেন। অপরাহ্ণ ৩টার সময় বালক বালিকা সম্মিলন; প্রায় ৪০০ বালক বালিকা সম্মিলিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকৃষ্ণ বাগচী সভাপতির কার্য্য, বালক বালিকাগণ আবৃত্তি, এবং শ্রীযুক্ত বিশ্বরঞ্জন দাস গুপ্ত ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দাস উপদেশ প্রদান করেন। তৎপর বালকবালিকাদের মিষ্টি বিতরণ করা হইয়াছিল। সন্ধ্যায় মন্দিরে সঙ্গত সভার উৎসবে শ্রীযুক্ত গৌরীনাথ চক্রবর্ত্তী শাস্ত্রী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দাস, কামিনীকুমার চক্রবর্ত্তী ও শরৎচন্দ্র দাস প্রভৃতি ধর্ম্মসাধন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। ১৩ই মাঘ প্রাতে শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা দাসের বাড়ী পারিবারিক উপাসনায় শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দাস উপাসনা করেন। সন্ধ্যায় মন্দিরের উপাসনায়ও জ্যোতিরিন্দ্র বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন। উপাসনার পর প্রীতিভোজন হয়। ব্রাহ্মযুবকগণ বিশেষ উৎসাহের সহিত সকল কার্য্যে সাহায্য করিয়া উৎসবানন্দে মাতিয়াছিলেন।

কার্শিয়াং:—গত ৯ই মাঘ, হইতে ১৬ই মাঘ পর্য্যন্ত স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে সপ্ত-নবতিতম মাঘোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। স্থানীয় বহু গণ্য মান্য লোক উৎসবে যোগ দিয়াছেন। উৎসবের শেষ দিন সুহৃৎ-সম্মিলন ও প্রীতি ভোজন অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইয়াছিল। বহু স্থানীয় ভদ্রলোক এই প্রীতি-ভোজনে যোগদান করিয়াছিলেন।

বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ—বিগত ৬ই ফেব্রুয়ারী অপরাহ্ণে ব্রহ্মমন্দিরে বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী সভাপতি-রূপে সঙ্গীত প্রার্থনা এবং সমাজের আদর্শ ও কার্য্য বিষয়ে বিশেষ ভাবে মন্তব্য প্রকাশ করেন। সভায় বার্ষিক কার্য্যের বিবরণ পঠিত হইলে তাহা গৃহীত হয়। তৎপরে আগামী বৎসরের জন্য মনোমোহন বাবু আচার্য্য এবং সত্যানন্দ বাবু, মন্মথ বাবু, সতীশ বাবু, রাজকুমার বাবু, ললিতকুমার বসু সহকারী আচার্য্য, মন্মথ বাবু সম্পাদক এবং বাবু রসিকলাল সেন, জ্ঞানানন্দ দাস সহকারী সম্পাদক এবং বাবু বিনয়ভূষণ গুপ্ত ধনাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। কর্ম্মচারিগণ ব্যতীত ৯ জন সভ্য লইয়া কার্য্য নির্ব্বাহক সভা গঠিত হয়।

বিগত ১৫ই পৌষ বরিশালস্থ সর্ব্বানন্দ ভবনে বাবু ব্রহ্মানন্দ দাসের শিশু কন্যার (৪ বৎসর ৮ মাস বয়সে) নামকরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। কন্যার নাম সুপ্রিয়া রাখা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস আচার্য্যের কার্য্য এবং মনোমোহন বাবু প্রার্থনা করেন। উপাসনান্তে সমাজস্থ সকলে ও সহরস্থ বিশেষ বন্ধুগণ প্রীতি-ভোজন করেন। এই অনুষ্ঠানে স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজে ২ টাকা প্রদত্ত হয়।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী পূর্ব্ব হইতে একটু ভাল হইলেও কোন বিশেষ কার্য্য করিবার শক্তি এখনো লাভ করিতে পারিতেছেন না। সামান্য সামান্য কার্য্যে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু তাহাও সম্ভব হইতেছে না।

শুভবিবাহ—বিগত ১০ই মার্চ্চ কলিকাতা নগরীতে পরলোকগত বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তীর কনিষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া সুচরিতা ও পরলোকগত ঈশানচন্দ্র সেনের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান কুমুদকান্তের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ১০ই মার্চ্চ কলিকাতা নগরীতে পরলোকগত যাত্রামোহন সেনের কনিষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া সুব্রতা ও শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার চক্রবর্ত্তীর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান সুধীরকুমারের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ১২ই মার্চ্চ কলিকাতা নগরীতে পরলোকগত আদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া শান্তিলতা ও চট্টগ্রামনিবাসী পরলোকগত রামকানাই দের পুত্র শ্রীমান অন্নদাচরণের শুভবিবাহ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন।

প্রেমময় পিতা নব দম্পতিদিগকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

উৎসব—গত ১৮ই মার্চ্চ কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজের চতুঃষষ্টিতম উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। প্রাতে কীর্ত্তন ও উপাসনা; আচার্য্য শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস। অপরাহ্ণে নগর কীর্ত্তন ও পরে ৬ ঘটিকায় শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল "ভক্তির পথ" বিষয়ে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। কলিকাতা হইতে বহু ব্রাহ্ম এই উৎসবে দুই বেলা যোগদান করিয়াছিলেন। নগর-কীর্ত্তনের দলকে অনেক হিন্দু বাড়ীতে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। এবৎসর উপাসনা ও বক্তৃতায় বহু স্থানীয় লোক যোগদান করিয়াছিলেন।

নিম্নলিখিত প্রণালীতে নারায়ণগঞ্জ ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চত্রিংশত্তম সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে:—

৪ঠা মার্চ্চ উৎসবের উদ্বোধন। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন আচার্য্যের কার্য্য করেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র তাঁহার স্বাভাবিক মধুর কণ্ঠে সঙ্গীত করিয়া উপাসনার সাহায্য করেন। ৫ই মার্চ্চ প্রাতে নগরের দ্বারে দ্বারে উষাকীর্ত্তন করিয়া সকলে মন্দিরে সমবেত হইলে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত উপাসনা করেন। অপরাহ্ণে মন্দিরে কীর্ত্তনের পর একটী সঙ্গীত হইলে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত "সাধন ও সাধুপুরুষ" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ৬ই মার্চ্চ প্রাতে একটী কীর্ত্তনের পর উপাসনা আরম্ভ হয়, অমৃতবাবুই আচার্য্যের কার্য্য করেন; তৎপর প্রীতিভোজন হইয়া এই বেলার কার্য্য শেষ হয়। অপরাহ্ণ ২ ঘটিকায় মহিলা-উৎসব। মহিলা ও বালিকারা মন্দিরে সমবেত হইলে তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সঙ্গীত করিলেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা করেন ও কিছু উপদেশ দেন। পরে মিসেস লাবণ্যপ্রভা দাস মহিলাদের জীবনী হইতে কিছু পাঠ করেন, অবশেষে সঙ্গীত হইয়া মিষ্ট জলযোগে এ বেলার কার্য্য শেষ হয়। উৎসবে বহু মহিলা ও বালিকা উপস্থিত ছিলেন। অপরাহ্ণ ৪৷৷০ ঘটিকায় নগর-সংকীর্ত্তন। গায়ক দল নগরে কীর্ত্তন করিয়া মন্দিরে উপস্থিত হইলে, একটি সঙ্গীতের পর শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী "চতুষ্পাদ ধর্ম্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ৭ই মার্চ্চ প্রাতে শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ীই আচার্য্যের কার্য্য করেন। অপরাহ্ণ ৬৷৷০ ঘটিকায় শ্রীমান্ মনোমোহন মিত্রের বাসায় তাহার স্বর্গীয় পিতামহের বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত উপাসনা করেন ও উপদেশ দেন। তাহার পিতা শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মিত্র 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' গ্রন্থ হইতে কয়েকটী শ্লোক পাঠ করিয়া জীবাত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে, ভারতীয় প্রাচীন ঋষিদিগের এবং ব্রাহ্মসমাজের অগ্রণীদিগের অমোঘ বিশ্বাসের কথা উল্লেখ করিয়া কিছু বলেন; অতঃপর তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেবের জন্য প্রার্থনা করেন। প্রীতিভোজনান্তে অদ্যকার কার্য্য শেষ হয়। ৭ই মার্চ্চ—আজ উৎসবের প্রধান দিন। প্রাতে উপাসনা শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় শ্রীযুক্ত মথুরানাথ গুহ সংক্ষিপ্ত উপাসনার পর উপনিষদ্ হইতে কিছু পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পরে নানা বিষয়ে কিছুক্ষণ আলোচনার পর কার্য্য শেষ হয়। অপরাহ্ণ ৬৷৷০ ঘটিকায় একটি কীর্ত্তন ও সঙ্গীতের পরে উপাসনা আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী আচার্য্যের কার্য্য করেন। পরে শান্তি বাচন হইয়া স্থানীয় মেসর্স এম্ ডেভিড কোম্পানীর ডাক্তার সাহেবের প্রদত্ত প্রচুর মিষ্ট জলযোগে উৎসব শেষ হয়। ঘোর নিরাশা ও অন্ধকারের মধ্যেও উৎসবের দেবতা আশার আলো জ্বালিয়া তাঁহার সন্তানদিগকে উৎসাহিত এবং উদ্যমশীল করেন, তাহাই সকলে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় দ্বারা ২১এ চৈত্র মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রীবরদাকান্ত বসু বি-এ,